শরৎ-সম্পুট

সেকাল আর একালের দৃষ্টিতে
শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন

পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি
১/১এ কলেজ স্কোয়ার। কলকাতা-১২

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রধান সম্পাদক
ড. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীধীরেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্য
শ্রীঅংশুমান পাল
পরিকল্পনা ও প্রযোজনা
শ্রীসুকুমার দাস

প্রকাশক
পরিতোষ মজুমদার
চারুপ্রকাশ
৭বি কলেজ রো
কলকাতা-৯
মুদ্রক
মলয়কুমার দত্ত
মুদ্রালিপি
১৮এ রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদচিত্র
ব্লু সীল । কলকাতা

প্রাপ্তিস্থান
পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতির বিক্রয়কেন্দ্র
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলকাতা-১২
বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির
৭বি কলেজ রো । কলকাতা-৯

সূচীপত্র

রাজনীতি-সমাজচিন্তা

সাহিত্যচিন্তা

শরৎপ্রতিভার মূল্যায়ন

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রস্তাবনা

শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে নিঃসন্তান, কিন্তু নিঃসন্দেহে বাঙালীর জাতীয় পিতৃ-পুরুষ। তাঁর জন্মের শতবর্ষাত্যয়ে পার্বণকৃত্যের আয়োজন করেছেন দেশ-বাসী। 'পিতৄন্ নমস্যে', স্মরণ-মনন চলছে। অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র গুপ্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সময়োচিত নিবাপাঞ্জলি সাজিয়েছেন পিতৃলোকবাসীর উদ্দেশে। মাধুকরী-পন্থায় আহৃত এই অঞ্জলি। বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ প্রথম তিনটি দশকে শরৎ-প্রতিভার উন্মেষ ও দ্রুত প্রসার ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি এবং সাধনার স্বাভাবিক ও সুমহান্ পরিণাম শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ দেশভাবনা ও অজস্র অপরূপ কথাসম্ভার। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসশিল্পের শূন্যদিগন্তে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'র সঞ্চার করেছিলেন। সর্বানুভূতির কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ অগ্রজন্মার পরিত্যক্ত কথাসূত্র নিপুণ হস্তে গ্রহণ করে-ছিলেন, এবং ছোটগল্পের সৃষ্টি করে কথাসাহিত্যে কবিপ্রাণতার ধারা বইয়ে দিলেন। এই দুই পূর্বসূরীর সমৃদ্ধিমান উত্তরাধিকার শরৎচন্দ্রে বর্তেছিল। তাঁর নিজেরও নিজের ছিল 'গুণানুবন্ধী প্রতিভানমদ্ভুতম্।' পতন-বন্ধুর-ব্যথা-বিধুর সাম্প্রত জীবন নিয়ে তিনি বেহাগ-বাগেশ্রীর অশ্রুত করুণ আলাপ করেছিলেন।

নানা স্তরের প্রবন্ধ-সঞ্চয়নের মাধ্যমে শরৎ-সমীক্ষার বর্তমান প্রয়াস সমাহর্তার একটি পরিচয় ব্যক্ত করেছে। তিনি তীক্ষ্ণধী ও ঐতিহাসিক বিবেক-সম্পন্ন সাহিত্যের পাঠক। শিক্ষা-সংস্কৃতিলব্ধ নির্বাচন-দক্ষতা ছাড়া এ সংগ্রহে তাঁর গবেষণা-নিপুণতার স্বাক্ষর পড়েছে। শরৎচন্দ্রের সমকালে এবং পরবর্তী সময়ের সীমিত পরিসরে এই অনলস শক্তিমান সারস্বত কর্মীর সৃষ্টিসম্ভার কিভাবে যুগচিত্ত স্পর্শ করে জাতির জীবনগঠনে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল, তাপমান যন্ত্রের মতো তার একটি নির্দেশিকা তিনি প্রবন্ধসমাবেশের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে গড়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের বিস্মৃতপ্রায় স্বাগতকার আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের একটি রচনা এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। মনীষী জননেতা বিপিনচন্দ্র পালের একটি সমালোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধীমান শিক্ষাবেত্তা ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ, প্রবীণ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, নবীনের উজ্জ্বল প্রতিনিধি ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, উৎকলের সাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর অনতিপরিচিত শরৎ-ভাবনা আগ্রহী পাঠকের গোচর করা হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, বর্তমান প্রবন্ধলেখকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁর চল্লিশ বছর আগেকার একটি বিস্মৃত ও বিস্মরণীয় রচনা অধুনা-লুপ্ত

ভারতবর্ষের নথি-সমাধি থেকে উদ্ধার পেয়ে এই সু-সংকলিত প্রবন্ধ-পঙ্ক্তীতে 'নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ' কবিবচনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে। বলা বাহুল্য, খ্যাতনামাদের সমালোচনাও এই অনতিবৃহৎ রচনা-সমুচ্চয়ে অংশতঃ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন আমাদের সাহিত্যিক জনমতের মূল্যমানের প্রতিবিম্ব বহন করে। এই মূল্যায়নের এককোটিতে স্তুতি, অপর কোটিতে দূষণ। ভূতার্থ-ব্যাহৃতি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। আমাদের অনতিপ্রাচীন সমালোচনা-সাহিত্য বঙ্কিমের যুক্তিনিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথের রসগ্রাহিতার পথ পরিহার করে চলেছে। শরৎচন্দ্র 'অপরাজেয়' কথাশিল্পী, এমন সিদ্ধান্তবচন আমরা আবৃত্তি করে চলেছি পুচ্ছগ্রাহিতাসূত্রে। 'অপরাজেয়' কথাটির যা ব্যুৎপত্তি, শরৎচন্দ্র নিজে এবং তাঁর যথার্থ গুণানুরাগীদের কেউ হয়তো তা শরৎ-সাহিত্যের পক্ষে দাবি করবেন না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা অসঙ্গত না হলেও ('comparison is odious' অভিমতটি পাশ কাটিয়ে) তার দায়িত্ব বহন করা নিতান্ত সুসাধ্য নয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকা 'Spectator'-এর নামপরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' ছাপ ফেলেছিল কিনা সে কথা বাদ দিয়ে বলা যায়, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠাতার দেশ-দেখা চোখ ও অনুরাগী কবি-মনের তুলনা হয় না। তার প্রমাণ শুধু আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জাগর মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' নয়। ছদ্মনামধারী কমলাকান্তের গম্ভীর মধুর তীক্ষ্ণ সরস প্রলাপে হাস্যকরুণের অপূর্ব সমাবেশ। তেমনভাবে শ্রীকান্তের ছদ্মবেশটি অপসারিত করলে শরৎচন্দ্র তাঁর দেশের লক্ষকোটি পরমাত্মীয়ের সঙ্গে কিরূপ নিবিড়ভাবে 'জীবনে জীবন যোগ' করেছিলেন তার সন্ধান মিলবে। বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষেত্রের স্বল্পালোকিত রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঙ্কিমের স্বচ্ছ সত্যসন্ধানী আর্ষদৃষ্টি অনুরাগভরে অনুপ্রবেশ করে রোমাঞ্চকর স্বপ্ন ও বাস্তব জগতের সৃষ্টি করেছিল। সে জগতের অধিবাসী একদিকে ঐতিহাসিক পুরুষ লক্ষ্মণ সেন, হলায়ুধ, পশুপতি, পিতাপুত্র মান-সিংহ-জগৎসিংহ, ওসমান, কতলু খাঁ, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজীব, রাজসিংহ, সীতারাম, মীরকাশিম, ভবানী পাঠক, লেফ্‌টন্যাণ্ট ব্রেনান, অপর দিকে মহামহিম কল্পপিতার বহুসমাদৃত মানসসন্তান, হেমচন্দ্র, নবকুমার, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মৃণালিনী, কপাল-কুণ্ডলা, সূর্যমুখী, ভ্রমর-দলনী, আয়েষা, প্রফুল্ল, লবঙ্গলতা, শান্তি, শ্রী, জয়ন্তী।

বঙ্কিমচন্দ্র দেবতার মেঘের মতো কণ্টকক্ষেত্রে করুণার বারিনিষেকের অনুনয় জানিয়েছিলেন। সে আহ্বানে সবচেয়ে অনুরাগভরে সাড়া দিয়ে-

ছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু রোহিণী-চরিত্র অবলম্বন করে এই প্রসঙ্গে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী দুয়ের মনোভঙ্গির পার্থক্যটাই আমরা বড়ো করে দেখে আসছি। শরৎচন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিকটতর সাযুজ্যের ঋণ স্বীকার করেছেন। লোকায়ত ধারণায় বঙ্কিম-চন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের ভেদের প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস দ্রুত সমাজবিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভেদের এই প্রাচীর বিধ্বস্ত করে দেয়। কাল যা ছিল আদর্শ আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আর-একটি প্রচলিত ধারণা, তিনি মুখ্যতঃ নারীতত্ত্ব-বিলাসী (feminist)। বিশেষ করে নারীত্বের পাতিত্যের দিকটি তিনি মহিমান্বিত করে তুলেছেন, চরিত্রহীনতা তাঁর সাহিত্যে সংবর্ধনা লাভ করেছে। আসল কথা বোধহয় এই যে, শরৎচন্দ্র সুন্দর সুশান্ত শালীনতাপূর্ণ জীবনের সুশ্রব সংগীতের মতো শ্রীহীন অশান্ত অকস্মাৎ-স্খলিত জীবনের মর্মভেদী হাহাকার কান পেতে শুনেছিলেন। যে নির্বীর্য নিষ্করুণ ক্ষমতালোভী পৌরুষ নারীর শুচিতা রক্ষার উপযোগী সমাজপরিবেশ গঠনের ক্ষমতার সঙ্গে চরিত্র ও প্রাণসম্পদ হারিয়ে বসেছে, নারীর প্রতি চরম সামাজিক দণ্ডবিধানের অধিকার তারই হাতে। এই হৃদয়হীন অবিচারের জন্য অভিমান ও বেদনা-বোধ শরৎচন্দ্রের মনঃশক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। চরিত্রহীনতাকে লোভনীয় ও মনোমদ করে তুলে ধরা নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষণিকের ভুলে, অন্যায় অবিচারে, নিপীড়নে, অভাবে দুর্যোগে যথার্থ চারিত্র-দীপ্তি যেখানে ম্লান হয়েছে, সেখানে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি নির্দ্বিধায় অকুণ্ঠভাবে সক্রিয় হয়ে নরনারী-নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছে। শরৎ-সাহিত্যে সতী-লক্ষ্মীর চিত্র কোথাও ম্লান হয়নি। এ-কালের dialectics বা পরিপ্রশ্ন-পদ্ধতির প্রভাবে 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের মুখে শরৎচন্দ্র কতক প্রশ্ন দিয়েছেন ; দ্রুত সমাজবিবর্তনের ফলে যে সমস্ত প্রশ্ন আজকার সমাজে জেগেছে। এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান তিনি দেননি, সমাধান চেয়েছেন। আমাদের দেশে পথে-ঘাটে চলতে গেলে মা-বোনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একথা শরৎচন্দ্র বড়ো গলা করে বলেছেন। আমাদের মনে হয়, মনোধর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্র ভারতীয় হিন্দু বাঙালী। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বিশ্বমানব। বঙ্কিমচন্দ্রের রসপ্রস্থান গীতা, রবীন্দ্রনাথের রসপ্রস্থান উপনিষদ। শরৎচন্দ্র জীবনরস-রসিক মনুষ্যত্ব-জিজ্ঞাসু। তাঁর সত্যের স্থান মুখে নয়, বুকে। শরৎচন্দ্র পরাধীন ভারতের বাঙালী কথাকার। তাই সংকোচ

কাটিয়ে এখনও আমরা বলতে পারিনি : শরৎচন্দ্র হুগো-টলস্টয়ের সগোত্র। স্বদেশের চণ্ডীদাসের মরমের তিনি অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথে আমরা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' পেয়েছি। শরৎচন্দ্রে পেয়েছি সামাজিক চিত্তে সহানুভূতির সুপ্তিভঙ্গ। যুবজন-চিত্তে সহানুভূতির সম্প্রসারণ শরৎসাহিত্যের সাক্ষাৎ সুফল। নিপীড়িত নিঃস্ব নিষ্কিঞ্চনের জন্য যেটুকু অকৃত্রিম বেদনাবোধ সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতার আড়ালে দেশের যুবশক্তিকে চঞ্চল ও উন্মনা করে তুলেছে, আমাদের মনে হয়, শরৎসাহিত্য তার জন্য পূর্বেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মানবাভিমুখী মনন ও সাধনা অর্থ, বিদ্যা, কুল ও ক্ষমতার যে নিষ্করুণ উদগ্র আভিজাত্যবুদ্ধি উৎখাত করতে পারেনি, শরৎসাহিত্যের দ্রুত প্রসার অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে অপসারিত করে সহজ স্বতোদীপ্ত মানবতার জয়গান করে 'সর্বোদয়ে'র পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

স্বাধীনতা-আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ, সমাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমকালীন ভাবনা ও কর্মসাধনার সঙ্গে উপন্যাসশিল্পী শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির যোগ অকৃত্রিম কিনা, এ নিয়ে আলোচনা ও অপরের সঙ্গে তাঁর তুলনা অনেকখানি 'এহো বাহ্য' নয় কি ? প্রত্যেককে তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে হবে। শরৎচন্দ্র যতখানি, ততখানি দিয়ে তাঁর তৌলন করতে হবে। তিনি যা নন, আমরা 'আপন স্বপন পরকে দেখিয়ে' তাঁর কাছে যা প্রত্যাশা করি, তাই দিয়ে তাঁকে যাচাই করা নিশ্চয়ই সমালোচনার পর্যায়ে আসে না। রবীন্দ্রনাথ অতিদুঃখে 'যথাসাধ্য ভালো' এবং 'আরো ভালো'র কলহের রূপক-সৃষ্টি করেছেন কণিকার একটি ক্ষুদ্র কবিতায়। সমালোচনার শাস্ত্র অবশ্য গুণ ও দোষ দুয়েরই আলোচনার প্রয়োজন স্বীকার করে। 'গুণদোষান্ অশাস্ত্রজ্ঞঃ কথং বিভজতে জনঃ।' কিন্তু গুণগ্রহণসামর্থ্য নিশ্চয়ই দোষোদ্‌ঘাটনপটুতার চেয়ে বেশি সার্থক। এই গুণগ্রহণক্ষমতাকে আলঙ্কারিক দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'কিমন্ধস্যাধিকারোঽস্তি রূপভেদোপলব্ধিষু'। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রকৃত সমালোচনার নাম পূজা।

শরৎচন্দ্রের একখানি প্রখ্যাত উপন্যাসের প্রৌঢ় অকৃতদার নায়ক এক রাত্রি-শেষে কোন দেবায়তনে সপরিবারে সুপ্ত জনতার সম্মুখীন হয়ে তাঁর যে-সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি এমন সন্তানের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। শরৎ-চন্দ্র অ-জাত সন্তানের জন্য দুঃখ অনুভব করেছিলেন কিনা, জানা যায় না। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির স্নিগ্ধকিরণ তাঁর বহুকোটি ভাবী

সন্তানের চিত্তদল কুমুদের মতো প্রস্ফুটিত করেছিল। স্বল্পভাষী মানুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য 'শিক্ষাষ্টকে'র প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনকে 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা—বিতরণম্' বলেছিলেন। মহাপ্রভুর দেশের মানুষ এবং প্রেমের ঐতিহ্যবাহী শরৎচন্দ্রের সুকৃতিতে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল যুব-সমাজ দেশের যেটি শ্রেয়ঃ সেটি বহন করে আনবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আমার সুধী বন্ধু এবং সমানকর্মা বর্তমান সঙ্কলনকর্তা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এ প্রার্থনায় নিজেকে যুক্ত করবেন।

জনার্দন চক্রবর্তী

ভূমিকা

শরৎচন্দ্রের শুভজন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। নানাভাবে তাঁকে দেশবাসী শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতিও তাঁদের সামান্য সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রদ্ধার ডালি সাজাতে চেয়েছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চারের দশক পর্যন্ত তাঁর প্রতিভা-অভিব্যক্তির কাল। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পথ কেটে যিনি এগিয়েছেন, তাঁর পক্ষে তিনটি দশক এমন কিছু দীর্ঘকাল নয়। তিরিশের দশকের উপান্তেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। যেন একটা বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আর অগ্রসর হতে পারলেন না। আর আশ্চর্য ঘটনাপারম্পর্য—তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র বিশ বছরের মধ্যে বাঙালী সমাজে কী গভীর পরিবর্তন এসে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, আন্তর্জাতিক শক্তির অক্ষরেখায় ইংরেজ হটে এল মার্কিন সভ্যতার নিশ্চিত অগ্রগতির কাছে, অন্যদিকে রুশ সমাজতন্ত্রের আদর্শ বস্তুত দুনিয়াটাকেই দুটি শিবিরে বিভক্ত করল।

বিজ্ঞানের বিভীষণ মারণলীলায় মানুষের বিশ্বাসের বনিয়াদ ধ্বসে গেল। শান্তির জন্য সংগ্রামের আহ্বান জাগল দিকে দিকে। বুর্জোয়া সভ্যতার সংকটের স্বরূপ দেখা দিল নগ্ন হয়ে। এই আন্তর্জাতিক পটভূমিতেই দাঁড়িয়ে বীরের রক্তস্রোত মাতার অশ্রুজলের বিনিময়ে এল খণ্ডিত স্বাধীনতা। তখন 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ'। এর কিছুই শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেন নি।

আমাদের পরিবর্তিত মূল্যবোধের আভাসমাত্র তখনো জাগে নি। এখন শিল্পবিচারে সমাজচেতনা রাজনীতিচেতনারও তৌলন হয়। কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মধ্যবিত্তের জীবনাচরণের সঙ্গে বিশেষ লেখকের শিল্পকৃতির সম্বন্ধ খতিয়ে দেখা হয়। সাহিত্যপাঠের ফলশ্রুতির সঙ্গে সমাজপ্রগতির সংযোগ আবিষ্কার নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং অপরিহার্য।

কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে, প্রথম আবির্ভাবের সময় যেমন মধ্যাহ্নরবিকে ছাপিয়ে শরৎচন্দ্রের যশ বিকীর্ণ হয়েছিল, অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণেই সমাজ-পট এবং বাংলা সাহিত্যের আমূল বদল হবার পরেও তিনি তেমনি জনপ্রিয়, তেমনি যশস্বী।

২

কী তাঁর জনপ্রিয়তার উৎস ? অনেকের মতে তাঁর সহজ সরল অকৃত্রিম হৃদয়াবেগযুক্ত অনবদ্য ভাষাই তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে। কিন্তু ভাষাই কি শিল্প,

ভাষা তো ভাবের বাহন মাত্র। আধেয় বাদ দিয়ে আধারবিচার তো চলে না। আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র গড়পড়তা বাঙালী মধ্যবিত্তের দেশপ্রীতি, সংস্কার-স্পৃহা এবং অন্তরপ্রোথিত রক্ষণশীলতা, পিছুটান, ভাবপ্রবণতা ও স্বভাবদৌর্বল্য সবটুকু নিঃশেষে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই পাঠকের হৃদয়ে তিনি উজ্জ্বল স্ফটিকাসনে অধিষ্ঠিত। পরিশীলিত মননের দ্বারা কথাশিল্পী চরিত্রগুলি ব্যাখ্যা করেন নি; তাই পাঠক-লেখক এবং তাঁর সৃষ্ট নরনারী একই পর্যায়ে একটি অপূর্ব চিত্তসাযুজ্য লাভ করেছেন।

আর-একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সিংহভাগ জমিদাররা নিয়েছেন; কিন্তু আমিন মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক কেরানী ইত্যাদি মধ্যবিত্তের নানা উপস্তরও কি সেই বন্দোবস্তের ফলভোগী নয়? প্রমথ চৌধুরী মালিকানার প্রায় বাহাত্তর রকম শ্রেণীপর্যায় ভাগ করেছেন। তার মধ্যে আমরা সবাই অন্তর্ভুক্ত, যারা সমাজের অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, প্রতি-কার চাই। তাই শরৎচন্দ্র যখন অন্যায় ও পীড়নের চিত্র তুলে ধরেন, পল্লী-সমাজের হাওয়া-বদলের কথা বলেন, তখন আমরা উদ্দীপিত হই। কিন্তু বেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় রমেশ ও বেণীর মা—সামন্তসমাজেরই অন্য প্রতিনিধি, জীবানন্দ চৌধুরীই তাঁর পুরুষানুক্রমিক দেনা শোধে ব্রতী হলেন—এইসব দেখেও আমরা খুশী। কারণ নীচুতলার মানুষের অভ্যুত্থান সমাজ-সংস্কারের পক্ষে তাহলে অনিবার্য নয়। এই পরম সান্ত্বনা মধ্যবিত্তের ভিত্তি ধরে নাড়া দেয় না। অথচ বিবেকের তাড়না অভিব্যক্তি পায়।

৩

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ দুরারোহ শিখর, শরৎচন্দ্র পরিচিত প্রাঙ্গণ: বিদেশের কণ্টিনেণ্টাল হাওয়া-লাগানো কালিকলম-কল্লোল-প্রগতির বাস্তববাদ এবং রবীন্দ্র বিরোধ সত্ত্বেও তরুণ লেখকরা সকলেই প্রথম পর্বে শরৎপ্রভাবিত। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেই যাঁরা চলতে চেয়েছেন, যাঁরা দেখেছেন, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,' গেছেন জীবনের সন্ধানে হাড়ি-মুচি-ডোম-বায়েনের জগতে, লিখেছেন পটলডাঙার পাঁচালি, তাঁরাই শরৎচন্দ্রের ছবি ছেপেছেন; শরৎসংবর্ধনার প্রতিবেদনে প্রশস্তি জানিয়েছেন। এ এক বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা। সবুজপত্রের লেখক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সেদিন শরৎবাবু এনেছিলেন গ্রামের গন্ধ। তাঁর দৃষ্টির, ভাষার ও ব্যবহারের ঋজুতায় ছিল গ্রামজীবনের আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতাই মৌলিকতার অন্য নাম।

চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে শরৎচন্দ্র এমন কিছু এনেছেন যা আজকের বিচারে আধুনিক নয়, হয়তো প্রগতিশীলও নয়, কিন্তু সমকালের প্রেক্ষিতে অনবদ্য। অধ্যাপক সুশীল জানাব কথায়: 'লিপিকৌশল, কাহিনীকৌশল নয়, এই চরিত্রসৃষ্টিই বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে শরৎচন্দ্রকে শুধু আত্মার আত্মীয় করে তুলেছিল একদিন, আজও তার শেষ নেই। সে চরিত্রগুলির মধ্যে মহামানবত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু ছোট বাঙালী পরিবারের মধ্যবিত্ত মানুষ আছে।' সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্গে গুজরাতী মারাঠী বিহারী মধ্যবিত্তের পার্থক্য সামান্যই। একই জীবিকা, একই জমির উপস্বত্ব ভোগ এবং শ্রেণীগত সীমা সকলের চারিত্রলক্ষণ। সেজন্যেই বাঙালীর শরৎচন্দ্র, ভারতবর্ষেরও। বিখ্যাত হিন্দী সমালোচক রামস্বরূপ চতুর্বেদীর উক্তি লক্ষণীয়: 'শরতের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ সমকালীন অন্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেখা যায় না। ডিকেন্স ডস্ট-য়েভস্কি এবং শরতের উপন্যাসে যে বিশ্বদৃষ্টি এবং আবেগানুভূতির গভীরতা দেখা যায়, আধুনিক লেখকদের রচনায় তার অভাব আছে।'

শরৎচন্দ্রের শিল্পীব্যক্তিত্বের অসামান্যতা এবং আধুনিক ভারতীয় কথা-সাহিত্যে তাঁর প্রভাবের কথা মনে রেখেই 'শরৎসম্পুট' সংকলিত হয়েছে।

৪

সম্পুটের রচনাগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) স্মৃতিকথা: প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের উদ্ভাসন। ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে সাহিত্যসৃষ্টির গভীরে পৌঁছানো যায়। এই পর্যায়ে সেই প্রয়াস আছে। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন প্রমুখের স্মৃতিচারণে আন্তরিক অনুভূতির স্পর্শ আছে।

(২) গ্রন্থবিচার: বিশেষ-গ্রন্থকেন্দ্রিক আলোচনা। এই সূত্রেও সমগ্রভাবে তাঁর কথাশিল্পের জগতে প্রবেশাধিকার জন্মায়। পরিমল গোস্বামী, কাজী আবদুল ওদুদ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখের গ্রন্থবিচার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(৩) চরিত্রবিচার: চরিত্রের মনোলোকেই লেখকের দ্বিতীয় জন্ম; চরিত্রের জীবনযন্ত্রণা শিল্পীর নিজেরই জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন। সৃষ্ট চরিত্রের ছকেই লেখকের জীবনবিন্যাস ধরা পড়ে। রাজলক্ষ্মী অভয়া কমললতা কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রসমীক্ষা শরৎমানসেরই বিশ্লেষণ।

(৪) রাজনীতি-সমাজচিন্তা: শিল্পী যদিও মূলতঃ শিল্পী, কিন্তু তিনি স্বয়ম্ভু নন; দেশ-কালের পরিবেশ তাঁকে উদ্বিগ্ন করে, প্রপীড়িত করে। অনুকূল

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ঔপন্যাসিক নন, রবীন্দ্রনাথও যত বড় স্রষ্টা, তত বড় মনীষী। শরৎপ্রতিভা মনন-নির্ভর না হলেও শিল্পী হিসেবে, পরাধীন ভারতের মানুষ হিসেবে তিনিও রাজনীতি-সমাজ-সমস্যায় আন্দোলিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বিতর্কের সম্ভাবনাও স্বাভাবিক। চরকায় স্বাধীনতা আসবে কি? বিলেতী কাপড় পোড়ালেই চরম স্বদেশকৃত্য হল? এরকম প্রশ্ন আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কেই প্রশ্ন। শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গেও এসব প্রশ্ন উঠেছে। নেপাল মজুমদারের আলোচনার বিপরীত কোটিতে আছেন দেবদাস জোয়ারদার ও তপোবিজয় ঘোষ প্রভৃতি; শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ভিন্নপন্থায় একধরনের সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। তিনি যে পথের দাবীর পর রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আর উপন্যাস লেখেন নি, সে কি টেগার্টের ভয়ে? বিপ্লববাদে শরৎচন্দ্রের আস্থা ছিল কি? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে ক্ষেত্রপাল দাসঘোষের ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখায়।

(৫) সাহিত্যচিন্তা : এ জীবন লইয়া আমি কী করিব? এই জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজেছেন বঙ্কিম জীবনে ও সাহিত্যে। চরিত্রবান কে? কাকে বলে চরিত্রহীন? পদস্খলিত হলেই কি সে পতিত বা পতিতা? শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তা নয়। সনাতন বিচারশাস্ত্রকে পাল্টে দেখো। সামাজিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত কারণগুলির মধ্যেই উত্তর নিহিত আছে। এ তো গেল সাহিত্যসৃষ্টির কথা। তারই মধ্যে উৎকীর্ণ থাকে লেখকের সাহিত্যচিন্তা, শিল্পদর্শন। এ বিষয়েও আলোচনা তাই অপরিহার্য।

(৬) শরৎপ্রতিভার মূল্যায়ন : এই পর্যায়ে সামগ্রিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-বিচার, স্বকৃত নাট্যরূপের আলোচনা, হাস্যরসসৃষ্টি-নৈপুণ্য, শিশুচরিত্রসৃষ্টির সাফল্য, কেদারনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ, আঙ্গিকবিচার, তাঁর শিল্পের জগতের পরিধিবিচার ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, গোপাল হালদার, রথীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের রচনা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৫

এছাড়া আছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শরৎচন্দ্রের প্রভাবের প্রকৃতি-বিচার। ড. চন্দ্রকান্ত মেহতা গুজরাতী উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করেছেন। কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী তাঁর জীবনে তথা ওড়িয়া সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ্য,

বোধহয় সম্পুটেরও সর্বোত্তম প্রবন্ধ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'ভারতমানসের প্রতিনিধি শিল্পী।' প্রভূত অধ্যবসায় ও অনলস পরিশ্রমের ফলে লেখক সারাভারতের কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করতে পেরেছেন। পরিসংখ্যান দিয়ে ছবিটিকে আরো স্পষ্ট করেছেন ; শ্রীযুক্ত মেহতার তথ্যগত ভ্রমও সংশোধিত হয়েছে।

একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের ভাষা-স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে—তাঁর জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। 'শরৎ-দূষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচকদের শরৎ-অনীহার ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। বিবরণটি অসম্পূর্ণ হলেও কৌতূহলোদ্দীপক। 'বামুনের মেয়ে' বিচার প্রসঙ্গে আমাদের গ্রামীণ সমাজের যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে সুধী পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অন্ততঃ তিনজন লেখক শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিরূপতার উল্লেখ করেছেন। আমাদের মতে, সব প্রশ্নই যে প্রাসঙ্গিক এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নে অপরিহার্য—তা নয়। তবু প্রশ্নটিকে যাচাই করে নেওয়া দরকার। সে-প্রয়াস কতদূর সার্থক হয়েছে জানি না।

চতুরঙ্গের এলা আর পথের দাবীর ভারতী বিপ্লবী দলের মেয়ে। দুজনেই খরদীপ্তিময়ী, অশঙ্কিনী নারী। কিন্তু পার্থক্যও গভীর—সে পার্থক্য দুই চরিত্রের সৃজক-পিতার দৃষ্টিভঙ্গিগত। বাণী রায় উভয়ের কাল্পনিক সংলাপ 'যদি দেখা হয়' লিখে সমালোচনাকেই রসসৃষ্টিতে পরিণত করেছেন।

আচার্য জনার্দন চক্রবর্তী 'প্রস্তাবনা' লিখে দিয়ে সম্পুটের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

॥ সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥ অল্পসময়ে নানা অসুবিধের মধ্যে 'সম্পুট' প্রকাশনের কাজে অনেক দোষত্রুটি রয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত সব লেখকদের প্রবন্ধ সংকলনে দেওয়া যায় নি। আবার প্রতিশ্রুত তালিকার বাইরেও অনেক লেখকের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারা যায়নি বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সনির্বন্ধ অনুরোধ, নিজগুণে ক্ষমা করবেন। ইতিমধ্যে কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বেড়েছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থের দাম বাড়াতে হল। গ্রাহকরা অবশ্য নির্ধারিত মূল্যেই পাবেন। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলির লেখক ও পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক

ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এবং চৈতন্য লাইব্রেরির সহযোগিতা অবশ্য উল্লেখ্য। বন্ধুবর তারাপদ সাঁতরার সৌজন্যে শরৎচন্দ্রের হিসাবের খাতার ব্লকটি পেয়েছি। বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকারকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি অধ্যাপক-বন্ধু অজয়কুমার ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পুরনো প্রবন্ধ অনুলিপির কাজে সাহায্য করেছেন গীতা সরকার, গৌর-গোপাল সাহা, প্রবীর ঘোষ, আশিসকুমার দে, শুভেন্দু গুপ্ত, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা সাহা ও প্রতিমা ঘোষ। 'চতুষ্কোণ' সম্পাদকমণ্ডলীর শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অরুণ রায়, তপোবিজয় ঘোষ এবং পল্লব সেনগুপ্তের সহযোগিতা ছাড়া সাম্প্রতিক শরৎ-বিতর্কের পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করা যেত না। শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী 'শতাব্দী স্বাক্ষর' এবং 'সাহিত্যপ্রয়াসী'র শরৎসংখ্যা দিয়ে সাহায্য করেছেন। চারুপ্রকাশের পক্ষে শ্রীযুক্ত অশোক ঘোষ অশেষ ধন্যবাদভাজন ; তিনি ছাড়া এ-গ্রন্থ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ছিল।

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর প্রথম প্রকাশকাল

১৯১৩	সেপ্টেম্বর	—	বড়দিদি (উপন্যাস)
১৯১৪	মে	—	বিরাজ বৌ (উপন্যাস)
	জুলাই	—	বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্প-সমষ্টি)
	অগস্ট	—	পরিণীতা (গল্প)
	সেপ্টেম্বর	—	পণ্ডিতমশাই (উপন্যাস)
১৯১৫	ডিসেম্বর	—	মেজদিদি (গল্প-সমষ্টি)
১৯১৬	জানুয়ারি	—	পল্লী-সমাজ (উপন্যাস)
	মার্চ	—	চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)
	অগস্ট	—	বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প)
	নভেম্বর	—	অরক্ষণীয়া (গল্প)
১৯১৭	ফেব্রুয়ারি	—	শ্রীকান্ত ১ম-পর্ব (উপন্যাস)
	জুন	—	দেবদাস (উপন্যাস)
	জুলাই	—	নিষ্কৃতি (গল্প)
	সেপ্টেম্বর	—	কাশীনাথ (গল্প-সমষ্টি)
	নভেম্বর	—	চরিত্রহীন (উপন্যাস)
১৯১৮	ফেব্রুয়ারি	—	স্বামী (গল্প-সমষ্টি)
	সেপ্টেম্বর	—	দত্তা (উপন্যাস)
	সেপ্টেম্বর	—	শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস)
১৯২০	জানুয়ারি	—	ছবি (গল্প-সমষ্টি)
	মার্চ	—	গৃহদাহ (উপন্যাস)
	অক্টোবর	—	বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)
১৯২৩	এপ্রিল	—	নারীর মূল্য (সন্দর্ভ)
	অগস্ট	—	দেনা-পাওনা (উপন্যাস)
১৯২৪	অক্টোবর	—	নব-বিধান (উপন্যাস)
১৯২৬	মার্চ	—	হরিলক্ষ্মী (গল্প-সমষ্টি)
	আগস্ট	—	পথের দাবী (উপন্যাস)
১৯২৭	এপ্রিল	—	শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস)
	অগস্ট	—	ষোড়শী ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ)

১৯২৮	অগস্ট	—	রমা ('পল্লী-সমাজে'র নাট্যরূপ)
১৯২৯	এপ্রিল	—	তরুণের বিদ্রোহ (সন্দর্ভ)
১৯৩১	মে	—	শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
১৯৩২	অগস্ট	—	স্বদেশ ও সাহিত্য (সন্দর্ভ-সংগ্রহ)
১৯৩৩	মার্চ	—	শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস)
১৯৩৪	মার্চ	—	অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প-সমষ্টি)
	ডিসেম্বর	—	বিজয়া ('দত্তা'র নাট্যরূপ)
১৯৩৫	ফেব্রুয়ারি	—	বিপ্রদাস (উপন্যাস)

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৯৩৮	মার্চ	—	শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ [ভাষণ-সমষ্টি : সম্পাদনা—মুরারি দে]
	এপ্রিল	—	ছেলেবেলার গল্প [তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি]
	জুন	—	শুভদা [উপন্যাস]
১৯৩৯	জুন	—	শেষের পরিচয় [উপন্যাস ; শেষাংশ রাধারাণী দেবীর লেখা]
১৯৪৮	ফেব্রুয়ারি	—	শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী [সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]
১৯৫১	জুলাই	—	শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী [সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]
১৯৫৪	নভেম্বর	—	শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র [সম্পাদনা—গোপালচন্দ্র রায়। পরে এই শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থের চিঠিগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আরও বহু চিঠি একত্রিত করে 'শরৎচন্দ্র—৩য় খণ্ড' অর্থাৎ পত্রাবলী খণ্ডগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে]।

শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্র

বিপিনচন্দ্র পাল

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রায় সবগুলিই মোটামুটি পড়িয়াছি। ইহাতে আমার প্রথমকার ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে। আজ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে একথা বলিতে পারি যে, বাংলার বর্তমান কথাসাহিত্যে সকল দিক দিয়াই শরৎচন্দ্রের আসন সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে psychological novel বলে, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত। আর সেই শ্রেণীর কথাসাহিত্য রচনায় শরৎচন্দ্র যে পরিমাণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, অতি অল্প সাহিত্যসৃষ্টিতেই, কি এ দেশে বা অন্যদেশে, এতটা কৃতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি সামান্য ফষ্টিনষ্টির ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের মনের নিগূঢ়তম ভাবগুলি নিপুণতা সহকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এইরূপ নিপুণতা কমই দেখা যায়। হালকা কথাবার্তার অন্তরালে মানুষের মন কতটা পরিমাণে যে আপনার গূঢ়তম আশা বা নিরাশাকে লুকাইয়া রাখিতে যাইয়াই ব্যক্ত করিয়া ফেলে, এই সত্যটা শরৎচন্দ্র প্রায় তাঁহার প্রত্যেক সৃষ্টিতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা এ সকল হালকা কথাবার্তা শুনিয়া বা ফষ্টিনষ্টি দেখিয়াই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির বিচার করেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মূল্য বুঝিতে পারিবেন না। অনেকেই পারেন নাই।

এইরূপ ভাসা-ভাসা ভাবে শরৎচন্দ্রের বই পড়িয়া রুচিবায়ুগ্রস্ত সমালোচক শরৎচন্দ্রের লেখাতে কুরুচির গন্ধ পাইয়া নাক সিঁটকাইয়া উঠিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের সকলগুলি পড়িবার পূর্বেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির গ্রাম্যরুচির কথা আমার কানে পৌঁছিয়াছিল। এই কথাটা যে কত অসত্য, তা আজ নিজে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া বুঝিতেছি। তবে শরৎচন্দ্র যে তাঁহার রচনাতে এই অভিযোগের কোনই কারণ দেন নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। এ সংসারে অধিকাংশ লোকেই ধর্মাধর্মের বিচার করে লোকের বাহিরের পোশাক দিয়া, সদাচার-অসদাচারের ওজন করে মুখের কথা দিয়া, অন্তরের ভাব দিয়া নহে। মানুষের বাহিরের কর্মাকর্ম দিয়া ইহারা তাহাদের অন্তরের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার হিসাব করিয়া থাকে। যাহারা আমাদের স্মৃতির বা ধর্মশাস্ত্রের বিধিলিঙ দিয়া মানুষের অন্তরের বিচার করে, কিংবা খ্রীষ্টিয়ানী বাইবেলের 'দশ-আজ্ঞার' ফুট-ফিতা ফেলিয়া মোরালিটির (mora-

lityর) কালি কষিয়া থাকে, তাহারা অতি সহজেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকে, সরাসরি বিচারে, অপাঠ্য বা কুপাঠ্য কহিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে। কিন্তু যাহারা খোলাতে ফলের আস্বাদন করে না, কিছু শাঁস খুঁজিয়া দেখে, তাহারা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির অভ্যন্তরে কতটা পরিমাণে যে চিরন্তন সত্যের ও ধর্মের প্রেরণা আছে, ইহা অস্বীকার করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

২

শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র ইহার প্রমাণ। বহুদিন পূর্বে 'বিজয়া' পত্রিকায় একটি সামান্য প্রবন্ধে 'কাম, সতীত্ব ও প্রেম' এই তিনের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে কী লিখিয়াছিলাম, আজ একটুও মনে নাই। কিন্তু বোধ হয় এই কথাটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, প্রেম সতীত্ব অপেক্ষা ততটা বড়, যতটা সতীত্ব কাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে ও সমাজে লোকে সচরাচর যাহাকে সতীত্ব বলিয়া মর্যাদা করে, এবং রুচিবাদীরা যাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচেন, তাহা যে খুব একটা সত্য বা মহৎ বস্তু, এমন বলা যায় না। রুচিবাদী কহিলাম, নীতিবাদী শব্দ ব্যবহার করিলাম না, কারণ আমাদের কোষে যাহাকে নীতি বলে, ইংরাজীতে তাহার নাম morality নহে। ইংরাজের morality আমাদের ধর্ম ; ইংরাজের statecraft বা politics আমাদের নীতি। ইংরাজীতে morality একটি সত্যবস্তু। কিন্তু এই morality-রও একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ভেজাল রূপ আছে, যাহাকে morality না বলিয়া আমি আমার ইংরাজী লেখায় ethicism বলিয়া থাকি। morality-র প্রতিষ্ঠা মানুষের অন্তরে—সেখানে যে সত্যসুন্দর দেবতা জাগ্রত রহিয়াছেন তাঁহারই পাদপীঠে। আর ethicism-এর প্রতিষ্ঠা ভগবানের চরণে নয়, সমাজের অনুশাসনে। এই অনুশাসনেরও শক্তি লোকনিন্দার ভয়ে ; ইহাই আমাদের সমাজে প্রচলিত সতীত্বধর্মকে অমন বড় করিয়া ধরিয়াছে। ইহাতে আমাদের দেশের স্ত্রী-চরিত্রকে একদিকে যেমন খুব বড় করিয়াছে—বাহিরের ত্যাগে ও সেবায়, সেইরূপ অন্যদিকে অতি খাটোও করিয়া রাখিয়াছে সত্যকার মনুষ্যত্বের বিকাশে। সমাজের দিক দিয়া এই সতীত্ববস্তু যতই বড় এবং পুরুষের যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, নারীর আত্মার দিক দিয়া ইহার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎ। তবে এই সতীত্বও একটা বড় কাজ করিয়াছে। এই সতী-ধর্মের বহু শতাব্দীর অনুশীলনে আমাদিগের দেশের নারী-চরিত্রে, বৈজিক শক্তি-প্রভাবে, এমন একটা সংযম গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা বোধহয় আর

কোন সভ্য দেশের স্ত্রী-চরিত্রে এতটা পরিমাণে পাওয়া যায় না। কিন্তু নদী যেমন এক পাড় ভরিলেই আর-এক পাড় ভাঙে, সমাজ-চরিত্রেও বোধহয় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের সমাজের অতি প্রাচীন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আধুনিক কালে, আমাদের সতী-সাধ্বীরা এতটা সংযত ও নিঃস্বার্থ বলিয়াই আমাদের পুরুষচরিত্র এতটা অসংযত ও স্বার্থপর হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে এই দুইটা বস্তুই সর্বাপেক্ষা চোখে পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্রে যেমন এই অসাধারণ সংযমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার পুরুষ-চরিত্রে সেইরূপ প্রায় সর্বক্ষেত্রে উদ্দাম লালসা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। আর পুরুষের অসংযমের পাশাপাশি নারীর এই সংযম ফুটাইয়া, শরৎচন্দ্র তাঁর নারী-সৃষ্টিকে পূজার অর্ঘ্য দিয়া মহীয়সী করিয়াছেন।

৩

শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্রের এই সংযম বহুশতাব্দীব্যাপী হিন্দুর সতীত্বের আদর্শের অনুশীলনের ফল বটে। কিন্তু আজ বহুশতাব্দীব্যাপী এই সামাজিক অনুশাসনে আমাদের নারী-চরিত্র যে কেবল এতটা পরিমাণে কামগন্ধহীন হইয়াছে তাহা নহে, ইহার নিকৃষ্ট স্বাভাবিক কামকে নষ্ট করিতে যাইয়াই নারী তার আত্মবস্তুকে পর্যন্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। নারী পুরুষের ছায়া হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব একেবারে যেন ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠতম নারী-চরিত্র ফলতঃ পুত্তলিকার মত হইয়া পড়িয়াছে; আর এই পুতুলের কলকাঠি পুরুষের হাতে সর্বদা নড়িতেছে। মনুষ্যত্বের এই অবমাননা বিধাতা কোথাও সহ্য করেন না। নারীর ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিতে যাইয়া তাহার ভাল দিকটাই চাপা রাখা হইয়াছে; মন্দ দিকটা, ইহার ফলেই, আরও বেশি করিয়া খুলিয়া গিয়াছে। নারী যেখানে আপনার সত্য অধিকারে এইরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়ে, সেখানে তাহার শক্তি কুটিল পথে যাইয়া তাহাকে অত্যন্ত স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা করিয়া তুলে এবং এ অবস্থায় নারী যতটা চালবাজি খেলাইতে জানে, সচরাচর পুরুষে ততটা জানে না ও পারে না। পুরুষ নারীকে বাহিরে আপনার হাতের কলের পুতুল প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছে, কতকটা পারিয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায়। কিন্তু সেই পুরুষই আবার নিষ্পিষ্ট নারীপ্রকৃতির হাতে নিজেও পুতুল হইয়া পড়িয়াছে। আত্মবঞ্চিতা নারী পুরুষের স্বার্থসুখসাধনায় আপনাকে বিসর্জন দিয়াই পুরুষের দুর্বলতা কোথায় এবং কতটা ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। যে নিজের শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে অবলম্বন করিয়াই সে আপনাকে

প্রবল করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এইরূপে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ তুলে। আমাদের দেশের নারীর চরিত্রেও বহুশতাব্দী ধরিয়া ইহাই দেখা গিয়াছে।

৪

কিন্তু কালপ্রভাবে, আর অন্য একটি দেশের সাধনা ও শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া আজ বাংলার নারীসমাজে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছে। ভিতরে ভিতরে চিরনিদ্রিতা নারী আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। এ বিদ্রোহ প্রকৃত পক্ষে নূতন নহে; চিরদিনই ইহা সমাজে ছিল, প্রচ্ছন্ন হইয়া। যেখানে এই বিদ্রোহ প্রকট হইয়া উঠিত, সেখানে নারী ঘরের বাহিরে যাইয়া আপনাকে নষ্ট করিত, এবং তাহার নিষ্ঠুর লীলার ফাঁদ পাতিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পুরুষ ধরিয়া মারিত। আজ নারীর এই বিদ্রোহ তাহাকে ঘরের বাহির করে না, সমাজের বাহিরে লইয়া যায় না, ধর্মের ও সত্য morality-র আদর্শকে নষ্ট করে না। বরঞ্চ মিথ্যা ধর্মের তুচ্ছ আবরণকে ছিঁড়িয়া নারীর সত্যকার মর্যাদা ও মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্রে এই অপূর্ব সত্যটাই খুব বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫

শরৎচন্দ্র যতগুলি নায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন, তার একটিকেও অপবিত্র বলা যায় না। যেখানে বাহিরের আচার-আচরণে অনেক বিগর্হিত কর্ম প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানেও শরৎচন্দ্রের নায়িকা-চরিত্রে শরীরে বা মনে পাপ প্রবেশ করে নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 'চরিত্রহীন' নাম শুনিয়া রুচিবাদীরা যতই নাক সিঁটকান না কেন, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর এই উপন্যাসে দুইটি প্রধান নায়িকা—এক সাবিত্রী, অপর কিরণময়ী। সাবিত্রীর প্রথম পরিচয় একটি মেসের বাড়িতে ঝি-রূপে। এই পরিচয়ে কিন্তু তাহাকে চেনা যায় না। আচার-ব্যবহারের ইঙ্গিতে মনে হয়, সে ফাঁদ পাতিয়া মানুষ ধরে। কলিকাতা শহরে সচরাচর ঝিগুলি যেমন কদর্য পল্লীতে এবং তদপেক্ষা কদর্য লোকের সহবাসে বাস করে, ক্রমে তাহাকে সেই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেসে দিনে চাকুরি করিয়া সেই স্থানেই গিয়া সে রাত্রি কাটায়। অথচ এই আচার ও আবেষ্টনের মাঝেও সাবিত্রীর শরীর ও মন যে একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়াছিল, ক্রমে ইহাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আর কিরণময়ী ঝোঁকের মাথায় যাহাই করুক না কেন, মুমূর্ষু স্বামীর ঘরে থাকিয়া হীনচরিত্র ডাক্তারের সঙ্গে যে খেলাই খেলুক না কেন, তাহার মন যে কত পবিত্র, দেহটা

যে কত শুদ্ধ, ইহা গোপন রহে নাই। তারপর, প্রকৃতপক্ষে যে-স্বামীকে সে কোনদিন প্রাণমন দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, সেই স্বামীর পরলোকে বিধবা হইয়া সে রাগের মাথায় বা ঝোঁকের মাথায় একটি কনিষ্ঠ সোদরের মতন পাতান-দেবরকে লইয়া স্বামীর ঘর ছাড়িয়া কলকাতা শহর ও বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া আরাকানে যাইয়া উপস্থিত হয়। এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এমন অবস্থায় পড়ে, যাহাতে এই তরুণ ও তরুণী বিধবাকে লোকচক্ষে পরস্পরের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতনই ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু যেখানে ও যে অবস্থায় শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন নষ্ট হইয়া পড়ে, কিরণময়ী কিছুতেই এইরূপ ভাবে নিজেকে নষ্ট করে নাই। আর এই রূপমুগ্ধ তরুণটিকেও নষ্ট হইতে দেয় নাই। তাহার শরীর এ কঠিন পরীক্ষাতেও সে বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারিণীর মত পবিত্র রাখিয়াছিল। এ পবিত্রতা হাতে-সূতাবাঁধা সতীত্বের জোরে গড়ে নাই; গড়িয়াছিল পবিত্র প্রেমের শক্তিতে, যেমন কিরণময়ী, সেইরূপ সাবিত্রী। দুজনাই কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাহিরের সমাজের নিয়ম ভাঙিয়াও অন্তরে নিজেদের পবিত্র রাখিয়াছিল, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। আর অল্পবিস্তর এই ছাঁচেই শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নারীচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মতে, অপরাধ তাহাদের অন্তরে নহে, বাহিরের সমাজের স্বেচ্ছাচারের বা অত্যাচারের ফলে। এ অপরাধও নিতান্ত বাহ্যবস্তু, একান্ত সাংসারিক; আন্তরিক বা পারমার্থিক আদবেই নহে। অথচ এই বাহিরের অপরাধের জন্য ইহারা কতটা ক্লেশ, কতটা অপমান, আর স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতম যাহা—কতটা লোকাপবাদ ইহারা সহ্য করিয়াছে! এইসকলের ভিতর দিয়াই শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্রসকল ফুটিয়া উঠিয়াছে। নায়িকাদিগের মধ্যে যে সংযম, যে আত্মবিলোপ, যে প্রেমনিষ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া বাংলার বৈষ্ণব ভক্তের সাধ্য কামগন্ধহীন 'গোপীপ্রেমের' কথা মনে হয়। বাংলার রসসৃষ্টিতে প্রাচীনকাল হইতেই কামের যথেচ্ছ ছড়াছড়ি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নিত্যসিদ্ধা গোপীপ্রেমের সন্ধান মহাজনপদাবলীর ভিতর ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই বলিলেও চলে। শরৎচন্দ্রই বোধহয় সর্বপ্রথমে এই একান্ত কামগন্ধহীন প্রেম যে কী বস্তু তাহা অসাধারণ নিপুণতাসহকারে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম নায়িকাদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের চিত্রে রক্তমাংসের সহজ প্রেরণা উপেক্ষিত হয় নাই। ইহাতে প্রাচীন আদর্শের সতীত্বের ছবিও ফুটিয়া উঠে নাই; অন্যদিকে আবার আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাসে যে কামের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, রক্তমাংসের তাড়নায় রক্তমাংসকে লইয়াই অনেক

সময় যে কাড়াকাড়ি হয়, শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্রে বোধ হয় কোথাও ইহা দেখা যায় না। অথচ শরৎচন্দ্র যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে বস্তুনিষ্ঠ বা realistic। এ চিত্র নিতান্ত কল্পিত নহে। পুরাতন সতীত্বের অনুশীলনের ফলেই বঙ্গনারীতে আজ এমন অপূর্ব প্রেমের সাড়া জাগিয়াছে। নারী এতকাল ছায়ার মতন পুরুষের অনুগামিনী হইয়া চলিয়াছিল; নারী আজ পুরুষের সহধর্মিণী হইতে চলিয়াছে। 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী এ পথের গুরু। 'পথের-দাবী'র সুমিত্রা ও ভারতী এই নূতন নারীধর্মের প্রবক্তা। শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র-অঙ্কনে ইহাই সকলের অপেক্ষা বড় বস্তু। এ বস্তু বোধ হয় এমন করিয়া বর্তমান সমাজের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে জুড়িয়া শরৎ-চন্দ্রই প্রথমে বাংলা সাহিত্যে প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র, মানবহৃদয়ের রূপকার

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী

সৃজনশীল সাহিত্য নারী বা পুরুষের আত্মাকে আবিষ্কার করেই পরিতৃপ্ত হয় না, তা বিশ্বসৃষ্টিকেও আবিষ্কার করতে চায়। উদাহরণ হিসাবে পঞ্চতন্ত্র, আরব্যরজনী বা ঈশপ লোককথার গল্পের উল্লেখ করা যায়। বিশ্বসৃষ্টির মর্মানুসন্ধানের জন্য পোকা-মাকড়, পশু-পাখি, এমনকি গাছপালা, লতা বা ভগবান এবং শয়তানও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাস্তব ও অ-বাস্তব ঘটনা একই সঙ্গে সক্রিয়। জীবনের একটি কাহিনী কল্পনা ও শৈল্পিক প্রকাশের সুন্দর বুননে বাস্তব ঘটনাকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রীতিকর রূপে উপস্থাপন করে। দৃশ্য, পরিস্থিতি, চরিত্রসহযোগে পাঠকের জানা-অজানা নরনারী·পশুপাখির এক জগৎ উন্মোচিত হয় যা তার আকর্ষণ বা উদ্বেগকে জাগ্রত করে কাহিনীর শেষ দেখতে বাধ্য করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমর মানবাত্মার রূপকার। মানবপ্রকৃতির গভীরে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর পরিণত শিল্পী-লেখনীর সুদক্ষ আঁচড় পাঠককে কাহিনীর শিল্পকর্মের মধ্যে দ্রুত নিয়ে যায়। কাহিনীর শিল্পকর্ম—সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব আবিষ্কার,—প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার অসাধারণ সৌন্দর্য—মানবকাঠামোতে অমর আত্মার গোপন অবস্থান।

তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধান ছিল নারী-পুরুষের আত্মার আবিষ্কার যা প্রতিটি অপরিচিত পথপ্রান্তেও পরিচিত, নারীপুরুষের অন্তরাত্মা যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জনয়িতা, যা নিরন্তর অচেতনকে হঠাৎ চেতন করে, গভীর নিদ্রালুর নিদ্রাভঙ্গ করে, নিষ্ক্রিয়কে সদাতৎপর করে তোলে, অন্ধকে চোখ মেলায় এবং চারিপাশের বিস্ময়কর পৃথিবীকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকিত রূপে উপস্থাপন করে, বধিরকে বিশ্বসংগীত শোনায়, যখন মূক অনন্তজীবনের ঐকতানের ছন্দে যোগদান করে।

গতানুগতিক বাংলা উপন্যাস থেকে শরৎচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। চরিত্রের প্রয়োগে, যা হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত, সেই কাহিনীর রূপায়ণে তিনি পূর্বসূরীদের কর্ষিত ক্ষেত্রের গতানুগতিকতাকে ভঙ্গ করেছিলেন।

এক অক্লান্ত লেখনীর দ্বারা এসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। নিষিদ্ধ অসামাজিক প্রেমের সীমানা এই লেখনী ছিন্নভিন্ন করেছিল। আমাদের

সামাজিক বিধিনিষেধকে তা নারীপুরুষের জটিল বিস্ময়কর সম্বন্ধের চরম নিষ্ঠুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে আক্রমণ করেছিল। আমাদের প্রাচীন সংস্কারবদ্ধ চিন্তার ওপর তাঁর নির্ভয় আক্রমণ সত্যি বিস্ময় উদ্রেক করে।

এক্ষেত্রে তিনি প্রধানুগ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং সমকালীন য়ুরোপীয় বা মার্কিন ঔপন্যাসিকদের চরিত্রচিত্রণ এবং রীতির নব্যধারায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সস্তা বিদেশী পোশাকে বাংলা উপন্যাস তখন সরল একঘেয়ে গতিতে চলছিল। প্রকৃত শিল্পীরূপে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নতুন জীবনের উদ্দীপনা আনলেন; সমকালীন বাংলা উপন্যাসে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব-রূপেই তিনি আবির্ভূত হলেন।

কিন্তু এটাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের একমাত্র বিশেষত্ব নয়। তাঁর সৃষ্টি-কর্মের অন্যদিক হল যে তিনি বাঙলা উপন্যাসের পূর্বতন ঐতিহ্যকেও আত্মসাৎ করেছিলেন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের সাধনায়।

তাঁর অনেক উপন্যাসেই আমরা আধুনিক সমাধানের উপযোগী সমস্যা খুঁজে পাই না। তিনি বাঙালী ঘরোয়া জীবনের চিরায়ত টানাপোড়েন, প্রেম-ঘৃণা বা জীবনসাধনার সাফল্য-অসাফল্যকে এঁকেছেন। তাঁর উপন্যাসাবলীকে এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় নূতন ও পুরোনো চিন্তা একসঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' এবং 'গৃহদাহে' তাঁর চরিত্র-রূপায়ণ-ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। অন্যান্য সৃজনশীল কাহিনীগুলোতে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—দুঃখের নীচু তারে প্রথাগত জীবনকেই উপস্থাপিত করেছে।

দেবদাস, চন্দ্রনাথ, কাশীনাথ, পরিণীতা, স্বামী, নিষ্কৃতি, বড়দিদি, মেজ-দিদি, বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি এবং অনুরূপ আরও কাহিনী অনুভববেদ্য ঘরোয়া সংঘর্ষের স্পর্শসঞ্জাত বাঙালী জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্রকর্ম।

একথা ঠিক যে এর মধ্যে কয়েকটি গল্প প্রেমের জটিল সমস্যা থেকে মুক্ত। সেখানে অন্য একটি গোপন ভালবাসার কথা বলা হয়েছে যাকে আমরা লজ্জাও বলতে পারি—যা কিনা শুধুমাত্র যৌথপরিবারব্যবস্থায়ই সম্ভব।

সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের সীমানা-বিধ্বংসী ঝড়ের মতো প্রেমের অবাধ প্রভাব, যা শরৎচন্দ্রকে তার পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে, তার চিহ্ন খুব কম উপন্যাসেই আছে। যুক্তির চেয়ে অনুভবের কাছে তাদের আবেদন বেশি। সীমিত পরিচিত পরিবেশে সুনিপুণ দক্ষতাযোগে সৃষ্ট এ সমস্যাই পাঠকমনে

আবেগ, দুঃখ জাগরিত করে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম লেখনবৈশিষ্ট্য শিল্পের অতুলনীয় স্পর্শ কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রে অঙ্কিত আছে।

একথা না বললেও চলে যে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ইংরেজি সমেত বহু ভাষাতেই লেখা হয় এবং প্রগতিশীল ঝোঁক সাহিত্যের সাধারণ প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতপক্ষে কোনো সাহিত্য প্রগতিশীলতা ভিন্ন উন্নতি করতে পারে না, কেননা আমরা প্রাচীন ব৷ আধুনিক যাই বলি না কেন, প্রগতিশীলতাই সত্যকারের শিল্পের সারাংশ যা টিঁকে আকে।

সমকালীন দুই প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে তুলনার একটা প্রথা আছে। শরৎচন্দ্রের এক ভক্ত তাঁকে একবার বলেন যে রবীন্দ্রনাথ যে কী লেখেন তার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না, অথচ শরৎচন্দ্রের দুঃখভাবনা, পারিবারিক ও জনজীবনের বৈচিত্র্যের শৈল্পিক উপস্থাপনা যেমন উৎসাহদায়ক তেমনি মন কাড়ে। এই মন্তব্য শুনে শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন—'হাঁ, আপনাদের কথা খুব সত্যি। কারণ রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের মত পাঠকদের জন্য, আমি লিখি আপনাদের জন্য।'

এখানেই তাঁর নিজের সাহিত্যবিচারের মহত্ত্ব বোঝা যায়। তাঁর গল্পের মানবিক স্পর্শ এবং দুঃখভাবনা বহু বিষয় ও পরিস্থিতির বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত দানের জন্য তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চরিত্রগুলিকে টেনে এনেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে দক্ষতার প্রধান লক্ষ্য হল একটি পুরুষ বা নারীর অন্তর অনুসন্ধান। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কল্পনাকে আকর্ষণ করতে প্রতিটি রচনাই জীবনের চেয়ে জীবন্ত।

একথা অনস্বীকার্য যে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা শরৎচন্দ্রের বহু গল্পের মূলে সক্রিয়। বর্তমান লেখক তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পথের দাবী' ওড়িয়াতে অনুবাদ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই গল্প শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার দাবি করে যা সমস্ত গতানুগতিক সীমানাকে ভেঙে ফেলেছে।

দৃশ্যতঃ শরৎচন্দ্র নিজেই গল্পের নায়ক অপূর্বের ছদ্মবেশে 'পথের দাবী'র দৃশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। সে কলকাতার বাসা ছেড়ে বার্মায় এসেছে এবং ভারতীর সঙ্গে আলাপ করেছে। ভারতী মুখ্য নারীচরিত্র, জাতে ক্রীশ্চান। সে ছিল স্কুলের শিক্ষিকা এবং একটি নূতন সংস্থা খুলেছিল, যার নাম লেখা তাজা ক্যাসুরিনা পাতা দিয়ে।

"কয়েকটি অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, পথের দাবী। তার মানে?

"ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই

আমাদের সাধনা। আপনি আমাদের সভ্য হবেন? অপূর্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে?

"ভারতী বলিল, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

"অপূর্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি। ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা, ফিরিঙ্গী ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে স্টেশন মাস্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়, আমরা যেন মানুষ নই। আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্তমাংস গায়ে নেই। এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

"ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জ্বালা টের পান অপূর্ববাবু? সত্যই কি মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ের বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না?

"অপূর্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়। কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না। মাপ করবেন আপনি, কিন্তু জোসেফ সাহেব ক্রীশ্চান বলেই ত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল। ধর্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষে হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোথাকার বিচার! এই বলচি আপনাকে আমি, এর জন্যই এরা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখনো ক্ষমা করবেন না।"

অপূর্ব, ভারতী এবং বৃহৎ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার প্রেক্ষাপট থেকে পৃথক। তিনি এখানে চিরপ্রিয় পরিচিত অনুভববেদ্য ঘরোয়া আবহাওয়াকে বিদায় জানিয়েছেন। তিনি শাশ্বত প্রেমের দিগন্তসন্ধানী একদল নারীপুরুষের সম্পূর্ণ নবজগৎ আবিষ্কার করেছেন। প্রতিটি চরিত্র এবং পরিস্থিতি জীবনের চেয়েও জীবন্ত। পরিণত তুলিকায়

হাল্‌কা টানে প্রতি চরিত্রের উপর মানবপ্রকৃতির জটিল মূল্যবোধ অঙ্কিত হয়েছে।

ভারতী ও সব্যসাচী প্রেমের এক টাইপের প্রতিনিধি, যা অবশ্যই মানব-চরিত্রায়নের প্রশংসনীয় অন্তর্ভেদী অনুভবে বিদ্ধ।

বস্তুতপক্ষে শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির যে কোন আলোচনায় এমন একটা ধারণা হয় যে একজন নারী বা পুরুষের খারাপ বা ভাল হওয়ার জন্য তার বিশেষ পরিপার্শ্ব এবং অবস্থাই একমাত্র দায়ী। প্রকৃতপক্ষে একজন নারী বা পুরুষের জন্মগ্রহণের কারণ হল পৃথিবীকে ধর্ম, শান্তি, সুখের আবাস করে তোলা। মানবচরিত্রে তার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং আবেগদুঃখজড়িত ভাষায় তার উপস্থাপনা লেখককে বুঝতে সাহায্য করে যিনি পৃথিবীর সব কিছুর ওপরে প্রেমের পতাকাকে তুলে ধরতে চান। প্রতিটি নরনারীর ছোটখাটো বিধি-নিষেধ এবং দুর্ঘটনাই তার পরিবেশের জন্য দায়ী—যেখানে সে বাস করে বা কাল কাটায়। তাঁর গল্পগুলির লক্ষ্য এক শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করা যেখানে প্রেম সমস্ত বিবেচনার উপর স্থান পাবে। সমস্ত মহৎ সাহিত্যই এই দিকে লক্ষ্য করে সৃষ্ট। শরৎচন্দ্রের মতো স্রষ্টার কাছে একজন পুরুষ বা নারী—জাতিধর্মগোত্রবর্ণভাষানির্বিশেষে—একই, অর্থাৎ মানুষ। এটা সত্যিকারের সাহিত্য সৃষ্টির অপরিহার্য সারাংশ এবং খ্যাত হতে বাধ্য। তাঁর শ্রীকান্ত, অপূর্ব, ভারতী, শশী এবং অসংখ্য চরিত্র—নারী ও পুরুষ—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেণীহীন সমাজের জন্য লড়াই করেছে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে প্রশস্তিপত্র দেওয়া হয়, তার শরৎচন্দ্র-রচিত প্রতিলিপি।

শরৎস্মৃতি

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে সুরটি একজন মানুষের প্রতি কথায় আচরণে দৃষ্টিতে অধরোষ্ঠের ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে, তার ভেতর সেই লোকটির ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। তিনি যদি লেখক হন, তবে নিজ রচনার মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সেটা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক আত্মিকরূপের একটি দিক্‌মাত্র। আসল মানুষটিকে সেখানে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। স্বকীয় রচনার মাধুর্যে যে গুণী আপামর সাধারণ সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থূলসূক্ষ্ম বহু অভিজ্ঞান রেখে গেছেন। সেই নিদর্শনগুলি আজ আমাদের কাছে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে।

চক্‌মকি পাথরে সুপ্ত বহ্নি থাকে, আর-একটা চক্‌মকির সংঘাতে ও সংস্পর্শে যেমন একটা ক্ষণিক আভা জাগে; তেমনি আমরা প্রতিদিনের জীবনে যাদের সংসর্গে আসি, তারা আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে যেন নানা রঙ-বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দীপ্ত করে। সেই ক্ষণিক আলোকে আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই। আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কারশক্তি দুর্বলতা সব ধরা পড়ে সে বিচিত্র আভাসে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন, নানা আলাপনের উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী রইল আগামী যুগের অধ্যয়ন-আলোচনার জন্য। তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হলে যে পরিস্থিতির প্রভাবে ও প্ররোচনায়, সুখদুঃখের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় শরৎচন্দ্রের সহজাত প্রতিভা ও অনুকম্পা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর অন্তঃসলিলার মুক্তধারায়, সেইসব অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে মাথট-মাশুল কতখানি তিনি আদায় করেছিলেন—তার একটা হদিস পাওয়ার প্রয়োজন আছে। এইসব মালমসলা হবে তাঁর জীবনসংহিতার ভাষ্য।

ভ্রমরের আর-একটা নাম মধুলিহ, কারণ সে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদন করে, এবং তার আর-একটা নাম মধুকর, যেহেতু সে সৃষ্টি করে নানা পুষ্প-নির্যাসে স্বকীয় মধু। শরৎচন্দ্র গৌড়জনের জন্য যে মধুচক্র সৃষ্টি করে গিয়েছেন সে মধু কোন্ পদ্মবনে কোন্ মালঞ্চে কোন্ আরণ্য নিভৃতে সঞ্চিত

হয়েছে তার সন্ধান লাভ করলে আমরা দেখতে পাব সমগ্র বাংলার পল্লীশহরে তার সুবিস্তীর্ণ পটভূমি।

আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে অব্যাহত গতি শুধু সাহিত্যিকের। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের আমরা শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাঁদের বুঝতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অর্বাচীনের কাছে তাঁরা দুর্জ্ঞেয়। পাণ্ডিত্যের একটা তকমা আছে। চাপরাশের কাছে সবাই প্রণত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রিই হোক বা অন্য কোনরূপ বৈদগ্ধ্যের উপাধিই হোক—নির্বিচারেই তা সাধারণের কাছে সম্ভ্রম আদায় করে। আমরা মেনে নিই সে লোকটা মার্কামারা—মেকি নয়। কিন্তু অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারদের মতো সাহিত্যিক উপাধিধারী নহেন। বাহিরের সম্বলের মধ্যে তাঁর আছে শুধু কাগজ আর কালি-কলম, আর আছে অন্তর্গূঢ় প্রতিভা। নিছক আত্মশক্তি ও অতন্দ্রিত সাধনার বলে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন, ভুবনবিজয়ী হন। নদীর মতোই আপনার খর-ধারার আবেগে পথ কেটে চলেন, কূলে কূলে অমৃতধারা বিতরণ করে। তিনি স্বয়ংভু, আত্মস্রষ্টা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি।

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগম্য ও নিষিদ্ধ সেখানে তাঁর অপ্রতিহত গতি। প্রাণের প্রেরণা স্থানে অস্থানে তাঁর জীবনতরীকে নিয়ে যায়। কত ঝড়ঝঞ্ঝা নৌকাডুবির দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি তাঁর দুর্লভ পসরাটি পূর্ণ করে আনেন, আমরা নির্বিঘ্নে ঘরে বসে তার আনুকূল্য ভোগ করি। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে অগ্নি অপহরণ করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ গিরি-গহ্বরে বন্দীদশা ও চিল-শকুনের চঞ্চুপ্রহরণ। কিন্তু তাঁর কল্যাণে ঘরে ঘরে জ্বলল প্রদীপ, পাকশালায় উনানে জ্বলল রন্ধনের আগুন। ডুবুরি যদি প্রাণভয় বিসর্জন করে অতলস্পর্শে ডুব না দিত, তবে সাগরের রত্নরাজিকে উদ্ধার করত কে?

শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশ ছিল নিত্য মুক্ত তাঁর রচনায়, বার্নস বা রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন কথা ও সুর যমজ হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যথার সঙ্গে অশ্রু, ক্ষতের সঙ্গে রক্তপাত, প্রেমস্পর্শের সঙ্গে পুলক যেমন চিরসম্পৃক্ত। যে সত্য জীবনে পরিপাক লাভ করেছে, ধূমলেশহীন শিখার মতোই তা জ্যোতির্ময়। আগুনটা ভাল করে ধরেনি যে কাঠে, তাতে ফোটে না তো বহ্নিদীপ্তি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে শুধু ধূম্রজাল।

শিবপুর কলেজে ছিলাম যখন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বছর কুড়ি আগেকার কথা। আমি তাঁর লেখার ভক্ত ছিলাম; সশরীরে যখন দর্শন দিলেন তখন তাঁর কল্পমূর্তিটি পেল তার বাস্তুভিটা আমার

চোখে। ভক্তের সঙ্গে ভক্ত-বৎসলের প্রীতি স্বাভাবিক, অল্প দিনেই অন্তরঙ্গ পরিচয় হল। আমি আজন্ম শহরে বন্দী, আর তিনি পথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক; আমার পল্লীবুভুক্ষু মন তাঁর মুক্তপ্রাণের খোলা হাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে সময় ঘন ঘন আমাদের দেখাশুনা হত, আর বাধত চিরচলিষ্ণু জঙ্গমের সঙ্গে এই স্থাবরের মল্লযুদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত রেডিয়ামের কণা যেন অজস্র বর্ষিত হত আমার অন্ধকার মনে পর্দার ওপর, স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে উঠত জ্বলে জ্যোতির্বিন্দু-গুলি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত শুধু গল্প আর তর্ক। তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের ডালে ডালে ঝাঁকি দিয়ে সংগ্রহ করতাম পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফলসম্ভার। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পরের বুলি কপচানো নয়—তাজা প্রাণের বহু সুখদুঃখ-সঞ্চিত অম্ল-কটুমধুর দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। সিনেমার ফিল্মে আঁকা অফুরন্ত চিত্রাবলি, নানা ঘটনার পরম্পরা দরদী হৃদয়ের স্নেহরসে অনুরঞ্জিত। স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে যেমন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ, মুক্তগতির লীলা—তেমনি আবার বহু অনুশাসনে নিষ্পিষ্ট রুদ্ধশ্বাস প্রাণধারায় আছে প্রবল বিক্ষোভ আর বেদনা। স্বেচ্ছাবৃত দৈন্য আর দুর্গতিতে কত প্রাণঋদ্ধি আর মহত্ত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বাংলার অন্তঃপুরে এবং আস্তাকুড়ে তার ইঙ্গিত পেতাম শরৎচন্দ্রের সহৃদয় ঘোষণায়। তাঁর যুক্তি-বিচারের প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যক্ষের মর্মস্থলে, আর অটুট বিশ্বাস ছিল আপনার সূক্ষ্মদর্শী অনুভূতির ওপর। হলে-যা-হতে-পারত সেই সম্ভাব্যতাকে দেখে প্রেমিকের যে দৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের সেই দৃষ্টি ছিল। বেসুরো জীবনের অন্তর্গূঢ় সুরটি তাঁর কানে জাগত। তাঁর প্রবীণ হৃদয়ের এই সহানুভূতি ও আশাশীলতা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল। মানুষের ভাল ও মন্দ দুইই তিনি যথেষ্ট দেখেছিলেন, তাই খাঁটি আর মেকির পার্থক্যটা ভালভাবেই বুঝতেন। মতে-আদর্শে-দৃষ্টি-কোণের সংস্থানে, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আমাদের বৈসাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, বাদানুবাদের অন্ত ছিল না, কিন্তু মনে পড়ে না কখনো সেজন্য কোন মনোমালিন্য হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তাঁর উদার প্রেমিক হৃদয় সব ব্যবধান অতিক্রম করে হৃদয়ের মিলনকেন্দ্রটিতে সহজে উপনীত হত। ছোট ছোট দু-একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত অভিজ্ঞ জীবনের দামিনীদীপ্তি।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বোধকরি আত্মবিরোধ। আদর্শের সঙ্গে অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে আজন্মের শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গ-সংস্কার এবং সর্বোপরি দৈবনির্বন্ধ অন্তরের নির্দেশকে জীবনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে। এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের জীবনেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। যাঁদের নাই অথবা থাকলেও ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তাঁরা

মহাপুরুষ। কিন্তু মানুষের ত্রুটি প্রমাদ ভীরুতা অক্ষমতা যেমন সত্য, তেমনি তার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, অনায়ত্ত আদর্শের জন্য ব্যাকুলতা ও বেদনা বোধহয় গভীরতর সত্য। পৃথিবীর নদীপর্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-বিস্তার, দিবারাত্রির আলো অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিগোচর, তার খনিজ গুপ্তধন সাগরগর্ভের রত্নাবলী অলক্ষ্যের অন্তরালে সুরক্ষিত গোপন সম্পদ।

"আজিকে হয়েছে শান্তি—জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে।" শরৎ-চন্দ্রের নশ্বর জীবনাংশ শ্মশানভস্মে বিলীন হয়েছে। অবিনশ্বর যা, তাঁর চিত্তসঞ্চিত ঋদ্ধিসম্ভার যা, অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার মূলধন যা, তার যথেষ্ট নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যরচনায়। সেই সম্পদের উত্তরাধি-কারী বাংলার বর্তমান ও আগামী যুগ। সাহিত্যিকের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় তাঁর রচনার সত্যে কল্যাণে ও সৌন্দর্যে। আসুন আমরা তাঁর বিদেহী আত্মিক বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনায় ধন্য হই। যাঁরা তাঁর ভঙ্গুর জীবনের সঙ্গে বন্ধুরূপে আত্মীয়রূপে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অন্তরে মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিটুকুই অমর হয়ে রইল।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর সমকাল

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক লোয়েল তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ My Study Windows-এ ইংরাজ আদিকবি চসারের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "Nothing is more certain than that great poets are no sudden prodigies, but slow result." অর্থাৎ মহাকবিরা ভুঁইফোঁড় নন্, তাঁরা ধীর বিবর্তনের ফলস্বরূপ। এই বিবর্তনের ধারা বিচিত্র। দেশবিদেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন কবিমানসের উপর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব বিস্তার করে এবং কবির স্বাভাবিক শক্তিগুলি বিকশিত হয়ে নব নব উদ্ভাবনী শক্তি আয়ত্ত করে। সমকাল ও কবিমানসের যোগাযোগের ফলেই সাহিত্যপ্রতিভার সৃষ্টি হয় এবং কবি নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অমরত্বলাভ করেন। কবি সম্বন্ধে লোয়েল যে সূত্র নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই প্রযোজ্য। একজন খ্যাতনামা বাঙালী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সৃজনপ্রতিভা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বাংলার সাহিত্যাকাশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটি মহা বিস্ময়কর বস্তু; রবীন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভূ বঙ্গসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করা অসম্ভব। যাঁরা সাহিত্যিক বিবর্তনে বিশ্বাসী, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপরোক্ত মতবাদ কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। দেশবিদেশের ক্রিয়াশীল প্রভাবগুলি কী রূপে ও কী প্রকারে কবি ও ঔপন্যাসিক আত্মসাৎ করে নিজ নিজ সৃজন-প্রতিভাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব না হলেও, সমকালের শক্তিশালী প্রভাবাবলীর সঙ্গে শিল্পীর মনোবিকাশের এবং তাঁর রসসৃষ্টির নিকট সম্পর্ক নির্দেশ করা সুকঠিন নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা শরৎ-সাহিত্যের সমালোচনা বিচার করলে মনে হয় যে শরৎ-সাহিত্য-সমালোচকদের কর্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। যে যুগে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাকে বাঙালী সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তখন সুরেন্দ্রনাথ পাঞ্চজন্য হস্তে রাজনীতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করছেন। সেবা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ও ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন তখন বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। জাতীয় জীবনের সকল দিকেই মুক্তির বাণী উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। এইরূপ পরিবেশের ভিতর শরৎচন্দ্রের শৈশব ও বাল্য অতি-

বাহিত হলো। যৌবনে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যে এই প্রবাহগুলি তীব্রতর হয়ে বাঙালীর জীবনকে ক্রমে গতিশীল করে তুলছে। রবীন্দ্রনাথের নব নব সৃষ্টি, বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের আহ্বান, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙালীকে প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন শরৎচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরক্ষেত্র স্পর্শ করে আলোড়ন জাগিয়েছে ; শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদের ভিতর স্বদেশী যুগের বীরপন্থী ক্ষাত্রতেজের প্রকাশ তাই অতি সুস্পষ্ট। তাঁর লেখনীমুখে স্বদেশী যুগের এই বীরবাণী অনবদ্যভাবে রূপ লাভ করেছে। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানসকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেনি ; তার কারণ তিনি ছিলেন বাংলার সংস্কৃতির ও রাজনৈতিক ধারার বাহক ও উপাসক। তাঁর লেখার ভিতর বাঙালীর শক্তিপন্থী মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ; গান্ধীবাদের বৈষ্ণব মনোভাব সেখানে তাই স্থান পায়নি। শরৎচন্দ্রের শিল্পের উপজীব্য বাংলার জীবনধারা থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং তা শিল্পীমনের অপূর্ব পরশ-পাথরের স্পর্শে সোনা হয়ে সাহিত্যরসে পরিণত হয়েছে। প্রথম যৌবনেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য সফলতা লাভ করেছেন্ তা সমালোচকমাত্রেই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁরা সকলেই দেশবিদেশের প্রভাব আত্মসাৎ করে নূতন রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। শরৎচন্দ্রও সেই শ্রেণীর মানুষ। সকল অমর লেখকেরই একটি না একটি বিশেষত্ব থাকে যার বলে তাঁরা পরবর্তী কালে রসপিপাসুদের প্রশংসার্হ হয়ে বিরাজ করেন। শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁর সর্ব মানবের প্রতি দরদ ও ভালবাসা। এই দরদ ও মানুষকে সর্বোচ্চ সত্য হিসাবে বিবেচনা শরৎ-সাহিত্যকে বাংলার সংকীর্ণ আসর থেকে বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। কারলাইল্ তাঁর 'Heroes and Hero-Worship' গ্রন্থে Hero as Poet প্রবন্ধে লিখেছেন : "It is a man's sincerity and depth of vision that makes him a poet." মানুষের প্রতি অন্তহীন দরদের জন্যই শরৎচন্দ্র পূর্বোক্ত আন্তরিকতা ও দৃষ্টির গভীরতা লাভ করেছিলেন। এই আন্তরিকতা ও দৃষ্টির গভীরতাই তাঁকে দিয়েছে মানবচরিত্রবিশ্লেষণে অসামান্য ক্ষমতা।

পল্লীসমাজের নিজস্ব মূল্য

পরিমল গোস্বামী

পল্লীসমাজকে শরৎচন্দ্র সত্যই দেখেছিলেন। তাঁর দেখা পল্লীসমাজের প্রতেকটি অংশের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তিনিই একথা স্বীকার করবেন যে তাঁর পল্লীসমাজকাহিনীর লোকেরা তাদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে।

পল্লীর মানুষকে তিনি নানাভাবে দেখেছেন, নিজেকেও পল্লীসমাজের পটভূমিতে দেখেছেন, কিন্তু এই কাহিনীতে তিনি একান্তভাবে পল্লীসমাজকেই দেখবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের ট্রাজেডিতে তিনি বিচলিত হয়েছেন বারবার, কিন্তু সমাজের ট্রাজেডিতে বিচলিত হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত তাঁর আর কোনো বইতে নেই। এর চরিত্রগুলি তাই শুধু কুঁয়াপুরের নয়, সকল পল্লীসমাজের পটভূমিতেই সত্য। বেণী ঘোষাল, মাসী, ভৈরব আচার্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, আকবর প্রভৃতি মানুষকে সকল গ্রামেই দেখা যাবে। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্র। এরা বিশেষ লোক হয়েও নির্বিশেষ। শুধু বিশ্বেশ্বরী একটি বিশেষ চরিত্র, স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু পল্লীপটভূমিতে তিনিও বাস্তব। শুধু রমা পল্লীসমাজে সম্পূর্ণ বাস্তব নয়। সে এত স্বতন্ত্র যে পল্লীসমাজে তাকে ঠিক যেন মানায় না। মানুষ হিসাবে হয়তো বা তার দেখা সর্বত্র পাওয়া যাবে, কিন্তু যেখানেই সে থাক সেখানেই তার মানসিক সত্তা একটু দুর্বোধ্য।

সাধারণতঃ মানুষের মনের দুই বিপরীত দিক পরস্পর খানিকটা মিশে থাকে, কিন্তু রমা যেন সম্পূর্ণ পৃথক দুই ব্যক্তি। মনোবিশ্লেষণে এর অনেকখানি ব্যাখ্যা মিলবে অবশ্যই, চরিত্র হিসাবেও জীবন্ত. কিন্তু তবু পৃথক পূর্বপরিচয়ের অভাবে অস্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র একে এনে বিনা কৈফিয়তে রমেশের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন, এটা ঠিক হয় নি। বেণী ঘোষালকে পল্লীসমাজের পটভূমিতে দেখলেই চেনা যায়! রমেশকে চেনা যেত না, কিন্তু তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, সে শিক্ষিত, বিদেশে থাকত। কিন্তু রমার পরিচয় কী? পল্লীসমাজের পটে এই রমাকে চেনা যায় না। কিন্তু অন্যত্রও কি তাকে চেনা যেত?

পল্লীসমাজের লোকেরা তার নিন্দা করছে মনুষ্যত্বের বিচারে নয়, সামাজিক বিচারে। শহরের সমাজে থাকলেও তার নিন্দা হত, কিন্তু তা শহুরে সমাজের বিচারে অবশ্যই নয়। নিন্দা হত তার দুর্বোধ্য ব্যবহারে।

হ্যামলেট যখন দুর্বোধ্য হয়েছে তখন তাকে পাগল বলে চিনিয়ে দেবার লোক ছিল, যদিও বুদ্ধিমানের মতে there was method in his madness। কিং লিয়ারের 'পাগলা'কে শেক্সপীয়ারই Fool নামে পরিচিত করিয়েছেন, টাচ্‌স্টোনকে ক্লাউন রূপে পরিচিত করিয়েছেন, তবে তারা তাদের পটভূমিতে সত্য হয়েছে। শরৎচন্দ্র রমার যে পরিচয় দিয়েছেন তা সাধারণত মেয়ের পরিচয়, সেইজন্যই রমা পল্লীসমাজে অবাস্তব। তার চরিত্র সম্পর্কে একটুখানি পূর্ব পরিচয় দিলেই সে সত্য হত। তার দ্বিমুখী ব্যবহারের যেটুকু সমর্থন আছে তা অত্যন্ত দুর্বল। শরৎচন্দ্রের নিজের মনেও রমা চরিত্র খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র যা দেখাতে চেয়েছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি এখানে এক বা একাধিক ব্যক্তিচরিত্রকে দেখাতে চান নি, তিনি সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন, সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন, এবং তাতে তিনি আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন। সমস্ত সমাজটিকে যখন দেখি, তখন রমাকে আমরা অগ্রাহ্য করি।

রমেশ এই সমাজে কেন বেমানান হল, কেন সে এ সমাজকে কিছু দিতে পারল না, তার আভাস শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, এবং চিন্তাশীলের মতোই দিয়েছেন। এ সমাজের উন্নতি করতে হলে কয়েকটা নির্দিষ্ট ধাপ পার হতে হবে, বাইরে থেকে এসে, সমাজের একজন না হয়ে কিছুই করা যাবে না।

বাংলার পল্লীসমাজের এমন সমগ্র রূপ আর কোথাও দেখিনি। পল্লীসমাজের এই রূপ শরৎচন্দ্রের মনে জ্বালা ধরিয়েছে, এ সমাজ ভাঙতে হবে এই তাঁর পণ, তাই তিনি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে, স্বরূপ চিত্রিত করেছেন, কোথায়ও হিংসা প্রকাশ করেন নি, উত্তেজনা প্রকাশ করেন নি। পল্লীসমাজকাহিনীর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে শিল্পীর একটি বড় কর্তব্যই পালন করেছেন। এর প্রয়োজন ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ শুকিয়ে শুকিয়ে মরলে তার ফটোচিত্র প্রকাশ করার সার্থকতা আছে। তাতে লোকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সহজে বুঝতে পারে। পল্লীসমাজও ঘুনধরা সমাজের ফোটোচিত্র।

কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করতে হবে, পল্লীসমাজ মহৎ উপন্যাস নয়। মহৎ উপন্যাসের লেখকের দৃষ্টি আরও ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয়। সংস্কারক হিসাবে রমেশের যে রূপটি তিনি পেতে চেয়েছেন—অর্থাৎ পল্লীর একজন রূপে, ঠিক সেই রূপেই ভবিষ্যতে রমেশ যদি ঐ সমাজে এসে মেশে তাহলে পল্লীসমাজই তাকে দীক্ষা দিয়ে ছোটলোক বানিয়ে ছাড়বে। দেখা যাবে রমেশ তাদের সঙ্গে

যথারীতি মামলা মোকদ্দমা চালাচ্ছে। ব্যক্তি গান্ধী যা পারেননি ব্যক্তি রমেশও তা পারবে না। তাই গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন এই রূপান্তর একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই সম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে একটা স্কুল গড়া যায়, একটি হাসপাতাল গড়া যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র বদলাবে কিসে ? তা ভিন্ন শত শত পল্লীর জন্যে একটি করে রমেশকে পাঠাবে কে ? পল্লী তো একমাত্র কুঁয়াপুকুর নয়। সুতরাং ব্যাধির মূলে পৌঁছানো দরকার। সমস্ত গান্ধীবাদ সেই মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা মাত্র। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি অব্যবহিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তা ভিন্ন পল্লীসমাজই তো একমাত্র সমাজ নয়। শহুরে সমাজ যে তার চেয়েও বিকৃত। কোন্ রমেশ এখানে মাথা তুলবে ? একটাকে বাদ দিয়ে আর-একটার কিছুই করা যায় না। সেইজন্যেই 'পল্লীসমাজ' অ্যাকাডেমি-পুরস্কারপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর একখানির ফোটোচিত্র মাত্র।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পল্লীসমাজের নিজস্ব মূল্যের জোরে তার অস্তিত্ব বাংলা-সাহিত্যে আশ্চর্যরূপে সার্থক।

শরৎচন্দ্র ও সমাজ-ক্রান্তি

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

রাজনীতির নানা পথ, নানা মত। রাজনীতি আজ যেটিকে পরম সত্য বলে শিরোভূষণ করে, কাল সেটিকে চরম মিথ্যা বলে পদদলিতও করতে পারে। সমসাময়িক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে রাজনীতি তার রূপ বদলায়, রঙ বদলায়। কিন্তু শিল্পনীতির প্রকাশ বিচিত্র হলেও অন্তরত তার সমস্ত প্রকাশই এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্বের অভিমুখী। সেই তত্ত্বটি কী? না, সে তত্ত্ব হচ্ছে জীবন-বেদনা ও সমাজচেতনার আনন্দ, যা সুন্দররূপে প্রকাশ পায় বলে সত্য ও কল্যাণময়—এবং সেই কারণেই তা কোন কালেই নিষ্ক্রিয় নয়, মানস পরিবর্তনের মহান কর্মে কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে নিত্যকালের জন্যই তা নিয়োজিত থেকে যায়।

যত পথেরই খবর পাওয়া যাক না কেন, শিল্পের একটি পথই আসল পথ—সেটি প্রেমের পথ। এই প্রেমের পথে শিল্পীর অগ্রগতি—গতি ছাড়া শিল্প হয় না, এবং শিল্পী মানেই হচ্ছে প্রগতিতত্ত্বের রসসাধক। কিন্তু এই মোটা কথাটা মনে না রাখলেই নয় যে, শিল্পের গতিতত্ত্বে যে পরিবর্তন সূচনা করে, তা আকস্মিকভাবে আমূল কোন ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা নয়, তা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জীবনবিচারে পরিবর্তন, যার গোড়ার কথা হচ্ছে শান্তির আশা, আর শেষের কথা হচ্ছে প্রেমের উপলব্ধি।

এ-হেন পরিবর্তনকে 'বিপ্লব' বলি না, বলি 'ক্রান্তি'। বিপ্লবে যদি নেতিভাব, ক্রান্তিতে তবে ইতিভাব। 'প্লু'-ধাতু থেকে বিপ্লব শব্দটির উৎপত্তি—এর অর্থ হচ্ছে প্লাবন। বি-উপসর্গ যোগে শব্দটির নেতিবাচকতা খুবই পরিস্ফুট। একেবারে প্লাবিত ক'রে, কি না ভাসিয়ে, ডুবিয়ে নিশ্চিহ্নের অতলে তলিয়ে দেওয়ার ভাব আছে বিপ্লবে। এ-শব্দের আভিধানিক অর্থ তাই বিদ্রোহ, উপদ্রব, দেশলুণ্ঠন, ভয়প্রদর্শন, ভয়প্রাপ্তি, হঠযুদ্ধ ইত্যাদি। বৈরূপ্যের এই ধ্বংসাত্মক লীলায় হিংসাভাবের উৎসাহ যে আছে—এটা না বললেও চলে। সময়ের প্রয়োজনে কোন কোন রাজনৈতিক দল এটা চাইতে পারে আবার প্রয়োজনবোধে শান্তি শান্তি করে ক্রান্তির আনন্দ গাইতেও পারে। ক্রান্তি কী? 'ক্রম্'-ধাতু থেকে ক্রান্তি। এর অর্থ গতি, অগ্রগতি, পাদবিক্ষেপ। জ্যোতির্বিদরা ক্রান্তি বলেন সূর্যসুন্দরের গতিপথকে। সূর্য এক রাশি থেকে আর রাশিতে যান, মাসের পর মাস হয় গত, আসে সংক্রান্তি, সম্যক ক্রান্তিপ্রভাবে সমাগত হয় নূতন মাস।

এইভাবে সূর্যের গতিপ্রভাবে প্রকৃতিতে জাগে নিত্য নূতন ঋতুলীলার আনন্দ— জাগে তপস্বী গ্রীষ্ম, কাঁদে বিরহিনী বর্ষা, মাতে মিলনোৎসুকা শরৎলক্ষ্মী, আসে প্রোষিতভর্তৃকা শীত-যৌবনা, হাসে প্রাণচঞ্চল গীত-বসন্ত। ক্রান্তি তাই এক থেকে আরে যাওয়া, কিন্তু ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে যাওয়া। হঠাৎ বিদ্রোহে, অস্থিবিবাদের ঝন্‌ঝনায় রাতারাতি মাতামাতি করে যাওয়া নয়। এক অবস্থা থেকে পরিবর্তনের দ্বারা অন্যতর অবস্থাপ্রাপ্তির প্রাণপ্রকাশ হচ্ছে ক্রান্তি। এটি তাই ইতিবাচক অভিধা। বিপ্লবও গতি, ক্রান্তিও গতি। বিপ্লব যদি বর্জনাত্মক, ক্রান্তি তবে সর্জনাত্মক। বিপ্লব যদি বিনাশ, ক্রান্তি তবে বিকাশ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব তাই প্রগতিবাদ নয়, ক্রান্তিই প্রগতিবাদ। বিপ্লবের মূল ভরসা হচ্ছে জীবপ্রবৃত্তির আকস্মিক আন্দোলন, ক্রান্তির মূল কথা হচ্ছে হৃদয়-উন্মেষের দ্বারা অনাগত শিবপ্রকৃতির অভ্যর্থনা! যা ছিল, তাতে যাওয়া, তাকে জাগানো প্রগতি নয়; সাধনার দ্বারা যা হয়, তা-ই প্রগতি। এই প্রগতি ক্রান্তি।

জীবনশিল্পী মহান শরৎচন্দ্র বিপ্লববাদী ছিলেন না, ছিলেন ক্রান্তিবাদী। হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে তাঁর আস্থা ছিল না, তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের ক্রমোন্নতিতে, সমাজের ক্রমোন্নতিতে। হৃদয়ের কাছে যেমন জোর চলে না, সমাজের কাছেও তেমনি জোর চলে না। হৃদয়পরিবর্তনের দ্বারা সমাজমানসের পরিবর্তন যদি সম্ভব হয় তবেই সেটা খাঁটি কাজ হবে, জোর করে কিছু করতে গেলে বিপরীত ফলই ফলবে। এই জন্যে জীবনক্রান্তির সাধক যারা, সাধকের মতো-ই তিনি তাদের মন ও মুখ ও কাজ এক করতে বলেছেন; হৃদয়ের ভাষায় নিবেদন করেছেন হৃদয়ের কাছে:

"আমি কেবল এই নিবেদনই করব, আপনাদের বুঝার সঙ্গে যেন কার্যের ঐক্য থাকে। বুঝি, ছোঁয়া-ছুঁই আচার-বিচারের অর্থ নেই তবু মেনে চলি; বুঝি জাতিভেদ মহা অকল্যাণকর তবু আচরণে তাকে প্রকাশ করি নে; বুঝি ও বলি বিধবাবিবাহ উচিত, তবু বিলাতী কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচরণ। দেশের দুর্দশা ও দুর্গতির মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে এনেছে, এ হয়তো আমরা কল্পনাও করি না।"

জাতির এই চরিত্রদৈন্য ও কাপুরুষতার কত রসমোহন স্মরণীয় চিত্রই তিনি অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু কোথাও এক কলমের খোঁচায় সমাজে যা আজও হচ্ছে তা ছাড়া অন্য কিছু রচনা করে দেশ ও জাতির ওপর মাতব্বরি করেন নি। তিনি জানতেন, জোর জবরদস্তি করে সাময়িকভাবে একটা রাষ্ট্রের পরিবর্তন আনা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু জীবন ও সমাজের পরিবর্তন ভিতর থেকে হওয়া চাই। আইনের ফতোয়া জারি করে রাতারাতি মানুষগুলোকে এক

ছাঁচের গারদখানায় তালগোল পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, তাদের বহু-কালের পুঞ্জীভূত সংস্কার আইনের বুলিতে কিংবা বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে সমাজে যা ঘটছে বা ঘটেছে, তা তিনি সমর্থন করেন নি বটে, কিন্তু একফুঁয়ে তা উড়িয়ে দিয়ে কল্পনায় একটা মনোমত সমাজ গড়তে চান নি।…এ কথা কে অস্বীকার করবে যে সামাজিক আইনকানুনে ভুলচুক অন্যায় অসঙ্গতি খুবই আছে ; কিন্তু এটা কি ঠিক যে আমি বা আমরা দলবেঁধে একটা প্রতিবাদসভা করলেই কিংবা খুব একটা মস্তরকমের মিছিল নিয়ে বড় রাস্তায় বার হলেই সেই সমস্ত অন্যায় অসঙ্গতি কর্পূরের মতো উবে যাবে ? আসল কথা, জীবনপরিবর্তনের মূলে আকস্মিক বিপ্লব নয়, সংযত ক্রান্তিই কাজ করে নির্ভুল এবং নিশ্চিতভাবে। এইজন্যে যে সমাজে আছি, তার শত-সহস্র ভুলচুকের মাঝখান থেকেই জীবনোত্তরণের কর্মসাধনা করতে হয় জীবন-শিল্পীকে। শরৎচন্দ্র এই কথা বলেন।

"সামাজিক আইন-কানুনে ভুলচুক অন্যায়-অসঙ্গতি কি আছে না আছে সে না হয় পরে দেখা যাইবে—কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসনবিধি ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্যদাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি ভুলভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায় কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা-একা বা দুই-চারিজন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা হায় না।"

শরৎ-সাহিত্য পর্যালোচনাকালে শরৎচন্দ্রীয় সমাজবোধের এই বৈশিষ্ট্যটি আত্মস্থ হয়ে ভেবে দেখতে হয়। তা না হলে তাঁর সাহিত্যিক চরিত্র ও পরিবেশের মূল রহস্যটুকু অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে। আর তা যদি থেকে যায় তাহলেই তাঁকে সেকেলে নীতিবাগীশদের মত গাল দিতে হবে নীতিহীন 'ভালগার' বলে, কিংবা একেলে উগ্রপন্থী বিপ্লববাগীশদের মতো নাক সিঁটকাতে হবে গতিহীন 'রিয়্যাকশনারি' বলে। কিন্তু দুটোই যে সত্য কথা নয়, ক্রান্তিতত্ত্ব যারা বোঝে তারা জানে। ক্রান্তিদর্শী যাঁরা, ব্যক্তিগত বা দলগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা-টাকেই তাঁরা প্রবল করেন না, সমষ্টিগত ও বিশ্বগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকেই লক্ষ্য রেখে তাঁরা পথ চলেন। সামাজিক হিসাবে, সমাজের একজন হিসাবে শরৎচন্দ্রকে অপেক্ষাই করতে হয়েছে. কিন্তু ব্যক্তি শরৎচন্দ্র, এটা অনেকেই বোধ করি জানেন, সমাজে reform নয়, revolution-ই চাইতেন।

"আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরাণ জিনিষটার পোষাক বদলে নেওয়া

আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি —সংস্কার জিনিষটার মানে কি? ওটা ভালো কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিষ অনেকদিন চ'লে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করানো। যেমন গভর্ণমেণ্টের শাসন সংস্কার Reforms আর এক দল যারা Revolution চাইছে Revolution মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান Reforms অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয়—মেরামত করে জিনিষটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। সেটা বিকল হয়ে পড়েছে, যেটা neglect দ্বারা হয়ত আপনি ধ্বংস হয়ে যেত সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করানো উচিত নয়।"

কথা উঠতে পারে, এমন কথা যিনি বলেন, গল্প-উপন্যাস লেখার সময় কেন তিনি সমাজ মেনে মেনে চলেন? কেন নায়ক-নায়িকারা 'রেভোলিউশনারি' হলো না? হলো না এই জন্যে সমাজে আজও তাদের হওয়াটা কিছু বাকি আছে। হয় নি বলে সমাজহৃদয়ে সত্যসত্যই যদি প্রতিক্রিয়া ওঠে তবে বুঝতে হবে শরৎচন্দ্রের ক্রান্তিময় পরোক্ষ প্রচেষ্টা ফলবতীই হয়েছে। মানুষ মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে, ভালোবাসা দগ্ধীভূত হচ্ছে নীতির চোখ রাঙানির রক্ত আগুনে, কুৎসিতমনোবৃত্তিসম্পন্ন অমানুষের দল গাঁয়ের মোড়ল হয়ে করছে হাঁকডাক—এসব তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন, নিপুণভাবে এঁকেছেন; ইচ্ছা করলে ভিন্নভাবেও তিনি আঁকতে পারতেন—অবলীলাক্রমে আঁকতে পারতেন এমন চিত্র যাপাঠ করে উগ্র বিপ্লববাদী তরুণমনও খুশিতে ঝলমল করে উঠতো। এমনটা আঁকা কি খুব-ই কঠিন, যে পার্বতী তার বুড়ো স্বামীর দু-গালে দুটি চড় বসিয়ে ধাঁ করে চলে এল দেবদাসের বুকে, গুনে-গুনে তিন এগারম্ তেত্রিশটি চুমো দিয়ে বললো, সতীত্বের চেয়ে বড় প্রেম, দেবদা, চলো চলে যাই বিবাহের চেয়ে বড় কোন সুন্দরের ঠিকানায়? কিংবা এটা আঁকাও কি শক্ত যে, গফুর লাঙ্গলের ফলাটা নিল কাঁধে, মহেশকে না মেরে জমিদারের মাথায় লাফ কেটে বললো হুংকার হেনে: জোত-জমি, ধানচাষ, খড়-বিচুলি এ সবে আমার অধিকার। তুমি এগুলো কাড়বার কে?

আর্টের বিচার এটা কেমনতর হলো সেকথা থাক। কিন্তু সাম্প্রতিক চাহিদা অনুসারে কথাটা বোধকরি বেশ মনোমতই হয়েছে। এক আঁচড়েই এটা করা কিন্তু সম্ভব। তবে বাস্তববাদের দোহাই যারা পাড়ি, তারা এটাতে কী বলতাম। সমাজে আজও যা সম্ভব হয়নি তা আঁকতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশেষ কোন বিপ্লববাদিতাকে তুষ্ট হয়তো করা হতো, মনের মতো একটা কার্যকরী

সমাজের খণ্ডচিত্রও হয়তো প্রদর্শিত ও প্রচারিতও হতো, কিন্তু বর্তমান বাস্তব সমাজের যথার্থ প্রতিকৃতি তাতে ফুটতো না, অপরিচয়ের অন্ধকারেই থেকে যেতো। এবং অপরিচয়ের অন্ধকারে যা থাকে, কে তার সন্ধান রাখে ? সুতরাং অধঃপতিত যে বাস্তবসমাজকে পরিবর্তনের দ্বারা অন্যতর মানস অবস্থায় আমরা নিয়ে যেতে চাইছি, তা নিয়ে যাওয়া সম্ভবই হতো না। ব্যাপারটা যে কত ভয়াবহভাবে জাতীয়তাবিরোধী হতো, সহজেই তা আজ অনুমান করা যায়। বিপ্লবধর্মীরা রাজনৈতিক কারণে স্বাজাত্যবোধবিহীন আন্তর্জাতিকতা-বাদী ; কিন্তু ক্রান্তিধর্মীরা সামাজিক কারণে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হয়েও স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন। শরৎচন্দ্র ক্রান্তিধর্মী। ব্যক্তি হিসাবে বিশ্ববিপ্লববোধে উদ্বুদ্ধ হলেও স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন তিনি সামাজিক। সমাজ-ক্রান্তিতে তাঁর নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠাই তাঁর সাহিত্য-শিল্পের প্রাণবস্তু। তাঁর সাহিত্যপাঠে বেদনাময় যে জীবনচেতনার আবেগ পাঠক অনুভব করে তার দ্বারা—বললে কি অত্যুক্তি করা হবে, যে সমাজহৃদয়ের কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ? নারীর জন্যে যে বেদনাবোধ অথবা জমিহীন ভাগচাষীদের জন্যে যে-সমত্ববোধ আজ আমরা অনুভব করছি, সে অনুভব সেকালের সমাজহৃদয়ে কি ছিল ? সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করার ছলনা কিংবা ব্রহ্মণ্য ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার অজুহাতে গতানুগতিক মৃত প্রথা ও বিধানগুলোকে আঁকড়ে থাকার কি উদ্ধত মাতব্বরিই না সেকালের সমাজ প্রকাশ করেছে। আজকের সমাজে এটা অবশ্য আর নেই। হতে পারে এটা আমাদের ব্যক্তি-অনুভব। কিন্তু ব্যক্তি-অনুভবই তো বিস্তৃত সমাজ-অনুভবে, সমাজ-অনুভব বিস্তৃত হতে থাকে বিশ্ব-অনুভবের সামগ্রিকতায়। বিস্তৃত-হওয়ার এই দীর্ঘ চিন্তাপথ হঠকারিতার দ্বারা পার হওয়া যায় না। চিন্তা ও সংকল্প প্রথমে ব্যক্তিতে, পরে সমাজে, তারো পরে বিশ্বে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কাজটা কঠিন, কিন্তু সঙ্গত কেননা স্বাভাবিক। কাজটার গতি তাৎপর্য অনুধাবন করলেই বোঝা সহজ হবে, জীবনে ও সমাজ-মানসে বিপ্লব নয়, ক্রান্তির মহিমাই গ্রাহ্য এবং বরণীয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলি সফল রেভোলিউশনের সংবাদ আমার পেয়েছি সেগুলির বাঙলা পরিভাষা এই ক্রান্তি। বলেছি বিপ্লব হচ্ছে নেতিবাচক একটা ভাব, ধ্বংসের পর সৃষ্টির স্পষ্ট ধারণা এই শব্দটির মধ্যে নেই। ক্রান্তি হচ্ছে সেই জাতের রেভোলিউশন, অন্তরে যার নবসৃষ্টির সুচারু পরিকল্পনা। বর্জন ও সর্জন—এই দুই কাজই পাশাপাশি চলে যার মধ্যে তার নাম ক্রান্তি। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কী সৃষ্টি করবো, কোন্ কল্যাণের আনন্দকে দেব রূপ, এটি যার জানা নেই পরিবর্তনের নামে ভয়াবহ মৃত্যুই সে ডেকে আনে। হঠাৎ

তাই কিছুই করার নেই এখানে। বাহ্যতঃ যেটি হঠাৎ হতে দেখেছি, সেটি যদি সফল হয়, জাতি ও বিশ্বের কল্যাণকে সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠা দেয়, তবে বুঝতে হবে, তথাকথিত সেই আকস্মিক পরিবর্তনটির মূলে বহুকাল ধরে ক্রান্তির প্রাণযৌবন ধীর ও স্থির নিষ্ঠায় কাজ ক'রে চলছিল। যে দেশ বা জাতি অন্তরে-বাহিরে প্রস্তুত নয়, বিপ্লবের অগ্নিদাহনে তাকে দগ্ধই করা হয়, তারপর সেই দগ্ধভূমির মহাশ্মশানে এসে দাঁড়ায় নেপোলিয়নকল্প নূতন লুই-এর দল। ফলে পরিবর্তনটায় রক্তারক্তিই সার হয়, মানুষ ও সমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। তুরস্কের মনীষী কামাল এটি জানতেন; তাই ধ্বংস ও সৃষ্টির দুই ক্রিয়ার প্রভাবেই দেশমানসকে প্রস্তুত করেছিলেন তিনি। এ প্রস্তুতি বহুদিন ধরে চলেছিল, কামালের চিন্তা, সংকল্প ও কর্মপন্থায় সমাজ ও দেশমানস টলেছিল, তা নইলে সাফল্য সুদূরপরাহত হতো তাঁর জীবনে। রুশদেশে যে বিপ্লব আমরা দেখেছি তার স্বরূপ একটু স্বতন্ত্র। দেশীয় রাজাকে হটিয়ে রাতারাতি একটা অঘটন সেখানে ঘটেছিল, কিন্তু কবে? ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত—দীর্ঘ এই বারো-তের বৎসর ক্রান্তির কঠোর তপস্যা চলছিল নির্জিত রুশবাসীর অন্তরে বাহিরে। লেনিনের তপস্যাকে যাঁরা জানেন, বিশিষ্ট একটা ঐতিহাসিক দিবসের সাফল্যের চেয়েও দেশমানসের প্রস্তুতিকেই তাঁরা মহত্তর ব'লে স্বীকার করেন। তবু এটা কি মিথ্যা এই রাশিয়াতেই ক্ষমতালোভী দুটো দল নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি মারামারি করেছে বহুদিন? ঈশ্বরেচ্ছায় রুশদেশ আজ প্রবল শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত, আজ সে শান্তির কথা উচ্চারণ করছে। শান্তির প্রস্তাব যদি অকৃত্রিম হয়, তবে প্রশ্ন এই, শান্তি কি রাতারাতি আসবে, না চিত্ত-প্রস্তুতির প্রবাহে আসবে? বাইরের থেকে রাশিয়াকে যতটা সুপ্রতিষ্ঠিত দেখছি, ভেতর থেকে সে যদি সত্যসত্যই ততটা সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে থাকে, তবে বুঝতে হবে, সে দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্দিন গত হয়েছে ফাইভ, টেন কি ফিফ্‌টিন্ ইয়ার্স প্ল্যানে—অর্থাৎ বর্জনের পর্জন্যনির্ঘোষে নয়, সৃষ্টির শান্তিময় ক্রান্তি-কল্যাণে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যাঁরা চান, এ কথাগুলি তাঁদের ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য ভারতে এখনও, এই চুয়ান্ন খ্রীষ্টাব্দে, স্বাধীনতা আসে নি বলে যারা ক্ষোভ করে, তারা বর্তমান অধিবেশেও নেতিবাদী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবে, ক্রান্তির কর্ম-সংজ্ঞায় কান দেবে না। শরৎসাহিত্য তাদের কাছে আজ নিন্দিতই হবে, শরতের সমাজদর্শন তাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত দর্শন ব'লে মৌখিকভাবেও স্বীকৃত হবে না।

রাতারাতি অপ্রত্যাশিত কিছু একটা করার আনন্দ মানবস্বভাবে যে নেই, তা শরৎচন্দ্র বলেন না। তাঁর কথা এই বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে

যদি কোথাও কার্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে বুঝতে হবে ক্রান্তির দ্বারা জনস্বভাব ও সমাজ-চেতনা সেখানে প্রস্তুত হয়ে আছে। অপ্রস্তুত চিত্তে বিপ্লব অকল্যাণই আনে, কেননা তার প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। জোরজবরদস্তির দ্বারা যা করা হয়, জোর-জবরদস্তির হিংসাত্মক অভিসন্ধিই একদা প্রতিশোধ নেয় জোরের ওপর জবরদস্তি বাড়িয়ে। ফলে; জোরের দ্বারা যতটুকু এগোনো হয়, প্রতি-জোরের প্রত্যাঘাতে তারও চেয়ে ঢের বেশী পেছুতে হয় পরিণামে।

'এই কথাটা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। কারণ, ইহা অনেকবার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসনদণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসনদণ্ড প্রবর্তিত করিলেও কোন ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।'

কুফল ফলে কখন? না, জাতিকে সত্যকার কল্যাণকর্মের নির্দেশ না দিয়েই এবং সে সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে তাকে প্রস্তুত না করেই যখন হঠযুদ্ধ জাগানো হয়, তখন ফলে। দলগত স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে জাতিকে হঠাৎ কোন ব্যাপারে বিদ্রোহী করে তোলা এক কথা, এবং জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রান্তিকারক আবহাওয়ার সৃষ্টি-সাধনা অন্য কথা। সাময়িক-ভাবে সাধারণ একটা সমস্যার সুযোগে জাতিকে মারমুখী করে দলগত অভিসন্ধি পূরণের প্রচেষ্টার দ্বারা জনস্বভাবের বিদ্রোহবৃত্তির আগুনে ইন্ধন জোগানো হয় বটে কিন্তু এতে কুফল ফলে এই: সর্জনাত্মক কর্মপন্থায় জাতিকে সামনের দিকে দাঁড় করানো হয় না, পেছনদিকেই কেবল মুখ করতে বলা হয়। সময়ে সময়ে বর্জনটা যে দরকার হয় না তা শরৎচন্দ্র কখনও বলেন না, কিন্তু বর্জনের বিধি-ব্যাপারটা অনাগত সৃষ্টির জনক হওয়ার বীর্যসঞ্চয়ে অন্তরত যদি সংযত ও ধীর না হয়, তবে বর্জনটা নেতিবাদ ছাড়া আর কী? নিছক নেতিবাদটা হচ্ছে পেছন দিকে মুখ করে চোখ-কান বুজিয়ে উধাও গতি, জাতির ওপর এইটা যখন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, জাতি প্রথমটা তখন মনে করে ঠিক চলাটাই চলছি বুঝি; পরে দিন গেলে বোঝা যায়, অগ্র বলে, যেখানে এগিয়েছি সেটা পশ্চাৎ ছাড়া আর কিছুই না। তখন ফেরার যদি চেতনা হয়, নূতন করে লড়াই-এর দিন আসে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি হয়তো বিপ্লবতত্ত্বে বিশ্বাসী হতে পারি কিন্তু ইচ্ছা মাত্রই এই বিপ্লবতত্ত্বে সমগ্র দেশ ও জাতিকে বিশ্বাসী করে তুলতে পারি না। ধীরে ধীরে আমাকে কাজ করতে হয়, সমাজে যা ঘটছে তা মেনেও এমনভাবে চলতে হয় যাতে আমার চলার ছন্দে বেজে ওঠে ঈপ্সিত সমাজের প্রতিধ্বনি।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই চলার ছন্দই বেজেছে। তিনি সমাজে যেমনটি দেখেছেন তেমনটি এঁকেছেন—কিন্তু এমনভাবে এঁকেছেন যাতে বর্তমান সমাজের কার্য কলাপে আমাদের হৃদয়-বেদনায় কল্যাণকর ক্রান্তির প্রতিক্রিয়া ওঠে। এই কারণে যে হিসাবে তিনি realist সেই হিসাবে তিনি একজন idealist-ও বটেন।

"গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic। আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি করে যে এই দুটোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে—এবং অনেক নোঙরা জিনিষই ঘটে, তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি-দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে।"

শরৎ-সাহিত্য সুনীতি নয়, দুর্নীতিও নয়, আসলে দুয়ে মিলে হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারক একটি উদার রসচেতনা, যার সূর্যদৃষ্টিতে বর্তমান সমাজ তথা অনাগত সমাজের পূর্ণরূপ দেখা সম্ভব হয়। এ-কথা কি অসত্য যে, সমাজে কখনও কখনও এমন অনেক মহৎ দৃষ্টান্ত-ও চোখে পড়ে—যা দেখলে হঠাৎ মনে হবে, বর্তমান সমাজের যেন এটা নয়। যে সমাজের ধ্যান করেছি অনাগত সেই ধ্যান-সমাজের আকাশ বেয়ে অতর্কিতে নেমে এসেছে ধ্রুব-দৃষ্টান্তের এই মহা-জ্যোতিষ্ক! বলা বাহুল্য, এর আলোয় অন্ধকার সমাজের রূপ খোলে ভাল। বেণীর পাশে বিশ্বেশ্বরী, কি গোবিন্দর পাশে রমেশ থাকায় ছবির চটকটা বেড়েই যায়। একবগ্‌গা realism এ যে কাজটা হয়—বাস্তবের বুকে একফোঁটা idealism-এর স্পর্শপাত ঘটলে সেই কাজটা স্পষ্টতর সৌন্দর্যে অধিকতর সত্যরূপে প্রতিভাত হতে থাকে; অর্থাৎ সাহিত্য তখন মাত্র নৈতিবাদী থাকে না, ইতি-ধর্মের আনন্দকল্যাণে অনাগত জীবন প্রকাশের প্রবণতা জাগায়। এই প্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিচেতনা তথা সমাজচেতনার উদ্বোধন হয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের তত্ত্বকথা শুধু রসোদ্বেজনাই নয়, মানবিক মহিমার বিকাশনাও বটে।

"সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত।

এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।"

রসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই সমাজক্রান্তি শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।···একদিন আমরা তাঁকে নিন্দা করে বলেছিলাম, সমাজকে তিনি অকল্যাণের পথে ঠেলে দিচ্ছেন; আজ আবার তথাকথিত রাজনৈতিক প্রগতিবাদ শিখে তাঁকে বলছি, তিনি 'ডোমেস্‌টিক' ঘরকন্নার সস্তাকথা বলেই কিস্তি মাত করেছেন, যথার্থভাবে প্রগতিবাদী তিনি ছিলেন না: তাঁর চেতনায় ও রচনায় পুরাতন স্থবির সমাজকে পদে পদে মেনে-চলার ভাবটাই প্রবল। তাঁর নায়ক-নায়িকারা বিদ্রোহিতা জানে না। দুই-একজন, যেমন অভয়া, কি কমল—সমাজ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে বটে, প্রতিবাদও করে নানা বিষয়ে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের ওপর 'পোয়েটিক্ জাসটিস্' করা হয়নি।

এই জাতের আলাপ-আলোচনার সম্মুখে প্রশ্ন এই: এ-সব আলোচনা আগে কোথায় ছিল? এমন বিচার আগে তো করি নি, বরং তাকে গতিবাদী বলে ভয় করেছি, ক্ষোভ করেছি! এর মানে কি এই নয়, সমাজ-চেতনায় আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়েছি, হয়েছি ক্রান্তি-বলে, রাজসিক কোন আকস্মিক বক্তৃতা-উচ্ছ্বাসে নয়! শরৎচন্দ্রের সমাজবোধের এই ক্রান্তিধর্মটি বুঝতে না পারার ফলে সেদিন তাঁকে নিন্দা করেছি গতিবাদী বলে, আজও ভুল বুঝছি রক্ষণশীল ভেবে। ক্রান্তি যে-অর্থে গতি, সেই অর্থে তিনি পরম অগতিবাদী, এবং আজকালকার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক ও কবিবর্গের মধ্যে তিনি প্রতিভাবান পায়োনিয়ার।

পূর্বেই একস্থানে উল্লেখ করেছি, reform-এর চেয়ে revolutionকেই ব্যক্তিচিন্তায় তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। মেরামতি কাজ তাঁর ধাতে সয় না। কিন্তু তাঁর সয় না বলে কারুরই সইবে না—সমাজের সইবে না, এটা তো দম্ভের কথা, এটা হঠকারিতা। আসলে যাতে কাজ হয় সেটাই ভালো, যাতে অকাজ বাড়ে, সেটা যতই বড় অস্ত্র বা মন্ত্র হোক না, সময়ের অপেক্ষায় সেটা সরিয়ে রাখা সমীচীন। এইজন্যে সমাজ-চিন্তায় তিনি মেরামতির কথাও তুলেছেন, কথাটা মেনেছেন। তাঁর ধারণাটা এই, সমাজের আইন-কানুন যারা করেছে, হৃদয়-সাধনায় উন্নততর হয়ে তারাই নিজে থেকে করবে সংস্কার, তবেই কাজটা ঠিক হবে।

"সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তাহার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া, শাসনদণ্ড পরিচালন করেন যাঁহারা, সংস্কার করিবেন তাঁহারাই। অর্থাৎ, মনুপরাশরের বিধিনিষেধ মনুপরাশরের দিক

দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই। বাইবেল কোরান হাজার ভাল হইলেও কোন কাজেই আসিবে না। দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজ-যন্ত্র এতাবৎকাল পরিচালন করিয়া আসিয়া থাকেন, ইহার মেরামতি কার্য তাঁহাদিগকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্যই করিতে পারিবে না।"

গূঢ়ার্থ এই : গতানুগতিক ব্রাহ্মণদের যতদিন না হৃদয়পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে, ততদিন গোঁড়ামির কদর্য শিক্ষা কোন না কোন উপায়ে সমাজশরীরে জোঁকের মত লেগে থাকবে, কেউ সেটা সহজে সরাতে পারবে না। কথাটার মৌলিকতা এ-যুগে আর বোধ হয় উপলব্ধি করছি না—কেননা এ-যুগে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-সমস্যা তেমন আর নেই। কিন্তু ধনী-দরিদ্রের সমস্যা তুলে একথাটার তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। বলা যেতে পারে যে, এতকাল শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ধনতন্ত্রীদল সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করে এসেছে, আজ যদি তাদের হৃদয়ের তথা বিচার-বোধের পরিবর্তন না ঘটে, তবে তাদেরও সর্বনাশ, সমাজেরও সর্বদিক থেকে বিস্তর অকল্যাণ। কথাটা বোধ হয় বিপ্লববাদীদের মনঃপূত হলো না। না হবারই কথা। তাঁরা আসুরিক হিংসাপন্থায় বিশ্বাসী। জোর করে বেয়োনেটের খোঁচায় রাতারাতি তারা ধনী-বংশ ধ্বংস ক'রে কার্যোদ্ধার করতে চান। এটা যদি কোথাও কখনও হঠাৎ সম্ভব হয় তখন দেখা যাবে, হৃদয়ের পরিবর্তন ব্যতিরেকে এটা হলো ব'লে ধনী-পুঞ্জের তখন হাতবদল হবে মাত্র। আইনের মুখোস পরে তখন কূটনীতিক কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক নামে রাজা না থেকে কাজে রাজা হবে, একচ্ছত্র সম্রাটত্বের অসীম সুখসৌভাগ্য কৌশলে করবে ভোগ —আর আইনের চাপে অগণিত জনসাধারণ একছাঁচে গড়া হৃদয়হীন কলের জনতা মাত্র হয়ে রইবে। অতীতের ইতিহাসে এর নজির আছে। নেপোলিয়নের ফ্রান্স, ইয়ান-সি-কাই-এর চীন, গোয়েবলসের জার্মানি, বেরিয়ার রাশিয়া চিরটাকাল এ নজির তো বহন করবে। এইজন্যে আজ শেষবারের মতো বিপ্লবের রক্তচক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধনীদের অভিমানের গদি ত্যাগ করতে বলা ভালো। বলা ভালো, হয় মৃত্যুর পথ থেকে অমৃতের পথে চলো, নয় লোভ ও শোষণের পুরাতন পন্থা আঁকড়ে থাকো আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরো। এতে যদি ধনিকসংঘের হৃদয় উন্মুক্ত হয়, সুখের কথা। এমনতর হৃদয়-উন্মুক্তির কথা পূর্বেও যে উত্থাপিত হয়নি তা নয়, যুগে যুগে নানাভাবে নানা প্রয়োজনে হয়েছে, কিন্তু যুগোচিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় একবারও হয়নি ; আজ তাই মহাযুগের সন্ধিক্ষণে বণিকসম্প্রদায় যদি আপনকার বর্জিত মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে পুরাতন ধনতন্ত্রের তথাকথিত রক্ষাকবচটি ত্যাগ করেন,

যদি বোঝেন, রক্তচক্ষুর ঔদ্ধত্যের সম্মুখে একমাত্র স্বেচ্ছায় দান ও প্রেমই কার্যকরী তখন তাঁরা ভূমিহীনকে স্বেচ্ছায় ভূমি দান করে ফকির হয়েও পাবেন সম্রাটের সম্মান ; অর্থাৎ যিনি সম্মান পাবেন তাঁর হৃদয়ে জাগবে দানমহিমার প্রেমক্রান্তি ; যিনি সম্মান দেবেন তাঁর হৃদয়ে জাগবে সন্তোষ-মহিমার প্রেমক্রান্তি ; ফলে ধনী ধন হারিয়েও শান্তি পাবে, ভূমিহীন অসন্তোষ হারিয়ে ভূমি পাবে, শান্ত হবে। প্রকৃত শান্তির এই তো পথ। এই শান্তির মূলকথা প্রেমচেতনা। হিংসা, দ্বেষ বা বোমা-বিস্ফোরণের বাহাদুরিতে এ শান্তি কখনও আসতে পারে না। মহাত্মা গান্ধীর চরিত-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে মনীষী শরৎচন্দ্র এই সত্যটি বেশ সুষ্ঠুভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

"লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে, ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না, তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই ধর্মযুদ্ধে 'তিনি' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা বন্দুক-বারুদ, কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে, এই পরম সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসাব্রতকে মাত্র ক্ষণেকের উপায় নয়, চিরজীবনের একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য।"—শরৎচন্দ্র স্বীকার করেছেন। সুখের বিষয় এই, শরৎচন্দ্রের নিজের কাছে এটা দুঃসাধ্য নয়, সুসাধ্য-ই ছিল। জীবনশিল্পীর কাছে এটা দুঃসাধ্য থাকার কথাও নয়। শিল্পী তো পার্টির নয়, কোন দেশ-এর কাছে সে তো দাসখত লেখায় না। অনাবিল আনন্দদৃষ্টিতে সে জগৎ দর্শন করে, জগৎকে সে ব্যাখ্যা করে প্রেমচেতনার যুক্তিতে। এই প্রেমচেতনা অপেক্ষা করতে জানে, জোর-জবরদস্তি ক'রে রাতারাতি বাজিমাত করতে জানে না। বলতে কি হবে, শরৎচন্দ্র কেন সমাজকে সমর্থন না করেও স্বীকার করেছেন, উপদেশ দিতে না চেয়েও কোন্ গুণে আমাদের শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে পেরেছেন, গতানুগতিকের সঙ্গে যথার্থ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কেন বিদ্রোহিতা করেন নি, প্রেমমিলনের সমস্ত মহিমা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেও কেন বিচ্ছেদের ব্যবধান করেছেন রচনা ?

আমি, আপনি, এ-ও-সে সমাজকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাই এক কলমের খোঁচায় তা করা যদি সম্ভব হতো, তবে সে কাজে আপত্তি ছিল না, কিন্তু শরৎচন্দ্র জীবনকে এবং জীবনের স্বরূপকে ভাবালুতার চোখে কখনও দেখেন নি। এবং এই কারণেই, যা হয়, যা রয়-সয় তাই অঙ্কন করেছেন এবং সেই অঙ্কনের সহায়তায় অনাগত যুগের আশা ও সৌন্দর্য রচনা করেছেন। ক্রান্তিকারক আবহাওয়া সৃষ্টিটাই সাহিত্যিকের কার্য—এ কার্যে তিনি পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন, এইজন্যে খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আজ যদি বর্তমানের কিছু বিরোধিতাও থাকে, তবে সেটাকে বড় করে দেখা সাহিত্যবেত্তা ও সমাজ-বেত্তার পক্ষে সঙ্গত হবে না।

সমাজ চলছে, সমাজ চলবে। এই চলাটাই নিয়ম। বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজ কত পথ কত মত বেয়ে বেগে এসেছে বেরিয়ে। মানুষের চঞ্চল মন বার বার তাকে বার করেছে।

"মানবের মনে গতি বিচিত্র। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ-দুঃখের ধারণা বহুপ্রকার। কালের পরিবর্তন ও উন্নতি-অবনতির তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অনম্য অপরিবর্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর ভরসা দিয়া নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে ত' তাহাকে মরিতেই হইবে। এই নির্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু আমাদের এই সমাজ, মুখে সে যা বলুক, কিন্তু কাজে সে সত্যই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিষটাকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে সে সমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ত বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং সে যখন বাঁচিয়া আছে তখন যে কোন উপায়ে, যে কোন কল-কৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ!"

"সর্বত্রই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ যে উপায়ে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—তাহা প্রকাশ্যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া নহে। কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নব-রচিত শ্লোক বেনামীতে এবং প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই তবে ছুটিয়া চলে, না হইলে খোঁড়াইতে থাকে। অতএব নিজের জোরে নূতন শ্লোক তৈরী করা প্রকৃষ্ট উপায় নহে। প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা।"

শরৎচন্দ্র তাই নূতন সমাজ রচনা করার দম্ভ প্রকাশ করেন নি, ব্যাখ্যা দ্বারা সমাজকে ক্রান্তিপথে পরিচালিত করেছেন। এই পরিচালনার পথে যাঁরা সাহায্য করবেন, তাঁদের হঠকারী হলে চলে না, ক্রান্তিদর্শী হতে হয়। মানস-পরিবর্তনের আনন্দসাধনায় তৎপর হতে হয়। তাঁদের, শুধু তাঁদেরই উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্রের আহ্বান এই :

"মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার ক'রো না ; সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ—যদি পরম দুঃখের পথ-ও হয় তা হলেও সে দুঃখ বরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ ক'রো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে চেয়ে দেশের লোকে যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে।"

রাজনীতি সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য কি না রাজনীতিবিদরাই বিচার করবেন, কিন্তু শিল্প ও সমাজনীতি সম্পর্কে এটা অবশ্যই প্রযোজ্য। এটা যদি মানেন তবে বুঝবো শরৎচন্দ্রের চেয়ে আপনি বেশী বুদ্ধিমান। অতএব তর্ক করবো না।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিমূল্য

সুশীল জানা

কথাটা উঠেছিল 'বিন্দুর ছেলে' প্রসঙ্গে। একজন খ্যাতনামা প্রবীণ কবি-সমালোচক একটু হেসে বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের কৌশল তো! ও হলো করুণকে অতি-করুণ, আর ঘৃণ্যকে অতি-ঘৃণ্য করে দেখানো।'

অর্থাৎ তাতেই কিনা বাংলার বৃহত্তম পাঠকসংখ্যা আজও পর্যন্ত হয় কেঁদে ভাসিয়ে নয় ফুঁসে ওঠে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? এ কি শুধু একজন ওস্তাদ কথাশিল্পীর পাঠক-ভোলানো কৌশল মাত্র—না, তারও গভীরে কাহিনী ও কারুকর্মের অন্তরালে আছে অতি বড় সত্য কোন একটা প্রাণস্পন্দন যা আজ পর্যন্ত বাঙলার পাঠক সাধারণকে গভীরভাবে বিচলিত করে?

বিচলিত যে করে—এ সম্পর্কে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সেটা কী? সে কি তাঁর উপন্যাসের অঙ্গসৌষ্ঠব বা রূপ—না উপন্যাসের চরিত্রগত গুণ? এখানে অঙ্গসৌষ্ঠব বা রূপ বলতে বোঝাতে চাচ্ছি তাঁর কাহিনীর গাথুনি, বলার ভঙ্গি ও ভাষা এবং চরিত্রগত গুণ বলতে বোঝাতে চাচ্ছি তাঁর বক্তব্য। সমালোচনার ক্ষেত্রে এমনি ভাবে একটু খুঁটিয়ে ভাগ করে নিতে হচ্ছে এই জন্য যে, তাঁর উপন্যাসের ভাব বা ধারাটা ঠিক কোথায় সেইটে বোঝার জন্য। নইলে এই তর্ক এইখানেই এই বলে খতম করে দেওয়া যেতে পারে যে, দেহ ও প্রাণের এই জাতীয় ভাগবাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে দেহহীন প্রাণের যে তত্ত্ব তা অধ্যাত্ম দর্শনের বিচার্য বিষয় এবং প্রাণহীন দেহের যে কথা তা কোন হাসপাতালের টেবিলে মূল্যবান হলেও সাহিত্যের মূল্যনির্ধারণে তার স্থান নেই। ঐতিহ্যের ধারা বহন করে এনেছেন যেসব সাহিত্যগুরু তাঁদের উজ্জ্বল সৃষ্টিচিহ্নগুলি থেকে একথাটা সাহিত্যপাঠকমাত্রের কাছেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে যে, সুষ্ঠু দেহ এবং জীবন্ত প্রাণ নিয়েই একটি সৃষ্টি সাহিত্যকীর্তি বলে গণ্য হয়, এবং তার বক্তব্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা অনুসারে হয়তো বা অবিস্মরণীয় হয় মহাকালের দরবারে। সেই সব সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এক-একটি যুগ, যুগমানস, কাল ও সভ্যতার তরঙ্গ। যে আধুনিক অর্থে উপন্যাসকে নবরূপের মহাকাব্য বলা হয়—বিশেষ কোন স্থান কাল ও পাত্র যেখানে সুস্পষ্টভাবে তাদের চিহ্নিত করে রেখেছে, উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি হলো সেই জাতের। অবিশ্যি এরই পাশাপাশি চরম দেহবাদী বা

প্রাণবাদী স্রষ্টা এবং সমালোচকও জন্মেছেন অগুনতি। তাঁদের ভ্রান্ত মত, পথ সাহিত্যের ধারাকে কখনও জনপ্রিয়তার নামে সস্তা চটকে খেলো করেছে, কখনও বা নীরস তত্ত্বদর্শনের গোলকধাধায় ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। এ হলো বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রের একটা দিক—বিশুদ্ধ রসবাদী সনাতনপন্থীদের দিক।

এর চাল-দুরন্ত দেহবাদীদের গুণকীর্তন করতে গিয়ে কিছুদিন আগে অগ্রজ এক সমালোচক একটি প্রাচীন উদ্ধৃতিতেই সবটুকু বলে ফেলেছেন এই বলে যে—'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙা পিতল'। আর প্রাণবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল গোলকধাঁধার আদর্শ-পঙ্কে পড়ে প্রায় প্রাণত্যাগ করেছেন। অন্য আর-এক দিকে তীব্র ও তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে সাহিত্যে বাস্তববাদ। 'বাস্তব' —এর ক্ষেত্র হলেও সেখানেও সেই পুরানো দেহপ্রাণের দ্বন্দ্ব কত তো নয়ই বরং জটিল আকার ধারণ করেছে। এখানে দেহবাদীদের চরম মুন্সী মরা খড়ে চোখ বুজে নিরংকুশ চিন্তার দৈন্যে ও পুনরাবৃত্তিতে কেবলি জাবর কাটছে এবং প্রাণবাদ বা 'কনটেন্টের' নামে বাস্তবতার ছদ্মবেশে গ্রাম-নগরের গরিব মানুষদের হৃতসর্বস্ব গরিবতম জীবনবোধের ওপর খেলো নোংরামি নিয়ে হচ্ছে রসসৃষ্টি। গভীর মহৎ জীবনের জন্য আবেগ কোথায়? যে শ্রেণী হৃতসর্বস্বদের স্ত্রীকন্যা হাতে পেয়েও সন্তুষ্ট নয়, সামান্য বেশার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, পরস্পরের স্ত্রীদের বিপথে টানতেও যাদের পরম আনন্দ, তাদেরই সৃষ্ট এক পাপকলুষ আবেষ্টনীকে বাস্তবতার নামে খাড়া করে তার মধ্যে অসহ্য রোমান্সেরও সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংগ্রাম নয়, বাঁচার তাগিদ, সুস্থ জীবনাবেগ নয়, শুদ্ধ বাস্তবতার জন্য যৌনতাকেন্দ্রিক খেলো বাস্তবতা—'শিল্পের জন্যেই শিল্প' এই বস্তাপচা বুলি থেকে ওটা আর কত দূরে? আর কালজয়ী সাহিত্যগুরুদের সৃষ্টিনির্দেশই বা কত দূরে? তথাকথিত ওই খেলো বাস্তবতার মধ্যে সাম্প্রতিক সাহিত্যে সমাজ-সত্য অনাগত মহৎ জীবনের আবেগ রূপে প্রতিফলিত যে একেবারে হয়নি—তা নয়, হয়েছে কিন্তু জীবন সেখানে একটি যুগের লক্ষণাক্রান্ত চরিত্ররূপে প্রতিভাত হয় নি। তাই সে মহাসত্য রাষ্ট্রনীতিক একটি তত্ত্ব বা তথ্য রূপেই থেকে গেছে, যার আবেদন কেবল জনকয়েক পরিণত বুদ্ধির খেলোয়াড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের এ অভাব বা অনুযোগের অবসান হবে সেইদিন যেদিন তথাকথিত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যপূর্ণ সহজ সরল একটি দেহ প্রাণ এবং নূতন জীবনাবেগে ও বৈচিত্র্যে লীলায়িত হয়ে উঠবে। সৃষ্টি হবে চরিত্রের।—এই চরিত্রের মানে ছুটকো-ছাটকা বাঁকাচোরা 'অভিনব' নামধারী 'টাইপ' সৃষ্টি নয়। লম্ফঝম্পের দ্বারা পবনতনয় যেভাবে সীমায়িত —তাতে তারা 'টাইপ' বটে, কিন্তু 'চরিত্র' নয়। 'চরিত্র'-সৃষ্টিতে কোন অভি-

নবত্বের স্থান নেই, বিস্ময়কর কিছু নেই—সে তথাকথিত সেই স্থান ও কালের সমাজসম্পর্ক থেকে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত অন্তরঙ্গ একজনের মতোই সামনে এসে দাঁড়ায়—তার মধ্যেই একটা বিশেষ স্থান ও কালের সমগ্র আশা, আবেগ ও কল্পনা বিধৃত হয়ে থাকে। এই চরিত্রের আবিষ্কারকই হলেন engineer of the soul, মানবাত্মার সংগঠক, স্রষ্টা। একদিকে মনুর শাসন আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদের শাসন। একদিকে সামন্তযুগের আদর্শ আর একদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা—আমাদের দেশের এই দো-আঁশলা সমাজব্যবস্থার মধ্যে বলা বাহুল্য যে অতীতের সাহিত্যে এই 'চরিত্র' এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের নাগালের বাইরে এক আদর্শলোক থেকে—চরম আদর্শবাদ রূপে। বঙ্কিমের আনন্দমঠে ভবানী পাঠকের কল্পনায় বা গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রের নিয়তিলাঞ্ছিত অনুশোচনায়। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় এবং শেষ বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের ছোট ছোট মানুষ, বাঙালী মধ্যবিত্তের ছোট ছোট জীবনে, ছোট ছোট আদর্শে চিরকালের সামাজিক মানব মহাবন্ধনের মেলায়। তারপর আর সেই চরিত্র কই? কোথায় স্থান ও কালের অন্যতর প্রতিনিধি যাদের মধ্যে একটি বিশেষ কালের আশা আনন্দ ও বেদনা প্রাণ পেয়েছে?

লিপি-কৌশল, কাহিনী-কৌশল নয়, এই চরিত্রসৃষ্টিই বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে শরৎচন্দ্রকে শুধু আত্মার আত্মীয় করে তুলেছিল একদিন, আজও তার শেষ নেই। সে চরিত্রগুলির মধ্যে মহামানবত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু ছোট বাঙালী পরিবারের মধ্যবিত্ত মানুষ আছে। বিরাট তারা কেউ নয় কিন্তু সম্রাট, বাঙালী পরিবারের ছোট উঠোনে সঞ্চরমাণ আজন্ম সামন্ত-শাসনে নিপীড়িত মেয়ে, বউ, মা। নগরসভ্যতার কেন্দ্রে উজ্জ্বল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিদীপ্ত তারকার আন্তর্জাতিক ভাববিলাস তাদের মধ্যে ছিল না বটে, ছিল এই মহাপৃথিবীর অত্যন্ত একান্তে বাঙলা নামক একটি দেশ—যেখানে ইংরাজ প্রভুরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে অতীতের গ্রামজীবনকে ভেঙে চুরমার করেছিল, সৃষ্টি করেছিল নিতান্ত অবজ্ঞাত মধ্যবিত্তের। চরিত্রগুলিতে ছিল সেই সময়ের দ্বন্দ্ব ও বেদনা। দ্বন্দ্ব ছিল গ্রাম ও নগরের, অতীতের ভালোর সঙ্গে ভাবীকালের ভালোর। তার সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিল সেই ছোট ছোট মানুষগুলি—একটা ফয়সালা করতে চেয়েছিল—পারে নি। অতি আনন্দেও তাই বেদনাঘন হয়ে ওঠে—'নিষ্কৃতি' যার চূড়ান্ত উদাহরণ, 'পল্লীসমাজ'—যা আজও হাজার হাজার পাঠক বার বার করে পড়ে। বিরাট পৃথিবী—অসংখ্য রাষ্ট্র, বিভিন্ন আন্ত-র্জাতিক চিন্তার টানাপোড়েন, তার মাঝখানে কোথায় আমরা রাখি 'পোড়া-কাঠ'কে, কোথায় বা রাখি 'ষোড়শী'কে? কোথায় রাখি 'অন্নদাদিদি'কে, কোথায়

বা রাখি 'জ্যাঠাইমা'কে ? কেবলি নারীচরিত্রের কথা এসে পড়েছে। হ্যাঁ—এসে পড়েছে এইজন্য যে পুরাতন গলিত সামন্তসমাজের প্রতি যে ঘৃণা আর বিক্ষোভ এবং মহৎ জীবনের প্রতি যে আবেগ, তা কোথাও যদি ভালো করে ফুটে ওঠে থাকে—তা এই নারীচরিত্রেই হয়েছে। চিরকালের সর্বহারার প্রতিরূপরা সেই-খানে কথা বলে উঠেছে তীব্র জ্বালায়। সামন্তসমাজের প্রবল শক্তি ধর্ম, এবং সাধারণভাবে ধর্ম নামক বস্তুটা এবং ধর্মধ্বজীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ বোধ করি 'গৃহদাহ' উপন্যাসের উপসংহারেই স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, রোমান্টিক সাহিত্য আত্মার যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের লক্ষণাক্রান্ত, মানবতার ধর্মে অভিসিঞ্চিত, এবং পুরাতন সমাজশৃঙ্খলের বন্ধনমোচনে উদ্‌গ্রীব—শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলি সেই ধারার। পিতৃশাসনের সমাজে নারীচরিত্র যেভাবে প্রাণ পেয়েছে পুরুষচরিত্রে তা হয়নি। পুরুষচরিত্রগুলি একমাত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেইখানে যেখানে সামন্তযুগের শয়তান তার দন্তনখর লুকিয়ে রেখেছে। যেমন রমেশ বা মহিমের চেয়ে বেশী—জীবানন্দ-গোলক চাটুজ্যেরা। নরনারীর এইসব চরিত্রসমাবেশে বাঙলার একটি কালের কথা বিবৃত হয়ে আছে। আগেই বলেছি, 'পোড়াকাঠ', 'অরক্ষণীয়া', 'ষোড়শী', 'সাবিত্রী' বা 'অন্নদাদিদি'দের জীবনে আন্তর্জাতিক মানবতার অতি বড় বড় তত্ত্ব বা তথ্য কিছুই নেই—যা আছে তা হল বাঙালী ছোট মধ্যবিত্ত ঘরের পারিবারিক জীবনের কথা—যার মধ্য দিয়ে মহৎ সমাজবন্ধনের জন্য সামন্তশাসনে নিপীড়িত বাঙালী মেয়ের সুস্থ একটি আবেগ বার বার প্রকাশ পেয়েছে। পুরানো হলেও গৃহ ও গৃহধর্মের সুস্থ কথাটিকে, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের কল্যাণময় মানবীয় আকৃতিটিকে তিনি এমনি সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবেই উপস্থিত করতে পেরেছিলেন যাতে সেকালের মধ্যবিত্ত সমাজ বিচলিত, আলোড়িত না হয়ে পারেনি। শান্ত গৃহপরিবেশের সেই হল শেষ চিত্র। অবশ্য সেকাল থেকেই বণিকযুগ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তা, বহুরকমের ফাটল ধরেছে আমাদের গৃহে ও গৃহকর্মে। চার্লস ডিকেন্সের Good old England-এর মতোই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিলোক আজ কেবল একটা দীর্ঘশ্বাসমাত্র এবং সাহিত্যে বাঙালী মধ্যবিত্তেরও সেই শেষ সার্থক ভূমিকা অভিনয়।

এই ভূমিকা সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন ওঠে—তা কতখানি বাস্তবপন্থী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শোনা যায় এ প্রশ্ন তুলেছিলেন 'ষোড়শী' সম্পর্কে এবং মেসের ঝি 'সাবিত্রী' সম্পর্কেও সাধারণ সমালোচনায় এ প্রশ্ন উঠেছে। এ ঠিক যে ন্যক্কারজনক কোন পঞ্চমকার সাধনচক্রে 'ষোড়শী'কে আমাদের দেখতে হয়নি,

তার জীবনের আসল সূত্রপাত হলো ধর্মশাসন ও নারীজীবনের প্রখর দ্বন্দ্ব থেকেই। তেমনি কলকাতার কুখ্যাত মেসের ঝির জীবন শুরু হয়েছে তার কলুষিত অতীত ও বহু-আকাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণ এক প্রেমের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত থেকে। এরই একপাশে সেই বিকৃত জীবনের খণ্ডচিত্র একটা দেওয়া আছে বটে—সেটা তার অবধারিত ভাগ্য হতে পারতো, সাবিত্রীর অভিমান সেই অতীত থেকে তার প্রেম- ও গৃহ-কামনার ভাবীকালে। নোংরামি ও ক্লিন্নতার স্থূল পরিবেশ রচনার চেয়ে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত সুস্থ ও সুন্দর মানবসম্পর্কের জন্যে যে আবেগ—তার প্রতি দৃষ্টি ছিল, সে সম্পর্কের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রতিও। অবিশ্যি পরবর্তীকালের সাহিত্যে বিদেশাগত ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদের ক্ষতলাঞ্ছিত একটি ধারা এসে তার ছায়াপাত ঘটিয়েছিল—যাতে বাস্তবতার নামে মানস বিকারের চূড়ান্ত কাণ্ড ঘটে যায়। চাপা পড়ে যায় মানবাত্মার সংগ্রামী বাস্তবতা—বড় ও স্পষ্ট হয়ে উঠলো খোলসটা এবং বিস্ময়কর সব স্রষ্টাদের বিকৃত মানস।

যুগপৎ ধনবাদী ও সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার ঘৃণিত ক্ষতলাঞ্ছিত চেহারাটাই অবধারিত সত্যরূপে প্রতিভাত হলো। বাস্তববাদিতার এ বিপদ এখনও কাটেনি, নূতন নূতন বিস্ময়কর স্রষ্টাদের গায়ে পুরানো সেই ক্ষতলাঞ্ছিত নামাবলী জড়ানো; অধিকন্তু, ক্ষয়িষ্ণু একটা সমাজের বস্তাপচা উপকরণ দিয়ে রং বা রোমান্সের সৃষ্টি করে চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত মানবসম্পর্ক ও গৃহধর্মে প্রচণ্ড আঘাত করা হচ্ছে। এদিক থেকে বাংলার ভেঙে-পড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছোট ছোট মানুষগুলির মস্ত বড় একটা আবেগ শরৎসাহিত্যে এসে থমকে আছে। পরবর্তীকালে এসেছে পরের পর অনেক ধারা, রসতত্ত্বের অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক স্রষ্টা, কিন্তু আসেনি বাঙালীর একটিও চরিত্র, আর তার নবতর পরিপ্রেক্ষিতে মহান জীবনের আবেগ। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্র আজও শেষ চরিত্রস্রষ্টা।

চন্দ্র অতন্দ্র নভে

হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র আজ নেই। বাংলা সাহিত্যকে অপরূপ সম্পদে সমৃদ্ধ করে বাঙালীর চিত্তে তাঁর চিরস্থায়ী আসন রেখে মরমী শিল্পী চিরদিনের জন্য প্রস্থান করলেন। সাহিত্যের অঙ্গনে এতদিন যে বিশেষ সুরটি বাজছিল আজ সে সুর চিরদিনের জন্য থামল। সমগ্র জাতির মর্মমূলে সেই মহাপ্রতিভার অকাল তিরোধান কতখানি আঘাত করেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে যে ক্ষতি সবচেয়ে বড়—বলতে গেলে অপূরণীয় বলে মনে হচ্ছে—তা হচ্ছে তাঁর সাহিত্যের জন্য নয়—মানুষটির জন্যও। সে মানুষটি বিলীয়মান খাঁটি বাঙালী মজলিশের প্রতীক ছিলেন। তাঁর জীবনের অতি নিকট সংস্পর্শে এসে কতদিন না আমার মনে হয়েছে—মানুষটি যেন একটি অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা, তারই উৎসমুখের ধারাজলে অবগাহন করে যে পুলকে যে রসানুভূতিতে চিত্ত ভরে উঠত এই আনন্দহীন জগতে বুঝি সে জীবনানন্দের তুলনা নেই। আর সেই জীবনানন্দের নিখুঁত ও পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলুম তাঁর গল্পে-মজলিশে। আজ সেই সব ছোটবড় গল্পের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই গল্পের কথক শরৎন্দ্রকে। তাঁর মুখ থেকে সেই সব গল্প যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছে বোধ করি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর অননুকরণীয় সরস কথনভঙ্গী।

তাঁর একটি গল্প মনে পড়ে। শরৎচন্দ্র তখন সবেমাত্র বর্মা থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। থাকেন বাজে শিবপুরে বাড়ি ভাড়া করে। সেখানকার এক বুড়ির সঙ্গে তাঁব পরিচয় হয়। পাড়ায় থাকে, কাজেই দেখাশুনো ও দু-চারটে কথাবার্তা হয় রোজই। একদিন তিনি দেখলেন সেই বুড়ি একটা মনি-অর্ডারের ফর্ম নিয়ে ভারী ব্যস্তভাবে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছে। শরৎ-চন্দ্র তাঁকে ডেকে এত ব্যস্ততার কারণ ও গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বুড়ি জানাল, সে কোন এক ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছে—বড় দরকার। শরৎচন্দ্র বললেন—শুনিই না বাছা কী দরকার তোমার। বুড়ি যেতে যেতেই বললে, এই মনিঅর্ডারের কুপনের ওপর একটা ছোট চিঠি এসেচে, তাই যাচ্ছি এই চিঠি পড়াতে সেই ভদ্রলোকের কাছে। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন : বুড়িটা ভাবত এ এক লুচিভাজা বামুন, কুপনের ওপর দু-ছত্তর বাঙলা চিঠি পড়ার বিদ্যেও এর নেই।

এই বাজে শিবপুরে থাকার সময়কার আর একটি গল্প তিনি বলেন। সেই সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর হঠাৎ তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মায় এবং তিনি বিস্তর টাকা খরচ করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভালো ভালো সব বই কিনে গভীরভাবে সেই বই অধ্যয়ন করতে শুরু করেন এই বিদ্যে আয়ত্ত করতে। অনেকদিন অধ্যয়ন করার পর তাঁর ইচ্ছা হলো—নিজে লোকের চিকিৎসা করে দেখবেন কতখানি কৃতকার্য হন। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেলো কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর—পেশেণ্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়িতে যারা আসে তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি তাঁদের কোন অসুখ করেছে কিনা। সবাই বলে না, কিছু হয়নি। গরহজম? মাথা-ব্যথা, চোঁয়া ঢেকুর? অম্বল? সবাই বলে—না, কোন অসুখই করে নি। বেজায় দমে গেলুম—কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে! যাই হোক্ অনেক চেষ্টা-চরিত্তিরের পর বাড়ির পেছনদিকের এক গয়লানীর অসুখ হতে আমার কাছে এল। খুব ভালো করে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু-একদিন পরে আবার এসে ওষুধ নিয়ে যেও বাছা—আর যদি কেউ তোমার জানাশুনো থাকে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এস—অমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেল আর তো আসে না। একদিন পেছনদিকের জানালাটি খুলে দেখি সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তাঁকে ডেকে বললুম, হাঁ বাছা তোমার সেই যে অসুখ করেছিল, আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে আর আসো না কেন? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি, আর দরকার নেই। যা বাবা, এতো পড়লুম, অমনি চিকিৎসা করব ওষুধ দেব—তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল তাকে চিকিৎসা করতে হলো না, এক ওষুধে সেরে গেলো!

শরৎচন্দ্র যখন 'অরক্ষণীয়া' গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদ ভারতবর্ষে দেন তখন তাঁর উপসংহার অন্যভাবে করেছিলেন। সেটি পড়ে তাঁর চিরশুভার্থী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাজেস্ট করেন—ঐভাবে শেষ না করে এইভাবে (বর্তমান গ্রন্থে যে উপসংহার আছে) শেষ করলে ভালো হয়। শরৎচন্দ্র তাই করেছিলেন। বই বেরুবার কিছুদিন পরেই মফঃস্বলের এক ক্লাবের কতকগুলি ভদ্রলোক চিঠি দিয়ে জানান যে তাঁদের ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তুমুল তর্ক এমন কি বাজি রাখতে হয়েছে উপসংহারের বক্তব্য নিয়ে। একদল বলছে জ্ঞানদার সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে শরৎবাবু এই উপসংহারই করেছেন, আর-একদল বলছে, না, কখনোই না। অতএব হরিদাসবাবু যেন শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করেন—জ্ঞানদাকে অতুল শ্মশান থেকে নিয়ে যাবার পর তাদের কী হলো এবং

তিনি কী বলেন তা যেন হরিদাসবাবু তাঁদের জানান। শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে ; বললেন, আপনার জন্যই তো এই বিপদ হলো—বেশ দিয়েছিলুম জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ; অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত, লেখক বাঁচত, প্রকাশকও বাঁচত। এখন এর কী জবাব দেব আমি তো ভেবে পাচ্ছি নে। এরকম চিঠি রোজ এলেই তো গেছি। বলে হাসতে হাসতে বললেন, তারা তো জানতে চেয়েছে জ্ঞানদা ও অতুলের শ্মশান থেকে যাবার পর কী হলো ? আচ্ছা লিখে দিন ; শরৎবাবু বললেন—তারপর তাহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই ; সুতরাং কী হইল তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

এইরকম কত গল্পই তিনি করতেন। কতদিন কতরাত্রি তাঁর চারপাশে বসে তাঁর অনুরাগী স্নেহভাজনরা কী অবিমিশ্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। প্রাণখোলা হাসি হাসবার কত সুযোগ পেয়েছেন তার বুঝি সীমা নেই। কিন্তু শুধু হাসির গল্পই তিনি বলেন নি—বলেছেন নিজের জীবনের অদ্ভুত সব গল্প। রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমরা তা শুনতুম, কত মানুষ কত ঘটনা ছায়াচিত্রের মতো ভেসে উঠত চোখের সামনে, অন্তর ভরে উঠত সহানুভূতিতে। সেদিন তাঁর সেইসব গল্পকে গল্পই মনে করতুম ; আজ মনে হয় তিনি নিছক গল্পের জন্যই গল্প বলতেন না, সেই গল্পের মধ্যে থাকত প্রচ্ছন্নভাবে একটি দরদী জীবন-রসিক। তাঁর সাহিত্যেও এই জীবনরসিকটিকে আমরা শিল্পীর ছদ্মবেশে কখনো দেখে থাকব। গঙ্গানদীর তরঙ্গের ওপর দিনান্তের পলাতক আলোর আভাসের মতো মাঝে মাঝে নির্বিকার শরৎচন্দ্রের মধ্যে সেই দরদী জীবন-রসিককে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কী কথা তাঁর সাহিত্যে তাঁর জীবনে বার বার নানা সুরে আমাদের বলতে চেয়েছেন ? কী মন্ত্র জীবনের তিনি শুনিয়েছেন ?

কী সে ? তাঁর সাহিত্য আর জীবন উপদ্রুত বঞ্চিত অপমানিত মানুষের কথাই আমাদের শুনিয়েছে। বলে গেছে : 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই'; বলে গেছে ঃ জীবনপ্রবাহের আবর্তে মানুষ অসহায়, ঘটনার দাস, নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ভুলভ্রান্তি সব ক্ষমা করে তাকে ভালবাস। জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম—প্রেম, সেবা, ক্ষমা, সব মানুষের মধ্যেই জীবন-দেবতার এই শ্রেষ্ঠ দানগুলি, ধর্মগুলি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মানুষের ভুলভ্রান্তিই বড় নয়, তার মধ্যেকার আসল রূপটাই বড়, তাকেই দেখা সত্য দেখা। মানুষ দেবতা নয়, সে মাটির পৃথিবীর মানুষ—দোষে আর গুণে। A man is a man for a' that.

শরৎসাহিত্যের মূল সুর দুঃখবাদের। তবু তাঁর সাহিত্যের সুকরুণ দুঃখ-বাদকে অতিক্রম করে তার বলিষ্ঠ আশাশীলতা এই ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর মানুষের কানে অভয়বাণী দিয়ে বলে, জীবনে গভীর নৈরাশ্য অকথিত বেদনা—স্বপ্নভঙ্গ আছে জানি, কিন্তু তাতে বিচলিত হয়ো না। জীবনের সব বিফলতা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখো। স্থূল বাস্তবতার শত আঘাতেও যেন স্বপ্নভঙ্গ না হয়, তাহলে একদিন 'কার জন্য বেঁচে থাকব?' এই প্রশ্নটির জবাব জীবন থেকেই পাবে।

শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর নামকরণের রহস্য

সুচরিতা রায়

"কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন"—এই সুপ্রচলিত প্রবাদবাক্যটির সঙ্গে অপরিচয় সাধারণতঃ কারুরই নেই। চেতন অচেতন বস্তু নির্বিশেষে 'নামকরণ' সেই বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করবার জন্য অত্যাবশ্যক; কারণ শুধু মাত্র আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যশালী হয়ে প্রত্যেক জীব ও জড় পদার্থ এই নাম গ্রহণের সাহায্যেই আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। কিন্তু জীবনের জটিল পরিবেশে 'নামকরণ' প্রসঙ্গেও বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। উপরি-উদ্ধৃত প্রবাদবাক্যটি অনুসরণ করে এ জাতীয় তথ্যসমৃদ্ধ উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ঘন-কৃষ্ণা মেয়েটির নাম বাবা-মা আদর করে রেখেছেন 'জ্যোৎস্নাময়ী'। হয়তো 'জ্যোৎস্নাময়ী' অন্তরের আলোতে তার বাইরের কালো আবরণ তুচ্ছ হয়েই যাবে। সুতরাং 'নামকরণের' উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একে অন্যের পারস্পরিক সান্নিধ্যে আসতে পারে বলে 'নামের' অমর্যাদা খুব প্রধান হয়ে ওঠে না—কারণ এখানে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিসত্তাটিকে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে নামকরণের সজীবতা এবং সার্থকতা যদি স্ব স্ব নামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিস্ফুট না হয়, তবে সাহিত্যরস হয় ক্ষুণ্ন। গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত পরোক্ষ জগতের পাত্র-পাত্রীরা দৃষ্টির অগোচরে থাকে বলেই তাদের নামের যাথার্থ্য তাদের প্রকৃতি—ভূমিষ্ঠ হয়ে দেখা যায়। পাঠকের রসদৃষ্টির সামনে তখন তারা প্রাণবন্ত হয়ে বিরাজ করে। তাই' পদ্মলোচন' যদি একচক্ষুবিশিষ্ট হয়ে পড়ে তবে সাহিত্য-সমঝদারকে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়।

শরৎ-সাহিত্য সাধারণতঃ পাত্র-পাত্রীর 'নামকরণ' তাদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের শিল্পানুভূতি এ ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। তাঁর সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্রগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন; নারী-চরিত্রগুলি সক্রিয়, চঞ্চল এবং শক্তি-সম্পন্ন। 'পুরুষ এবং প্রকৃতি'র চিরন্তন স্বরূপবৈশিষ্ট্যের অনুসৃতি ঘটেছে এইসব চরিত্রাবলী রূপায়নে। সুতরাং পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শিব এবং শক্তিরূপিণী প্রকৃতিদেবীর বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত শরৎচন্দ্রের প্রধানতম কয়েকটি গল্প উপন্যাসের নায়ক এবং নায়িকারা আত্মপ্রকাশ করছে।

'কাশীনাথ' গল্পের কাশীনাথ কাশীশ্বর মহেশ্বরের মতোই নির্লিপ্ত উদার প্রাণ। তার অনুচ্ছ্বসিত, অটল স্থৈর্যের কাছে সচঞ্চলা 'কমলা'র উচ্ছ্বসিত

আবেগ প্রতিহত হয়েছে। হিন্দুদেবতা নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীর অপর নাম কমলা। কমলা আদ্যাশক্তি মহামায়ার 'চঞ্চলা-চপলা' স্বরূপের প্রতিমূর্তি। আদ্যাশক্তি সেই প্রকৃতি সুন্দরী যাঁর নানাবিধ মায়ায় এবং লীলায় উদার ব্রহ্মাণ্ডধারী হয়েছেন লীলাময়। শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' গল্পের কমলা চরিত্রে অগভীর উচ্ছলতা যতখানি সাধনার অভাবও ততখানি। হৃদয় অপেক্ষা আবেগের বশে কমলা তার প্রেমে কাশীনাথকে অভিষিক্ত করেছে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের 'রমা' কমলারই নামান্তর মাত্র, কিন্তু রমা তার রম্যতা দ্বারা চরিত্রের গভীর সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি। রমার স্বত্বাধিকারের যোগ্যতা নিয়ে 'রমেশ' উপন্যাসের নায়ক —উদার পুরুষ। এখানেও রমা আঘাত করেছে, কষ্ট দিয়েছে রমেশকে। অকৃতার্থ জীবনের প্রতিশোধ নিয়েছে উভয়ের প্রেমকে সবলে আবৃত করে। এদিকে স্নেহ-মমতা-কৃতজ্ঞতাপূর্ণ রমণীয় রূপটিতে রমার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত রমেশের রূপান্তর চিরবৈরাগী ভোলা মহেশ্বরের চরিত্রপ্রাধান্যে বিরাজমান। 'রাজলক্ষ্মী' বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী প্রাণসত্তা—জীব-জগৎকে প্রাণদান করে রাখার জন্য বৈরাগী পুরুষকে তার ঔদাসীন্যের আবরণ খুলতে বাধ্য করেছে। পিয়ারী-রাজলক্ষ্মীর প্রেমবোধ তাই শ্রীমণ্ডিত। এই প্রেমশ্রী নিয়ে শ্রীকান্তকে সে করেছে অনুরাগী—সেই অনুরাগের বিচিত্র রূপ, আশা-নিরাশার-দ্বন্দ্ব, বিরহ-মিলনের ঘনীভূত রস শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মূলতত্ত্ব। পুরুষ-প্রকৃতির আদিম লীলাকে শরৎচন্দ্র আধুনিক প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধুর্যে এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে নারীপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ বিভিন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পুরুষ-চরিত্রগুলি প্রায় একজাতীয়। শ্রীকান্ত, রোহিণী, গহর, সন্ন্যাসীভাই—অসহায় নারীনির্ভরশীল উদাসীন পুরুষের লক্ষণগুলি নিয়েই কাহিনীভাগে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে অভয়া আদ্যাশক্তির বরাভয়দায়িনী রূপ নিয়ে সমাজ-বিভীষিকার বিরুদ্ধে জানিয়েছে প্রতিবাদ। রোহিণীবাবুর প্রেমকে সে অচরিতার্থ হতে দেয়নি। নারী এখানে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারিণী। দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দায় শোকাকুল হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। 'অন্নদাদিদি'র আত্মদান ভিখারী অনাবৃত স্বামীকে বরণ করে। সে স্বামিসত্তাটিকে ধ্যানের মধ্যে স্থাপন করে শত লাঞ্ছনাও হাসিমুখে সহ্য করেছে। অভয়া এখানেই করেছে বিদ্রোহ—একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বামীর অত্যাচার সে অসহায়ভাবে সহ্য করতে রাজী নয়।

'বড়দিদি' গল্পে মাধবীলতা নারীজনোচিত প্রেম-মহিমা নিয়ে 'রসাল-বৃক্ষ' সুরেন্দ্রনাথকে প্রকৃত আশ্রয়স্থল জেনেছে। সুরেন্দ্রনাথ কাশীনাথ নয় বটে, পুরুষ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে পূর্ণতর ভাবেই রূপায়িত। নীলাম্বরের উদার হৃদয়-উন্মুক্তিতে বিরাজ বৌ শান্তির নীড় রচনা করতে পারেনি। নীলাম্বরের আপাত কাঠিন্য বা রুক্ষতা ঘন কঠিন অসীমভাবে নীলাম্বরের হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল যে তার পরিমাপ পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই বিরাজ বৌ নীলাম্বরকে ভুল বুঝেছে চিরকাল। চন্দ্রনাথ সরযূর জীবনে এনেছে প্রেমের জোয়ার, তাই শঙ্কিত চিত্তে সরযূ রিক্ত ভাটার আগমন প্রতীক্ষা করে। সাবিত্রী সমাজনিন্দিতা, কিন্তু সতীশের প্রতি প্রেম তাকে পাতিব্রত্যে উন্নীত করেছে। কিরণময়ীর চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য দিবাকরের অকিঞ্চিৎকর জীবনে এনেছে বৈচিত্র্য—দিবাকর জীবনে বড় হয়নি, প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে ধ্বংস হয়েছে। কিরণময়ীর উত্তাপ লেগেছে কাহিনীর অন্যান্য চরিত্র-গুলিতেও। উত্তাপ-দগ্ধ উপেন্দ্রের জীবন বিষাদময় করে কিরণ অবশেষে ম্লান হয়েছে। সাবিত্রীর চরিত্রে রয়েছে স্নিগ্ধ দীপ্তি, তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য নেই ; সমগ্র কাহিনীভাগে তাই সাবিত্রীর নিষ্ঠা অম্লান। সমাজ-অনুশাসনরূপ মৃত্যুশমন তার ত্যাগমহিমার কাছে পরাভূত।

পার্ব্বতী চঞ্চল হয়েছে ছন্নছাড়া দেবদাসের জন্য। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—পূর্ণামৃতময় নয়। দেবদাস বিষামৃত পান করে নীলকণ্ঠ। চন্দ্রমুখী—শুধু বহিরাবয়বে সীমায়িত নয় তার সৌন্দর্য ; অন্তরের স্নিগ্ধলোকে দেবদাসের সন্তাপ দূর হয়েছে। নীলকণ্ঠ হয়েছে চন্দ্রচূড়। চন্দ্রমুখী সমাজের পদতলে স্থান পেলেও দেবদাসের মাথার মণি। সৌদামিনীর প্রকৃত শক্তি এবং জ্যোতির সঞ্চার ঘন-শ্যামের গভীর প্রেমের অজ্ঞাত প্রেরণায়। কালো মেঘের বুকেই সৌদামিনীর যথার্থ শোভা।

'গৃহদাহের' অচলা সর্বংসহা ধরিত্রী, সুরেশ এবং মহিম দুজনের প্রতি তার সমবেদনা। স্বামী মহিমের ধ্যানমগ্ন চিত্তের আবরণ খুলে নিজেকে অচলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তার ফলে যে গভীর ব্যবধান উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, সুরেশের আবির্ভাব সেই অবকাশটুকু গ্রহণ করতে। সুরেশ ভোগপ্রবণ মনের পরিপোষক। সে অচলাকে মুক্তি দিতে পারেনি ; ভোগ-মুখর প্রেমের সংকীর্ণ পরিধিতে অচলার অচলত্ব আরও দৃঢ়তা লাভ করেছে। এদিকে মহিমের প্রেমের মহিমায় অচলার মহিমান্বিতরূপদর্শন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যার জীবনে 'সুরেশের' প্রেম অভি-শাপ—এখানে প্রেমের ঘটেছে অপঘাত। সুরেশ অচলার জীবনে দুর্গ্রহ।

'বামুনের মেয়ে'তে অরুণ তার নবোদিত উচ্ছ্বাস নিয়ে সন্ধ্যার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সন্ধ্যা ও অরুণ সম্পূর্ণ বৈপরীত্য নিয়ে কি কখনও মিলিত হতে পারে? সন্ধ্যার গভীর দৃঢ়তার কাছে অরুণ বিচলিত হয়েছে, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুচ্ছ্বসিত সংকল্পের কাছে—যেমন ভাবে সন্ধ্যার আগমনে সপ্তাশ্বরথী অরুণের অস্তিত্ব যায় লুপ্ত হয়ে।

'শেষ প্রশ্নে' কমল মধুলোভীদের আকৃষ্ট করেছে তার তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন বাচনভঙ্গীতে এবং সৌন্দর্যে। কমলের সান্নিধ্যে যারা এসেছে তারা আহত হয়েছে অনেকেই, কারণ তারা দূর থেকেই মুগ্ধ হয়ে সুখী হয়নি, কমলকে আঘাত করেছে। তাই মৃণালের কাঁটায় বিদ্ধ হতে হয়েছে সকলকেই। আশুবাবু মিষ্টভাষী শিবপ্রতিম মানুষ। কমলের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রন্থভাগে একমাত্র আশুবাবুর প্রতি উদ্দিষ্ট হয়েছিল—অন্যান্য সকলে কমলের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি স্থাপন করেছিল বলেই কমলের কাছে তারা কৃপার পাত্র। শিবনাথ গুণী পুরুষ—কমলের মত মেয়েকে সে আকৃষ্ট করেছিল তার প্রতি, কিন্তু নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তিপাশে সে বন্ধনগ্রস্ত। এ যেন সেই অনার্যপ্রভাবসম্পন্ন শিবের প্রতিরূপ—গঞ্জিকাসেবী ভোলানাথের স্বরূপ।

বাঙলাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে মাতৃপূজার প্রচলন বিশেষভাবে প্রাধান্যশালী হয়েই চিরকাল আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রামাণ্য তথ্যেরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। আর্য আর্যেতর, এই দুই শাখার একীকরণের ফলে আমাদের দেশের দেব-দেবীর পরিকল্পনা মিশ্রণজাত। তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় মহাশক্তির আশ্রয় নারীচরিত্রের দুই বিপরীত স্বরূপকে ভিত্তি করে। কাশীশ্বরগৃহিণী, কুমারজননী পঞ্চতপা গৌরীর লীলামাধুর্য বিষহরি মনসা এবং চণ্ডিকার মধ্যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবির দৃষ্টিতে দেবী মানবীয় দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। তা ছাড়া, এই দুর্বলতা মাতৃশক্তির আধার থেকে উদ্ভূত নয়, আর্যেতর কল্পনায় আধিপত্য বিস্তারের আগ্রহ থেকে দেবীচরিত্রে আরোপিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, এবং হিংসাপরায়ণতার জন্য এক সময় 'শক্তি'র মাতৃত্ব এবং নারীত্ব স্থানচ্যুত হয়েছিল।

জাতীয় জীবনে শক্তিপূজার অপ্রতিহত আধিপত্য স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাহিত্যেও তাকে স্বীকার করে নিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আধুনিক যুগের সাহিত্যে নারীপ্রাধান্যের অপ্রশমিত ধারাটি তাই চিরসজীব। শরৎ-সাহিত্যে পাত্রপাত্রীর নামকরণবৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে কয়েকটি পারিবারিক চিত্রসম্বলিত গ্রন্থে নারীশক্তির দুই বিপরীত দিকের পরিচয় পাওয়াযায়।

নামের সঙ্গে চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য মহাশক্তির নামবৈচিত্র্যে যেমনটি স্থান পেয়েছে, শরৎচন্দ্রও তা যথার্থভাবে অনুসরণ করেছেন। অন্নপূর্ণা-সিদ্ধেশ্বরী-নারায়ণী-বিশ্বেশ্বরী-হেমাঙ্গিনী-ভবানী-চরিত্রাবলীর উচ্ছ্বসিত স্নেহ-মমতা, কারুণ্য, মাতৃত্বের চরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। শাসন এখানে স্নেহের বন্ধনে শিথিল, কাঠিন্য হৃদয়রসে দ্রবীভূত। পার্থিব সৌন্দর্য এবং মাধুর্য একাধারে স্থান পেয়ে শরৎচন্দ্রের শিল্পনির্দেশে মাতৃরসে রূপান্তরিত হয়েছে। সুখদায়িনী, তৃপ্তিদায়িনী এই মাতৃমূর্তির কল্পনা আমাদের গৃহ-জীবনের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ থেকে জাতীয় জীবনের বিরাট ক্ষেত্রে ক্রম-প্রসারিত।

এলোকেশী-দিগম্বরী-কাদম্বিনী-চরিত্র কটি যে বিশেষত্ব নিয়ে সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে, এর বাস্তবতা 'নামের' দিক দিয়ে যেমন সার্থক, চরিত্রের দিক দিয়েও তেমনি। কয়েকটি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিচয় বহন করে এই চরিত্র কটি নারীত্বের সহজাতগুণের বৈপরীত্য সাধন করেছে। মাতৃত্ব ও নারীত্বের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ এলোকেশী-দিগম্বরী-কাদম্বিনী-নামাঙ্কিতাদের আবির্ভাব। এই নাম তিনটির মধ্য দিয়ে তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্রে যে গূঢ়তম রহস্যের ইঙ্গিত সূচিত হয়, সেখানে সৌন্দর্য বা স্নিগ্ধতার অবকাশ নেই—একটি ভয়াবহ পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয় মাত্র। শরৎ-চন্দ্রের চিত্রিত এলোকেশী-দিগম্বরী-কাদম্বিনী-চরিত্রের সান্নিধ্যে গ্রন্থভাগে একটি অশুভ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের প্রবর্তনা উপলব্ধি করা যায়; যদিও তা সর্বাংশে বাস্তব। 'নাম-মাহাত্ম্য'বিচারপ্রসঙ্গে আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সূত্রানুসন্ধান ক'রে শরৎ-সাহিত্যে তার যৎসামান্য আভাসটুকু পরি-বেশন করতে চেষ্টা করেছি।

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত প্রায় সকল চরিত্রের নামকরণেই একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁর কয়েকখানি বিশিষ্ট রচনার চরিত্র সংক্ষেপে বিচার ক'রে 'নামকরণে'র উদ্দেশ্য ও মূল্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েছি। অবশ্য কোন কোন চরিত্রের নামকরণপ্রসঙ্গে ব্যতিক্রম যে ঘটেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শরৎ-প্রতিভা

দীনেশচন্দ্র সেন

প্রায় আট-নয় মাস পূর্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি সিনেট অফিসের সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলাম, তখন সুধীবাবু (শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া সুধীবাবু দু-একটি কথার পর বলিলেন, আপনি শরৎবাবুকে চেনেন না? ইনি একজন ভালো ঔপন্যাসিক। আমি বলিলাম, ইঁহার লেখা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইনি কী বই লিখিয়াছেন? তখন সুধীবাবু ইঁহার রচিত কয়েকখানি বইয়ের নাম করিলেন। আমি তাহার একখানিও পড়ি নাই। আমি বলিলাম, ইনি ত আমাকে ইঁহার কোন বই দেন নাই। শরৎবাবু বলিলেন, আমি দিলে কি আপনি পড়িবেন? আমি কতকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলাম, ঠিক যে পড়িব একথা বলিতে পারি না; তবে আপনি বই দিয়া দেখিতে পারেন। বস্তুতঃ আমি মনে করিয়াছিলাম অনাড়ম্বরবেশী শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি এখনকার সাহিত্য-বাজারের কোন সামান্য ব্যবসাদার গল্পলেখক। সুধীবাবু তাঁহার প্রশংসা করিয়া চলিত ভদ্রব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। আজকাল ত গল্পলেখক বঙ্গসাহিত্যের হাটে পথে। রাঁধুনি বামনের হাতে যাহারা রন্ধনের কাজ ও চাকরানীর হাতে ঘরের অন্য কাজ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া, উপাধান আশ্রয় করিয়া দিনরাত্রি নিষ্কর্মাভাবে কাটান, এইগুলি সেই নব্য সম্প্রদায়ের মহিলাদেরই মুখরোচক হয়।

উক্ত ঘটনার তিন-চারি মাস পরে গুরুদাস বাবুর দোকান হইতে আমি কতকগুলি বই পাই। তাহার মধ্যে বিন্দুর ছেলে ও রামের সুমতি—এই দুটি গল্প পড়িয়া আমি যেন নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। চরিত্রগুলি পড়িয়া মনে হইল তাহারা সজীব হইয়া কথাবার্তা বলিতেছে। সাধারণতঃ গল্পলেখকেরা বদ্ধ- পরিকর হইয়া দুই রকমের চরিত্র রচনা করেন,—ভাল এবং মন্দ। যে ভাল তাহার গুণের শেষ নাই, যে মন্দ তাহার দোষের সীমা নাই। অত্যাচারী ক্রমাগত পীড়ন করিতেছে, সহিষ্ণু ক্রমাগত সহ্য করিতেছে। করুণরসের সৃষ্টি করিবার জন্য লেখকদের কেহ কেহ ভাসুরের দ্বারা দেবর-পত্নীর চুলের মুঠি ধরাইয়া তাহাকে ভিটা হইতে তাড়াইতেছে, ক্ষয়রোগকাতর বিধবা তথাপি সেই ভিটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। কোন

স্থানে দীন দরিদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাল-লাঙ্গল বন্ধক রাখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পড়ার খরচ চালাইয়া তাহাকে উকিল তৈয়ারি করিতেছেন। পরে সেই কনিষ্ঠভ্রাতা শ্বশুরের অর্থগৌরবে এবং ওকালতির পশার জমাইয়া, চিরসহিষ্ণু দয়াময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পশুর মতো গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে; বড় ভাই তখনও ছোট ভাই-এর মঙ্গল কামনা করিতে ছাড়েন নাই। এইরূপ অত্যাচারের বর্ণনা পাঠকালে সে সত্য সত্যই কোন সময়ে চক্ষুর জল না পড়ে, এমন কথা আমি বলিব না। কিন্তু গ্রন্থকার যাহাকে ভাল করিয়া গড়িবেন তাহার মুখে সাদারঙ ঘষিয়া তাহাকে চক্‌চকে করিয়া দিবেন; এবং যাহাকে খারাপ করিবেন স্থির করিয়াছেন তাহাকে কাল কালিতে স্নান করাইয়া বানর বানাইয়া ছাড়িবেন, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাহা ছাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বরতাকে অনেক সময় ইহারা করুণরসের প্রতিপোষক মনে করিয়া সাহিত্যিক শিল্পজ্ঞানের একান্ত অভাব দেখাইয়া থাকেন। একদা কোন একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া একটা দৃশ্য বড় সাংঘাতিক মনে হইল। স্টেজের উপর একটা ছেলেকে শোয়াইয়া তাহার খুল্লতাত বিষয়লোভে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করাইতেছেন, জোর করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বিষ দেওয়া হইতেছে, বালকটি তীব্র যন্ত্রণায় যতই হাত-পা ছুঁড়িতেছে, ততই দর্শকের দল বেজায় উত্তেজিত হইতেছে। এইরূপ করুণরসের উদ্রেক করা কতকটা সহজ। যদি স্টেজের উপর কোন অভিনেতা বমি করিয়া বীভৎস রস প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান, তবে বোধ হয় এইরূপ সহজেই কৃতকার্য হইতে পারেন।

কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টির আইন-কানুন অত স্থূল নহে। রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে দোষে-গুণে রচনা করিতে হয়। তবেই তাহাকে আমাদের একজন বলিয়া চিনিতে পারি। রাম চরিত্রও অবশ্যই আদর্শ চরিত্র; কিন্তু বাল্মীকির হাতে তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ হইয়াছেন। মহাকবি নিশ্চয় পুতুল গড়িতে চেষ্টা পান নাই। গুহক চণ্ডালের গৃহ ছাড়িয়া একরাত্রি তিনি একটা বড় গাছের শাখায় বাস করিয়াছিলেন। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, পশুর গর্জন, মনোরমা সীতা ঝটিকাদলিতা বল্লীর ন্যায় তাঁহার কণ্ঠলগ্না—এমন সময় দুঃসহ কষ্টে তীরবিদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন এমন কি কখনো শুনিয়াছ লক্ষ্মণ যে কোন পিতা জগতে আমার মত ছন্দানুবর্তী পুত্রকে এইভাবে বর্জন করিতে পারে? রাজা দশরথ একান্ত কাপুরুষ ও স্ত্রৈণ; তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও, নতুবা কৈকেয়ী নিশ্চয়ই আমার মাতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবে। কৌশল্যা রামের বনগমন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া রামচন্দ্র

শয়ন করিতে অভ্যস্ত, সে কেমন করিয়া তাহার লৌহ সাবলের মত দৃঢ় বাহু আশ্রয় করিয়া নিদ্রা লাভ করিবেন পাছে রামের চিত্র কঠোর হয়। এই ভয়ে কৃত্তিবাস এ সকল অংশ বাদ দিয়াছেন। লক্ষ্মণ বুঝিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্। একথা বাঙ্গালা রামায়ণে পৌঁছায় নাই। হনুমান রাবণকে প্রথমদিন দেখিয়া বলিয়াছিল, কী গম্ভীর রাজোচিত মূর্তি। কৌপীনধারী রামচন্দ্র ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া কী করিবেন? সুতরাং বাল্মীকিকৃত রাম নিছক ভালোমানুষটি নহেন এবং রাবণও নিছক দুষ্ট লোক নহে।

বড় কবি ও লেখকেরা শাস্ত্র ধরিয়া কিংবা সামাজিক হিসাবে কী ভাল, কী মন্দ তাহার একটা নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া চরিত্র গঠন করেন না। তাঁহাদের কল্পনা তাঁহাদিগকে এমন একটা জায়গায় লইয়া যায়, যেখানে সজীব ব্যক্তিরা চলাফেরা করে। কবি ও লেখক অতি স্পষ্টভাবে মনশ্চক্ষে যাহা দেখেন, তাহাই লেখনীমুখে প্রতিভাত হয়। আদর্শ আঁকিবার চেষ্টা করিয়া কেহ কখনও খুব উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। সুখে-দুঃখে, আলো-আঁধারে দোষে-গুণে এই বিশ্ব। ইহাতে যাহা উচ্চ ও বড়, তাহা কেবলই উচ্চ ও বড় নহে। হিমালয় পর্বতে এমন গহ্বর আছে যাহা হইতে পাতাল পর্যন্ত দেখা যায়।

বহুদিন পরে শরৎবাবুর গল্পে সজীব মানুষ দেখিলাম। দেখিলাম—ক্রুদ্ধ সর্পিণীর ন্যায় স্ত্রীলোকের হৃদয়ও কুসুম-সুকুমার হইতে পারে। ভ্রাতৃবধূ ভাসুরকে কঠোর কথা বলিলে, সর্বদাই তিনি দীনহীন ভালো মানুষ—গর্বিতা ভ্রাতৃবধূর কৃপাপাত্র হইবার প্রত্যাশী নহেন। বড়মানুষ ভ্রাতার বাটীর পার্শ্বে কুটিরে থাকিয়া সারাদিন খাটিয়া প্রাণান্ত শ্রমে উপজীবিকা অর্জন করিতে পারেন। ইহার গল্পে পাড়ার সেরা বদমাইশ ছেলেটার মতো এমন কোমল চরিত্র বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎবাবুর প্রধান চরিত্রগুলির অনেকের মধ্যে প্রধান দোষ আছে, তাহা সত্ত্বেও তাহা লইয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ। এমন যে সোনার পুতুল নারায়ণী, সেও স্নেহান্ধ এবং নিজের স্নেহপাত্র সম্বন্ধে দোষ দেখিতে অপটু। লেখক তাহায় পক্ষ লইয়া তাহার দাবিগুলি আঁকিয়াছেন। তাহার কোনটিই একরঙের হইয়া যায় নাই। দোষেগুণে যেরূপ সংসার, শরৎবাবুর অঙ্কিত চরিত্রগুলিতেও সেইরূপ কোনদিকে আলো পড়িয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, কোনদিকটা আঁধার রহিয়া গিয়াছে। মোটের উপর, চরিত্রগুলির প্রত্যেকের দোষেগুণে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে উহারা জীবন্ত মানুষের মতন হইয়াছে। লেখকের সহৃদয়তা এত বেশী যে একান্ত

কোপন, একান্ত অভিমানী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন চরিত্রের ভিতরকার মাধুর্যের উৎসের তিনি সন্ধান করিয়াছেন। ইউজিন সুর, মাদার রজ্ঞ এবং ভিকটর হিউগোর নটারডোমের কুব্জ বাহিরে কুৎসিত হইয়াও ভিতরের সৌন্দর্যে অপূর্ব হইয়াছেন। লেখকেরা ভিতর দেখাইয়াছেন বলিয়াই আমরা বাহিরের কুৎসিতও যে ভিতরে সুন্দর হইতে পারে তাহা বুঝিয়াছি। পণ্ডিতমশাই গল্পের নায়িকার মতো অতবড় সাংসারিক-বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোককে প্রধান নায়িকা করিয়া দেখানো সহজ নহে। কিন্তু যে অন্তর্যামী বিধাতা কুসুমের হৃদয়ের সন্ধান রাখেন তিনি গল্পলেখকের হাতে ভিতরটা দেখিবার দেখাইবার চাবিটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কুসুমের অভিমান, কুসুমের রাগ, তাহার অশ্রুতপূর্ব স্বামী-প্রেমের উপর দাঁড়াইয়া সকল দোষের মধ্যে অপূর্ব মাদকতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। আমরা দুর্দান্ত বালক রামের দোষগুলি পর্যন্ত ভালবাসিতে শিখিয়াছি। লেখকের প্রবল সহানুভূতি আমাদের টিকি ধরিয়া লইয়া এমন সকল জিনিসকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে, যাহা প্রথমতঃ একান্ত দোষের মনে হওয়া স্বাভাবিক। রাম যে তাহার দিদিমাকে ডাইনি বুড়ি বলিত, ডাক্তারের কলমের আমগাছগুলি কাটিয়া ফেলিবার ও তাহার বাড়িতে আগুন ধরাইবার ভয় দেখাইত, চুরি করিয়া গৃহস্থের শশা খাইত, এমনকি তাহার মাতৃসমা বৌদিদির চোখে পেয়ারা ছুঁড়িয়া মারিয়া ফুলাইয়া দিয়াছিল—এ সকল আমাদের চক্ষে, তাঁহার চরিত্রের অসামান্য স্নেহপ্রবণতার গুণে, মধুর বোধ হইতেছে। জননী যে গুণে ছেলের দোষ দেখিয়াও দেখেন না, তাহাকে ভাবের অমৃতে ডুবাইয়া রাখেন, শরৎবাবুর ভিতরে সেই গুণ, প্রীতি ও সহানুভূতি এত বেশী যে, তিনি পাঠকের চিত্ত মাতৃহৃদয়ের ন্যায় সুকোমল করিয়া গড়িয়া ফেলেন। রামের সুমতি গল্পটির মতো সর্বাঙ্গসুন্দর মনোহর গল্প আমি বাঙলা সাহিত্যে পড়ি নাই। রাম তাহার ভ্রাতৃবধূকে ভালবাসিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, ইহা সত্য যে তাহার প্রকৃতির সমস্ত উদাস উচ্ছৃঙ্খলতা সেই ভালবাসায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

অত অল্প জায়গায় এরূপ প্রবলভাবের করুণ রস সৃষ্টি করিতে বঙ্গীয় অন্য কোন আধুনিক লেখক পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

প্রচলিত রাশিরাশি ছোটগল্পের করুণরস রামের সুমতি গল্পের তুলনায় সিন্ধুর নিকট বিন্দু। বস্তুত রামের সমস্ত দোষ আমরা জননীর চক্ষে মার্জনা করিয়া থাকি। নৈতিক হিসাবে উহারা যত বড়ই হউক না কেন, লেখক তাহা বৃন্দাবনের লীলার ন্যায় মধুর করিয়া তুলিয়াছেন; সেখানে ছুরি-মারামারি, মান-অভিমান—সকলই স্নেহের মূল্যে বিকাইয়া গিয়াছে। নারায়ণী যেদিন

স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়া রামের জন্য রাঁধিতে বসিল, সেদিন তাহার মূর্তি রাফায়েলের অমর তুলিকায় আঁকা ম্যাডোনা মূর্তির ন্যায় আদর্শ মাতৃমূর্তি। সেই রান্না, সেই পরিবেশনের কথা—চক্ষের জলে পড়া যায় না। প্রবীণ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম ; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আপনি আমার চক্ষুপীড়া বাড়াইয়া দিলেন। গল্পগুলির আর-একটা বাহাদুরি এই—উহা আদৌ ফেনাইয়া লেখা হয় নাই। আজকাল বাজে কথা, বিশেষ প্রকৃতিবর্ণনা, এত বেশী দেখা যায় যে উহার দ্বারা গল্পভাগ প্রায়ই উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। শরৎবাবুর ভাষায় সংযম আছে ; সংযত দুই-একটি কথায় তাঁহার চরিত্রগুলির অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় সাধারণ লেখকগণের কথার বাহুল্যে তাঁহাদের নায়কনায়িকাগণের প্রকৃতি ঢাকা পড়ে মাত্র। পূর্বেই লিখিয়াছি সকল দিক দিয়া দেখিলে রামের সুমতি গল্পটিই বোধ হয় লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটি ক্ষুদ্র কিন্তু ইহাতে এত ঘটনার বাহুল্য আছে যে ইহার প্রত্যেক চিত্র একটি মহাকাব্যের অধ্যায়ের মতো। রাম একপায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিরূপে দাঁড়াইতে হয় তাহা তাহার পাঁচ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ শিখাইতে গেলে তাহার গালে ঠাস করিয়া চড় মারিল, এই ব্যাপারে নারায়ণী একটু হাসিলেন। অশ্বত্থগাছ উঠানের উপর বপনকালে রামের অবিশ্রাম আদেশ প্রদানে, গোবিন্দের ছোট একটি ঘটি করিয়া জল আনা, এক ডালের দিকে ইঙ্গিত করায় রামের সতর্ক করিয়া দেওয়া, কারণ আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে গাছ বাড়িবে না, কালী গরুর ভয়ে বাঁশের বেড়া দেওয়া, কোথাও বা রামের কাঠি দিয়া বেলের আটা খোঁচাইয়া বাহির করা এবং সেই ঘটনা শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের গম্ভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা, কখনও রামের কঞ্চির দ্বারা পাখির খাঁচা প্রস্তুত করা, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিতে যেন সমস্ত বাল্যলীলার একটা জগৎ আমাদের চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে। এই শিশুলীলার মধ্যে মাতৃরূপিণী বউদিদির আদর আব্দার ও বাহিরের শত প্রকার অসহ্য গঞ্জনায় যেন সমস্ত দৃশ্যটি স্নেহাসারে অভিষিক্ত করিয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রগল্পে লেখক সূক্ষ্মতুলি ধরিয়া যে সকল চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কৃষ্ণনগরের কারি-গরের হাতের তৈয়ারি মাটির মূর্তির মতো এক-একটি ভিন্নপ্রকারের এবং প্রত্যেকটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অতি স্বাভাবিক বলিয়া তাহাদের গঠন-নৈপুণ্য আমাদের চক্ষু এড়াইতে পারে ; কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে নিত্য দাসী কিরূপ স্পষ্টবাদিনী, বহুদিন এক মনিবের সঙ্গে থাকায় গৃহের ধাতটি সম্বন্ধে তাহার কিরূপ অভিজ্ঞতা। ভোলা চাকর ছোট হইলেও কিরূপ প্রভুভক্ত, অনুগত এবং সখ্যভাবে আবদ্ধ। নারায়ণীর মাতার

মতো চরিত্রের বঙ্গীয় গৃহে অভাব নাই; ইহাদের প্রভাবে কত গৃহের শান্তি চলিয়া যাইতেছে। বড়ভাই গোবেচারী, কিন্তু তিনিও নিতান্ত ভালোমানুষটি নন, তাঁহার ভিতরেও দুষ্ট পরামর্শ গ্রহণের প্রবৃত্তিটি বিলক্ষণ আছে ; গিন্নির ভয়ে অনেক সময় সেই প্রবৃত্তিটি খেলা করিতে সাহস পায় নাই। এই সকল চরিত্রের আশেপাশে দুই-একটি ছোট চরিত্র উঁকি মারিতেছে ; তাহারা লেখকের অবহেলার রেখাপাতেও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারবাবুর সাক্ষ্য মান্য করিবার ভয়ে একবৃদ্ধ রোগী বলিয়া উঠিয়াছিল, উনি বাবু কি বলিয়াছেন, আমি ত তাহা শুনি নাই, কানের ভিতর কুইনাইনে ভোঁ ভোঁ করিতেছে। এইরূপ দু-একটি কথায় পাড়াগাঁয়ে ভীরুস্বভাব গৃহস্থের ছবি অতি স্পষ্টভাবে চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র ঘটনা, চরিত্র ও পুঞ্জীভূত গৃহস্থালীতত্ত্ব চলচ্চিত্রের মত, নারায়ণী ও রামের বাৎসল্যকে মহীয়সী শোভা প্রদান করিয়াছে। বউদিদির শোক এবং সংযত বাক্যে অর্ধ-প্রকাশিত সুগভীর মাতৃপ্রেম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রেমের সংযম কতদূর তাহা দুই-একটি ব্যবহার ও বাক্যে বুঝিতে পারা যায়। নারায়ণীকে তাহার মাতা যখন দুধ লইয়া খাইবার জন্য সাধাসাধি, অনুরোধ ও গঞ্জনামূলক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, নারায়ণী তখন দু-এক চুমুক দুধ খাইল। সাধারণ গল্পলেখকেরা নিশ্চয়ই এ জায়গায় লিখিতেন, নারায়ণী কিছুতেই দুধ খাইতে রাজী হইল না। কিন্তু লেখক শুধু বলিলেন, নারায়ণীর কথাকাটাকাটি করিতে ভাল লাগিল না, এজন্য তিনি দধ খাইলেন ; দুধ নিশ্চয়ই তাঁহার বিষের মত ঠেকিয়াছিল, তথাপি তাহাকে খাইতে হইয়াছিল ; বিষ হইতে তিক্ত মায়ের কথার জ্বালা এড়াইতে। যখন রামের অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহলে মরিয়া যাইতেছিলেন, তখনও হৃদয়হীনা মায়ের নিকট সেকথা শুনিলেন না। যাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া যাইতেছিল সেই কথা দর্প করিয়া তাঁহার মাতা তাঁহার কানে বিজয়ভেরীর মতো বাজাইতে আসিয়াছিলেন। নারায়ণী তাঁহার প্রধান কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া অন্যদিক হইতে রামের সংবাদ জানিতে চেষ্টা পাইলেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এতবড় সংযম প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অথচ গভীরতম বাৎসল্যের ইহাই স্বভাব, শরৎবাবু অবহেলায় দু-একটি কথায় যেরূপ মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, সুদীর্ঘ বর্ণনাতেও অনেক সময় তাহা পাওয়া যায় না।

রামের সুমতির শেষটি বড়ই স্বাভাবিক। পূর্বেই বলিয়াছি, রাম বউদিদির স্নেহের বলে এতবড় দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কিছুতেই বউদিদির পর নহে। বউদিদির স্বামী তাহার বৈমাত্রেয় ভাই—তাহার পর ; কিন্তু বউদিদি তাহার মাতৃসমা—তাঁহাকে ছাড়া সে জানে না, কিছুতেই সে তাঁহাকে পর

ভাবিতে পারে না। বউদিদি বড় হইয়া মরিয়া যাইবে, একথাও তাহার অসহ্য'। বউদির ছেলেটি তাহার নিত্য সহচর, তাহার একান্ত স্নেহাস্পদ। আপনার বলিয়া এই চিরাগত বিশ্বাস যখন ভাঙিয়া গেল, তখন রাম একেবারে কী একটা হইয়া গেল। ক্ষুদ্র একটা পুটুলি লইয়া যখন সে অকূল সংসারের পথে একক দাঁড়াইল এবং ভোলাকে দিয়া বৌদিদির নিকট হইতে একটি টাকা পাথেয় চাহিল, তখনকার তাহার মূর্তি ও ডাক্তারের বাড়িতে কলমের আমের চারা কাটিবার ভয় দেখাইবার সময়কার মূর্তি—এই দুইটি মূর্তি সম্পূর্ণ পৃথক। এখনকার রাম আর সে রাম নাই ; দু দিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহার পায়ের নীচে যে জমি ছিল তাহা সরিয়া গিয়াছে—তাহার ভুল ভাঙিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার বাল্যপ্রকৃতি একেবারে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় নারায়ণী তাঁহার মাতাকে বিনীত ভাবে স্বগৃহ হইতে বিদায় লইতে বলিলেন। রাম বলিল, না উনি থাকুন। আমি উঁহাকে আর উৎপাত করিব না। আমি ভাল হইয়াছি। সুতরাং দিগম্বরী ঠাকুরানীর থাকা না থাকা গল্পের উদ্দেশ্যের নিকট তুচ্ছ হইয়া পড়িল, রামের সুমতি হইল অর্থাৎ তাহার লীলা-মধুর, দুর্দান্ত অথচ কোমল, আব্দার প্রশিত অথচ একান্ত নির্ভরশীল শিশু-প্রকৃতি ঘা খাইয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। এখন দিগম্বরী তাহার প্রতি যত অত্যাচার করিবেন, মুখ ভেঙাইবেন ও শাপান্ত করিবেন, সে সকল নদীতরঙ্গে শৈলকঠিন তীরভাগের ন্যায় সে নীরবে সহ্য করিবে। ইহা আমরা যখন বুঝিলাম তখন শ্বাশুড়ী ঠাকুরানীর থাকা না থাকায় আমাদের আর কোন কৌতূহলসম্বন্ধ রহিল না। গল্প স্বাভাবিকক্রমে এখানেই শেষ হইল। এই গল্পটি বাৎসল্যভাবের পরিণতি। সেই বাৎসল্য কত গভীর, তাহা যেদিন নারায়ণী তাহার মায়ের মুখে রামের মৃত্যুকামনার শাপ শুনিয়াছিলেন, তখন একবার মা কথাটি রোষকম্পিত স্বরে উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। মধুর মা কথাটি সেদিন বজ্রের শক্তি ধারণ করিয়া দিগম্বরীর অন্তরাত্মা কম্পিত করিয়া দিয়াছিল।

অতি অল্প কথায় শরৎবাবু তাঁহার চরিত্রগুলি এইভাবে জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন।

শরৎবাবু একটি তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন—তাহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য বোধ হইয়াছে। এটি বৈষ্ণবধর্মের প্রধান ভাব ; কিন্তু শরৎবাবু বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে তাহা পান নাই। ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্বতই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বড় রকমের স্নেহ শুধু রক্তমাংসের সম্পর্কজাত নহে। তাহা ভগবানের দান, তাঁহার ইচ্ছায় জন্মে। কোথায়ই বা ইহার উৎপত্তি না হইতে পারে? শুধু মাতাই যে

স্নেহের অধিকারিণী তাহা নহে। একটি কালো ছেলে কোলে পাইয়া গর্ব, অভিমান ও রূপের মূর্তিস্বরূপ বিন্দু তাহাকে মায়ের অপেক্ষা বেশী স্নেহ করিতে শিখিল; স্নেহের গণ্ডী কতদূরে টানিতে হইবে, কুলজীশাস্ত্র হইতে আমরা তাহা নির্দেশ করিতে পারি। কেহ সে গণ্ডী অতিক্রম করিলে মায়ের চেয়ে যে বেশী ভালবাসে তাকে বলে ডাইন প্রভৃতি রূপ কটূক্তি করিতে পারি।

কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির ক্ষেত্র অবাধ, সে প্রকৃতির লীলা কোথায় থামিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের ভিতরে যে আত্মা আছেন, তিনি পরকে আপন করেন, ও আপনকে পর করেন; তিনি আইনকানুনের ধার ধারেন না। বৈষ্ণবেরা এই নিষ্কাম প্রেমকে জড় নিয়মের বশবর্তী মনে করেন না; রক্তের সংস্রবে যে স্নেহ করেন, উহা তাহা হইতে বড়। এই কথা বুঝাইতে দৈবকী হইতে যশোদার মাতৃভাব বেশী দেখাইয়াছেন। নন্দই আমাদের চক্ষে আদর্শ পিতা, বসুদেব নহেন। যখন প্রভাসে যাইয়া তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিলেন, তখন তাঁহারা প্রাণ ছাড়িতে চাহিলেন, কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিলেন না। শরৎবাবু বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি প্রভৃতি গল্পে পরকে আপন হইতে আপন করিয়া দেখাইতেছেন। কোন্ মাতা বিন্দুর মতো, নারায়ণীর মতো স্নেহশীলা? অপার্থিব প্রেম কোন্ ক্ষুদ্র উপলক্ষে কোন অনির্বচনীয় সূত্র আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে আসিয়া সিংহাসন পাতিবে তাহা বলা যায় না। স্বামী হইতেও কেহ বেশী আত্মীয় হইতে পারে—এই তত্ত্বের উপর পরকীয় রস স্থাপিত; মাতা হইতেও অধিকতর স্নেহশীলা হইতে পারেন—ইহাই আমরা শরৎবাবুর অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রে দেখিতে পাই। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিহিত বাঁধা ঘাটে প্রেম ও স্নেহ সচরাচর বিচরণ করে বলিয়া মনে করিও না যে উহারা নিগড়বদ্ধ। উহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। কোন্ অনির্বচনীয় নিয়মে প্রেম কোথায় কাহার জীবনকে ধন্য করিতে উপস্থিত হন, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? মুক্ত আকাশ ও বায়ুর ন্যায় প্রেমের ক্ষেত্র অসীম; উহার কোন্ দুয়ার দিয়া চন্দ্রকিরণের মতো কাহার হৃদয় ছুঁইবে—কে বলিবে? স্নেহের এই অনির্বচনীয়ত্ব, এই গূঢ় গতিবিধি শরৎবাবুর লেখায় আমরা দেখিতে পাই। বৈষ্ণবদিগের মুখে এই সুর শুনিয়াছি বলিয়া উহা আমাদের কানে এত মিষ্টি লাগিয়াছে।

আর একটি ভাব আমরা শরৎবাবুর লেখায় পাই। তাহা স্নেহের রাজ্য আগন্তুকের দৌরাত্ম্যের সাংঘাতিক বলি। একান্নভুক্ত পরিবার যেখানে স্নেহ-মায়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে শতদোষ সত্ত্বেও তাহা অনড় অটল। রামের এত অনিষ্টতা ও অনিবার্য দোষগুলি লইয়াও নারায়ণীর সংসার বেশ

চলিতেছিল। কিন্তু এত আঘাতেও যাহা নড়ে নাই, সহানুভূতিশূন্য আগন্তুকের নিঃশ্বাসে তাহা ভাঙিয়া পড়িবার মতো হইল। বিন্দু ও অন্নপূর্ণার বিবাদে যে গৃহে সর্বদা ঝড় বহিত, তাহা এলোকেশীর আগমনে কিরূপ হইয়া গেল। এটি একটি নিত্যপরীক্ষিত সত্য যে, কোন পরিবারে যদি নৈতিক মহৎ অপরাধ না থাকে, তবে শতদোষ সত্ত্বেও তাহা শুধু মমতার বন্ধনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু আগন্তুকগণের অযাচিত আত্মীয়তা তাহা একদিনও সহ্য করিতে পারে না। যে সকল ভাব অনভ্যস্ত, তাহার উৎপাতে গৃহস্থালী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া যায়। রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে পড়িয়া পাঠক এই কথাটি বেশ বুঝিতে পারিবেন।

শরৎবাবুর চন্দ্রনাথ উপন্যাসখানি বহু পূর্বে লেখা। যতই প্রবীণতা ও চুলের পক্কতা বাড়িয়া যায়, ততই সে লেখা উৎকৃষ্ট হয়, এই বিশ্বাস আমাদের নাই। চন্দ্রনাথ পুস্তকের উপসংহারভাগ অতুলনীয়। এই উপন্যাসে একটি জাতিচ্যুতা মেয়েকে শিক্ষিত ও ধনী যুবক চন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন; সরযূ নিজের কুলকলঙ্ক জানিয়াও স্বামীর নিকট গোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে তাহা বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ধরা পড়িয়া গেল। তখন চন্দ্রনাথ ও সরযূর প্রেম গাঢ় হইয়াছে; সরযূ নিজ কুলকলঙ্কের কথা সর্বদা হৃদয়ে ঢাকিয়া রাখিয়া স্বামীর প্রতি ভালবাসা বাহিরে দেখাইতে ভয় পাইয়াছে। তাহার তাসের ঘর কখন ভাঙিয়া যায়, সে ভয় তাহার সর্বদা ছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথের সরল অকপট প্রেম সরযূকে যথাসর্বস্ব জ্ঞান করিয়া তাহাকে যেন বুকে করিয়া রাখিয়াছিল।

শেষের কদিন

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে মৃত্যু যে একদিন আসবেই তা জানলেও তার অনিশ্চয়তা এবং আকস্মিকতা একটা পরম স্বস্তির ব্যাপার ; তাই বোধ হয় এই বিশ্বলীলার পরিকল্পনায় তার স্থান এত বড় !

মৃত্যু তার করালরূপ আর বিরাট রহস্য নিয়ে কবে যে শরৎচন্দ্রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তা আর কেউ না জানলেও তিনি যে জানতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই । ২৩শে ডিসেম্বর সকালে জনকয়েক বন্ধু এসে তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন : নিশ্চয় সেরে উঠবেন আপনি । শরৎচন্দ্রের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল । বললেন তিনি, আজ কত তারিখ ?

২৩শে ডিসেম্বর ।

২৩শে জানুয়ারি আমার কথা মনে কোরো তোমরা······মনে থাকবে ? শান্ত হাসিটি ! বললেন : কোন সন্দেহ নেই আমার !

জানুয়ারির সেই ২৩ আজই ! সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হল !

কোথায় শরৎচন্দ্র আজ !

... ...

পুজোর আগে দিনকয়েকের জন্য এসেছিলাম, দেখতে তাঁকে ।

ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তখন ডিস্‌পেপসিয়া নিয়ে মশগুল ! কী করে তাকে বাগে আনবেন তারই উপায় খুঁজচেন !

শরীরকে তিনি অবহেলা করতেন । খাওয়া-দাওয়ার লেঠা হয়তো ছিল ; কিন্তু ঘটা ছিল না ।

দায়ে পড়ে ডাক্তারের নির্দেশমত চা ছাড়ি-ছাড়ি করছেন ; কিন্তু বহুদিনের পুরোনো বন্ধুটার মায়া ত্যাগ করাও কঠিন ।

চায়ের বদলে বেলপাতার রসের পরীক্ষা, কিঞ্চিৎ কাঁচা দুধ আর চিনি সহযোগে—আমি তখন চালাচ্চি । তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন ।

জিজ্ঞেস করলেন : কতদিন চালাচ্চ ?

মাস দেড়েক ।

শরীর দেখে মনে হয় এটা তোমার কাজে লেগেছে ; আমাকে অনেকদিন অনেকে এর কথা বলেছে ; কিন্তু জান তো আমার আলস্য । দেখি উপকার হয় কিনা ।

এই সময় তিনি শিশুসাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বন্ধু নরেন্দ্র দেবের অনুরোধে 'সোনার কাঠি'র জন্য লালুর গল্প লিখেছেন।

লালু যে কে তা আমি চিনেছি কিনা জানতে চাইলেন। বললাম: দুটোই সত্যি গল্প: তুমি বাস্তবকে সাহিত্যের পংক্তিতে তুলে রূপদান করেছ!

বললেন: বেশ লাগে ছেলেমেয়েদের গল্প লিখতে। এতদিন লিখলে কত লিখতে পারতাম। তুমি ফিরে এসো, এবার ওদিকে মন দেওয়া যাবে··· কিন্তু·········

কী কিন্তু?

আমি পরিষ্কার বুঝেছি আমার দিন সন্নিকট।

মৃত্যুভয়?

হেসে বললেন, অব্যর্থ অনুমান, ভুল নেই; কেননা বাঁচার ইচ্ছেও নেই। সব জিনিসেই একটা নিদারুণ ঔদাসীন··· ···কেন বলো তো?

কথা না কয়ে খানিকটা সময় কেটে গেল।

কী? কোন উত্তর দাও না যে? ঠিক এমনিটি হয়েছিল আমাদের মুকুজ্জে মশায়ের। তাঁরও যেন রসবোধ চলে গিয়েছিল।

বললাম: বয়সও তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল; তাঁর কথা ঢের আলাদা··· জীবনে কাজ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তোমার কাজ যে এখনও বাকি শরৎ!

কী আর কাজ! রোগের যন্ত্রণা ভোগা ছাড়া?

দেশ তোমার কাছে সাহিত্যের দিক দিয়ে এখনও অনেক কিছু আশা করে।

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র বললেন: তা ঠিক; অনেক কিছু করতে পারতাম; কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাতে করিনি। আজ বুঝেচি সত্যিকার শরীর খারাপ কাকে বলে। ওগুলো বায়না ছিল।······অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল। সময় পেতাম তো অসমাপ্ত বইগুলো······

সে সময় পাবে হয়তো!

আর পেয়েছি!

··· ··· ··· ··· ···

ভাগলপুর যাবার সময় এল; যেতে হবেই। যাবার সময় শরৎ বললেন: আমিও যাব বাড়ি, নবমী পুজোর দিন।

এই শরীর নিয়ে কাজ নেই, শরৎ, তোমার গিয়ে সামতায়। তার চেয়ে

ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে চলো কোথাও চেঞ্জে যাওয়া যাক। বয়স হচ্ছে, আর অবহেলা কোরো না।

সেই বৈরাগ্যের হাসি!

... ...

চিঠি পেলাম। লিখচেন শরৎ: ডাক্তার-কবিরাজেরা বলেন, আমার লিভারের শিরোসিস্ হয়েছে। রাজগৃহে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসা যাবে। সেখেনে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাকে চিঠি দিলে চলে এসো।

সেই চিঠি পেলাম ভূতচতুর্দশীর দিন। প্রকাশ লিখেচেন: দাদার শরীর আরও খারাপ হয়েছে। তিনি আপনাকে আসতে বললেন। খুব সব দরকারী কথা আছে আপনার সঙ্গে। কবে আসবেন জানাবেন।

কালীপুজোর পরের দিন সকালে রওনা হলাম। একখানা চিঠি দিলাম দেশে, আর একখানা বালীগঞ্জে।

এসে শুনলাম: তিনি পরশু আসচেন। নেহাৎ সেদিন না এলে, শনিবারে নিশ্চয়।

শুক্রবার সকালে মন চাইলে না আর দেরি করতে। রওনা হয়ে গেলাম ন'টার গাড়িতে। সাড়ে দশটার সময় সামতার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেখি, জীর্ণ-শীর্ণ শরৎচন্দ্র পুকুরের পারে বসে মাছ ছাড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে মলিন হাসি হেসে উঠে এলেন।

কেমন দেখছ আমায়?

ভালো না।

সুরেন, আমার পেটে অবস্ট্রাক্‌শন হয়েছে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

না। ও আমি জানি।

কিন্তু অমন আন্দাজি জানায় তো কাজ হবে না। চলো কলকাতায় গিয়ে একটা রীতিমত চিকিৎসা করা যাক।

এ রোগের চিকিৎসা নেই······আমায় শান্তিতে যেতে দাও না এই রূপ-নারায়ণের তীরে, প্রভাসের সমাধির পাশে।

কী যে সব বল তুমি, বলে ঘরে জামা ছাড়তে পালিয়ে গেলাম।

শরৎ ইজিচেয়ারে বাঁকা হয়ে বসে আছেন। বললেন: আজ এ বাড়ির ছুটি। ও বাড়িতে সব্বারই নেমন্তন্ন। আজ যে ভাইফোঁটা। দিদি তো এখানে নেই তবু ওরা খুব উৎসাহ করে লেগে আছে·········তুমিও যাবে তো?

ও বাড়ি তো আমার নূতন নয়। তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে। অনেকদিন যাইনি ওখানে।

বেশ যেও।

বললাম বটে ; কিন্তু মন আমার চাইছিল না। যাবার সময় বললুম : তোমার আর গিয়ে কাজ নেই শরৎ। ও'রা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন, বলে পাঠিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন : ভারি শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে যাব, না ? সেইজন্য যেতে দিচ্ছ না ?

একটু হাসলাম, এ কথার উত্তর কী দেব ?

ফিরে এলে বললেন : তোমার সঙ্গে বসে একসঙ্গে খাইনি অনেকদিন ; ইচ্ছে করে সেই আগেকার মতো······রাতে একসঙ্গে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন নিজেই। উপরে গিয়ে দেখি : একখানা মস্ত কার্পেটের একপাশে একটা তাকিয়া, তার ওপর শরৎচন্দ্র হেলে পড়ে খেতে বসেছেন।

অস্ত যাবার সময় হেলে-পড়া চাঁদের মতোই ঠিক দেখিয়েছিল কিনা জানিনে ; কিন্তু অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করেছিলাম বলেই মনে পড়ে আজ।

পরের দিন শনিবার, কলকাতা আসার কথা। যাত্রার কোন উদ্যোগই নেই। খানিকটা বেলার পর বড়-মা এসে বললে : কৈ গো, তুমি ইস্টিশনে যাবার জন্যে তো বললে না ?

যেতে কি পারব বউ ? শরীর যে ভাল নেই।

তবে থাক্, বলে তিনি কর্মান্তরে চলে গেলেন।

শেষকালে কাহারদের কাছে খবর গেল। তারা জানে এই মানুষটির কাছে পান থেকে চুন খসার জো নেই। তারা তখুনি এসে দূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

দাড়ি কামাতে কামাতে শরৎ বললেন : দেখ্ কালীপদ, আমাকে বাচি মাছের পোনা জোগাড় করে দিতে পারিস ?

বাচিমাছ বাবু ? কী করবেন ?

পুকুরে ছাড়ব রে।

পুকুরে ? ও মাছ হবে না বাবু।

তুই তো সব জানিস ; জানিস মুকুজ্জেদের পুকুরে বাচিমাছ আছে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড়বাবু ছাড়িয়ে গেছলো ; সে সিঁদুরে বাচি। ঠিক বটে।

তবে ?

সে তো এখন পাওয়া যায় না।

যায় রে যায়। আমাকে আর শিখোতে লাগবে না।

কালীপদ অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে লাগল ; বললে : বাবু, আপনি সব জান ; তোমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আচ্ছা, এই নে, রাখ তোর কাছে। বাচি আমার চাইই চাই ; কবে দিবি ? আমি দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরব।

কালিপদ খুশী হয়ে দক্ষিণা নিলে।

মনে থাকবে ? ঠকাসনে যেন।

সময় হয়ে আসছে, বললুম : তবে আমি এগুই শরৎ। ধীরে-সুস্থে যাব।

আচ্ছা, তোমায় পথে ধরে নেব।

হিসেব করে দেখলাম গাড়ি আসার দশ মিনিট আগে নিশ্চয় পৌঁছাব, সে কেন যতই সরীসৃপগতিতেই যাই।

বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথটি। ধান প্রায় পেকে এসেছে। এলোমেলো দুপুরের উতলা হাওয়ায় মাটি আর পাকা ফসলের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। চলেছি আর ভাবছি কত কী। কিন্তু মনের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন তার নিবিড় দুশ্চিন্তার জটাজাল মাথায় নিয়ে ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে বলছে : পারবি কি ? বাঁচাতে পারবি কি, শরৎকে ?

কোলা ব্রিজের ওপর গুম-গুম শব্দ শুনে যেন হুঁশ হল। তাকিয়ে দেখি বীরবিক্রমে আসছে ছুটে গাড়িখানা। ঘড়িতে দেখি এখনো কুড়ি মিনিট বাকি। পিছন ফিরে দূরদূরান্তরে দেখলাম প্রদীপ্ত রোদের উত্তাপে কাঁপছে মাঠের ওপরের বাতাস। কিন্তু পালকি কই ? দেখতে পাওয়া যায় না! কী হল! ছুটছুট্!

প্লাটফরমের ওপর থেকে দেখতে পেলাম দূরে জীবন চাকর ছুটছে কৃষ্ণসার হরিণের মতো—পালকির আগে আগে।

জীবন হাঁপিয়ে এসে পড়ল। ওদিকে গাড়ি দাঁড়াল, কি দাঁড়াল না—আবার ফুঁকে গর্জন করে—তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল।

শরতের পাল্‌কিখানা প্লাটফরমের সংকীর্ণ প্রবেশপথে ধস্তাধস্তি করতেই রয়ে গেল।

পাল্‌কি থেকে মুখ বাড়িয়ে শরৎ বললেন : সুরেন, গাড়িখানা আটকাতে পারলে না, ইস্টিশান মাস্টারকে বলে ?

আমি যে নিজেই এসে পৌঁছাতে পারিনি। ট্রেনটা নিশ্চয়ই বিফোর টাইম ছেড়ে গেছে।

তাই কি ?

ভেতরে গিয়ে জানা গেল ট্রেনের সময়টা পনের মিনিট এগিয়েছে সে মাস থেকে। পল্লীতে সে খবর গিয়ে পৌঁছয়নি আমাদের।

তবু রক্ষে ! শরৎ বললেন : আমি আর লজ্জায় যাচ্ছিলাম না। এমনি একটা বদনাম আছে কিনা আমার।

ততঃ কিম্ ?

চলো, ফিরে যাই বাড়ি। আমি বড় অসুস্থ ; শুধু বলেছিলাম বলেই যাচ্ছিলাম।······কিন্তু তোমার যে ভারি কষ্ট হবে হেঁটে ফিরতে।

তা একটু হলই বা। জুতোটা ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে মাঠের পথে হাঁটতে আরামই···কিন্তু পথটা এখনও—

ওটা কি পথ ? ও যে বাঁধ··কত কষ্ট দিচ্ছি তোমায়। একটা পালকি নাও।

ঘোর আপত্তি ক'রে দ্রুত পথ চলতে শুরু করে দিলাম।

* * * * *

মা-কালীর প্রসাদ খেয়ে আর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অতিভোজনে শরৎ একটা সংকটময় অচল অবস্থায় এসে পড়লেন। কলকাতা যাওয়া স্থগিত রাখতেই হল।

পরের দিন সকালে নিচে এসে শরৎ বললেন : দেখো, আমার পেটের মধ্যে এই ক'দিনের খাবার গজগজ করছে। একটা কিছু উপায় না করলে তো প্রাণ যায়।

ডাক্তার ডাকি ?

তার আগেই একটা কিছু ব্যবস্থা করো।

নুন গরমজল গ্লাস দুই খেয়ে যখন পেটের বোঝাইগুলো উঠে গেল, তখন দেখা গেল চার-পাঁচ দিন যা খেয়েছেন—একটু গলেও নি—সৈনিকের মতোই সব খাড়া হয়ে রয়েছে।

সুরেন, কিছু একটা উপায় করো।

কলকাতা যাওয়া এই অবস্থায় সম্ভব নয় ; এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তার ডাকি ?

কী করবে সে ?

আর কিছু না হয় পথ্যের ব্যবস্থাটা তো হতে পারে।

ডাক্তারবাবু এলেন, ভালোমানুষ লোকটি।

অনেক গবেষণার পর স্থির হোল : তরিতরকারি, এমন কি ভাতও চলবে না। পাখির মাংসের জগ্‌ সূপ ; দুধে অরুচি ; ক্ষীর চলতে পারে।

শরৎ বললেন, আধসেদ্ধ ডিম, ডাক্তার ?

তাও খাবেন ? আচ্ছা চলবে ও।

না, না, ডিম আমার খুব সহ্য হয় ; পেটে একটুও হাওয়া হয় না।

বেশ চলুক, দেখুন কী রকম থাকেন।

ডাক্তার গেলে শরৎ বললেন : সবাই ফেলছে অন্ধকারে ঢিল। কোনটাই লাগে না। চলেছে এক্সপেরিমেণ্টের পর এক্সপেরিমেণ্ট।

সত্যি ! দিন চারেকের মধ্যে দেখা গেল, যে তিমির সেই তিমির। সেই বেঁকে বসা ; সেই ঘন ঘন ঢেঁকুর ; সেই আইঢাই, সেই যাই-যাই !

একদিন শরৎ ডেকে পাঠালেন।

কী শরৎ ?

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দেখালেন : দেখছো এই গাছটা ? এটা ছিল একটা ল্যাংড়া আমের গাছ—কী দশা হয়েছে এর ? সোজা সুন্দর ছিল গাছটি ঝাঁকড়া পাতা ভরা ; এখন নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত পাতাগুলি শুকিয়ে গেছে। বললেন শরৎ, গত বছর খুব ফলেছিল, চমৎকার এত বড় বড় আম, কী মিষ্টি কী সুন্দর ছিল এর স্বাদ—আজ কোথাও কিছু নেই, এই দশা। বলো তো ব্যাপার কী ?

গাছটার দিকে সত্যি যেন চাওয়া যায় না। দেখলেই মনে হয় : নিকট ভবিষ্যতে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার অমোঘ সূচনা।

ঠিক সেই কথাই বোধ হয় তাঁর মনেও জেগেছিল। আমি কী বলি তার প্রতীক্ষায় আছেন যেন শরৎ। একটু অতর্কিতে, একটা উল্টাপাল্টা বলে ফেলাই স্বাভাবিক ; কিন্তু আমাকে অতিশয় সতর্ক হতে হয়েছিল। তাই বললাম : এদেশের মাটি বোধ হয় আমগাছের অনুকূল নয়। আমাদের ওখানে এমনি ফুলেফলে পেঁপেগাছগুলো যায় শুকিয়ে।

দেখছো না পোকা কী রকম। একটা লাইন ধরে চারিদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে কুরে কুরে খেয়েছে ? কী ব্যবস্থা করি বলো তো ?

পোকা মারা, গোড়ায় সার দেওয়া, লোনা কাটানো এবং মাঝে মাঝে প্রচুর জল দেওয়া।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তবে বাকি গাছগুলোর করিয়ে দি ? বোল ধরার সময় তো আসচে।

পরের দিন থেকে গাছের গোড়া খুঁড়ে—খোলেজলর, চুন, শিংএর জল

দেওয়া চললো। ছাতা মাথায় শরৎ বসে আছেন। দেখছেন ফাঁকি দেয় কিনা লোকগুলো।

খানিকটা বেলা হলে গিয়ে বললাম: আজ আর ওদিক মাড়ালে না বড় ?

তুমি যে খোলা হাওয়ায় থাকতে বলেছ। খোলা হাওয়ায় কিছু হয় কিনা জানিনে; কিন্তু এদের কাজের কাছে থাকতে বেশ লাগছে; আজ শরীরটাও ভাল বোধ করছি। অন্ততঃ যন্ত্রণা সব ভুলে গেছি, সেটাই সবচেয়ে বড় লাভ।

সেদিন জানতাম না যে, ঐ ব্যাধির আর কোন চিকিৎসা ছিল না; শুধু ভুলে থাকাই ভাল থাকার একমাত্র উপায়।

এই খেলাই শরৎ অতি বিচিত্র এবং অপূর্ব ভাবে শুরু করে দিলেন। ফুটে-যাওয়া রজনীগন্ধার গ্যাজগুলো রোদ হাওয়া লাগার জন্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়াতে লাগলেন। কোথা থেকে এল গ্যাঁদার চারা। মৌসুমী ফুলের বীজ কী করে পাওয়া যায় ভেবে ভেবে শরৎ একেবারে অধীর, আকুল, উতলা।

আমি হাসি।

শরৎ বলেন: ও আমার একটা মহা দোষ। যা মনে হবে তা তক্ষুনি চাইই চাই, নইলে গেলাম আর কী।

ইম্পেসেন্স অব জিনিয়াস্!

বড় বদ রোগ আমার ওটা কিন্তু।

আচ্ছা একটা উপায় দেখা যাক্—

উঠেবসে উৎসাহে এবং আনন্দভরা চোখ চেয়ে বললেন: কী বলো তো ? সুবোধকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি বীজ পাঠিয়ে দেবার জন্য।

সুবোধ, কে সুবোধ ?

চুঁচড়োর গো।

ও আবার বীজ পাবে কোত্থেকে ?

নিজের বাড়িতেই, ওদের যে ভারি ফুলের শখ।

তাড়াতাড়ি লেখার সরঞ্জাম বার ক'রে দিয়ে বললেন: বলে দাও আমার না হলেই নয়, চাইই চাই।

এমনি করে পুকুরে মাছ ছাড়িয়ে, ফলফুল গাছের গোড়া খুঁড়িয়ে—তাতে সার দিয়ে, বিকেলে দাবা খেলে, শরৎ নিজেকে ভোলাতে লাগলেন। কিন্তু রোগ তাঁকে ভুলে রইল না।

এর ওপর চলেছে দুর্দান্ত আত্মচিকিৎসা; ট্যাকাজাইম থেকে মিল্ক অব

ম্যাগনেসিয়া ; থাবা থাবা সোডা, গোটা দুই করে একসঙ্গে জেনাস্পিরিন, এমন দু-চার বার দিনে। অবসন্ন বোধ করলে—উনৃকানিশ নির্জলা।

••• ••• ••• •••

নিচে নেবে এসে সেদিন শরৎ বললেন : যে রেটে আমার জোর কমে আসচে তাতে আর দু-চার দিনের মধ্যেই ওপরে উঠতে পারব না দেখচি।

সত্যিই জোর কমে আসছিল। চলন আর তেমন বলদৃপ্ত নেই। পা-দুখানি শীর্ণ সরু হয়ে গেছে—আর তাতে একটা অবসন্ন লটপট ভাব। মনে হয় ওরা চায় এবার সুদীর্ঘ বিশ্রাম।

বললাম : তোমার এই আন্দাজি চিকিৎসায়, পেটেন্ট ঔষধের বান ডেকে যাওয়ায় ব্যর্থতা হওয়াই তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞান ভালবাস বল, এ কী অবৈজ্ঞানিকের কর্মপদ্ধতি? তুমি এদেশে বসে যদি জাহাজ জাহাজ পেটেন্ট ওষুধ খাও তো টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না।

চেয়ারের ওপর শুয়ে পড়ে তিনি বললেন : বাস্তবিক। বোধহয়, এই ক'মাসে তিনশো টাকার বাজে ওযুধই ফেললাম খেয়ে।

সেইখানেই যদি লেঠা চুকে যেতো তো বেঁচে যেতুম। ওগুলো তোমার পেটে ঘা না করে দেয়—এটাই আমার সবচেয়ে দুর্ভাবনা।

মানা কর না কেন?

শুনবে তুমি?

নিশ্চয়।

বেশ, আমি বলি ছাড় আগে সোডা আর জেনাস্পিরিন।

রাজী আছি তাতে যদি ঘুমের অসুবিধা না হয়।

খাওয়াও তোমার বদলাতে হবে। তোমাকে সম্পূর্ণ তরল খেয়েই থাকতে হবে। কঠিন জিনিস যে কিছুই সহ্য হয় না।

কিন্তু ওতে যে আমার কিছুমাত্র রুচি নেই।

জানি, কিন্তু ভাত কি লুচি—শক্ত জিনিস খেলেই তো তোমার কষ্টের শেষ থাকে না—তা তো বুঝতেই পার শরৎ!

মুশকিল করলে দেখছি, বলে চুপটি করে বসে রইলেন শরৎ।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে। নদী থেকে ঝড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া উদ্দাম হয়েই ছুটে আসছে—সেদিন আর ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না।

লেখার ছোট ঘরটির সামনে শরৎ গুটিশুটি হয়ে চেয়ারের ওপর শুয়ে আছেন। ঘরের মধ্যেও যাবেন না, বিছানাতেও শোবেন না।

মেঘমলিন ছায়াচ্ছন্ন দিনের অবসানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করছি :

ক্ষীর সহ্য হয় না, দুধে অরুচি, শুধু ওট-মীল পরিজ খেয়ে কি চলে, মশাই ?

কিন্তু ডাক্তার বলেন : উপায়ও তো নেই, কলকাতায় নিয়ে যান না। একটা সুচিকিৎসা না হলে······

এমন সময় ঝড়ের গতিতে একটা পালকি এসে পড়ল। তা থেকে নেবে এলেন মাথায়-টুপি-পরা একজন হিন্দুস্থানী যুবক।

এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন : শরৎবাবুর বাড়ি ? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তিনি বড় অসুস্থ—ঐ বসে আছেন।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে যুবকটি কাছে গিয়ে বসে বললেন, এ কী হয়েছে আপনার ?

শেষের পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। দেখছো না ভাই।

যুবকটি স্তব্ধ হয়ে কাছে বসে রইল। আলো এলে দেখা গেল, শরৎ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। একখানা হাত টেনে নিয়ে বিদেশী বন্ধুটি বললেন : চলুন আমাদের দেশে। সেখানকার জল, সেখানকার হাওয়ায় আপনি মোটা তাজা হয়ে উঠবেন।

এই বয়সে ? শরৎ জিজ্ঞেস করলেন।

কী বয়স আপনার ? আমাদের দেশে সত্তর বছরের বুড়োর ছাতিও (বুক) এত্তখানি উঁচু···চলুন আপনি সেই দেশে !

সেই অবিশ্বাসের হাসি।

লক্ষ্ণৌএ যুবকটির বাড়ি। কনখলে তাদের হাওয়া বদলাবার বাড়ি আছে। সেইখানে গিয়ে থাকার অনুরোধ করলে, শরৎ উৎসাহভরে উঠে বসে বললেন :

কিন্তু ভারি যে শীত হবে সেখানে। আমি কি সে শীত সহ্য করতে পারব ?···আচ্ছা ভেবে দেখি। পরশু আমি কলকাতা যাব। সেখানে গিয়ে তোমায় চিঠি দেব। তারপর তুমি সব ঠিক কোরো। দিস্তেখানেক লুচি উড়িয়ে সবল-সুন্দর দেহ নিয়ে যুবকটি পালকিতে চড়ে বসে ঝড়ের মতোই ইস্টিশনের দিকে ছুটলেন শেষ ট্রেন ধরবার জন্য।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্ট গবাক্ষ খুলে দিয়ে যেন তারার আলো দেখে আর মুক্ত আকাশের হাওয়া খেয়ে আমরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম !

তা হলে পরশু যাওয়া হচ্ছে কলকাতা।

অটল হয়ে দেশের বাড়িতে থেকে মৃত্যুকে কঠোর আলিঙ্গন করার এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের নিষ্পেষণে আমরা যেন দম আটকে মারা যাচ্ছিলাম!

ডাক্তার যাবার সময় কানে কানে বলে গেলেন: আর-একদিনও দেরি করবেন না—এই সুবর্ণ সুযোগ!

আশা হল; কিন্তু তার চেয়ে বড় ভয়: মত বদলাতে কতক্ষণ!

শরৎ-কথা

মনোজ বসু

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয় চাঁদ স্নিগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে ; এ আমার—একেলা আমার। ভাবতে হয়তো ব্যথা লাগে, চাঁদের এই স্মিতদৃষ্টি সকলেরই ওপর। শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেও অমনি একটা ভাব মনে হত। মানুষের ওপরে এমন দরদ আর কোথাও দেখিনে।) তিনি মুখেও বলতেন মানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। আমার সব গল্পই মানুষের গল্প। মুখে যাই বল না কেন, তোমরা মানুষের গল্প শুনতে চাও, তাই আমাকে এত ভালবাস।

সামতাবেড়ের পল্লিবাসে শরৎচন্দ্রকে দু-একবার দেখেছি। বালিগঞ্জের শরৎচন্দ্র ছিলেন চাল-চিত্রহীন প্রতিমার মত। পল্লীর আবেষ্টনের মধ্যে তাঁকে যে না দেখেছে সে তাঁকে উপলব্ধি করবে কী করে? মনে পড়ে সেটা শীত-কাল। উঠান ও বারান্দা ভরে গেছে, গ্রামের নানাবয়সী স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানে ইজিচেয়ারে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র। পাশেই এক বাঁশের চোঙাভরতি ফাউণ্টেন পেন। স্টিমার থেকে নেমে অবশেষে বালির চড়া ভেঙে উঠানে পৌঁছনো গেল। সস্নেহে আহ্বান এল—এসো এসো এসো।

সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্তি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করা গেল। শুধু পয়সা দিয়ে দায় সারা নয়; ঘরগৃহস্থালীর সব খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন, তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

—ভাল আছে দাদাঠাকুর, তোমার ওষুধ ধন্বন্তরি।

কিন্তু ছেলেটিকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি। ভেসে ভেসে শেষে ঐ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে, শকুনে এসে ভিড় করে এসেছে—দেখে থাকতে পারলাম না—তুলে আবার মাঝনদীতে ফেলে দিয়ে এলাম—বামুনকে দিয়ে শেষে মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হাঁ রে ছবির মা?

বুড়ো ছবির মা আঁচলে চোখ ঢাকল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় কিসের একটা সভা—শরৎচন্দ্র সভাপতি। খাওয়া-দাওয়ার পর কজনে মিলে রওনা হয়েছি—দেউলটি এসে ট্রেন ধরতে হবে।

—দাদাঠাকুর—

সর্বনাশ, পেছন ডাকে! তুলসীবাবু সভয়ে বললেন—বিপদ-টিপদ না ঘটলে বাঁচি।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঘটবে বলেই তো ঠেকছে। সভাপতি করেছে—বক্তৃতা না শুনে কি ছেড়ে দেবে সহজে ?

দু-তিনটে লোক মাঠের দিক দিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—আবার চলেছ কলকাতায় ? এই যে বললে পায়ের ধুলো দেবে সকালবেলা।

শরৎচন্দ্র বিব্রতভাবে বলে উঠলেন—দেবো—দেবো। রাত্রেই ফিরে আসছি—

লোকটা কিন্তু একবিন্দু প্রত্যয় করল না। ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ, আসতে দিচ্ছে তারা ? বেচারা আমি, আমার দিকেই তারা কটমট করে তাকায়। বোঝা গেল অপরাধী আমাকে ঠাউরেছে। কলকাতা থেকে এক-একটি দুর্গ্রহ এসে তাদের দাদাঠাকুরকে টেনে নিয়ে যায়, এটা তারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ হে তুলসি—শিগ্‌গির যদি কাজ চুকে যায় আজই ফিরতে হবে কিন্তু।

তারপর ঐ চাষাভুষোদের কথাই চলল। তারা জানে না তাদের দাদাঠাকুরের আলাদা কোন রকম স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সভাসমিতি উপলক্ষে যারা এসে শরৎচন্দ্রকে গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের উপরে এদের মহা রাগ। হাসিমুখে শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, একদিন কিন্তু আমার সত্যি সত্যি বড় দুঃখ হয়েছিল। একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, সেটা পড়াবার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে। এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে পাঁড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি সেইখানটায় বসে। অথচ এতগুলোর মাঝে একটা লোকেরও মনে এই কথা জাগল না যে টেলিগ্রাম পড়ার মতো ইংরাজি-বিদ্যা দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে।

সকালবেলাকার সেই ছবি মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহকল্প—অন্তত বয়সের দিক্ দিয়ে—সত্বরই পরমাগতি লাভ করলেন ; রইল মেয়েটি আর তার অটুট স্বাস্থ্য। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা নাকি কোন কোন সমাজমণির বংশদুলালকে খারাপ করেছে। বংশদুলালেরা সে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয়। বিপন্না মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে—সেটিও আগের দিন মারা গেছে।

সেই ছবি ও তার মা কোথায় আছে কেমন আছে জানি না। দাদাঠাকুরের

বিয়োগব্যথা তারা কিভাবে নিয়েছে ! আমাদের কাছে শরৎচন্দ্র বেঁচে আছেন তাঁর চিরজীবী সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। তাদের তো কিছুই রইল না।

সেকালে দেশে অন্নের অভাব ছিলো না, হৃদয়েও ছিলো তেমনি অবাধ প্রাচুর্য। জ্ঞাতি বন্ধু আপনার নিয়ে বৃহৎ সংসার, অগুনতি ঘর, বাড়িতে অতিথি এলে ঘরের গোলকধাঁধা ভেদ করে সে বেচারা আর বেরুবারই পথ পেত না। আর কষ্টে কষ্টে পথ যদি বা মিলল, গৃহকর্তা অমনি আগলে দাঁড়ালেন—না হে, এতবেলায় আর যায় না—চলো, চলো, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসিগে। আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র সেই মজলিশী জাতের শেষ বংশধর। বিংশ শতাব্দীর কর্মব্যস্ত মানুষ আমরা—কিন্তু তাঁর কাছে গেলে সাধ্য কি যে উঠে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লঘুপক্ষ পাখির মতো উড়ে পালাচ্ছে—কাজের ক্ষতি হচ্ছে, মন ব্যস্ত—তবু বসে থাকতে হবেই। কত গল্প, নিজের সম্বন্ধে, আশেপাশের দশজনের সম্বন্ধে, সাধারণ সাধারণ কত কী কাহিনী। একদিন তাঁকে বলেছিলাম—আপনার গল্প মগ্ন হয়ে শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করিনে।

শরৎচন্দ্র বললেন—জীবনটাই তো ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে গেলাম ভাই। তোমরা সব স্কুলে-কলেজে কত খাটুনি খেটে পড়াশুনা করেছো, সে সময়টা আমি ফাঁকি মেরে তামাক খেয়ে কাটিয়েছি।······তারপর খালি মিথ্যে কথা লিখে-লিখেই এত ভালবাসা কুড়িয়ে গেলাম।

আর-একদিন বলেছিলেন—আমার লেখার মধ্যে সবাই আমাকে খোঁজে। কেউ বলে আমি গোঁড়া হিন্দু, কেউ বলে আমি একজন নাস্তিক। কেউ বলে 'চরিত্রহীন' বইটায় আমার নিজের কাহিনী রয়েছে, কেউ বলে শ্রীকান্ত আমারই আত্মজীবনী। আমায় নিয়ে সবার কথা কাটাকাটি চলে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে হাসি।

আমি বললাম, আপনি মায়াবী। চরিত্রগুলোকে এমন জীবন্ত করে এঁকেছেন যে মিথ্যে বলে কেউ মানতে চায় না।

একটুখানি ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—মিথ্যাও হয়তো তারা নয়, জীবনে কত মানুষ দেখলাম, কত রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। লিখবার সময় সেই সব মানুষের মধ্যে ডুব মেরে বসি। তখন আর সম্বিৎ থাকে না।

মনের মধ্যে আসন জুড়ে বসবার শক্তি যে তাঁর কত বড় সমগ্র দেশের মানুষ আজ তার সাক্ষী দিচ্ছে। শিল্পী পরৎচন্দ্রের কোন দিন মৃত্যু হবে না, কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্রের সঙ্গ যারা চিরদিনের মতো হারাল, তাদের দুঃখের পরিসীমা নেই।

ঘরের মানুষ শরৎচন্দ্র

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়

যার জন্য সাধনা নেই, আয়োজন নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সে বস্তুকেও মানুষের আদর কত! ক্লেশলেশহীন সুদূর যাত্রাপথের নিঃসঙ্গতার পথে যদি সাথী এসে জোটে; অনেকের কাছে সে যেন পরম বিত্ত। যাত্রাশেষে সে সাথীর জন্য বুঝি বা বিচ্ছেদবেদনাও জাগে।

কিন্তু সে ঈপ্সিত যদি মনের মতো হয়ে আসে তার চেয়ে আর প্রিয় কে আছে? যার জন্য প্রদীপ জ্বেলে পথ আলো করে রেখেছি, পরম আকাঙ্ক্ষিত মানুষটি যদি লগ্ন মেনে নাচ-দরজায় এসে দাঁড়ায়—হাসিমুখে বলে "এসেছি" তাকে কি না ভালবেসে থাকা যায়?

বাঙালীর জীবনে শরৎবাবুর আবির্ভাব আমার মনে এমনি একটি ছবি ফুটিয়ে তুলে। বিয়ের রাত্রে বরের আবির্ভাবের মতো—আবশ্যক—অবশ্যম্ভাবী, প্রিয় এবং প্রার্থিত হলেও এ আগমন আকস্মিক। চাইছি বলেই পাব এমন সৌভাগ্য কয়জনের? কিন্তু পাওয়া গেল!

এমন শরৎ-সংবর্ধনায় তাই আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের উৎসব মিলে একটা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল—প্রশ্ন, সন্ধান আর কৌতূহলের অন্ত নেই—এবং যেদিন জানা গেল অপরিচিতের বেশে এলেও তাঁর চারপাশে কোন রহস্য নেই, জটিলতা নেই, আমাদের ঘরের মানুষ, বাঙালী—সেদিন মনেপ্রাণে সুখী হয়েছি। আত্মীয়বিয়োগের মতোই আজ শরৎবাবুর তিরোভাব তাই মর্মান্তিক।

... ...

শরৎবাবুর উদয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা অনিবার্যতা ছিল। তিনি আপন মহিমায় যে আসন দখল করেছিলেন বাঙালীর মনে সে আসন পাতা ছিল, এই আগমনের অপেক্ষা করে। না এলে যেন চলত না—অসম্পূর্ণতা থেকে যেত।

শরৎবাবু এলেন যাকে বলে সাজানো রঙ্গমঞ্চে। একশ বছর ধরে বাংলায় নব-জীবনযজ্ঞ চলেছে—বিরাট সব মানুষ বাংলার মাটিতে বিচরণ করেছেন—রামমোহন এসেছেন, বঙ্কিম এসেছেন, ভূদেব, মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—শান্তির মন্ত্র নয়, যিশুর মত সকলেই এনেছেন—নিশিত তরবারি। আত্মবিস্মৃত জাতিকে নবজীবনের দীক্ষা দেবার সে কী মহামহিম আয়োজন। আকাশে বাতাসে বিপ্লবের বাণী, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্যোতনা।

বাঙালী ভয় পেয়েছে, অভিমান করেছে, দ্বন্দ্ব করেছে—কিন্তু বিরাটের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনি—অপ্রস্তুত সুপ্তিমগ্ন গ্রামে বন্যার অতর্কিত আক্রমণের মত এসেছে বিরোধী ভাবের প্লাবন। ভাবালুতার অন্ধকারে শত্রুমিত্র নির্ণয় হয়ত কঠিন হয়েছে—পথ ভুল করেছে, কিন্তু বাঙালী যুদ্ধবিরতির সাদা পতাকা হাতে নিতে লজ্জা পেয়েছে। সে এক অপূর্ব কাহিনী—বাঙালীর বিচিত্র ইতিহাসে সে এক নব-পর্যায়।

প্লাবনের শেষে পলির মত ভাব। দ্বন্দ্বের বিরতিতে দেখা গেল জাতি লাভ করেছে—নূতন মতি, নূতন গতি, নবনিষ্ঠা ও অভিনব দৃষ্টি—এবং সবচেয়ে নূতন যে, এই পরম প্রাপ্তিকে ব্যক্ত করবার মত সে পেয়েছে শক্তিমতী বাণী। 'আবার মানুষ হবার' আশা নিয়ে জাতির অগ্রসর হওয়ার কাহিনী হয়তো অনেকের কাছে অপরিচিত নয়।

কিন্তু বিরাটের জয়তিলক আঁকা এই বীরের ভিড়ে সাধারণ বাঙালী যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বাংলার সে যুগের এই অসাধারণ মানুষগুলি যেন পর্বতশিখরের মতো দুরধিগম্যতার মহিমায় আসীন। নাগরিক জীবনে মানুষ মানুষকে জানতে পায় না, জানবার চেষ্টাও করে না—এই না জেনে থাকায় সে অভ্যস্ত। গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব অপরিচয়ের অপূর্ণতা মানুষকে পীড়া দেয়। পরিচয়ের বা আয়ত্তের অতীত লোকে যে থাকে তাকে নিয়ে অনাগরিকের অস্বস্তির আর সীমা নাই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক এমনি একটি অস্বস্তি বাঙালীকে ক্ষুব্ধ করেছিল। দুরূহ ভাষা, দুরারোহ ভাবশিখর এবং সুদুর্লভ সঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে অনেকদিন তাদের কাছে পর করে রেখেছিল।

সান্নিধ্যলোভী বাঙালী তাই এমন একটা মানুষের আশায় মনে আসন সাজিয়ে বসেছিল—বাইরের হলেও যিনি ঘরের বলে উৎসব করা যায়। 'দাদা' বলে একছুটে কাছে যাওয়া যাবে, হাসিমুখে কথা কইতে বাধবে না এবং ভেবে কথা বলতে হবে না—তবে না আপন?

এ হেন সময় এলেন শরৎচন্দ্র—প্রার্থিত এ আবির্ভাব—এমন আপন করে এ অসামান্যকে বাঙালী কোনদিন তার চণ্ডীমণ্ডপে পায়নি। যতটা আশা ছিল, শরৎচন্দ্র নিঃশেষে তা পূরণ করেছেন এবং কৃতার্থতার নির্বাধ আনন্দে জাতি তাঁকে আদর করেছে।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের একটি বিশেষত্ব—তা আকস্মিক। ছোট বড় ভাল মন্দ রচনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে হয়নি। তিনি এলেন সাজানো রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ সজ্জায় পরিপূর্ণ ভূমিকায়।

"মন্দির", "বড়দিদি" হয়তো সাধারণ বাঙালী পাঠকের অন্যমনস্ক দৃষ্টি এড়িয়েছে, কিন্তু "বিন্দুর ছেলে", "রামের সুমতি" প্রমুখ রচনাবলী থেকেই জাতির শিক্ষিত দলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত। বাণীসেবার বলিষ্ঠ নিষ্ঠায়, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে, অপূর্ব প্রকাশকৌশলে তিনি যেন সামান্য কালের মধ্যেই চিরপরিচিত হয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য নিতান্ত অল্প, বেশী করে হিসাব করলেও তা ঘণ্টা দশেক হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পড়ার ঘরে প্রথম পরিচয়ের চিত্রটি আজও আমার মনে অম্লান।

সেদিন শরৎবাবু এনেছিলেন গ্রামের গন্ধ। তাঁর দৃষ্টির, ভাষার ও ব্যবহারের ঋজুতায় ছিল গ্রামজীবনের আন্তরিকতা। সে সন্ধ্যার আবেষ্টনের মধ্যে শরৎবাবুকে খাপ খাওয়ানো মুশকিল। অথচ বুঝতে দেরি হয় না যে তার মধ্যে 'কায়দা' ছিল না। যদি কোথাও originality থাকে সে তার sincerityর রূপভেদ মাত্র।

প্রত্যেক মানুষের একটা বিশিষ্ট গতি আছে। গতির নিয়মে ছন্দ মেনে চলার মধ্যেই যেন জীবনের সার্থকতা। ছন্দচ্যুতির মধ্যে থাকে পরিণতি-হীনতার দ্যোতনা। আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের ছন্দ ছিল এই আন্তরিকতায়।

মুখোশ পরে বিরাটের অভিনয় করবার যার সাধ, সে শুধু বিদ্রূপ কুড়োয় —মানুষের যদি কোন সাধনা থাকে সে কেবল আপন হবার। আপনাকে অতিক্রম করবার কল্পনা, পৃথিবীর বাইরে যাবার ইচ্ছার মতোই অসার, হাস্যকর।

যে সকল রচনায় শরৎচন্দ্র 'দেশের দুলাল' তার মধ্যে তাঁর এই আন্তরিকতা সরল ও সবল আবেগে রূপায়িত হয়েছে। বোধ ও দৃষ্টি এত পরিচ্ছন্ন যে আয়াসের চিহ্নমাত্র নেই। বিরাট বোধের জটিলতাহীন রচনাবলী বাঙালী পাঠককে সেদিন অপূর্ব তৃপ্তি দিয়েছিল। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ের "দুর্বোধ্য" রস গ্রহণচেষ্টার ক্লেশ থেকে শরৎচন্দ্র তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

অতিসান্নিধ্যের ফলে যা ছিল নগণ্য, অতিপরিচয়ে যা ছিল অবহেলিত তার সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের আবেশ শরৎচন্দ্রের রচনায় যে লীলায় প্রস্ফুটিত তেমন আর কোনদিন বাংলায় হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা বাংলার ঘরের কথা, কিন্তু সে ঘরে থাকে পুরন্দর আর শ্রীগোরা আর বিনোদিনী—ইন্দ্রনাথের 'দিদি'র সেখানে যাবার সাহস হত কি? বিশেষ

নয়, কুলি বাঙালী নির্বিশেষে যে ঘর আশ্রয় করে আছে শরৎচন্দ্র তাদের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

বাঙালীকে শরৎবাবু দিয়েছেন তার আশার অতিরিক্ত—কিন্তু মনে হয় তার অপেক্ষা এবং তার সাধ যে তিনি পূরণ করেছেন, এতেই বাঙালী চির-কৃতজ্ঞ. চিরকৃতার্থ।

সাহিত্যচিন্তা : শরৎচন্দ্র

ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

যুগটা ছিল রবীন্দ্রনাথের। বিশ্বসভায় বাঙলা সাহিত্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। স্বদেশে তখন তাঁকে ঘিরেই চলছে নানা উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক। রবীন্দ্র-বিরোধী ও রবীন্দ্রভক্ত স্পষ্টতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন বাঙালী পাঠকেরা। রবীন্দ্র-বিরোধীদের মধ্যেও অবশ্য প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন অনেকে। বাঙালীর ভক্তিপ্লাবিত মনে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ 'গুরুদেব' হয়ে উঠলেন। ফলে রবীন্দ্রপ্রেমিকের স্তুতিবাদ কখনও কখনও সাহিত্যবিচারের সীমা অতিক্রম করে গেল। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্র-বিরোধীর ক্রোধও সাধারণ যুক্তিবুদ্ধির শাসন গেল অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিরোধীরা উপস্থিত করতে চাইলেন কোন এক শক্তিমান লেখককে। শরৎচন্দ্র তখন 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' লিখে যশ কুড়িয়েছেন, 'চরিত্রহীন', 'বিরাজ বৌ', 'পল্লী-সমাজ' লিখে অপযশ কুড়িয়েছেন। 'যশ' ও 'অপযশ' দুইয়ের পিছনেই কিন্তু ছিল সাহিত্য-সমালোচকদের তথাকথিত নীতির প্রতি অন্ধনিষ্ঠা, সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে সদামনস্কতা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রকে ঘিরেও চলছিল বিভিন্ন ধরনের মতবাদের ঝড়। রবীন্দ্রনাথের তৈরী পথে তিনি চলছিলেন না। যা হোক কিছু নতুন ঢঙে নতুন কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। তথাকথিত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। জীবনের নানা ঘাট থেকে জল তুলেছিলেন এবং সে জল তীর্থ সলিল-এর মত পবিত্র ছিল না। ফলে একদল রবীন্দ্র-বিরোধীর কাছে শরৎচন্দ্র ক্রমে তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন শরৎচন্দ্রেরও বিরোধী। অন্ততঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম এই প্রসঙ্গে করা যায় যাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতা সর্বজনবিদিত এবং যিনি শরৎ-চন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস কিছুতেই তাঁর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করতে সম্মত হন নি, যেহেতু এই উপন্যাসে নীতিশাস্ত্রের ও তথাকথিত সমাজ-স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু বর্ণিত ছিল। কিন্তু ১৩৩০-এর পর যখন বাঙলা সাহিত্যের জগতে কালাপাহাড়ি প্রমত্ততা নিয়ে 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'কে নির্ভর করে এলেন নব্যতন্ত্রীরা তখন শরৎচন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন তাঁদের প্রধান ভরসাস্থল। বলা যায় নবীনেরা রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলেন শরৎচন্দ্রকে সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁরই আড়াল থেকে। ১৩৩৪-এর শ্রাবণের 'কল্লোল'-এ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখা হল 'তাঁহার

চিত্ত হোমানলের মত উপর দিকে উঠিয়া সুন্দরের মাঝে সত্যকে খুঁজিয়াছে, মলিনতার ভিতর নামিয়া তাহারও ভিতর যে পরম সত্য লুকাইয়া আছে—তাহার সন্ধান-লুব্ধ হয় নাই।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কাজে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, নবীনদের মতে, শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শক্তি প্রমাণিত হয়েছে সেক্ষেত্রে—'জীবনের এই পাপের দিকটার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়'। স্পষ্টতঃই নব্যতন্ত্রীদের আকর্ষণ দেখা গেল শরৎচন্দ্র সম্পর্কে। এদিকে 'পথের দাবী'র (১৯২৬, ৩১শে আগস্ট) প্রতি রাজরোষ এবং এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আনুকূল্য কামনা করেও শরৎচন্দ্রের ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে অভিমান পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল। রবীন্দ্র-বিরোধীরা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করার জন্য এতদিন খুঁজছিলেন একজন শক্তিমান লেখককে আর শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আচরণে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। সুতরাং যাকে বলে দুই-এ দুই-এ মিলে 'চার' হয়ে গেল। রবীন্দ্র-বিরোধীদের ভরসা হিসেবে শরৎচন্দ্র আত্ম-প্রকাশ করলেন। যদিও শরৎচন্দ্র নিজে রবীন্দ্রভক্তির কথা বারবার জানিয়ে এসেছেন বন্ধুজনের কাছে, তবু এবার সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-বিরোধিতা উগ্র হয়ে উঠল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'-(১৩৩৪ শ্রাবণ) প্রকাশের পর।

তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নব্যতন্ত্রীদের বিদেশ থেকে ধার-করা 'বে-আব্রুতা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বললেন—'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্যপদার্থ ; ভুলে যান, তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না।······এখানকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।' এই 'আধুনিক সাহিত্য'কে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করলেন 'হোলি খেলার দিনের চিৎপুর রোড'-এর সঙ্গে। বললেন, আধুনিক সাহিত্যিকেরা বিদেশের হাট থেকে হট্টগোল আমদানি করছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরের মাসেই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিকে আক্রমণ করলেন 'রসরচনা' বলে। যুক্তি, যুক্তিহীন উত্তেজনা সব মিলে নরেশচন্দ্রের সেই রচনা ধাবিত হল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শায়কের মতো। নরেশ-চন্দ্রের প্রবন্ধটি স্মরণে রেখে শরৎচন্দ্র আক্রমণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। প্রথমত, নব্যতন্ত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয় এবং তখন তাঁরাই তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয়তঃ, 'পথের দাবী'র অভিজ্ঞতাও তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

সম্পর্কে বেদনা সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয়ত, সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য মৌলিক না হলেও কিছু গুরুতর প্রভেদ ছিল উভয়ের মধ্যে। 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে (১৩৩৪-এর 'বঙ্গবাণী' আশ্বিন) শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নব্যতন্ত্রীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে বললেন, 'কবি তো থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচিধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল কালিকলমের দল?' সর্বোপরি 'আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্র নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের এই আক্রমণ কিছুটা ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়াল। আসলে নব্য-তন্ত্রীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেমন মাঝে মাঝে নির্দয় মন্তব্য করেছেন, স্বদেশে ও অন্যত্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে এঁদের সাড়ম্বর আবির্ভাবের দিকে কটাক্ষ করেছেন, এঁদের পরিণতি সম্পর্কে সংশয়জড়িত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তেমনি নবীনদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন যাঁরা, তাঁরাও রবীন্দ্র-দূষণে মাত্রা রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে সাহিত্য-সমালোচনার নান্দনিক দিকটা তিরস্কৃত হল; সাহিত্য-তত্ত্বের মূল সত্য সম্পর্কে সকলেরই অল্পাবিস্তর বিস্মরণ ঘটল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য, প্রথমাবধি রসের সপক্ষে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে এসেছেন এবং তথাকথিত বাস্তবতা সম্পর্কে বিরূপতা। বাস্তবের যে সংজ্ঞা সাহিত্যের জগতে তিনি গ্রহণীয় মনে করতেন তা য়ুরোপীয় 'realism'-এর সঙ্গে মিল খায় না। য়ুরোপীয় 'রিয়ালিজম', 'ন্যাচারালিজ্‌ম্' এবং আরও পরে 'ডাডায়িজ্‌ম্' বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ, প্রাচীন মূল্যবোধের প্রতি বিরূপতা, অর্থনৈতিক কারণে জীবনের মাত্রা পরিবর্তনের স্বরূপ বিষয়ে সজ্ঞানবোধ নিয়ে সাহিত্যের জগতে গভীর ও ব্যাপক আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল গত শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে। সাহিত্যের জগতে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু ও ধ্যানধারণার এই অনুপ্রবেশ রবীন্দ্রনাথ কদাপি সহজ মনে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর ভক্ত বাঙালী সাহিত্যরসিক ও স্রষ্টারা চোখ ফেরালেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের এই নবীন জীবন-ভাবনার দিকে। শরৎচন্দ্র মনের দিক থেকে ছিলেন এঁদেরই একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতা করে জানালেন, 'বিজ্ঞান তো কেবল অপক্ষ-পাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্যকারণের সত্যকার সম্বন্ধবিচার'। শরৎচন্দ্র 'বিজ্ঞান'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তা নিঃসন্দেহ গ্রহণযোগ্য। হয়তো বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার সম্পর্কে এক ধরনের সশ্রদ্ধ কৌতূহল নিয়ে

'মেরিনেত্তি'র মতো কবিরা কাব্যের ক্ষেত্রে শুধুই যান্ত্রিক শব্দের সন্নিবেশকে কবিতা বলে চালাতে চেয়েছিলেন এই শতকের গোড়ার দিকে (যদিও তাঁরা নিজেরাই এক সময় এইজাতীয় প্রচেষ্টার সীমা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে-ছিলেন)। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়াও আমাদের চোখে পড়েছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেই। নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা বিজ্ঞানেরই অনিবার্য কুফলরূপে অনুভূত হতে লাগল একদল সাহিত্যিকদের মধ্যে। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে সাহিত্যের বিষয়রূপে স্বীকার করে নেওয়া আর বিজ্ঞানের প্রথম শর্ত কার্য-কারণে বিশ্বাস—দুটো আলাদা জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল, ইকনমিকসের অধ্যাপক, বায়োলোজির লেকচারার ও সোসিওলোজির স্বর্ণপদকপ্রাপ্তের সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় করে আসার বিরুদ্ধে (দ্রঃ 'সাহিত্যে নবত্ব')। শরৎচন্দ্রও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁদের আবির্ভাবের সপক্ষে কোন ওকালতি করেননি, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্তের সংকীর্ণতাকেও মেনে নিতে পারেন নি। বিজ্ঞানের নাম করে যা-ইচ্ছা সাহিত্যে আমদানি করা এবং বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে সাধারণ যুক্তি বুদ্ধিকে সাহিত্যের রাজ্য থেকে দূর করা—কোনটাই শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল না। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক যেমন তিনি মানতেন না, তেমনি বিজ্ঞানের দোহাই নিয়ে সাহিত্যে নোংরামির অনু-প্রবেশকেও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না—'নোঙরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয়, একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়; সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না।' ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি')। মোটকথা, বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ কোন অনুরাগ বা বিরাগ প্রকাশ না করে সাহিত্য তার নিজের ধর্ম যথাযথ পালন করবে, সাহিত্যের রীতি ও নীতি সম্পর্কে এই ছিল শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ও ঘোষণা। বিজ্ঞানের নাম করে সাহিত্যে নোঙরামিকে টেনে আনার বিরুদ্ধে যেমন শরৎচন্দ্র তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি জীবননীতি সম্পর্কে সনাতনীদের সংকীর্ণ ধারণার বিরুদ্ধেও নিজের অভিমত অসংকোচে ব্যক্ত করেছিলেন। বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর পরিণাম শরৎচন্দ্রের যে ভালো লাগে নি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (নদীয়া শাখা) বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে সে কথা জানিয়ে বললেন, 'যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না, অথচ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক

দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনায় মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গীততেও সাহিত্যের বিড়ম্বনা ঘটে। রোহিণীর মৃত্যুকে শরৎচন্দ্র আর্টের অনিবার্যতা হিসেবে মানতে পারেন নি। তাঁর মতে, এই পরিণামের পিছনে আছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বঙ্কিমের নীতিবোধের সজাগ উপস্থিতি। এই নীতিকে শরৎচন্দ্র নিতান্ত convention ছাড়া কিছু ভাবতে পারেননি। নীতি ছাড়া জীবন নেই, খুব সত্যি এই কথা। কিন্তু ভুল হবে যদি নীতি বলতে conventionকে বোঝানো হয়। conventionকে শরৎচন্দ্র যে 'নীতি' বলে গ্রহণ করেন নি, বরং convention-এর খাতিরে জীবনের অনিবার্যতাকে প্রতিরোধ করার বাসনার বারবার সমালোচনা করেছেন এতে শরৎচন্দ্রের নিজের সম্পর্কে দাবি সত্য বলেই মনে নয়—'আমি একজন Ethicsএর student, সত্য student। Ethics বুঝি এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না'। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লেখা একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে জানিয়েছিলেন এই কথা। প্রসঙ্গটা ছিল 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলাল 'চরিত্রহীন' তাঁর 'ভারতবর্ষে' ছাপতে চান নি। কারণটা ছিল ethics-ঘটিত। কিন্তু এই ethics যেহেতু convention-এর নামান্তর মাত্র এবং কোন মহৎ সাহিত্যেই সমাজের conventionকে ধ্রুব বলে মেনে নেওয়া হয়নি, হলে পরে সাহিত্যের প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়, অতএব 'চরিত্রহীন'এর বিরুদ্ধ ethics-এর দোহাই পাড়া শরৎচন্দ্র বরদাস্ত করতে পারলেন না। এই বছরই ১৪।৯।১৯১৩ তারিখে 'যমুনার' সম্পাদক ও একান্ত সুহৃদ ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখলেন 'ভাল বই যাহা art হিসাবে psychology হিসাবে বড় বই তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই ?' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছাড়া টলস্টয়ের 'রেজারেকশন'এর কথাও উত্থাপন করলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে। দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকা বা না-থাকার দিকে তাকিয়ে যাঁরা সাহিত্য বিচার করেন তাঁদের ethics নামক convention চিরকাল আর্টের বিচারকে চোখ রাঙিয়ে এসেছে। সামাজিক প্রথার প্রতি আনুগত্য aesthetics-এর শত্রুতা করে এসেছে চিরকাল। এই প্রথানুগতরাই কি বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আত্মপ্রকাশে চমকে ওঠেন নি ? রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র অসংগতি ও 'চিত্রাঙ্গদা'র অশালীনতা নিয়ে সাহিত্যের আসর উত্তপ্ত করেননি ? শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে সনাতনীদের আপত্তির প্রধান কারণও ছিল সামাজিক প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য। খুব সংক্ষেপে হলেও শরৎচন্দ্র ঠিক কথাই বললেন : 'moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে—হ্যাঁ ,একটা

লেখা হয়েছে বটে।' অর্থাৎ আর্টের বিচার যেন আর্টের দিক থেকে হয় এবং তারপর যদি লেখাটা উত্তীর্ণ হয় তাহলে নীতির (প্রচলিত অর্থে) প্রশ্ন অবান্তর। এই ছিল তাঁর বক্তব্যের নিহিতার্থ। সাহিত্য কোনদিনই সমাজে গুরুগিরি করে নি। অতীতে করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না। অতএব সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তথাকথিত নীতির স্বার্থেও সাহিত্যের অনিবার্য পরিণতিকে লেখকের স্বমতে পরিচালিত করার প্রয়াস অবশ্যই নান্দনিক বিচারে ক্ষমার অযোগ্য। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের জগৎ তা-ই যথার্থ অনৈতিক যেখানে স্বাভাবিক পরিণতিকে লেখক সমাজের রুচি অনুযায়ী নয়, অন্য কোন তাগিদে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেন। আমাদের মন্তব্যের সমর্থন লরেন্স-এ (ডি. এইচ, লরেন্স) মিলবে—Morality in the novel is the trembling instability of the balance when the novelist puts his thumb in the scale, to pull down the balance to his own predilection, that is immorality.' উপন্যাস প্রসঙ্গে লরেন্সের এই মন্তব্য আসলে সমগ্রভাবে আর্ট সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যথার্থরূপ যে ক্ষেত্রে বর্ণনীয় সেক্ষেত্রে লেখকের পক্ষপাতিত্ব অনৈতিকতা।

সমাজ কোনদিনই নবীনের অভ্যাগমকে সংশয়লেশহীন দৃষ্টিতে দেখে নি। সুতরাং পরিবর্তনের প্রথম ধাপে সমাজের স্থবির আদর্শগুলি চিরকালই নবীনকে আঘাত হেনেছে মর্মান্তিকভাবে। সমাজের এই আঘাত যদি সাহিত্যিকের কাছেও চলিত প্রথার স্বার্থে সমানভাবে সমর্থন ও প্রশ্রয় লাভ করে তাহলে সাহিত্যের সেই নিষ্ঠুরতা রসিকদের, বিশেষতঃ উত্তরকালের পাঠকদের, বেদনার কারণ হয়।···সমাজে অকালবৈধব্য একদা ছিল সমস্যা। বিদ্যাসাগর চাইলেন বিধবাদের সেই যন্ত্রণা লাঘব করতে, সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়তে। কাজটা সহজ ছিল না। বিধবাবিবাহ আইন-সম্মত হলেও সমাজ মেনে নিল না। তার বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে আইন ঢুকতে পারল না। এমন সময় বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের উইলে দুই বিধবার জীবনতৃষ্ণার বেদনাদায়ক পরিণতির ছবি আঁকলেন বঙ্কিম। এ ক্ষেত্রে লেখকের ভূমিকা হল কী? অবশ্যই সমাজের স্বার্থ রক্ষা। বঙ্কিমের এই কাজের সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র বললেন, রোহিণীর পরিণতিতে 'সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্যসুন্দর আর্ট। শরৎচন্দ্রের এই বিচার ঠিক হল কি না, প্রশ্ন উঠতে পারে। রোহিণীকে তিনি যেভাবে বোঝালেন সেটাই রোহিণীর

সঠিক পরিচয়, না, শরৎচন্দ্র নিজের মন দিয়ে রোহিণীকে কিছুটা বানিয়ে নিয়েছেন, এ প্রশ্নও অবান্তর হবে না একেবারে। কিন্তু পরেও রোহিণীর পরিণতি নিয়ে মোহিতলালের সঙ্গে কথোপকথনকালে নিজের পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থেকে শরৎচন্দ্র পুনরায় অভিযোগ তুলেছিলেন : 'ধর্ম ও নীতি-শাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে—নারীর জীবনের যেটা সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি, তাহাকে একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাতে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা কবিকল্পনার গৌরব কোথায় ?' বিচারে তাঁর যেমনই হোক, আমরা একথা বলতে পারি, মানুষের কোনরকম অবমাননাকে শরৎচন্দ্র আর্টের নীতি বলে গ্রহণ করতে পারে নি। হয়ত তাঁর নিজের উপন্যাস প্রসঙ্গেও বলা যায়, তিনি নিজে কি সমাজের convention-কে ভেঙে এমন কোন পরিণতি তাঁর উপন্যাসে সম্ভব করতে পেরেছিলেন যার দ্বারা তাঁর উক্তি "ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ' সত্য হয়ে উঠতে পেরেছিল ? যে-মুক্তির কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন তাঁর কোন্ উপন্যাস সেই মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, কোন কোন মহলে এ প্রশ্নও উঠেছে। তা-ও নিশ্চয়ই বিচার্য বিষয়। কিন্তু সাহিত্যের আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি যে জীবননীতির প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির কথা বলেছেন, তত্ত্ব হিসেবে তার গুরুত্ব যে অনেকখানি তা মানতে হবে। তা ছাড়া বঙ্কিম-রবীন্দ্র ঐতিহ্যে লালিত বাঙালী পাঠকদের সামনে শরৎচন্দ্র সমাজের এমন স্তরের কাহিনী ও চরিত্র অনাবৃত করেছিলেন যা অনেকদিক থেকে convention-বিরোধী ছিল। শিল্পকর্ম হিসেবে 'চরিত্রহীনে'র সাফল্য যাই হোক, ১৯১৩ সালটা মনে রাখলে এই উপন্যাসের জীবনায়নে যে নবীনত্বের চমক ছিল তা নিশ্চয়ই মানব। তা যদি না-ই থাকত তাহলে চতুর্দিক থেকে সেকালে অত বিরোধিতা এল কেন ? শুধু তা-ই নয়, প্রচলিত অর্থে যা ভাল বা যে গল্প লিখলে সমাজের স্বার্থরক্ষা হয় সে রকম কিছু যে তিনি লেখেন নি, তা অন্ততঃ শিল্পী হিসেবে তাঁর চিন্তার মুক্তি ঘোষণা করে। চিন্তার দিক থেকে যথাসাধ্য প্রথামুক্ত হতে চেয়েছিলেন বলেই একদিন নব্যতন্ত্রীদের আদর্শের সঙ্গেও তাঁর ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হল। ৫৪তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির আয়োজিত সভায় তিনি নবীনদের লক্ষ্য করে কিছু কথা বললেন। কথাগুলো অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মুখেও শোভা পেত।

(ক) 'লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশে কত রকম অভাব আছে—নানান্ দিক আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলেচ।' অথবা (খ)

'এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে মানুষ আনন্দ বোধ করে মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এসব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার।' অথবা (গ) 'একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন, তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।' প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে শরৎচন্দ্র নবীনদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছেন সে আপত্তি একদা রবীন্দ্রনাথই উত্থাপন করে শরৎচন্দ্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। একই ধরনের বিষয়বস্তুর প্রতি নবীনদের অনুরাগ রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি, কারণ নবীনেরা বিশেষ একধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্যরচনাকেই মনে করছিলেন 'আধুনিক' হওয়ার একমাত্র উপায়। তিনিও তো নবীনদের শক্তি যেক্ষেত্রে সপ্রমাণিত হয়েছে সেখানে অগ্রজ হিসেবে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। আসলে লরেন্স যাকে বলেছেন 'predilection', যেখানে অসজ্ঞান অনুবর্তিতাই প্রধান, সেখানেই শিল্পীদের ত্রুটি ও দুর্বলতা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কারণও ছিল তাই। গোড়ার দিকে নবীনদের 'predilection'-কে শরৎচন্দ্র 'purpose' (সজ্ঞান ক্রিয়া) বলে ধরে নিয়ে যে ভুল করেছিলেন পরে তা সংশোধন করে নেন। এবং তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদও দূর হয়ে গেল। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিও স্পষ্টই রবীন্দ্রনাথের মতের অনুরূপ একটি উক্তি। শরৎচন্দ্র 'রসবস্তু'র প্রতি নবীনদের আগ্রহী হতে বলেছেন। অথচ মাত্র চার বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'রসসৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতি শব্দগুলির 'রস'কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন 'ধোঁয়াটে বস্তু'। সুতরাং সাহিত্যের বিষয়নির্বাচন ও রসসৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের মতভেদ একটি পর্বে দূর হয়ে গেল। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতের পার্থক্য মৌলিক ছিল না। অভিমান এবং পরিপার্শ্বের উস্কানিও কিছুটা শরৎচন্দ্রকে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরব করে তুলেছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটু মন্তব্য ব্যবহার করার জন্য তিনি অমল হোম ও দিলীপকুমার রায়ের কাছে কতই না অনুতাপ করেছেন! তারপর ৬২তম জন্মদিনে বেতার-প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সম্ভাষণে স্পষ্টই বললেন, 'আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ'।

সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতের প্রথম দিকের বৈষম্য পরবর্তীকালে দূর হয়ে গিয়েছিল 'সাহিত্য' ও 'সত্যে'র মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাতেও। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে লেখা একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন—'নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না।' এই চিঠির সতেরো বছর পরে

লেখেন, 'সত্য আর সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বনেদ, কিন্তু সেইটেই সব নয়।······সত্যের দিক দিয়ে গেলে, আর যাই হউক, ভাল সাহিত্য হয় না' (১৩৩৭-এর আষাঢ় সংখ্যা 'উত্তরা'য়)। পুনরায় ১৩৪১-এর ৪ঠা মাঘ 'বাতায়ন' পত্রিকায় লেখেন, 'সাহিত্যের ব্যাপারে গোড়া থেকেই বলেছি যেন আমি কখন মিথ্যার আশ্রয় না নি। অবশ্য সত্যি জিনিসটাই সাহিত্য নয়'। বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই সমস্ত মন্তব্যের মধ্যে প্রথমটিতে শরৎচন্দ্র অনেকটা 'ন্যাচারা-লিস্ট'দের মতো নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ জানিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদ্ধৃতি দুটিতে সাহিত্যে সত্যের যথাস্থিতমূর্তি রূপায়ণের বিরোধিতা ক'রে শরৎচন্দ্র বিশেষ ধরনের 'সত্য'-কে কামনা করেছেন, যে-সত্য 'কল্পনা'র বিরোধী নয়। বস্তুতঃ এই সত্যই সাহিত্যের সত্য বা 'poetic truth' বলে কথিত। কিন্তু 'ন্যাচারালিস্ট'দের আপত্তি ছিল এই 'poetic truth'-এর বিরুদ্ধে এবং তাঁদের অনুরাগ ছিল 'scientific truth' সম্পর্কে। একদা 'scientific truth' বা নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি অনুরাগ থেকেই 'কল্লোলে'-এ রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বে শরৎচন্দ্রকে স্থাপন করা হয়েছিল। 'কল্লোলে'-র ধারণা ছিল এই scientific truth, যাকে তাঁরা বলেছেন জীবনের 'পাপের দিকটা', তার চিত্রণে শরৎচন্দ্র অসাধারণ বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী। কিন্তু এঁদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল উপরি-উদ্ধৃত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্তি দুটিতে। তথাকথিত 'সত্য'কে শরৎচন্দ্র বলেছেন 'সাহিত্যের বনেদ'। 'বনেদ' যেমন ইমারত নয়, তেমনি প্রচলিত অর্থে যা 'সত্য' তা-ও সাহিত্য নয়, সাহিত্যের ভিত্তিমাত্র। বনেদ-হীন ইমারত রচনা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় 'সত্য'-সম্পর্ক-শূন্য সাহিত্য রচনা। কিন্তু যদি নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি অটুট আগ্রহ বরাবর বজায় রাখা হয় তাহলে চূড়ান্ত বস্তুবাদীও একটি স্তবের পর পরাজিত হতে বাধ্য। জোলা এবং তাঁর অনুবর্তীদের অনেকের পক্ষে পরে আর প্রকৃষ্ট অর্থে 'ন্যাচারালিস্ট' থাকা সম্ভব হয় নি, কারণ যথার্থ ন্যাচারা-লিস্টিক সাহিত্য লেখাই অসম্ভব। 'নিরপেক্ষ সত্য', 'বৈজ্ঞানিক সত্য' কথা-গুলো সাহিত্যের রাজ্যে আরও অনেক চমকপ্রদ শব্দের মতোই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই এই সমস্ত শব্দব্যবহারের সীমা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই সমস্ত শব্দের অভিধাগত অর্থের চাহিদা পূরণ করা কোন মহৎ সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কারণটা খুব অল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্র বলেছেন এবং তা নির্ভুল—'Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙরা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা

photography হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে?' (সাহিত্য ও নীতি)।

নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি যখন শরৎচন্দ্র তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তার অনেক আগেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, যা ঘটে তা-ই সাহিত্যের সত্য নয়, কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য এবং সাহিত্য বা কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির আরশি নয়, অথবা সত্য যে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্য তা জানাবার জন্য অন্য শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাহিত্য বলছে যা আনন্দ-রূপে, অমৃতরূপে বিভাসিত তা-ই সত্য। এরপর ১৩২১ (১৯.৪) থেকে বাস্তব শব্দটাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের সিদ্ধান্ত বদল করেন নি। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিপিনচন্দ্র পালের আক্রমণেও রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র, যাঁর রচনার উপর রিয়ালিজমের তকমা এঁটে দিয়ে একদল রবীন্দ্র-বিদূষণে মেতে ছিলেন এবং অন্যদল শরৎ দূষণে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা 'নিরপেক্ষ সত্য'-সন্ধানী শরৎচন্দ্রকেই জেনেছিলেন। ১৩৩১-এর চৈত্রমাসে মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : 'ইংরেজীতে idealistic ও realistic বলে দুটো কথা আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করবেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না; অন্তত উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না।' মন্তব্যটা ১৩৩১-এর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' রচনার তিন বছর আগে। সাহিত্যধর্ম প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-বিরোধিতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু মুন্সীগঞ্জে পঠিত প্রবন্ধেই 'কেউ কেউ' বলে যাঁদের দিকে শরৎচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কি তাঁদের দলভুক্ত ছিলেন না? রবীন্দ্রনাথ যে realism-এর প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল পাশ্চাত্য থেকে আমদানি-করা এবং শরৎচন্দ্র যাকে বলেছেন 'বনেদ' তা-ই। আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যে রিয়ালিজমের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল সে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে যা যত অনিবার্যই হোক বাংলা সাহিত্যে তা ছিল ধার-করা। অন্ততঃ রাধাকমলবাবু যে-পরিমাণে রুশ সাহিত্যের এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন তাতে তো তাই মনে হয়। কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যতাত্ত্বিক না হয়েও শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র নিজের উপলব্ধি থেকে স্পষ্টভাষায় সত্য কথাটি বলেছেন যে, আইডিয়ালিস্টিক এবং রিয়ালিস্টিকের মধ্যে 'একটাকে

বাদ দিয়ে আর একটা হয় না ; অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন্ ধার ঘেঁষে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে।' আসলে 'রিয়ালিজম' ও 'আইডিয়ালিজম' শব্দ দুটো দর্শন থেকে ধার-করা, ফলে তা নিয়ে কচকচিও মারাত্মক। শিল্পীর উপলব্ধিতে ছাড়া এই সব সমস্যার সমাধান সহজে ঘটে না। ভাববাদীরা শিল্প-সাহিত্যের দ্বারা যে কোন জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না সে কথা কাণ্টের সময় থেকে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে আসছিলেন। এমন কি বাস্তববাদীরা—বিশেষতঃ গোর্কি যাঁদের বলেছেন critical realist, সেই বালজাক, ফ্লোব্যারও—সাহিত্যের দ্বারা জাগতিক কোন কাজ হাসিল হয় বলে মনে করতেন না। কিন্তু ইবসেন বা শ-এর নাটক থেকে এমন কিছুর হদিশ মিলল যাকে তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্প বলা চলে না। শিল্পের জগতে 'প্রোপাগাণ্ডা' কথাটা চালু হল ধীরে ধীরে। তারপর গোর্কির 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা' তো সাহিত্যের দ্বারা সমাজপরিবর্তনের কথাও বলতে লাগলেন। সুতরাং 'art for art's sake' মতবাদ ধাক্কা খেল 'art for life's sake' তত্ত্বের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ, শিল্পের সার্থকতা শিল্পেই,—এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।' অবশ্য এই কথা বলার সমকালেই কালিদাসের 'শকুন্তলা' এবং 'কুমারসম্ভবে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ aesthetics-কে ethics-এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন অনেকখানি। কিন্তু কোন দিনই শিল্পের দ্বারা জীবনের কোন উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। শরৎচন্দ্র বললেন, 'যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তো তা art নয়, ধর্ম নয়। Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা immoral বা অকল্যাণকর হতে পারে না ; এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতে 'সত্য নয়' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১০ই আশ্বিন)। সুতরাং শিল্পের লক্ষ্য নীতি প্রচার এবং শিল্পের সার্থকতা শিল্পেই এই দুই মতবাদের আপাত বিরোধিতা শরৎচন্দ্র মানলেন না, যেমন মানেন নি ভাববাদের সঙ্গে বাস্তববাদের প্রচলিত দ্বান্দ্বিকসম্পর্ককে। বস্তুতঃ, যে সনাতনীরা নীতিপ্রচারকে সাহিত্যের লক্ষ্য বলতেন তাঁদের কাছে 'নীতি' শব্দের যে তাৎপর্য ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে 'নীতি' শব্দের মর্মার্থ ছিল তার থেকে পৃথক। সুতরাং প্রচলিত অর্থে নীতিবাদী যাঁরা তাঁদের সঙ্গে কলাকৈবল্যবাদীদের যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক ছিল 'নীতি' শব্দের অর্থের ভিন্নতায় (ব্যাপকতাও বলা চলে) ফলে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ভাবনায় সে দ্বন্দ্ব দূর হল। মোটকথা, সাহিত্যতত্ত্বের জগতের দুটি প্রধান

সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর সমাধান করে দিলেন শরৎচন্দ্র। একটি ভাববাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব, অন্যটি কলাকৈবল্যবাদ ও নীতিবাদের দ্বন্দ্ব। বস্তুতঃ এই 'বাদ' বা 'ism'-গুলোকে জল-অচল শ্রেণীতে ভাগ করার দার্শনিক প্রয়াস আপাতভাবে যত সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার বলেই মনে হোক না কেন সাহিত্যের জগতে খুব শক্ত ভিত্তির উপর এই ভাগগুলো দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয় না। এই সমস্ত আন্দোলনের জন্মকাল ও পরিবেশ বিচার করলে এদের নিয়ে গোঁড়ামি কত মিথ্যা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া সাহিত্য যখন বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে জন্ম নেয় না তখন বিভিন্ন বিপরীতের একত্র সমাবেশ সাহিত্যের জগতে কোন বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। অথচ সাহিত্যিকেরা বিশেষ মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী এক পক্ষের প্রতি অন্ধ অনুরাগ এবং অন্য পক্ষের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও যে একদেশদর্শিতার ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন তা নয়। রোমাণ্টিক কাব্য-কবিতা সম্পর্কে তাঁর যে আস্থা ছিল সেই আস্থা ছিল না ইবসেনের নাটক প্রসঙ্গে। অন্য অনেক বিদেশী লেখকদের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে অথচ টলস্টয় ও গোর্কির প্রসঙ্গ তিনি বিশেষ উল্লেখ করেন নি বা সবিস্তারে আলোচনা করেন নি। অন্য দিকে, টলস্টয়ের 'রেজারেকশন'-এর কথা শরৎচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থনে উল্লেখ করেছেন একাধিকবার। গোর্কি-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার গর্কি প্রভৃতিকে ভাল লাগে—তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নাই তবু তাঁদের appreciate করি' (১৩৪৩, ১৯ ভাদ্র, বাতায়ন)। সমগ্রভাবে রুশ সাহিত্য সম্পর্কে আকর্ষণ প্রকাশ করে লিখেছেন (১৩৩২-এ) 'আমাদের সাহিত্য রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।' এর তিন বছর পরে ('সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে) রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি ওঁরা নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি পরে বা যে-কোনো উগ্র সাজেই হোক, তবে আমাদের দেশের ইস্কুল মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন।' এরপর রবীন্দ্রনাথ 'উপরওয়ালা রাশিয়ান হেডমাস্টার' কথাটা ব্যবহার করেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তখনও হয় নি রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু রুশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতালাভের পরও যে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেছিলেন তা নয়। আসলে টলস্টয়, গোর্কি বা ইবসেন রবীন্দ্র-নাথের চেতনার উদ্দীপনে সাহায্য না করলেও শরৎচন্দ্রকে প্রাণিত করেছিলেন এঁরা। কারণ অন্য অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক মতদ্বন্দ্ব

দূর হলেও এ বিশ্বাস একান্তই শরৎচন্দ্রের নিজস্ব ছিল যে 'ভাবে, কাজে, চিন্তায়, মুক্তি এনে দেওয়াই তো সাহিত্যের কাজ।' রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্বে এই মন্তব্যের সমতুল উক্তি আমাদের চোখে পড়েনি। সুতরাং সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতাদর্শগত প্রভেদ বেশ গভীর ছিল বলেই মনে হয়।

জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার ভিতর গুরুতর পরিবর্তনের সূত্র চোখে পড়েছে অনেক রবীন্দ্র-সমালোচকের। এমনকি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্র-বিরোধীদের একদল কবির মতপরিবর্তনের উপর নির্ভর করে তাঁদের আক্রমণের অস্ত্রে শান দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে লেখা সমগ্র একটি প্রবন্ধের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাঁর অধিকাংশ মতামত বক্তৃতায়, নয়ত বা চিঠিপত্রে ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার যে অবকাশ আছে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে অবশ্যই তা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতপরিবর্তনের ভিতর থেকেও তাঁর বিশ্বাসের একটি ঐক্যমূর্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সাহিত্যের উপাদান, গঠন ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বক্তব্য একটি সুগঠিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল কিন্তু শরৎচন্দ্রকে শিল্পী হিসেবে বিচার করতে আমাদের যত সুবিধা, শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে বিচার করার অসুবিধা তার চেয়ে অনেক বেশি। যুক্তিবুদ্ধি-শাসিত তত্ত্ব-গর্ভ বাক্য উচ্চারণে তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত সত্য নয়। অথচ যেহেতু নিজে ছিলেন অক্লান্ত সাহিত্য-সেবী তা-ই সাহিত্যের উপাদান, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলির একটা সমাধান গড়তে পেরেছিলেন নিজের মত করে। উপাদান ও উদ্দেশ্যই সাহিত্যজগতের প্রধান দুটি সমস্যাকেন্দ্র। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল ও অমিল আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রকে নির্মাণের কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের মূল্যও অস্বীকার করা যায় না।

প্লট ও চরিত্রের মধ্যে কার গুরুত্ব অধিক, এ প্রশ্ন বহু প্রাচীন। অ্যারিস্টটলের সময় থেকে নাটকের প্লট ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে যে সমস্যা ঘনীভূত হয়েছিল ধীরে ধীরে সেই সমস্যাই রূপ নিল উপন্যাসের ক্ষেত্র। যাঁরা মধ্যপন্থী তাঁরা 'প্লট' এবং 'চরিত্র' পৃথক্‌ভাবে কারুর গুরুত্বই কম বা বেশি বলতে সম্মত নন। বস্তুত 'প্লট' এবং 'চরিত্র'কে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে দুর্মোচ্য সমস্যা নিয়ে বিব্রত বোধ করেন, ভাবিত হন। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রেরও একটি বক্তব্য ছিল। তাঁর নির্দেশ ছিল, 'গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে

তাহার প্রীতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই।' তিনি নিজে নাকি প্রথমে কিছু চরিত্র স্থির করে নিয়ে তারপর প্লট গঠন করেন। গল্প চরিত্রকে কেন্দ্র করে নিজে থেকে গড়ে ওঠে। তাঁর এই পদ্ধতি আমাদের তুর্গেনেভের পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

তুর্গেনেভ সম্পর্কে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা প্রবন্ধে হেন্‌রি জেম্‌স্ জানিয়েছিলেন—'The germ of story with him was never an after of plot—that was the last thing he thought of, it was the representation of certain persons.' চরিত্র নির্বাচন ছিল, হেন্‌রি জেম্‌স্ এর মতে, তুর্গেনেভের প্রধান সমস্যা। শরৎচন্দ্রও চরিত্র-নির্বাচনকে গণ্য করতেন ঔপন্যাসিকের প্রধান ও প্রথম সমস্যা বলে। অবশ্য চরিত্র নির্বাচনের পর যে কাহিনীর জাল গড়ে তোলা হয়, তার টেকনিক-গত যে সমস্যা প্রধান হয়ে ওঠে সে বিষয়েও সতর্ক ছিলেন তিনি। 'রচনার কৌশল', তাঁর মতে, এমন একটি গুণ যা শিল্পীকে যত্ন করে আয়ত্ত করতে হয়। আরম্ভ এবং শেষ করা—ঔপন্যাসিকের কাছে দুটোই সমস্যা। কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ করতে হবে না জানলে শিল্পী হিসেবে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়।—'কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়!' অসংযত ভাবে রূপরচনা কোন মহৎ শিল্পীরই কাজ নয়। গ্রহণ এবং বর্জন কবার পদ্ধতি- দুই-ই জানতে হবে লেখককে। আবেগের আতিশয্য শিল্পীর উচ্ছৃঙ্খল বিবেকের পরিচয় বহন করে। আবেগের যৌবন-সুলভ অমিতাচার যুক্তিসংযমের প্রৌঢ়ত্বের তর্জনীসংকেতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, 'মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকই বাড়তে থাকে।' এই ক্রিটিককে শরৎচন্দ্র অবশ্য রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব অনুকূল বা সহায়ক মনে করতেন না। 'তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ করে যে ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে'। কথাটা একদিক থেকে যথার্থ হলেও এই ধরনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। মানুষের ক্রিটিক সত্তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে একথা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে বলতে হবে 'ক্রিটিক সত্তা' আছে বলেই অসংযত ভাবপ্রকাশের অশোভন চাঞ্চল্য থেকে শিল্পী নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। অতএব ক্রিটিক সত্তা বর্জনীয় নয়—বরণীয়। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের নিজের শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে যুক্তি অপেক্ষা আবেগের প্রাধান্য ছিল বলে তিনি যৌবনকেই মনে করতেন শিল্পসাধনার মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু বিপরীতটাও কি সত্য নয়? পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা কোন কোন শিল্পকর্মীর

যৌবনের অপরিণত উচ্ছ্বাসকে পরবর্তী পর্বে মহিমময় তাৎপর্যে অভিষিক্ত করেছে, এ ঘটনাও তো সত্য। তবে যেহেতু শরৎচন্দ্র মনে করতেন উপন্যাসের ক্ষেত্রে dialogue ছোট্ট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশী বলেছে। এ হল artistic formএর ভিতরের রহস্য. সুতরাং তার কাছে যৌবনই যে রস-সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত সময় এ বিষয়ে সংশয় নেই।

সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে লেখা শরৎচন্দ্রের রচনা অপ্রচুর হলেও দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের সমস্যা নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ সমস্যার চমকপ্রদ সমাধান। তিনি (ক) বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন না ; (খ) বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অশালীনতা আমদানি করা পছন্দ করতেন না ; (গ) মানবজীবনের কোনরকম অবমাননা, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কাছে (ঘ) 'সত্য' হচ্ছে সাহিত্যের বনেদ ; (ঙ) কলাকৈবল্যতত্ত্বের সঙ্গে নীতির কোন বিরোধ সত্য ছিল না ; (চ) ভাবে কাজে ও চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ ; (ছ) ভাববাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় ; (জ) প্লট অপেক্ষা চরিত্র-রচনাই প্রধান সমস্যা, এবং (ঝ) প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি শব্দও সাহিত্যের রূপের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

এই সমস্ত তত্ত্ব তাঁকে ভাবতে হয়েছিল কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মত-দ্বন্দ্বের সময়, কখনও নবীনদের একই সুরে সাহিত্যচর্চার মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতার সমালোচনার কালে, এবং কখনও সমকালীনদের আতিশয্যদোষদুষ্ট সাহিত্য সমালোচনার মুহূর্তে। প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ছিলেন না শরৎচন্দ্র। তাঁর সমস্ত ভাবনা এসেছিল তাঁর স্রষ্টাব্যক্তিত্বের মধ্যস্থতায়। সুতরাং সমর্থনপিপাসায় তিনি অপরের দ্বারস্থ হন নি। নিজের উপলব্ধি থেকে প্রাপ্ত সমাধান নিজের মতো করেই প্রকাশ করেছেন। কারুকে convince করার কোন দায়িত্বও ফুটে ওঠে নি তাঁর রচনায়। তাঁর আলোচনার ঢঙে এই স্বাতন্ত্র্য বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনাপদ্ধতি থেকে এক পৃথক দিগন্তের নির্দেশ দান করে।

শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত

জনার্দন চক্রবর্তী

বাঙালীর সাহিত্যিক চিত্ত যেমন গীতিমুখর তেমন কথাপ্রবণ। পদগীতি-মুখরিত বঙ্গদেশে বিশ্বসভার গায়ক-কবির আবির্ভাব সুন্দর ও স্বাভাবিক ঘটনা। তেমন মঙ্গলকথার স্নিগ্ধ সরস ক্ষেত্র আমাদের এই বাংলায়, বঙ্কিম-রবীন্দ্রের অনুগামী শরৎচন্দ্রের নবকথার প্রবর্তন একটি সুসঙ্গত সহজবোধ্য ঘটনা। দেশবাসীর বিয়োগ-বিক্ষুব্ধ চিত্তে আজ নৈরাশ্যকর একটি প্রশ্নই জাগিতেছে। লোকায়ত সাহিত্যের অপূর্ব পরিণতি বিধান করিয়া যে শক্তিমান বাণীপন্থী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নরদেবপূজার প্রজ্বলিত দীপশিখা কে আর অনির্বাণ রাখিবে?

সংসারে আভিজাত্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নির্মম আভিজাত্য মানব-মনের ব্যাধিবিশেষ। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আভিজাত্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হয়। যুগে যুগে, দেশে দেশে উৎকট হৃদয়হীন আভিজাত্য যে বিক্ষোভ বিলড়ন, যে প্রলয়ঙ্কর প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, মুখ্যতঃ তাহার কাহিনী লইয়াই আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস। চিরন্তন মানবের না হইলেও, অধুনাতন মানবের দুঃখদ্বন্দ্ব-আর্তি-বেদনার মূলেও এই নিষ্করুণ উদগ্র আভিজাত্য। আভিজাত্যব্যাধিতে ব্যাধিত হয় যখন জাতীয় চিত্ত, তখন তাহার চিন্তাছন্দে হয় প্রতিপদে যতিভঙ্গ, ভাব-প্রবাহও হইয়া আসে পঙ্কিল, প্রতিহত-গতি। কর্মশক্তিতেও আসিয়া পড়ে অবসাদ, চিত্ততল হইয়া উঠে রিক্ত, নির্বিত্ত। জাতীয় মনের এইরূপ অবসাদ ও দীনতার মুহূর্তে আসিয়াছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁহার অপরিসীম সহানুভূতির হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা লইয়া। হায়, 'যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্র-জাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'—তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল?

মুখ্যতঃ রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতীচির সহিত আমাদের যে কিঞ্চিদধিক সার্ধ শতাব্দীর সংস্কৃতিগত পরিচয় তাহাতে জাতীয় জীবনে উপচিত হইয়াছে একটি লভ্য। তাহাকে বলিতে পারা যায়, জাতীয় যৌবনের সুপ্তিভঙ্গ অথবা যুবজন-চিত্তে সহানুভূতির সম্প্রসারণ। বাঙালীর নবীন সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষাপ্রসারে, রাষ্ট্রগঠনপ্রচেষ্টায়—এককথায় নব্যসংস্কৃতি গঠনপ্রয়াসে, সর্বত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে এই সুপ্তোত্থিত, ক্রম-প্রসার্যমান সহানুভূতি। আবার এই লভ্যটুকু অর্জন করিতে গিয়া আমাদের

চিত্ত যে নবতন্ত্র সঙ্কীর্ণতার অধিষ্ঠানভূমি হইয়া উঠে নাই, তাহাও বলা চলে না। তবে সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা ও অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মহামনীষী আশুতোষ অহংমুখী আত্মবিকাশের পথ না খুঁজিয়া দৃষ্টিহীন আত্মদ্রোহিগণের অপযশ ও বৈরবৈরূপ্যের বোঝা চিরজীবন মাথায় বহিয়া 'নবনালন্দা শিক্ষাগেহ' গঠনে তাঁহার জিতজর কর্মশক্তি ও প্রাণপাতী সাধনা নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারই রচিত বিশ্ববিদ্যার জাতীয় 'চত্বর' 'বিচিত্র-কলা-বিলসিত' করিতে গিয়া এই মহাপুরুষ বিগত শতাব্দীর অর্ধশিক্ষিত রামনিধির 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'-সূত্রের জীবন্ত ভাষ্য রচনা করিয়া পরকীয়া-ভাষারস-রসিক দিবান্ধ-শিক্ষাবিদ-বঁধুয়াগণের সূচিভেদ্য মোহতিমির অপসারিত করিয়া বিদ্যাভিসারের নরপতিবর্ত্ম নির্মাণের সূত্রপাত করিলেন।

রামকৃষ্ণসহচর গিরিশ কেন রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন? রামকৃষ্ণ-পরিকর জীবন্মুক্ত পুরুষ কেন জনসেবাকেই 'দেশ-আত্মার কুণ্ঠা' হরণের ও সুপ্তবিবেকের আনন্দ জাগরণের 'নান্যঃ পন্থাঃ' বলিয়া সিংহবিক্রমে প্রচার করিলেন? দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, বস্ত্রহীনতা, বৃত্তি-হীনতার মর্মভেদী হাহাকারে থাকিয়া থাকিয়া কেন ভারতীয় বিজ্ঞানসাধনার পিতৃস্থানীয় আচার্যদেবের সমাধিভঙ্গ করিতেছে? আর রাজনীতিক আন্দোলন-শ্রান্ত 'কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' গুজরাতী মহাত্মা কেনই'বা মৈথিল বিদ্যাপতির বহুজন-কীর্তিত প্রাচীন পদটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে শুনাইলেন, 'হরি (জন) বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া'?

এখন বোধ হয় আমরা অসংকোচে বলিতে পারি, জাতীয়তা সাধনের যুগপ্রচেষ্টা এবং শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সম্ভাবনা সূচিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার আগমনী গৌরচন্দ্রিকা দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছিল। তরুণ বাংলায় করুণ হিয়ার সবটুকু অমিয়া মথিয়া তারুণ্যের জয়-গীতিকার এই কথাশিল্পী সাহিত্যিক কায়া পরিগ্রহ করিলেন। এই সহৃদয়াগ্রগণ্য ব্যক্তি সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে সম্ভাবিতকে অভাবিতরূপে, প্রত্যাশিতকে অপ্রত্যাশিতরূপে সফল করিয়া তুলিলেন। তাই বলিতে প্রবৃত্তি হয়, 'ছন্নছাড়া জীবনের দরদী-বন্ধুর বঙ্গদেশে আবির্ভাব ছন্নছাড়া 'isolated fact' নহে। পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচকের ভাষায়, শরৎচন্দ্র 'had his affiliation with the present and the past.'

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা একটা মস্ত ভুল করি তাঁহাকে জীবনের একাংশ-দর্শীরূপে বুঝিতে গিয়া। তিনি সমাজের উপরিচর ব্যক্তি নহেন, তত্ত্বদর্শী ও

তলাবগাহী ব্যক্তি। তাহার সাহিত্যসাধনা জীবনের দুরবগাহ রসসাধনা, পিরিতের সাধনা। তাহা একান্ত ভাবেই মরমের সাধনা, মরম না জানিয়া ধরমবাখান নহে। 'প্রাণের হরি'কে উপেক্ষিত উপোষিত রাখিয়া তিনি পীরিতি-তত্ত্ব বুঝেন নাই। 'গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম' করিয়া তিনি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাই সেকথা 'শুনিতে জগৎবশ'। তাই যুবচিত্তে তাঁহার একাধিপত্য সাম্রাজ্য। দেশদর্শনের উদাত্ত-গম্ভীর আহ্বান বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে জাগিয়াছিল। সে আহ্বানে সত্য করিয়া সাড়া দিয়াছিলেন, সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে একা শরৎচন্দ্র। জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম, প্রখ্যাত অখ্যাত, সুখ্যাত কুখ্যাত সবকিছুকেই তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, আঁকিয়াছিলেন।

বিষয়টির একটু স্পষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। সংসারে শ্রীমান ও শ্রীহীন, শুচি ও অশুচি পাশাপাশি বাস করিয়া থাকে। গৃহসুখনিরত শুচিশুভ্র শালীনতার মধ্যে যে সুশৃঙ্খল সুনিয়ত জীবন স্ফূর্ত হয়, তাহার শান্তশ্রী নরনারী উভয়কে বেষ্টন করিয়া সংসারে বিরাজিত। দাম্পত্যে ইহার সুশান্ত সুন্দর অভিব্যক্তি। দাম্পত্যনিষ্ঠ পৌরুষ, পতিব্রত নারীত্ব ভারতবর্ষে বড় হৃদ্য মনোজ্ঞ। বধূধর্ম-চারিণীর 'অচলাশ্রী', জরাযৌবন, শীতবসন্ত, সুখদুঃখ, মিলন-বিরহ, আবাহন-নির্যাতন প্রভৃতি অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও এদেশে অপরিম্লান রহিয়াছে। এই অপরূপ কল্যাণী মূর্তির 'সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়ের' অমিয়াধারায় ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীরাম, কেতকাদাস-কবিকঙ্কণ, মধুসূদন-দীনবন্ধু, হেম-নবীন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সকলেরই রসচৈতন্য গাঢ়-নিস্নাত। আমরা সীতা-সাবিত্রী, দ্রৌপদী-দময়ন্তী, মালবিকা-শকুন্তলা-বেহুলা-খুল্লনা, প্রমীলা-লীলাবতী, শচী-ভদ্রা-ভ্রমর-সূর্যমুখী আরও কত দেবীমূর্তির সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। কে বলিতে পারেন, এই চিরভাস্বর দেবীমূর্তির পাদমূলে দাঁড়াইয়া শরৎচন্দ্রের 'মা' বলিতে প্রাণ 'আনচান' করিয়া উঠে নাই? প্রাত্যহিক জীবনের এই দেবীনিবহের সোদরা-কন্যাকাগণকে শরৎচন্দ্র পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের সুবর্ণপ্রতিমা গড়িয়াছেন, 'প্রণতিনম্র শিরোধরাংস' হইয়া ইঁহাদিগকে স্তুতি প্রণতি জানাইয়া-ছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস কি পাঠকদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? আমাদের দেশ যে সত্যই 'মা-বোনের' দেশ, একথা এমন গর্বোদ্বেল হর্ষাপ্লুতচিত্তে কে বলিয়াছেন?

তবে এই প্রসঙ্গে একটা অভিযোগ বোধ হয় তাঁহার ছিল। এই বন্দ্য-বরেণ্য নারী মূর্তির পার্শ্বে আধুনিক পৌরুষ কিরূপ প্রতিভাত হইবে? এদেশে পৌরুষের বর্তমান স্বরূপ কি? নারীর এই চিরন্তন পূজ্যমূর্তি নিরীক্ষণের

নৈতিক অধিকার পুরুষ কতটুকু বজায় রাখিয়াছেন ? পৌরুষের ক্ষেত্রে বাচিক, মানসিক ও কায়িক ব্যভিচার যদি মার্জনীয় হয়, শুধু মার্জনীয় নহে, প্রশংসনীয়ও যদি হয়—তবে নারীর মানসব্যভিচারটুকুও কেন অমার্জনীয় হইবে ? যে পাশব পৌরুষের 'কলুষ-পরুষ' স্পর্শ এই পূজনীয় মূর্তি অশুচি করিয়া তুলে, যে নিবীর্য পৌরুষ এই দেবীপ্রতিমার পবিত্রতা রক্ষণে অসমর্থ, তাহার পক্ষে নারীর শৌচাশৌচ বিচারের স্পর্ধা কি পরম অধর্মাচার নহে, ঘৃণ্য নির্লজ্জ কাপুরুষতা নহে ? অভিমানদৃপ্ত অকপট সংশয় যদি শরৎচন্দ্রের এবং তাঁহার প্রভাবে যুবচিত্তে জাগিয়া থাকে তবে সেইজন্যই কি শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহিত্য অপাঙ্‌ক্তেয় ?

পূর্বেই বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র জীবনের একাংশদর্শী উপরিচর ব্যক্তি নহেন। গৃহসুখবিহীন অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনেরও একটা মর্মভেদী সংগীত আছে। সে সংগীতের প্রতি কি চিরকালই আমাদের 'কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ' ? জীবনের এই দিক্‌টার সহিত চলার পথে সকলেরই তো অল্পাবিস্তর চাক্ষুষ ও শ্রৌত পরিচয় ঘটিয়া থাকে। অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচয় অনেকেরই থাকে না। থাকার বিপত্তি আছে, শঙ্কা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সহানুভূতির পরিচয়ে আপত্তি কি ? শুধু আপত্তি নাই, তাহাই নহে। ইহা সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যসাধনের একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব। হৃদয়বত্তার ইহা একটি চিরন্তন স্বধর্ম। এই স্বধর্মের পথ বাহিয়া নির্ভীক জীবন-পথিক শরৎচন্দ্র আমরণ চলিয়াছেন। স্বধর্মে নিধন বুঝি তিনি শ্রেয়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলিব, তাঁহার নিধন নাই। সে অমিত অভয়মন্ত্রোদ্দীপিত দুর্জয় প্রাণের নিধন নাই। তাহার নিত্যতা অতীতে বর্তমানে প্রাচীতে প্রতীচীতে সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত।

শরৎচন্দ্রের জীবনে যদি কোন স্থায়ীভাব থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সহানুভূতি। কী সুদূরপ্রসারী সুগহনচারী ছিল তাঁহার এই সহানুভূতি! পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের প্রখ্যাত অখ্যাত সর্বদিকেই ব্যাপক এবং অন্তর্নিবিষ্ট-ভাবে ছিল তাঁহার সমদৃষ্টি। মনস্বিতা ও হৃদয়বত্তার অমিত ঐশ্বর্যদীপ্ত, নরনারী চিত্তের অতিগহনতলে অবতরণ করিয়া খুঁজিতেন তিনি অন্তরের দুঃখ-দ্বন্দ্ব, স্নেহপ্রীতি, ঘাত-প্রতিঘাতের সবটুকু রহস্য। আবার অবজ্ঞাত, অনভিজাত অথবা সমাজের প্রত্যন্তচর ক্ষুদ্রজীবনের সবটুকু রসমাধুর্যের তিনি ছিলেন বিলাসী ভোক্তা ও সুনিপুণ পরিবেষ্টা। দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কৈশোর আঁকিতে গিয়া তিনি যে রূপদক্ষতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জুড়ি মিলিবে কোথায় ? ইন্দ্রনাথের আভাসটুকুই শুধু আমরা পাইয়াছি কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত চিত্রে।

প্রাচীন প্রাকৃত বাংলার জীবনরস-রসিক কবির শিশুক্রীড়া-বর্ণনায়—'জলে খেলে মাছ মাছ, ঝালি খেলে চড়ি গাছ, জীবন মরণ নাহি জানে'—যাহার প্রতিধ্বনি আমরা পাই একালের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' উক্তিটির মধ্যে, 'পরেশের মায়ের পরেশে'র বাতাসালোলুপ ক্ষুদ্র মনটুকুর সমস্ত চাতুরি-মাধুরী ধরিয়া ফেলিলেন শরৎচন্দ্র কিরূপে? মহেশ গাভীটির সুকরুণ শোকাবহ জীবনাবসান ও তাহার মালিক কৃষকপ্রজা গফুরের সবটুকু দুঃখব্যথা কি করিয়া তিনি বুঝিলেন? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, মারী-তাড়িত, অজ্ঞান অশক্ত জনানিবহ কিরূপ শোচনীয় জীবনযাপন করে, আর দলে দলে কিরূপে অতি বন্য পশুর মত মৃত্যুকবলিত হয়, পল্লীচিত্র আঁকিয়া তাহার এইরূপ নিদারুণ মর্মঘাতী বিবরণ আর কেহ কি দিতে পারিয়াছেন?

দেশের শিক্ষিত যুবকগণের কাছে শরৎচন্দ্রের বোধহয় একটা আবেদন ছিল। সে আবেদন অনেকটা বাংলার অকৃত্রিম যুবজন-সুহৃৎ শিক্ষাব্রতী পুরুষপ্রবর আশুতোষের পদবীসম্মানবিতরণী সভার জলদ-গম্ভীর অনুযোগ-মধুর বক্তৃতার মতই শুনায়। অথবা জাতি ও সাহিত্যের শুভ স্বপ্নদর্শী এই মহামানবের সাহিত্যিক অধিবেশনসমূহের ওজোগুণশালী সুচিন্তিত অভিভাষণ-গুলির মত কতকটা শুনায়। অবৈতনিক পাঠশালার বৈরাগী শিক্ষক বৃন্দাবন, বিলাতফেরত বীজাণু-গবেষক, কৃষকসহচর কৃষিশিক্ষক, আপনভোলা নরেন্দ্রনাথ পীড়িত ও পীড়নকারী পল্লীসমাজের উচ্চশিক্ষিত, একনিষ্ঠ অভিজাত সেবক রমেশ-শরৎচন্দ্রের এই কল্পনাবিগ্রহনিচয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কি এদেশে হইবে না? তাঁহাদের পরিকল্পন কি লঘু শরদভ্রখণ্ডের মত আকাশেই মিলাইয়া যাইবে? দেশের সুশিক্ষিত সুপ্তোত্থিত যৌবন কি অজ্ঞতার গুরুভার জগদ্দল দেশের দীর্ণপঞ্জর বক্ষঃস্থল হইতে নামাইবার এতটুকু প্রয়াসও পাইবেন না?

শরৎচন্দ্রকে শুধু নারীতত্ত্বজিজ্ঞাসু অথবা পাতিত্যপ্রেমিক বলিয়া জানিলে যেমন ভুল হইবে, পশ্চিম সাগরের বীচিগণনাকারী আত্মদর্শনবিমুখ প্রগতিবাদী-দিগের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিলে তেমনই কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পীর একটি সুস্থির সমাহিত সৌন্দর্যপিপাসু কবিব্যক্তিত্ব ছিল। নিসর্গতন্ময়তা, বস্তুসম্পর্ক-নিরপেক্ষ ভাবাকুলতা, বিমান-বিসর্পি-কল্পনা-জীবিতা হয়ত সে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল না। বাস্তব সাম্প্রত জীবনরসে ছিল সেই ব্যক্তিত্ব ভরপুর, দুঃখ ও কারুণ্যের অনুভূতিতে তাহা ছিল তন্ময়। তাই তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গি ছিল সহজ অথচ সুন্দর, ঋজু অথচ ছন্দোময়। ভাষা ছিল তাঁহার নিরলঙ্কার অথচ শাণিত, সংক্ষিপ্ত অথচ দৃপ্ত। ভাষা ও

রীতি বিচার করিয়া এ ব্যক্তিকে যথার্থই বলা চলে, 'The style is the man.'

পরিশেষে একটা কথা বক্তব্য। পাতিত্যের প্রতি শরৎচন্দ্রের ঘৃণা হয়ত আমাদের অপেক্ষাও তীব্রতর ছিল। কিন্তু সে ঘৃণা সত্যিকার পাতিত্যের প্রতি। পতিত-জ্ঞানে অবিচারে নির্মমভাবে উপেক্ষিত মহত্ত্বের প্রতি নহে। শ্রদ্ধাও ছিল তাঁহার মাহাত্ম্য-বিমণ্ডিত তথাকথিত পাতিত্যের প্রতি। পরম শুচি ও অকৃত্রিম তাঁহার এই শ্রদ্ধা ঘৃণাটুকু। এই ভাবটুকু ফুটাইতে গিয়া তিনি জীবনের বিষামৃতের একত্র মিলন ঘটাইয়াছেন। সু-কু পাপ-পুণ্যের এই একস্থ দিদৃক্ষা কি অধ্যাত্ম-সম্পর্কী নহে ?

শরৎচন্দ্র সেইদেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যে দেশের বহুজন ধিক্কৃত আদিম স্মার্ত ধর্মকে 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন, যে দেশের পুরাণকথায় মধুকৈটভ বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতরূপে পরিকল্পিত, যে দেশের 'প্রচণ্ড মনোহর' দেবতা শবগণের 'করসংঘাত' (সুকৃতি-দুষ্কৃতি ?) কাঞ্চী করিয়া পরিধান করেন এবং যে দেশের দেবীপ্রশস্তিতে সকৃতিগণ-ভবনের শ্রী-রূপিণীর সঙ্গে পাপাত্মা-সম্ভবা অলক্ষ্মী মূর্তিও বন্দিতা হইয়া থাকেন। শরৎচন্দ্রের জন্ম সেই দেশে, যে দেশের রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আকুলিবিকুলির ভাষা, 'নে মা আমার পাপ, নে মা আমার পুণ্য'—যে দেশের আদি-গীতিকবির আত্মনিবেদনের 'সহজ'-সুর—

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণখানি।

যদি দেখা হয়

('পথের দাবী'র ভারতী ও 'চার-অধ্যায়ে'র এলালতা)

বাণী রায়

এলা। ভারতী, তোমার সঙ্গে আমার যে এমন হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে তুমি কি জানতে ?

ভারতী। হ্যাঁ এলা, আমি জানতাম। আমাদের দুজনের জীবনই যে একই গতি ধরে চলেছিল।

এলা। তাহলে, তুমি বলতে চাও যে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ধারণা এক রকমের ছিল ? কিন্তু তা তো নয়, ভারতী। দুজনেই রাজনীতির পথে চলেছি সত্যি, কিন্তু পথ তো ছিল আলাদা।

ভারতী। জানি এলা। তোমার পথ ছিল সর্বনাশের পথ। তোমার গুরু ইন্দ্রনাথের নির্দেশে তুমিও ধ্বংস হলে, সঙ্গে সঙ্গে যাকে সবচেয়ে ভালবাসো, সেই অতীন্দ্রকেও ধ্বংস করলে।

এলা। ধ্বংস তো তুমিও কম করতে যাওনি, ভারতী। সব্যসাচীর কৃপায় অপূর্ব রক্ষা পেল, নইলে সেদিন পথের দাবীর গুপ্ত সভায় তার তো প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েই গিয়েছিল। অমন দুর্বলচেতা লোককে দিয়ে কি জীবন-মরণের খেলা চলে ?

ভারতী। আমার ভুল হয়েছিল। আমি পথের দাবীতে যোগ দিয়েছিলাম কুলি-মজদুরের দুঃখ দূর করতে—নরহত্যা বা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বাষ্পও ওর সঙ্গে জড়িত আছে, আমি জানতাম না। সুমিত্রা আমাকে পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করতে বলতেন। আমি ভেবেছিলাম সে আমারি আত্মরক্ষার জন্যে, অন্যকে হত্যা করতে নয়। বেচারী অপূর্ব! সে আমাকে বড় বিশ্বাস করেছিল, অথচ আমি অজানিতে তাকেই অত বড় বিপদের মধ্যে টেনে নিলাম। সব্যসাচী শুধু বুঝেছিলেন আমার কথা।

এলা। সব্যসাচীর মুখের কথা আমিও যে শুনতে পাচ্ছি আজ—"এর জন্য তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না, বোন, তোমার মধ্যে যে হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে চলে গেছে—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাব না।"

ভারতী। আমাকে লজ্জা দিও না, এলা। দাদা আমাকে বাড়িয়েছিল। তাই তো সুমিত্রা মুহূর্তের জন্যও আমাকে ঈর্ষা করবার উপক্রম করে-ছিলেন। আমি তো সুমিত্রার পদনখের যোগ্যও নই।

এলা। কেন নও? সুমিত্রা পাথরে তৈরী দেবী—গুরু সব্যসাচীর উপযুক্ত শিষ্যা। তাকে সবাই ভয় করে দূরেই রাখত, কাছে টেনে আনবার সাহস হত না। সুমিত্রা আগুন। কিন্তু, ভারতী, তুমি জল। সহজ-সাদা জল, পিপাসার শান্তি। সকলেরই তোমাকে প্রয়োজন।

ভারতী। এলা, আমার প্রশংসা করবে বলে কি স্থির নিশ্চিত হয়ে এসেছ? একটু আগেই রাজনীতির কথা হচ্ছিল না।

এলা। আমাদের জীবনের বড় সত্য। কিন্তু তুমি যা বলেছ ঠিক। আমি চলেছিলাম ধ্বংসের পথে, তুমি চলেছিলে কল্যাণের পথে। আমার থেকে শক্তি তোমার বেশী। স্বয়ং সব্যসাচীও তোমাকে পারেন নি নিজের বিশ্বাস থেকে ভ্রষ্ট করতে।

ভারতী। ছি এলা, ছি। নিজেকে অপমান কোরো না। আমি অতি দুর্বল, অতি সাধারণ। সাংসারিক হাঁড়িবেড়ির মোহে আমার জীবন কাঁদত। দাদা তাই তাঁর দুরূহ ব্রতে আমাকে ডাকেন নি। জানতেন আমি পারব না। তোমাকে ইন্দ্রনাথ যে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কী বলেছিলেন মনে আছে?

এলা। নেই? সেই তাঁর কথাই তো আমার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে আমাকে সহজ পথ থেকে ভ্রষ্ট করেছিল। ইন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভালোবাসার গুরুভার তোমার ব্রত ডোবাতে পারে, তুমি তেমন মেয়ে নও।" আহা, সেই গৌরবের ভারেই তো জন্মের মত ডুবে গেলাম।

ভারতী। ডুবে গেলে, মানে?

এলা। 'চার অধ্যায়ে'র অধ্যায়ে লেখা আছে আমার নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস। আমিও নারী। তোমার মতই কোমলতা ছিল মনে, শপথের বেদীতে আত্মবিক্রয় করেছিলাম। বলেছিলাম দেশের কাজে আমি বাগ্‌দত্তা। ওঃ।

ভারতী। অধীর হয়ো না, এলা। রচনাকার সব নায়িকার জীবন তো মিলনান্ত করতে পারেন না। দুর্লভ তুমি। রবীন্দ্রনাথ তাই তোমাকেই বলি দিলেন। শরৎচন্দ্র আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেন অসহায় অপূর্বর সারা জীবনের ভার নিতে।

এলা। মৃত্যুই দুঃখ নয়। আমার প্রিয়তমের হাতে মৃত্যু আমার স্বেচ্ছামৃত্যু, 'নোংরা হাত লাগতে দিইনি গায়ে'—তার হাতে মৃত্যু আমার সৌভাগ্য। কিন্তু তা নয়,—অতীন্দ্রকে, আমাকে অন্তুকে আমি তার জীবিকাভ্রষ্ট করেছিলাম—এই তো আমার দুঃখ, আমার গ্লানি।

ভারতী। সে তো বলেই ছিল যে তোমার দোষ নেই। সে রাস্তা ছিটকে পড়েছিল আপন অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র।

এলা। ভুল কোরো না, ভারতী। আমাকে ভোলাবার জন্যেই ও বলেছিল। বারে বারে স্বীকার করেছে ও আমাকে ভালবেসেই এসেছিল গুপ্ত রাজনীতির রক্তসঙ্কুল পথে। প্রতি মুহূর্তে ওর ঘৃণা হয়েছে, ওর কবি মনে বেধেছে বিরোধ, তবু তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না। নিজের আত্মাকে হত্যা করেছিল ও। সেই ভূত একদিন আমাদের দুজনকেও হত্যা করল।

ভারতী। কেন তাহলে টেনেছিলে অতীন্দ্রকে তোমার সর্বনাশা পথে? আমি জানতাম না তাই অপূর্বকে পথের দাবীতে এনেছিলাম। তুমি তো জেনেশুনেই অতীন্দ্রের সর্বনাশ করেছ, এলা।

এলা। ভুল বুঝো না আমাকে। সত্যই বলেছিলে তুমি, আমাদের দুজনের জীবন একই গতি ধরে চলেছিল। সে গতি প্রেমের। ফার্স্টক্লাস ডেকের বেতের কেদারায় বসে ছিল অতীন্দ্র। জীবনে সেই আমার সব চেয়ে আশ্চর্য এক চমকের চিরপরিচয়। তখনই মনে মনে পণ করলাম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে। তাই ইন্দ্রনাথের-স্বদেশীদল তাকে পেলেন।

ভারতী। সেই তো ভুল হল। সে তোমার অন্তরের মানুষ, তাকে হাটের মধ্যে ছেড়ে দিলে নির্মম হয়ে। সে তা চাইবে কেন?

এলা। জানি, ওখানেই আমার ভুল হয়েছিল। সকলকে সব কাজ মানায় না, আগে বুঝি নি। তখনও বোকা ছিলাম। মনে ছিল গর্ব, আমার ব্রত আমারই যোগ্য। তার পরে গর্ব হারালাম। ভালবাসা আমার বুদ্ধি ফিরিয়ে দিল। অন্তুর যথার্থ স্বরূপ কী চিনতে পারলাম। কিন্তু তখন বড় দেরি গিয়েছিল।

ভারতী। কিন্তু এলা, শেষের দিকে তো তোমার চিরকুমারীত্বের পণ তুমি ভাসাতে চাইলে। তাহলে কি, মনে তোমার প্রথম থেকেই সংশয় ছিল?

এলা। না, না। ইন্দ্রনাথকে যখন কথা দিয়ে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম, তখন আমি ছিলাম অন্য মানুষ। কিন্তু, অবশেষে আমারও যে ঘটল পরিবর্তন। আমিও বুঝলাম ও পথ আমার পথ নয়। ভয়ঙ্কর একটা ট্র্যাজেডির চেহারা আমারও চোখে পড়েছিল।

ভারতী। ঠিক পথে চলে গেলে না কেন তবে ?

এলা। চেষ্টা তো করেছিলাম। অতীন্দ্রের বনবাসে ছুটে গেলাম। নিতে চাইলাম তাকে বরণ করতে। সে আমাকে ঠেলে ফেলে চলে গেল কর্মের নির্দেশে।

ভারতী। অথচ একদিন সেই তো তোমাকে পণ ভাঙতে বলেছিল, না ?

এলা। হ্যাঁ, তখন আমি বুঝিনি। যখন বুঝলাম তখন দেরি হয়ে গেছে। মরতেই হল।

ভারতী। আহা !

এলা। ওই তো তোমার দোষ, ভারতী। তুমি বড় নরম। কিন্তু, সব্যসাচী তোমাকে অত স্নেহ করলেন কী করে ?

ভারতী। আমি দুর্বল বলেই।

এলা। না, ভারতী, তোমার মধ্যে ছিল দুর্লভ শক্তি নির্বিচারে ভালবেসে যাবার। অত কাছে তাই টানতে পেরেছিলে নির্মম বিপ্লবী সব্যসাচীকে বোনের মায়া দিয়ে। অপূর্ব অপদার্থ জেনেও ভালবাসতে পেরেছিলে তাকে। এতক্ষণ তো আমার ভুলেরই আলোচনা হল। তুমি কেন বুদ্ধিমতী হয়ে অপূর্বকে ভালবাসার ভুল করলে ?

ভারতী। আমি কী করব ? যে মানুষ অত অসহায়, অত পরনির্ভর, আমারি ওপরে যে সামান্য কয়েকদিনের দেখায় নির্ভর করে বসল, তাকে দূরে সরাব কী করে ?

এলা। তারপরে যখন শুনলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দলের নামধাম বলে দিয়েছে, তখন ? তোমার অত শ্রদ্ধার পাত্র সব্যসাচী বিপন্ন হতে পারেন, তখনও তো তাকে ভালবাসতে ছাড়লে না ?

ভারতী। আমি তো তিলমাত্র প্রশ্রয় দিইনি অপূর্বকে তারপর। কিন্তু দাদা সব্যসাচীই তো বোঝালেন আমাকে। অপূর্ব সত্যি অকাজের নয়। আরো দশজন বাঙালী ছেলের মত সে স্বদেশের উন্নতি কামনা করে। আরো তো সেবা করেছে সে। আমাকে বিশ্বাস করেছিল, ভাবেনি আমি হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেব।

এলা। এ সমস্ত কথাই তো সব্যসাচীর কথা।

ভারতী। হ্যাঁ, তাঁর মতো বুদ্ধি কার আছে বলো? অপূর্বকে তুমি যদি সেই ভয়ানক দিনে দেখতে, তাহলে বুঝতে সে যা করেছে, না বুঝে করেছে। অস্বীকার কিছুই করতে চায়নি। কেমন বিহ্বল হয়ে আমাকে খুঁজছিল। সে ছিল দুর্বল—এই তার দোষ। বিশ্বাসঘাতক সে নয়। যদি হত, সব্যসাচী তাকে প্রশ্রয় দিতেন না।

এলা। আমি তো ভেবেই পাই না, অত দুর্বল মানুষকে তুমি ভালবাসলে কী করে?

ভারতী। এলা, অপূর্বের দুর্বলতার মধ্যেও নিষ্ঠা ছিল। সকলের ঠাট্টা, বিদ্রূপের মধ্যেও সনাতন হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল ও মায়ের প্রীতির জন্যে, মাকে সুখী করবার আশায়। প্রকৃতপক্ষে ওর মা-ই ওর দুর্বলতার জন্য দায়ী। সর্বদা মা যেন তাকে আবৃত করে থাকতেন। মা মারা যাবার পরে সে অন্য মানুষ হয়ে গেল। আমাকে বিধর্মী খ্রীষ্টান বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল অপূর্ব মায়ের জন্যেই। তারপরে সব বাধাই তো ভেসে গেল। আমারি হাতে আত্মসমর্পণ করল সে।

এলা। এতক্ষণে বুঝেছি, ভারতী। যে বিশেষত্ব ছিল তোমার মধ্যে, তারও মধ্যে ছিল তাই। ভালবাসার ক্ষমতা, যে ভালবাসা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, বিচার না করে। তাই তো অপূর্ব মাকে অমন করে ভালবেসেছিল। তাই তো সে অনাত্মীয়াকে অমন করে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিল। ধন্য তোমাদের ভালবাসা।

ভারতী। আর তোমাদের ভালবাসা? নিজের হাতে প্রিয়াকে সে-ই হত্যা করতে পারে, যে বেশী ভালবাসে। বিপদ থেকে বাঁচাতে তোমাকে হত্যা করেছিল সে অত ভালবাসে বলেই।

এলা। আমাকে সবাই তো ভাসিয়ে দিয়েছে। তোমার প্রিয়কে রক্ষা করে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে সব্যসাচী নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুললেন। আর আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন ইন্দ্রনাথ—নিয়োজিত করলেন আমার প্রিয়কে আমার ধ্বংসের আয়োজনে।

ভারতী। পাথর ইন্দ্রনাথ। সব্যসাচীও পাথর, কিন্তু সে পাথরের নীচে ঝরনা ছিল স্নেহ-প্রীতির। ইন্দ্রনাথের পরীক্ষা চলছিল তোমাদের নিয়ে। অতীন্দ্রকে শেষ পরীক্ষা করে নিলেন উনি।

এলা। সে পরীক্ষার আর কোন ফলই তিনি পান নি। অলিখিত থাকলেও সকলেই জানে, আমার সঙ্গে অতীন্দ্রের জীবনও শেষ হয়ে গেল। সর্বনেশে ব্যামোতে ধরেছিল ওকে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এসেছিল আমাকে পথের সাথী করতে। একদিন অস্বীকার করে ঠেলে দিয়ে কাজে চলে গিয়েছিল। শেষদিনে কাজ হল আমাকে সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুসাগর পাড়ি দেওয়া। ভারতী, ভারতী, শেষ দিনে অন্তুর বলা কথা আমি যে এখনও শুনতে পাচ্ছি, "মৃত্যু সব চেয়ে নিশ্চিত—জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে!······সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে।"

ভারতী। ধন্য তোমাদের ভালবাসা! আর আমার দুঃখ নেই তোমার জন্যে।

এলা। কিন্তু, ভারতী, আমিও তো মেয়ে। বড় দেরিতে বুঝলাম সে কথা। বুঝলাম আমার জীবনের চরম সার্থকতা কী। কঠিন পরীক্ষায় নয়, মাধুর্যের সাধনায়। কল্যাণের পথ আমার, সর্বনাশের পথ নয়। অন্তুর তখন ফিরবার পথ ছিল না। সর্বনাশের ইঙ্গিতে বিপথে চলেছিল ও। তাই, সঙ্গে নেয়নি।

ভারতী। এলা, ইন্দ্রনাথ তোমাকে নিয়েছিলেন ছেলেদের অনুপ্রেরণা জোগাতে, সব্যসাচী আমাকে রেখেছিলেন সেবা করতে। প্রথম থেকেই পথ ছিল পৃথক। তুমি ছিলে সর্বনাশের দূতী। সব-হারানোর খেলায় সবই হারালে শেষে।

এলা। মনে পড়ে অন্তু বলেছিল :—

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

ভারতী। এলা, সাধারণ মেয়ের মতো, আমার মতো সংসার করতে পেলে না বলে দুঃখ কোরো না। তুমি যে স্বতন্ত্র, তুমি যে দুর্লভ।

এলা। কিন্তু, ভালবাসায় যে আমি সাধারণ হয়েই গিয়েছিলাম, ভারতী, পাগল হয়ে সামান্য মেয়ের মতো অতীন্দ্রের পায়ে পড়েছিলাম আমার সব কিছু উপহার দিতে।

ভারতী। তা হলেও তুমি আমি নও। জন্মলগ্নক্ষণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ তোমাকে অসামান্যা করেই সৃষ্টি করেছিলেন—রূপে, গুণে, বিদ্যায়। আমি ছিলাম অতি সাধারণ শরৎচন্দ্রের কলমে—ভালবেসেছি, ঝগড়া করেছি, কেঁদেছি এই মাত্র। তুমি যাকে ভালবাসলে সে-ও

অসামান্য। আমি ভালবাসলাম সাধারণ মানুষ অপূর্বকে। আমার রাজনীতি হল নিরন্ন দুঃখীদের নিয়ে। তোমার রাজনীতি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সব দিকেই তুমি যে অসামান্য ছিলে, তাই অসামান্য পরিণতি তোমার।

এলা। কিন্তু, ভারতী, পাঠক কাকে মনে রাখবে? অসামান্য আমাকে, যে যমকন্যার কালো জলে বিফল জীবনের নিষ্ফলতা ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? না, তোমাকে, যে তার ছোট সেবা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে ছোট গৃহকে স্বর্গ করে তুলল?

ভারতী। সে ভার পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে চলো, এলা।

'দত্তা' প্রসঙ্গে

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' এমন একখানি উপন্যাস যার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ-প্রশ্ন ওঠে না। আজ পর্যন্ত যতবারই উপন্যাসখানি পড়েছি, ততবারই শরৎচন্দ্রের কাহিনীর একটানা গতি এবং সংলাপের অনায়াস সাফল্যে মুগ্ধ হয়েছি। এই বইয়ে শরৎচন্দ্র ছোটখাটো খুঁটিনাটি অর্থাৎ detail-এর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। তাই তারই সাহায্যে চরিত্র আর ঘটনা পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে মনে হয়, incident ও character, এই দুটি উপকরণের শোভন ও সমন্বয়ী রূপায়ণেই কমেডি জমে ওঠে। বস্তুনিষ্ঠ হয়েও শরৎচন্দ্র 'দত্তা'য় একখানি রোমাণ্টিক উপন্যাসের মূল্যবান খসড়া রেখে গেছেন।

শিল্পের দিক থেকে 'দত্তা' উপন্যাসখানি যে একেবারে নিখুঁত কিংবা শরৎচন্দ্রের পূর্ণবিকশিত প্রতিভার ছাপ এতে পড়েছে, একথা তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত পাঠকও হয়তো বলবেন না। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এ বইয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর পরিণতিকামী শিল্পের পথ খুঁজেছেন। তিনি সন্ধান করেছেন সাহিত্যের এমন একটি বিশিষ্ট আকার যাতে তাঁর কথাচিত্র সার্থকতা পায়। দীর্ঘ উপন্যাস তাঁর শিল্পমার্গ নয়, যদিও সেখানে কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। আবার প্রকৃত ছোট গল্পও তাঁর বিশেষ ধরনের শক্তিমত্তার যথার্থ ভাষা নয়। তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত বাহন হল বড় ছোটগল্প অথবা পরিমিত উপন্যাসের ফর্মে সুব্যক্ত ও সুস্পষ্ট কাহিনী, যার মধ্যে ছোটগল্পের রেখা, সংলাপের সূচ্যগ্রতা এবং জীবনের একটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত পরিধির মধ্যে চরিত্র-চিত্রের বিবর্তন সংযুক্ত হয়। এককথায় novelette-ই হল তাঁর কৃতিত্বের ক্ষেত্র। তাই 'দত্তা' উপন্যাসে যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট গল্পের মর্ম-আবেদন অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বইখানি চিত্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য। কিন্তু যখনই বস্তুনিষ্ঠতা অথবা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে কাহিনীটি অনর্থক জটিল অথবা দীর্ঘ হতে চায়, তখনই সূক্ষ্মরুচি পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'দত্তা'র উপসংহারে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সাধারণ গল্পলোলুপ পাঠক হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, উচাটন মন বলে 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। কিন্তু রসজ্ঞ পাঠকের মনে কেমন একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তি থেকে যায়।

মনে হয়, জীবন বেগবান হলেও কমেডি এতটা আবেগবান না হলেই মানাত ভালো। সন্দেহ হয়, 'সিচুয়েশন'টি যেন একটু জোর করেই তৈরী করা। মিলনান্ত বিবাহ-বাসরে চরিত্রবান্ আখ্যান যেন অনুষ্ঠানপ্রধান হয়ে ওঠে, যদিও শরৎচন্দ্র বারে বারেই বলেছেন যে মিলন জিনিসটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মাত্র নয়। পরিকল্পিত চরিত্রগুলি লেখক-তাড়িত ঘটনার একাগ্রচাপে কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের সুখী হয়ে ওঠে। গল্পের মোড় আশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে গিয়ে বিবাহের দৃশ্যে এমন একটি ধার-করা সার্থকতা লাভ করে যেটি সহজ ও অনিবার্য বলে মনে হয় না।

তবু এ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব কম নয়। শিল্পপরীক্ষার অবসরে তিনি এই সহজ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন যে জীবনের অন্ধ গলিতে মানুষ পথ হাতড়ে বেড়ায় বটে কিন্তু সেটা অভ্যাস ও সংস্কারের সনাতন কারসাজি। অপ্রত্যাশিত এসে ধরা দেয় বারে বারেই, আলোর আভাসও ফুটে ওঠে, যখন সামাজিক মূঢ়তা অথবা অসঙ্গতিগুলো ঝেড়ে ফেলার মতন সৎসাহস থাকে মনে। আশ্চর্য এই যে, মানুষ ঠেলে ফেলে দেয় অন্তরসত্যের মতন এমন দৈব ঐশ্বর্য। বোঝে, কষ্ট পায়, তবু কদর দেখায় না, অথবা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়। 'দত্তা'র নারীচরিত্রের চিত্রণকৌশলে অক্ষুণ্ণ আছে শরৎচন্দ্রের সুনাম। পুরুষ চরিত্র মোটামুটি 'টাইপ', তাই তাদের বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয় না। নরেন ও বিলাসবিহারী এক হিসাবে 'ফয়েল' বা প্রতিতুলনা। দয়াল ও রাসবিহারীও তাই, যদিও রাসবিহারীর মতন বিষকুম্ভ-পয়োমুখ চরিত্র অনেকটাই মৌলিক সৃষ্টি। কিন্তু বিজয়ার মতন একটি সুললিতার বিসঙ্গত লীলা, খেয়ালী গতিবিধি ও কার্যকলাপ বুঝতে অনেকগুলি পুরুষ হিমসিম খেয়েছে 'দত্তা' উপন্যাসে। রোমাণ্টিক কথাবস্তুর উপজীব্যই হল 'আভিমানিক প্রীতি'। এই ভাব-প্রতিজ্ঞাটি অতি প্রাচীন, বাৎস্যায়নের আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার হৃদয় নিয়ে এর অফুরন্ত খেলা। ফলে অভিমানিনীর স্বেচ্ছাকৃত বাধারচনায়, অন্তরায় সৃষ্টিতে আর অবশ্যম্ভাবী ভুল বোঝাবুঝির পালায় এমন একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে যাতে গল্পের গতি ঘোরালো হতে বাধ্য। গল্পের শেষ যে ভাবেই হোক্ না কেন, উপন্যাসখানি মোটের উপর কোমল-করুণ ও মধুরই লাগে।

তরুণ অবস্থায় যখন প্রথম 'দত্তা' পড়ি, তখন অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, একথা বলা বাহুল্য। বিজয়ার মত মেয়ে ঘরণী হলে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তার অস্বস্তিকর পরিণতি অপরিণত কল্পনা তখনও ঠিক ধরতে পারেনি। কিন্তু পুস্তকচারিণীর অকারণ ক্রোধ-ক্রন্দন, অহেতুক প্রীতি-তিরস্কার,

প্রকাশ ও অবগুণ্ঠন, এক কথায় তার লীলাবৈচিত্র্য যে অতি সহজেই মনোহরণ করেছিল, একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু নিছক পাঠক হিসেবেও একথা মনে হয়েছিল যে এই কাহিনীর গতি, ঘটনাসংস্থানের আকস্মিকতা এবং কথাবার্তার সংযোজনায় এমন একটি প্রয়োগকৌশল রয়েছে যাতে উপন্যাসের চেয়ে নাটক হলেই বইখানি জমত বেশী। সত্য কথা বলতে গেলে, 'দত্তা'য় অনেকখানি নাটকীয়ত্ব বা দৃশ্যরস আছে যার যথার্থ চিত্রণ উপন্যাসের লিখনভঙ্গিতে ততখানি পূর্ণ হয় না, যতখানি হয় রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে। তাই শিশিরকুমার যখন 'দত্তা'কে 'বিজয়া'য় পরিণত করলেন, নাটকখানি মনের তৃপ্তিসাধন করেছিল, যদিও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এই আংশিক অতৃপ্তি অভিনয়ের দোষে নয়, নাট্যরূপে গ্রহণ-বর্জনের পালাটা মাত্রাধিক্য ছাড়িয়েছিল বলেই। শিশিরকুমার ও চারুশীলার কৃতিত্ব অতি উচ্চাঙ্গের হলেও সমগ্র অভিনয় সমানুপাত হয়নি। সম্প্রতি এ উপন্যাস ছায়াচিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচার করবেন রসজ্ঞ সমালোচক। কেবল বলতে পারি, ছায়াচিত্র সংস্করণটি অমনযোগী প্রযোজনার পরিচয়। এর চেয়ে প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের তরুণ ছাত্ররা 'দত্তা'র যে নাট্যরূপ দিয়েছেন, তার স্মৃতি আমার মনে এখনও উজ্জ্বল। শৌখিন অভিনয় হলেও ছাত্রদের অভিনয়দক্ষতা এবং সর্বোপরি তাদের team work এবং detail এর প্রতি সূক্ষ্ম ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি যথার্থই শিল্পসম্মত হয়েছিল।

'দত্তা'র আলোচনা প্রসঙ্গে একখানি ইংরেজি উপন্যাসের কথা স্বতঃই মনে পড়ছে। অনেক দিন আগে 'দত্তা' পড়বার পর যখন হার্ডির 'ট্যু অন এ টাওয়ার' পড়ি, তখন মনে একটা গভীর দাগ পড়েছিল যেটি আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি। একটু বিস্মিত হয়েই লক্ষ্য করেছিলাম, এ দুখানা উপন্যাসে অনেকখানি গরমিল থাকলেও কয়েকটা বড় রকমের মিল আছে। প্রথমেই বলে রাখি, এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা অথবা শিল্পকৃতিত্ব কম করে দেখানোর উদ্দেশ্য আমার নেই। বরঞ্চ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটা পার্থক্য আছে যে সাহিত্যিক প্রভাবের কথা উঠতেই পারে না। উপন্যাস দুখানির তুলনামূলক আলোচনা করাই আমার নির্দোষ অভিপ্রায়। কেন না, অনেক সময়ে বড় শিল্পী বা সাহিত্যিক অজ্ঞাতসারে একই পথে খানিকটা চলেন।

হার্ডির বইখানি 'দত্তা'র মতই প্রণয়-সম্পর্কিত কাহিনী। সাংসারিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও Swithin ও Viriette, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক আকর্ষণটা তীব্র। অনেকটা 'দত্তা'র নরেনের মতই হার্ডির নায়ক। মানুষের সংসর্গ এবং সর্বপ্রকার সামাজিক জটিলতা থেকে সে দূরে সরে এসে

আশ্রয় নিয়েছে এক পুরানো টাওয়ারে। তারই চূড়ায় বসে চলে আকাশচারী গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে তার মৌন আলাপ। সৌরজগতের রহস্যে সে অভিভূত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র হল তার চরম নেশা। Swithin প্রথমটা জানতেই পারে নি, কেমন করে Viriette-এর মতন সম্ভ্রান্ত এক মহিলার কৌতূহল-দৃষ্টি সে ইতিমধ্যে অর্জন করেছে। Viriette বিবাহিতা রমণী, Blountএর মতন ধনী ও অভিজাত মানুষের পত্নী, এবং প্রচুর বিত্ত ও রূপের অধিকারিণী। 'দত্তা'র বিজয়াও অর্থ ও রূপের দিক থেকে কিছু কম নয়। উপরন্তু, নরেন তার কাছে পিতৃঋণের জন্য অধমর্ণ। তবে বিজয়া কুমারী, যদিও সে বাগ্‌দত্তা এবং যার সঙ্গে নীরব প্রতিশ্রুতি এবং রাসবিহারীর ফিকির-জালে আবদ্ধ, সে আর কেউ নয়, স্থূল ও জৈব প্রকৃতির মানুষ—বিলাসবিহারী। কুটিলতায়, দম্ভে, বদ মেজাজে এবং শক্তিপ্রয়োগে সে Blount-এর সগোত্র। বিজয়ার মতন তেজী মেয়েকে সে দাবিয়ে রাখতে চায়—যেটা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হল। উভয় নায়িকারই ক্ষেত্রে হৃদয়ের পথে মস্ত সামাজিক বাধা এবং সেই কারণেই গল্প জমে উঠেছে ও অভাবিতভাবে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে শুরু করে এমন একটা মনোভাবের উদ্ভব হয়েছে যেটা শুধু প্রণয়-আকর্ষণ নয়, তারও অতিরিক্ত কিছু। নরেনের প্রতি বিজয়ার আর Swithin-এর প্রতি Viriette-এর মনোভাব মুখ্যতঃ সমবেদনা। দুজন নারীই সহানুভূতিপ্রবণ, উভয়েই চায় আর্থিক অসচ্ছলতায় যেন বিজ্ঞানচর্চা ব্যাহত না হয়।

Swithin ও নরেনের চরিত্রে একটা মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বিজ্ঞানী; একজনের নেশা আকাশতত্ত্ব, অপরের জীবাণুতত্ত্ব। Swithin জানতে পারেনি Viriette-এর ক্রমশঃ ঘনায়মান শ্রদ্ধা ও প্রীতি, যেমন নরেন ঠাহর করেনি বিজয়ার মতন উন্নতশির আঘাতপটু মেয়ের মনে কেমন করে গভীর আসক্তি বেড়ে উঠেছে। দুজন পুরুষই সরল, আত্মবিস্মৃত, নারীর অভিমানে ও রমণীর ছলাকলায় অনভিজ্ঞ। কিন্তু এখানে আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের লেখনীতে নরেন যতখানি চরিত্রগুণ লাভ করেছে এবং চরিত্র হিসেবে 'realised' হয়েছে, হার্ডির উপন্যাসে Swithin ততখানি সার্থক হয়ে ওঠে নি। আড়াল যখন দুর্ভেদ্য হয় মানুষের প্রেম তখন একটা পথ খুঁজে নেয়। এবং সে পথটা সঙ্কীর্ণ, সঙ্কোচভরা অথবা বিপজ্জনক বলেই মনোরম। হার্ডির উপন্যাসে এই সামাজিক প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে অনেক সুচিন্তিত অভিমত আছে, এবং সে সব মন্তব্য বেরিয়ে এসেছে Viriette-এর অন্তর্দাহ-সূচনায়। যে খ্রীষ্টান আইনের কবলে পড়ে Viriette তার প্রথম বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি

পাচ্ছে না, উপরন্তু অন্যায় সন্দেহ ও দুর্নাম কিনছে, তার বিরুদ্ধে তার কঠোর মন্তব্য খুবই স্বাভাবিক। আর বিজয়াও ব্রাহ্মধর্মের নামে যে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির পরিচয় পেয়েছে, তার বিরুদ্ধে সে মাথা তুলেছে। তবে Viriette-এর অদৃষ্ট মন্দ, সে তার বাঞ্ছিত জনকে পেল না। স্বামীর মৃত্যুর পর Swithin কে না পেয়ে এক বিশপের কাছে সে আত্মসমর্পণ করল। বিজয়া উদ্ধত তেজস্বী ঘোড়সওয়ারের মতোই জীবনের বাজি জিতে নিল, পেল নরেনকে। কেন না, শেষ মুহূর্তে দাবি জানাবার ও মানাবার মতন উন্মুক্ত মনের শক্তি সে প্রয়োগ করতে পেরেছে। ইংরেজী উপন্যাসে সামাজিক কাঠামোখানা আলাদা, তাই তার সুর ও পরিবেশ বিয়োগান্ত। বাংলা উপন্যাসে সমাজঘটনার চক্রান্তে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে মিলনান্ত। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলবার আছে। দুখানি উপন্যাসেই ধর্মের নামে অন্ধ সংস্কার, মানবাত্মার অপমান এবং সমাজেব অছিগিরির বিরুদ্ধে তীব্র আলোচনা আছে। কিন্তু যে অর্থে 'টু অন এ টাওযার' Church of England-এর বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যাণ্ডা নয়, সেই অর্থে শরৎচন্দ্রেব 'দত্তা'ও ব্রাহ্মধর্মের বিপক্ষে বঙ্কিম প্রচারকার্য নয়। ঔপন্যাসিক সংস্কারক নন, সমালোচক। তাই সমালোচনাটাই শিল্পীর ও শিল্পের অন্তর-অলঙ্কার।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রে নারী এসেছে এগিয়ে। পুরুষ দুজনেই অসাংসারিক, আত্মরত ; তাই নায়িকার এই অগ্রণী ভাবটুকু বেমানান মনে হয় না। বরঞ্চ ভালোই লাগে। অর্থের অভাব যখন নেই, কৌতূহল যেখানে প্রচুর, অন্তর যখন ভদ্র সমবেদনায় পূর্ণ, প্রেমের জন্ম সেখানে সহজ। তাই Viriette চায় Swithin-এর বৈজ্ঞানিক স্পৃহা যেন নষ্ট না হয়। বিজয়ার আশঙ্কা পাছে অর্থের চাপে নরেনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং গভীরতর দুশ্চিন্তা যখন নরেন গ্রাম ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার চেষ্টা করে। Swithin ও Viriette-এর হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র আর নরেন ও বিজয়ার মধ্যে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র চমৎকার ঘটকতা করেছে।

উপন্যাস দুখানির মধ্যে বড় রকমের পার্থক্যও অবশ্য রয়েছে। একটি হল, হার্ডির চেয়ে শরৎচন্দ্রের বাস্তবনিষ্ঠার যেন একটু বেশী পরিচয় পাওয়া যায় 'দত্তা'য়। উভয় গ্রন্থেরই মধ্যে রোমান্স ঘনিয়েছে। অতএব ঘটনার বাহুল্য এবং কিছুটা আকস্মিকতা অনিবার্য। 'Cross-pupose' না থাকলে গল্পের গতি যায় থেমে, জীবনের irony অথবা পরিহাস জন্মে না। উভয় শিল্পী এগুলি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তবু পরিবেশ-সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের লেখনী আরো যেন সহজ ও বস্তুনিষ্ঠ। লঘু কৌতুকে, বিমল হাস্যরসে, করুণ প্রসন্নতায়

এবং উচ্ছল সজীবতায় 'দত্তা' যেন আরও উজ্জ্বল মনে হয়। হার্ডির 'টু অন এ টাওয়ার' কিছু বেশী গম্ভীর, অন্তর্নিহিত বিয়োগের স্তব্ধতায় ভারাক্রান্ত। দুই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক সংস্থান স্বতন্ত্র, যদিও আঙ্গিক-কৌশলে অনেকটা মিল আছে। তা ছাড়া হার্ডির জীবনদর্শন হল নিজস্ব। সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর আসন স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। নিয়তির অমোঘ ট্র্যাজেডি এমনভাবে ঘনিয়ে ওঠে যে সন্দেহ হয় 'Character is fate', নাকি হার্ডির নিজস্ব শিল্পমার্গই সেই নিয়তির অভ্রান্ত ইঙ্গিত? দুখানি উপন্যাসই লেখকদের পরিণত রচনা নয়। তবু পরিণতির আভাস আছে উভয় গ্রন্থেই এবং পাঠকের চিত্তজয় করে অনেকটা একই উপায়ে। তবে হার্ডির উপন্যাসে একটি মৌল প্রেরণা উদ্দেশ্যের মতই পিছন থেকে কাহিনীর অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ সম্পর্কে হার্ডি নিজেই মুখবন্ধে পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন :

"This romance was the outcome of a wish to set the emotional history of two infinitesimal lives against the stupendous background of the stellar universe and to impart to readers the sentiment that of these contrasting magnitudes, the smaller might be the greater."

কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয় নি। এ উপন্যাস সমস্যামূলক নয়। ইটের পরে ইট সাজিয়ে একটা ইমারত গড়ে তুলে মানবজীবনের ব্যর্থতা এবং তার অনিবার্য পরিণতি বিফলতার ধ্বংসস্তূপে চরিত্র দুটিকে এনে ফেলতে চান নি শরৎচন্দ্র। ঘরোয়া চিত্রে, সামাজিক পরিবেশে নিয়তির তির্যকলীলায়, ঘটনা ও চরিত্রের দুটি বিপরীত সূত্র ধরে তিনি রোমান্সের একটি অপ্রত্যাশিত পরিণতি চিত্রিত করেছেন তাঁর অনায়াস ভঙ্গিমায় ও ভাষার নিজস্ব প্রসাদগুণে। 'টু অন এ টাওয়ার' আর 'দত্তা'য় লেখকদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, এ কথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে দুখানি উপন্যাসই প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সমধর্মিত্বে মনকে সমানভাবেই আকর্ষণ করে।

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগেকার কথা। শরৎদা তখন বাজে শিবপুরের গলির ভিতরে থাকেন। একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর, তিনি কলকাতা আসবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সঙ্গ নিলাম।

হাওড়ার ট্রাম লাইন পার হয়ে কলকাতা ট্রাম লাইনের ধারে এসে দাঁড়ালাম। হ্যারিসন রোডের ট্রাম ধরবো। ট্রাম আসতে প্রথম শ্রেণীর দিকে এগিয়ে চললাম। পাশে চেয়ে দেখি, শরৎ-দা দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকেই চলেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতেই উঠে বসলেন। অগত্যা আমাকেও তাই করতে হলো। ট্রামে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এই ভাল!

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম পাল্টাবার জন্যে নামলাম। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে কেউ ঔপন্যাসিককে চিনতে পেরে সম্ভ্রমে নমস্কার করলো। আমার দিকে চেয়ে বললেন, পথ হাঁটার এই বিপদ।

বিপদটা যে সত্যিই বিপজ্জনক, তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। বললাম, হেঁটেই যাবেন নাকি?

বললেন, কেন, হাঁটতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?

—মোটেই না! আপনার কষ্ট হবে, তাই বলছিলাম।

—কষ্ট হবে? কেন? হাঁটতে কষ্ট হয় বড়লোকদের, সাধারণ মানুষের আবার হাঁটতে কষ্ট হয় নাকি!

বুঝলাম, আজ তিনি সাধারণ মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। একদিন যাদের সঙ্গে এক হয়ে ছিলেন, তাদের সঙ্গেই একসঙ্গে হাঁটতে-ফিরতে আজ তাঁর ভাল লাগছে। তিনি যে সাধারণ মানুষদের ছাড়িয়ে উঠেছেন, সে কথাটা ভুলে যেতে আজ ভাল লাগছে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ভিড় ঠেলে শ্যাম-বাজারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

হাঁ, কোথায় যে আমাদের গন্তব্য, তখনো তা জানি না। জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাইনি, লেখার মতন জীবনের প্রতিদিনের কথাবার্তাতেও তিনি সাস্‌পেনস্ বজায় রেখেই চলতে ভালবাসতেন।

সুকিয়া স্ট্রীট পার হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করি, শরৎ-দা, কোথায় যাবেন? উত্তর এলো, কেন? তা না জানলে কি তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

বুঝলাম, সাস্‌পেনস্‌ ভাঙবার সময় এখনো আসেনি। এ আর্ট তাঁর অভ্যাসসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

ফুটপাথ দিয়ে চলেছি। পাশের এক বৃহৎ বড়লোকের বাড়ির সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। কান পেতে কী যেন শুনছেন। রাস্তার কোলাহল ভেদ করে কানে এলো, কাকাতুয়া জাতীয় কোন পাখির আর্ত চীৎকার।

সেই চীৎকারের দিকে কান রেখে বলে উঠলেন, শুনছো?

দেখলাম, রাগে তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

—বড়লোক! পাখি পোষবার শখ! সঙ্গে সঙ্গে দেখি হন্‌ হন্‌ করে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন। আমি কিছু বলবার আগেই দেখি, বাড়ির দরোয়ান তাঁকে আটকেছে। তখন তাঁর পোশাকের ওপর পড়েছে কংগ্রেসের প্রভাব। এবং সেই পোশাক তাঁর চেহারার ব্যক্তিত্বহীনতাকেই আরো পরিস্ফুট করে তুলেছে। তার ফলে হিন্দুস্তানী দরোয়ান রীতিমত রুক্ষকণ্ঠে তাঁকে প্রতিরোধ করে গর্জন করে উঠলো,—আরে বাবু, ক্যায়া ম্যাংতা? শরৎ-দা ব্যঙ্গের সুরে প্রত্যুত্তর দিয়ে উঠলেন, ক্যায়া ম্যাংতা!

সামনের উঠোনে একটা কাকাতুয়া ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে একটা দড়িতে নিজের গলা জড়িয়ে ফেলেছিল এবং তার ফাঁস থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল।

শরৎ-দা দারোয়ানের বাধাকে ভ্রুক্ষেপ না করে, উঠোনে সেই কাকাতুয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে ফাঁস থেকে মুক্ত করলেন।

দরোয়ান ততক্ষণে ধরে নিয়েছিলো, বোধ হয় কোন দুঃসাহসিক চোর তার মনিবের কাকাতুয়াটিকে চুরি করতে এসেছে, বা অনুরূপ একটা কিছু। তাই হাত পাকিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলো। আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, আরে ভাই! জান্‌তা হ্যায় কৌন······আমার হিন্দুস্থানীকে গ্রাহ্য না করে দরোয়ান-পুঙ্গব প্রায় একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বাড়ির প্রাঙ্গণে দুজন অপরিচিত লোককে সেইভাবে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, আপনারা? কী ব্যাপার? কাকে চান?

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না।

শরৎ-দা ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে ভদ্রলোকটিকেই প্রশ্ন করে উঠলেন, এ পাখি বুঝি আপনার? পাখি পোষবার খুব শখ আপনার, না?

হঠাৎ একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখে সেই ধরনের রুক্ষ প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক তো অবাক! প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আপনি কী বলছেন?

শরৎ-দা তিক্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলে উঠলেন, জীবজন্তু পুষতে হলে, অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন? কতক্ষণ ধরে পাখিটা যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁশ নেই।

ভদ্রলোক এতক্ষণে হয়তো ধরে নিয়েছিলেন যে ভর্ৎসনাকর্তা পাগল।

আমি তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললাম, বোধহয় চেনেন না ওঁকে, উনি হলেন শরৎচন্দ্র—

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? ঔপন্যাসিক?

আমি বললাম, হাঁ।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ হাতজোড় করে শরৎ-দার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, এভাবে যখন এসে পড়েছেন গরিবের বাড়িতে তখন—

নিমেষে শরৎ-দার গলার সুর বদলে গেল। একান্ত পরিচিতের মত বলে উঠলেন, না হে না, বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি······হয়তো দেরি হয়ে গেলো ······চলো······চলো নেপেন······

বলতে বলতে শরৎদা একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ট্রাম স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চললেন।

—এহে! বড্ড দেরি হয়ে গেল! হয়তো আর দেখা হবে না!

—কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?

—আরে চলোই না, দেখতে পাবে।

ট্রাম আসতে উঠে বসলাম। বেলগাছিয়ার ট্রাম। ট্রাম থেকে নেমে বুঝলাম আমাদের গন্তব্য—বেলগাছিয়ার পশু হাসপাতাল। হাসপাতালে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কে আছে শরৎ-দা?

মুখ ভার করে কাতর কণ্ঠে শরৎ-দা বললেন, কী যে হয়েছে ভেলির, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না···খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিল···বাধ্য হয়েই হাসপাতালে দিয়েছি···এ-ক'দিন, রাত্তিরে এতটুকুও ঘুমুতে পারিনি!

এমন সময় ভেলির ওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালাম। উঠোন থেকে কয়েকটা ধাপ, তার উপর বারান্দার ধারে ভেলির ওয়ার্ড।

শরৎ-দা হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি, অতি মৃদুকণ্ঠে বললেন, আস্তে এসো, যেন পায়ের শব্দ না হয়।

দেখলাম, জুতো খুলে পা টিপে টিপে শরৎ-দা ধাপগুলোর ওপর দিয়ে বারান্দায় উঠে চুপটি করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সংকেত করলেন, কথা বোলো না।

চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শরৎ-দা কিছুক্ষণ ধরে চুপটি করে সেই ঘরের দিকে চেয়ে থেকে তেমনি পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে ফিরে এলেন। আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, ঘুমুচ্ছে, আহা! হয়তো দু-দিনের পর আজ একটু ঘুমুচ্ছে। আমার একটু সাড়া পেলেই উঠে পড়তো! শব্দ কোরো না···আস্তে আস্তে চলো···

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে শরৎ-দা ফিরে চললেন। এক পা করে এগিয়ে চলেন আর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চেয়ে দেখেন।

এইভাবে পা টিপে টিপে শরৎ-দা গেট পর্যন্ত এলেন। গেটের বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, আর ভয় নেই, এবার কথা বলতে পার! ওখানে একটু কথা বললে আর নিস্তার ছিল! ও নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে উঠে বসতো!

তারপর হঠাৎ কী মনে করে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, হ্যাঁ হে! তুমি এই হাসপাতালের খবর কিছু জানো? এরা নিশ্চয়ই রুগীদের খুব যত্ন করে, না? কী বলো? কথা বলছো না যে? এরা নিশ্চয়ই খুব যত্ন করে, কী বলো?

কিছুই জানতাম না। তবু বললাম, নিশ্চয়ই, যত্ন করবে বৈকি।

আবার ট্রামে উঠে বসলাম। চুপ করে বসে আছেন। মুখ অন্ধকার! হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, যত্ন এরা করে নিশ্চয়ই! কী বলো?

দেখলাম, শরৎ-দার চোখ ছলছল করছে।

বলবার কথা

শ্রীমতী বাণী রায়

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, অনেক সভা ডাকা হয়েছে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা কথার বাণে যা শরৎ-সাহিত্যে নেই তারও অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করেছেন, অথচ যা আছে তা বাতাসে তুষের খোসার মত উড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে বলার কিছু নেই। সাহিত্য concrete বস্তু নয়, অত্যন্ত abstract—বহু ব্যক্তিই বহু দিক থেকে দেখবেন। কিন্তু এক-একজন পণ্ডিতম্মন্যের লেখনীর আত্মপ্রীতি মতামত সহনশীলতাকে অতিক্রম করে যায়।

কিছুদিন পূর্বে একখানি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বেপরোয়া প্রবন্ধ পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। প্রবন্ধকারের নাম এখানে উল্লেখ করছি না কারণ 'man wars not with the dead' কিন্তু সেই সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকাটি আজও স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মারাত্মক ভ্রমসঙ্কুল শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কীয় প্রবন্ধটির অদ্যাপি প্রতিবাদ ছাপা হয়নি।

সাধারণ পাঠক হিসাবে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু, উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ স্বীয় গোষ্ঠীর মতগৌরব রক্ষার্থে বিলম্বের অজুহাত দেখালেন। তারপর সারা জীবন শরৎচন্দ্র যে পত্রিকার সেবা করে গেছেন, সে পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ও প্রতিবাদ হিসাবে প্রবন্ধ ছাপিয়ে সহধর্মীর রোষ উপেক্ষা করতে সম্মত হলেন না। আমাকে বললেন, প্রবন্ধটির প্রতিবাদ অংশ বাদ দিয়ে দিতে। আমি সম্মত হইনি। অতঃপর, আনাড়ি লেখকের মতো প্রতিবাদহস্তে অন্য পত্রিকার দ্বারস্থ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদ হয় কম, যদিও ক্ষেত্র থাকে অসংখ্য। কারণ অনেক। প্রতিবাদ-প্রবন্ধে পয়সা পাওয়া যায় না, অপ্রিয় হতে হয়। বিনি পয়সার বেগার এদেশে আর যে কেউ খাটুন না কেন, খ্যাতনামা সাহিত্যিক খাটবেন না। তার ওপরে, দু-চারটি বড় বড় কথা ও বৈদেশিক কোটেশন দেখালে আমরা হকচকিয়ে যাই। সাধারণতঃ, যারা সেই সব কোটেশনের মর্মগ্রহণ করতে পারবেন, তাঁরা উনবিংশ-শতাব্দীসুলভ উন্নাসিকতায় বাংলা সাহিত্য পড়েন না। যদি বা পড়েন, তাহলে সেই রবিঠাকুর পর্যন্ত আদি ও অন্ত। যাঁরা অত্যন্ত আগ্রহে সাময়িক বাংলা সাহিত্য অনুধাবন করে চলেন, তাঁরা সাধারণতঃ L' Assimoir, Mrs Warren's Profession, Doll's House ইত্যাদির সঙ্গে এতবেশী সম্পর্ক রাখেন না যে সেই সব পুস্তক সম্পর্কীয় উক্তির ভুল ধরতে পারেন। সুতরাং ঝানু সমালোচকেরা

আমাদের গলদ ধরতে পেরে এমন টোনে সুগম্ভীর নিবন্ধ রচনা করে যান, যা আমাদের আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য মনে হয়।

উল্লিখিত প্রবন্ধটির প্রতিবাদ বর্তমান প্রবন্ধ অবশ্যই নয়। বিশেষ কোন কারণে আমার প্রতিবাদের ইচ্ছা নেই। তবু, কতগুলি উক্তি পেয়েছিলাম, যা খণ্ডন করা উচিত। বিভিন্ন সমালোচকদেরও অনেক মন্তব্য দেখেছি, এইসঙ্গে সেগুলির ভ্রান্তিও দেখানো দরকার। আমরা যাঁকে শ্রদ্ধা করি, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, অপরপক্ষের অশ্রদ্ধাকেও খণ্ডন করা। শরৎচন্দ্রকে আজ দেশ ও জাতি নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা দিয়েছে, তবু ভুল বোঝার অবকাশ আছে। তবু আমার জানার মধ্যে গলদ নাই। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে অত্যন্ত সস্তা সাধারণ ভাব প্রকাশের প্রতিবাদ করি না। যখন প্রতিমুহূর্তে আমাদের কর্তব্য প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা তখন নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য ক্ষমার্হ নয়।

আমি নিজের কানে শুনেছি 'মিস্ট্রি অব্ দি কোর্ট অব্ লণ্ডন রচয়িতা রেন্‌ল্‌ডস্-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা। পড়েছি শরৎসাহিত্যের পটভূমিকা নাকি বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব। জেনেছি উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিক পতিতা-সাহিত্য রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কথা, ১৩৫৩ সালে সেই প্রসিদ্ধ পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় এই সব ভ্রান্ত ও চিন্তাশূন্য উক্তি কালির হরফে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার চেয়েও বিস্ময়, কেউ কিছু বলেনি; পত্রিকার তরফ থেকে কোন ত্রুটি স্বীকার করা হয়নি। যা যা পূর্বে ঘটেছিল, পর্বেই বলেছি। যে সমস্ত সাহিত্যসম্রাটেরা পৃষ্ঠপোষকতা করে উক্ত পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করেন, তাঁরাও নির্বাক ছিলেন। মৃত লেখককে নিয়ে অত মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কী? কারণ তাঁর কাছ থেকে তো কোন ছাড়পত্র পাওয়ার আশা নেই।

একটি বিশেষ কারণেও উক্ত প্রবন্ধের আর প্রতিবাদ করিনি। আজও করছি না। প্রতিবাদ করা এখন সম্ভব নয়, মনুষ্যোচিতও নয়। তবু, চোখে ভুল যখন পড়েছে, তখন একেবারে চুপ করে থাকা পাপ। তাই, এখন লিখতে হচ্ছে বিশেষ ধরনে। অনুরোধ, প্রবন্ধটি সাহিত্য সমালোচনা হিসাবেই গ্রহণ করা হয় যেন। যা বলবার কথা সেটাই বলা আমার উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বহু ভ্রমাত্মক উক্তি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ধরি মাছ না ছুঁই জল' গোছের গেছো সমালোচনা বহু সাহিত্যিক করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রের রচনাদি আমরা যথেষ্ট পাঠ করেছি, কিন্তু

যুক্তি দিয়ে শরৎসাহিত্য বিচারের প্রকৃত সময় উপস্থিত। প্রথমেই শরৎ-সাহিত্যের পটভূমি বিচার করা যাক।

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের আমরা যে পটভূমিকা পাই, সেই সাহিত্যের সঙ্গে অথবা বাংলা দেশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে কতটা যোগ ছিল তা বিবেচ্য। বর্মাতে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের বহুদিন নির্বাসিত ভাবে কাটিয়েছিলেন। সেই সময় মনে হয়······"ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে যে নবীন বাংলাসাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল, আমি তার কোন খবরই জানিনে।"

রবীন্দ্রনাথের সামান্য কয়েকখানা বই ছিল তাঁর অবলম্বন······"কি কাব্য কি কথাসাহিত্যে আমার এই ছিল পুঁজি।" ···(জয়ন্তী উৎসর্গ)। যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়কে লিখিত পত্র থেকে জানা যায় ···"আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলো সম্বন্ধে প্রায়ই কিছু জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না।"······অন্য একটি পত্রে···"আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন, কিন্তু আমার বাংলা বই নাই। মাসিক পত্রও একটা লই না।"······

নানাদিক থেকে আলোচনায় দেখা যাবে শরৎচন্দ্র তখন বর্মাতে নিরুপদ্রব কেরানী-জীবন গ্রহণ করে বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি বই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছিল সেগুলোতে তৎকালীন বঙ্গসমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থা কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল, তা আলোচনাসাপেক্ষ।

তাহলে শরৎসাহিত্যের প্রকৃত পটভূমিকা কী? শরৎচন্দ্র যে 'ভুঁইফোঁড়' লেখক নন এই উক্তির সমর্থন সূত্র ধরে বহু প্রবন্ধকার পাশ্চাত্যচিন্তার গোলক-ধাঁধায় পাঠকদের আহ্বান করেছেন। কিন্তু শরৎসাহিত্যের প্রকৃত পটভূমিকা আঁকবার জন্যে শরৎচন্দ্রের কিশোরকালের পঠন-পাঠন এবং জীবনযাত্রাই বিশেষভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে সদ্যঃপ্রকাশিত 'যমুনা' পত্রিকার জন্য বন্ধুদের অনুরোধে শরৎচন্দ্র সাধারণ্যে সাহিত্যিকরূপে প্রথম কলম ধরলেও প্রকৃতপক্ষে সেই স্মরণীয় সাধনার সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পূর্বে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবন সূচিত হয়।

কিশোর বয়সে শরৎচন্দ্র 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ' ইত্যাদি ছোট উপন্যাস ; 'অনুপমার প্রেম' 'বেনাবন', প্রভৃতি গল্প রচনা করেছিলেন। পরে সেগুলি যথাযথ অথবা সামান্য সংশোধিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্যের চর্চা শরৎচন্দ্র রাখতে পারেননি।······"আমি যে

কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথা ভুলে গেলাম।”......(‘শরৎ-সাহিত্য পরিচয়’—শনিবারের চিঠি—মাঘ, ১৩৫২)। কিন্তু ‘দেবদাস’, চন্দ্রনাথ’ প্রভৃতি লেখাতেই শরৎচন্দ্রের রচনার মর্মবাণী বেজেছে। সেই সুরের ক্রমবিবর্তন শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনার মূল। সুতরাং এই সময়ে ভাগলপুরে যে সব আন্দোলন চলেছে সে-সব, এবং শরৎচন্দ্রের উপর যেসব সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল তার সম্যক আলোচনাই বাংলা সাহিত্যে শরৎসাহিত্যের আবির্ভাবের কারণকে প্রকট করবে, ইউরোপীয় সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা নয়। “পাশ্চাত্য প্রেরণালব্ধ বাংলার নব্যভাবের জন্য অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা”—তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেনি। তাঁকে মুখর করেছিল স্বকীয়তার সঙ্গে কয়েক-জন বঙ্গীয় পূর্বসূরীদের প্রভাব মিলিত হয়ে। সে সমস্ত সাহিত্যিক প্রভাব শরৎচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন এবং যেসব প্রভাব তাঁর উপরে সুস্পষ্ট দেখি সে সব সাহিত্য এই বাংলার প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য। শরৎচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে কিশোর কালে তিনি স্বীয় পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্ধ-সমাপ্ত ছোটগল্প, উপন্যাস নাটক ইত্যাদি নিয়ে ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা’ কাটিয়ে দিয়েছেন, (‘বাতায়ন’—শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪)...... “অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতের বৎসর বয়সে আমি গল্প লিখতে সুরু করি।”......

দ্বিতীয় প্রভাব, কতকগুলি তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাংলা পুস্তক।—“বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’, আর বেরোলো ‘ভবানীপাঠক’—ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক।”

তৃতীয় প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের উপরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছেন শরৎসাহিত্যের বিশেষ রূপে। শরৎচন্দ্র বলেছেন: “রবীন্দ্রনাথের ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ আত্মীয়ের মুখে শুনে তার আমারও চোখে জল এল।” এই প্রভাব কিশোর-রচনা ‘চন্দ্রনাথে’ কৈলাসখুড়ো ও বিশুর কাহিনীতে ধরা পড়ে। ঘটনা-সংস্থানের ওপর নির্ভর না করে চরিত্রের অন্তর্লীন ভাববিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর পরিণতি দেখানোর ভঙ্গিটিও রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রে নেমে এসেছে।

‘চোখের বালি’ যখন ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার কথা স্মরণ করে শরৎচন্দ্র বলেছেন:—“সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না।... ...এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।”

তারপরেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে "সাহিত্যের ছাড়াছাড়ি" হলেও এই প্রভাব তাঁর অন্তরমন পূর্ণ করেছিল। তাই ১৯১২-১৩ সালে লেখা পরিণত বয়সের উপন্যাস 'চরিত্রহীনে' 'চোখের বালি'র সুস্পষ্ট প্রভাব দেখি। বিধবার ভালোবাসার তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুকিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ও প্রেমাস্পদের উপর প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে প্রেমাস্পদের স্নেহপ্রীতির জনকে প্রেমের অভিনয়ের দ্বারা আঘাত—এ চিত্র, জনৈক প্রবন্ধকারের সাফাই পাওয়া সত্ত্বেও, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে অসম্ভব" হয় নি। 'নষ্টনীড়', 'ঘরে বাইরে', 'নৌকাডুবি', 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি আখ্যায়িকা যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তববাদী। অতিশীলতা সেখানে শিল্পকলাকে ব্যাহত করেনি। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' নৌকাডুবির রূপসৃষ্টি দেখি, 'স্বামী' ঘরে বাইরেকে মনে করায়।

চতুর্থ প্রভাব, বঙ্কিমচন্দ্র। হরিদাসের গুপ্তকথার পরের পর্যায়ে · "এইবার পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ··। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল।···সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।"·· (জয়ন্তী উৎসর্গ)

বহু সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাননি, পেয়েছেন সাগরপ্রমাণ ব্যবধান। এইখানেই আপত্তি। লেখক বলেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের মত কোন সমস্যা বা প্রশ্নের ভড়ং তোলেননি।"

তাহলে 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি বইগুলির সার্থকতা কী? প্রত্যেকখানিতেই ইউরোপীয়-সাহিত্যসুলভ প্রচলিত ত্রিভুজের অঙ্গীভূত নায়ক-নায়িকা ও নিষিদ্ধ প্রেম। এ ভিন্ন, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যার সাক্ষাৎ বঙ্কিমচন্দ্রে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র সে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন চতুষ্পার্শের জগতের মাটিতে দাঁড়িয়েই—"বিশ্বামিত্রের মত স্বীয় সৃষ্ট জগতের বিজনতায়" নয়।

শরৎচন্দ্রও তাঁর পুস্তকে এই সমস্ত সমস্যা, যা চতুষ্পার্শেই ছিল, নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কিন্তু সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পাননি। প্রভেদ সেইখানে, সমস্যার অভাবে বা উদ্ভবে নয়। যথা: বিষবৃক্ষের সমস্যা শরৎচন্দ্র নানাভাবে অবলোকন করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমী সমস্যার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রে সূর্যমুখী ছিল, কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখীর সংঘাত সেখানে অবশ্যম্ভাবী, লৌকিক মতই সেখানে বড় কথা নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'মাধবী' 'হেম' 'অপর্ণা' এই জটিলতার অঙ্গীভূত নয়, তবু তাদের প্রেম বা জীবন কোনটাই সফল হল না। অথচ শরৎচন্দ্রের মতে ভালোবাসা জীবনের চরম বিকাশ, তাহলে এই ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? শরৎচন্দ্রকে বহু লেখক সাহসী ও

উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিক বলেছেন। কিন্তু লোকমতকে শিরোধার্য করে যিনি রামচন্দ্রের ত্যাগে প্রশ্রয় দিলেন, তিনি "বৈরাগ্যের ভড়ংকে ধূলাশায়ী করেছেন" বলা চলে না ; শরৎচন্দ্র "নতুন শক্তিতত্ত্বের উষ্ণতার মধ্যে বর্ধিত হয়েছেন—দায়ভূত বৈষ্ণবাদর্শের নিঃশেষ সমর্পণের মধ্যে নয়।" কথাগুলি যথার্থ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্রের অগ্রগতি কতদূর দেখা যাক।

শরৎচন্দ্র "সমাজসংস্কারক" বা বিপ্লবী সাহিত্যিক নন সত্য ; কিন্তু তিনি কোন "নৈতিক স্বাধীনতার নূতন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেননি"—একথাও চিন্তাশীলের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বরঞ্চ সমস্যার সমাধানে পশ্চাৎপদ হলেও শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতিটি অক্ষর বলে দেয় তাঁর মনের সহানুভূতি কোন দিকে। 'আঁধারে আলো'র বিজলী, 'শ্রীকান্তের' পিয়ারী গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদা পায়নি, কিন্তু তাদের সৃষ্টিকর্তার মত যে ছিল অন্যরূপ, একথা অনভিজ্ঞ পাঠকের চোখেও ধরা পড়ে। সেখানেই শরৎচন্দ্রের প্রকৃত বিশেষত্ব। সমাজের বাঁধাধরা রূপ বাসনই শরৎচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আপাত দৃষ্টিতে লক্ষণীয় বিচারবিধির পশ্চাতে যে আর-একটি সূক্ষ্ম বিচারবিধি আছে, এবং সেই বিধিতে বহু জিজ্ঞাসার উদ্ভব হতে পারে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র অবহিত ছিলেন। সেই জন্য তাঁকে নিষ্ক্রিয় সমাজসংস্কারক বলাও চলে। দেবদাসের সঙ্গে চন্দ্রমুখীর বিবাহ ও পার্বতীর গৃহত্যাগ তিনি ঘটাতে পারেননি, সাবিত্রীকে যক্ষ্মারোগীর সেবায় নিয়োজিত রেখে, কিরণময়ীকে উন্মাদ করে যা নিন্দিত, গর্হিত ও তুচ্ছ, তাকে মাল্যভূষিত করবার দায় এড়িয়েছেন। 'পথ-নির্দেশের' গুণীকে বৈরাগ্যগ্রহণ, 'বামুনের মেয়ে'র সন্ধ্যা-জ্ঞানদাকে দেশান্তরে গমন করিয়ে শরৎচন্দ্র নিষ্ক্রিয় সমাজসংস্কারক সেজেছেন, কিন্তু অন্যায়ের সমালোচনা করতে বিরত হননি। প্রতিটি বস্তুর সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য শরৎচন্দ্র অন্বেষণ করতে চেয়েছেন। ধর্ম, নীতি, সমাজ—সমস্ত কিছুর অন্তর্লীন ফাঁকি বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার ক্ষুধা ছিল শরৎচন্দ্রের। এই জন্য তাঁর মানসিক প্রবণতা কিছুটা আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে তুলনীয়—অর্থাৎ সত্যান্বেষক। মানুষের দুঃখবেদনার সমাধান যে হৃদয়ের ইঙ্গিত মেনে চললে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর এবং শুষ্ক বিচারবুদ্ধির পীড়নে বঞ্চিত মানুষের হৃদয়দাহ যে চিরন্তন ট্র্যাজেডি—এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করবার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার অগ্রগতি। শরৎসাহিত্যে দেখি, হৃদয়ের যেসব বৃত্তি জনমতঅনুমোদিত নয় সেইসব বৃত্তির প্রতি লেখকের প্রগাঢ় সহানুভূতি। প্রেমের আলোচনায় দেখি শরৎচন্দ্রের নায়কনায়িকারা স্থানকালপাত্রভেদে সামাজিক শাসন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নির্বিচারে ভালোবেসেছে। সেই প্রেমে মিলন

শরৎচন্দ্র দেখাতে পারেননি, কিন্তু প্রেমকে স্বীকার করতে তিনি দ্বিধা করেননি। শেষ পর্যন্ত লৌকিক ও সামাজিক অনুশাসন শরৎচন্দ্রের নরনারী গ্রহণ করেছে সত্য কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে গ্রহণ করতে পারেননি।

বঙ্কিমী যুগের প্রধান আবেদন মানুষের আদর্শবাদের মহনীয় গৌরবে—"যাও প্রতাপ,······সেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।······লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না।"

কিন্তু দুর্বল মানুষের দোষত্রুটি, স্খলনপতন নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করে পতিত মানবাত্মার সঙ্গে সহানুভূতির অশ্রুবিসর্জনে শরৎচন্দ্র একপদ অগ্রসর হয়ে এলেন—

"দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়।······মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে,······মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।'

শরৎচন্দ্রের মত, সতীত্ব অথবা সাধারণ-স্বীকৃত কোন আদর্শচ্যুত হলেও মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য দিতেই হয়। মানুষের মূল্য সে মানুষ হিসাবেই, নৈতিক আদর্শের মাপকাঠির হিসাবে নয়। এই সমবেদনা ও সহানুভূতি শরৎ-সাহিত্যের প্রাণ। এইখানেই তাঁর সাহিত্যিক মূল্য স্থাপিত। কশ্চিৎ প্রবন্ধকার বর্ণিত "পূতিগন্ধময় কামিনী কাঞ্চনে ভরপুর রাজত্বের ঝরোকা উন্মুক্ত করবার জন্য" এবং "যৌনতত্ত্বের হেরফের প্রকাশের জন্য" নয়।

শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে বহু সমালোচক ক্রমাগত পতিতার নামোল্লেখ করে বিরত হয়েছেন।

কিন্তু শরৎসাহিত্যে প্রধান সমস্যা পতিতা নয়, বিধবা, বিশেষতঃ বাল-বিধবা। পতিতা দেবীরূপ ধারণ করলেও শরৎচন্দ্র তাকে পাঙ্‌ক্তেয় করেননি—সমাজের বাহিরে তাকে চরমদণ্ডে অভিশপ্ত করে রেখে দিয়েছেন। উচ্ছৃঙ্খল দেবদাসও চন্দ্রমুখীর সেবা একান্ত প্রয়োজন জেনেও তাকে সঙ্গে নিতে অস্বীকার করল। "আর যাই হোক, এ জগতে তাহার সম্মান নাই।" শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর মুখে শুনি, "একটা বেশ্যাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া মনটায় কালি মাখিও না।" বাধাবন্ধনহীন শ্রীকান্তও পিয়ারীকে তার গ্রামের বাড়িতে নেওয়ার প্রস্তাবে শিহরিত হল। সমাজ যাকে বাহিরে রেখেছে অথবা যে একদিন স্বেচ্ছায় বহির্গামিনী হয়েছে, কোন রকম কর্মের দ্বারাই যে সে মনুষ্যত্বের দাবিতে সমাজব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে না, এই সামাজিক শাসন শরৎচন্দ্র দুর্লঙ্ঘ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই এইসব অপাঙ্‌ক্তেয় চরিত্র সমাজের

বাহিরেই পড়ে আছে। শরৎচন্দ্র সাহিত্যে কতটা "উচ্ছৃঙ্খল" ছিলেন অথবা অবনত, গলিত-রাজ্য সাহিত্যে পাঙ্‌ক্তেয় করেছিলেন" সে বিষয়ে এখন বিবেচ্য। সেই পত্রিকাটিতে প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্রকে "পতিতাদের নষ্টনীড়ের এই তথাকথিত ঋষি" "পতিতাদের অন্তরঙ্গ তথ্য উদ্ঘাটনে শূর" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কিন্তু, শরৎচন্দ্র পতিতা দিয়ে কাহিনী আরম্ভ করে দেবীতে শেষ করেছেন। এ কথা শরৎসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নজির—"সকল সম্প্রদায়ের গণিকাদের মধ্যেও উঁচুনীচু আছে"—(শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়কে লিখিত পত্র)। "কোন কয়লার খনি হইতে কি অমূল্য হীরামানিক ওঠে"—(শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র)।

শরৎচন্দ্র যে অন্তরঙ্গ তথ্য-উদ্ঘাটন করেছেন সে তথ্য পতিতার নয়—প্রেমিকার।

অন্যদিকে, বিধবাকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে নানারূপ প্রশ্নের আবির্ভাব হয়েছে। সমাজের একাঙ্গ বিধবার হতশ্রী জীবনপ্রণালীতে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। বিফল হয়ে যাওয়ার দণ্ড শরৎচন্দ্র গুরুতরই মনে করেছেন। কেন এরকম হবে ? 'পল্লীসমাজে' বিশ্বেশ্বরীর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শরৎসাহিত্যে ক্রমান্বয়ে করা হয়েছে।

শরৎসাহিত্যের এই প্রধান সমস্যা বাংলাদেশে একান্ত নিজস্ব। জাতিভেদ ও বিধবা সমস্যা আকারে বাংলাতেই আছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে ফলিত পারিবারিক সমস্যার রূপ শরৎচন্দ্র এদেশে এনে জনপ্রিয় হয়েছেন, এরকম অশ্রদ্ধার কথা বহুবার পড়েছি। কিন্তু বিধবা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় সমস্যাই নয়। এদেশে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি আখ্যায়িকা এই সমস্যা বিশদভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। রমেশচন্দ্র সমাধানের চেষ্টা করেছেন (সংসার ও সমাজ)। শরৎসাহিত্যের অন্যান্য সমস্যারও জন্ম দেখি এই বাংলার মাটিতে (বামুনের মেয়ে, পল্লীসমাজ, দত্তা ইত্যাদি)। প্রবল স্বকীয়তার সঙ্গে দেশের মাটির যোগ শরৎচন্দ্রকে বাংলার প্রাণউৎসের সন্ধান দেখিয়েছে। পতিতার সমস্যার আভাস পাই 'কপালকুণ্ডলার' লুৎফ-উন্নেসা চিত্রে। 'রাজসিংহে'র জেবউন্নেসাও এদিকে আলোকপাত করে। 'বিষবৃক্ষে' হীরার গৃহবর্ণনার অঙ্কুর বিকশিত রূপ ধারণ করেছে যাতে সাহিত্যে পতিতা সম্পর্কে লিখবার প্রেরণা শরৎচন্দ্রকে এদেশই দিয়েছে, কোন পাশ্চাত্য সাহিত্যপঠন নয়। শ্রীযুক্তা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র—"আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম।"

'চন্দ্রনাথে' সরযূর সমস্যার অগ্রদূত 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা। কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দের, জাহাঙ্গীর ও মেহরের নিষিদ্ধ প্রেম পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রে দেখি। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার, হেমচন্দ্র মৃণালিনীর পূর্বরাগের বিশদ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রে পাই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, "পাশ্চাত্য প্রেরণাক্ষুব্ধ দেশের অনুভূতিকে প্রকট করবার জন্য" শরৎচন্দ্র এক সম্পূর্ণ বিজাতীয় পথে চলে গিয়ে সস্তা নাম করেননি। সে পথের চিহ্ন বঙ্কিমে ছিল, রবীন্দ্রনাথে ছিল। শরৎচন্দ্র নানা বয়সে বৈদেশিক সাহিত্য অল্পবিস্তর পাঠ করলেও প্রভাবগ্রস্ত হননি। সাহিত্য-সাধক চরিতমালার ৫২ নং পুস্তিকায় দেখি রায়বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের বাল্যকাহিনী' প্রসঙ্গে বলেছেন,—"শরৎচন্দ্র যখন লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জীবনের যে অংশে তিনি তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করিতেছিলেন, তখন আমি তাহাকে কখনও কোন পুস্তক অধ্যয়ন করিতে দেখি নাই।"

এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা কিছু বিস্তার লাভ করলেও শরৎচন্দ্রকে খাঁটী বাঙালী বলা চলে। কারণ, বাংলার বিচিত্র সমাজব্যবস্থার আলোচনা এবং, মধ্যবিত্ত সমাজের হৃদয়মূলক নানা সমস্যা দেখা দিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সীমায়। অতিসাধারণ নরনারী, অতিপরিচিত গৃহ আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হল। একটি বিরাট পল্লীসমাজ নাগরিকের চক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। অথচ, এখনও কারো কারো মুখে শোনা অসম্ভব নয় যে, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত সমাজ-চেতনা ছিল না!

অতিবাস্তব বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করা চলে না। ইউরোপে যেসব সাহিত্যিক নব চাঞ্চল্য এনেছিলেন এবং বঙ্গীয় সুধী-সমাজে প্রভাব ফেলেছিলেন, তাঁদের সাধনপথ শরৎচন্দ্রের থেকে ভিন্ন। তাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা শুনেছি যথেষ্ট। মোটামুটি ভাবে কয়েকজনের কথা আলোচনা করা যাক।

জোলার 'নানা' সুখে, দুঃখে, সম্পদে-দারিদ্র্যে, প্রেমে-বিরাগে শেষপর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেল। শরৎ-সাহিত্যে পতিতা পতিত রইল না শেষপর্যন্ত আমরা দেখেছি। L'Assommoir-এর আলোক-চিত্রধর্মী রচনা শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। "প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, সে কি ছবি হবে?"—('সাহিত্য ও নীতি')—শরৎচন্দ্র। রসিক-মাত্রেই স্বীকার করবেন এ উক্তির যাথার্থ্য। "অবনত গলিত রাজ্যকে পাঙ্‌ক্তেয় করে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় হয়েছেন'—এ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

ফ্লোবারের 'মাদাম বোভারি' শরৎসাহিত্যের সহধর্মী নয়। ফ্লোবার

নিজেও নিরপেক্ষ চিত্র গ্রহণ করেছেন। ইবসেনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র সমশ্রেণীতে পড়বেন না। কারণ, ইবসেনী সাহিত্যের আবেদন বুদ্ধিতে, শরৎসাহিত্যের আবেদন হৃদয়ে।

শ-এর সঙ্গে শরতের পার্থক্য একটি বই দেখলেই বোঝা যাবে। 'বামুনের মেয়ে'তে সন্ধ্যা তার পিতার জন্মকাহিনী শোনার পরের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রোফেশন' পুস্তকে ভিভী ওয়ারেনের নিজের জন্মরহস্য শোনার পরের প্রতিক্রিয়া তুলনীয়।

যদি বলা যায় শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক কতকগুলি ভাবধারা এসেছিল যার জন্য দেশ অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত ছিল, তাহলে ঠিক বলা হবে কি? পূর্বেই দেখেছি শরৎচন্দ্রের পুস্তকের সমস্যা, চরিত্র, আবহাওয়া, টেক্‌নিক, নীতি—সবকিছুই ছিল এদেশীয়। বিশ্ব-সাহিত্যে সর্বহারাদের যে বিশেষ স্থান আছে, শরৎসাহিত্যে সেই জনতা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তিনি স্বীকার করেছেন, যদিও ব্যক্তিগত বিদ্রোহে প্রকাশ্যে উৎসাহ দেখান নি। সমাজের নিম্নস্তরের পক্ষে ওকালতি তাঁর ব্রত ছিল না। তাঁর প্রিয় গবেষণা ছিল মনোলোক। একখানি পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন—"আমি মানুষের হৃদয় বুঝি।" একথা সত্য।

ধনিক-শ্রমিকের সংগ্রাম, নিঃস্ব নরনারীর অনটনের ব্যথা তাঁকে যত না মুখর করেছিল, তার থেকে অনেক বেশী মুখর করেছিল সামাজিক শাসনে বিপর্যস্ত তরুণজীবনের মুক্তিপ্রয়াস। সমাজবিচ্ছিন্ন নরনারী তিনি অঙ্কন করতে চাননি। তাই শেষ মুহূর্তে গ্রাবা নাটকের 'Dieu et machine'-এর প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর রচনায়। 'পথনির্দেশে' জটিলতার বাহিরে পথ শরৎচন্দ্র অতি সহজেই নির্দেশ করেছেন। যথা:—"অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে, যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়—রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ ··সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, বিরহেই মধুর।"

এই বৈষ্ণবীয় নিষ্কাম জীবনবাদকে ক্রমাগত প্রাধান্য দেওয়ার জন্য শরৎসাহিত্যের যে সুর, তাকে উচ্ছৃঙ্খল বা দুঃসাহসী বলা চলে না। বঙ্কিমে যে সব সমস্যা, শরৎচন্দ্রে কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন। তবু, শরৎচন্দ্রের সমস্যা সমাধানে নেতিবাচক মনোভাব দেখে তাঁর প্রগতিবাদের অসম্পূর্ণতাই চোখে পড়ে। কাজেই "শরৎসাহিত্যে বৈরাগ্যের ভড়ংকে বিনা সঙ্কোচে ধূলাশায়ী করা হয়েছে" একথা পড়লে বিস্মিত হতে হয়।

'পণ্ডিত মশাই'তে দেখি সর্বস্ব ত্যাগ করে কুসুম ও বৃন্দাবনের জনহিতার্থে

দেশান্তর যাত্রা। রাজলক্ষ্মীর সার্থকতা শ্রীকান্তের গৃহে রাজরানী রূপে নয়, আত্মব্রহ্মচারিণী কমললতার শিষ্যারূপেই। মৃণালের নিজস্ব রূপ সুরেশ'-মহিমের সম্ভবপরা বধূরূপে নয়, সর্ববঞ্চিতা ব্যথিতা রূপেই। বিরাজ সংসারে ফিরতে পারল না, যদিও লঘু পাপে গুরুদণ্ড তার পূর্বেই হয়েছিল, 'বামুনের মেয়ে'র সন্ধ্যাও শেষে তুচ্ছ প্রেমের উর্ধ্বে বড় কিছুর আশায় যাত্রা করল। 'পল্লী-সমাজে'র রমা রমেশ দত্তের সুধার মত সগৌরবে সমাজে স্থান পেল না। চন্দ্রমুখী, সাবিত্রীর পরিণতি দেখলাম। বঙ্কিমী পথেই শরৎচন্দ্র অবশেষে চলে গেলেন—সে পথ ত্যাগের। বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মানুষের পাপের স্খালন করেছেন, রবীন্দ্রনাথে বৃহত্তর শক্তিকে প্রণামের সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির বিধান দেখেছি। শরৎচন্দ্রে সেই শুদ্ধি ত্যাগে। উৎকট দুঃখের পরও সুখের বা ভোগের যোগ্যতা পাওয়া গেল না। তাই বিরাজকে মরতে হল, কিরণময়ীকে পাগল হতে হল। গৃহদাহের অচলার দুঃসাহসের পরিণতি চন্দ্রশেখরীয় যুগের শৈবলিনীকেই মনে করায়। শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীলতা বৈরাগ্য বা নিষ্কাম জীবনবাদের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত। "দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন" সম্ভব হল না। "শরৎচন্দ্রের পরকীয়া কলিকাতার অলিগলির পাকচক্রে দেখা দিলেন" বটে ; কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, শেষ পর্যন্ত উঠে গেলেন ওই গোলকের উর্ধ্বচক্রে। কাজেই, একদল লোক শরৎচন্দ্রকে যে শ্রেণীতে ফেলে উল্লাস প্রকাশ করেন, শরৎচন্দ্র সে শ্রেণীভুক্ত নন। বেদ ও উপনিষদের দেশের সন্তান শরৎচন্দ্র পরদেশী ছিলেন না। অশ্লীলতার অপবাদ দিয়ে তাঁর রচনার বিচার মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য। তিনি শেষ পর্যন্ত কী বলেছেন, সেটাই বড় কথা। কিসের মধ্যে দিয়ে বক্তব্যকে টেনে নিচ্ছেন, সেটা গৌণ।

সন্ন্যাসের অপেক্ষা বড় বস্তু শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, কিন্তু সেও নূতন নয়। উদাহরণতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দেখি পরিশিষ্টাংশে গোবিন্দ-লালের উক্তি......'আমি শান্তি পাইয়াছি'......শচীকান্ত বিনীত ভাবে বলিল, 'সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায় ? গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, 'কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎপাদ-পদ্মে মনস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর,—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বঙ্কিমী মতবাদই সমস্যা সমাধানে শরৎচন্দ্রের আশ্রয় হয়েছিল, যদিও শরৎচন্দ্র প্রত্যেকবারই পূর্বগামীদের দৃষ্টান্তে সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে তাঁর প্রগতির বোঝাপড়া আপোসে নিষ্পত্তি করেছেন, তবু আধুনিক মননশীলতাও শরৎচন্দ্রে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রধান উপজীব্য না হলেও তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজকে কলের মত অনুসরণ না করে মানুষের নিজের দাবি সমাজের বিরুদ্ধে জানাবার অধিকার আছে, এই তথ্য শরৎচন্দ্রের দান। আবার স্বাধীনতা-সম্পন্ন মানুষ ফিরে গিয়ে সুস্থ ও সুন্দর সমাজের কাঠামোকে তুলে ধরে বহন করবে, এ-ও শরৎচন্দ্রের মত। গণ-সাহিত্যের বীজ এখানে নিহিত। 'দেনা-পাওনা'তে জীবনানন্দের প্রশ্ন দেখি: "কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমার পুরুষানুক্রমে জমাকরা ঋণ?" ষোড়শীর উত্তরে: পুরুষানুক্রমেই তা শোধ করতে হবে।"

'বড়দিদিতে' সুরেন্দ্রনাথের মুখে—'দুঃখীর রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি?'

বৃন্দাবনের শেষ কথায় যে সুর পাই সেই সুরই দেখি আধুনিই বঙ্গসাহিত্যের মর্মবাণী:—"যারা আমাদের মুখের অন্ন পরনের বসন যোগায়—সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এই গ্রামেই বাস। তাঁদিগকে দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁতলে আপনাদের ওপরে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি হয়েছে।'

এই মতবাদ নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের অগ্রগতির দ্যোতক। সুতরাং বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা ধরা যায় অনায়াসে।

যে সমালোচকের উক্তি এতক্ষণ ধরে বহুল উদ্ধৃত করে খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা করছি, তাঁর আরও একটি উক্তি নিয়ে আলোচনা করবো। এ আলোচনা প্রতিবাদ নয়, অন্যের মতামতের সঙ্গে তুলনায় নিজের মত যাচাই করে নেওয়া। সেই প্রসিদ্ধ পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল: (উক্তিগুলির মধ্যে কোন মিল নেই, অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী।)—'ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্র···সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যের শাসন মেনে চলেছেন।'

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্তা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি থেকে জানা যাবে—"আমি খাওয়া-ছোঁয়ার বাছবিচার করি না।"····· মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত চিঠি···"কতকগুলো পাঠকে মনে করে যেখানে সেখানে যপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দুধর্মের বড় বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোনমতেই ভাল হইতে পারে না···" আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে—আপনার আর রক্ষা থাকিবে না—মার মার্ শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে—"

শরৎচন্দ্রের জীবনযাত্রার বেপরোয়া প্রণালীও উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যেও দেখি ব্রাহ্মধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি বারে বারে বিদ্রূপ করেছেন। লৌকিক ধর্মকে প্রধান মর্যাদা তিনি দেননি। ধর্ম মানবজীবনে মহাসত্য এবং শরৎচন্দ্রের মতে—"সত্যের স্থান মুখে নয়, বুকের মধ্যে।"

প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সর্বসমাজের অশিবকে দেখানো। সেইজন্য সময় ও স্থান-বিশেষে শরৎচন্দ্র কখন ব্রাহ্মবিদ্বেষী, কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও শূদ্র। বামুনের মেয়ে, পল্লীসমাজ, একাদশী বৈরাগী, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি আখ্যানে হিন্দু সমাজের অনাচারের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র বিচলিত লেখক। 'মহেশে' মুসলমান গফুরের প্রতি সমবেদনায় তিনি বিচলিত। 'নববিধান', 'শেষপ্রশ্ন', 'অনুরাধা' প্রভৃতিতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কঠোর সমালোচনা পাই। 'দত্তা'তে দেখি ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভণ্ডামিকে আঘাত। কিন্তু প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্রকে 'ব্রাহ্মবিদ্বেষী' বলে অন্যায় করেছেন। 'দত্তা'য় যেখানে রাসবিহারী সেইখানেই দয়াল। এখানে বরং 'গোরা'র টেক্‌নিক দেখি। বিজয়া, নলিনী (দত্তা), লাবণ্য (সতী) ইত্যাদি মধুর ব্রাহ্মমহিলার চরিত্র সৃজন বিদ্বেষকে বোঝায় না। 'পরিণীতা'র মহৎ চরিত্র গিরীনও শরৎ-চন্দ্রের সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্রের বহুগ্রন্থে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা আছে। অন্য ধর্মের সংঘর্ষে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারবিচার সম্পর্কে অভিমত শরৎচন্দ্রের অভ্যাস। সে সব রচনা পাঠ করার পরেও শরৎচন্দ্রকে শাস্ত্রনীতির একান্ত বশ্য ব্রাহ্মণ রূপে চিত্রিত করা অত্যন্ত একদেশদর্শী সমালোচনা। ধর্মের বিশেষ কোন শ্রেণীতে টিনে-অাঁটা বিস্কুটের মত লেবেলবন্দী আর যে লোককেই করা চলুক, শরৎচন্দ্রকে চলে না।

যে কোন প্রতিভাকেই বিশেষ একটা শ্রেণীতে আবদ্ধ করা চলে না। অথচ আমরা সাধারণতঃ সমালোচনা করতে বসে শুধু লেখকের লেখা নয়—তাঁর জীবন সম্পর্কেও রায় দিই ভাল করে না বুঝে। প্রতিভার দৈনন্দিন কার্যকলাপ স্ব-বিরোধী হলেও সৃজনকর্মসীমায় তাঁর প্রকৃত জীবন-দর্শন লেখা থাকে। সাধারণ জীবনে গগনস্পর্শী প্রতিভাকেও অনেক সময় সাধারণ লাগে। তাই চরিত্রবিচারের প্রচেষ্টা না করে রচনা-বিচারই করা উচিত।

শরৎচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে যে কয়েকটি স্থূল অপবাদ এখনও দেখা যায় সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করলাম। শরৎসাহিত্য একটা বিচিত্র সাহিত্য, সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, রক্ষণশীলতা, প্রগতি—সব মিলিয়ে এর ভিত্তি। নগরের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ক্রিয়াকলাপ থেকে নগণ্য পল্লীপ্রান্তরে এর গতি। মহীয়সী সুমিত্রার পাশেই অরক্ষণীয়া জ্ঞানদা। ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতার সঙ্গে কত বিভিন্ন চরিত্র। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মাটির প্রতি অপরিসীম মায়া। জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলির সঙ্গে অন্তরের বন্ধনপ্রয়াস। কী সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে, কী বিনা আয়াসে।

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে নানা সুলভ উক্তির মধ্যে বিনা চিন্তায় বলা একটি বিশেষণ কিন্তু অত্যন্ত যথার্থভাবে কথাশিল্পীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। সাধারণ ছোট একটি কথা।—'দরদী শরৎচন্দ্র।' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে যেমন 'মহাত্মা' বলাই তাঁর একমাত্র বর্ণনা দেওয়া, তেমনি 'দরদী' শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণ। তাই তিনি সকলের হৃদয় জয় করেছেন, তাই তাঁকে ভোলা যায় না। আজ পর্যন্ত কোন কথাসাহিত্যিক এমন দরদ দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষকে দেখাতে পারেননি। ওই তো শরৎচন্দ্রের 'সোনার কাঠি', পাঠকের মনের গুপ্তদ্বারের চাবিকাঠি। 'বিপ্রদাস', 'শেষপ্রশ্ন' ভুলে যাবো, কিন্তু 'রামের সুমতি', 'অরক্ষণীয়া' ভুলতে পারবো না। 'মেজদিদি' 'পণ্ডিত মশাই' 'বিরাজ বৌ' 'পল্লীসমাজ' কেবল ব্যথা ও বেদনার সু-নিবিড় আকর্ষণে চিরদিনই আমাদের বুদ্ধিপ্রখর মানসকে অভিভূত করে যাবে। মানুষের প্রতি চিরন্তন মনুষ্যত্বের আবেদন। সাহিত্যবিচারের কষ্টিপাথর তার সঠিক মূল্য দেবে কিভাবে? যে আমাকে কাঁদায়, তার যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার আমি করবো কেমন করে?

শরৎ-সংবর্ধনা

সুনীল দাস

রবীন্দ্রসমকালীন শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র যেমন খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। । দেশবাসী তাঁর এই দানের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে শরৎচন্দ্রকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অসামান্য দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে দেশের বিভিন্ন বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে জগত্তারিণী স্মৃতি সুবর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। শরৎচন্দ্রের পূর্বে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এই পদক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে শরৎচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষার বাংলার প্রশ্নপত্ররচয়িতার পদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। এই সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় নিজেকে ঠিক মত সাহিত্যসাধনায় মগ্ন রাখতে পারেন নি বলে উল্লেখ করেন। ১৩৩৩ সালে সুরমা উপত্যকা ছাত্রসম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে শরৎচন্দ্র শিলচর যান। শিলচর ছাত্র সংঘ তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে একটি মানপত্র প্রদান করেন।

১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র সাড়ম্বরে শরৎচন্দ্রের বাহান্নতম জন্মোৎসব পালন করা হয়। বাংলার এই লোকপ্রিয় কথা-শিল্পীর প্রথম জন্মজয়ন্তী পালন করলেন শিবপুর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগী সভ্যবৃন্দ—সুবোধ রায় (কার্যকরী সম্পাদক), কবি জগদ্বন্ধু মিত্র, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, অরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। হাওড়ার এই শরৎ-অনুরাগীর দল সারা বাংলার সারস্বত সমাজকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শরৎ-সংবর্ধনার জন্য। শরৎচন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে গৌরী-নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সারা বাংলার সাহিত্যসেবক ও শরৎ-অনুরাগীর দল শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন দরদী কথা-শিল্পীকে। এই উপলক্ষে 'উপহার' নামক একটি বত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়। এই পুস্তিকায় শরৎপ্রশস্তি করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এ ছাড়া প্রবন্ধ, কবিতা লিখে

শরৎচন্দ্রকে যাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁরা হলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, রাধারাণী দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব, জগদীশ গুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র রায়, জগদ্বন্ধু মিত্র, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ ও সুবোধ রায় প্রমুখ। শিবপুর সাহিত্য সংসদ-প্রবর্তিত প্রথম শরৎজন্মজয়ন্তী পালনকে কেন্দ্র করে আজও বাঙালী শরৎজন্মজয়ন্তী পালন করে আসছে।

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর তিপান্নতম জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই সভায় শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন—'নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে এতদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তার সকল ক্ষতিই তারা আবার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে,—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্যরচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়।" (অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল,—শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, পৃ ২২১-২২২)

১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি'র উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্র ঐ সভায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত না হতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করে সমিতিকে একটি পত্র দেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে এক মহতী সভায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি ও দিলীপকুমার রায়ের উদ্বোধনসঙ্গীতে সভাটি পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সভায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছাত্রগণ অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। ঐ সভা মাল্যচন্দনে চর্চিত শরৎচন্দ্রকে একটি রৌপ্যপাত্রে অভিনন্দনপত্র অর্ঘ্য দেন। অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন—আমার শক্তি কম তবু দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবেসেছি, এ কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নেই, যথার্থ ভালবেসেছি। —মানুষকে তন্ন তন্ন করে দেখবার চেষ্টা করলে তার ভিতর হতে অনেক

জিনিস বের হয়, তখন তার দোষত্রুটিতেও সহানুভূতি না করে থাকা যায় না।'
এই অভিভাষণটি প্রথমে 'স্বদেশী বাজার' পত্রিকায় ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে এটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১৩৩৬ সালের ৩১শে ভাদ্র 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশতম জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ দিন উপস্থিত না থাকতে পারায় ৭ই আশ্বিন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যে শোভিত ফিজিক্স হলে ছাত্র, তরুণ সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের উপস্থিতিতে শরৎ-বন্দনা করা হয়। একটি উদ্বোধনসঙ্গীত দিয়ে সভার কার্য শুরু হয়। সমিতির সম্পাদক অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। উক্ত পত্রে তরুণ সাহিত্যিকগণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। শরৎচন্দ্র ঐ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, তিনি এক বৎসর কাল যাবৎ তরুণ সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করে দেখেছেন যে তরুণ সাহিত্যে শক্তির পরিচয় যথেষ্ট কিন্তু উপাদানের অভাব। শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি ১৩৩৬ সালের ৮ই আশ্বিন সংখ্যা দৈনিক বঙ্গবাণী, ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের 'মাসিক বসুমতী' ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের এই মৌখিক অভিভাষণটি উল্লিখিত পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতীতে (আশ্বিন, ১৩৩৬) প্রকাশিত অভিভাষণ '৫৪তম জন্মদিনে' এই শিরোনামে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৭ সালের আষাঢ়) জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতে শরৎচন্দ্র লাহোর যান। লাহোর-প্রবাসী বাঙালীরা শরৎচন্দ্রকে এক বিশেষ সভায় অভিনন্দিত করেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি এই সভায় বলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সত্যই প্রার্থনা করুন, যেন এতবড় ভাষাকে যাকে রবীন্দ্রনাথ এত বড় করে তুললেন, তাকে যেন আরও বড় করা হয়।···পৃথিবীর সবাই আজ স্বীকার করেছে, ভাষার দিক দিয়ে আমরা কিছুতেই ছোট নই। আগে যাঁরা বাঙলা পড়তেন না, তাঁরাও আজ বাঙলা পড়েন। এই ভাষা যে আজ কত বড় হয়েছে, তার আর তুলনা আছে? একটা দিক বাঙালীর আছে, যেখান দিয়ে সে দাঁড়াতে পারে।'

শরৎচন্দ্রপ্রদত্ত এই অভিভাষণটি কাশী থেকে প্রকাশিত ১৩৩৭ সালের

আঁতমান হইয়াও খ্যাতিতে আসক্ত নও, তেজস্বী হইয়াও নিরভিমান, শ্রদ্ধার
রচ পরিবেষ্টিত হইয়াও নিরহঙ্কার। সত্যভাষণে তোমার কুণ্ঠা নাই,
তে আবিলতা নাই, দেশবাসীর প্রিয় হইবার গ্লানিকর চেষ্টা হইতে তুমি
তাঁনাকে মুক্ত করিয়াছ। হে দেশবাসীর বরপুত্র, আমরা তোমাকে অভিনন্দন
করিতেছি।'

শা শরৎচন্দ্র এই সংবর্ধনার উত্তরে বলেন—'মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন
মা স্বীকার ক'রো না—সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ যদি পরম দুঃখের
পড়েছয়, তা হলেও সে দুঃখবরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো।
দিক দিরং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভবিষ্যৎ যে
ছিল তালেতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা অর্জিত হয় না,
করেছেন।নে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে

১৯৩০

শুরু হয়। ঐদর ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে
দেশের এই সংকটকাল বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। রাজনৈতিক
ভাদ্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে শরৎজন্মোৎসবসভা স্থগিত রাখা হয়। ঐ সময়
করেন। শরৎচন্দ্র দেশেরদলের প্রাধান্য ছিল বেশী। একটি 'ফরওয়ার্ড'
অস্বীকার করেন। অভিনন্দন প্রথম দলটির নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু,
ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ মযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। শরৎবন্দনা
সঙ্কটকালে তিনি অভিনন্দন গ্রহণ করিতেকোয় গোপনে বিপক্ষ দল শরৎ-
আমাদের হয় নাই।' দিন হলে (৩১শে ভাদ্র)

এই সভায় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকেপের মৃত্যুবার্ষিকী
সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে তাঁহার জন্মদিনে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছা তিক
কিন্তু অভিনন্দন না লইয়া শরৎচন্দ্র আরও বেশী শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।'
সেদিনের সভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, আজ কিছু গ্রহণ করতে কিন্তু আমি
অক্ষম। ব্যক্তিগত সম্মানের দিন এ নয়, আনন্দের এ সময় নয়। মনের এই
চঞ্চল অবস্থায় কিছু বিশেষ বলাও সঙ্গত হবে না।··তবে দেশের কথা মনে
করলে ব্যথা চাপতে পারিনে। আমার মনের কথা পরে আমি বলব।
ছেলেদের বলি তাদের সাহিত্যচর্চা অক্ষুণ্ণ থাক। না বলতে পারায় যে আমার
কষ্ট সে তোমরা বুঝে নিও।' [ভারতবর্ষ, ১৩৩৭ কার্তিক]

প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের ছাপান্নতম জন্ম-
দিন (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ৩১শে ভাদ্র) উপলক্ষে এক বিশেষ অধিবেশনে
শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ঐ সমিতি ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে

জিনিস বের হয়, তখন তার দোষত্রুটিতেও সহানুভূতি না করে থাকা যায় না,

এই অভিভাষণটি প্রথমে 'স্বদেশী বাজার' পত্রিকায় ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯:
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে এটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শর
চন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১৩৩৬ সালের ৩১শে ভাদ্র 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের চতুঃপঞ্চা
তম জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ দিন উপস্থিত না থাকতে
পারায় ৭ই আশ্বিন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যে শোভিত ফি
হলে ছাত্র, তরুণ সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের উপস্থিতিতে ন
বন্দনা করা হয়। একটি উদ্বোধনসঙ্গীত দিয়ে সভার কার্য শুরু হয়। করা
সম্পাদক অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। উক্ত পত্রে তরুণ সাহি পরিপূর্ণ
বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। শরৎচন্দ্র ঐ অভিনন্দনের উত্তরে হাশয়ের
এক বৎসর কাল যাবৎ তরুণ সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ ক নাথ মৈত্র
যে তরুণ সাহিত্যে শক্তির পরিচয় যথেষ্ট কিন্তু উপাদানের অভ iberty'তে
অভিভাষণটি ১৩৩৬ সালের ৮ই আশ্বিন সংখ্যা দৈনিক বঙ্গ কথাসাহিত্যের
আশ্বিন মাসের 'মাসিক বসুমতী' ও 'শনিবারের তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের
হয়। শরৎচন্দ্রের এই মৌখিক অভিভাষণটি চন্দ্র ঐ দিনের অতি-
রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'শরৎচন্দ্রের অপ্র লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।
বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতীতে (আ একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি :
'৫৪তম জন্মদিনে' এই শিরোনাম প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গালা-

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে (করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের
পতিত্বে কংগ্রেস অমূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরে-
প্রয়াস ছেন তার জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথাসাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে
আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্
প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, একথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবন্ধের
মধ্যে দিয়ে স্বীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে,
রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোনদিন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। আজ সকল
কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সেদিন হয়তো আমার নিজের সমস্যার মীমাংসাও এর
মধ্যেই খুঁজে পাবো।' [স্বদেশ ও সাহিত্য]

১৩৩৯ সালের ১লা আশ্বিন শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনে কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'ছাত্র ছাত্রী উৎসব পরিষদ' সিনেট হলে এক
সভায় শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা
শরৎচন্দ্রকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। এই মানপত্রে তাঁরা লেখেন—'তুমি

কীর্তিমান হইয়াও খ্যাতিতে আসক্ত নও, তেজস্বী হইয়াও নিরভিমান, শ্রদ্ধার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও নিরহঙ্কার। সত্যভাষণে তোমার কুণ্ঠা নাই, দৃষ্টিতে আবিলতা নাই, দেশবাসীর প্রিয় হইবার গ্লানিকর চেষ্টা হইতে তুমি আপনাকে মুক্ত করিয়াছ। হে দেশবাসীর বরপুত্র, আমরা তোমাকে অভিনন্দন করিতেছি।'

শরৎচন্দ্র এই সংবর্ধনার উত্তরে বলেন—'মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার ক'রো না—সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ যদি পরম দুঃখের পথও হয়, তা হলেও সে দুঃখবরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা অর্জিত হয় না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে।'

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। রাজনৈতিক দলাদলির জন্য ঐ দিন শরৎজন্মোৎসবসভা স্থগিত রাখা হয়। ঐ সময় বাংলাদেশে দুটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য ছিল বেশী। একটি 'ফরওয়ার্ড' দল, অপরটি 'অ্যাডভান্স' দল। প্রথম দলটির নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, এবং দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। শরৎবন্দনা কমিটিতে 'ফরওয়ার্ড' দলের প্রাধান্য বেশী থাকায় গোপনে বিপক্ষ দল শরৎ-বন্দনাসভা পণ্ড করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে ঐ দিন টাউন হলে (৩১শে ভাদ্র) হিজলী জেলে নিহত সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ স্মৃতি দিবস পালন করার ব্যবস্থা করেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র দলাদলির ঊর্ধ্বে—একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও ঐ দিন শরৎ-বন্দনা স্থগিত থাকে। এ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লেখেন—'রাজনৈতিক হিরোওয়ারশিপের জন্য সাহিত্যরাজ্যের 'হিরো'কে তাঁর পূজামণ্ডপে যাবার পথ ছেড়ে দেওয়া হল না। 'পথের দাবী'র স্রষ্টার পূজা আয়োজন তারা সেদিন লুটিয়ে দিলে তাই পথের ধুলোয়। যাঁদের স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে এই দক্ষযজ্ঞ ঘটলো তাঁদের আত্মা সেদিন আচার্যের অবমাননায় লজ্জিত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়।'

ঐ সময় মহাত্মাজী 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার' বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করার সংকল্প করেছিলেন। এই সুযোগে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ শরৎজয়ন্তী বন্ধ করে দেবার জন্য কাগজে

বিবৃতি দিয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'ও 'শরৎ-বন্দনা'র বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। অবশেষে ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে দেশের জনসাধারণ ও সাহিত্যিকগণের সম্মিলিত চেষ্টায় কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভায় তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনাসমাবেশে নরেন্দ্রদেবের সম্পাদনায় 'শরৎ-বন্দনা' নামে একটি রচনাসংকলন শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 'শরৎবন্দনা সমিতি'র সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্র দেব, সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশীষ গুপ্ত, রাধারাণী দেবী, সোমনাথ মৈত্র, সুশীলচন্দ্র মিত্র, গিরিজাকুমার বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অবনীন্দ্রনাথ রায়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ও মৃণাল সর্বাধিকারী প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ। এই সম্মাননাসভায় শরৎচন্দ্রকে সোনার দোয়াতকলম, গরদের জোড়, চন্দনকাঠের খড়ম এবং কয়েকটি মানপত্র উপহার দেওয়া হয়।

এই সভার সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি 'বিশেষ সাংসারিক উদ্বেগজনক ঘটনায়' এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি ঐ দিন শরৎচন্দ্রকে একটি ব্যক্তিগত পত্র ও বাণী প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি উৎসর্গ করেন। 'তোমার জন্মদিন উপলক্ষে কালের যাত্রা নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি।' ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লেখেন, 'তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ। দেশের গভীরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ততত্ত্বকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিশিখায় দীর্ঘ আয়ু সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।' ঐ দিনের সভায় স্বদেশবাসিগণ ও স্বদেশবাসিনীগণের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি মানপত্র প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র সমাজের নিষ্পেষিত মানুষের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে বলেছেন—'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত

থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম ? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি ; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা মালতী জাতি যূথি, আনে গন্ধব্যাকুল দক্ষিণা পবন ; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করি নি।'

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শরৎচন্দ্রকে বিশিষ্ট সদস্য রূপে গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লেখেন : 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যখন বিশিষ্ট সভ্যরূপে শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব হয়েছিল তখন প্রবীণের দল ছিলেন সাহিত্য পরিষদের পরিচালক। তাঁরা শরৎচন্দ্রকে দুর্নীতিমূলক সাহিত্যরচনার জন্য অপরাধী ঘোষণা করে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁদের দলই কার্যনির্বাহক সমিতিতে সেদিনে সংখ্যায় বেশী থাকায় শরৎচন্দ্রকে তাঁরা সাহিত্য পরিষদে প্রবেশ করতে দেননি। এর ফলে তরুণেরা বিদ্রোহী হয়ে পরবর্তী নির্বাচনের সময় এই প্রাচীনপন্থী দলকে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে যথাসম্ভব অপসারিত করে স্বপক্ষীয় দলের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়েছিলেন, এবং শরৎচন্দ্রকে কেবল মাত্র বিশিষ্ট সভ্যই নয়, পরিষদের সাহিত্যশাখার সভাপতিপদেও বরণ করে নিয়েছিলেন।'

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এঁদের মধ্যে স্যার জন এণ্ডারসন ও স্যার আবদার রহিমকে 'ডক্টর অব্ ল', আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে ডি. লিট উপাধি প্রদান করা হয়। এই সমাবর্তনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, স্যার যদুনাথ সরকার, আচার্য পি. সি. রায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে।

শরৎচন্দ্র ডি. লিট উপাধি নিতে ঢাকায় গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (তিনটি ছাত্রাবাস যথাক্রমে জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হল এই তিনটি হলের পৃথক তিনটি ছাত্র ইউনিয়ন ছিল। এছাড়া সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন নামে আরও একটি ইউনিয়ন ছিল) চারটি ছাত্র ইউনিয়নই পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। এ ছাড়া তিনি দশম বার্ষিক মুসলিম সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতি হিসাবে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, কামরুন্নেসা গার্লস্ কলেজ, মিলন পরিষদে ও 'শান্তি' সাহিত্যসম্মিলনীতে শরৎচন্দ্র মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

'জগন্নাথ হলে' শরৎচন্দ্রের ভাষণ শেষ হলে, একজন মুসলমান ভদ্রলোক অভিযোগ করেন, শরৎচন্দ্র কেন হিন্দুসমাজের মত মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখেন না? ঐ সভায় তিনি মুসলমান সমাজ নিয়ে লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র 'ঢাকা হলে' বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি তাঁর বাকি জীবন মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখায় নিয়োগ করবেন। কেননা বাঙ্গালা দেশের সমাজে মুসলমান সমাজ একটা বড় অংশ। [স্টেটস্ম্যান ১৯৩৬, ৩১শে জুলাই]। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ইউনিয়নে, ৩১শে জুলাই সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র যে মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন ঐ সময়কার স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ঐ অভিভাষণটি লিখে রেখেছিলেন। (গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র' ২য় খণ্ড গ্রন্থে ঐ বক্তৃতাটি পাণ্ডুলিপির গর্ভ থেকে মুক্তি পায়।) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমিতি শরৎচন্দ্রকে আজীবন সদস্য নির্বাচন করে একটি মানপত্র প্রদান করেন। অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ. এফ রহমানের (ডি. লিট সম্বন্ধীয়) পত্রের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যারা বইএর পাতা থেকে শিক্ষালাভ করেছে, সে এক জিনিস, কিন্তু বাইরের জগতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও এক বড় জিনিস, তা থেকে বঞ্চিত হওয়া শুধু মূঢ়তাই নয়, নিজেকেও বঞ্চনা করা।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, তার সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি বই পড়ে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এখানেও তিনি মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন বলে ভরসা দেন। 'ঢাকা মুসলিম হলে' শরৎচন্দ্র শিক্ষকদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কামরুন্নেসা গার্লস কলেজের অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী কলেজের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে একটি মানপত্র দেন। শরৎচন্দ্র এই অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আর নারীদের ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? সতীত্ব সেই মনুষ্যত্বের একটি মাত্র দিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠি নয়, আর আদর্শ

তো শুধু মেয়েদের বেলায় নয়, পুরুষের বেলায়ও এ আদর্শ প্রযোজ্য। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছ রেখো, সত্যের আলোকে মানুষের বিচার করো, সংস্কারমুক্ত মন ও সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে মানুষকে দেখো —এই আমার উপদেশ।'

ঐ সময় শরৎচন্দ্র ঢাকায় 'মিলন পরিষদে' আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ঢাকা সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ এই মিলন পরিষদ। 'ধলাগ্রামের' 'ধলা হাউস' নামক বাড়িতে একটি বৈঠকী সভায় শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় ফরাস তাকিয়া ও আলবোলার ব্যবস্থা ছিল। শরৎচন্দ্র সেদিন তামাক খেতে খেতে গল্পের ছলে তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। সভার শেষ দিকে একজন শ্রোতা শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—'অনেকে বলেন শ্রীকান্ত নাকি আপনারই আত্মচরিত? একথা কতদূর সত্য?' শরৎচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। বরং একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং প্রশ্ন-কর্তাকে সামান্য তিরস্কারও করেছিলেন। পরক্ষণেই তিনি প্রসন্ন মুখে বলেছিলেন—'তবে 'শ্রীকান্তের' গহর কিন্তু আমার দেখা চরিত্র, রিয়েল ক্যারেক্টার।' [শরৎচন্দ্র, ২য় খণ্ড—গোপালচন্দ্র রায়]

শরৎচন্দ্র ডি. লিট্ নিতে ঢাকায় গেলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই ঢাকা রূপলাল হাউসে 'শান্তি' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'শান্তি' পত্রিকার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাস শরৎচন্দ্রকে মালা-চন্দনে ভূষিত করে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। পরে শান্তি পত্রিকার লেখক-লেখিকার পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করা হয়। এই অভিনন্দনপত্রটি শরৎচন্দ্রের মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। অভিনন্দনপত্র থেকে নিম্নলিখিত ছত্রটি প্রণি-ধানযোগ্য—'সেইদিন আপনি যাহাতে বাঙ্গালায় হিন্দুর প্রতিবেশী বিরাট মুসলমান সমাজ লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারেন তজ্জন্য আশীর্বাদ চাহিয়া-ছিলেন। আমরা সমস্ত অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার সাধু সংকল্প সফল ও জয়যুক্ত হউক। সাহিত্যিকের পরিপূর্ণতা ব্যতীত বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক কল্যাণও ইহাতে সাধিত হইবে।' অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন—লাট সাহেব বললেন, মুসলমানদের নিয়ে গল্প লিখবে। এ কাজ যদি করতে পার তা হ'লে অত্যন্ত ভাল হয়। সাহিত্য নিয়ে আমি কোনদিন ছেলেখেলা করিনি। অন্য ব্যাপারে হয়ত কথা রাখতে পারি।' এই বক্তৃতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে বলেন—"রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার উপর এদের অনেকগুলো চিঠি এসেছে। আমায় চিঠি

দিয়েছে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি কতকগুলি তুলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, না, না, ওসবের ভেতর আর আমি যেতে চাই না। ভোলানাথ যখন মারা গেল তার অপরাধটা কি? আক্রাম খাঁর ছেলেই কাগজ চালায়। তাদের spirit-এর একটা দৃষ্টান্ত দিই। নরেন দেবের কাছে লেখা চাইতে গেছে, বলে "বাংলা থোড়া বহুৎ সমঝ্‌তে হেঁ, বোলনে নেই সাক্‌তে।"

শরৎচন্দ্রের এই বক্তৃতাটি ১৩৪৩ সালের 'শান্তি' পত্রিকার ও বাতায়ন ১৯শে ভাদ্র ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। পরে এটি পুস্তকাকারে শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে।

ডি. লিট্‌. পাওয়ার পর কলিকাতায় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রতিষ্ঠিত 'রসচক্র' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানান। শরৎচন্দ্র এই রসচক্রের সভাপতি ছিলেন, প্রথমে কালিদাস রায়, পরে রাধেশ রায় রসচক্রের সম্পাদক হন। এই রসচক্রের সভ্যবৃন্দ শিল্পী অর্ধেন্দু গাঙ্গুলীর বনহুগলীস্থ বাগানবাড়িতে এক উদ্যানসম্মিলনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রসচক্রের সভ্যবৃন্দের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট্‌ দেওয়ায় 'রসচক্র' সভ্যবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে লেখেন:

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্যাদা দান করিয়া নিজের মর্যাদাই বহুগুণে বৃদ্ধি করিল। শরৎচন্দ্রের গৌরবদ্যুতি নূতন করিয়া কি বাড়িবে জানি না। শরৎচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত হইয়া উপাধিই গৌরবান্বিত হইল বলিয়া মনে করি।

'আজিকার এই উদ্যানসম্মিলনে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আমাদের পরম ভক্তিভাজন শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

'আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই— আমরা কোন মামুলি বচনবিলাসের আড়ম্বর করি নাই,—আমরা সভাপতি ভাড়া করিয়া আনি নাই, আমরা অভিনন্দনপত্র রচনা করি নাই, আমরা ফুলের মালা পর্যন্ত পরাই নাই—আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু জানাইতেছি। রসস্রষ্টা হইতে পারা বহুজন্মের সাধনার ফল, রসস্রষ্টা হইতে না পারি, যেন রসের পরিপূর্ণ মন উপলব্ধি করিয়া 'রসচক্র' নাম সার্থক করিতে পারি—এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।'

শরৎচন্দ্র এই অভিনন্দনের উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোন

'উপাধি না দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো আমাকে কোন উপাধি দিল না। তবু তো ওরা দিল। আমার সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য ওদের এই যে স্বীকৃতি, এতে বিশ্ববিদ্যালয় বা উপাধি নয়, আমিই বরং কৃতার্থ হয়েছি।'

১৩৪২ বঙ্গাব্দে ১১ই আশ্বিন 'রবিবাসর'এর পঞ্চাশ জন সদস্য এই সাহিত্যিক ও শিল্পী সংস্থা বর্তৃক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের দমদম 'অলকা' ভবনে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন ছিলেন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ। শরৎচন্দ্রের এই সভার সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে মহালয়ার দিন কলিকাতায় 'হোটেল ম্যাজেস্টিকে' পি. ই. এন. ক্লাব শরৎচন্দ্রকে এক মহতী সভায় সংবর্ধিত করেন। এইসময় পাইকপাড়ার রাজ-বাড়িতেও এক সভায় শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে প্রকাশ্য সভায় অনেক বার সংবর্ধনা জানিয়ে-ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে একটি পত্রে শরৎচন্দ্রকে লেখেন—'আগামী রবিবার তোমার প্রৌঢ় বয়সের প্রারম্ভকে অভিনন্দিত করব বলে সংকল্প করেছি। উক্ত দিনে আশুতোষ কলেজ হলে ভবানীপুরে একটি নাট্যগীতি অভিনয়ের আয়োজন করা গেছে, সেইখানেই তোমার সম্মাননার অভিপ্রায় আছে। আর কোথাও আর কোনো সময়ে সুযোগ করে উঠতে পারলুম না।

'আমি কাল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলকাতায় পৌঁছব। সেখানে যদি তোমার কাছ থেকে সম্মতি পাই, তাহলে কথাটা পাকা হোতে পারবে।'

রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত আশুতোষ কলেজ হলে শরৎসংবর্ধনাসভাটি অনুষ্ঠিত না হয়ে ২৫শে বৈশাখ সকালের দিকে রবিবাসরের উদ্যোগে বেলেঘাটায় 'প্রফুল্লকাননে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত থেকে যে মান-পত্রটি পাঠ করেছিলেন তা থেকে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা হল "কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

"তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য তোমার বন্ধুগণের এই আমন্ত্রণ-সভা।

"বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়; তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে

এসেছি, তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে। সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তারা কাল যা পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের ক্ষুধায় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে।···

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়।···যে লেখার প্রাণ আছে প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

"জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংশ্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

"সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে

মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য ক'রে দেখতে, স্পষ্ট ক'রে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষ-গুণে ভরা ভালোয়-মন্দয়, চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪০।"

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই সংবর্ধনায় শরৎচন্দ্র ভীষণ আনন্দিত হন। রবীন্দ্রনাথের এই আন্তরিক অভিনন্দনবাণীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমস্ত ক্ষোভ মুছে যায়।

কলিকাতা বেতারকেন্দ্র শেষ বয়সে প্রতি বৎসর ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে 'শরৎ-শর্বরী' নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কখনো কখনো শরৎচন্দ্র এই সভার উদ্যোক্তাদের অনুরোধে অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে 'শরৎ-শর্বরী' অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র ৫৯তম জন্মদিনে একটি ভাষণ দেন। ভাষণটি ২৯শে আশ্বিন ১৩৪১ বঙ্গাব্দের 'বেতার জগৎ' এবং পরে 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ৩রা আশ্বিন শনিবার শরৎচন্দ্রের একষষ্ঠিতম জন্মতিথি উপলক্ষে হাওড়া টাউন হলে এক সভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র বাইরে থেকে এসে প্রথমে হাওড়া শহরে অবস্থানের কথা ও বহু গ্রন্থ হাওড়ায় রচনার কথা উল্লেখ করেন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় দশম বার্ষিক মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে জীবনের অবশিষ্টাংশ মুসলমান সমাজের চরিত্র অঙ্কনে ব্রতী থাকবেন বলে যে উক্তি করেছিলেন, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা যেই মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে করি না কেন, মুসলমানগণ আমাদেরই প্রতিবেশী, বাংলা ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়া যদি তাহাদের সহিত কথা বলি, তবে তারা শুনিতে বাধ্য, কারণ, তারাও ত মানুষ।' মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে "অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে" বলে শরৎচন্দ্র মনে করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি প্রথমে বাতায়ন ৯ই আশ্বিন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলীতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

বেতার কর্মী আয়োজিত 'শরৎ-শর্বরী' অনুষ্ঠানে ১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র তাঁর দ্বিষষ্টিতম জন্মদিনে উপস্থিত হতে পারেন নি। পরদিন

১লা আশ্বিন তারিখে তিনি ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন—বাষট্টি বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি আজ রোগশয্যায় তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্বাদ এটি শুধু আমার নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্বাদ আমি আজকের দিনে চেয়ে নিলাম।" শরৎচন্দ্রপ্রদত্ত এই বক্তৃতাটি রেকর্ড করা হয়েছিল।

১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৬২তম জন্মদিবস উপলক্ষে স্কটিশচার্চ কলেজের 'বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি' জলধর সেনের সভাপতিত্বে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র যেন তাঁর মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন—তাই তিনি অভিনন্দনের উত্তরে বলেছেন, আজ দেশের বড় দুর্দিন। আজ আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ। আজকের দিনে আমার ইচ্ছা ছিল জন্মদিনে এইরূপ আনন্দ না করা। কিন্তু তোমাদের ডাক, তোমাদের সম্পাদকের আবদার আমায় রাখতে হল। কবে আছি, কবে নেই—হয়ত আজকের ৩১শে ভাদ্র আর ফিরে আসবেন না, সেই জন্য আসতে হল, তোমাদের ডাককে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ৬১টা ত চলে গেল—কিছু করতে পারলাম না। জানি না ৬২টা কি রকম ভাবে যাবে। যদি আবার ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে, তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই আসব।' এই অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বাঙালীর অবক্ষয়ের কথা উল্লেখ করেন। শরৎচন্দ্রের এই মৌখিক অভিভাষণটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে প্রকাশিত হয়।

'মাতৃভাষাকে বড় করে না তুললে চিন্তা চিরদিন ছোট হয়ে থাকে'—বিদ্যাসাগর কলেজে ৬২তম জন্মদিনের সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন। শরৎচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজের সভার পর বিদ্যাসাগর কলেজে যান। জলধর সেন অতিথি হিসাবে বিদ্যাসাগর কলেজে শরৎ-সংবর্ধনা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শেষে তিনি বলেন, 'আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায়।'

শরৎচন্দ্র সারা জীবনে অনেক সভাসমিতিতে যোগদান করেছেন। এ সম্বন্ধে আমি 'সভাসমিতির আলোকে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। বর্তমান প্রবন্ধটি শুধু শরৎ-সংবর্ধনা সম্পর্কে। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী, শরৎ জন্মশতবার্ষিকী—অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত, ১৩৮২।

রাজলক্ষ্মী, কমললতা ও শ্রীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর বিষাদিনী, সন্ন্যাসিনী জীবনের ইতিহাস পড়তে পড়তে দুঃখে বেদনায় ক্ষোভে যেমন আমাদের অন্তর অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি আবার বিদ্রোহী হৃদয়ে সন্দেহের ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে, না, না, না; এ তো হতে পারে না। রাজলক্ষ্মীর জীবনের ইতিহাস অমন ব্যর্থ পরিণতিতে সমাপ্ত হতে পারে না। (তার বুকের নারীত্ব, তার অন্তরের মাতৃত্ব—মাতৃত্বের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, তার প্রেম—যে প্রেমের পুণ্য স্পর্শে তার পিয়ারী-জীবনের কলঙ্ক-কালিমা নিঃশেষে মুছে গেছে,) সেই প্রেম, অবশেষে সবচেয়ে বড়ো তার শ্রীকান্ত—সকলি তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল? আর বড়ো হয়ে উঠলো সুনন্দা আর গুরুদেব? বড় হয়ে উঠলো এই সমাজ—এই সমাজের দেওয়া মিথ্যা বিবাহের সংস্কার? বড় হয়ে উঠলো রাঙামাটির কে-এক মেয়ে সুনন্দার দেওয়া পূজাপার্বণ, আর কাশীস্থ গুরুদেবের ওই দুর্বোধ্য ইষ্টমন্ত্র? না, না, এ হতে পারে না। তৃতীয় পর্বেই রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে না। সন্ন্যাসিনী জীবনই তার জীবনেতিহাসের শেষ কথা নয়। রাজলক্ষ্মী শক্তিময়ী। শ্রীকান্ত সত্যই বুঝেছিল, 'রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে, সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে।'

তার অন্তরের মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, তার মহীয়সী নারীত্বের প্রবল আকর্ষণ, শ্রীকান্তের প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসা একদিন মিলে রাজলক্ষ্মীর অন্তরে প্রেমের যে দুর্নিবার ভাগীরথীপ্লাবন সৃষ্টি করেছে, তার সামনে সংস্কারের ঐরাবত—তা সে যত শক্তিশালীই হোক—ভেসে যাবে নাকি? তার সুপ্রচুর শক্তির পরিচয় তো আমরা বহুবারই পেয়েছি। (সেই সেদিন, যেদিন রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মাঝখানে বঙ্কুর মায়ের মাতৃত্বের গৌরব মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো—হোক সে মিথ্যা—কিন্তু সেদিনের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে কতটুকু শক্তির বলে বিদায় করে দিতে পেরেছিল। তারপর যেদিন সমাজের বুকে শ্রীকান্ত রুগ্ন, নিঃসহায় হয়ে তাকে আহ্বান করেছিল, সেদিন সমাজশাসন আর সমাজপতি-দের রক্তচক্ষু তো তাকে বাধা দিতে পারে নি। আপনার প্রেমের গৌরবে মাথা উঁচু করেই সে শ্রীকান্তের পাশে দাঁড়াতে পেরেছিল।) তার উপরে যেদিন সুনন্দা তাকে পূজাপার্বণের মাঝে ডেকে নিয়ে গেল, যেদিন ঠাকুর দর্শন করতে গিয়েও বারবার শ্রীকান্তের বিরস মুখখানিই চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল,

সেদিন কতটুকু শক্তির বলে শ্রীকান্তকে ছেড়ে সে কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে আপনাকে উৎসর্গ করতে (উৎসর্গ তো নয়, আত্মবলি) গিয়েছিল ? হতে পারে, এও আজ তার কাছে মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এত শক্তি যার বুকে রয়েছে সে কেন আপনার জীবন সার্থকতায় পূর্ণ করে তুলতে পারবে না ?

তাই রাজলক্ষ্মীর পরিপূর্ণ জীবনের মাঙ্গলিক পরিণতির ইতিহাস রচনা করবার জন্যই প্রয়োজন হল শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের। এ না হলে সম্পূর্ণ রাজলক্ষ্মীকে আমরা পেতাম না। রাজলক্ষ্মীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথাই আমাদের কাছে অজানা হয়ে থাকত। বড় হয়ে উঠত তার পরাজয়ের, তার ব্যর্থতার মর্মান্তিক ইতিহাস।

মনে রাখতে হবে, রাজলক্ষ্মী সাবিত্রী নয়। সাবিত্রী স্বর্গীয় নিষ্কাম প্রেমের মূর্ত আদর্শ (তাকে আমরা নমস্কার করি)। সাবিত্রীর প্রেম platonic love—তাতে চাওয়া-পাওয়ার কথা হারিয়ে গেছে; তাতে প্রেমাস্পদ প্রেমের বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাবিত্রীর প্রেমের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে শেষের কথা হল প্রেম। প্রেমের জন্যই সে সতীশের আকর্ষণ হতে আপনাকে মুক্ত করে নিতে পারল। সাবিত্রীর জীবন ব্যর্থ হয় নি। কারণ প্রেমের জন্যই সে প্রেমকে চেয়েছিল। সতীশ ছিল উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সাবিত্রী নয়। তার প্রেমে রয়েছে প্রেমানন্দকে পাওয়ার আকুলতা, আর নারীত্ব ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। শ্রীকান্তকে ছেড়ে তার প্রেম টিকে থাকতে পারে না। ওই ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে, আত্মভোলা লোকটিই তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। রাজলক্ষ্মীর প্রেম স্বর্গের নয়, মর্ত্যের।

রাজলক্ষ্মী রমাও নয়। রমাকে ঘিরে রয়েছে পল্লীসমাজের নিষ্ঠুর শাসন। রমা দুর্বল। সে রমেশের প্রেমকে স্বীকার করে নিতে পেরেছে, কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তাই তার জীবন অমন ব্যর্থ। তাই তার স্থান সমাজের বুকে হল না, অন্য কোথাও তার প্রাণহীন পঙ্গু দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে হল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী রমা নয়। সে স্বপ্রতিষ্ঠিতা। ঈপ্সিত পরিণতির দিকে আপনাকে সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে শক্তিময়ী রাজলক্ষ্মী আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে। চতুর্থ পর্ব রাজলক্ষ্মীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে সার্থক।

রাজলক্ষ্মী চরিত্রের দুটো দিক আছে। একদিকে সে নারী—essentially typical নারী। তার বুকের মধ্যে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার তৃষ্ণা রয়েছে, মা হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, নারীজীবন সার্থক করবার

আকুলতা রয়েছে। অন্য দিকে রয়েছে তার সহজাত ধর্ম ও সংস্কার, সমাজ-নীতির সম্বন্ধে সমৃদ্ধ চেতনা, আত্মসম্মানের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি। তার একদিকে শাশ্বত নারীধর্ম আর একদিকে তার ইহজীবনের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সংস্কার-সমষ্টি।

বৈঁচিফুলের মালার অন্তরালে আত্মনিবেদনের পালা দিয়ে আরম্ভ হল তার জীবনের কাহিনী। তার পরে এল দৈবের বিড়ম্বনা; অমানিশার দুর্যোগময়ী প্রলয় রাত্রি। বিবাহের নামে কী একটা সামাজিকতার মিথ্যে অনুষ্ঠানের আড়ালে ঢাকা পড়ল রাজলক্ষ্মী। সেই অনুষ্ঠান ডেকে নিয়ে এল পিয়ারী বাইজির কলুষিত জীবনের পুঞ্জীভূত কালিমা। তারপরে একদিন শ্রীকান্তের সম্পৃত স্পর্শে মসীমাখা রাজলক্ষ্মীর বুকে আবার ফিরে এল আত্মচেতনা। তার পরবর্তী জীবন হল বৈঁচিফুলের মালার অন্তরালে যে রাজলক্ষ্মী ছিল তাকে ফিরে পাওয়ার ইতিহাস। দুই পক্ষই প্রবল পরাক্রান্তশালী। কাজেই সংগ্রামও হয়ে উঠেছে ভীষণ। জয়পরাজয়ের পালা চলেছে দুইদিক থেকেই। তাই দেখি, যখনই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে কাছে ডেকে নেয়, তখনই বঙ্কুর মায়ের মাতৃত্বের অভিমান মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়; আবার তারও প্রতিক্রিয়া চলে পরবর্তী জীবনের অশ্রুসিক্ত ইতিহাসে। যখনই দেখি রাজলক্ষ্মী ভবিতব্যের রঙীন আশা বুকে নিয়ে রাঙামাটিতে নীড় রচনায় অধীর হয়ে ওঠে, তখনই মাঝখানে এসে দাঁড়ায় সুনন্দা আর গুরুদেবের ইষ্টমন্ত্র।

চতুর্থ পর্বে সেই সংগ্রামের ঘন দুর্যোগ শান্ত ও প্রশমিত হয়ে এসেছে। তার অবচেতন আত্মার (subconsciousness) দেশ থেকে প্রতিনিয়ত যে প্রতিধ্বনি উঠছে, তার সম্বন্ধে সে এখন সম্পূর্ণ সচেতন হতে পেরেছে। সে বুঝতে পেরেছে, কেবল ঐ ছন্নছাড়া আত্মভোলা লোকটি ছাড়া এ বিশ্বে তার আর কিছু চাইবার নেই। সে চাওয়ার নিবিড়তার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে কাশীর গুরুদেবের অষ্টপ্রহরব্যাপী জপতপের নামে আত্মপীড়নের ভিতর দিয়ে। আজ রাজলক্ষ্মী সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত। সুনন্দার পূজাপার্বণ আজ তার কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা। বঙ্কুর মায়ের আত্মসম্মানের গৌরব ভ্রান্তিমাত্র। লক্ষ্মীর বুকে মিথ্যা সম্মানের মোহ আজ আর একফোঁটাও নেই। তাই ওই নাম-না-জানা কোন্ এক অচিন মেয়ে পুঁটুর প্রতিও আজ তার ঈর্ষা হয়। হায় রাজলক্ষ্মী, কোথায় তোমার সেই নির্ভীক আত্মম্ভরিতা! শ্রীকান্তের উপর তোমার একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রভাব আজ কোথায়?

পুঁটুর প্রতি লক্ষ্মীর মনোভাবকে বুঝতে হলে আর-একটা দিনের কথা মনে করতে হবে—যেদিন লক্ষ্মীর বাড়িতে শ্রীকান্তের সঙ্গে পূর্ণিয়া জেলার

কে এক জমিদারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মনে করুন, রাজলক্ষ্মীর সেদিনের ব্যবহার। সে শ্রীকান্তের বুকে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে নি কি? কিন্তু কেন? সে তো ভালো করেই জানত, শ্রীকান্তের প্রেম ঈর্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন নেই। তবে? তার উত্তর আজ রাজলক্ষ্মীর মর্মে মর্মে লেখা হয়ে আছে। She is paid back in her own coins। সেদিনের পরীক্ষা আজ অশ্রুজলে পরিশোধ করতে হয়েছে। আর-একটা কথা এ সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে, ঐ ঈর্ষা সাবিত্রীর পক্ষে সম্ভব হত না। সে তো জেনেশুনেই সরোজিনীকে তার আসন ছেড়ে দিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী বলেই এ ঈর্ষা সম্ভব হতে পেরেছে।

এর আর-একটা দিক আছে। এ পরাজয় পুঁটুর কাছে নয়, এ রাজলক্ষ্মীর নিজের কাছে নিজের পরাজয়। সে যে চাওয়ার দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতে চেষ্টা করেছিল, সেই চাওয়াই তাকে আজ অমন একটা সামান্য উপলক্ষে এনে দেখিয়ে দিলে, তার চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা কত মিথ্যা, কত অকিঞ্চিৎকর। এ ঈর্ষা লক্ষ্মীর পক্ষেও সম্ভব হত না, যদি কাশীর নিরন্তর আত্মপীড়নের ফলে তার বুকে এই অসংশয় আত্মচেতনা না জাগতো। সে তো আজ সম্পূর্ণভাবেই বুঝতে পেরেছে, ওকে না পেলে তার আজ কিছুতেই চলবে না। যে লোকটির নিজের সম্বন্ধে কোন খেয়াল-খবরই নেই, সে যখন অসুখবিসুখে ভুগে মরবে, তখন পুঁটু তার অধিকারের দাবি নিয়ে অনুক্ষণ তার শিয়রে বসে সেবাশুশ্রূষা করবে, আর রাজলক্ষ্মী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে? শেষ পর্যন্ত সে ওই একরত্তি পুঁটুর সতীন হবে? রাজলক্ষ্মীর এ মনোভাবের মাঝে ত পাওয়া না-পাওয়ার সন্দেহের কণামাত্রও নেই। একান্তভাবে আপন করে না পেলে যে আজ তার কিছুতেই চলছে না। হায় রাজলক্ষ্মী! তোমার এ জ্ঞান কোথায় ছিল, যখন রাঙামাটির বুক থেকে পালিয়ে তুমি কাশীর গুরুদেবের আশ্রয় নিয়েছিলে? শাস্তি তোমার আজো ফুরোয় নি—কমলতার কাছে আজ তুমি সত্যিই পরাজিতা।

কমললতা,—অপূর্ব এই সৃষ্টি! কমললতার কাছে বিদ্রোহিনী অভয়াও ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু কমললতা চরিত্র বিশ্লেষণের স্থান এ নয়। এত অল্প পরিসরের মাঝখানে টেনে এনে তাকে বিড়ম্বিত করব না। কমললতা ও গহরের জীবনের কাহিনীর সন্ধান আর-একদিন করতে হবে। অপূর্ব এই দুই সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি, পল্লীকবি গহরের পশ্চাতে শরৎচন্দ্রের রঙীন তুলিকায় পল্লীর যে চিত্র ফুটে উঠেছে—সেই জ্যোৎস্না রাত, সেই ফুলের বাগান, সেই শ্যামল বনরাজিলীলা, সেই বৈষ্ণবীর আখড়া—

এমনটি আর কোথাও তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি—কোথাও না! চতুর্থ পর্বের ভাষাও কী কবিত্বময়। কমললতার স্পর্শে যেন সকল কিছুই মধুময় হয়ে উঠেছে!

কমললতা যেন লক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সার্থক মিলনের স্বর্ণসূত্র। কমললতার পাশাপাশি আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাজলক্ষ্মী নিজেকে চিনতে পেরেছে। হোক সে পরাজয়ের ভেতর দিয়ে—কিন্তু সে পরাজয়েও অগৌরব নেই। তার নিজেকে জানতে পারা, নিজেকে বুঝতে পারাটাই আজ তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। আর শ্রীকান্ত? কমললতার স্পর্শে শ্রীকান্ত নিজের অন্তর্নিহিত প্রেমের সন্ধান পেয়েছে। সেই জন্যেই আজ এই ভবঘুরে লোকটির পক্ষে রাজলক্ষ্মীর হাতে ধরা দেওয়া সম্ভব হতে পেরেছে। নইলে হয়ত হত না। তাই বলি, কমললতাও লক্ষ্মী-শ্রীকান্ত মিলনের স্বর্ণসূত্র। কমললতা যেন সন্ধ্যার সখী গোধূলি। বান্ধবীর প্রিয়তমকে তার হাতে তুলে দিয়ে সে যে কোথায় কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল—তার খবরটিও আর আমরা পেলাম না। শুধু প্রিয়সখার প্রেমস্পর্শে তার দুটি গণ্ডে অলক্ত রাগরেখা ফুটে উঠতে দেখলাম। কিন্তু তার পরেই আমাদের কানে ভেসে এল সন্ধ্যার মিলন-আরতির মঙ্গলশঙ্খ। আমরা সেই মিলনমঙ্গলেই আবিষ্ট হয়ে পড়লাম।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক রাজলক্ষ্মীর এই হারানো ও ফিরে-পাওয়াকে Paradise Lost ও Paradise Regained বলেছেন। খুবই চমৎকার কথা। তিনি আরো বলেছেন, রাজলক্ষ্মী যে স্বর্গ হারালো, সে স্বর্গ আর সে ফিরে পায়নি। যা সে পেয়েছে তা পৃথিবীর ধূলির স্পর্শে কলঙ্কিত। তিনি এই অনুযোগও এনেছেন যে, শরৎবাবু নিষ্কাম প্রেমের মহান আদর্শকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেন নি—অনেক খাটো করে ফেলেছেন। আমরা বলি—না, তা নয়। রাজলক্ষ্মী যে স্বর্গ চেয়েছিল সে স্বর্গেই ফিরে যেতে পেরেছে। রাজলক্ষ্মীর স্বর্গ ও সাবিত্রীর স্বর্গ এক নয়। আমরা বলি রাজলক্ষ্মী মর্ত্যের মানবী। তার বুকে নারীত্বের কামনা আছে, মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রেমাস্পদকে একান্ত নিকটে পাওয়ার তৃষ্ণা পুরা মাত্রায় বর্তমান রয়েছে। কাজেই রাজলক্ষ্মীর স্বর্গ সাবিত্রীর নিষ্কাম প্রেমের কল্পস্বর্গ নয়। তার স্বর্গ পৃথিবীর স্পর্শে নিস্তেজ হয়ে যায় নি, বরং আরো উজ্জ্বল, আরো মহীয়ান হয়ে উঠেছে। সে স্বর্গ দেবীর নয়, সে স্বর্গ মানবীর, সে স্বর্গ রাজলক্ষ্মীর।

ভারতমানসের প্রতিনিধি কথাশিল্পী

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১

শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে বাঙালী সাহিত্যরসিক একদা তাঁকে অপরাজেয় কথাশিল্পী বলে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, তা কেবল বাঙলা দেশের নয়, সারা ভারতবর্ষের প্রাণের কথা। রাজ্যভেদে আমাদের ভাষা আলাদা, আহার্য আলাদা, পোশাক-পরিচ্ছদের তারতম্যও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা: সামাজিক রীতিনীতি এবং পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকে কোথাও কোথাও আমরা এতটা ভিন্নপন্থী যে একের পক্ষে যা স্বাভাবিক, অন্যের কাছে তা বিস্ময়কর, একের পক্ষে যা সাবধানে বর্জনীয় অন্যের কাছে তা গ্রহণীয় হতে কোনো বাধা নেই, এক পক্ষে যা নিষিদ্ধ অন্য পক্ষে তা সমাদৃত।

এহেন বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের দেশে সাহিত্যের রসাস্বাদনেও যে তারতম্য ঘটবে তাতে আর বিচিত্র কী? তামিলভাষী যাঁকে শিরোধার্য বলে গণ্য করে বাঙালী হয়ত তাঁকে জানেই না; গুজরাতী সাহিত্যে যিনি আলোড়ন তুলেছেন, কেরল তাঁর প্রতি উদাসীন; তেলুগু ভাষায় যিনি প্রাতঃস্মরণীয়, মারাঠীদের কাছে তিনি একটি নামমাত্র, তার বেশি কিছু নন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সকলের —সারা ভারতের প্রিয় লেখক। কোনোরূপ অত্যুক্তির ছোঁয়া না লাগিয়েও বলা যায়, শরৎচন্দ্র আধুনিক ভারতমানসের প্রতিনিধি কথাশিল্পী। প্রেমচাঁদ (হিন্দী) ও নানক সিং (পাঞ্জাবী), নাজির আহমেদ (উর্দু) ও বাপি রাজু (তেলুগু), শিবরাম (কন্নড) ও খাণ্ডেকর (মারাঠী), শিবশঙ্কর (মলয়ালম্) ও কৃষ্ণমূর্তি (তামিল), রমণলাল (গুজরাতী) ও কালিন্দীচরণ (ওড়িয়া)—এঁরা সব নিজ নিজ ভাষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু ভাষান্তরে তাঁদের রচনা তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি। বাংলার বাইরে বঙ্কিমের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সমাদর প্রায় সর্বত্র, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই পরম বিস্ময়, কিন্তু শরৎসাহিত্য সকল ভাষার প্রাণের সামগ্রী।

উপন্যাসের খ্যাতিকে বিশ্বাস নেই। আজ যিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে, পঁচিশ বছর পরে তিনি বিস্মৃত ও অবহেলিত—এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শিল্পীর কীর্তি আরও ক্ষণস্থায়ী—অনুবাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার ক'রে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতীয় লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রই বোধ করি

একমাত্র ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর পরেও প্রায় চারিটি দশক ধরে মোটামুটিভাবে ভারতীয় মানসলোকে প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন। প্রদেশভেদে প্রভাবের তারতম্য আছে সন্দেহ নেই এবং একথাও ঠিক যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা-লাভ, দেশবিভাগ, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিরাট বিপর্যয় প্রভৃতির কোনোটিই যিনি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পান নি এবং যাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল প্রধানত উনিশ-শতকী আবহাওয়ায়, বিংশ শতকের শেষ পাদেও তাঁর প্রভাব অক্ষুন্ন থাকা প্রগতি সাহিত্যের দৃষ্টিতে কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবু যে শরৎচন্দ্র আজও বিপুলভাবে পঠিত, তার মূলে রয়েছে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ও শিল্পগুণ।

২

বিভিন্ন ভাষায় শরৎচন্দ্রের প্রকাশক এবং বিশেষ করে অনুবাদক-গোষ্ঠীর কথা স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলার থাকলেও বাঙালী পাঠকের কাছে তার মূল্য সামান্যই। তবে শরৎসাহিত্যের অনুবাদ কবে, কোন্ ভাষায়, কী বই দিয়ে শুরু হয়েছে তার একটা মোটামুটি আভাস পেলে মন্দ হয় না। বাংলা ভাষায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতির সূচনা ১৯১৩ সালে এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে সে খ্যাতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অব্যবহিত পরেই অনুবাদ শুরু হয়ে যায় হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাতী ভাষায়। হিন্দীতে বিরাজ বৌ (১৯১৯), মারাঠীতে 'দত্তা' (১৯২০)। গুজরাতী অনুবাদও শুরু হয় 'দত্তা' দিয়ে, ১৯২১ সালে। দক্ষিণ ভারতে শরৎচন্দ্রের প্রচার আরম্ভ হয় কিন্তু পরবর্তীকালে। বাংলায় চন্দ্রনাথের প্রকাশ ১৯১৬ সালে। দশ বছর পরে এই চন্দ্রনাথ দিয়েই মালয়ালম্-এ শরৎ-অনুবাদের সূচনা। তেলুগুতে অনুবাদ হয় (১৯২৯) অরক্ষণীয়ার। কন্নড বা কানাড়ী ভাষায় শরৎসাহিত্যের প্রবেশ দেবদাস দিয়ে (১৯৩৯)। তামিল ভাষায় শরৎচন্দ্রের প্রথম অনূদিত গ্রন্থ গৃহদাহ (১৯৪১)।

। প্রথম অনুবাদের কালানুক্রমিক বিবরণ।

গ্রন্থ	বাংলায় প্রকাশ	অনুবাদের ভাষা	প্রকাশকাল
বিরাজ বৌ	১৯১৪	হিন্দী	১৯১৯
দত্তা	১৯১৮	মারাঠী	১৯২০
দত্তা	১৯১৮	গুজরাতী	১৯২১
চন্দ্রনাথ	১৯১৬	মলয়ালম্	১৯২৬
অরক্ষণীয়া	১৯১৬	তেলুগু	১৯২৯
দেবদাস	১৯১৭	কন্নড	১৯৩৯
গৃহদাহ	১৯২০	তামিল	১৯৪১

যতদূর জানা সম্ভব হয়েছে, তারই ভিত্তিতে উল্লিখিত (এবং পরবর্তী কিছু) হিসাব রচিত। এগুলিকে বেদের ন্যায় অভ্রান্ত মনে করা নিষ্প্রয়োজন।

। জনপ্রিয় গ্রন্থ।

যদি অনুবাদের সংখ্যা দিয়ে জনপ্রিয়তার বিচার হয়, তবে তালিকাটা দাঁড়াবে এইরকম :

অনুবাদসংখ্যা	গ্রন্থ	ভাষা
৯	বিরাজ বৌ, পল্লীসমাজ	হিন্দী
৬	দত্তা	গুজরাতী
৪	পরিণীতা	মলয়ালম্
৩	দত্তা	মারাঠী
৩	বিরাজ বৌ, গৃহদাহ	কন্নড
৩	দেবদাস	তামিল
৩	শুভদা, শেষের পরিচয়	তেলুগু

যদি সাতটি ভাষায় অনুবাদ সংখ্যার ভিত্তিতে বিচার হয়, তবে শীর্ষস্থানীয় প্রথম তিনখানি গ্রন্থের পরিচয় এইরূপ :

ভাষা	পল্লীসমাজ	বিরাজ বৌ	দেবদাস
হিন্দী	৯	৯	৬
গুজরাতী	৫	৪	৪
কন্নড	২	৩	২
তামিল	২	১	২
তেলুগু	১	২	১
মারাঠী	১	১	১
মলয়ালম্	১	১	২

। অনুবাদে গ্রন্থের নামকরণ।

অনুবাদে গ্রন্থের মূল নাম কতটা বজায় থাকে এবং কতটা কি ভাবে পরিবর্তিত হয় তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে নীচের বিবরণ থেকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নায়ক বা নায়িকার নামে যদি মূলগ্রন্থের নামকরণ হয়, তবে তা অপরিবর্তিতই থাকে। যেমন—কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, বিপ্রদাস। মূলগ্রন্থের নাম অন্যরূপ হলে অনুবাদককে ভাবনায় পড়ে যেতে হয় এবং তখন তার সমাধান হয় নায়ক বা নায়িকা বা অন্য কোনো প্রধান চরিত্রের নাম দিয়ে। যেমন পল্লীসমাজ—রমা (তামিল), রমা-রমেশ

(গুজরাতী); দেনা-পাওনা—ভৈরবী (তামিল-তেলুগু-মলয়ালম্-গুজরাতী-মারাঠী), ষোড়শী (কন্নড); দত্তা—বিজয়া (গুজরাতী-মরাঠী-মলয়ালম্), নরেন্দ্রবাবু (মলয়ালম্); পরিণীতা—ললিতা (তামিল, মলয়ালম্); পথের দাবী—ভারতী (তামিল, তেলুগু, কন্নড, মারাঠী), অপূর্ব-ভারতী, (গুজরাতী), সব্যসাচী (মারাঠী); চরিত্রহীন—সাবিত্রী (তামিল), সতীশচন্দ্রন্ (মলয়ালম্), কিরণময়ী (গুজরাতী)। তৃতীয় শ্রেণীর নামকরণ হয় অনুবাদের সাহায্যে। যেমন, দেনা-পাওনা—লেনদেন (হিন্দী-গুজরাতী); বামুনের মেয়ে—ব্রাহ্মণ কী বেটী (হিন্দী), বামণ নী দীকরী (গুজরাতী), ব্রাহ্মণ চী মুলগী (মারাঠী), ব্রাহ্মণ পিল্ল (তেলুগু), ব্রাহ্মণ পুত্রি (মলয়ালম্), ব্রাহ্মণির হুড়্গি (কন্নড)। চতুর্থ শ্রেণীর নামকরণে পাওয়া যায় অনুবাদকের নিজস্ব রুচি ও কল্পনার পরিচয়। যেমন, গুজরাতীতে নিষ্কৃতি—'দেরানী-জেঠানী' (ছোটজা বড়জা), বৈকুণ্ঠের উইল—'সাবকী মা' (=বিমাতা)। যেমন তামিলে, রামের সুমতি—'মদনি' (=বৌদি), নিষ্কৃতি—'তূয় উল্লম্, (=পবিত্র চিত্ত), দত্তা—'পল্লিনট্পু' (=পাঠশালার বন্ধুত্ব)। যেমন মলয়ালমে, মেজদিদি—অম্ময়েত্তেডি (=মায়ের খোঁজে), দর্পচূর্ণ—এণ্টে ভর্তবু (=আমার স্বামী)।

। শরৎচন্দ্রের দশক ।

বাংলায় বিশেষ করে কোন্ দশককে বলা যায় শরৎচন্দ্রের দশক? এ প্রশ্নের উত্তরে নানা মুনির নানা মত হতে পারে। অন্য ভাষায় মতান্তর হওয়ার আরও বেশি সম্ভাবনা। তবু সাহস ক'রে বলছি। শরৎচন্দ্রের অনুবাদ আজ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও কোনো বিশেষ দশককে যদি শরৎচন্দ্রের দশক বলে অভিহিত করতে হয়, তবে তা হল চল্লিশের দশক। পঞ্চাশের দশকে অন্যভাষায় অনুবাদ ব্যাহত না হলেও মারাঠীতে হয়েছে বলে মনে হয়, এবং তার কারণ বোধ করি মারাঠী ঔপন্যাসিক বামন মল্হার জোশী (১৮৮২—১৯৪৩) এবং জ্ঞানপীঠ-পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস "যযাতি"র লেখক বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকরের জনপ্রিয়তা। তেলুগু-মলয়ালম্-কন্নড-তামিলে পঞ্চাশের দশকেও অনুবাদ চলেছে। অতঃপর ধারা কিছু ক্ষীণতর। কিন্তু হিন্দী-গুজরাতীতে শরৎ-ট্র্যাডিশন সত্তরের দশকেও প্রায় সমানে চলেছে।

৩

ভারতবর্ষে নানা অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধ'রে শরৎচন্দ্র যেভাবে পঠিত ও ও সমাদৃত, তাতে বিভিন্ন ভাষায় শরৎ-সাহিত্যের উপর সমালোচনাগ্রন্থের প্রকাশ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি। আজ থেকে ৮৫ বছর আগে, ১৮৯০ সালে, তিনি একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন: "যখন দেখিব আমাদের সাহিত্যপত্রাদিতে মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি" (দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ "মারাঠী ও বাঙ্গলা", সাধনা)। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই মন্তব্যে যে মনের প্রকাশ, তা কোনো প্রাদেশিক সীমায় আবদ্ধ না থেকে সর্বভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত। আজও কেন যে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে সেই উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারিনি, ভাবতে একটু অবাক লাগে। কিন্তু একেবারেই যে পারিনি তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। বঙ্কিমকে নিয়ে লেখা কন্নড সমালোচক কৃষ্ণশাস্ত্রীর "বঙ্কিমচন্দ্র" বইখানি ১৯৬১ সালে সাহিত্য একাদেমীর পুরস্কারে ভূষিত। বাঙালীর কানে মধ্যযুগীয় হিন্দী সন্ত কবিদের বাণী শুনিয়েছেন স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন। তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ারের সহস্রগীতির বাংলা রূপান্তর ও রসাস্বাদনের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজদাস (পূর্বাশ্রমে যিনি ছিলেন ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু)। আরও হয়েছে, আরও হচ্ছে, আরও হবে।

শরৎ-সাহিত্য নিয়ে বঙ্গেতর ভারতীয় ভাষায় যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে, গুণে ও পরিমাণে তা খুব তৃপ্তিকর বলা যাবে না। আর, সমস্ত ভাষাকেও একশ্রেণীভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অনুবাদের মতো আলোচনার ক্ষেত্রেও ভাষাভেদে বিস্তর তারতম্য ঘটেছে। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রেও হিন্দী অগ্রণী।

॥ দক্ষিণ ভারত ॥

। তেলুগু ।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাচতুষ্টয়ের মধ্যে শরৎচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বোধ করি, তেলুগু। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি এই ভাষায়। একখানি হল কে. ভি. রমণ রেড্ডি রচিত এবং ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ "শরৎবাবু: জীবিত সাহিত্য পরিচয়মু"। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন গোরুরেপাটি

বেঙ্কটসুব্বয়া তাঁর দুখানি গ্রন্থে : (১) শরৎদর্শনম্ (১৯৫৬), (২) শরৎ-জীবিতম্ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৬০)। পাঁচ-শতাধিক পৃষ্ঠার প্রথম বইখানিতে পাওয়া যায় শরৎসাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। এক হিন্দী ছাড়া অন্য কোনো অবঙ্গীয় ভাষায় শরৎসাহিত্যের এত বিশদ বিশ্লেষণ হয়নি। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫ সালে। পাঁচ বছর পরে ১৯৬০ সালে এই গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে পাই সুখ্যাত শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা। কিন্তু এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যে কয়েকটি কথা বলেছেন, বর্তমান আলোচনায় সেগুলিরই মূল্য বেশী। লেখক অকপটে স্বীকার করেছেন যে আন্ধ্র বা তেলুগুভাষীদের উপর সর্বাধিক প্রভাব বাংলা সাহিত্যের। আন্ধ্রদেশে প্রথম সমাদর লাভ করে বন্দেমাতরম্-এর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। তারপরে এল বিশ্বকবির উপন্যাস, ছোটগল্প, গান ও কবিতা। প্রায় একই সময়ে অনূদিত হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলি। এসব আজ (অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে) পুরাতনের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান পাঠকসমাজে সবচেয়ে সমাদৃত লেখক শরৎচন্দ্র। এক কথায় বলা যায়, আন্ধ্রদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন তিনি। একথা ঠিক যে শরৎবাবুর রচনা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমাদের কিন্তু মনে হয় তিনি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছেন তেলুগু পাঠকদের উপর।[1] শরৎবাবু যে মূলত বাঙালী একথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছি। তিনি আমাদের এতই কাছের মানুষ যে তাঁকে আমরা তেলুগুভাষীদের একজন বলেই ধ'রে নিই। আজ তেলুগু দেশে সবচেয়ে বেশি আদর শরৎচন্দ্রের রচনার। যত বেশিসংখ্যক অনুবাদক তাঁর রচনায় হাত লাগিয়েছেন, এমন অন্য কোনো লেখকের রচনায় নয়। রামায়ণের অসংখ্য অনুবাদের মতোই শরৎসাহিত্যের অনুবাদ। একথা সত্য যে আমাদের অঞ্চলে রবীন্দ্র একাডেমির মতো কোনো শরৎ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে শরৎচন্দ্রের বিপুল পাঠকসংখ্যাই এখানে একা-ডেমির কাজ চালাচ্ছে। আন্ধ্রেরা তাঁকে আপন ক'রে নিয়েছে। তাঁর সমস্ত রচনা কেবল স্বতন্ত্রভাবেই নয়, গ্রন্থাবলীর আকারেও সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে।[2]

১। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে গুজরাতী ও হিন্দী পাঠকসমাজ সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়।

২। বঙ্গসাহিত্য প্রভাবম্ মনমীদ অধিকম্‌গা কলদু। অদিলো বন্দেমাতরপু স্রষ্টা বংকিম-চন্দ্রান নবললু অধিকংগা আন্ধ্রদেশমুলো আদরিম্পবডিনবি। অনন্তরম্ বিশ্বকবি নবললু, কথলু, গেয়ালু আন্ধ্র সাহিত্যমুলো অবতরিঞ্চায়ি।...ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তার কারণ কী? অনেক লেখকের জীবন ও রচনার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। শরৎবাবু সে পর্যায়ের লেখক নন। তাঁর জীবন ও সাহিত্য যুক্ত হয়েছে অবিনাবদ্ধভাবে। তাঁর বস্তুবোধ ও কল্পনার মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়। শরৎবাবুর সাহিত্যখ্যাতির কারণ এই নয় যে, তিনি বিরাট প্রতিভার অধিকারী। তিনি যে বাংলা সাহিত্যে অনন্য আসন লাভ করেছেন, এমনকি মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডতুল্য ভাস্বর রবীন্দ্রপ্রতিভাকেও জয় ক'রে তিনি যে স্বতন্ত্ররূপে দীপ্তিমান, তার কারণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও লেখক জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক।[৩]

। কন্নড ও মলয়ালম্ ।

উল্লিখিত ভাষা দুটিতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ বা আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি। কোনো কোনো অনূদিত গ্রন্থের ছোট ভূমিকায় সামান্য যে দু-চার কথা স্থান পেয়েছে, তাতে, সত্য বলতে কী, মন ভরে নি।

কন্নড অনুবাদ "মনে সুট্টিতু"র ভূমিকায়[৪] অনুবাদক কে. বীরভদ্র পাত্র-পাত্রীর নামকরণ সম্পর্কে একটা নতুন কথা বলার চেষ্টা করেছেন। সুরেশ মানে ইন্দ্র। ইন্দ্রের মতোই প্রবল তার সম্ভোগেচ্ছা। গৃহদাহে মহিমের কেবল 'মনে'ই (মনে=গৃহ) 'মন'-ও পুড়েছে। কিন্তু তাতে মহিমের 'মহিমে' (=মহিমা) কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।[৫]

। মলয়ালম্ ।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে মলয়ালম্-এ শরৎচন্দ্রের স্থান সম্পর্কে আলোচনার মুখেই একটি উদ্ধৃত দিচ্ছি মলয়ালী লেখক এবং 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদক কে. সুরেন্দ্রন্-লিখিত ভূমিকা থেকে। বিন্দুর ছেলের অনুবাদ 'প্রেমসাগরম্' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। সুরেন্দ্রন্ বলেছেন: 'মলয়ালম্ সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অপরিচিত নিশ্চয়ই নন, তবে যথেষ্ট সুপরি-

---

৩। কোন্দরি রচয়িতল জীবিতং বেরু, বারি রচনলু বেরু। শরৎবাবু ঈ শ্রেণী লোনি বাড়ু কাড়ু। আয়ন জীবিতানিকী সাহিত্যানিকী অবিনাভাবসম্বন্ধ মুন্নদি...ইত্যাদি।

৪। কন্নড ভাষায় গৃহদাহের তিনটি অনুবাদ দেখেছি। (ক) ১৯৭০-এ 'অরগিন মনে' (খ) ১৯৬৫-তে 'মনে সুট্টিতু', (গ) ১৯৬৯-এ 'গৃহদাহ'।

৫। শরচ্চন্দ্ররু মুখ্যবাগি ঈ কাদম্বরিয়ল্লি মাত্র তম্ম পাত্রগলিগে হেসরু কোড়ুবাগলু তুম্ব বিবেচিসিদ্দারে এন্দু ননগন্নিসিতু। মহিম সুরেশ অচলা ঈ হেসরুগলু, আয়া পাত্রগল ব্যক্তিত্ব-গলিগে হিডিদ কন্নডিয়ন্তিবে। মহিমন মনে সুট্টিতু; মন সুট্টিতে?...ইত্যাদি।

চিতও নন। আজ পর্যন্ত তাঁর মাত্র চার-পাঁচখানি বই মলয়ালমে প্রকাশিত হয়েছে।' বই-এর সংখ্যা নিয়ে হিসাবে কিছু গরমিল দেখা গেলেও সুরেন্দ্রনের মন্তব্যটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তাঁর আক্ষেপ এই যে শরৎচন্দ্রের মতো লেখকের এতদিনে যোগ্য সমাদর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। পরের বছর কথাটা আরও জোরালো করে বলেছেন সমালোচক "সাহিতীদাসন্" (আসল নাম এম্. আর্. নায়র্) টি. সি. ভাস্করন্ মুসসত্-এর 'বিজয়া'র ('দত্তা'র অনুবাদের) ভূমিকায় (১৯৫৪)—"আধুনিক কেরলে প্রেমের গল্প নামে এক ধরনের অশ্লীল রচনার খুব প্রচলন হয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই বইখানি প্রেমের কাহিনী হলেও, সুখের বিষয়, সেই-শ্রেণীভুক্ত নয়। সৎ সাহিত্যের যা লক্ষণ ও লক্ষ্য, বিজয়া সেই আদর্শেই রচিত—লোকহিতকর চরিত্রসৃষ্টি, মন-কেড়ে-নেওয়া কাহিনীর গাঁথুনি, মনোরম ঘটনাসংস্থান এবং বাস্তবসম্মত জীবনচিত্রন যে কোনো সহৃদয় পাঠককে খুশী করবে।"[৭] 'সাহিতী-দাসন্'-এর এই উক্তিকে যদি বিশ্বাস করা যায় (অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখছি না), তবে বলতেই হবে ভারতবর্ষে একমাত্র কেরলীয় পাঠকরাই শরৎ প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কিন্তু পাঠকদের উপর ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার আগে আরও একটু খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। মলয়ালমে যাঁরা শরৎচন্দ্রের অনুবাদক তাঁরা প্রায় কেউই বাংলা থেকে সরাসার অনুবাদ করেননি, করেছেন অন্য ভাষা থেকে।[৮] ফলে শরৎচন্দ্রের একটা বড় আকর্ষণ খোয়া গেছে পরোক্ষ অনুবাদে। আরও একটা কারণ আছে এবং সেটাও কম গুরুতর নয়। মলয়ালমী পাঠকদের একটা বড় অংশ নায়র সমাজ, যে সমাজে বিধবা-বিবাহের বাধা আগেও ছিল না, এখনও নেই। অথচ শরৎসাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বিধবার প্রেম, যে প্রেমের পরিণতি কখনই বিবাহ পর্যন্ত পৌছয়নি। সামাজিক-ব্যবধান আরও আছে। কিন্তু আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট। তবে কি সামাজিক ব্যবধান সাহিত্যরস আস্বাদনের পরিপন্থী? এ জটিল প্রশ্নে প্রবেশ না করে আমাদের

৬। শরৎচন্দ্রন্ কৈরলিক্কু কেবলম্ অপরিচিতনল্ল, পক্ষে বেণ্ডত্র সুপবিচিতনুমল্ল। অদ্দেহ-ত্তিন্টে নালো অঞ্চো কৃতিকল্ মাত্রমে মলয়ালত্তিল্ বন্নিট্টুল্লু।

৭। ইন্ন্ কেরলত্তিল্ প্রচুর প্রচারত্তিলিরিক্কুন্নতুম্ মিক্কতুম্ আভাসবুম্ অশ্লীলবুম্ আয় অনুরাগকথকলুটে রীতিয়িলুল্ল শুক পুস্তকমল্ল ইতু। ইতিলে লোক গুণানুসৃতমায় পাত্রসৃষ্টিয়ুম্, হৃদয়া-বর্জকবুম্ আনন্দোত্তেজকবুমায় সন্দর্ভশুদ্ধিয়ুম্, জীবিতব্যবহার সাধারণমায় স্বভাবচিত্রী-করণবুম্ এতোরু সহৃদয় নেয়ুম্ বাসপ্লিক্কুন্নতাণ। ইতুতন্নে য়াণলো উত্তম সাহিত্যাত্তিন্টে লক্ষণবুম্ লক্ষ্যবুম্।

৮। 'নিষ্কৃতি'র দুটি অনুবাদের মধ্যে একটি করা হয়েছে দিলীপকুমার রায় কৃত "The Deliverance" থেকে, অন্যটি হিন্দী অনুবাদ "ছুটকারা" থেকে।

দেখা দরকার কেরলের অনুবাদক সমালোচক লেখকদের মতো উন্নত সমজ-দারেরা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কিছু বলেছেন কিনা।

যথেষ্টই বলেছেন, এবং তার থেকে মনে হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে তাঁদের কোনো বিরূপ ধারণা তো ছিলই না, বরং অন্য অনেকের চেয়ে তাঁরা বেশী সচেতন ছিলেন শরৎসাহিত্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণে। অন্যতম অনু-বাদক নারায়ণ পণিক্কর লিখেছেন: "ললিতা (অর্থাৎ পরিণীতা) একটি ক্ষুদ্র কাহিনী হলেও এরই মধ্যে আমরা পরিষ্কাররূপে দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের মহৎ আদর্শ, রচনানৈপুণ্য এবং চিত্রনির্মাণচাতুর্য। দেখতে পাই কঠোর পণপ্রথার ফলে উদ্ভূত দুঃখকষ্টের একটি মর্মস্পর্শী চিত্র।[৯] ......শরৎচন্দ্র সামাজিক বিকার নিয়ে কখনো বড় বড় বক্তৃতা করেন না; যারা সেই সমাজ-বিকারের বলি, তিনি শুধু এঁকে দেখান সেই সাধারণ মানুষের ছবি।"[১০]

এই ধরনের ছোট ছোট মন্তব্যের ভিত্তিতে শিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তের কথাগুলিও মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো। ভারতবর্ষের গল্প-লেখকমণ্ডলীতে শরৎচন্দ্রের স্থান খুবই উঁচু।[১১] তাঁর নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভাশক্তি, অপ্রতিহত কল্পনা, মানুষের হৃদয় সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি দুঃখী দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা—এই সমস্ত গুণের সমীচীন সংমিশ্রণ শরৎচন্দ্রকে বিশ্বসাহিত্যিকদের প্রথম সারিতে স্থাপিত করেছে।[১২] কি বাঙালী, কি অন্য ভাষার সাহিত্যশিল্পীরা শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যগুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ভারতীয় সাহিত্যে আগামী দীর্ঘকাল যাবৎ শরৎচন্দ্র অবিসংবাদিত প্রেরণাশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।[১৩]

৯। ললিতা ওরু চেরু কথয়াণেঙ্কিলুম ইতিলুম আদর্শমহত্ত্বম্ রচনাপাটবমুম চিত্রনির্মাণ-চাতুরিয়ুম্ মহনীয়াদর্শঙ্গলুম্ তেলিঞ্ঞু কানুমান কলিয়ুম। স্ত্রীধন সম্প্রদায়ত্তিন্টে কারুণ্যম নিমিত্তম উণ্ডাকুন্ন দুঃখিতঙ্গলুটে ওরু হৃদয়স্পৃক্কায চিত্রম নম্মল ইতিল দর্শিক্কুন্নু। (ভূমিকা পরিণীতার অনুবাদ 'ললিতা', ১৯৪৪)

১০। শরৎবাবু সামুদায়িক দূষ্যঙ্গলেপত্তি দীর্ঘদীর্ঘঙ্গলায় প্রসঙ্গঙ্গল্ ওন্নুম্ নটত্তুন্নিল্ল। আ দূষ্যঙ্গলক্কু বশংবদরায়িট্টুল্ল জনতয়ে চিত্রীকরিচ্চু কাণিচ্চু তরুকমাত্রমাণু। (তদেব)

১১। ভারতকথাকৃত্তুকলুটে আখ্যায়িকাকারন্মারুটে শরৎবাবুবিন্টে স্থানং অত্যুন্নতমাকুন্নু। (তদেব)

১২। নবনবোন্মেষ শালিনিয়ায় প্রতিভাশক্তি, অপ্রতিহতমায ভাবনাবিলাস, অগাধমায় মনুষ্যহৃদয়জ্ঞানম্ সর্বোপরি বিশালমায় দীনজনানুকম্পা ইবয়ুটে সমীচীনমায় সম্মেলনত্তাল্ শরচ্চন্দ্রনে বিশ্বসাহিত্যকারন্ মারুটে মুন্নণিয়িল্ এত্তিচ্চতু। (ভূমিকা, নারায়ণ পণিক্কর কৃত মেজদিদির অনুবাদ "অম্ময়ে পোলে", ১৯৫৪)

১৩। কথাকারণ্মার্—বঙ্গালিকলুম্ অল্লাত্তবরুম্—অদ্দেহত্তে সাহিতীয় গুরুবায়ি অংগীকরিচ্চু। ভারতীয় সাহিত্যত্তিল্ অনিষেধ্যমায় ওরু প্রেরণাশক্তিয়ায়ি শরচ্চন্দ্রন্ বলরে-কালম্ নিলনিল্ক্কুমতান্নু। (ভূমিকা, কে সুরেন্দ্রন্ কৃত বিন্দুর ছেলে-র অনুবাদ "প্রেমসাগরম্", ১৯৫৭)

তামিল

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তামিল ভাষায় রচিত যে দুটি বই দেখার সুযোগ হয়েছে (অন্য বইয়ের সন্ধান জানা নেই) তা হল : (১) বেল্লুরম্-সংকলিত 'শরৎচন্দ্ররিন্ বাড়্‌বুম্ পনিয়ুম্' (শরৎচন্দ্রের জীবন ও রচনা, ১৯৬০) এবং (২) তুলসীদাস রুদ্র-প্রণীত "শরৎচন্দ্ররিন্ বাড়্‌কৈ বরলারু" (শরৎচন্দ্রের জীবনী, ১৯৬৭)। দ্বিতীয় বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ ও প্রতিভাধর অভিনেতা নাগেশ্বর রাওকে, শরৎচন্দ্রের নানা গল্পের নানা ভূমিকায় যাঁর সুযোগ্য অভিনয় দেখে গ্রন্থকার অল্প বয়সেই শরৎচন্দ্রের গভীর হৃদয়ানুভূতির পরিচয় পান। ভারতীয় সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মুখ্য প্রবর্তনা সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন, যার তাৎপর্য এইরকম : শরৎচন্দ্র লিখেছেন এমন ভাষায় যাকে পণ্ডিতী বলার উপায় নেই, যে ভাষা সহজ, সরল, জনসাধারণের উপযোগী অথচ যাকে হাল্‌কা বলেও তুচ্ছ করা যাবে না। বস্তুত, মনে হয়, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্তেই বাঙালী লেখকেরা সমাজের প্রতিনিধিরূপে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন। তামিলে ভারতী [১৮৮২-১৯২১] ও বাংলায় শরৎচন্দ্র—এঁরা দুজন একই কাজ করেছেন প্রায় একই সময়ে—একজন (অর্থাৎ ভারতী) কবিতার মধ্য দিয়ে, আর একজন গদ্যে।[১৪] তামিল দেশে উচ্চতা এবং শ্রেষ্ঠতাবোধক শব্দ 'গোপুরম্'। লেখক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : শরৎচন্দ্রের সাহিত্য গোপুরম্-এর মতো সগৌরবে দণ্ডায়মান। মৃত্যুদেবতা যা ছিনিয়ে নিল তা হচ্ছে গোপুরম্-এর ছায়া মাত্র। আসল গোপুরম্ চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের জীবন-যাত্রার আলোকবর্তিকার মতো।[১৫]

তামিলে শরৎচন্দ্রের অন্যতম অনুবাদক অ. কি. জয়রামন্। তাঁর অনূদিত প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের সূচনায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে কিছু না কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। তারই কয়েকটি এখানে একসঙ্গে জড়ো করা হল : কয়েক বছর যাবৎ [১৯৪২ সালে লেখা] বাংলা থেকে অনেকগুলি উপন্যাস

১৪। শরৎচন্দ্ররু পোত্তুমক্কলুক্কাক এলিয় মুরৈয়িল্ চিন্তিত্তু এলুত্তত্ তলৈপ্পট পিন্নরে এলুত্তালন্ গর্বমাকত্ তলৈ নিমিরন্দু চমূকত্তিন্ পিবতিনিতিয়াক বিলঙ্ক মুডিয়ুম্ এনর নিলৈ ইন্তিয়াবিল্ উরুবায়িট্রু। ইগুক্ কাল কট্টত্তিল্—এবত্তালচ্ চট্রু মুন্নতাক—ইন্ধে নমরু পারতি [=ভারতী] ইলক্কিয় বাল্‌কৈ বালন্দু কাট্টিনার্। ওরুবর্ উরৈনডৈ বলম্ মিক্কবর্, মট্রবর্ কবিতৈ আবেচম্ কে গুনর্। (পৃ: ১)

১৫। শরৎচন্দ্ররিন্ ইলক্কিযপ্ পডৈপ্পুক্ কোপুরমায় নিমিরন্দু নিরকিরতু। কালতেবন্ দম্মিটমিরন্দু পরিত্তু মরৈত্তু বৈত্তুক্ কোণ্ডতু কোপুরত্তিন্ নিললৈত্ তান্। কোপুরম এন্রুম্ নিলৈয়ায় নম্মুটৈয় পয়ণত্তিন্ কলঙ্করৈ বিলক্কমায় নিন্রু অলিক্কুম্। (পৃ: ৮৮)

তামিলভাষীদের মধ্যে সমাদৃত হয়ে আসছে। তার মধ্যে বঙ্কিম ও শরৎ-এর বইগুলিই প্রধান। হৃদয়ানুভূতি পরিস্ফুটনে অসামান্য নৈপুণ্যের অধিকারী শরৎচন্দ্র। চিত্রশিল্পী যেমন দু-একটি বর্ণের সাহায্যে নানা রঙের ছবি আঁকে, শরৎচন্দ্রও তেমনি অল্প কয়েকটি চরিত্র দিয়ে কাহিনীকে সরস ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন। শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি উপন্যাসেই তাঁর আঁকা চরিত্র-গুলি পাঠকের মনে এমন একটা ছাপ রেখে যায়, যা সহজে মুছে যাবার নয়। [অরক্ষণীয়া সম্পর্কে] বিরাট ধ্বংসের মধ্য থেকে যেমন সৃষ্টির উদ্‌গম হয়, তেমনি মানুষের অন্তিম আশ্রয় শ্মশান থেকে তাদের (অতুল ও জ্ঞানদার) জীবনযাত্রা শুরু হল।

উত্তর ভারত

। মারাঠী ।

মারাঠী ভাষায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ লিখেছেন প্রহ্লাদ নরহর জোশী, ১৯৫৫ সালে। দ্বিতীয় গ্রন্থ সুধা কুলকর্ণী ১৯৬৩ সালে। আর সম্প্রতি বেরিয়েছে সুমতি ক্ষেত্রমডে রচিত "জীবনস্বপ্ন" (১৯৭৫)। শেষোক্ত বইটি ঠিক জীবনী নয়, শরৎচন্দ্রের জীবনোপন্যাস।

খুব সম্প্রতি চোখে পড়ল মারাঠী দৈনিক পত্রিকা 'লোকসত্তা'য় (১৫. ২. ৭৬) আর. ডী. দেশপাণ্ডে লিখিত বিশেষ প্রবন্ধ "নারীজীবনাচে মার্মিক ভাষ্যকার শরদ্‌বাবু"। একটি স্থলে বলা হয়েছে—"তিনি (শরৎচন্দ্র) নিজে প্রত্যক্ষভাবে যে জীবন অনুভব করেছেন, সেই জীবনই তাঁর গল্পে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীকান্তে শ্রীকান্ত, চরিত্রহীনে সতীশ, পথের দাবীতে ডাক্তার ও শেষ প্রশ্নে আশুবাবু হলেন শরৎচন্দ্রের প্রতিনিধি।"[১৬]

মারাঠী ভাষায় শরৎচন্দ্রের অন্যতম অনুবাদক হলেন ভার্গবরাম বিট্‌ঠল বরেরকর—যিনি মামা ওয়ারেরকর নামে সুপরিচিত। সব্যসাচী (পথের দাবী-র অনুবাদ, ১৯৪৮) গ্রন্থের ভূমিকায় একটি বিশেষ দিকের প্রতি তিনি মারাঠী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন বাঙালী এবং মহারাষ্ট্রীদের স্বভাবধর্মে সূক্ষ্ম পার্থক্য উপস্থাপিত করা হয়েছে অপূর্ব এবং

১৬। ত্যানী জে জীবন প্রত্যক্ষ অনুভবলে, তেঁচ ত্যাচা কথাকাদম্বার্যন্ত প্রতিবিম্বিত ঝালেলে আহে। শ্রীকান্তমধীল শ্রীকান্ত, চরিত্রহীনমধীল সতীশ, পথের দাবীমধীল ডাক্টর ও শেষ প্রশ্নাতীল আশুবাবু ম্হণজেচ শরদবাবু।

রামদাসের চরিত্রের সাহায্যে। অপূর্ব যেমন সাধারণ বাঙালী যুবকদের প্রতিনিধি তেমনি রামদাস হল মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের। বাঙালীদের সমস্ত দোষ গুণ যেমন অপূর্বের চরিত্র দিয়ে দেখানো হয়েছে, তেমনি রামদাসের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে মহারাষ্ট্রীদের দোষগুণের, বিশেষ করে গুণের পরিচয়। একথা মনে না হয়েই পারে না যে বিপ্লবী রূপে বাঙালীদের তুলনায় মহারাষ্ট্রীদেরই শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন।[১৭]

। গুজরাতী ।

হিন্দীকে বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা গুজরাতী পাঠক-মহলে। এখানে একটা ভ্রম নিরসনের সুযোগ নিচ্ছি। অনেকের ধারণা গুজরাতী ভাষায় শরৎচন্দ্রের প্রথম অনুবাদক মহাদেব দেসাই। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় সেমিনারে কথাটা বললেন জনৈক গুজরাতী অধ্যাপক। তার উপর অযাচিত মন্তব্য করে বসলেন এক বাঙালী বিদ্বান। বললেন, "মহাদেব দেসাই প্রথম অনুবাদক তো বটেই, আর তাঁর সেই অনুবাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন গান্ধীজী।" মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে কিছু জানা নেই, কিন্তু প্রথম অংশটি মেনে নিতে দ্বিধা হচ্ছে। কারণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ অন্যরূপ। দেসাই অনূদিত প্রথম গ্রন্থ "শরদবাবুনী এণ বার্তাও" (=শরৎবাবুর তিনটি গল্প: বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি)। প্রকাশকাল ১৯২৩। তার দুবছর আগে, ১৯২১ সালে, বেরিয়ে যায় "শ্রীমতী বিজয়া" (দত্তার অনুবাদ)। অনুবাদক কৃষ্ণপ্রসাদ মণিশঙ্কর শাস্ত্রী। মহাদেব দেসাই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিমান ব্যক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রের অখ্যাতনামা পথিকৃৎকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

গুজরাতী ভাষায় শরৎচন্দ্রের সবগুলি না হলেও অনেকগুলি বই অনূদিত হয়েছে লেখকের জীবৎকালের মধ্যেই (১৯৩৮)। এই দীর্ঘকাল ধরে

১৭। বংগালী আণি মহারাষ্ট্রীয় ব্যক্তীচা স্বভাবধর্মাতীল অত্যন্ত সূক্ষ্মভেদ অপূর্ব আণি রামদাস যা দোন পাত্রাংচ্যা দ্বারে মাডল্যাত আলা আহে। অপূর্ব মৃহণজে সর্বসামান্য বংগালী তরুণাচে জসে প্রাতিনিধিক স্বরূপ আহে, তসাচ রামদাস হা মহারাষ্ট্রীচে প্রাতিনিধিক স্বরূপ যা দৃষ্টীনে চিত্তার লেলা আহে। বংগলী চে সারে আণি সারে দোষ জসে অপূর্বচ্যা চারিত্র্যাতূণ দাখবিলে গেলে আহেত, তাচে প্রমাণে রামদাসচ্যা চারিত্র্যাতূণ মহারাষ্ট্রীচা গুণদোষাঁচে—সামান্যতঃ গুণাচেচ স্বরূপ মাডলে আহে।......ক্রান্তিকারক যা নাত্যানে মহারাষ্ট্রীয় হা বংগাল্যাপেক্ষা শরদবাবূনী শ্রেষ্ঠ ঠরবলা আহে অসে বাটল্যাবাচূন রাহত নাহী।

গুজরাতী জনসমাজে শরৎচন্দ্র যেভাবে পঠিত ও সমাদৃত হয়ে আসছেন, তাতে গুজরাতী ভাষায় শরৎসাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট আলোচনা-গ্রন্থের প্রকাশ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। অথচ আজ পর্যন্ত এজাতীয় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। গ্রন্থ প্রকাশিত না হোক, বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমালোচকদের মন্তব্য থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গুজরাতী মনোভাবের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

"শরৎসাহিত্যে পাত্রপাত্রীর নামধাম ও সম্বোধনাদি বঙ্গদেশীয় না হলে আমাদের মনে হত এ সমস্ত বুঝি সুরতের (সুরাটের) আশপাশের কাহিনী।"[১৮] নিষ্কৃতির 'প্রবেশক'-এ মুরলী ঠাকুর বলেছেন, "শরদবাবুকে যেন চেষ্টা করে কথা বলতে হয় না, কথা আপনা থেকেই জন্মলাভ করে। উপন্যাসে বর্ণিত পাত্রপাত্রীর জীবন প্রাণবন্ত হয়ে যথাকালে তার ঔচিতপূর্ণ পরিণামে এসে বিশ্রামলাভ করে। শ্রীকান্ত ও চরিত্রহীনের মতো বড়ো উপন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে কাশীনাথ ও পরিণীতার মতো ছোটখাটো উপন্যাসও সমানভাবে সজীব ও রসগ্রাহী।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম আধুনিক অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী। ভদ্রলোকের আসল নাম রজনীকান্ত। এঁর অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন গুজরাতী সাহিত্যের খ্যাতনামা জীবন-চরিতকার ধনবন্ত ওঝা। দত্তাকে ইনি বলেছেন সংস্কার-সমন্বয়ের উপন্যাস। এঁর মতে, শরৎবাবুর পক্ষপাত ছিল প্রাচীন সংস্কারের প্রতি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের নবীন শুভ প্রবর্তনাকে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। শরৎবাবু সনাতন ধর্মকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তার জড়তাকে নয়। সনাতন ধর্মের উদারপন্থী নরেন্দ্র এবং নবপ্রবর্তিত ব্রাহ্ম-ধর্মের আলোকপ্রাপ্তা বিজয়া—এই দুই বিসদৃশের মিলনসাধনের মধ্যেই শরৎবাবুর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন প্রাচ্য ও অর্বাচীন প্রতীচ্যের উপযুক্ত সমন্বয়ের কথা গুজরাতী সাহিত্যে ইতিপূর্বে বলে গেছেন বৃহত্তম গুজরাতী উপন্যাস "সরস্বতী চন্দ্র" (১৮৮৭, ১৮৯২, ১৮৯৯, ১৯০১ সালে প্রকাশিত চারিটি খণ্ডে সম্পূর্ণ)-এর রচয়িতা গোবর্ধনরাম মাধবরাম ত্রিপাঠী (১৮৫৫—১৯০৭)। শরৎচন্দ্রের রসমধুর রচনায় সেই সত্যের সন্ধান পেয়ে গুজরাতী পাঠক-সাধারণ আনন্দিত।

১৮। মাণসোনা অনে সগপণনাঁ নামো অনে সম্বোধনো বংগালী ন হোত তো কোঈ আমনে জরুর সুরত আসপাসনা ভাগনী বার্তাও সমজত (ভূমিকা, শরৎবাবুণী এণবার্তাও, রামনারায়ণ বিশ্বনাথ পাঠক)।

শরৎচন্দ্রের রচনায় গুজরাতী পাঠকের আগ্রহ বোঝা যাবে আর-একটি দৃষ্টান্ত থেকে। শরৎচন্দ্রের অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'জাগরণ' প্রথম প্রকাশিত হয় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩ ০ থেকে ১৩৩২ সালের মধ্যে। এর পরে ১২/১৩ বছর বেঁচে থেকেও তিনি আর এ বইটি সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হননি। পরবর্তী অসম্পূর্ণ উপন্যাস "শেষের পরিচয়" শেষ করেন রাধারাণী দেবী। কিন্তু 'জাগরণ' সম্পর্কে কোনো বাঙালী লেখক তেমন আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে জানি না। এই কাজটি সম্পন্ন করেন প্রসিদ্ধ গুজরাতী অনুবাদক শ্রীকান্ত। অনুবাদের প্রকাশকাল ১৯৫২। 'জাগরণ'-এর পরিবর্তে অনূদিত গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'অমরনাথ'। তবে গ্রন্থের অভ্যন্তরে শরৎচন্দ্রের রচনা পর্যন্ত প্রতিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে 'জাগরণ', পরবর্তী অংশে 'অমরনাথ'। ১৭টি পরিচ্ছেদে এবং ১৬১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানির ৯০ পৃষ্ঠা ও ৯টি পরিচ্ছেদ শরৎচন্দ্রের রচনা। বাকী অংশ অনুবাদকের সংযোজন। প্রকাশকের মন্তব্যে বলা হয়েছে: "এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি পড়ে মনে হয় যে লেখক যদি এটি শেষ করে যেতে পারতেন, তবে আর একখানি পথের দাবী পাওয়া যেত।" জাগরণ সম্পূর্ণ হলেও পথের দাবীর মর্যাদা লাভ করত কিনা সন্দেহ। অনুবাদকের সংযোজন অংশটুকু পড়ে পাঠের পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

। হিন্দী ।

হিন্দীতে শরৎচন্দ্রের অনুবাদ বেরিয়েছে অজস্র। এক-একখানি গ্রন্থের যেমন বিভিন্ন অনুবাদ, তেমনি বিভিন্ন অনুবাদের নানা মুদ্রণ। ভারতবর্ষে হিন্দীভাষীর সংখ্যা সর্বাধিক বলে শরৎরচনাবলীর বিক্রিও এই ভাষায় সবচেয়ে বেশি, বোধ করি বাংলার চেয়েও।

হিন্দীতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছেন নাম-করা লেখক ইলাচাঁদ জোশী, ১৯৩৮ সালে, তাঁর "শরৎচন্দ্র কী প্রতিভা" নামক দুটি প্রবন্ধে এবং ১৯৭৪ সালে আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "আওয়ারা মসীহা" (ভ্রাম্যমাণ দেবদূত) প্রকাশের ফলে বিপুল খ্যাতিলাভ করেন লেখক বিষ্ণু প্রভাকর। এই দুই কালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় ডক্টর ইন্দ্রনাথ মদানের "শরৎচন্দ্র: চিন্তন ও কলা" (১৯৫৪) (বইটি প্রথমে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে "শরৎচন্দ্র: হিজ্ মাইণ্ড্ অ্যাণ্ড্ আর্ট নামে), ইলাচাঁদের "শরৎচন্দ্র: ব্যক্তি ঔর কলাকার" (১৯৫৪), রামস্বরূপ চতুর্বেদীর

"শরৎকে নারীপাত্র" (১৯৫৫), মন্মথনাথ গুপ্তের "শরৎচন্দ্র : এক অধ্যয়ন" (১৯৪৬) (বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে "শরৎচন্দ্র : ব্যক্তি ঔর সাহিত্যকার" নামে) এবং ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ তিওয়ারীর তুলনামূলক সমালোচনাগ্রন্থ "প্রেমচাঁদ ঔর শরৎচন্দ্রকে উপন্যাস" (১৯৭৯)।

উল্লিখিত বইগুলির মধ্যে মন্মথনাথের বই অনেকটা "সংক্ষেপে শরৎচন্দ্রের গল্প" জাতীয় রচনা। বাকী বইগুলি মোটামুটি আলোচনা-মূলক। রামস্বরূপের গ্রন্থে শরৎসাহিত্য থেকে ছোট বড় সব মিলিয়ে মোট ১৭৮টি নারীচরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে নানারকম স্বাধীন মন্তব্যও করা হয়েছে। রামস্বরূপের মতে শরৎচন্দ্র ছিলেন শিল্পীদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং চিন্তাশীলদের ব্যক্তিদের মধ্যে মহান শিল্পী।[১১] তাঁর দু-একটি মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কোন্ দৃষ্টিতে তিনি শরৎচন্দ্রকে বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে ও পথনির্দেশ এক অনুপম ত্রিবেণী। যে-কোনো কথা-সাহিত্যই এই ত্রিবেণীর দ্বারা গৌরবান্বিত হতে পারে। বিরাজ বৌ বইখানি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়, শরৎসাহিত্যের রমণী-প্রেমে সেক্স্-এর প্রাধান্য নেই। শরৎবাবুর রচনা হল স্নেহভালবাসার নির্মল মন্দাকিনী, বাসনার কলুষিত বৈতরণী নয়। চরিত্রহীনে যে আদর্শবাদ শিথিল, পল্লীসমাজে আবার তা সংহত সংযত রূপ নিয়েছে। অথচ এখানে বাস্তবতাও অক্ষুণ্ণ। যে বিশ্বেশ্বরী (জ্যাঠাইমা) বাঙালী পাঠক ও সমালোচকদের চোখে "অবাস্তব অশরীরী দেবতা," রামস্বরূপ তাঁকেই বলেছেন—পল্লীসমাজের ঈর্ষা-দ্বেষের অন্ধকারে উজ্জ্বল নির্মল জ্যোতি।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে ইলাচাঁদ জোশীর মন্তব্য ভাববার মতো। তিনি স্বীকার করেন, কেবল জনপ্রিয়তা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। কারণ সাধারণ জনতার কাছে সেই সমস্ত রচনাই প্রিয় যাতে আছে রোমহর্ষক ঘটনার অথবা নরনারীর কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতার বিবরণ। কিন্তু গোড়ার দিকে যে দুটি রচনা নিয়ে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হল, তাতে জনপ্রিয়তার উল্লিখিত লক্ষণের কিছুমাত্র আভাস নেই। রচনা দুটি রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে। কেবল এই দুটিতেই নয়, পরবর্তীকালের (বলা বাহুল্য, এখানে হিন্দী অনুবাদের কথা বলা হচ্ছে) বড়দিদি, মেজদিদি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি গ্রন্থেও আমরা পাই অন্য গুণ—হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি, সূক্ষ্ম সংবেদন ও 'বিচক্ষণ মার্মিকতা'। এইসব

১১। ওয়ে কলাকারোঁ মেঁ মহান্ বিচারক এবং বিচারকোঁ মেঁ মহান্ কলাকার থে। (পৃঃ ৩০০)

গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তব জীবন ও কমনীয় আদর্শের যে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন তার ফলে সহসা জনপ্রিয় হওয়া নিতান্ত সহজ কথা নয়। নয় ঠিকই। ইলাচাঁদ তাই শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, হিন্দী সমাজে আর-একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ 'রামচরিতমানস'। অর্থাৎ তুলসীদাসের মতো শরৎচন্দ্রের রচনাতেও একই সঙ্গে হয়েছে জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষের দুর্লভ সমাবেশ।

হিন্দী সমালোচক যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালী সমালোচক থেকে ভিন্নপন্থী, তার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মনে করেন, গঠনকৌশলের দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠের উইল গৃহদাহের সমশ্রেণীভুক্ত (পৃ. ১৬৫)। কিন্তু হিন্দী সমালোচকের মতে বৈকুণ্ঠের উইলে কাহিনী ও চরিত্রের সামঞ্জস্য ঘটেনি। উপসংহারে আকস্মিক পরিবর্তন অনেকটা উপদেশাত্মক হয়ে উঠেছে। চরিত্রসৃষ্টি হালকা। গল্পের কাঠামো শিথিল। বইটিতে সামাজিক সমস্যার আলোচনা দুর্বল এবং কাহিনীতে প্রাণসঞ্চার ঘটেনি। চরিত্রহীন উপন্যাসে সরোজিনী-সতীশের বিবাহ গল্পকে সবচেয়ে বেশি দুর্বল করে ফেলেছে বলে ডক্টর মদান মনে করেন। সুবোধ সেনগুপ্তের মতে দেনাপাওনা শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। হিন্দী সমালোচকদের মত অন্যরূপ। ডক্টর মদান বলেন, দেনাপাওনার শৈলী অপরিণত। চতুর্বেদীর বক্তব্য: যদিও দেনাপাওনা শরৎবাবুর সৃষ্টিকালের উত্তরার্ধে রচিত একখানি বড় উপন্যাস, তবু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে এই গ্রন্থে সাহিত্যরসসৃষ্টি হয় নি। লেখক বাংলার গ্রামজীবনের চিত্রণে এত ব্যস্ত যে বইটিতে মানবিক ভাবনার স্পর্শ লাগাবার অবকাশ খুব কমই পেয়েছেন।[২০] পল্লীসমাজ ও দেনাপাওনার তুলনা ক'রে তিনি পল্লীসমাজকেই উচ্চতর স্থান দিয়েছেন।

"বিপ্রদাস যে শরৎচন্দ্রের নিকৃষ্টতম রচনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ কম"—ডক্টর সেনগুপ্তের এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মত উপস্থিত করেছেন হিন্দী সমালোচকেরা। ডক্টর তিওয়ারীর মতে, বিপ্রদাসে শরৎচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। অগ্রণী সমালোচক চতুর্বেদীর বক্তব্য: পূর্ববর্তী সমস্ত রচনার চেয়ে বিপ্রদাস 'প্রৌঢ়' রচনা। এই উপন্যাসের

২০। 'লেনদেন' শরৎবাবুকে রচনাকালকে উত্তরার্দ্ধমে' রচিত এক অপেক্ষাকৃত বড়া উপন্যাস হৈ, পরন্তু যহ্ নিঃসঙ্কোচ রূপসে কহা জা সকতা হৈ কি আকারকে অনুরূপ ইস উপন্যাস মে' রসসৃষ্টি সম্ভব নহী' হো সকী। লেখক বংগালকে পল্লীসমাজকে চিত্রণ মে' ইতনা ব্যস্ত রহা হৈ কি উসে সহজ মানবীয় ভাবনায়ো'কা স্পর্শ করনে কা বহুত কম অবকাশ মিল সকা। (পৃঃ ১৮৩)

প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ভারতীয় নারীর কল্যাণময় ও মহিমময় রূপ দেখানো হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ নারীচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ছিল শরৎবাবুর মনে, তার চরম সীমায় তিনি পৌঁছেছেন শেষপ্রশ্ন উপন্যাসে (১৯৩১)। কিন্তু মনে হয়, আবার তিনি ঝুঁকেছেন পরম্পরাগত ভারতীয় রূপের প্রতি। তার পরিচয় বিপ্রদাস (১৯৩৫)।[২১]

শরৎসাহিত্যের শিল্পকৌশল নিয়েও আলোচনা করেছেন হিন্দী সমালোচকবৃন্দ। প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে প্রেমচন্দের কথা। ডক্টর মদানের মতে, শরৎবাবু জীবনের বিচিত্র দিকের ছবি আঁকেন নি, তবে যেটুকু এঁকেছেন সেখানে তাঁর জুড়ি নেই। ডক্টর তিওয়ারীও মনে করেন, প্রেমচাঁদের তুলনায় শরৎসাহিত্যের পটভূমি অপেক্ষাকৃত সীমিত হলেও সেই সীমিত ক্ষেত্রেই গল্প বলায় তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও, নতুন নতুন কল্পনালোক উন্মোচিত করে।[২২] তিওয়ারীর মতে, শরৎচন্দ্রের কাহিনী অত্যন্ত স্বাভাবিক রীতিতে গড়ে উঠে ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। প্রেমচাঁদের তুলনায় শরৎচন্দ্রের গল্পাংশ সুগঠিত, স্বচ্ছন্দ এবং আখ্যায়িকার বিভিন্ন অংশগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। প্রেমচাঁদের উপন্যাসে অনাবশ্যক প্রসঙ্গ এসে যেমন গল্পের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, শরৎসাহিত্যে তেমন অবান্তর ঘটনার ব্যবহার নেই। বস্তুত শরৎবাবুর মাত্রাবোধ ও সামঞ্জস্যজ্ঞান তাঁর গঠনকৌশলকে অনবদ্য ক'রে তোলে। তাঁর এই গল্পাংশের গাঁথুনি বা সংহতিগুণ কেবল ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলিতেই নয়, শ্রীকান্ত ও চরিত্রহীনের মতো বৃহৎ উপন্যাসেও বর্তমান। একই উপন্যাসে একাধিক আখ্যান থাকলেও লেখক অদ্ভুত নৈপুণ্যে সেগুলি জুড়েছেন। প্রেমচাঁদ আকস্মিক ঘটনার সৃষ্টি করে কাহিনীর শিল্পরূপ ও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করেন।

২১। বিপ্রদাস উপন্যাসকী সবসে বড়ী বিশেষতা য়হ হৈ কি ইসমেঁ উন্হোঁনে নারীকে ভারতীয় রূপকো হী অনধিক শ্রেয়স্কর এবং মহিমাময় দিখায়া হৈ। নারীকে পূর্বী ঔর পাশ্চমী সংস্কৃতিয়োঁসে অনুপ্রাণিত, দো বিভিন্ন এবং প্রায়ঃ বিরোধী রূপোঁমেঁ, শ্রেষ্ঠতাকে লিয়ে জো সংঘর্ষ শরৎবাবুকে মনমেঁ চ রহা থা, উসকী চরম সীমা উনকে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপন্যাস শেষপ্রশ্ন মেঁ পহুঁচ গঈ হৈ, পরন্তু ইসকে বাদ জান পড়তা হৈ কি উনকা নির্ণয় নারীকে পরম্পরাগত ভারতীয় রূপ কে হী পক্ষমেঁ রহা। (পৃঃ ২৮৩)

২২। শরৎচন্দ্রকে উপন্যাসোঁ কী কথাবস্তু কা ক্ষেত্র সীমিত হৈ। শরৎচন্দ্র মেঁ কথা কো প্রস্তুত করনে কী কুছ ঐসী ক্ষমতা হৈ, কুছ ঐসী কুশলতা হৈ কি উনকা প্রত্যেক উপন্যাস এক নয়া কল্পনালোক খোলতা হৈ। (পৃঃ ২২৪)

শরৎচন্দ্রের গল্পে কোথাও আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ নেই। ইন্দ্রনাথ মদান স্বীকার করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা বই পড়বার সুযোগ তাঁর হয়নি। তাঁর আলোচনার অবলম্বন একমাত্র হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদ পড়েও কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে (প্রেমচাঁদের কথা স্মরণ রেখেও মনে হয়েছে) যে, ভারতীয় কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক শরৎচন্দ্র।

পত্রাবলীর শরৎচন্দ্র

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীচরিতের একটি অখণ্ড মাল্যরচনার প্রয়াস হিসেবে তাঁর পত্রাবলীকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পত্রগুলির মধ্যে তাঁর শিল্পীআত্মার উপাদান-উপকরণের পরিচয় যেমন মেলে—তেমনি উপাদান-অতিরিক্ত সাহিত্যিক মূল্যের পরিচয়ও পত্রগুলিতে সুপ্রচুর। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর মনোজীবনের উন্মুক্ত, অকপট প্রকাশরীতি আত্মনিষ্ঠ আনন্দবেদনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক প্রকৃতি এবং হৃদয়লোকের একটি ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডল রচনা করেছে। শরৎ-মানসের সহজিয়া সুনিপুণ স্বভাব-উক্তির ভঙ্গী ভাষার তদ্গত আন্তরিকতা এবং নানা বিষয়-বৈচিত্র্যের উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই পত্রাবলীর শরৎচন্দ্র পূর্ণ-বিকশিত। আবার কোথাও প্রয়োজনের আত্যন্তিক নিষ্ঠায় ভাষার রমণীয়তার প্রতি কিছুটা বিমুখ হয়ে তিনি যুক্তির প্রতি মনোযোগী কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ—যার মধ্য দিয়ে রুচিনীতি, সাহিত্যবোধ ও সমালোচনাবৃত্তির প্রকাশরীতি দ্বিধাহীন স্পষ্টভাষণে উদ্ভাসিত হয়েছে। কোন কোন পত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা কথার পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক দেশকালের নানা প্রসঙ্গের পর্যালোচনা লক্ষণীয় গুরুত্ব লাভ করেছে। আবার বহু পত্রে তাঁর অমলিন শিল্পীচরিতের স্বভাবানুগ হাস্য-রসের সিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ হয়েছে। এই রস-রসিকতা যেন তাঁর শিল্পী-চরিতেরই দ্যুতি-লাবণ্য।

তাঁর পত্রাবলীর একটি বিশেষ অংশ জুড়ে আছে তাঁর সাহিত্যভাবনা। এই সাহিত্যভাবনা তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে যেমন বিশ্লেষণমুখর—তেমনি অপরের রচনা সম্পর্কেও নিরপেক্ষ সত্যের মূল্যায়নে বাঙ্ময়। এইজাতীয় পত্রের সূত্রে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিমত উদাহৃত হয়েছে। সাহিত্যের মৌলিক প্রকৃতি তত্ত্ব নির্ধারণে সে অভিমতের মূল্য নিঃসন্দেহে আজ ঐতিহাসিক বলে বিবেচিত হবে। বহুজনের রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর পত্রাবলীতে উল্লেখিত কিছু কিছু মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রচনারীতির মধ্যে সংযমকে তিনি চিরকাল উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের রচনা সম্বন্ধে এক'টি পত্রে তিনি লিখেছেন: "প্রভাত মুখুজ্জের বর্ণনায় নিপুণতা, ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারী, ক'টা সোফা,

প্রদীপ ক'টা সলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।" জলধর সেনকে একটি পত্রে তীব্র আক্রমণ করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—"তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ-মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইল কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।" দিলীপকুমার রায়কে লিখিত একটি পত্রাংশে পাই—"অবশ্য সংযম জিনিসটা হচ্ছে একপ্রকারের ইন্‌সটিংট, ও নিজের না থাকলে পরে বুঝিয়ে দিতে পারে না।… লেখায় সংযম-সাধনার মতো শক্ত সাধনা আর নেই। যা অনায়াসে লিখতে পারতাম তা না-লেখা। রসজ্ঞ পাঠকের মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখনি সে দেখতে পায় এই সংযমের চিহ্নটুকু।" দিলীপকুমার রায়ের কাছে লিখিত আর-একটি পত্রে পাই: "তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেছি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইংগিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না।" কিংবা "তোমার 'দোলা'র ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়েছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই।"

দিলীপকুমার রায়ের রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একটি বিশেষ মানসিক আকর্ষণ ছিল। তাঁর আশ্রমে বাস প্রসঙ্গে একটি পত্রে তুলনামূলক ভঙ্গীতে জীবন সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ উক্তি শরৎচন্দ্র করেছেন—সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সাহিত্য-চিন্তাও স্বগতোক্তির মতো উচ্চারিত হয়েছে। জীবনবিমুখ সাহিত্যভাবনা তাঁর ছিল না বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন: 'জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে?…নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাঙলাদেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম 'যৌবনের' আবেগে যত কিছুই করুক,

দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।···সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফু'টিয়ে তুলেছে।"

রবীন্দ্রবিরোধিতার নামান্তরে আধুনিকদের অসংযমকে শরৎচন্দ্র বেশীদিন সমর্থন করতে যে পারেননি—পত্রাবলীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ মন্তব্যে আমরা তার পরিচয় লাভ করি—"শেষ প্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। 'খুব বোরবো, গর্জন কোরে নোংরা কথাই লিখবো' এই মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের সেন্ট্রাল পিভট নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।" কিংবা: "কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়েলিজম্ ভাবে তাদের আইডিয়ালিজম্ ত নেই-ই, রিয়ালিজমও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্ধা—না জানার অহমিকা।"

প্রবন্ধে আড়ম্বরের আতিশয্য, 'যেখানে সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা'র বিরোধী ছিলেন শরৎচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি পত্রে লিখেছেন: "লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর কোয়ালিফিকেশন—লেখকের নয়। এ-কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো। কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্ বা নারীর উপরেই হোক্।" জীবনে অভিজ্ঞতার মূল্যকে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন—পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতার সন্ধান মিললেও পত্রে যথার্থ অর্থে মর্মোপলব্ধি হয়তো সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এবং সাহিত্যসৃজনে এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য গভীর চিন্তাদ্যোতক: "জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতগুলি কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময় দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য ও সঙ্কোচে বাধে।" সৃজনলগ্নেও সাহিত্যিকের মধ্যে একদিকে যেমন আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্ব সক্রিয় থাকে, অপর দিকে তেমনি স্রষ্টার মধ্যে সমালোচনা-প্রখর একটি সত্তাও থাকে। লেখকের এই ক্রিটিক সত্তা তাঁর মধ্যে সক্রিয় থেকে সাহিত্যকে যথার্থ রসোত্তীর্ণ হতে সহায়তা করে। সাহিত্যসৃষ্টির নেপথ্যে স্রষ্টার

অন্তর্লীন এই 'ক্রিটিক' সত্তা প্রসঙ্গেও একটি পত্রে শরৎচন্দ্র অন্তর্গামী আলোচনা করেছেন : "মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না। ক্রিটিকও থাকে। তাই বেশী বয়সে লেখক যখন লিখতে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান-বুদ্ধিবিদ্যের দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে ব্যক্তি রসসৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো, আর লেখা উচিত নয়।" তৎকালীন 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লেখা একটি পত্রে সাহিত্য প্রচারে, সৃজন ও পাঠকমনকে অধিকার করার যথার্থ দিকনির্দেশ করে তিনি বলেছেন : "মাসিক পত্র বহুলোকের প্রিয় করে তোলার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা ও সংযম। উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী তো হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। গল্পেই হোক্ বা যাতেই হোক্ যদি দেখতেই পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখনি মনে ক'রো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য,—সে টিকবে না।" সাহিত্যে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গল্প প্রসঙ্গে পত্রে শরৎচন্দ্রের পর্যালোচনা তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক সত্তার বিশেষ দৃষ্টিকোণেরই পরিচয়বহ—"সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে।...এমন কথাও মনে ক'র না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষণীয়, হৃদয়বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দারকার।" দিলীপকুমার রায়ের রচিত সাহিত্যকর্ম শরৎচন্দ্রের সস্নেহ সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। দিলীপকুমারের রচনার সংযম ও 'প্রৌঢ়-শোভন-নিপুণতা' দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পত্রমাধ্যমে সাহিত্যরচনার যে তালিম শরৎচন্দ্র দিয়েছিলেন—তা চিরকালের সাহিত্যরচয়িতাদের জন্যেই পথপ্রদর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে : 'রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেকনিক বল,—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখা ই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ

হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ পাঠকের দল এমনি কুঁড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিশটুকু মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।" শরৎ-পত্রে সাহিত্য-সৃষ্টির এই শিক্ষানবিশির হাতে-কলমে নির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমকালীন সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আর-একটি লক্ষণীয় মানদণ্ডে তৌল করেছিলেন শরৎচন্দ্র। সমসাময়িক পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের গুণগত তারতম্যের মূল চারিত্রকে শরৎচন্দ্র পর্যালোচনা করেছেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত একটি পত্রে তিনি ব্যবহারিক সমালোচনার মাধ্যমে দ্বিধাদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে বলেছেন: "আজকাল রাশি রাশি বাংলা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দু'টা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে, শুধু এই নয়, ইহার পোনর আনাই অন্য লোকের চুরি···দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে, তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।" তিনি সাহিত্যে কৃত্রিমতামুক্ত সৎসাহস ও সরলতাকে স্বাগত জানিয়েছেন চিরকাল। রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনা শরৎমানসের এইজাতীয় নির্দিষ্টতা ও বলিষ্ঠতার স্মারক—"এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য—কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিত্যতা নেই।" মহিলাদের মধ্যে নিরুপমা দেবীর রচনা শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর রচনা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন, "সোমনাথের গল্পটা শেষ করে জলধরবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা ওঠে। আমি আমার মত এই বলে দিই যে, এই বই পড়া উচিত তাদেরই বেশী কোরে যারা নিজেরা বই লেখে।" প্রমথ চৌধুরীর রচনার মধ্য দিয়ে নির্মল লিখনভঙ্গী, রসে ভরা সোজা সরল কথোপকথন, মনের ভাব প্রকাশের অনাবিল মুক্ত পথের যে সন্ধান পেয়েছেন—সাহিত্যক্ষেত্রে সেগুলিকেই গ্রন্থকারদের অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে পত্রে উল্লেখ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা' সমালোচনা প্রসঙ্গে পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—

'চারইয়ারির কথাগুলি ঠিকমতো বুঝবার জন্যে পাঠকের এডুকেশন এবং কালচার বিশেষ একটা পর্যায়ে পৌঁছান দরকার।'

শরৎচন্দ্রের স্বরচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'চরিত্রহীন' যেভাবে সমালোচিত হয়েছিল তাতে শরৎচন্দ্রকে একদা আত্মপক্ষ সমর্থনের কারণে পত্রে প্রবন্ধে নানা ভাবে এই গ্রন্থখানি প্রসঙ্গে বহু বিশ্লেষণ করতে হয়েছে এবং রচনাটি সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ই বারংবার উচ্চারিত হয়েছে—"যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না. .আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না।" উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ পাল, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার রায় প্রমুখের কাছে লিখিত পত্রে, শরৎচন্দ্রের আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা ক্ষুব্ধ বক্তব্য তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে এবং আহত আবেগাত্মক ভঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে। শরৎমানসের আত্মচারণা এবং সাহিত্যিক দৃক্‌কোণের বিশেষ পরিচয় পত্রগুলির মধ্যে নিহিত। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লিখিত পত্রাবলী একত্র ক'রে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা সত্তার অন্তরালবর্তী সমালোচকসত্তা এবং শরৎপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নানাভাবে ধরা পড়বে। আমরা এই পত্রগুলির কিছু নির্বাচিত অংশ আমাদের পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি :

ক. শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে।

খ. সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়া দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই···এ একটা Scientific Psycho and Ethical Novel। আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না।

গ. ···এটা সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার জন্য নয়, স্কুল পাঠ্যও নয়। টলস্টয়ের 'রিসরেক্‌সন' তাহারা একবার যদি পড়ে, তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকিবে না।

ঘ. ···যারা বোঝে না, যারা art-এর ধার ধারে না তারা হয়তো নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভালো তাতে সন্দেহ নেই।

'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে নানা পত্রে যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের পরিচয় পাই। কিন্তু এ সত্ত্বেও কোন 'অনুকূল প্রতিক্রিয়া' সৃষ্টি করতে না পারায় শরৎচন্দ্রের মানসিক ক্ষোভ ক্রোধ ও ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষপ্রয়োগে

কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সমকালীন বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনার প্রেক্ষিতে শরৎমানসের প্রতিক্রিয়া কিছুটা উগ্রতার পরিচয় দেয়। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে লিখিত একটি পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করবার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে ইতিমধ্যে খুঁজে রাখতে হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই— এমনি করে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধরে 'এক্সপোজ' কোরব। আমি অনেক নজির এর মধ্যেই জোগাড় করেছি। রবিবাবু প্রভৃতি সর্বত্র হতেই।" আর একটি পত্রাংশেও ঠিক অনুরূপ উষ্ণ প্রতিক্রিয়ার পরিচয় বিধৃত: "অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই। ('কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু, এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন! ··আর আমার চরিত্রহীন যত অপরাধে অপরাধী? নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন', এর মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না। 'রত্নদীপ' নাম দিয়া বাড়ীর কেচ্ছা সুরু করি নাই।"

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস প্রসঙ্গেও তাঁর পত্রে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও অভিমতের পরিচয় পাই। রাধারাণী দেবীর কাছে লেখা দুখানা পত্র থেকে তাঁর মতামত উদ্ধৃত করছি:

১। শেষ প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেককেই ব্যথা দেবো, তবুও যা ঠিক বলে মনে করি তা বলা দরকার।

২। শেষ প্রশ্ন তোমার ভালো লেগেছে শুনে ভারী আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাংলা দেশে হয়তো পাবো না; শুধু গালিগালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়।···অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত।

'পল্লীসমাজ' বিষয়ে সুবোধ রায়কে একটি পত্রে তিনি উপন্যাসটির পরিবেশ প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। দিলীপকুমার রায়ের কাছে লিখিত আর-একটি পত্রে উল্লেখ আছে। "বইটার (নিষ্কৃতি) নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মন্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দের ভালো লাগল জানিনে···তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়তো বাঙালী একজন গল্প লেখককে পশ্চিমের ওরা একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন।" দিলীপকুমার রায়ের কাছে লিখিত পত্রেই শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"ইতিপূর্বেই তোমার প্রেরিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের উপর প্রবন্ধ পেয়েছিলাম··· শ্রীকান্তের কথাই আছে সত্যি, কিন্তু সাহিত্যবিচারের যে ধারাটি তুমি এমন মধুর ক'রে এমন হৃদয় দিয়ে আলোচনা করেছ তা শুধু যে সুন্দর হয়েছে তাই নয়, নিরপেক্ষ সুবিচার হয়েছে বলে যে কোন দরদী পাঠকই স্বীকার করবে। ···শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুসি হয়েছি বলতে পারিনে,—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন করে মন দিয়ে লিখে-ছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই।" শ্রীকান্ত ৫ম পর্ব রচনার অভিপ্রায় শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারের কাছে পত্রমাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন—"আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব ভালো হয়নি তবে থামলো এইখানেই রথ। ···আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ পর্বটা শেষ করবো এবং নানাদিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্য দিয়ে কতটুকু রসসৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না—থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা, তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানিনে, তবে উপন্যাসসাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে, যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসি নি।" পত্রাংশটি শরৎচন্দ্রের সমগ্র মনোজীবন ও শিল্পভাবনার দিক্-নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। উক্তিগুলি শরৎচন্দ্রের আপন শিল্পীচরিত্রের সর্বঙ্কর মানসিক প্যাটার্নের পরিমাপক।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর মধ্যে সাধারণভাবেও সাহিত্যতত্ত্বঘটিত নানা প্রসঙ্গ, উদ্দেশ্য-আদর্শ ও নন্দনতত্ত্ববিষয়ক ধারণা ইত্যাদিও ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যে রীতি ও নীতিপন্থা, সত্য ও সুন্দরের মিলনজাত দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির চিন্তাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণও শরৎ-পত্রে তাঁর শিল্পচিন্তার অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করেছে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৮শে পৌষ অমল হোমকে লিখিত একটি পত্রে শরৎ-চন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পাই : "কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায় এ যেমন সত্যি, এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই, আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেননি গুরু বলে।" নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'চোখের বালি' পাঠ করে সেই অভূতপূর্ব আনন্দানুভূতিকে শরৎচন্দ্র

বাণীবদ্ধ করেছিলেন একটি পত্রে—যার মধ্য দিয়ে শিল্পী শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ছবি ফুটেছে: "ভাষা ও অনুভূতির একটা নতুন আলো যেন এসে চোখে পড়লো; সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজস্ব মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি······এই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতো বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র স্পষ্টতঃই বলেছেন—"এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে কি কথাসাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।" ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র কলকাতার টাউনহলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীতে পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিশেষ কারণে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে না পারায় কবি আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। সেই আশীর্বাণীর উত্তরে শরৎচন্দ্র যে পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় মেলে: "···'কালের যাত্রা'র সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।" 'চোখের বালি' ও 'গোরা'র সমালোচক শরৎচন্দ্র 'যোগাযোগ' উপন্যাসের আস্বাদন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন। দিলীপকুমারের কাছে লিখিত রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধটি সম্পর্কে শরৎমানস তখন কিছুটা প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন ছিল—তাৎক্ষণিক আপত্তি ও ক্ষোভের প্রশ্ন 'যোগাযোগ' সমালোচনায় সক্রিয় ছিল। শরৎ-রবীন্দ্র তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল 'পথের-দাবী' নামক বিতর্কিত উপন্যাসখানি নিয়ে। ১৩২৯ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবাত্মক কাহিনীটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার কর্তৃক গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র কর্তৃক ইংরেজ সরকারকে প্রতিবাদপত্র লিখতে অনুরুদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ এতে রাজী হন নি এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিসহ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন—তার ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়ে পাঠকমাত্রেই অবহিত আছেন। মর্মাহত শরৎচন্দ্র এর প্রতিবাদপত্র রচনা করেও শেষাবধি কবির কাছে তা পাঠান নি। সেই পত্রে প্রতিবাদ

সোচ্চার হয়ে উঠলেও অভিমান ছিল আত্মমুখী এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের ভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শরৎচন্দ্রের ভারাতুর কণ্ঠই তাই সেখানে উচ্চারিত হয়েছে— "আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি।" শরৎচন্দ্রকর্তৃক 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সংশয়াপন্ন মন্তব্য করেছিলেন – "তোমার নাট্য লেখবার শক্তি আছে।...তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে ভুলতে না পারো, তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।...তুমি উপস্থিত কালের কাছে দাম আদায় করে সুখী থাকতে পারো; কিন্তু সকল কালের জন্য কী রেখে যাবে?" প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র যা লিখেছিলেন তা পর্যালোচনা করলে সমকালীন দুই মহৎ সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনো-জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং সে পরিচয়ের ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন: "ছবির পারস্পেক্টিভ এবং সাহিত্যের পারস্পেক্টিভ কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়তো এক নয়। তা ছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়।" দুই সাহিত্যমহারথীর এইজাতীয় পত্র-বিতর্কের মধ্য দিয়ে দুই দৃষ্টিকোণের ব্যাপ্তি ও চিন্তাশীলতার গভীরতা সমগ্র সাহিত্য-ধারণার পরি-পূরক রূপে কাজ করে।

সাহিত্যের কল্যাণী দিকটাকে শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ প্রয়োজনের দিক বলে স্বীকার করেছিলেন। মানুষের অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে পারলেই মানুষের উদার দৃষ্টি ও সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে। বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে শরৎচন্দ্র এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলেন—"সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে ব'লেই মনে হয়।" জাহান-আরা চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্রে শরৎচন্দ্র এই বিষয়ক চিন্তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর চরম মূল্যাবধারণাকে শরৎচন্দ্র নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন: "সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদের ঘুচোতে হবে।"

শরৎচন্দ্রের আরও বহু পত্র আছে যার মধ্য দিয়ে তাঁর লঘু পরিহাসস্নিগ্ধ উদার হৃদয়ই উন্মোচিত। বহু পত্রে 'ভেলু'র নাম চিহ্নিত হয়ে আছে—যা তাঁর পশুপ্রীতি ও কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক। কিছু কিছু পত্রে সরস

উপস্থাপনাভঙ্গীর মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। কোন কোন পত্রে আবার রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয়ও মেলে।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী আবেগাত্মক হয়েও আকর্ষণীয় রূপে সংহত এবং তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে রূপান্তরিত। বিচিত্রমুখী আবেদনে বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতায় অতিকথামুক্তিতে এবং বস্তুনিষ্ঠ বিষয়মুখীনতায় বিধৃত হয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। পত্রগুলির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও মননের অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভ করা যায়। একটি বিশেষ মানুষের বিশেষকালের ভাবনা ও চেতনার ইতিহাস এই পত্রাবলী। সংযমে উত্তীর্ণ ও জীবনরসে পরিপূর্ণ সাহিত্যভাবনাই পত্রাবলীর শরৎচন্দ্রকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শোনা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে যে ভঙ্গীতে কথা বলতেন সেই অপূর্ব ভঙ্গীতেই তিনি কথায় সুরের জাল বুনে শ্রোতার মনকে বেঁধে ফেলতেন; কথায়, গল্পে, রহস্যালাপে তিনি যে মোহের সৃষ্টি করে যেতেন সেই মোহে আবিষ্ট হয়ে তাঁরই মুখে সেদিন শুনলাম দুটি গল্প :

শরৎচন্দ্র বললেন,—দেখো, জগতে সম্ভব ও অসম্ভবের দিক দিয়ে জীবনে আমি যা দেখেছি, সময় সময় আমি তাতে অভিভূত হয়ে গেছি—মনের মধ্যে অবিশ্বাসও জেগেছে কোনো সময়ে। কিন্তু সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেবার সুযোগও আমি পেয়েছি কারণ মানুষের চরিত্রে অসম্ভব বলে কখনও কিছু আমি উড়িয়ে দিইনি। দিইনি বলেই আমার লোকসানের চাইতে লাভই হয়েছে অনেক বেশী। শরৎচন্দ্র বললেন, শোনো তবে,—

রেঙ্গুনে থাকতে আমি এমনি একটা অসম্ভব ব্যাপার দেখেছিলাম। শীতলচাঁদ নামে একজন কামার কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার রেলকারখানায় কাজ করত। রেঙ্গুনে একটা ভাল কাজের জোগাড় করে সে কামিনী গয়লানীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। কামিনীর বয়স তখন চব্বিশ পেরিয়েছে বোধ হয়, কিন্তু বাঙালী মেয়ের এ বয়সে যে প্রথম যৌবনের এতখানি উচ্ছলতা থাকে সেটা বোঝা যেতো একবার তার চোখের দিকে চাইলে। সুঠাম সুডোল কর্মঠ দেহের উপর এমন একটি সম্ভ্রমস্নিগ্ধ সুষমা ছিল যা দেখলে বিশ্বাস হত না যে সে ঘর-সংসার ছেড়ে কালাপানি পাড়ি দিয়ে আসতে পারে একজন পরপুরুষের ভালবাসার মোহে। তারা বাসা বেঁধেছিল রেঙ্গুন শহরে আমাদের মেসের খানিকটা দূরে। বাঙালী বলে আমার সঙ্গে ছোটবড় বহু বাঙালীর সঙ্গেই বিশেষ আলাপ ছিল—শুধু প্রবাসী বলে নয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতাম বলে। তোমরা যাদের ছোটলোক বল তাদের মধ্যে ভাল ডাক্তার বলে আমার একটা মিথ্যা পসার হয়েছিল। আমার অফিসে যাওয়া-আসার পথে তাদের বাসা। হিন্দুর ঘরের মেয়ে কামিনী আদরযত্ন ও পরিচর্যায় শীতলচাঁদের মনটা এমনি ভাবেই বশ করে ফেলেছিল যে পাঁড় মাতাল শীতলচাঁদ নাকি 'তোবা' 'তোবা' করে মদ ছেড়ে দিয়েছিল শুধু কামিনীর খাতিরে। সেদিন শরীরটা আমার ভাল ছিল না, সকাল সকাল অফিস থেকে বাসায় ফিরছি,—দেখি কামিনী দরজা ধরে তার বাসার সামনে কার যেন পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেঁদে-কেঁদে তার চোখ বসে গেছে—সারা মুখে কে যেন

খানিকটা আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। ভাবলাম মহামারী ব্যাপার কিছু একটা ঘটেছে কাল রাত্রে। শীতল হয়তো আবার মদ ধরেছে, তাই নিয়ে ঝগড়া গালাগালি, এবং শেষে কামিনীকে মারধর করে সে বোধহয় বেরিয়ে গেছে—কামিনী তারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিরে কামিনী, দাঁড়িয়ে আছিস যে অমন করে?—ব্যাপার কী?" কামিনী ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললে—"দাদাবাবু, আমার কপাল পুড়েছে—ওনার ওপর আজ চার দিন থেকে মায়ের দয়া হয়েছে। ভেবেছিলাম এমনি এমনি যাবে—তোমাকে আর এই ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে টানব না—কিন্তু কাল রাত্রি থেকে বেহুঁশ জ্বর, যন্ত্রণায় কেবল ছটফট করছে—গায়ে এমন বেরিয়েছে যে তাকে চেনা যায় না। তুমি দয়া করে একটু দেখবে দাদাবাবু?"—বলেই কামিনী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই যা দেখলাম—তা বর্ণনা করা যায় না। রোগে মানুষের চেহারা যে এমন বীভৎস হতে পারে তা জানতাম না। শীতলকে সত্যই আর চেনা যায় না। যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করে শুধু কাতরাচ্ছে, চোখ চাইতে পারছে না—সেই অজ্ঞান অভিভূত অবস্থায় নাম ধরে ডাকতেই কামিনী শীতলকে জড়িয়ে ধরে তার বিকৃত বিবর্ণ মুখের কাছে মুখ দিয়ে বললে—"ওগো শুনছ?—দাদাবাবু এসেছেন,—আর ভয় নেই—একফোঁটা ঔষধ খেলেই, সব যন্ত্রণা ভাল হয়ে যাবে।"

শরৎচন্দ্র বলে যেতে লাগলেন—আমার ক্ষমতা কতটুকু তা আমি জানতাম—তাই আমি নিজের মনে কোনো ভরসা পেলাম না। ভাবলাম—এই অবস্থাতেই মানুষ বুঝি মৃত্যু কামনা করে।

কিন্তু কোনো উপায়ই তখন ছিল না। আমার সাধ্যমত ঔষধ দিলাম। বড় ডাক্তারও এসেছিল।—যে কদিন শীতল বেঁচেছিল অফিস কামাই করে যাতায়াত করেছি, কিন্তু শীতল কিছুতেই বাঁচল না। সে ক'দিন ধরে তার রোগশয্যার পাশে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রিয়জনের অনিবার্য মৃত্যুর অপেক্ষায় একাসনে একাগ্রমনে সেবাপরায়ণা যে নারীমূর্তিটিকে আমি বসে থাকতে দেখেছিলাম—জীবনে আমি আর তার কথা কখনও ভুলব না। মানুষ হিসাবে কোনো সতীলক্ষ্মী হিন্দু স্ত্রীর চাইতে সেই দ্বিচারিণী নারীর মূল্য কি কোনো অংশে কম ছিল? নারীর মূল্য কীই বা আমরা জানি আর কতটুকুই বা আমরা দিয়ে থাকি?

এ তো গেল এক দিনের দৃশ্য—দৃশ্যান্তরে চোখ মেলে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম বছর দু-এক পরে।

বাসা বদল করে আমি যে বাঙালী মেসে গিয়ে উঠলাম—তার কিছু দূরেই বড় রাস্তার উপর একটি বাঙালীর মুদির দোকান ছিল। মেসে সাব্যস্ত হয়ে নিয়ে বিকেল বেলার দিকে বেরিয়েছি—পকেটে চুরুট আছে কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠি নেই,—ভাবলাম দূরে ওই মুদির দোকান থেকে একটা দেশলাই কিনে নেওয়া যাবে। দোকানে ঢুকে যা দেখলাম—তা আমার কাছেও অসম্ভব বলে মনে হল। দেখি কামিনী, তার সারা গায়ে নানারকম গয়না, বসে বসে খদ্দেরদের সওদা দিচ্ছে। তার মুখগহ্বরে সদ্যনিক্ষিপ্ত পানের খিলিটিকে রসাক্ত করবার জন্য, জারমান সিলভারের সুদৃশ্য একটি কৌটা থেকে জরদাটুকু, কেবল সে মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় দাদাবাবুর ত্রস্ত পদে প্রবেশ। কামিনী শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে —সরাসরি আমার পায়ের কাছে ঢিপ করে এক প্রণাম। পায়ের ধুলো মাথায় ও বুকে দিয়ে হাসিমুখে কামিনী বললে—"ভাল আছেন তো দাদাবাবু?" বললাম—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো ভালই আছি—তোর খবর কী? খবরটা তো ভালই মনে হচ্ছে, কী বলিস?" কামিনী এবার ফিক্ করে একগাল হেসে বললে, "হ্যাঁ দাদাবাবু, ভালই আছি আপনার আশীর্বাদে।" বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল;—বোধ হয় পুরোন দিনের স্মৃতি তাকে চঞ্চল করে দিলে—লজ্জাও হয়তো হল খানিকটা আমার কাছে। সে থতমত খেয়ে বললে—"যমে টানলে আর কার সাধ্য রাখে? মানুষের হাতে কিছু নেই এটা আমি তাকে শ্মশানে দিয়ে এসেই বুঝতে পারলাম। একদিকে যমে টেনেছে আর একদিকে আমি টেনেছি, বাঁচার হলে সে বাঁচত দাদাবাবু—। সে যে মরবেই। —এই বলে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।—সামলে নিয়ে কামিনী বললে—"ইনি তার মামাত ভাই, অনেকদিন থেকে রেঙ্গুনেই থাকেন। যাতায়াত ছিল—আমার দুঃখের দিনে ইনিই খোঁজখবর নিয়েছেন—দুবেলা দুটো খেতে পেয়েছি—সেও এঁরই জন্য। দুটি ছোট ছেলে, মা নেই। আহা! তাদের মুখের দিকে চেয়েই না আবার আমাকে নোতুন সংসার পাততে হল। নইলে আমার একটা পেট দুঃখধান্দা করেই চলে যেত।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কামিনী বললে—"তবে মানুষটা বড্ড ভাল দাদাবাবু।—ঠিক তারই মত। বড্ড আদরযত্ন করে, ভালবাসে, নেশাভাঙ করে না—আর বলতে কি দাদা-বাবু—" কামিনী কী যেন বলতে গিয়ে সামলে গেল। বুঝতে পারলাম তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে সেও এই নতুন মানুষটিকে ভালবাসে! শীতলের অসুখের সময় একটি লোক দেখাশোনা করত বটে। জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যাঁরে কামিনী, এর নাম নিবারণ না?" কামিনী আবার একটু হেসে, মাথার

কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ দাদাবাবু—আপনি তো সবই জানেন।"

শীতলের রোগশয্যার পাশে বেহুলার মতো কামিনী অনন্যমনে আপনাকে উৎসর্গ করে বসে ছিল, অনাহারে অনিদ্রায়, দুর্ভাবনায় কামিনী যেন কদিনেই পোড়াকাঠ হয়ে উঠেছিল। আবার কামিনীর সারা দেহে যেন বসন্তের হাওয়া লেগেছে—সুডৌল মুখে, আয়ত চোখ দুটিতে সে লাবণ্য আবার ফুটে উঠেছে। —তাতে মনে হল কামিনী নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। আমি যতদিন সে অঞ্চলে ছিলাম, লক্ষ্য করেছি কামিনীর চোখে মুখে এতদিন নিভৃত নীড় রচনার যে আকুল আগ্রহ ছিল—তা যেন এ গৃহের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সফলতা লাভ করেছে। কামিনীর জীবনের সাধ মিটেছে, সে আবার ভালবেসেছে। কামিনী এবার গৃহিণী হয়েছে। কামিনী সত্যই সুখী হয়েছে। ভাবলাম এও যদি সম্ভব হল তাহলে কামিনীর জীবনে শীতলচাঁদও সত্য— নিবারণও সত্য।

নির্বাক বিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের গল্প শুনছিলাম, এবার তিনি চুপ করে গড়গড়া টানতে লাগলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর আবার বলতে লাগলেন,—

আর দেখো, যদি বল সামাজিক নীতি-দুর্নীতির কথা? কে তার বিচার করবে? মানুষকে যারা দেখলে না—তার দুঃখে এসে দাঁড়ালে না, তার ব্যথায় ব্যথা পেলে না, তারা তার আসল পরিচয় পাবে কী করে? বাইরের ভাল মন্দ সৎ-অসৎটাই যাদের কাছে বড়, মানুষের অন্তরের মানুষটি তো তাদের কাছে ছোট হয়েই থাকবে। সংসারে অবজ্ঞাত নীচ বলে ছোট বলে অসৎ বলে যাদের আমরা ঘৃণা করি তাদের মধ্যে যে আমি কী পরিমাণ মনুষ্যত্ব দেখেছি সে কথা আর-একদিন তোমাদের বলব। চরিত্রহীনের কথাটা বলে আজকের মত শেষ করব।—সন্ধ্যা সাতটায় হাওড়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং আছে।

শরৎচন্দ্র আরম্ভ করলেন,—

কাশীতে কিছুদিন আগে আমি সুরেশের (উত্তরা-সম্পাদক) ওখানে গিয়ে উঠেছি। ওখানকার কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে বললেন যে এখানে বাঙালীরা আমাকে দেখতে চায়। সেজন্য তারা একটি সভায় আমায় ডাকবে। তারা জানত, কিছু বলতে বললে আমি সভায় যাব না, তাই শুধু আমার উপস্থিতির আমন্ত্রণই তারা করে গেল। সভায় ফুলের মালা, চন্দনের ফোঁটা, ধূপধুনা কিছুরই অভাব ছিল না, অভ্যর্থনার আন্তরিকতা দেখে আনন্দ যে না পেলামতা নয়। আরো আনন্দ হল এজন্যে যে সভায়

সাহিত্যিক বেশী ছিল না, ছিল সাহিত্যের পাঠক ও রসিক জনেরা। তাদের কাছে আমি কতখানি পরিচিত হতে পেরেছি এটুকু জানার কৌতূহল হল—উৎসাহিত হয়ে কিছু বললামও সেই সভায়। সভা শেষ হয়ে গেল। একে একে সকলেই প্রায় বিদায় নিয়ে চলে গেল। শেষে দেখি একটি বর্ষীয়সী মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন, সঙ্গে তাঁর একটি বিশ বাইশ বছরের মেয়ে, সাদা থান পরা, মাথার চুল ছোট করে কাটা। মাথাটা মুড়ানোই বোধ হয়। মেয়েটি আমার কাছে এসে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে এমন ভাবে মুখের দিকে চাইতে লাগল যে আমার মনে হল, সে যেন আমায় বেশ ভাল করেই চেনে। আমি বললাম—"কৈ, আমি তো তোমায় চিন্‌তে পারলাম না?" মেয়েটি বললে—"না, আমায় আপনি কী করে চিনবেন, তবে আমি আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।" "আমি? আমি তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছি? কৈ, আমার তো কিছু মনে হয় না।" মেয়েটি বললে, "না, সেই কথাই আমি আজ আপনাকে বলতে এসেছি। দিদিমা, তুমি একটু এগোও, আমি ওঁকে দুটো কথা বলে যাই।" মেয়েটি বিধবা কিন্তু রূপ যেন তার উথলে পড়ছে—এমন রঙ, এমন মুখশ্রী, আমি ইতিপূর্বে কোথাও কখনো দেখেছি বলে মনে হল না। ভাবলাম মেয়েটি তো বেশ সপ্রতিভ। মেয়েটি বললে,—"আপনি আমার গুরু।" কথাটা শুনে খুব হাসতে ইচ্ছা করল কিন্তু সে আঘাত পাবে মনে করে আত্মসংবরণ করলাম। মেয়েটি বললে—"দেখুন, বিদেশে থাকতাম আমার বাবার কাছে, তিনি বাঙলাদেশের বাইরে কোনও একটি কলেজের অধ্যাপক। আমার মা দু-বছর বয়সে মারা যান। বাবার কাছেই আমি মানুষ। সতেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়, ছ মাস যেতে না যেতেই এই কাশীতেই হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে স্বামীর মৃত্যু হয়। সেই থেকেই আমি বাবার কাছে। আমি বাবার এক মেয়ে, আমাকে তিনি লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন আমাকে ভুলিয়ে রাখতে। বাবার এক ছাত্র ছিল। নিজের ছেলেকেও বাবা বোধহয় এতখানি স্নেহ করতেন না। বাবার ক্যাশবাক্সের চাবি থেকে আরম্ভ করে ক্লাসে কোন্‌দিন কোন্ লেকচার আছে—তা ঠিক করে রাখা এবং সে সম্পর্কে তাঁর বই ও নোটের খাতা—সব তারই তদারকে থাকত। সেই ছাত্রটি আমাকে অঙ্ক আর সাহিত্য পড়াত। যেমন সুন্দর চেহারা মনটাও বোধ হয় তার তেমনি সুন্দরই ছিল। এমনিভাবে প্রায় বছর দেড়েক কাটার পর আমাদের দুজনের মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছে বাহিরে তার লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে লাগল। বাবা তাঁর লাইব্রেরি ঘরে বেশীক্ষণ সময় কাটালেও তাঁর দৃষ্টি

এড়িয়ে চলার চেষ্টা আমি অন্ততঃ কোনও দিন করিনি। কিন্তু একদিন হঠাৎ ছাত্রটি গম্ভীরভাবে আমাকে আর পড়াতে পারবে না বলে জবাব দিয়ে গেল। বাবা যেন আমার উপর বিরক্ত হয়েই আমায় বরানগরে আমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মনটা আমার পড়ে রইল—সেই কলেজের চারিদিকে। তিন-চার মাস যেতে না যেতেই আমাদের দুজনের পত্র-বিনিময়ের ফলে ছাত্রটি এসে হাজির হলো কলকাতায় এবং দেখাশোনাও হতে লাগল নিয়মিতভাবে। তার সহপাঠী আমার মামাত ভাইয়ের সহযোগিতায় বার বার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে আমি কোথাও পালাতে পারলাম না। কিন্তু একদিন মরিয়া হয়েই কথা দিলাম তাকে—"আজ রাত্রি দুটোর সময় পালিয়ে যাব।" সারাদিন কেমন একটা অস্বস্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে কাটল। সন্ধ্যাবেলায় আমার ছোট মামাত ভাইটিকে লাইব্রেরি থেকে একখানা উপন্যাস এনে দিতে বললাম। উদ্দেশ্য ছিল পাছে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই বইটা পড়ে রাত জাগব। সন্ধ্যাবেলা আমার হাতে এনে দিল একখানা মোটা উপন্যাসের বই—তার মলাটের উপর "চরিত্রহীন" নামটি পড়ে হঠাৎ বুকের কাছে যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাবলাম, প্রকৃতির পরিহাস নাকি! আপনার উপর সেদিন খুব রাগও হল, দুঃখও হল। সন্ধ্যার পর সবাই শুতে গেলে বইখানা নিয়ে পড়তে লাগলাম। একটা নাগাদ বই শেষ করে মনটাকে যাচাই করে দেখি, কিরণময়ী আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। তার দৃঢ়তায় যে আমি নিজে এমন কঠিন হতে পারব তা ভাবতেও পারিনি। বইটা বুকের উপর রেখে চোখ বুজে পড়ে আছি, ঘুম আসছে না—শুনতে পেলাম দরজায় ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তাকে বললাম—"আমায় ক্ষমা করো, আমি যাব না।" সে বললে—"সে কী! টিকিট কেনা, সব ব্যবস্থা ঠিক, এখন পিছলে চলবে কেন? তাই যদি মনে ছিল তবে আমায় বিদেশ থেকে বরানগরে টেনে আনলে কেন?" আমি বললাম, "অন্যায় করেছি, আমার তুমি ক্ষমা করো।" সে বললে—"এই বুঝি তোমার ভালবাসা?" আমি বললাম—"ভালবাসাটা আমার সত্যি, মিথ্যে নয়, সেটা মিথ্যেও কোনদিন হবে না—কারণ ভালবাসা কী তা আগে আমি কখনো জানতাম না। তবে আমি যে আজ তোমার সঙ্গে পালাবো না, এটাও মিথ্যে নয়, সত্যি। সে আমার দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে গেল। সেদিন—আমি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছি বটে, কিন্তু এমন গভীর ঘুমও আমি এর আগে কোনদিন ঘুমুইনি। তিন চার দিন পরেই দিদিমার সঙ্গে কাশী চলে এসেছি, সেও আজ এক বছর হয়ে গেল। আপনাকে দেখবার ভারী ইচ্ছা ছিল। বিশ্বনাথ যে এত শীঘ্র ইচ্ছা

পূর্ণ করবেন তা জানতাম না।" এই বলে মেয়েটি আবার আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। তারপর দু-একবার কাশী গিয়েছি, মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু সে তো তার ঠিকানা দেয়নি আর আমিও সেদিন অভিভূতভাবে চলে এসেছিলাম। তাই তার সঙ্গে আমায় প্রথম ও শেষ দেখা। আমি মনে ভাবি, সমালোচকেরা যা খুশি তাই লিখুক—অন্ততঃ একটি জীবনের উপরও যে আমার "কিরণময়ী" এমনি গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে চরিত্রহীন লেখা তাতেই আমার সার্থক হয়েছে।

শরৎচন্দ্র কথার জাদুকর, এখনো সময় সময় মনে হয় এ তাঁর কথার জাদুকরী মাত্র। সত্যকার ঘটনা নয়, এও বুঝি তাঁর একটা গল্প রচনা। কিন্তু তখনকার তাঁর সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সত্য কথা বলবার দৃঢ়তা ও ভাবতন্ময়তার কথা মনে হলে—এ গল্প নিছক সত্য বলেই বিশ্বাস হয়।

কমললতা

ডঃ ক্ষেত্রপাল দাশ ঘোষ

কমললতা শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি, তাঁহার মানবচৈতন্য বা নারীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ ফুল। প্রাণের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া, সমস্ত দরদ দিয়া কমললতাকে ভালবাসিতে হয়, তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না—এমনি গভীর তাহার আত্মত্যাগী চরিত্রের আবেদন, এমনি মর্মস্পর্শী তাহার জীবনের বেদনা। তাহার জীবনের অন্যান্য সুরের চাইতে করুণ সুরটিই গিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে, সকল সুরকে ছাপাইয়া উঠে, তাই তাহার দুঃখ বেদনা যে-রকম গভীর ভাবে আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে, তেমনটি শরৎচন্দ্রের আর কোন চরিত্রই করে না। পার্বতী, রমা ও সাবিত্রীর দুঃখে আমাদের মন বিচলিত হয়, অযৌক্তিক সমাজবিধি-বিধান সম্বন্ধে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে; ষোড়শী, কিরণময়ী বা অচলার বেদনা আমাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করে, মনের বিশ্লেষণে, অন্তরের রহস্যোদ্ঘাটনে আমরা প্রবৃত্ত হই, দুঃখের অরন্তুদ বা মধুময় আবেশ তাহাতে বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু কমললতার দুঃখ বিভিন্ন, ইহার দ্রাবণী বা আকর্ষণী শক্তি অপরিমেয়। সাঁইথিয়া স্টেশনে ভোরের আধো-আলো আধো-আঁধারের ভিতর দিয়া ট্রেন যখন ছাড়িয়া দিতে উদ্যত, কমললতা গাড়ি হইতে হাত বাড়াইয়া সেই প্রথম শ্রীকান্তের হাত ধরিল, চিরদিনের মত তাহার কাছে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া কমললতা তাহার অন্তিম মিনতি জানাইয়া গেল : "আমি জানি আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও,—নির্ভয় হও। আমার জন্য ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ কোরো না! গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।" এ বিদায়ের সংবেদন বিশ্বসাহিত্যে বিরল—এমনি পূত, শান্ত আত্মত্যাগী মর্মস্পর্শী ইহার আবেদন। রাজলক্ষ্মী সম্পূর্ণভাবে মন হইতে মুছিয়া গেল, রহিল সেখানে শুধু বৈষ্ণবী কমললতার মিনতিভরা দুটি অশ্রু-সজল চোখ। গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। এই রূপসী, রহস্যময়ী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণ স্নেহময়ী আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীর জন্য, এই অসহায়া অপরিতৃপ্ত নারীর অবলম্বন খোঁজা-মনের জন্য, আজ যাহাকে "শ্রীকান্ত নামটাকে পাথেয় করিয়া খেয়া ভাসাইতে হইল।" তাই শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান···ও যেন তাঁদেরই কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার

পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়।" একটু আগেই বলিয়াছি, এ-বিদায়ের তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে খুব কমই আছে, একমাত্র গ্রীক কবি হোমারের রাজকন্যা নসিকা চরিত্রাঙ্কনে এই দরদী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। সে মুখ ফুটিয়া বেশী কিছু বলে নাই, অথচ আগন্তুককে সে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া তাহার তরুণ প্রাণের সমস্ত অর্ঘ নিবেদন করিয়াছিল, শুধু বিদায়ের ক্ষণে প্রাসাদ-স্তম্ভে হেলান দিয়া নসিকা বলিল, আশা করি দেশে গিয়ে মধ্যে মধ্যে আমার কথা স্মরণ করবে। অডিসিউস চলিয়া গেল, ফেলিয়া গেল নসিকার প্রাণের উদগ্র অব্যক্ত ভালবাসা, নবীন জীবনের সরস উচ্ছল অর্ঘ। এ ভালবাসা কেউ জানিল না, কেউ বুঝিল না, নীরবে নতমুখে নসিকা জীবনের মহিমাময় শূন্যতাকে বরণ করিয়া নিল। এ দুঃখ অপরিসীম, কিন্তু কমললতার বেদনা আমাদের হৃদয়কে আরো নিপীড়িত করে। সে একান্ত অসহায়া অথচ সর্বগুণ-সম্পন্না বলিয়া, বিশেষ করিয়া তাহার সর্বত্যাগী চরিত্রের মাধুর্যে, কমনীয়তায়। যাহার আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, তাহাকেই সযত্নে রচিত স্নেহসিঞ্চিত নীড় ত্যাগ করিয়া বারবার বিরাট শূন্যতার দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতে হয়, ইহাই কি বিধির বিধান? এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে। গহর কমলকে ভালবাসিয়া-ছিল, কিন্তু কবির নীরব প্রেমের প্রতিদান না দিতে পারিয়া (শ্রীকান্ত তাহার জীবনপথে না আসিলে হয়তো এ প্রতিদান সে একদিন দিতে পারিত) সে তাহার একমাত্র আশ্রয় সাধের আশ্রম ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিল, শ্রীকান্তের সঙ্গে পথে পথে বাহির হইয়া পড়িবার প্রস্তাব পর্যন্ত করিল—তাহা 'সেই ভুবুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদলকরা স্বামিত্বের হাঙ্গামায় ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর' একথা শ্রীকান্তের মনে বিদ্যুৎ-বেগে খেলিয়া গেল। মুসলমান কবি মুখ ফুটিয়া আখড়ার বৈষ্ণবীকে তাহার প্রণয় নিবেদন করিতে পারে না। 'কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে।' শ্রীকান্ত বুঝিল, 'সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্ম-ভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ হয় কমললতা পলাইতে চায়'। কী বিরাট এই আত্মত্যাগ! কিন্তু তাহার অন্তরের স্নেহের দরদের উৎস অফুরন্ত ধারায় গহরের জন্য প্রবাহিত হয়েছে, শেষ তিন দিন সে খায়নি, গহরের অন্তিম শয্যা ছাড়িয়া একটিবার ওঠেনি।

এই আত্মত্যাগের চরম নিদর্শন দেখি মরা শেষ অধ্যায়। বড় গোঁসাইজীর সনাতনপন্থী গুরুদেবের গহরকে নিয়া মিথ্যা সন্দেহ জন্মিল, কমললতার সমর্পিতপ্রাণ বিগ্রহের ঘরে যাওয়া কমললতার বারণ হইল, তাহার সেবার ঠাকুর কলুষিত হইল, এই ভয়ে গহরের দেওয়া টাকা শ্রীকান্তকে ফিরাইয়া দিয়া

চিরদিনের জন্য আশ্রমের শেষ আশ্রয়টুকুর মায়া কাটাইয়া সে চরম আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হইল—কোনদিনই সে আশ্রমে আর ফিরিয়া যাইবে না। ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে শ্রীকান্তের আগ্রহাতিশয্যে সে উত্তর করিল, 'শুধু যাবো যদি তুমি যেতে বলো। আর কারো কথায় না।' এই চরম আত্মসমর্পণ করিয়া এই একান্ত নিঃসহায়া বৃন্দাবনের পথে বাহির হইয়া পড়িল। না চলিয়া গিয়া তাহার উপায় ছিল না, সে বুঝিয়াছিল রাজলক্ষ্মী অপেক্ষা তাহার ভিতরে শ্রীকান্ত তাহার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে সে ভালবাসিয়াছে, স্নেহ করিতে শিখিয়াছে, তাহার জীবনে সে ছায়াপাত করিতে চায় না। এই অমিতবিভবশালী সত্যিকারের বৈরাগী নারীর দৃষ্টি যখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, তখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের নায়িকা কে? রাজলক্ষ্মী না কমললতা? আমার নিজের মনে কোন দ্বিধা নাই, সাহিত্যের মানদণ্ড দিয়া বিচার করিয়াও থাকে নাই।

কেদারনাথ ও শরৎচন্দ্র

সুবল গাঙ্গুলী

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা ও রমেশচন্দ্র দত্তর রচনায় সাহিত্যের নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে, সেই সময় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' আর স্টীল, সুইফট আর অ্যাডিসনের হাস্যরসের নির্যাস নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এলো এক নতুন ধারা—তার নাম কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেক লেখক, কবি ও অগণিত মুগ্ধ পাঠিক-পাঠিকার পরম-প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় দাদামশাই।

১৮৬৩ সালে দক্ষিণেশ্বরে কেদারনাথের জন্ম। উত্তরপাড়া হাইস্কুল ও কুটিঘাটা স্কুলে বাল্যশিক্ষা। চাকরি-জীবন কাটে মিলিটারি ডিফেন্স অ্যাকাউন্টসে উত্তর ভারতে। মীরাট, কানপুর, আম্বালা প্রভৃতি শহরে তাঁকে বহুদিন থাকতে হয়। ১৯০২ সালে সরকারী কাজে চীন যাত্রা করেন। ১৯১০ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে জোর করে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর হন কাশী-বাসী। এই কাশীতে থাকার সময় তাঁর সাহিত্যের পথে জয়যাত্রা হয় শুরু। যৌবনে 'সংসারদর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। আর লেখেন একটি অভিনয়-কাব্য 'রত্নাকর'। এ ছাড়া 'গুপ্তরত্নোদ্ধার" নামে একটি প্রাচীন কবি-সঙ্গীতসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর দীর্ঘ চাকরি-জীবনে তেমন কিছু সাহিত্য-চর্চা করে উঠতে পারেন নি।

অবসর গ্রহণ করে কাশীতে থাকার সময় কেদারনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে পুনঃ-প্রবেশ করেন। 'কাশীর কিঞ্চিৎ', 'চীনযাত্রা', 'ভাদুড়ী মশাই', 'আমরা কি ও কে', 'আই হ্যাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় থেকেই প্রকাশিত হয় ও অচিরে কেদারনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হয়ে ওঠেন।

কেদারনাথ লিখেছেন—তাঁর জীবনে দুটি ইচ্ছা ছিল: দর্শনলাভ রাম-কৃষ্ণদেবের, ও বন্ধুত্ব রবীন্দ্রনাথের। তাঁর এই দুটি ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। আর তার সঙ্গে হয়েছিল গিরিশ ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলার সব লেখক-মনীষীর সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব।

এই কাশীতে থাকার সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের প্রথম সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ পরবর্তীকালে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সেটা বাংলা ১৩২৬

সাল। বাংলা সাহিত্যগগনে তখন শরৎচন্দ্র মধ্যাহ্নসূর্য। যত তেজ, তত উজ্জ্বলতা। এই সময় শরৎবাবু বায়ুপরিবর্তনের জন্য এলেন কাশীতে। প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দাদামশাই নিজের অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন :—

'পথের ধারে কোনো এক পরিচিতের বারান্দায় বসে সাহিত্য-প্রসঙ্গই চলছিল। কাশীতে সেটা অবান্তর হলেও—বসন্তের দাগ মিলায় না, অঙ্গের বা সঙ্গের সাথী। নবীন-ব্রতী, তরুণ উৎসাহী শ্রীযুক্ত সুরেশ ['উত্তরা'-সম্পাদক কাশীর সুরেশ চক্রবর্তী] সংবাদ দিলেন—"শরৎবাবু এসেছেন, দেখা করতে যাবেন ?" সুরেশ সতেরো বছরেই সাহিত্যিক হিসাবে সিদ্ধহস্ত—সব্যসাচী বলা চলে। শরৎবাবুর সঙ্গে "বাৎচিৎ" সারা আছে। এ ক্ষেপেও সে আক্ষেপ রাখা হয় নি। শরৎবাবুকে দেখবার ইচ্ছাটা সত্যই প্রবল। যিনি বই-ছাড়াদের কেঁচে বই ধরিয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে বই কি! খৃষ্টানই হয়েছি—তা বলে সরস্বতী পূজো করব না কেনো! তবে—একটা কথা আছে। শঙ্কিতা "কমল",—আমি "কমল" বলে নলিনাক্ষের সামনে দাঁড়াতে পেরেছিল,—ক্ষীণ হলেও তার সম্পর্কের সাহস ছিল। কিন্তু আমি কি বলে গিয়ে দাঁড়াবো! অবশ্য আমিও ডুবো আসামী, সেটা প্রমাণ করতে পারি। দৃশ্যটা যে বড় বেখাপ ঠেকবে! যিনি "অরক্ষণীয়া" লিখেছেন, তিনি "অরক্ষণীয়" সম্বন্ধে কি ভাবেন নি ? মূঢ়তাটা সানিয়ে নিতে পারবেন।

'সুরেশ বলে উঠলো, "ব্যাঃ—এই যে- ঐ তিনি যাচ্ছেন। চলুন— চলুন।"

"দাঁড়ান—দাঁড়ান" যন্ত্রচালিতের মতো অনুসরণ করলুম। তারপরই সামনা-সামনি। ভাগ্যে নমস্কার জিনিসটা সংস্কারের মধ্যে ছিল,—প্রথম ধাক্কা সেই সামলে দিলে।

তারপর। তারপর—সে কথা ভাবিনি কোনো কালে। "ইনিই কেদার-বাবু—" "কাশীর কিঞ্চিৎ" এঁরই লেখা।" দুর্বিষহ। ধরণী দ্বিধা হও। ধরিত্রী শুধু সম্পর্কে নয়, সত্য সত্যই সীতার মা ছিলেন, তাই তাঁর উপায় হয়েছিল, —আমার বেলা একটু হাঁ করলেই বাঁচতুম। যিনি কথা কইলেন—তিনিই শরৎবাবু।—"বেশ লেখা হয়েছে—ঠিক লিখেছেন, খুব দেখা হয়ে গেল তো। তা—নাম লুকিয়েছেন কেনো, নাম গোপন করবার মত লেখা তো আপনার নয়।" (দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ "স্মরণে"। 'কবস্মৃতি' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত। সেই সময় নন্দীশর্মা ছদ্মনামে কেদারবাবুর প্রথম ব্যঙ্গকবিতার সংগ্রহ "কাশীর কিঞ্চিৎ" সদ্য প্রকাশিত হয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম দর্শনে শরৎবাবু এই গ্রন্থের কথাই আলোচনা করেন)। কেদারনাথ এর পরে লিখেছেন "নানা কথা চলতে লাগলো, আমার লক্ষ্য কিন্তু মানুষটির ওপর। খুব সাদাসিদে

চাল,—ক্যাম্বিসের জুতো,—তাও পুরো নয়—গোড়ালি নেই। টুইল সার্ট—তাও পুরো নয়—দু' একটা বোতাম নেই। দাড়ি—তাও পুরো নয়—বাদসাদ দেওয়া। এই ভাব। বললুম, "আপনাকে বড় কাহিল দেখছি, সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন বুঝি ?"

"না, আমি বরাবরই এই রকম। একবার ভাগলপুরের গঙ্গায় পড়ে এই শরীরেই কাহালগাঁয় গিয়ে উঠি।" ভালো করে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললুম—"বলেন কি! তাহলে শুধু শক্তিশালী লেখকই নন।" তিনি হাসতে লাগলেন।" এই কাশীতে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গেই কেদারনাথ লিখেছেন, "কি সূত্রে মনে নেই, আমিই 'গৃহদাহে'র কথাটা বললুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'গৃহদাহ'খানা দেখেছেন নাকি ?" "শুধু দেখিনি—দেখে অবাক হয়েছি। নিজেকে বিপদে ফেলে—সেটা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াসের মধ্যেই কারো কারো আনন্দ থাকে,—আপনি তাঁদেরই একজন। বইখানা 'গৃহদাহ' হলেও—আপনারই অগ্নি-পরীক্ষা। ভাল-মন্দ বলবার অধিকারী আমি নই, তবে ডিহিরি পৌঁছবার পর থেকে শেষ পর্যন্ত,—কি কি ভাবে আর কতটা বিপদ মাথায় করে আপনাকে এগুতে হয়েছে, সেটা বুঝতে পারি। যুদ্ধে কাটাকাটি থাকে,—ওই কয় পৃষ্ঠা এগুতে আপনাকেও বোধ হয় অনেক কাটাকাটি করতে হয়েছে। খসড়াটা দেখতে ইচ্ছা হয়, সেখানা রাখবেন—নষ্ট করবেন না। আপনি যে কত বড় শক্তিশালী লেখক তার পরিচয়—ওই কয় চ্যাপ্টারেই রেখে দিয়েছেন।" হাসতে হাসতে বললেন—"বলেন কি! আপনার তো সাহস কম নয়।" তখন দশাশ্বমেধ কালী-মন্দিরের সামনে এসে পড়েছি,—প্রণাম করলুম। বাঙালীটোলার রাস্তায় ঢুকে পড়া গেল। সারি সারি সন্দেশ-রসগোল্লার দোকান। "কাশী যে ভূ-স্বর্গ তার প্রমাণই এই সব,—ভক্তের ভিড়ও তাই এত—না ?" আমি একটু হাসলুম, তাই বোধ হয় বললেন—"আমাকে নাস্তিক বলে মনে হয় কি ?" "এ কথা কেনো ? আমি তো আপনার চেয়ে বড় আস্তিক দেখতে পাই না।"

"অপরাধ ?"

"অপবাধটা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করেছি। সব মনে নেই—"চরিত্রহীনে" গৃহদেবতা নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে—কলেজ থেকে ফেরবার পথে—গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শান্তিলাভার্থে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, সে দিবাকর নয়, বোধ করি—শরৎচন্দ্র। অন্ততঃ দিবাকরের প্রাণে যিনি অনুতাপ এনেছিলেন তিনি—আপনি। আবার অত বড় বিচার-গর্বিতা বিদুষী কিরণময়ীর হাতে যিনি কালীঘাটের ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে তার অভিনয়ের

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের একটি পত্রের প্রতিলিপি।

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাবড়া
1930

প্রিয়বরেষু,

চিরদিন সময় বয়ে নিয়েই গেলো দুঃখ, অই এ জীবনের সকল কাজই এলো মেলো হয়ে আছে, কিন্তু নাগালের নীচে নামতে আর চাইনেনা। বার বার চিঠি লিখতে চাইলাম, বারবার দিন-ক্ষণ গেলো উত্তীর্ণ হয়ে। সেই চিঠি আজ লেখাও হোলো, কিন্তু তার মন টুকু আর জানায়না। হাতের বাইরেই রয়ে গেলো। আমার সান্ত্বনা এ আমার কপালের লেখা, একে এড়াবো কি করে? ভালোবেসে খোঁজ-খবর নেবার মানুষের বিদেশের [illegible] এ জন্যে আপনাকেই ছেড়ে দিলাম, — ভগবান যদি থাকে, তখন আপনি জোরে এক্ষণার দেখবো।

কেমন আছি জানতে চান? বেশ আছি। দিনরাত একটা ইজি চেয়ারে দক্ষিণ-বারান্দায় শুয়ে আছি। কাঁচা মেঘে, তাল-বন নদীর, আর্দ্র অনুরাগে [illegible] রক্ত গুলো নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্ছে, — [illegible], আমার মন [illegible] ঘুমিয়ে পড়ি, দুর্বল দেখি, ভাবি, — কেবল চাইলেই মুহূর্তে বন্ধু নদী; পালের নৌকা আলোকে ভাসি, হঠাৎ কখন চোখ বুজে আসে, যায় সব সেই হারিয়ে, নিমেষের স্বপ্নলোকে ঘুরে এসে [illegible] যা দেয় জাগিয়ে, [illegible] [illegible] একটা ঢেউ দেখি, — বলি, কে আছিস রে, তামাক দে — হুঁকো নিয়ে যায়, কিন্তু টানলে দেখি কোনদিন ধুঁয়া নেই। [illegible] বলে, ঘুমিয়ে ছিলেন যে। আবার তামাক পুড়ে গেছে। তাহলেই একবার

ফাঁক নেই, শুধু গলা চড়িয়ে হাঁকে বলি — হাঁ — ঘুমুচ্ছিলাম বই কি! খুব দিবানিদ্রা। যে বলেছি কালীদাসির সেই নিদ্রা থেকে আমায় যে কলকেতায় মেন এ বেলার মতো না নেই। তবু মনে মনে হেসে হেসে বলি, বেশ তো আমার, যদি সত্যিই আমার কলেরাটা একটা আরামের সম্মুখ, কেউ তোমাকে নিন্দে করবেনা। আমার চিঠি রইলো, দাদা, কাউকে রামা।

একদিন রান্নাও করি, কিন্তু হয়েছে আমারই মতো সময় নষ্ট নিয়ে। এখন খুশী হয়ে আর নিতে পারবোনা।

কিন্তু তারা এলো। লাগবে উপস্থিত। ঘুমুতে ঘুমুতে আর জাগতে-জাগতে পড়া সুরু করি। বহুদিনের অভ্যাস, বহু আগেও রঙ-সাহস ছাড়বেনা। খোকাটি তোমারই কাছে কিন্তু হয় বলিনে ছিলাম আকাশবাণী ব্যাপারের। তাই ভরসা আছে, ঘুমের মাঝেও লাগবে রস কম রেখে ভুলে গড়িয়ে পড়বোনা।

চিঠি তোমার আমার চিরকালই এলোমেলো। মানুষকে কষ্ট করে বুঝতে হয় এই আমার শাস্তি। আপনাদেরও কোন চিন্তা নেই। প্রার্থনা, মাঝে মাঝে যেমন খবর দেন তেমনি যেন ভুলে কোনো বঞ্চিত করবেননা। ইতি — ৭ই পৌষ ১৩৩৭।

আপনার স্নেহের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।" হেসে বললেন—"বই লিখতে বসে অমন অনেক কিছু লিখতে হয়।"

"তা স্বীকার করি। তর্ক করতে পারবো না—সে শক্তি বা স্পর্ধা আমার নেই। জীবনে ভুল-চুকই বহুৎ, কিন্তু এ ভুলটা স্বীকার করতে মন চাচ্ছে না।"

"কাজ কী—তাতে আমার লাভই রইল," বলে হাসলেন। ছাড়াছাড়ির সন্ধিপথে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই হল। তাঁর কথাবার্তার আর ব্যবহারের সহজ-সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হলুম। শেষে বললেন—"আবার যেন আপনাকে পাই—আমি শিবালয়ে বাসা নিয়েছি।" "নাস্তিকের লক্ষণ বটে!" হেসে বললেন, "সুরেশ জানে—আসবেন।" "বলার অপেক্ষা রাখতুম না।" "নমস্কার—নমস্কার।" (দ্রষ্টব্য "স্মরণে", 'কবুলতি' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত)

শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে কাশীর আসর জমজমাট হয়ে উঠলো। তিনি প্রায় দু'মাস কাশীতে ছিলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কাশীতে বীণাপাণি উইভিং ফ্যাক্টরি নামে বেনারসী সিল্কের বিরাট ব্যবসা করতেন। এই মণিবাবুর বাড়িতেই প্রায়ই বিকেলে শরৎচন্দ্র ও কেদারনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যেতেন। শরৎবাবু তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতেন, কিন্তু দাদামশাই ঋজু হয়ে বসতেই ভালবাসতেন। কতবার তাঁর চুরুট নিভে যেত, কতবার জ্বলতো, চায়ের ও চুরুটের ঘনঘটায় বিদ্যুৎ চমকাতো। রসালাপে জমে উঠতো মজলিশ। "উত্তরা"-সম্পাদক কাশীর সাহিত্যিক সুরেশ চক্রবর্তীর ভাষায়: "একদিন সুযোগমতো শরৎবাবুকে আমাদের পরিকল্পিত মাসিক পত্রিকাখানির কথা জানানো হ'ল। দাদামশাই বোধহয় বললেন—'আপনি যদি লেখেন—' তিনি এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন একখানা উপন্যাস দিতে। পত্রিকার নামকরণ করলেন দাদামশাই "প্রবাস-জ্যোতিঃ"। একটি অনুষ্ঠানপত্র তিনি লিখলেন, প্রবাসে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন কেন?" ('উত্তরা', পৌষ ১৩৩৬ সংখ্যা)। এর পর ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হলো "প্রবাস-জ্যোতিঃ"। সম্পাদনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাস-জ্যোতিঃ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র ১৯২০ সালের ১২ই অক্টোবর একটি চিঠিতে দাদামশাইকে লেখেন, "আপনার পাকা হাতের হালধরা বজায় থাকিলে 'প্রবাস-জ্যোতি'র আর যাই হোক, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই।"

কেদারনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব এতো নিবিড় হয়েছিলো যে একবার অসুস্থ হলে "প্রেমিক দরদী একবার আমার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে একটি

চাকর সঙ্গে কাশী এসে উপস্থিত। পাঁচ দিন থাকেন, অনেক কথাই হয়, পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষষ্ঠ দিন প্রত্যাবর্তন করেন। সে কথা আজ কথামাত্র বোধ হতে পারে, কিন্তু সেদিন তা ছিল না।

"পরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে দেখা। রূপনারায়ণ-তীরে তাঁর সামতাবেড় ভবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। নিজেই নিষেধ করেন—'পথ সুগম নয়—কষ্ট হবে।' পরে উভয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।" ('শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ সংখ্যা)

১৯২৫ সালের পর থেকে কেদারনাথ প্রায়ই কাশী থেকে পূর্ণিয়া যেতেন। তাঁর একমাত্র জামাতা হরিজীবন চট্টোপাধ্যায় পূর্ণিয়া শহরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। জামাতার আকস্মিক মৃত্যু কেদারনাথকে দারুণ আঘাত করে। এর-পর থেকে শোক-সন্তপ্ত কন্যা ও স্নেহের নাতি-নাতনীদের দেখতে পূর্ণিয়ায় তিনি প্রায়ই আসতেন। ১৯৩৬ সালের পর থেকে পাকাপাকিভাবে তিনি পূর্ণিয়ায় চলে আসেন, এবং এখানেই ১৯৫০ সালে তাঁর দেহাবসান হয়। এই পূর্ণিয়ায় থাকার সময় শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে দাদামশাইকে অনেক চিঠি লেখেন। একটি উদ্ধৃত করছি :

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা—হাবড়া।

প্রিয়বরেষু,

কতকাল পরে আপনার হাতের লেখা চোখে দেখতে পেলাম। সকলের আগে এই কথাটিই মনে এলো যে ভালবাসা যেখানে সত্য, যেখানে অন্তরের বন্ধু, তার মধ্যে আর ভ্রম নেই। মন স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নেয়। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে কারো ভাববার যো নেই যে আমরা কেউ কাউকে স্মরণ করি, অথচ আমার দিক দিয়ে তো জানি যখনই আপনার লেখা ছাপার অক্ষরে পড়ি তখনই মনে পড়ে কাশীর কথা। জীবনের শেষ দিকে ঐটুকুই সম্বল রয়ে গেলো। আগে প্রায়ই ইচ্ছে হতো কাশী যাই,—এখন সে ইচ্ছেও আর হয় না আপনি নেই বলে। আচ্ছা কেদারবাবু, কাশীবাস কি আপনি ছেড়ে দিলেন ? শেষকালে কি পূর্ণিয়ার ভাগাড়টাই সার করবেন ? জানি আপনার পূর্ণিয়া ছাড়ার অনেক বাধা, তবু ও জায়গাটাতেই আছেন মনে হলে আমার বিশ্রী লাগে। ভাববারও যো নেই যে এই তো কাশী, ইচ্ছে হলেই গিয়ে কেদারবাবুকে দেখে আসা যায়।

এবার আমার সামতাবেড়ের আসন টললো বোধ হয়। আর ভাল লাগছে

না। অথচ কোথায় গেলে যে ঠিক ভালো লাগবে তাও ভেবে পাচ্ছিনে। পূজোর পর যা হয় কিছু একটা কোরবো।

আপনি ষোড়শীর কথা শুনলেন কার কাছে? শিশিরের অভিনয় দেখেছেন? কি চমৎকার করে? বইটা আমার উপন্যাস দেনা-পাওনার গল্প থেকে নেওয়া। থিয়েটারের মত কোরে একটা বইও (নাটক) ছাপানো হয়েছে। পড়েচেন? বই যা হোক, অভিনয় বড় ভালো হয়।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু? আগেকার চেয়ে ভালো তো? প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি। বন্ধুর লেখা বলে নয়, সত্যিকার সাহিত্যিক মানুষের লেখা বলে পড়ি। আমি ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছি—কিন্তু বাঁচাটা পুরোনো হয়ে গেছে। রোজই সে খবর টের পাচ্চি। চিঠির জবাব দিতে ভুলবেন না।

আপনার
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জুন ১৯২৮

কেদারনাথ তাঁর রচিত 'কোষ্ঠীর ফলাফল' গ্রন্থটি 'শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। 'কোষ্ঠীর ফলাফল' প্রথমে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে আসে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯। পূর্ণিয়া থেকে দেওঘর যাত্রার মনোরম, সরস কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থটি উপহার পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র যে চিঠিটি কেদারনাথকে লেখেন, তা উদ্ধৃত করা হলো :

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা—হাবড়া।
২৭ আশ্বিন, ১৩৩৬।

প্রিয়বরেষু,

আজ বিজয়া দশমীর সায়াহ্ন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। এ জীবনে যে কয়জনের সত্যকার স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি, আপনি তাঁদেরই একজন। কিন্তু সে স্নেহের মর্যাদা আমি শুধু জড়তা আর আলস্যের জন্যই রাখতে পারি নি। অথচ এমন মাস বোধ হয় একটিও কাটে না যাতে আপনাকে স্মরণ না করি। আর বাইরের অপরাধ যতই বেড়ে চলে ততই ভাবি আপনি কোনদিন আমাকে ভুল বুঝবেন না।

১লা কার্তিক

'কোষ্ঠীর ফলাফল' আজ সকালে শেষ হল। আচ্ছা, আমার মত একজন সামান্য লোককে কি ভেবে এতখানি গৌরব দিয়ে বসলেন? সাহিত্যিকের দল ভাববে কি বলুন তো?

চমৎকার লাগলো। দীন-দুঃখী কেরানীকে কেউ আজও এমন অন্তর দিয়ে ভিতরে পেয়ে এত মধুর কলম দিয়ে সংসারে প্রকাশ করেনি। ব্যথায় বুকের মধ্যে যেন টনটন করতে থাকে। ভাষা আর লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একটি হিতোপদেশও এই বইখানি থেকে সংগ্রহ করেছি। রেলের তরুণ কবি-কর্মচারীটি যখন বলচে যে দিনের মধ্যে একবারও খাতাখানি হাতে নিয়ে বসতে না পারলে দিনটাই যেন ব্যর্থ মনে হয়। লিখতে পারি না পারি, ভেবেচি জীবনে এই পরম সত্যবাক্যটি প্রত্যহ পালন করে চলবো। মাসের পর মাস কেটে যায়, খাতা-কালি-কলমে হাত দিতেও মন চায় না, - আপনার আশীর্বাদে যে কটা দিন বাকি আছে সে কটা দিন যেন প্রতিদিন এই কথাটি মনে রাখতে পারি।

বইখানিতে একটিমাত্র ত্রুটির বিষয় উল্লেখ কোরব—কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে ঐশ্বর্য্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।

এবার কাশী কবে যাবেন? শীঘ্র যদি যান আমাকে একছত্র লিখে জানাবেন।

এখন থেকে চিঠির জবাব পরের দিনই দেব। এ আর অন্যথা কোরব না।

নমস্কার। আপনার শরৎ

পুঃ—এইমাত্র যে চিঠিখানি বিজয়ার দিনে আমার কল্যাণ কামনা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইলাম। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং ধন্যবাদ।

—শঃ।

কেদারনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অটুট বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘ ১৭।১৮ বৎসর। সম্ভবতঃ তাঁদের শেষ দেখা হয় ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সময় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতা অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সভায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের সাক্ষাৎ হয়। এর পর সামতাবেড় যাওয়ার জন্য দাদামশাই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পথ

দুর্গম বলে শরৎবাবু তাঁকে যেতে নিষেধ করেন। এই সময় কলকাতায় থাকার সময় উভয়ে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎ করে আসেন।

দাদামশাইয়ের শেষ দিনগুলি তাঁর নাতিদের সঙ্গে পূর্ণিয়ায় কাটে। ১৯৩৬ সাল থেকে স্থায়িভাবে পূর্ণিয়ায় অন্তিম দিন পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ ১৪ বৎসর কাটান। মনে পড়ে শৈশবে তাঁকে আমাদের পূর্ণিয়া শহরে ভাট্টাবাজার পাড়ায় দেখেছি। আমাদের বাড়ির কাছেই তিনি থাকতেন। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে পদচারণা করেছেন অশীতিপর সদাহাস্যময় দাদামশায়। মুগ্ধ-বিস্ময়ে আমরা বালকের দল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

১৯৫০ সালে ভাট্টাবাজারে জামাই ডাক্তার হরিজীবন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। সেই বাড়ির একটি ঘরে আজও রাখা আছে একটি বিছানা। তাঁর ব্যবহৃত ছড়ি, বাঁধানো দাঁত, চশমা আজও রাখা আছে। আর আছে বইপত্রে ঠাসা কয়েকটি আলমারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ নিজের হাতে লিখে উপহার দিয়েছেন। বনফুল, তারাশঙ্কর, গোপাল হালদার প্রভৃতি লেখকের উপহার দেওয়া অজস্র গ্রন্থ। পূর্ণিয়ার ছেলে সতীনাথ ভাদুড়ীর উপহার দেওয়া তাঁর 'জননায়ক' গ্রন্থের পাতায় লেখা দাদামশায়ের মন্তব্য—'সতীনাথ, তুমি নিশ্চয়ই দশজনের মধ্যে একজন লেখক হবে।'

দেওয়ালে টাঙানো বহু ছবি— রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দাদামশাই, শরৎচন্দ্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রয়েছে শান্তিনিকেতনে তোলা সংবর্ধনা উপলক্ষে সাহিত্যিকদের সঙ্গে তোলা ছবি। এই ঘরটিতে যেন বাঙলা সাহিত্যের এক বিশাল ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে আছে। নেই শুধু একজন। তিনি আবাল-বৃদ্ধবনিতার চির আদরের দাদামশাই।

শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলি কেদারনাথের দৌহিত্র ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত

তরুণের বিদ্রোহ এবং স্বদেশ ও সাহিত্য

জীবনময় রায়

শরৎচন্দ্রের বই সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তাঁর এই একটা ভাব সকলের নজরে পড়ে যে শরৎচন্দ্র যে দেশের মাটিতে জন্মেছেন যে দেশ তাঁর নিজের, সে দেশের কোন নিন্দা, সত্য হোক্ বা মিথ্যা হোক্, তিনি অন্যের মুখ থেকে শুনতে রাজী নন্। এই মনোভাব তাঁর 'গোরা' 'পড়ার ফল কিনা জানি না, কিন্তু গোরার মনোভাবের সঙ্গে এই মনোভাবের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আর-একটি মনোভাবও শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই। সেটি হচ্ছে এই, দেশ জাতি ও সমাজকে যদি কিছু গালাগালি করতে হয় তো সে তিনি করবেন, দেশকে তিনিই ভালবেসেছেন। কিন্তু অন্যে বললেই সেটা দেশদ্রোহিতা হতে বাধ্য। সত্য কি মিথ্যা, এ প্রশ্নই সেখানে বিবেচ্য নয়। এই মনোভাবটি আমাদের অক্ষম বাঙালী মনের আত্মসম্মানকে বড় একটি আশ্রয় দান করে। বাংলা দেশে ওই দুইটি ভাবের সাধারণ নাম দেশ-ভক্তি, যাকে চল্‌তি কথায় বলে পেট্রিয়টিজম্।

এটা গেল দেশভক্তির এক পিঠ। এর আর-একটা দিক্ আছে, সেটা যেমন মনোরম তেমনি দায়িত্বভার-শূন্য ; সেটা হচ্ছে পরনিন্দার দিক।

এক্ষেত্রেও সত্য-মিথ্যা বিচার করাটা দেশদ্রোহিতা। দেশভক্তকে মানতেই হবে যে দেশের যা কিছু মন্দ তা ইংরেজকৃত। এই দুটি মনোভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে এই প্রবন্ধটি পড়লে ভাষাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লোকচিত্ত-রঞ্জনের অদ্ভুত ক্ষমতা পাঠককে অভিভূত করবে—একথা জোর করে বলার দরকার করে না।

কিন্তু সমালোচনায় দেশভক্তির স্থান নেই, বিশেষত এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বহুস্থলেই 'সত্য গোপন করা পাপস্বরূপ' বলে দৃঢ়কণ্ঠে তার থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জীবনে অনেক পাপ করা গেছে—কিন্তু পাপ না করবার সুযোগ এত সহজে বড় একটা পাইনি। তাই আজ ভরসা ক'রে উপন্যাস ও গল্পকলার জাদুকরের প্রবন্ধ সমালোচনা করতে অগ্রসর হয়েছি। আর-একটা ভরসা আমার আছে। সেটা হচ্ছে উত্ত্যক্ত শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ : "যাকে সুখ্যাতি করতে পারিনে তাকে নিন্দে করতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।" শরৎচন্দ্রের সুখ্যাতি আমি প্রচুর করতে পারি, সুতরাং লজ্জা বোধ করবার কারণ আমার সে পক্ষেও নেই।

শরৎচন্দ্রের যে দুখানি বইয়ের সমালোচনা করতে বসেছি তার মধ্যে 'তরুণের বিদ্রোহ' বইখানি "১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে রংপুরের বঙ্গীয়

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা"। এই বক্তৃতার স্পষ্ট উদ্দেশ্য স্বর্গগত দেশবন্ধুর দলের মোক্তাররূপে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গোক্তি ক'রে তাঁর প্রচারিত মতগুলিকে তরুণ দলের কাছে খেলো করা। যিনি যত বড়ই হোন না কেন, তাঁর মত বা তাঁর কার্যপ্রণালী সমালোচনা করবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ব্যঙ্গোক্তিমাত্রে দ্বারা কোনো মতকে খণ্ডন করা হয় না এবং ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা কোন মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করাও যায় না। শরৎবাবু লিখেছেন—

"কোথায় কোন্ এক অজানা পল্লী চৌরীচোরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ ক'রে।"···"এবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে, সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন কমিশন। আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জন; সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব।" জালিয়ানওয়ালাবাগই হোক আর সাইমন কমিশনই হোক—দেশের আন্দোলন কোনো একটা উত্তেজনার ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তার ফল্গুবাহিনী থেকে বন্যার আকারে প্রকাশ পায়।

সেই প্রাণশক্তির দুর্নিবার স্রোতঃপ্রবাহকে, দেশের কল্যাণের পথে প্রবাহিত করতে, দেশের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন তাঁরা, যে কার্যপ্রণালী স্থির করেন, তা যে সকল সময়ই, এমন কি কোন সময়ই অভ্রান্ত হয় এমন বলা যায় না। অভ্রান্ত হওয়া যদি সম্ভব হোতো তা হলেও তার ফল যে সব সময় আশানুরূপ এমনকি কল্যাণকর হয় তাও নয়। নানা প্রতিকূল নূতন ঘটনায় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া হয়তো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এবং লোক-পরিচালনের দুরূহ কার্যপ্রণালীতে যদি কোথাও ভ্রান্তি থাকে তবে সেই ভ্রান্তি সংশোধনের সমস্যা—সস্তায় যাদের সহজে উত্তেজিত করা যায় এমন তরুণদলের সামনে দাঁড়িয়ে কটূক্তি করে—নিরাময় চিত্তে "নিভৃত পল্লী"-কোটরে, যেখানে বাইরের "তর্জন গর্জন পৌঁছবে না সেখানে আশ্রয় নিলেও মেটে না।

এই সূত্রে বলা ভালো যে শরৎচন্দ্র, তরুণকুলের ক্রোধ উদ্দীপ্ত না করেও কি করে বক্তব্যে স্পষ্টবাদিতার চেহারা ফোটে তারি চেষ্টায় দিশাহারা হয়ে এই প্রবন্ধটির মধ্যে তরুণস্তুতি ছড়িয়েছেন প্রচুর পরিমাণে ও নির্বিচার প্রশ্রয়ে আত্ম-ত্যাগে নিষ্ঠার সঙ্গে খাদি প্রস্তুত করতে জেলে যেতে দেশকে ভালবেসে অকাতরে প্রাণ দিতে এই বাংলার তরুণেরা যেমন এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ আবার পাতা চারেক পরেই দেখি যে তাদের আর-এক মূর্তি।

শরৎচন্দ্র এই অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগী যুবকদের নির্জীব বলে ভর্ৎসনা করছেন। বলছেন "শান্তি-স্বস্তি-হীন সম্মান-বর্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এত লোভের বস্তু ?" (এখানে অবশ্য ভারত কথাটা বাংলার প্রতিশব্দ)। "তরুণ শক্তি যে প্রাণ দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা করে এ যদি তারা ভোলে" ইত্যাদি। অথবা "এই যে যুব-সঙ্ঘ, খোঁজ করলেই দেখা যাবে এর মধ্যে তেরটা দল। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই" ইত্যাদি। কৌতুকের কথা এই যে, এই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের একদল হয়ে অন্য দলের উচ্ছেদসাধনোদ্দেশেই এই বক্তৃতায় সেদিন ব্রতী ছিলেন। যুব-সঙ্ঘের কটা দল সে কথা ছেড়েই দি—অন্ততঃ সেদিন শরৎবাবু যে বৃহত্তর ভারত-সঙ্ঘের মধ্যে "মতের মিল" প্রতিষ্ঠার 'চ্যাম্পিয়ন' স্বরূপ দাঁড়াননি সে দিকে "তাঁর" দৃষ্টি আকর্ষণ করবার লোক বোধ হয় সেখানে ছিল না। অথবা যুবকেরা বোধহয় বিশিষ্ট অতিথির প্রতি শিষ্টতার খাতিরে এ কৌতুকাবহ ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজম করেছিলো।

অতএব খদ্দর প্রচারের প্রতি প্রচুর যুক্তিসম্পর্কশূন্য ব্যঙ্গোক্তির পর শরৎচন্দ্র একজায়গায় বলছেন, "এ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত এই যে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কমিয়ে আনার দরকার। অভাব-বোধই দুঃখ। অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কৌপীন পরিধান—এবং যেহেতু সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম উপায়।···এই ত্যাগের মন্ত্র সর্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে।"

"সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম উপায়" এমন কথা সম্প্রতি কে কোথায় বলেছেন সেটা শরৎবাবু বলে দিলেই ভাল করতেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা অনামা কাল্পনিক মহৎ লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে এ যেন 'বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে কোঁদল' করা।

একটা কথা শরৎবাবুর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অবধান করা উচিত; সেটা এই—মানুষ যখন কোন বিশেষ সঙ্কল্প সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের সহজলব্ধ আরামের পথ ছেড়ে দিয়ে বিশেষ কোনো কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই কৃচ্ছ্রসাধনাকে 'পুরুষকার' বলে অভিহিত করা অসমীচীন হয় না। এবং পুরুষকারের সঙ্গে "ভগবান করেছেন" "কপালে লেখা" "সংসার ত মায়া, দুদিনের খেলা" প্রভৃতি মনোভাব এক পংক্তিতে পাংক্তেয় নয়। সুতরাং কপালের দোহাই যারা দেয় তারা সাধকের দলে নয়। পাঁচহাত কৌপীন যাঁরা পরতে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁদের মনে দেশটাকে "পশুর কোঠায়' টেনে নিয়ে যাবার কোনো মতলব ছিল না। পূর্বে যাঁরা দিয়েছিলেন তাদের হয়ত নিছক আধ্যাত্মিক

কারণ ছিল কিন্তু এবার যিনি দিয়েছেন তাঁর কারণগুলির মধ্যে একটি প্রধান যে অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাটা জনসাধারণের পক্ষে যে সাময়িক, সে কথা জাতীয় কংগ্রেসের শাখা-পতির অজানা থাকবার কথা নয়। অবশ্য মানসিক সিদ্ধি ও শক্তিলাভও এই উদ্দেশ্যের অন্যতম হওয়া সম্ভব। ধনী ব্যক্তিকে যদি কোন কারণে দারিদ্র্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হতে হয়, তবে ভিক্ষা ও পরমুখাপেক্ষিতার চেয়ে নিজের জন্যে নিজের হাত পা খাটালে তাকে "চাকরের কোঠায়" গিয়ে পড়তে হয় না। তাতে তার অর্থসমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান তো হয়ই, তাছাড়া আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষ সাধনে তার চিত্ত সম্পদবান হয়।

যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চলে, কিন্তু গালাগালি বা ব্যঙ্গ তো যুক্তি নয়—রাগ। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ (?) অসহযোগ। তার টিকি বাঁধা রইল তাঁর খাদি চরখার দড়িতে" ইত্যাদি। (২) "স্বরাজের তারিখ ধার্য হোলো ৩১শে ডিসেম্বর।" (৩) "পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস নেতাদের মত অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িও না।" (৪) চৌরী-চৌরায় হোলো রক্তপাত। মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে।" (৫) "আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জন, সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়া" (৬) "মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা—"সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে লেখাপড়া শেখানো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত" থাকতে কেউ বলেন কিনা আমার জানা নেই। দেশের কল্যাণ নির্ভর করে নানা বিষয়ের সাধনায়। তার মধ্যে কতকগুলি প্রধান বলে ধরা যায় এবং অপর কতকগুলি আনুষঙ্গিক। দেশের মুক্তি ও কল্যাণের পন্থা উদ্ভাবন ও অনুসরণে যাঁরা অগ্রসর সেই সকল মনীষীর মধ্যে যাঁর চিত্তে যে ব্যাপারের সাধনাকে দেশহিতের প্রধানতম উপায় বলে মনে হয়, তিনি সেটাকেই বড় করে দেখেন ও বড় করে বলেন, তারি জন্যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য দান করেন ও অন্যকে দান করবার জন্য আহ্বান করে থাকেন। উৎসাহের আতিশয্যে নিজের উদ্ভাবিত পন্থাকে আবশ্যকের অতিরিক্ত মূল্য দেওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু লোকশিক্ষা, চরকা, জাতিভেদনাশ, স্ত্রীজাতির উন্নতি যিনি যতই মঙ্গলকর ব'লে মনে করুন কেন, অন্যান্য মঙ্গল সাধনের সর্বপ্রকার চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে উপদেশ দেন, দেশের এমন বন্ধু আমাদের চোখে পড়েন নি। শিক্ষাবিস্তারের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে তো নয়ই। শরৎবাবু লিখছেন, "শিক্ষাবিস্তার চেষ্টা করতে মানা করিনে, কিন্তু এখানে

একটা নাইট্‌-ইস্কুল, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর।" এতদ্দ্বারা শরৎবাবু দেশের শিক্ষাবিস্তারের এ চেষ্টাকে যে আবশ্যকের পক্ষে ছেলেখেলা, সেইজন্যই দুঃখ করছেন, সুতরাং এ অপেক্ষাও অধিকতর শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকেই সমর্থন করছে। শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা এদেশে যাঁরাই করছেন তাঁরাই শিক্ষাদানের এই স্বল্প আয়োজনের দীনতা মর্মে মর্মে অনুভব করে থাকেন এবং এই চেষ্টাকে বহুগুণপ্রসারিত, লোকপ্রিয় ও প্রচারিত করা চাই, এটা জেনেই তাঁদের এই প্রাণপাত পরিশ্রম। সফলতা লাভ করা তো আমাদের দেশের জমিতে দেরি হতে পারে, এই পর্যন্ত। অথচ দেশের এই শিক্ষা-প্রবর্তনের যে চেষ্টাকে তিনি ছেলেখেলা বলে বর্ণনা করেছেন সেই চেষ্টা দেখেই আবার তার বাহুল্যে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। বলছেন, "তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁদের পরে আমার ভরসা কম"। অর্থাৎ তাঁরা লোক খারাপ নয়, তবে নির্বোধ। শরৎবাবুর মতে গভর্নমেণ্ট ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না। যে দেশে গভর্নমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা শিক্ষাবিস্তারকল্পে জাগানো সম্ভব নয় সেখানে কি হাত-পা ছেড়ে মানুষকে তবে বসে থাকতে হবে? তাছাড়া, যে কোন সংস্কার-চেষ্টার প্রেরণাই ব্যক্তি থেকে মণ্ডলী, এবং মণ্ডলী থেকে তা জাতিকে অনুপ্রাণিত করে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সেটা জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং গভর্নমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কেবল ছেলেখেলা হয়, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

এইটুকু প্রবন্ধের সমালোচনা করতে অনেকখানি লিখতে হচ্ছে। তার প্রধান কারণ প্রবন্ধটি মহৎ ব্যক্তি ও মহৎ চেষ্টার প্রতি যুক্তিবিহীন কটুবাক্যে পূর্ণ এবং তরুণ দলকে উত্তেজিত করে দলবিশেষের পুষ্টি সাধনই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। এমন বক্তৃতা যদি শরৎবাবুর মত মান্য লোকের মুখ থেকে না বেরোতো এবং একে যদি বাংলার অক্ষয় কলঙ্কের মত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না হোতো তবে এর সমালোচনাও দরকার হোতো না। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "সত্য মনে করে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু'দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু আমি তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লী মাজুতে" ইত্যাদি। গোড়ার লাইনটা একটু বদলে "সত্য মনে করে" না লিখে, মহাত্মার বিরুদ্ধে তরুণদের উত্তেজিত করে কংগ্রেসে নিজের দল ভারি করব এই মনে করে লিখলে সত্য মনে করতে হোতো না, তবু সত্যই হোতো। আর বাংলার তরুণদলকে কোন মন্ত্র বলে সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত করা সম্ভব শরৎচন্দ্রের চেয়ে সে বিদ্যার

বড় ওস্তাদ বাংলা দেশে নেই। কোন্ কোন্ বাক্য বিস্ফুরণে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অভ্রভেদী করে তোলা যায়, কোন্ কোন্ তুলনায় তাদের আহত আত্মম্ভরিতাকে নিরাময় আশ্রয় ও নির্বিরোধ প্রশ্রয় দেওয়া যায়, কোন্ কথায় তাদের উদ্দাম কল্পনাকে মাদকতায় মশ্‌গুল করে তুলতে পারা যায়। ---এ বিদ্যার তিনি যাদুকর। কিন্তু কাল্পনিক চিত্রকে চিত্তহারী করে প্রকাশ করাই তাঁর ব্যবসা, ঐতিহাসিক সত্যকে অ-সংস্কৃতভাবে প্রকাশ করতে তিনি অভ্যস্ত নন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধে সত্যভাষণের খাতিরে অপ্রিয়ভাষণের কথা স্থানে স্থানে শাসানো আছে। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সত্যের জন্য অপ্রিয়তাকে ডরাননি। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটি বারংবার পড়েও এই উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারবেন না। অর্থাৎ নিতান্ত দুঃসাহসিক সত্যভাষণের চিহ্ন কোথাও দেখতে পাইনি; বরং বিস্তর স্তুতিবাক্য বাংলার তরুণদের (যাদের সম্ভাষণ করে এই বক্তৃতা তাদের) কংগ্রেসের চেয়ে, বড়দৌলিওয়ালাদের চেয়ে, নিখিল ভারতের অন্যান্য সকলের চেয়ে, অভ্রভেদী আসনে বসিয়েছিলেন। তারপর তাদের দলের মধ্যে দলাদলির যে উল্লেখটুকু করেছেন তারও ঝাঁঝটুকু মারবার জন্য তাকে যুগান্তের অভিশাপ, বাঙালীর জাতীয় উত্তরাধিকার-কলঙ্ক, প্রকাশ করেছেন। যাই হোক বক্তৃতাটি অক্রোধী ও অকামী মহাত্মার প্রতি কটূ ও ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ, তাও আবার দলাদলির সৃজনকল্পে। এ সম্বন্ধে আমি শরৎচন্দ্রের স্বদেশ ও সাহিত্যের "শেষ প্রশ্ন" শীর্ষক একখানি পত্র থেকে দু'চারটি পংক্তি উদ্ধার করে, আমার সমালোচনার এই অংশটি শেষ করব--- পাঠক সন্দেহ করবেন না, এই পত্রখানি এই "তরুণের বিদ্রোহ"-এর বক্তারই লেখা।

(১) "মনের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ভদ্র ব্যক্তির অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়।" আয়ত্ত যে হয়নি তাই প্রমাণ করতেই যেন অধুনা আলোচ্য বক্তৃতাটির অবতারণা। কত দিনে ও কত দুঃখে আয়ত্ত হবে তার সঠিক উল্লেখ নেই। (২) "মানুষকে আহত করায় নিজের মর্যাদা আহত হয় সব চেয়ে বেশী।" আশা করি ভবিষ্যতে একথা তিনি আর বিস্মৃত হবেন না। "আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের আত্মসম্মানে আঘাত করা আমার ধাতে পোষায় না।"

এই পত্রের লেখকও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বইখানার নাম "তরুণের বিদ্রোহ" দেবার কারণ বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না---তবে নামটা বাংলা দেশে ব্যবসা হিসাবে মূল্যবান বটে।

এই বইয়ের সত্য ও মিথ্যা প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র তাঁর অন্তরের অনপনেয় বেদনা দিয়ে রচনা করেছেন। এর প্রত্যেকটি কথা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন প্রত্যেক ভারতীয় নরনারী মর্মে মর্মে অনুভব করেন। শিশুকাল থেকে প্রতিপদে স্কুলের শিশুপাঠ্য বই থেকে হেড মাষ্টারের অফিসের খাতা পর্যন্ত সব আগা-গোড়া মিথ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষ। "কর্তৃপক্ষদের উত্তর ওতে কিছু মিথ্যা হয় না—ও সকলেই জানে।" যেটা সকলে জানে সেটা না হয় বোঝা গেল ; কিন্তু ভয়ে বা লোভে মিথ্যা বলার এই ক্ষুদ্রতা শিশুর মনে ধীরে ধীরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে বড় হয়ে মিথ্যা কথা বলার অপমান, হীনতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা আমাদের আত্মসম্মানবোধকে আর আহত করে না। একথা যদিও অতীব সত্য যে আমাদের দেশ দুর্ভাগ্য, কেননা এ রাজ্যে সত্য বলা সিডিশন কিন্তু এ কথাও কম সত্য নয় যে ঘরে এবং বাইরে আমরা আমাদের সামাজিক সাংসারিক ও ব্যবহারিক জীবনে অসত্য চরণকে আমাদের শিশুদের জীবনের সামনে 'ক্লেভারনেস' ও 'ট্যাক্টফুলনেস'—চতুরতা ও সংসার-বুদ্ধির আদর্শরূপে দাঁড় করিয়ে থাকি। এরই আবহাওয়াতে তারা বড় হয়। সুতরাং যে সম্পাদক শরৎবাবুকে বলেছিলেন গোড়ায় একটা 'যদি এবং শেষে একটা 'কিনা' দিয়ে তিনি রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে থাকেন তাঁর এ বিদ্যার শিক্ষা পিতা-মাতার এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকেই হয়েছে। জাতির এই হীনতা শরৎচন্দ্রের চিত্তে তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধকে পীড়িত করেছে। এবং তাঁর অননুকরণীয় আবেগময়ী ভাষায় তিনি প্রত্যেক ভারত-বাসীর মনের এই দুরপনেয় বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরই ভাষায় বলি, "ভাষা যেখানে দুর্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস্ না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নিচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ?"

স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রকাশকের নিবেদন লেখাটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে। ভাষার উপর লেখকের একটি সহজ অধিকার আছে, লেখার মধ্যে বাঁধ কোথাও শিথিল হয়ে যায়নি—পড়তে ভাল লাগে। "আমার কথা"—শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়ার কচকচি। তার রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে চাইনে। নৈতিক দিকে একটা কথা বলব। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "আর 'ইনডিফারেন্স' অর্থে যদি কেউ (ইংরাজরা) এই ইঙ্গিত করে থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি ত তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্মান্তিক হয়েই বেজেছে'

ইত্যাদি। আমাদের বলতে দেশের লোকের মধ্যে ক'জনকে বোঝায় তা জানি না। গভীর ব্যথা অত্যন্ত নির্দিষ্টসংখ্যক কয়েকজনের বেজে থাকতে পারে, কিন্তু দেশের লোক বলতে যে বিপুল জন-সংখ্যাকে বোঝায় তাদের ত শতকরা ৯৯ জনের দেশের সম্বন্ধে কোনো অনুভূতিই নেই। বাকী লোকের মধ্যে কয়েক সহস্র যাঁরা দেশের ও মহাত্মার খবর রাখেন তাঁদেরও (শরৎচন্দ্রের কথাই তুলে দি) "আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, সর্বপ্রকারের সুখ-সুবিধার কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে, পান থেকে একবিন্দু চুন যেন না খসতে পায়—তার পর স্বরাজ বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্যন্ত বল, যা হয় তা হোক, কোনো আপত্তি নেই।"—অর্থাৎ হয় যদি ত পরের উপর দিয়েই হোক্। তার ফলাফল না হয় তাঁরা কৃপা করে সহ্য করবেন। এমনকি পরের ছেলের মার খাওয়া, প্রাণ দেওয়া নিয়ে সকাল বিকেল চায়ের আসর, মেসের আড্ডা এবং লাট্-বাবুদের বৈঠকখানায় বিজয়হুঙ্কারে ফাটাফাটি পর্যন্ত করতে রাজী আছেন। গভীর বেদনার কী জাজ্বল্য চিত্র। মহাত্মার কারাদণ্ডে কটা থিয়েটার, বায়স্কোপ একদিনও খালি পড়ে আছে? শরৎবাবুর এই কথাই ত সবচেয়ে সত্য যে তাঁকে মুক্ত করা দেশের লোকেরই হাত। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ তাঁকে জেলে রাখতে পারবে না, তা সে গভর্নমেণ্ট যত শক্তিশালী হউন।" এই হাস্যকর গভীর ব্যথাটিকে 'সে (গভর্নমেণ্ট) যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে 'ইনডিফারেন্স'—"সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা?"

"স্বরাজসাধনায় নারী" প্রবন্ধে শরৎবাবু লিখেছেন যে, "মেয়েদের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে তারা সেই অনুপাতেই সামাজিক, নৈতিক আর্থিক দিকে ছোট হয়ে গেছে কিংবা যারা তাদের স্বাধীনতা হরণ করেনি অন্য কোন জাত তাদের পরাধীন করতে পারে নি, পারেনা, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়।" ভগবানের আইন আমার জানা নেই, এবং সে সম্বন্ধে স্পেকিউলেট করা আমার ব্যবসাও নয়, কিন্তু স্বাধীনতা যদি সকলেরই কামাবস্তু হয় তবে মেয়েদেরও তা থেকে বঞ্চিত করবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। যে জিনিস ভাল, মঙ্গলকর, সে তার নিজের জোরেই মঙ্গলজনক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি প্রাচীন গ্রীস শিক্ষায়, শিল্পে, চিন্তায়, সাহিত্যে অতুলনীয়, কিন্তু সেখানে নারীর স্থান কোথায় ছিল? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর তুর্কী ও মোগলের কথা বলা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর তুর্কী ছিল 'টেরর অব্ ইউরোপ'। স্ত্রীস্বাধীনতা ভাল বলেই তা ভাল, তা বই তাকে

স্বরাজ লাভের উপায় বলে উৎকোচের ব্যবস্থা করা কেন? কোনো ভালো জিনিসের মূল্যাঙ্ক তাতে খর্ব করা হয় না কি?

"শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধ পড়লে সেই "তরুণের বিদ্রোহ"-এর বক্তাকে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথা ইচ্ছা করলে শরৎচন্দ্র যতটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন বলে আমাদের জানা আছে এমন অল্পলোকই আছেন, অথচ দুঃখের বিষয়, শরৎচন্দ্র অযথা কথার মারপ্যাঁচে কতকগুলি অবান্তর তর্কের সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমের কাছে আমাদের কিছু শেখবার আছে, এই সামান্য সত্যটুকুতে উষ্মা প্রকাশ করলে হয়ত দেশভক্তি প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু স্বদেশপ্রিয়তা যে প্রকাশ পায় না শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে কথা শরৎচন্দ্রকে তাঁর বই থেকেই স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। আসলে, শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সেন্স অব হিউমার-এর মধ্যেও কোথায় যেন একটা নাটুকে বাঙালী বীর লুকিয়ে আছে; সে সময়ে এবং অসময়ে তার শত্রুর দলের পোশাকটা পরে আসরে নেমে পড়ে—তার হুঙ্কারে চারিদিকে হাততালি পড়তে থাকে—তখন আর শরৎচন্দ্রকে চেনা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"একথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করেছে, সে কোনো একটা সত্যের জোরে।"

শরৎচন্দ্র লিখছেন—

"লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু একেই যদি মানুষ চরম সত্য বলে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত" ইত্যাদি।

শরৎবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত্ত্ব, 'ফ্যাক্ট' এবং ট্রুথের গোলমাল করেছেন, দেখলে আশ্চর্য লাগে। আসল কথা, রাগ হলে লোকের আর যুক্তি থাকে না—বিশেষতঃ রাগ প্রকাশের জায়গাটা যদি এমন মাটিতে হয় যেখানে লোকে যুক্তি বা ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের চেয়ে একটা নাটকোচিত স্বাদেশিকতার জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। কতকগুলি অদ্ভুত কথার উপর ভিত্তি করে শরৎবাবু এই বিতণ্ডাটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ দু-চারটে তুলে দিই।

১। সংসারে জয় করা বা কেড়ে নেওয়ার বিদ্যেটাকেই সভ্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই পশ্চিমের মানুষের বড় সার্থকতা এবং সেটার উপরেই রবীন্দ্রনাথের লোভ।—এটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একটা আবিষ্কার বটে। রবীন্দ্র-নাথের সমস্ত চিন্তার ধারা আজ বাংলা সাহিত্যে নবশক্তিতে নবীন আলোকে,

ভারতবর্ষের ধ্যান ও সাধনার পরম সম্পদ—এই বিশ্বব্যাপার ও মানবচেষ্টার অন্তরালে অজেয় আত্মিক শক্তির পরিচয়বত্তাকে ঘোষণা করছে। এ খবর শরৎ-বাবুকে আমাদের দেবার দরকার আছে কি ?

২। ইংরাজরা পৃথিবীকে কামধেনুর মত দোহন করেছে কিন্তু আমরা উপবাসী রয়েছি। এ একটি ফ্যাক্ট, একেই চরম সত্য বলে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে বলেছেন।

৩। পশ্চিমের সভ্যতার বোধ করি এই একটি মাপকাঠিতে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন ইত্যাদি।

এ যেন নতুন লজিক পড়া কলেজের ছেলের কথায় কথায় চুল ধরে তর্ক করা। 'সারভাইভেল অব দি ফিটেস্ট'-এর রাজ্যে, জগতে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর রূপে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অর্থে, শক্তিতে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে মাথা তুলে রাখতে পেরেছে—তাদের সেই শ্রেষ্ঠত্বকে তাদের অন্তর্নিহিত কোনো মহাশক্তির প্রকাশ বলেই জানতে হবে—কোনো অঙ্কশাস্ত্রই তাকে ফাঁকতালে পাওয়া অ্যাক্সিডেণ্ট বলবে না। সেই অন্তর্নিহিত মহৎ শক্তিই তাঁদের জীবনের মহৎ সত্য—বড় হবার সেই সত্য, একটা 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'। একদিন পূর্বদেশের লোক তার যে দিকে সাধনা করেছিল সে দিকে সে সিদ্ধিলাভ করেছিল—আজ পশ্চিম যদি তার কোনো দিকের সাধনায় বড় হয়ে থাকে তবে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে তার কাছে তা শিখতে হবে বই কি—এতে রাগের কী আছে ? যে লোকটা গায়ে ভীমের মত শক্তি সঞ্চয় করল—তার গায়ের জোর একটা ফ্যাক্ট, মেছো বাজারে গুণ্ডামি করে ম্যাঠারি বাজারে বাড়ি তোলে এও একটা ফ্যাক্ট, কিন্তু তিলে তিলে যখন সে শক্তিসঞ্চয়ের সাধনা করেছে এবং সেই শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তার ভিতরকার রহস্য বা সত্য কি তার পরস্বাপহরণ না গুণ্ডামি ?

শক্তিলাভ করা যদি অভিপ্রেত হয় তবে তার সাধনার গূঢ় তত্ত্ব তার এক-নিষ্ঠতা, তার 'মেথডস্' সব তার কাছ থেকে শিখতে হবে। তারপর আমরা আমাদের শক্তির ব্যবহার কিভাবে করব তাই দিয়ে আমাদের মেণ্টালিটির (মতির) পরিচয় দেব। যে বিদ্যুৎ দিয়ে তারা মারছে তাই দিয়ে মানুষকে বাঁচাচ্ছেও ত—সুতরাং মারবার কথাটাই যে একমাত্র ফ্যাক্ট তাও নয়—তাদের জীবনেও নয়। সেইটেই একান্ত করে শেখবার উপদেশ রবীন্দ্রনাথ দেননি।

তাছাড়া বড় হওয়া বিদ্যেটা ত মাত্র তাদের নরহত্যাতেই প্রকাশ পায়নি ? যে যুগ যুগ সাধনার দ্বারা তারা শক্তি সঞ্চয় করবার মন্ত্রসকল তাদের জীবনে

সাহিত্যে
...। তাঁর সৃষ্ট শিশুচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রগল্ভতা। উপন্যাসেও দেখা
...ন্দ্র-শিশু প্রগল্ভ। 'গোরা'য় দেখি :

'পরেশ কহিলেন, "শুনলুম সেদিন সতীশ আপনার এখানে এসেছিল, খুব বোধ হয় বিরক্ত করে গেছে। ও এত বকে যে, ওর দিদি ওকে বক্তিয়ার খিলিজি নাম দিয়েছে।"'

কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'কে 'ভাবশিশু' আখ্যা দেবার পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয় এই শিশুকে 'কল্পনার শিশু' নাম দেওয়াই বোধ হয় বেশী সঙ্গত। এই শিশু সাধারণ শিশুর মতোই সরল বটে ; কিন্তু মননপ্রাধান্যে অসাধারণ। আমরা কখনও ভুলতে পারি না যে এদের শৈশব রবীন্দ্রনাথেরই শৈশব। 'জীবনস্মৃতি'-'ছেলেবেলা'য় রয়েছে কবির শৈশব-কৈশোরককালের কথা। ছেলেবেলার খেলাধূলার বহুতর বাস্তব উপকরণের অভাব পরবর্তীকালে রচিত সাহিত্যে কল্পনায় পূর্ণতা পেয়েছে। যা-ই হোক, এই শিশুর মাধুর্য সবারই মনোহরণ করে। অবশ্য একথাও সত্য যে এদের দৃষ্টি ঠিক শিশুশোভন তন্ময় দৃষ্টি নয়। 'মনে পড়া' নামে কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতাটিতে মায়ের সঙ্গে পুত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বর্ণনা নেই। অথচ বাৎসল্যরসের ঘাটতিও ঘটতে দেয়নি স্নেহসম্পর্কের সম্ভাব্য কল্পনা ও অনুমানের বর্ণাঢ্য চিত্রে। তবে শিশুর শিশুত্ব অনেকটাই গৌণ হয়ে পড়েছে। পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে কবিশোভন তেজ কল্পনা, সজাগ দৃষ্টি এবং নিবিড় রসানুভবক্ষমতা। অর্থাৎ অহং-প্রাধান্যই রবীন্দ্রশিশুর বৈশিষ্ট্য এবং বোধ করি তা অনপনেয়। বহুপঠিত 'বীরপুরুষ' কবিতায় 'খোকা'র 'মা'কে নিয়ে বিদেশ ঘুরে যাবার যে অভিযান তা সর্বাংশে কাল্পনিক। শরৎসাহিত্যের শিশুচরিত্র কিন্তু এমন 'নিষ্ক্রিয় নায়ক' নয়। সে কথা মেনে নিয়েও বলা যায় রবীন্দ্র-অঙ্কিত শিশুচরিত্রের বর্ণ ও ভাব ও ব্যঞ্জনা অসামান্য বলেই তার গৌরবও আলাদা—মূল্যও স্বতন্ত্র। শিশু সম্পর্কে তাঁরই ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

সব দেবতার আদরের ধন নিত্যকালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সি।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের শিশু কিন্তু অনেকটাই বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের শিশুকৃষ্ণের সগোত্র। তাঁর সাহিত্যে মাতৃস্নেহও উৎসারিত হয়েছে নিজ সন্তানের পরিবর্তে সন্তানস্থানীয় চঞ্চল শিশুর প্রতি। এ বিষয়টি তাঁর একাধিক উপন্যাস এবং গল্পে উদাহৃত হয়েছে। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে দেখি অভি-

মানিনী বিন্দু অন্নপূর্ণার শিশুসন্তানকেই নিজের সন্তানের মতো স্নেহভালোবাসা দিয়ে মানুষ করতে চায়। নরেনের সান্নিধ্যে কু-সংসর্গের আশঙ্কা করে সে বড়ো জায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেও পেছপা নয়। সে যাই হোক, জননী বা তৎস্থানীয়ের স্নেহ বা বাৎসল্য নয়, স্নেহবাৎসল্যের চির আলম্বন শিশুই আমাদের আলোচ্য।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে শিশুর অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তার বিচিত্র বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে বিচিত্রতর রূপ দিয়েছেন। তাঁর শিশুচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তন্ময়তা। প্রত্যেক শিশুরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সে সেই জগতের মধ্যে তার মনের মতো নানা উপকরণেই এমন তন্ময় হয়ে থাকে যে বাইরের অন্য কোনো কিছুই সময় সময় তার কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসেই পাই শিশুর এই তন্ময় দৃষ্টির পরিচয়। 'রামের সুমতি' গল্পে রামলাল তাদের পুকুরের বহুদিনকার দুটি বড়ো মাছকে অত্যন্ত ভালো-বাসে। মাছদুটির নামকরণও সে-ই করেছে: কার্তিক আর গণেশ। অন্য আর-পাঁচজনের চোখে দুটি মাছের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু রামের কাছে তাদের সত্তা ও সৌন্দর্য পৃথক। দিগম্বরী ভগার সাহায্যে যেদিন বামুন খাওয়াবার উপলক্ষে তাঁর পরম প্রিয় মাছ দুটির একটিকে ধরিয়ে আনল, রাম ভোলার মুখে খবর শুনে পেয়ারা চিবুনো রেখে দিয়ে গাছ থেকে 'ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল.· এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝ-খানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ। বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে। বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।'

পরিণত বয়সের মানুষ মাছটিকে দেখবে লোভের দৃষ্টিতে। কল্পনা করবে তার বড়ো বড়ো খণ্ড ভক্ষণের আস্বাদ। কিন্তু রামের মতো শিশুদের কাছে মাছের উপযোগিতা বা উপভোগ নয়—তার সৌন্দর্য তার প্রাণবন্ত রূপই আকর্ষণের বিষয়, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। শিশুচরিত্রের মধ্যে বড়োদের মতো আত্মসম্ভ্রমবোধও অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। রামের মধ্যে তা আছে। উঠোনের ওপর অশ্বত্থগাছ রোপণের ঘটনায় নারায়ণী ও দিগম্বরীর মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়। গাছটি উপড়ে ফেলা হলে রাম পাছে অনর্থ বাধায় এই আশঙ্কা করে নারায়ণী রামকে বলে যে মঙ্গলবারদিন গাছ পুঁততে নেই। এবং মঙ্গলবারে পাঁজি দেখতেও নেই—পাছে রাম নিজে দেখতে চায় পাঁজিতে

একথা সত্যিই লেখা আছে কিনা, তাই নারায়ণী জানায় এই সহজ কথাটি ভোলাও জানে। তখন ভোলার কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে এ বিষয়ে নিরস্ত থাকাই ভালো ভেবে রাম আর পাঁজি দেখে না। ভোলার কাছে তার অজ্ঞতা ধরা পড়ুক এটা সে কিছুতেই চায় না।

শরৎসাহিত্যে শিশুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য চঞ্চলতা উদাহৃত হয়েছে একাধিক শিশুচরিত্রে---কোথাও প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায়, কোথাও পরোক্ষ উল্লেখে। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে দেখি বিন্দুর শাসনশৈথিল্যের সামান্য অবসরে অমূল্য নরেনের অনুকরণই শুধু নয়, আর পাঁচটা দুষ্টু ছেলের সঙ্গে মিশে লোকের আমবাগানে এমন দৌরাত্ম্য করে যার জন্যে তাকে অন্নপূর্ণার কাছ থেকে গোপনে জরি-মানার টাকা আদায় করতে হয়। এবিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে রামের সুমতি গল্পে। রামের দস্তুর মতো একটি দুষ্টু ছেলের কাহিনী আছে। সে-ই তার সর্বাধিনায়ক। গ্রাম্য ডাক্তার তার হুমকির জোরে নারায়ণীর জ্বর দেখতে বাড়িতে আসে এবং বেশী ফি নিতে সাহস করে না। রাম পেয়ারা গাছে চড়ে কাঁচা পেয়ারা যত খায় তার চেয়ে নষ্ট করে আরও বেশী। আবার পর মুহূর্তে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে অন্য বিষয়! রক্ষাকালী আর শ্মশান-কালীর মধ্যে কার জিভ বেশী লম্বা এই নিয়ে সে মারামারি করে। দিগম্বরীকে লক্ষ্য করে কাঁচা পেয়ারা ছুঁড়ে বৌদির কপালে তা লাগিয়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ভালো হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে আবার ভুলে গিয়ে দুষ্টুমি-দৌরাত্ম্য করে। এমনি করেই তার চিরচঞ্চল শিশুপ্রাণের অবাধলীলার প্রকাশ ঘটেছে শরৎচন্দ্রের কুশলী লেখনীর স্পর্শে।

শিশুচরিত্র বন্ধন-অসহিষ্ণু—মুক্তি- ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী। রাম কোনো শাসনই মানে না। নারায়ণীর অপার স্নেহই একমাত্র তাকে সাময়িকভাবে শান্ত করতে পারে। গল্পের শেষে দেখি বৌদির কোলে বসে রাম বলছে—'আমি ভাল হয়েচি, আমার সুমতি হয়েচে—আর একটিবার তুমি দেখ।' আমাদের মনে হয় রাম এ প্রতিজ্ঞা অন্যান্যবারের প্রতিজ্ঞার মতই কালে কালে ভুলে যাবে এবং আবার দুষ্টুমি করবে।

মুক্তি এবং স্বাধীনতা যে শিশুর কাছে কত প্রার্থিত তার উদাহরণ রয়েছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে। মেজদা পড়বার ঘরে পড়ুয়াদের তদারকিতে এমন কড়া ব্যবস্থা করেছিলেন যে পড়া ছেড়ে একটু বাইরে যেতে হলে তাঁর কাছ থেকে 'শ্লিপ' নিতে হত এবং সপ্তাহশেষে কে কতবার 'শ্লিপ' নিয়েছে তাই হিসেব করে তার শাস্তি হত। যেদিন ছোড়দা, যতীনদা জানতে পারল

মেজদার শাসনের শৃঙ্খল থেকে অত্যাচার থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে সেদিন তাদের সে কী আনন্দ।

'দত্তা'য় দেখি পরেশ নামে বালকটি বিজয়ার দ্বারা নরেনের সংবাদ গ্রহণে নিযুক্ত হয়ে আসল লক্ষ্য ভুলে বাতাসা কেনা উপলক্ষকেই বড়ো করে দেখে এবং যথারীতি নরেনের খবর নিতে ভুলে যায়। শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যে ভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। একাধিক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র তা দেখিয়েছেন।

মানবমানবীর চরিত্র সৃষ্টির একজন সার্থক রূপকার শরৎচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যে মানবকদের চরিত্রসৃষ্টিতেও সমান সার্থকতা সংলক্ষ্য। উত্তরকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পথের পাঁচালি এবং আরও কয়েকটি উপন্যাসে শিশুচরিত্রের অপার রহস্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে অফুরান উৎসাহ দেখিয়েছেন। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রকেই তাঁর উত্তরসাধকদের সার্থক পথপ্রদর্শকের গৌরব দান করতে হয়।

বিপ্লবী শরৎচন্দ্র

ডক্টর ক্ষেত্রপাল দাশ ঘোষ

শরৎসাহিত্য আলোচনার একটা যুগ ছিল যখন শরৎচন্দ্রকে বিপ্লবী বলিয়া সকলে অভিনন্দিত করিত ; কিন্তু আজকাল আবার ঠিক একটা উলটা সুর বাজিয়া চলিতেছে। অভিযোগ আনা হইতেছে শরৎচন্দ্র বিপ্লবী তো ছিলেনই না, ছিলেন ছদ্মবেশী বুর্জোয়া। অভিযোগের কারণ হইতেছে কৃষাণ মজদুর তাঁহার সাহিত্যে স্থান পায় নাই, সমাজতান্ত্রিক সমস্যা লইয়া তাঁহার মন উদ্বেলিত বা বিক্ষুব্ধ হয় নাই, তিনি হয় অভিজাত সম্প্রদায়, নয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রা বা যাহাদের সচরাচর পতিতা বলা হয় তাহাদের কাহিনী তাঁহার অমৃতলেখনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য একথা কেহই অস্বীকার করেন না যে শরৎচন্দ্রের মানবচৈতন্য এত বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ইহার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। এই মানবচৈতন্যই যদি অনস্বীকার্য হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে: সমাজচৈতন্য কি মানবচৈতন্যের বাহিরে? যাহার মন মানুষের দুঃখকষ্টে কাঁদিয়া উঠে, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়, সমাজের নির্মম বিধিবিধানের উৎসাদনই শুধু কামনা করে না, পুঞ্জীভূত বেদনার অশ্রুভারে তাহাকে দ্রবীভূত করিয়া নূতন কল্যাণকর খাতে প্রবহমান করিতে চায়, সেই উদার দরদী মন কি বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক না গতানুগতিকের দাসানুদাস ? বিচার করিয়া দেখিলে এক মুহূর্তের জন্যও এই অভিযোগ টিঁকিবে না। কারণ এ কথা সত্য নয় যে শরৎসাহিত্যে কৃষাণ বা চাষীদের কথা একেবারে নাই। 'মহেশে' বা 'পল্লীসমাজে' চাষী বা গ্রাম্য সর্দারের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতে এই নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি শরৎচন্দ্রের সীমাহীন সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। কৃষাণ-মজদুরের যুগে যদি তিনি বাস করিতেন, অর্থাৎ যে যুগে তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তিনি যদি সে যুগের মানুষ হইতেন তাহা হইলে তাহাদের ক্ষোভ ও গ্লানি তাঁহার ক্ষুরধার লেখনীতে কী জ্বালাময়ী অগ্নিবিকিরণ করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই তাঁহাকে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেওয়া নেহাত সাহিত্যিক বা সত্য দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। বিশেষ করিয়া যখন শরৎ-সাহিত্যে মানবতার এমন বীজ রহিয়াছে যাহা প্রকাণ্ড মহীরুহজন্মের দ্যোতক। আরেকটি দিক দিয়া এই বুর্জোয়া আখ্যা শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হয়—সেইটি হইল নীতির দিক দিয়া বা রাষ্ট্রিক বিপ্লব-

বাদের দিক দিয়া। এই অভিযোগগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব ইহার মধ্যে সত্যতা ঠিক তেমনটিই আছে যেমনটি ছিল প্রথম অভিযোগের ভিতর। কমল, অভয়া, সাবিত্রী, কিরণময়ী, অচলা বা সব্যসাচীর দ্রষ্টা যিনি, তিনি যে সাহিত্যে বুর্জোয়া নন, সে কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য। তবে একথাও সত্য তিনি পুরানপন্থী বা প্রচলিত বিধিবিধানানুরক্ত না হইলেও একেবারে চরমপন্থী নন, বা সে হিসাবে বিপ্লবী নন। কারণ সকল সামাজিক পরিবর্তনের মূলেই শরৎচন্দ্রের নিকট রহিয়াছে একটি মানকাঠি—সেটি হইতেছে সামাজিক কল্যাণ। শুধু ব্যক্তিগত মতে অন্যায় অবিচার হইতেছে বলিয়া পরিবর্তন করিয়া গেলাম, সমাজ সে পরিবর্তনের মূল্য দিল না, এমন পরিবর্তনে শরৎচন্দ্রের মন উঠে নাই। তিনি বারবার প্রতি গ্রন্থেই এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—যে পরিবর্তন সমাজ তার অন্তরের ভালবাসা শ্রদ্ধা দিয়া মানিয়া লইবে না, সে পরিবর্তনের কোন বিশেষ মূল্য নাই, কারণ সে পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত কাম্য বলিয়া মনে হইবে না, বা তাহাকে বহন করিবার শক্তিও অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে থাকিবে না। তাই শুনি সাবিত্রী বলিতেছে সতীশকে :

"তুমি বলবে সত্য হোক, মিথ্যে হোক, আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমিও সমাজ চাই, আমিও তাকে মানি। আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তাকে সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই তো সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন। ওগো, এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কোর না।"

তাই হয় নাই রমা-রমেশের মিলন, সাবিত্রী-সতীশের পরিণয়, কমললতা-শ্রীকান্তের ঘরবাঁধা ও পার্বতী-দেবদাসের প্রেমনিবেদন। অন্যদিকে দেখিতে পাই, অচলা ও কিরণময়ীর অবুদ্বুদ দুঃখ—উচ্ছৃঙ্খলতা বা পাপের পথে যে দুঃখ আছে তা শরৎচন্দ্র কোনদিনই অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি পাপীকে কোনদিন ঘৃণা করেন নাই, তাঁহার অফুরন্ত সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া তাহাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষত সারাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, এবং জগতের সহানুভূতি তাহাদের জন্য আহরণ করিয়া আনিতে চাহিয়াছেন। এক হিসাবে গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকাদের দোষ থাকিলেও যেমন তাহারা আমাদের সহানুভূতি ও অনুকম্পার আধার হইয়া দাঁড়ায়, আমাদের সমস্ত মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহাদের দুঃখ ও বিপর্যয়ে, শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাও ঠিক তেমনি ভাবে আকর্ষণ করে আমাদের মনকে, দ্রবীভূত করিয়া দেয় আমাদের হৃদয়কে তাহাদের অন্তরের বেদনায়, সে বেদনা যত কলুষজাতই হউক না কেন, যত বিভ্রান্তিতেই তাহার উৎপত্তি হউক না কেন। শরৎচন্দ্রের মনে একটি গূঢ়

উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে—এই বেদনার সংঘাতেই অনুষ্ঠিত হইবে যাহা কিছু পরিবর্তন, সামাজিক নির্মম বিধিবিধান সম্বন্ধে জোর করিয়া নয়—এই ছিল তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। কারণ তিনি মানবমনের দ্রবণীয়তায় যে সকল কল্যাণময় সামাজিক পরিবর্তনের মূল উৎস সে সম্বন্ধেও তাঁহার মনে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন, এই দুঃখ বহিবার শক্তি হইতেই আসে মানুষ হইবার শক্তি, এই অধ্যাত্মবিশ্বাসে ও আশাবাদে তিনি ইংরেজ কবি ব্রাউনিংএর একান্ত নিকট আত্মীয়। তাই শুনিতে পাই উপেন্দ্র বলিতেছেন সাবিত্রীকে :

"যাবে দিদি আমার সঙ্গে ? সতীশকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে—তা হলেই বা। এর চেয়ে কত বেশী দুঃখ কষ্ট যে ভগবান মানুষকে সইতে দিয়ে মানুষ করে তোলেন ভাই !"

আবার আশুবাবু কমলকে বলিতেছেন, "মনিকে আমি ক্ষমা করেছি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙ্গাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবে, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অনুমতি দিতে পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্বাদটুকু রেখে যাব দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি ভালবাসা—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।"

এই কথাগুলির ভিতরে এমন একটি সত্যের সুর বাজে, এমন একটি আন্তরিকতা আছে যে মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের প্রকৃত মতবাদ। সংসারের বিধিবিধানের বিরুদ্ধে যাইলে দুঃখ পাইতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া যে যাওয়া চলিবে না, সে প্রচেষ্টাকে কেউ বুঝিবে না বা তার ক্ষমা নাই তা নয়, বরঞ্চ এই দুঃখের ভিতর হইতেই আসিবে মুক্তি, আসিবে দিব্যদৃষ্টি, উদ্‌বুদ্ধ হইবে সমাজের বিবেকচেতনা। এই আশা লইয়াই শরৎচন্দ্র এত বেদনার চিত্র, নির্মম বিধি-বিধানের নিষ্পেষণের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, প্রতিবাদ কোন না কোন চরিত্রের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে কিন্তু জোর করিয়া সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে কোন সমস্যার সমাধান করিতে যান নাই, অন্তর্জাত বেদনাকেই সে কাজ করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই সত্যিকার পরিবর্তন আজ বাংলার সমাজ-জীবনে আস্তে আস্তে আসিয়াছে। আজ সাবিত্রী, কমললতা,রাজলক্ষ্মীর নামে সমাজ ছি-ছি করে না, পরন্তু এইসব নারীচরিত্রের মহীয়সী মহিমাটাই চোখে পড়ে বেশী, তাহাদের পতনের কাহিনীগুলি নয়। কমলের মতবাদকেও সমাজ গ্রহণ না করিলেও বুঝিতে শিখিয়াছে, যে কমল সংস্কার মানে না, ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না। শুধু বোঝে, ইহলোকে ও দেহের সুখ, সেই কমলেরও ক্ষোভ

ছিল, গ্লানি ছিল, দেহমন বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া আসিত। কিন্তু তাহার চরিত্রের জোর ছিল অসামান্য, তাই তাহার চরমপন্থী মতবাদের পোষক না হইয়াও তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল না হইয়া পারা যায় না।

শৈশব বিবাহবন্ধনের ভঙ্গুরতাকে লক্ষ্য করিয়া কমল বলিতেছে, "হা অদৃষ্ট! উনি যাবেন বিয়ে হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না কি?

আবার—

"সত্য যাবে ডুবে আর যে অনুষ্ঠানকে আমি মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওকে রাখব বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানী, সংসারে প্রাণ যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যা নয়।

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিনি। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?

এ কথার উত্তর কমলের সত্যিকারের প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধমতপোষক আশুবাবুও দিতে পারিলেন না; তাই মনোরমাকে কথার মোড় ঘুরাইয়া দিতে হইল।

যে বন্ধন বা অনুষ্ঠানের ভিতর হইতে প্রাণ চলিয়া গিয়াছে তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকার সার্থকতা কিছু নাই—এই চেতনা ধীরে ধীরে আজ বাংলার সমাজের বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চরিত্রহীন

কাজী আবদুল ওদুদ

চরিত্রহীন প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এর পঞ্চম সংস্করণে শরৎচন্দ্র এই ভূমিকাটি যোগ করেন :

> চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্পবয়সে। তারপর ওটা পড়ে ছিল। শেষ করবার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য-রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানাস্থানে নানা আকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।

চরিত্রহীন সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে ঢের। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই ভূমিকাটির দিকে কেউ যে তাকিয়েছেন, তা মনে হয় না। এই ভূমিকাটি কিন্তু খুব মূল্যবান ; তার কারণ, এতে চরিত্রহীন উপন্যাসখানির এক বিশেষ পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচয়টি এই যে, এটি মোটের উপর শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত রচনা।

এর অপরিণতি সহজেই চোখে পড়ে গল্পটির গাঁথুনির দিকে তাকালে। কাঁচা নাটুকে ভঙ্গিও এতে প্রচুর। কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এটি যখন প্রথম 'যমুনা' মাসিকপত্রে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে প্রায় তখন থেকেই পাঠকদের মনোযোগ এর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অর্থাৎ বঙ্কিমোত্তর বাংলা উপন্যাসে দুইখানি বই প্রভাববিস্তারের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য হয়েছে—একখানি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', অপরখানি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'। চরিত্রহীনের অপরিণতি, আর অসাধারণ প্রভাব, দুয়েরই কথা আমাদের ভাবতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, চরিত্রহীন তিনজন চরিত্রহীন আর একজন চরিত্রবানের কাহিনী ; সেই তিনজন চরিত্রহীন হচ্ছে সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী ; আর চরিত্রবান হচ্ছে উপেন্দ্র। এরা ভিন্ন আরো বহু চরিত্র এই উপন্যাসে আছে, তাদের মধ্যে সতীশের ভৃত্য বেহারী আর উপেন্দ্রের পত্নী সুরবালার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবু চরিত্রহীনকে মোটের উপর সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী আর উপেন্দ্রের কাহিনী বলা যেতে পারে।

গ্রন্থের নায়ক সতীশ মস্ত বড় জমিদারের ছেলে। বয়স বছর তেইশ, সুদর্শন, ব্যায়ামের দ্বারা গঠিত তার সুউন্নত বলিষ্ঠ শরীর সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এনট্রান্স পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি, সেজন্য কিছুমাত্র মাথাব্যথাও তার নেই। আখ্যায়িকার সূচনায় সে কলকাতায় এক মেসে থেকে হোমিও-প্যাথি পড়ছে, উদ্দেশ্য—গ্রামে গিয়ে একটি ভাল দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র ও হাসপাতাল খুলবে। তার সম্বন্ধে তার বন্ধু ও গুরু উপেন্দ্রের একটি মন্তব্য এই :

> রাগ পদার্থটি ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশী, প্রাণের মায়াটিও তেমনি পরিমাণে কম। এই কলিযুগে বাস করেও যাদের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সত্যযুগের মতোই থাকে এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাহিত বোধ থাকে না, তাদের বেঁচে থাকা না-থাকার উপর আমি ত বেশী আস্থা রাখিনে। সহ্য করতে পারাও যে একটা ক্ষমতা, অনাহূত সাহায্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও যে অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন, সেটা ও বোঝেই না। ও যেন সেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে বাংলা দেশে এসে জন্মেছে।

এ থেকে তার চরিত্রের অনেকখানি পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু সবখানি নয়। এই অসাধারণ অকপটতা, নির্ভীকতা আর হৃদয়ের প্রসারের সঙ্গে তাতে রয়েছে এক গভীর প্রেমপ্রীতির ক্ষুধা—প্রেমপ্রীতি পেয়ে ও দিয়ে সে যেন জীবনের পরম চরিতার্থতা লাভ করে। তার চরিত্রের এই দিকটা চরিত্রহীনকারের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

গল্পের সূচনায় যে মেসে তাকে আমরা পাই সেখানে চাকরেরা তার একান্ত ভক্ত তার দরাজ হাতের জন্য, আর বাবুদের কেউ কেউ তার উপর রীতিমতো অসন্তুষ্ট ঐ একই কারণে। মেসের ঝি সাবিত্রীর বয়স বছর বাইশ, বিধবা, কথা-বার্তায় চালচলনে ঝি-জাতীয় স্ত্রীলোকের মতো আদৌ নয়। সাবিত্রী মেসের সব বাবুরই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে, তারো মধ্যে সতীশবাবুর কাজ সে যে আরো একটু মন দিয়ে করে, তা সতীশও বোঝে। সতীশও অনেক সময় এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা বুদ্ধিমতী মার্জিতরুচি ঝির কথা একটু ভাবে; সে যে ঝি-জাতীয় স্ত্রীলোক—এ তার প্রত্যয় হয় না, কিন্তু সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেকে ঝি ভিন্ন আর কিছুই বলে না। সতীশ এই বয়সে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে। কিন্তু সেই বিদ্যা তার জন্য জুটিয়েছে এমন সব সঙ্গী যারা মদ্যপায়ী, এবং মদ্যপায়ী হলে আরো যেসব দোষ সাধারণতঃ ঘটে সেসব দোষেও দুষ্ট। সতীশ মাঝে

মাঝে মত্ত অবস্থায় মেসে ফেরে। কিন্তু সাবিত্রীর প্রভাবে সে মদ্যপান প্রায় ত্যাগ করে। বাসার ঝি হলেও নিজের অজ্ঞাতসারে সতীশ তাকে অনেকখানি সমীহ করে চলে। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর ব্যবহারেও মাঝে মাঝে এতখানি মাধুর্য প্রকাশ পায় যা সতীশকে অন্তরে অন্তরে বিচলিত না করে পারে না। এমনিভাবে বিচিত্র ছোটখাটো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সতীশ বুঝতে পারে, সে সাবিত্রীকে ভালবাসে। একটা ঝিকে ভালবাসা অতিশয় অসঙ্গত—এ চেতনা তাতে দেখা দেয়, কিন্তু মনকে সে বশে আনতে পারে না। সাবিত্রী সতীশকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। তাতে সতীশ ক্রুদ্ধ হয়ে সাবিত্রীকে বহু অপমানকর কথা বলে। সাবিত্রী সতীশকে স্পষ্টই বলে :

একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালি মাখিয়ো না।

সতীশকে এড়াবার জন্য সাবিত্রী কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়! সতীশ সাবিত্রীর খোঁজ না করে পারে না। সে সংবাদ পায়, সাবিত্রী সতীশের ইয়ার বিপিনবাবুর আশ্রিতা হয়েছে। সংবাদটি অবশ্য ভুল। কিন্তু সতীশ মর্মাহত হয়। শেষে সে মনকে বোঝায় সাবিত্রী তাকে একদিনের জন্যও ছলনা করেনি। বরং পুনঃ পুনঃ সতর্ক করেছে; শুভ কামনা করেছে। সাবিত্রীর স্মৃতি শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে হলো এক অমূল্য গোপন সম্পদ।

> ···সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পতিতার কোন কালিমাই ত সে মুখে নাই। গর্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, স্নেহে স্নিগ্ধ, সেই সংযত পরিহাস, সর্বোপরি তার সেই অকৃত্রিম সেবা। এমন সে তার এতখানি বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার আবরণটা লইয়া খেলা করিতে গিয়া যে আগুন বাহির হইয়া পড়িয়াছে ইহার দাহ হইতে কেমন করিয়া কোন পথে পলাইয়া আজ সে নিষ্কৃতি-লাভ করিবে! নিষ্কৃতিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অশ্রু সে দমন করিতে চাহিল না—এ অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না। অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ সে তাহার পরম দুঃখের মধ্যে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত বড় সুখের আস্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল তাহারই উদ্দেশে দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল।
>
> ···চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে মনে বলিল···ভগবান! কার হাত

দিয়ে তুমি কখন যে কাকে কি পাঠিয়ে দাও, কেউ বলতে পারে না। আজ তোমারি হুকুমে সাবিত্রী দাতা, আমি ভিক্ষুক। তাই সে ভাল হোক, মন্দ হোক, সে বিচার আর যে-ই করুক, আমি যেন না করি। আমার বুক থেকে সব জ্বালা সব বিদ্বেষ মুছে দাও—তার বিরুদ্ধে আমি যেন কৃতঘ্ন না হয়ে থাকি।

এরপর সতীশের পরিচয় হয় ব্যারিস্টার জ্যোতিষ রায় ও তার অনূঢ়া ভগিনী সরোজিনীর সঙ্গে—এরা সতীশের গুরু ও বন্ধু উপেন্দ্রের পরিচিত। সতীশের চালচলনে বিদেশিয়ানা আদৌ ছিল না, তবু তার দিকে সরোজিনী আকৃষ্ট হয়, সতীশের মনও সরোজিনীর দিকে কিছু ঝোঁকে। রায় পরিবারে সতীশ-সরোজিনীর বিয়ের কথা আলোচিত হতে থাকে। সরোজিনীর পাণি-প্রার্থী ব্যারিস্টার শশাঙ্কমোহন খোঁজ করে সাবিত্রী-সতীশের ব্যাপার জেনে জ্যোতিষকে জানায়। সতীশকে জিজ্ঞাসা করা হলে সতীশ অকপটে বলে :

···সাবিত্রী কে আমি তা জানিনে···তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সে উত্তর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে···তবে একথা খুবই সত্যি, সাবিত্রী যাই হোক, যদি নিজের ইচ্ছায় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম তাকে মাথায় করে রাখতুম।···যথার্থই আমি ভাল নই, যথার্থই আমার সঙ্গে কারো সংস্রব রাখা উচিত নয়···আমি ভেবে-ছিলুম, একদিন নিজেই সমস্ত কথা জানাব। কিন্তু কোনোদিন সে সুযোগ হলো না, সে সাহসও ছিল না। দোষ আমার। এ আমি প্রতিদিনই টের পাচ্ছিলাম, তাই মনে আমার সুখ ছিল না···অথচ আমি কোনো বিষয়ে কাউকে ঠকাইনি, ওসব আমি জানিওনে।

এতে সতীশ ও সরোজিনীর বিয়ের কথা যা চলছিল তা ভেঙে যায়; কিন্তু সরোজিনীর অনুরাগ টলে না।—পিতার মৃত্যুর পরে সতীশ প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়—দেশের বাড়িতে ফলাও করে ডিস্‌পেনসারি হাসপাতাল এসব খোলে, আর এক তান্ত্রিক গুরু ধরে পঞ্চমকারের সাধনায় রত হয়। বেহারী প্রমাদ গুনে সাবিত্রীর খোঁজে কাশীতে যায় ও তাকে নিয়ে আসে। সাবিত্রীর আগমনে সতীশের তান্ত্রিক সাধনা ঘুচে যায়। সতীশ পুরোপুরি জানতে পারে সাবিত্রী নিষ্পাপ, তার হৃদয়ে সতীশ ভিন্ন আর কারো স্থান নেই; সতীশ তার দিকে আকৃষ্ট না হয়, এইজন্যই সে মিথ্যা বদনাম নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। সতীশের নিউমোনিয়া হয়। সাবিত্রী চিন্তিত হয়ে উপেন্দ্রকে চিঠি দেয়।

এর মধ্যে উপেন্দ্রের সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেছে। যক্ষ্মায় তার স্ত্রী

সুরবালার মৃত্যু হয়েছে, সে নিজেও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। পুরীতে গিয়ে সে জানতে পায়, সতীশ যাকে ভালবাসে সেই সাবিত্রী বাল-বিধবা, তাকে তার ভগ্নীপতি বিয়ে করবার লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সাবিত্রী যখন টের পায় তার ভগ্নীপতির মতলব ভাল নয়, তখন তার আশ্রয় ত্যাগ করে সে মেসে চাকরি নেয়। সেই সূত্রে সতীশের সংস্পর্শে সে আসে ও তার একান্ত অনুরাগিণী হয়। কিন্তু তাকেও সে এড়িয়ে যায় ও জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করে। সাবিত্রীর চিঠি অনেক ঘুরে উপেন্দ্রের হাতে পৌঁছয়। ততদিনে সতীশ আরোগ্যলাভ করেছে। একদিন উপেন্দ্র ও সরোজিনী তার বাড়িতে এসে হাজির হলো। উপেন্দ্র সাবিত্রীকে নিজের ছোট বোন বলে সমাদরে গ্রহণ করলো। ঠিক হলো কালাশৌচ গত হলে সতীশ-সরোজিনীর বিয়ে হবে আর সাবিত্রী নেবে উপেন্দ্রের শুশ্রূষার ভার। তাদের যাবার দিনে সতীশ বেঁকে বসলো, ব'লে সে সাবিত্রীকে যেতে দেবে না, তাকে বিয়ে করবে। সাবিত্রী বললে: 'সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখে···এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করো না।'

উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় সতীশ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে: 'আমি ভাল নই, বহু দোষ, বহু অপরাধে অপরাধী—তবু কেমন করে সরোজিনী আমাকে গ্রহণ করবেন! বরঞ্চ তুমি আমাকে এ অধিকার দিয়ে যাও যেন কারও ভয়ে, কোনোও লোভে, কোনও দুর্বলতায় তাকে না অস্বীকার করি যে আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।'

উপেন্দ্র বললে—'সমস্ত জেনেই আমি তোদের এক করে দিয়ে গেলাম।'

সতীশ বললে—'আমাকে নিয়ে কি সরোজিনী সুখী হতে পারবেন?'

সাবিত্রী উপেন্দ্রকে বললে—'সে ভার আমি নিলুম দাদা, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

উপেন্দ্র বললে—'আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্য নয় সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভিতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।'

উপেন্দ্রের আদেশের প্রভাব সাবিত্রীর উপরে কেমন হলো সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য এই:

> শুনিয়া পাষাণ-মূর্তির মত সাবিত্রী নতনেত্রে বসিয়া রহিল। আজ সতীশ আর-একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশমাত্র অধিকার

রহিল না। তাহার ভাবনায় তাহার বাসনায় তাহার পরম সুখের পরম দুঃখের, তার দুঃসহ বেদনার আজ তাহার চোখের উপরেই সমাধি হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস পর্যন্ত সে পড়িতে দিল না। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতী যেমন করিয়া তাঁহার অন্তরের দুর্জয় অগ্ন্যুৎপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সতীশের পরিচয়ের সঙ্গেই আমরা সাবিত্রীর পরিচয় পেয়েছি। সেই সঙ্গে উপেন্দ্রেরও অনেকখানি পরিচয়, বিশেষ করে তার শেষ জীবনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জীবনের প্রথম দিকটার কথা আরো একটু জানতে হবে। উপেন্দ্র ছিল সতীশের চাইতে বয়সে কিছু বড়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—পশ্চিমের একটা বড় শহরে ওকালতি করতো। সতীশের বিরাট প্রাণ তার প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল—সে সতীশকে গ্রহণ করেছিল বন্ধুরূপে. কিন্তু সতীশ তাকে একই সঙ্গে জানতো বন্ধু ও গুরু বলে। যাকে বলা হয় নীতিনিষ্ঠ নির্দোষ জীবন, উপেন্দ্র ছিল তার পূজারি, সে-জীবনের কোনো ব্যত্যয় সহ্য করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তার স্ত্রী সুরবালা ছিল স্বামী-অন্তপ্রাণ, সংসার-অনভিজ্ঞা, শিশুর মতো সরল ; শাস্ত্রের কথা, দেবতা ও মহাপুরুষদের কথা সে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো—তার এই অতিশয় ঋজু চরিত্র ও ধর্ম-বিশ্বাস তার স্বামী পরম প্রেমে নিরীক্ষণ করতো। সতীশ যে কুসঙ্গে মিশে মদ্যপান আরম্ভ করেছে তা সে জানতো না, সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের সম্বন্ধের কথা তার মেসের এক ভদ্রলোক তাকে জানায়। উপেন্দ্র প্রথমে সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু হঠাৎ একদিন সস্ত্রীক সতীশের বাসায় উপস্থিত হয়ে সে একজন ভদ্রগোছের যুবতী মেয়েকে দেখতে পায়। সতীশের পতন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে তৎক্ষণাৎ সে তার বাসা ত্যাগ করে। বহুদিন পরে অবশ্য সাবিত্রীর সত্যকার পরিচয় সে পায় আর তার অসাধারণ চরিত্রের জন্য তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়। উপেন্দ্রের বাল্যবন্ধু ছিল হারাণ। হারাণ দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে অন্তিম সময়ে উপেন্দ্রকে সংবাদ পাঠায়। উপেন্দ্র সতীশকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় হারাণের ভাঙা বাড়িতে উপস্থিত হয়। হারাণের চিকিৎসার ত্রুটি হয় না, কিন্তু হারাণ তার ভাঙা বাড়ি বৃদ্ধা মাতা আর অসাধারণ স্ত্রী কিরণময়ীর ভার উপেন্দ্রের উপরে রেখে পরলোক যাত্রা করে।

এই কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তার প্রথম জীবনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এইভাবে :

ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামিভবনে আসিয়াছিল। শ্বশ্রূ অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর-যত্ন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষাদান দিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে গুরুশিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। ···যৌবনে, অজ্ঞাতে, নিরহঙ্কারে দেহের কূল উপকূল যখন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে স্বামীর সহিত সূক্ষ্ম বিচার লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল। কেন যে তাহার দৈহিক নির্যাতন শেষ হইল, কেন যে সে গৃহিণী কর্ত্রী হইয়া উঠিল, একথা সে একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল না। স্বামী বলিতেন সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং আর সমস্ত উপলক্ষ। দয়া, ধর্ম, পুণ্য, এ সমস্তই ওই উপলক্ষ। হয় স্বদেশের না হয় বিদেশের—কি উপায়ে যে সুখের সমষ্টি বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়—ইহাই জীবনের কর্ম, এবং জানিয়াই হোক, না জানিয়াই হোক, এই চেষ্টাতেই জীবের সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এইটিই একমাত্র তুলাদণ্ড, যাহাতে ফেলিয়া সমস্ত ভালমন্দই ওজন করিয়া দিতে পারা যায়। নিজের কি পরের, সেদিকে চাহিও না। কিরণ, তুমি কেবল এইটিই বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সুখের মাত্রা বাড়ে কি না।

পণ্ডিত স্বামীর তত্ত্বাবধানে কিরণময়ীর পড়াশুনা ও বুদ্ধির চর্চা অনেক হয়েছিল, হয়নি হৃদয়ের চর্চা। সে ঈশ্বর পরকাল এসব মানতো না, মানতো ইহকাল—ইহকালের সুখসুবিধা। তার স্বামীর চিকিৎসা করেছিল এক নতুন-পাশ-করা ডাক্তার। কিরণময়ীর রূপলাবণ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হতে তার দেরি হয় নি, কিরণময়ীও তার আসক্তি লালন করে চলায় কোনো দোষ দেখেনি। তার পতন আসন্ন হয়ে এসেছিল, এমন সময়ে তাদের বাড়িতে এলো উপেন্দ্র ও সতীশ। হারাণের সামান্য যা কিছু ছিল সব উপেন্দ্রর নামে উইল করে দেবার ইচ্ছা হারাণ জ্ঞাপন করলো। আড়ালে থেকে একথা শুনে উপেনকে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে কিরণময়ীর বাধলো না। স্বামীর এমন মুমূর্ষু অবস্থায় তার সাজসজ্জার পারিপাট্য দেখে সতীশ বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু উপেন্দ্র তার ক্ষোভের কারণ বুঝে বললো, কিরণময়ীর যাতে ক্ষতি হয় এমন কিছুই সে করবে না।

হারাণের অন্তিমকালে কিরণময়ী যে প্রাণঢালা সেবা করেছিল তা দেখে সতীশ কিরণময়ীর মহাভক্ত হয়ে উঠেছিল, উপেন্দ্রও বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু কিরণময়ীর এমন পরিবর্তনের মূলে ছিল উপেন্দ্র, আর উপেন্দ্র ও সুরবালার অপূর্ব দাম্পত্য-প্রেমের কাহিনী ; সতীশ তাকে সেইসব কাহিনী বলেছিল। উপেন্দ্রকে দেখেই কিরণময়ী মুগ্ধ হয়েছিল, সেই সঙ্গে বুঝেছিল উপেন্দ্র অপ্রাপ্য, তার পবিত্রতা বজ্রের মতো কঠোর। কিন্তু উপেন্দ্র ও সুরবালার প্রেমের সংবাদ তাকে প্রেরণা দিয়েছিল নতুন করে স্বামীকে ভালবাসার সাধনায়। বিধবা হবার পরে একদিন সে সুরবালাকে দেখে এলো, সুরবালার সরল গভীর প্রত্যয় তার মতো পণ্ডিতারও অন্তর স্পর্শ করলো। সেই দিনই ফিরে এসে সে উপেন্দ্রের কাছে অকপটে ব্যক্ত করলো উপেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা কেমন করে তার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে। এই অনাথ পরিবারের জন্য একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করে উপেন্দ্র পশ্চিমে ফিরলো তার আশ্রিত একান্ত স্নেহাস্পদ পিসতুত ভাই সদ্য বি. এ. ফেল এবং পুনঃপরীক্ষার্থী দিবাকরকে কিরণময়ীর তত্ত্বাবধানে রেখে।

কিরণময়ী ও অঘোরময়ী দুইজনেরই প্রচুর আদরযত্ন পেয়ে মুখচোরা দিবাকরের জীবন যেন বদলে গেল। সে দুই-একটি মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা আরম্ভ করলো। সেসব লেখা কিরণময়ীর চোখে পড়তে দেরি হলো না, কিন্তু তার সমাদর না পেয়ে পেলো উপহাস। এই সূত্রে কিরণময়ী তাকে জানালো কেমন করে সত্যকার সাহিত্য জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করে, অপরের ধার করা ভাব থেকে কদাচ নয়। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলে কিরণময়ী মন্তব্য করলো :

> সন্তানধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা···এইজন্য নারীর বাল্যরূপ যদি বা মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাকে মাতাল করে না। আবার একদিন তার সন্তানধারণের বয়স পার হয়ে যায়, তখনও ঠিক তাই···শুধু নারী নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

এসব আলোচনা বুঝবার ক্ষমতা দিবাকরের ছিল না ; তবু মনে তার নতুন পুলক জাগলো। বিশেষ করে, কিরণময়ীর বিব্রত-করা হাসি-তামাসা, সান্নিধ্য, তার ভিতরে যেন এক নতুন চেতনার উন্মেষ করলো।

অঘোরময়ী কিরণময়ী ও দিবাকরের এত মেলামেশায় গল্পগুজবে খুব

অসন্তুষ্ট হয়েছিল ; বিশেষ করে দিবাকরের দ্বারা তার আর কোন কাজই হচ্ছিল না সেইজন্য। হঠাৎ একদিন উপেন্দ্র এসে উপস্থিত হলো ; তার কাছে আক্রহীন ভাষায় কিরণময়ীর নামে অভিযোগ করতে অঘোরময়ীর রুচি বা বুদ্ধিতে একটুও বাধলো না। কিরণময়ী এসব কথার কোনো প্রতিবাদ করলো না, নীরবে উপেন্দ্রের জন্য খাবার প্রস্তুত করলো। উপেন্দ্র সে খাবার খেলে না, কিরণময়ীকে বললে, 'আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।' কিরণময়ীও অবশ্য কড়া প্রত্যুত্তর করতে ছাড়লো না, বললে : '······তোমার রাগ বল, ঘৃণা বল, ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত? কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা তুমিও তাই।······কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলুম তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখনি! নিজের বেলায় বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশি মিঠে লাগে ঠাকুরপো?' উপেন্দ্র দিবাকরকে হুকুম করলে তখনই বাক্স-বিছানা বেঁধে তার সঙ্গে যেতে। অঘোরময়ীর অনুনয়ে সে রাত্রির মতো ও বাড়িতে থাকবার অনুমতি সে পেলে। উপেন্দ্র যখন এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন কিরণময়ী অপরের অগোচরে তার পা জড়িয়ে ধরে বললে—'আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে! সমস্ত মিথ্যে। ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি ভাবতে পারলে!' 'চুপ করুন! অনেক অভিনয় করেছেন—আর না।'—বলে অসহ্য ঘৃণায় উপেন্দ্র তার মাথাটা সজোরে ঠেলে দিলে, সে পা ছেড়ে দিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল। 'নাস্তিক! অপবিত্র, ভাইপার' বলে উপেন্দ্র দৃক্‌পাত না করে দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল।—সেই রাত্রি ভোর হবার পূর্বেই অপমানে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানহারা কিরণময়ী দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দাসীর সহায়তায় আরাকান-যাত্রী জাহাজে গিয়ে উঠল।

দিবাকর কিরণময়ীর অনুবর্তী হয়েছিল একপ্রকার দিশাহারা অবস্থায়। কিন্তু জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। দুই চক্ষে তার ধারা বইল।

কয়েকদিন ধরে আদর করে ধমকিয়ে প্রলুব্ধ করে কিরণময়ী দিবাকরকে বশ করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। শেষে সে দিবাকরকে বললে, দেশে ফিরে যাওয়াই তার উচিত। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রের কথা উঠলো। কথায় কথায় দিবাকর বললে : 'কাল তুমি বললে উপেনদার মাথা হেঁট করে দেবে। সে রাত্রে তোমাদের কি কথা যে হয়েছিল, কোন্ রাগে যে এ কথা বলেছিলে তা এখনো আমি ভেবে পাই নে। হেতু তোমার হয়ত

আছেই, কিন্তু সে কারণ যাই হোক, ও মাথা হেঁট করার দুঃখ যে কত বড় তা যদি জানতে অমন কথা মুখেও আনতে না। তাছাড়া ওসব মাথা যদি হেঁট হয়েই যায় তবে কোনদিন নিজেদের মাথা তুলব আমরা কোনদিকে চেয়ে?' উপেন্দ্রের মহিমাময় চরিত্রের প্রতি দিবাকরের সীমাহীন শ্রদ্ধা কিরণময়ীর অন্তরে যেন এক বিপ্লব ঘটালো। উপেন্দ্রের প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা বোধ করে কিরণময়ী নিজের জীবনের পথ ফিরে পেলো। দিবাকরকে রক্ষা করা এখন থেকে তার এক কাজ হলো।

আরাকানে কিরণময়ীকে যেমন যুঝতে হলো অভাব-অনটনের সঙ্গে, তেমনি দিবাকরের নবজাগ্রত কামনার সঙ্গে। তার লাঞ্ছনা যেদিন চরমে পৌঁছলো সেদিন সতীশ হাজির হলো তাদের দুজনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তার মুখে তারা শুনলো সুরবালা গত হয়েছে, উপেন্দ্র কলকাতায় মরণাপন্ন অসুস্থ।

তারা কলকাতায় পৌঁছলে দেখা গেল কিরণময়ীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। পালিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নানরত মেয়ে-পুরুষদের সে বলতে লাগলো :

······ভগবান কি সত্যি আছেন? তোমরা কি তাঁকে ভাবতে পার? ভক্তি করতে পার? আমি পারিনে কেন? সুদীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি খুলে কপালে পিঠে সর্বত্র ছড়িয়ে সে উপেন্দ্রের কামরায় হাজির হয়ে বললে ;

······সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে। সেই আমার গুরু। সেই ত আমাকে বলেছিল ভগবান আছেন। তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হত···

দিবাকরকে দেখে বললে :

তুমি অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ ঠাকুরপো, তোমাকে এরা কি লজ্জা দিচ্চে···

উপেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললে :

ওকে তোমরা দুঃখ দিও না ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে সে সত্য একদিনের জন্য ভাঙিনি···আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো। একটু খাবে! হয়ত ভাল হয়ে যাবে।

শেষ ঘনিয়ে আসছে দেখে উপেন্দ্র সতীশকে বললে : চোখে চোখে রাখিস ভাই যতদিনে না আবার প্রকৃতিস্থ হন।

কিন্তু তোর ভয় নেই সতীশ, ওঁর অন্তরের আঘাত যে কত দুঃসহ হয়েছে সে উপলব্ধি করবার শক্তি নেই আমাদের, কিন্তু সে যত বড় নিদারুণ হোক, অতবড় বুদ্ধিকে চিরদিন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না।

'চরিত্রহীনে'র প্রধান চরিত্রগুলোর ও কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পেলাম তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে, ঘটনার বিন্যাসে সংলাপে ভাবালুতা যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে এতে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অন্যান্য রচনায় প্রেমতন্ময়তার বা প্রেমে আত্মবলিদানের যেমন মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, এতেও তাঁর সেই চিন্তা প্রবল—হয়তো প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। সাবিত্রীর আত্মবলিদানের দিকে কী গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছেন তা আমরা দেখেছি ; কিন্তু শুধু সাবিত্রী নয়, সুরবালা, উপেন্দ্র, বেহারী, সতীশ —প্রত্যেকেরই আত্মোৎসর্গপরায়ণ ভালবাসা তিনি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। কিরণময়ীর জীবন প্রচলিত আদর্শের প্রতি বিরূপতায় ও সুখান্বেষণে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু শেষে সেও উপলব্ধি করলো, উপেন্দ্রের প্রতি তার মনে যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল, তার বুদ্ধির অহঙ্কার ও নাস্তিক্য নয়, সেই আত্মবিলোপপরায়ণ প্রেমই তার জীবনের পথ। কিন্তু যত ভুল সে করেছিল তার দুঃসহ গ্লানি তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটালো।

কিন্তু স্পষ্ট বা প্রবল চিন্তার সাহিত্যে যতটা মূল্য, তার চাইতে বেশি মূল্য চরিত্রসৃষ্টির। সেই চরিত্রসৃষ্টি 'চরিত্রহীনে' অনেক ক্ষেত্রেই সুসম্পন্ন হয়নি। চরিত্রগুলোর মুখে কথা অনেক বসানো হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বর্ণনাও কম দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেই সব কথা বা বর্ণনা চরিত্রপ্রকাশক তেমনি হয়নি। সতীশের কথা ভাবা যাক। লেখক দেখাচ্ছেন, সাবিত্রীর প্রতি তার অন্তরে যে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে তা গভীর, কতখানি গভীর তা নিজেও সে জানে না। অথচ সাবিত্রীর তরফ থেকে কিছু বাধা বা উপেক্ষা পেয়ে যত অপমানকর কথায় সে সাবিত্রীকে বিঁধলো তাতে এই পরিচয়ই কি পাওয়া গেল না যে—ভালবাসা তার অন্তরে যত জায়গা পেয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি জায়গা পেয়েছে এক ধরনের অহমিকা ? হয়তো বলা হবে—এই দুর্বলতা দিয়েই তো তাকে গড়া হয়েছে, তার বন্ধু ও গুরু উপেন্দ্রের উপর রাগ করেও সে কিরণময়ীর কাছে যা-তা বলেছিল। কিন্তু উপেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সে যত কটু কথা উচ্চারণ করেছিল তার চাইতে অনেক বেশি আপত্তিকর কথা সে সাবিত্রীকে বলেছিল। তা ছাড়া সতীশকে লেখক যতগুলো উপাদান দিয়ে গড়েছেন অথবা যতগুলো উপাদান তিনি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেসবের মধ্যে বড় করে দেখেছেন তার ভালবাসার ক্ষমতা। গঙ্গার ঘাটে যেদিন সে সাবিত্রীকে স্মরণ করে সত্যকার শান্তি পেলে সেদিন তাতে সেই অসাধারণ ভালবাসাই আমরা দেখি, আর সাঁওতাল পরগনায় জ্যোতিষবাবুদের বাড়িতে যেদিন সে অকপটে স্বীকার করলো, সাবিত্রী নিজের থেকে চলে না গেলে সে কোনদিন তাকে ত্যাগ

করতো না, সেদিনও সেই পরিচয়ই আমরা পাই। অথচ এতখানি ভালবাসার ক্ষমতার সঙ্গে লেখক তাতে দেখিয়েছেন এক অত্যন্ত হীন ধরনের অহমিকা। সাবিত্রীর প্রতি এমন ভালবাসার সঙ্গেই তার মনে যে সরোজিনী স্থান পেলো, এতেও তার চরিত্র ঠিক প্রকাশিত হয়নি। হয়তো বলা হবে, জীবনে তআমরা এমন বৈচিত্র্য বা অদ্ভুতত্ব দেখি। কিন্তু জীবন ও শিল্পের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। জীবনে অনেককেই আমরা ঠিক বুঝি না বা জানি না, কিন্তু শিল্পী যাদের আমাদের সামনে দাঁড় করান তাদের বোঝাবার জন্যই দাঁড় করান। তাদের মধ্যেও বৈচিত্র্য দুর্জ্ঞেয়তা এসব থাকতে পারে, থাকেও, কিন্তু এমন ইঙ্গিতও শিল্পীকে দিতে হয় যাতে তাঁর অত্যন্ত জটিল সৃষ্টিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সামনে অনেকখানি স্পষ্ট চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। সতীশ তার অপূর্ব প্রেম আর অদ্ভুত অহংকার ও খেয়ালিপনা নিয়ে তেমন স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ায় না। হয়তো সে দাঁড়ায় মোটের উপর এক সদাশয় কিন্তু অনেকখানি খেয়ালী স্থূল প্রকৃতির তরুণরূপে; কিন্তু লেখক তো তাকে ঠিক সেই রূপ দিতে চান নি। তার ভিতরে এমন একটা হৃদয় মাঝে মাঝে তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন যাতে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে সে খেয়ালী, এমনকি চরিত্র-হীন হলেও আসলে তার চরিত্র উচ্চাঙ্গের। এ-ই লেখকের বক্তব্য। কিন্তু তাঁর সেই বক্তব্য আচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর চিত্রে। তাঁর যে একটি প্রধান চিন্তা—মানুষের অন্তর জিনিসটা অনন্ত, অর্থাৎ স্ববিরোধিতার আর অন্ত তাতে নেই,—সেইটি তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে একটি বিঘ্ন ঘটিয়েছিল মনে হয়।

তেমনি উপেন্দ্রের ব্যাপারেও। উপেন্দ্রকে যে কত মহৎ করে লেখক অঙ্কিত করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকান যাত্রার দৃশ্যে। তার মহত্ত্বের সামনে নতশির হয়ে দিবাকর তো উপস্থিত বিপদ কাটিয়ে উঠলোই, কিরণময়ীও সেই মহত্ত্বের সামনে নতশির হয়ে ঘোর দুর্দিনে পথ পেল। কিন্তু সেই উপেন্দ্রকে আগেকার অনেক দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে অনেকখানি অসহিষ্ণু নীতিবাদী। যত সহজে কিরণময়ীকে সে বলতে পারলো "আপনার ছোঁওয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে", যে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব তাতে আরোপ করা হয়েছে তার অধিকারীর পক্ষে তেমন উক্তি অসম্ভব, কেননা তা যেমন অভদ্র তেমনি অন্যায়। এত বড় একটা অন্যায় যে তার দ্বারা সংঘটিত হলো সে চেতনাও তাতে যোগ্যভাবে জাগেনি। এখানেও সেই 'মন জিনিসটা অনন্ত তত্ত্বের পরিচয় অর্থাৎ মনের অনন্ত স্ববিরোধিতার পরিচয়। কিন্তু জীবনে এটি বড় সত্য হলেও আর্টে এর প্রয়োগে সাবধান হতে হয়, কেননা, আর্টে চরিত্র চাইই, নইলে আর্টের সৃষ্টি অনেকখানি অর্থহীন হয়।

এ সম্পর্কে কবিগুরুর কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি। সাহিত্যে যেখানে সত্যিকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখতে দেখা যায় কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি। কেউ বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন···তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

বেহারী, সুরবালা, সাবিত্রী—এদের চরিত্র মোটের উপর সুস্পষ্ট হয়েছে, বোধহয় তার কারণ, এদের চরিত্রে জটিলতা নেই। বেহারী ও সুরবালার চরিত্র জটিল তো নয়ই, সাবিত্রীর চরিত্রও জটিল নয়, কেননা তার ভিতরে যেমন রয়েছে প্রেম-প্রীতি-উন্মুখমন, তেমনি সেই মন পবিত্রতা-অভিসারী—সেই পবিত্রতা তার জীবনে যে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কেননা, অপরের লোলুপ দৃষ্টি তার উপরে পড়েছিল, সেই দৃষ্টি তার উপরে পড়তে সে খানিকটা দিয়েও-ছিল, এতেই সে নিজেকে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার অযোগ্য মনে করে—যদিও সতীশকে ভালবেসেই সে জীবনের স্বাদ পায়। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সাবিত্রীর—এবং শরৎচন্দ্রের আরো অনেক নায়িকার—মনের এ দ্বন্দ্বে দেখেছেন এক ট্র্যাজিডি। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ট্র্যাজিডি-জাতীয় হলেও পুরো ট্র্যাজিডি নয়, একে বলা যায় কিঞ্চিৎ ভাগ্যবিড়ম্বনা—টমাস হার্ডি যাকে বলেছেন life's little ironies, সেই জাতীয় ব্যাপার। অভয়া মনের বলে এই ভাগ্যবিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠেছিল, রাজলক্ষ্মীকে কাটিয়ে উঠতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল; কাজেই শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের জীবনেও এই দ্বন্দ্ব ঠিক ট্র্যাজিডির বা বিড়ম্বনার রূপ নেয়নি, যে রূপ নিয়েছিল ট্র্যাজিডির চাইতে সে সব অনেক ছোটখাটো ব্যাপার। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের এক বিশেষ স্তরে বিশেষ কালে নারীদের জীবনে এই বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছিল, তারই নিপুণ ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। দ্বন্দ্বে এমন কিছু চিরন্তনতা বা বিরাটত্ব নেই—ট্র্যাজিডিতে কিন্তু চিরন্তনতা বা বিরাটত্ব অপরিহার্য।

বেহারী সুরবালা সাবিত্রী—এদের সাধু চরিত্র করে আঁকা হয়েছে তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এরা কি মহৎ চরিত্র? অর্থাৎ শিল্পে মহৎ সৃষ্টি? এদের সুন্দর হৃদয় আমাদের খুশী করে; কিন্তু শিল্পে মহৎ তাই যা শুধু হৃদয়ধর্মে মহৎ নয়, মনোধর্মেও মহৎ। এদের কি মনোধর্মে মহৎ বলা যায়? আমাদের ধারণা—যায় না।

বেহারী বা সুরবালার মধ্যে কোনো মহৎ, অর্থাৎ বৃহৎ মন যে নেই তা তো স্পষ্ট, সাবিত্রীর বহু দুঃখভোগের ভিতর দিয়েও কোনো মহৎ মনের

অর্থাৎ মহৎ মননশক্তির জন্ম হয়নি। একটি অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা তার লাভ হয়েছে, তার নির্লোভতাও চমৎকার, কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে প্রাদেশিক বেশি, সার্বভৌমিক কম। প্রাদেশিক বেশি বলেই তার ধারণা—"সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই তো সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখে।" 'চরিত্রহীনে' কিছু পরিমাণে মহৎ চরিত্র অর্থাৎ মহৎ সৃষ্টি বলা যায় কিরণময়ীকে।

চরিত্রহীনের চারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে মাত্র সাবিত্রী অনেকখানি সু-অঙ্কিত। কিন্তু তেমন সু-অঙ্কিত না হয়েও কিরণময়ী একটি মহৎ বা অসাধারণ চরিত্র হয়েছে। অসাধারণভাবে বঞ্চিত তার জীবন, সেই সঙ্গে অসাধারণ রূপ-যৌবনের আর অসাধারণ মস্তিষ্কশক্তিরও সে অধিকারিণী। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার মনে জাগা স্বাভাবিক; কিন্তু তার এত ব্যর্থতা ও বিদ্রোহের মধ্যেও ঘুমিয়েছিল প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী। সেই নারী প্রথম জেগে উঠল আর রূঢ় আঘাত খেলো অনঙ্গ ডাক্তারের সংস্পর্শে এসে; কিন্তু তারপর অনেকখানি সার্থক হলো উপেন্দ্রকে দেখে। দিবাকরের সঙ্গে তার যে সব আলাপ-আলোচনা রং-তামাসা, তা কিছু পরিমাণে বঞ্চিত জীবনের অজানিত দাহ। কিন্তু দিবাকরকে নিয়ে তার আরাকান যাত্রাকে কী বলা হবে? তা কি শুধু উপেন্দ্রের উপরে প্রতিশোধ? খানিকটা হয়তো প্রতিশোধ, কিন্তু সবটা নয়। তার পরিচয় রয়েছে আরাকানযাত্রী জাহাজে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজন সম্বন্ধে দিবাকরের সঙ্গে তার আলোচনায়। দিবাকরকে পরে সে যত বড় নাবালক দেখলো ততটা আশঙ্কা হয়তো আগে তার হয়নি। যাক, শেষে উপেন্দ্রের প্রতি তার শ্রদ্ধা ফিরে পেয়ে সে পথ পেলো এবং সে-পথে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলো। কিন্তু দেহটাকে বাঁচাবার জন্য তার, অথবা শরৎচন্দ্রের, যে উৎকণ্ঠা অনেকেই তাকে অদ্ভুত ভেবেছেন, আমরাও তার বেশি আর কিছু ভাবতে উৎসাহ বোধ করি না; শরৎচন্দ্র বলেছেন, তাঁর চরিত্রগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব থেকে নেওয়া। তাঁর কথা অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তাঁকে কল্পনা দিয়ে যে অবশিষ্ট দশভাগ পূরোতে হয়েছে সেই ফাঁক দিয়ে দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে এই অদ্ভুত সংস্কার তাঁর অনেক রচনায় অশোভনভাবে মাথা জাগিয়েছে। দেহের পবিত্রতার জন্য এমন উৎকণ্ঠা সাবিত্রীতে অবশ্য শোভন, কিন্তু কিরণময়ীতে নয়, কেননা তার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। তাই এক কিরণময়ীর মধ্যে আমরা দুটি মানুষকে পাচ্ছি—বিদ্রোহী কিরণময়ী আর প্রেম-নিষ্ঠ কিরণময়ী। শুধু সেইটিই অবশ্য আপত্তিকর নয়। আপত্তিকর ব্যাপার এইখানে এইটি যে এই দুয়ের মধ্যে কোনো যোগ ঘটে নি। বিদ্রোহী

কিরণময়ীই অবশ্য অনেক বেশি প্রাণবন্ত ; তার চিন্তা ও বাণী আমাদের অনেকখানি সচেতন করে তোলে। বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'চরিত্রহীন' বাংলা সাহিত্যে একখানি স্মরণীয় উপন্যাস হয়েছে এই বিদ্রোহী কিরণময়ীর গুণে। 'চরিত্রহীন' যে আমাদের একালের সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার অনেকটা কারণ কিরণময়ী, সতীশ, সাবিত্রী—এর এই তিনটি দোষযুক্ত অথচ শক্তিশালী চরিত্র। কিন্তু শুধু এই প্রধান চরিত্রগুলোই নয়, এর নামটিও অনেকখানি এর প্রভাবের মূলে। এই নামকরণের ভিতরে যে একটি সবল বিদ্রোহের, একটি 'ডোন্‌ট কেয়ারে'র ভাব আছে সেটি পাঠক-সাধারণকে স্পর্শ না করে পারেনি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, সত্যকার কোনো বিদ্রোহ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তা বা জীবনাদর্শ এর দ্বারা প্রচারিত হয়নি। কিরণময়ীকে—অর্থাৎ প্রথম দিককার কিরণময়ীকে—এক বিদ্রোহের মূর্তি মনে হলেও আসলে সে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মূর্তি, আর তিন প্রধান চরিত্রহীনের ভিতর দিয়ে মোটের উপরে কী কথা লেখক বলতে চেষ্টা করেছেন তা ব্যক্ত হয়েছে বইয়ের শেষের দিকে কিরণময়ীর প্রতি সতীশের এই উক্তিতে :

> এ কি সত্যযুগ যে, পৃথিবী-শুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাকবে ? এ হলো কলিকাল, অন্যায় অকাজ ত লোকে করবেই ! তার কে আবার জমা-খরচ খতিয়ে বসে আছে ! আমার উল্টো বিচার, তা ভালই বল আর মন্দই বল বৌঠান। আমি দেখি কে কি কাজ করেছে। হারাণদার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্বামী-সেবা ; সে তো আমিই চোখে দেখেছি। সেই তুমি হবে অসতী ! আমি মরে গেলেও এ বিশ্বাস করবো না।······

আগাগোড়াই শরৎচন্দ্র প্রচার করতে বা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন গভীর প্রেম-প্রীতি, গভীর সমবেদনার বাণী। 'শেষ প্রশ্ন' এবং 'পথের দাবী'তেও তিনি অবশ্য কিছু বিদ্রোহ প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চিন্তা

নেপাল মজুমদার

১। বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব

মহান শিল্পী ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মে দেশের এবং বিশ্বের সেই বিশেষ যুগের প্রধান প্রধান বিরোধ-সংঘাতগুলি প্রতিফলিত না হয়েই পারে না, এবং এ বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্যে অনিবার্যভাবে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রগতির শক্তিরই জয়ধ্বনি শোনা যায়, অন্তত তার সপক্ষে তাঁর আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়। এইসব বিরোধ-সংঘাত এবং জাতীয় ও মানব-নিগ্রহের আত্যন্তিক বেদনা যে-সব শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মে যতখানি তীব্র ও মর্মস্পর্শী হয়েছে,--এই কাজ যিনি যতখানি বাস্তবানুগ ও নিপুণ শৈল্পিক রীতির সাহায্যে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তিনি ততখানি সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর সমাদর ও জনপ্রিয়তা অসাধারণ না-হয়েই পারে না।

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের জাতীয় ও সমাজ-আর্থনীতিক জীবনে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী শক্তির এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশের সামন্ততান্ত্রিক এবং উদীয়মান পুঁজিবাদী শক্তির স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত (যদিও তা সীমাবদ্ধ আকারে) থাকলেও এই ত্রয়ী শক্তি মিলিতভাবেই দেশকে শোষণ করে এসেছে। কিন্তু তবুও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনটাই ছিল সবচেয়ে প্রবল এবং ভয়াবহ। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই ছিল দেশের প্রধানতম শত্রু। তাই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রশ্নটাই সেদিন ছিল প্রধানতম প্রশ্ন। এই ছিল ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা, এই ছিল ইতি-হাসের অমোঘ নির্দেশ। মহৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকরা ইতিহাসের এই আহ্বানে সাড়া না-দিয়ে পারেন না। তাঁরা তাঁদের সৃজনকর্মের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং পরাধীনতার গ্লানি, অপমান ও বেদনাবোধটা সুতীব্র করে তুলতে প্রয়াসী হন। সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও পীড়ন-নির্যাতনের (যা সনাতনী হিন্দুসমাজের নামে চলে আসছিল) বিরুদ্ধেও তাঁরা সংগ্রাম পরিচালনা করে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে উজ্জীবিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। কেননা ভারতবর্ষের মত দেশে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামও তীব্র ও প্রবল হতে বাধ্য।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই নিরিখে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের কয়জন কৃতী

সাহিত্যিককে আমরা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করতে পারব?—কয়জন এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন?

উনিশ শতকে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের পুরোধাদের চিন্তায় ও সাহিত্যকর্মে নিঃসন্দেহে এই বেদনা-বোধ ও চেতনা কিছুটা কাজ করেছে কিন্তু তা তেমন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ রূপ নিতে পারেনি—অন্তত তা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামচেতনায় রূপ নিতে পারেনি। তার ঐতিহাসিক ও বাস্তবসংগত কারণও আমাদের অজানা নয়। আমাদের দেশের সেই সময়কার বিশেষ বাস্তব অবস্থায় ঐ রূপ নেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। আমাদের লেখক, শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীরা শিল্পসাহিত্য ও নাট্য-আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলতে চেয়েছেন, অপরদিকে তেমনি দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমকে উদ্বোধিত করে তার একটা দৃঢ় রূপ দিতে চেয়েছেন, যেটা ছিল পরবর্তীকালের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

কিন্তু পরবর্তীকালে,—বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীতে যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ক্রমেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম-সংঘর্ষে রূপ নিতে থাকে, তখন বাংলা সাহিত্যের কয়জন শিল্পী-সাহিত্যিককে আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা সাফল্যলাভ করতে দেখি? ইতিহাসের বা দেশের আহ্বানে কয়জনই বা সাড়া দিয়েছেন?

বিস্ময়ের কথা, এই কালে যে কয়জন লেখক-শিল্পী সবচেয়ে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁরাই দেখি ইতিহাস-নির্দেশিত এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছেন। এই ব্যাপারে প্রথমেই যে কয়জন সাহিত্যরথী-মহারথীর কথা মনে আসে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ও সত্যেন দত্ত। এই কয়জনের চিন্তাভাবনায় ও সৃষ্টিকর্মে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ- ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। এঁদের সাহিত্যকর্মে স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আবেগ-উত্তেজনা ও আকুতি যতখানি তীব্র ও সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এমনটি অন্যদের ক্ষেত্রে হয়েছে কিনা সন্দেহ। শুধু চিন্তা-ভাবনায় ও সাহিত্যকর্মেই নয়,—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এঁরা ব্যক্তিগতভাবে যতখানি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এমনটি বাঙলা সাহিত্যের অন্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদমূলক শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নাটক রচনা করে আরও অনেকে খ্যাত হয়েছেন বটে, তবে

তাঁরা কেউ দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে এমন প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। অথচ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, এই কয়জনই রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন নি। সাহিত্য ও শিল্পসাধনার পথে অগ্রসর হয়েই তাঁরা রাজনৈতিক সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। আর সেই সত্যের জন্য তাঁরা সংগ্রামও করেছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কতখানি যুক্ত ছিলেন, কত গভীরভাবে তিনি এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, অন্যত্র আমরা তার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি। (লেখকের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' পাঁচ খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চিন্তা ও ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ কিংবা আলোচনা এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে যে সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। এর কতকগুলো অসুবিধাও রয়ে গেছে। কেননা, আজও পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্য-ভিত্তিক জীবনীও যেমন রচিত হয়নি, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক রচনাবলীর, বিশেষ করে, তাঁর বিক্ষিপ্ত বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃতি-চিঠিপত্রাদির পূর্ণাঙ্গ সংকলন হয়নি। যাইই হোক, প্রকাশিত তথ্যাদির ভিত্তিতে শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চিন্তা ও ভূমিকার মূল বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরাই হলো বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্র পশ্চিম বাংলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছেলেবেলা খুব দুঃখকষ্ট ও অবমাননার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। এই কারণে পড়াশুনাও খুব বেশি করা সম্ভব হয় নি। অল্প বয়স থেকেই গল্প ও কথাসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেও তখনও পর্যন্ত তিনি তেমন খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। আর দশজন বেকার বাঙালী যুবকের মত জীবিকার অন্বেষণে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ভাগ্যান্বেষণে তিনি বার্মায় গিয়ে কেরানীগিরি করে খুব সাধারণ মানুষের মতই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। এই বার্মায় থাকার সময় আকস্মিক-ভাবে তাঁর কয়েকটি গল্প প্রকাশের পর তাঁর সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি দেশে ফিরে (মে, ১৯১৬) আসেন।

বার্মা প্রবাসকালে শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক ভূমিকা কী ছিল, জানা যায় না। 'পথের দাবী'তে বার্মায় ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের যে গোপন কার্য-কলাপের কথা বলা হয়েছে তখন প্রবাসী বিপ্লবীদের দু-চার জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে থাকলেও সে-রকম কোন গুপ্ত সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯০৪-৫ সাল থেকে ১৯০৮-৯ সালে বাংলা দেশে যে

রাজনৈতিক ঝড় বয়ে যায় শরৎচন্দ্র তখন বার্মায় থাকার জন্য তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু তবু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব যে তাঁর উপর বেশ কিছুটা পড়েছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। বঙ্গভঙ্গ 'settled fact'কে 'unsettled' করার মহান কৃতিত্বের জন্য তিনি পরবর্তীকালে বাংলায় তরুণ ও যুব সম্প্রদায়কে বার বার অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এরপর মহাযুদ্ধের সময়—১৯১৫-১৬ সালে বাংলা দেশে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবপ্রচেষ্টা চলেছিল এবং যুদ্ধের পরবর্তীকালে রাওলাট বিল ও জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে সারা দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তখনও আমরা শরৎচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি বটে, তবে দেশের এই লাঞ্ছনা ও অপমানে তিনি যে ক্ষোভে, ক্রোধে মর্মে মর্মে গুমরে মরছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের 'নাইটহুড' ত্যাগের ঘটনায় তিনি যে কী পরিমাণ উৎফুল্ল ও উল্লসিত হয়েছিলেন তাঁর অমল হোমকে লেখা পত্র (১৬.৮.১৯) থেকেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

"...ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে।... দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কতটা পশু হতে পারে তা ইতি-হাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো।

"আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবারে একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

"'নারায়ণে'র সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশসাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম আজ আমাদের বুক দশ হাত হল কি না বলুন।"

শরৎচন্দ্রের একজন জীবনীকার (শ্রীকানাইলাল ঘোষ—'শরৎচন্দ্র' ॥ পৃঃ ১৭৬) লিখেছেন যে, এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'স্যার' উপাধি ত্যাগ না করায় শরৎচন্দ্র নাকি খুবই দুঃখপ্রকাশ ও খেদোক্তি করেছিলেন। কিন্তু শুধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই বা কেন—আচার্য জগদীশচন্দ্র বা ডাঃ নীলরতনের মত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আর কাউকেই তো 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করতে দেখা যায় নি—এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন সরকারী খেতাববর্জনের কার্যসূচী নেওয়া হয়, তখনও না। তাছাড়া রাওলাট আন্দোলন ও জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন চিত্তরঞ্জনের কাছে প্রতিবাদ

আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, চিত্তরঞ্জন তখন তাতে সম্মতি দিতে পারেন নি। এই ঘটনায় শরৎচন্দ্রের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল শরৎচন্দ্রের জীবনীকাররা কেউই তা লেখেন নি।

এর অনতিকাল পরেই, গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হলে শরৎচন্দ্র তাতে অংশ গ্রহণ করেন। বস্তুত অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অর্থাৎ একেবারে সক্রিয়ভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখলেন। শুধু যুক্ত রাখলেন বলাই যথেষ্ট নয়, তিনি কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং বি. পি. সি. সি-র সহ-সভাপতি বা ভাইসপ্রেসিডেন্ট হলেন। পরে তিনি এ. আই. সি. সি রও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর মনোহরপুকুরের বাড়িতে বহুদিন বি. পি. সি. সি-র সভা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাপর্বেই কলকাতায় 'ফরবীজ ম্যানসন'এ যে জাতীয় কলেজ ('গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন') স্থাপিত হলো তার অধ্যক্ষ হলেন সুভাষচন্দ্র। শরৎচন্দ্রও এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। দেশের মেয়েরাও যাতে এই আন্দোলনে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তারই জন্য শরৎচন্দ্র ও দেশবন্ধুর পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নারীকর্মমন্দির' নামে কলকাতায় একটি নারীসমিতিকেন্দ্র স্থাপিত হল।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় এই অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে এক ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামনীতির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি ও কার্যসূচী কিংবা গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের খিলাফতের দাবির প্রতি সমর্থন—এর কোন-টাকেই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বিশেষ করে, সরকারী স্কুল-কলেজ ও ইংরেজী বর্জনের আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস নেতারা যেসব উক্তি ও মন্তব্য করতে থাকেন তাতে করে কবির আশঙ্কা গভীরতর হয়, নেতারা পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেশের চারিপাশে দেওয়াল গেঁথে স্বাজাত্যবোধকে প্রবল করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি গান্ধীজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' অর্থনীতিক তত্ত্বের সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাতেই (জানুয়ারি ১৯২১) গান্ধীজীর বিখ্যাত Hind Swaraj পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গান্ধীজী গর্বের সঙ্গে ভূমিকায় লিখলেন যে, এর একটি শব্দও তিনি প্রত্যাহার করতে চান না, পরন্তু এই তত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রত্যয় ও আস্থা আরো

গভীর ও দৃঢ়তর হয়েছে। কবি স্পষ্টই বুঝলেন, গান্ধীজী দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন। তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ-তত্ত্বের বিরোধিতা করে এই সময়ই তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার মিলন' নামক নিবন্ধটি রচনা করেন। (আগস্ট ১৯২১) এবং কলকাতায় এক জনসভায় তা পাঠও (১৫ই অগস্ট) করলেন। তিনি তাঁর নিবন্ধে, ভারতের জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা মুক্তি-আন্দোলনের উগ্র স্বাদেশিক সংকীর্ণতা পরিহার করে তার একটা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট রাখার এবং সেই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করার আহ্বান জানালেন, যেমন করে দেবতারা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনীবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। এই কারণেই তিনি দেশের বিদ্যানিকেতনগুলিকে 'পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন' করে তোলবার আহ্বান জানালেন। অবশ্য এই উপলক্ষে তিনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের বীভৎস দিকটাও উদঘাটন করতে ভুললেন না। পাছে তাঁর এই ঐক্য- ও মিলন -তত্ত্বের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হয়, এই কারণেই তিনি যুদ্ধোত্তর যুগের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবিকে (right of self-determination of nations) পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তাঁর ঐ নিবন্ধেই লিখলেন :

"পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।...পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়।...সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগের অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে ; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।" ['শিক্ষার মিলন'- কালান্তর ॥ পৃঃ ১৮৩-৮৪]

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র কবির এই সতর্কবাণীর মূল লক্ষ্য ও তাৎপর্যটি সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। দলে দলে ছাত্ররা স্কুল কলেজ বর্জন করছে। গান্ধীজী এক বৎসরের মধ্যেই 'স্বরাজ' এনে দেবার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,—অভাবিতরূপে এমন একজন পরিত্রাতাকে পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের! অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচী এবং গান্ধীজী-নির্দেশিত পথে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজলাভ আদৌ সম্ভব কিনা, ঐসব কথা ভেবে দেখবার অনেকেরই অবকাশ ছিল না, শরৎচন্দ্রেরও না। তাঁর ধারণা হলো, যে কোনো কারণেই হোক কবি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ঠিক সমর্থন করতে পারছেন না, তাই তিনি স্কুল কলেজ বয়কট আন্দোলনকেও সমর্থন করছেন না। এইরকম একটা ধারণা নিয়ে তিনি এই সময় কবির বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক নিবন্ধটি রচনা করেন। কয়েক দিন পর এটি আবার 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে' তিনি পাঠও করলেন। তিনি তাঁর এই নিবন্ধে কবির বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বললেন :

"···কবি জোর দিয়ে বলেছেন, একথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, একথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফগানরাও বড় কম করে নি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। ···কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না। কে বলেছে তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়ন-শাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমী বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর।"

তিনি আরও বললেন,

"পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়,—এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে, দম্ভে এদের বুক ভরে উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানবহত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের

এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন।" ['শিক্ষার বিরোধ',-স্বদেশ ও সাহিত্য ॥ পৃঃ ২৪-২৫]

এরপর তিনি সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিগুলির পররাজ্য লুণ্ঠনের এবং সমৃদ্ধির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতিরও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেখালেন, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাসংস্কৃতির কিছুই তারা শেখাবে না। শোষণযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য কিছু কেরানী ও দক্ষ রাজকর্মচারী তৈরি করাই তার আসল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এসব কথা রবীন্দ্রনাথেরও কথা। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উত্থান—তাদের পররাজ্যলুণ্ঠন, তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে শোষণকে তীব্রতর করার প্রয়াস, বিজ্ঞানকে যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে এদেশের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই দীর্ঘকাল থেকে অবিরাম সংগ্রাম ও সতর্কবাণী ঘোষণা করে আসছিলেন। কিন্তু বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রশিল্প, পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করার নির্দেশ যে গান্ধীজী কিংবা অসহযোগ আন্দোলনের নেতারা কেউই দিলেন না, এতে করেই কবির সংশয় প্রবল হয় এবং এই কারণেই কবি ঐ সতর্কবাণী ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

উল্লেখযোগ্য, এর অল্প কয়েকদিন পরেই অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ণ রূপদান করতে গিয়ে গান্ধীজী বিলিতী কাপড় পোড়ানো এবং চরকা বা 'খাদি' আন্দোলনের সূচনা করলে রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ করে 'সত্যের আহ্বান' নামক ভাষণটি কলকাতার এক জনসভায় পাঠ করেন (১৩ই ভাদ্র ১৩২৮)। গান্ধীজী তার জবাব দিলেন 'Young India'য়। কলকাতায় উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হয়। বলা বাহুল্য, এ আলোচনাও ব্যর্থ হয়।

লক্ষণীয়, শরৎচন্দ্র এই ঐতিহাসিক বিতর্কে প্রায় সম্পূর্ণই নীরব রইলেন। অনুগত ও সুশৃঙ্খল কংগ্রেসসেবীর মত প্রথম দিকে তিনি চরকাও কেটেছেন কিন্তু গান্ধীজীর চরকা-তত্ত্বে তাঁর অন্তর-মন একেবারেই সায় দিতে পারেনি। কিন্তু শুধু চরকা বা খাদির আর্থনীতিক তত্ত্বের 'পরেই নয়—সমগ্রভাবে গান্ধীজীর সংগ্রামনীতি সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রবল হতে থাকে। অল্পকাল পরেই চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সেই সময় এবং পরবর্তীকালেও তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর আন্তরিক ক্ষোভ

প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রশক্তির 'পরে যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও গান্ধীজীর মত ও পথ সম্পর্কে —বিশেষ চরকা-তত্ত্ব সম্পর্কে, তাঁর সন্দেহ ও বীতরাগ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। কলকাতায় গান্ধীজী এলে পরে তিনি সে-কথা স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন। 'শিক্ষার মিলন' নিবন্ধে কবি কেন যে ঐ সতর্কবাণী করেছিলেন, এতদিনে শরৎচন্দ্রের কাছে তা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গেল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ চরকা ও খাদি-তত্ত্বের বিরুদ্ধে যতখানি কঠোর সমালোচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্রও প্রায় তার অনুরূপ করলেন (তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' শীর্ষক ভাষণ এবং 'পরশুরাম' ছদ্মনামে 'নূতন প্রোগ্রাম' শীর্ষক রচনাটি দ্রষ্টব্য)। শরৎচন্দ্র 'গান্ধীবাদ'কে যদিও বা সহ্য করতে পারতেন, তথাকথিত 'গান্ধীবাদী'দের একেবারেই পারতেন না। অন্ধ গুরুবাদীর মত একদল কংগ্রেস নেতা যুক্তিবিচার বিসর্জন দিয়ে গান্ধীজীর কথাবার্তা হাবভাব এবং চলন-বলনের হাস্যকর অনুকরণ করতে থাকলে শরৎ-চন্দ্রের কাছে তা অসহ্য বোধ হয়। তীব্র শ্লেষ ও কটাক্ষ-বিদ্রূপ করে তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে লিখলেন, '(বেণু',-আশ্বিন, ১৩৩৬) :

"সেদিন কেন যে কবি এত বড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তার আর সীমা থাকে ! দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরি হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগদুগ্ধ পান পর্যন্ত তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন— তেমনি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেমনি চাদর গায়ে দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ—সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোল কলায় হৃদয় ভরে নাই ; উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাস্তবিক এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।" ['নতুন প্রোগ্রাম' —স্বদেশ ও সাহিত্য' ॥ পৃঃ ৭১]

শরৎচন্দ্র আজীবন কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। কংগ্রেসকে তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের মিলনমঞ্চরূপেই দেখে এসেছেন। কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর অনুগামী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে 'দেশবন্ধু'র পরে তাঁর যতখানি শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল এমন আর কোনো কংগ্রেস

নেতার 'পরে ছিল না। আর ঠিক এই কারণেই সুভাষচন্দ্রকে তিনি সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন। গয়া কংগ্রেসের পর (১৯২২) দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্যদল গঠন করে কংগ্রেসের নীতি-কৌশলের পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে সমর্থন এবং সক্রিয়ভাবে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন। দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি স্বয়ং 'Forward' এবং 'বাংলার কথা' পত্রিকার জন্য অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের' বলে সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ রায়, এস. সি. মিত্র প্রমুখ 'স্বরাজ্য' নেতাদের সঙ্গে বাংলার বহু যুবক গ্রেপ্তার (অক্টোবর ১৯২৪) হলে পর শরৎচন্দ্র খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। এর কয়েক মাস পরে দেশবন্ধুর মৃত্যু হওয়ায় তিনি আরও মুষড়ে পড়লেন। সামনে তিনি যেন সব অন্ধকার দেখলেন। বছর দুয়েক পর—১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বাংলার তৎকালীন যুবনেতারা জেল থেকে বেরিয়ে এলে পর শরৎচন্দ্র পুনরায় নতুন উদ্যমে কংগ্রেসের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে 'হাওড়া টাউন হল'এ এই বিপ্লবী নেতাদের প্রকাশ্য সংবর্ধনা জানালেন। ঐ বৎসরই মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব গৃহীত হলে পর তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এর কয়েকমাস প্ররে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের নেতৃত্বে যখন 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবীতে Independence League গড়ে উঠল তখন তিনি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পর ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সর্বদলীয় খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসে'র প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কার্যত মাদ্রাজ প্রস্তাব প্রায় নাকচ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। শরৎচন্দ্র তাতে খুবই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। অল্পকাল পরে রংপুরে বঙ্গীয় 'যুব সম্মিলনী'র ভাষণে তাঁর এই ক্ষোভ প্রকাশ্যেই জ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে পরবর্তীকালে তিনি সুভাষচন্দ্র জওহরলাল প্রমুখ বিদ্রোহী নবীন কংগ্রেস গোষ্ঠীর সমর্থন করে এসেছেন, একেবারে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত, যদিও শেষ কয়টি বৎসর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সক্রিয়ভাবে বিশেষ কিছু করতে পারতেন না। এটা গেল তাঁর প্রকাশ্য রাজনীতির দিক। কিন্তু এই প্রকাশ্য দিকটা ছাড়াও একই সঙ্গে পাশাপাশি পরস্পর-বিরোধী রাজনীতিক চিন্তার প্রভাবও তাঁর উপর কম কাজ করেনি।

স্মরণ রাখা দরকার, এই অসহযোগ আন্দোলনের শেষের দিকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী এবং কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রসার পাশাপাশিই ঘটতে থাকে।

অবশ্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের থেকে অনেক বেশি ছিল। শরৎচন্দ্রের চিন্তা-চেতনায়ও দেশের তৎকালীন এই দুই পরস্পরবিরোধী রাজনীতিক ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। তৎসত্ত্বেও বলতে হবে তাঁর আকর্ষণ ও ঝোঁকটা অপেক্ষিকভাবে ছিল সন্ত্রাসবাদের দিকেই বেশি করে।

পূর্বেই বলেছি, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় শরৎচন্দ্র খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এক সময় তিনি হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগ করে বিবৃতিও দিয়েছেন। আন্দোলনের এই ব্যর্থতার মধ্যে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দেয়। ১৯২৪ সালের শুরুতেই কলকাতায় গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে মিঃ ডে নামে জনৈক ইংরেজকে হত্যা করে বসলেন (১২ই জানুয়ারি)। কিছুদিন পরেই তাঁর ফাঁসি হয় (৬ই ফেব্রুয়ারি)। ফাঁসির পূর্বে তিনি যে দৃপ্ত ও নির্ভীক ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃতি দিয়ে যান তাতে সারা দেশে,—বিশেষ করে ছাত্র-ও যুব-সমাজে—দারুণ চাঞ্চল্য এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাঁর ফাঁসির আগের দিন গান্ধীজী অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পান। গান্ধীজী একটু সুস্থ হওয়ার পরই 'স্বরাজ্য দল'-এর নেতা দাশনেহরুর সঙ্গে এক আপোস-আলোচনায় তাঁদের কাউন্সিল-প্রবেশনীতি মেনে নিলেন। পক্ষান্তরে তিনি কংগ্রেসে চরকা ও খাদি কার্যসূচীকে মানিয়ে নিলেন। কিছুকাল পরে তিনি গোপীনাথ সাহা এবং সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টাকেও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়ে তা পাস করিয়ে নিলেন, এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনে। এই প্রস্তাব পাস উপলক্ষে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর তুমুল তর্কবিতর্ক হয়। এই ঘটনায় শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর 'পরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এরই কয়েক মাস পরে সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ রায় প্রমুখ স্বরাজ্য নেতাদের সঙ্গে বহু যুবকর্মীও গ্রেপ্তার হলেন, 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'-এর বলে। অল্পকাল পরেই 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' এবং 'দক্ষিণেশ্বর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা', 'আলীপুর জেল হত্যাকাণ্ড মামলা' চলতে থাকলে শরৎচন্দ্র খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। বস্তুতপক্ষে এই সময়েই তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, এই সময়ই 'বঙ্গবাণী'তে তাঁর বিখ্যাত 'পথের দাবী' উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৬ সালের অগস্ট মাসেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'আলীপুর জেল হত্যাকাণ্ড মামলা'য় আসামীরা তখন ফাঁসির দণ্ডাদেশ পেয়ে নির্জন 'সেল্'-এ দিন গুনছিলেন। মাসখানেক পরে—২৮ সেপ্টেম্বর (১৯২৬)—অনন্তহরি মিত্র ও

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর আলীপুর জেলে ফাঁসি হয়ে গেল। 'পথের দাবী' ইতিমধ্যেই বাংলা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় (৩১শে অগস্ট ১৯২৬)। এই বাজেয়াপ্ত গ্রন্থখানি বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজের কাছে 'অগ্নিবেদ'স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

'পথের দাবী'তে সুস্পষ্টরূপেই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার যুবমনের দুঃসহ জ্বালাযন্ত্রণাকে তিনি অপরিসীম দরদ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'পথের দাবী'তে শুধু সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংগঠন ও ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথাই নেই,—সেই সঙ্গে আছে শ্রমিক-ধর্মঘট ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা। শ্রমিককল্যাণ সংঘ করে শ্রমিকদের যে অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না, কিংবা শ্রমিক-ধর্মঘটও যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাফল্যলাভ করতে পারে না,—একমাত্র সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্যেই দেশের তথা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আসতে পারে, এসব কথা মোটামুটিভাবে তিনি সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বলাবার চেষ্টা তখন করেছেন। এসব সত্ত্বেও বলা যায়, 'পথের দাবী'তে তিনি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ওড়ন পাড়ন দিয়ে বিপ্লবপ্রচেষ্টার যে চিত্র দিয়েছেন, তা অতিমাত্রায় রোমান্টিক, এবং কয়েক জায়গায় বেশই দুর্বল হয়ে পড়েছে। 'পথের দাবী'তে কৃষকসমাজের কথা নেই—কৃষক বিদ্রোহ বা বিপ্লবেরও কোন ইঙ্গিত নেই (যেটা নাকি ভারত ও বর্মার বিপ্লবের প্রধান শ্রেণীশক্তি)। 'পথের দাবী'তে ঠিক জনগণ এবং তার বিপ্লবী ভূমিকাকে মহিমান্বিত করা হয়নি, মহিমান্বিত করা হয়েছে 'সব্যসাচী'র মত রোমান্টিক বিপ্লবী নায়ককে। তাই 'পথের দাবী' পাঠ করে বাংলার যুবকেরা সব্যসাচী হবারই প্রেরণা পেয়েছে —শ্রমিক- কিংবা কৃষকনেতা হবার নয়। বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্র অনুশীলন-চর্চারও প্রেরণা পায় নি।

শরৎচন্দ্রের মানস ও রাজনীতিক চিন্তার মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধী চিন্তার প্রবণতা ও দ্বন্দ্বসংঘাত লক্ষ্য করা যায় যেটা ছিল তৎকালীন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর রাজনীতিক নেতা ও কর্মীদেরই শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক ও সমাজ-আর্থনীতিক তত্ত্বাদির সুদীর্ঘ ও সুকঠিন অনুশীলনের সাহায্যে চেতনার স্বচ্ছতা এবং যুক্তিপারম্পর্যবোধ জন্মে, তা তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি। ভারতের মত (তৎকালে বার্মাও ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল) বিশাল উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-আন্দোলনের রূপ কী হবে, কোন্ শ্রেণী তার নেতৃত্ব করবে, কোন্ কোন্ শ্রেণী তার প্রধান চালিকাশক্তি হবে, কী তার নীতিকৌশল হবে, আন্দোলনের

বিভিন্ন স্তর কী হবে—এসব সম্পর্কে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। রণনীতি ও কৌশলের ব্যাপারে ভুল হতে পারে, আর সে ভুল তৎকালীন সব কটি বামপন্থী দলই অল্পবিস্তার করেছিল। কিন্তু মূল রাজনীতিক বিচার ও চিন্তা-চেতনার মধ্যেই যদি গণ্ডগোল বা গোঁজামিল থাকে, তা হলেই প্রশ্ন আসে।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে মার্কস লেনিনের কয়েকটি রচনা এবং মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লব সংক্রান্ত কিছু কিছু পুস্তকপুস্তিকাও ছিল।* তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা এস. এ. ডাঙ্গে সম্পাদিত The Socialist পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা তাঁর সংগ্রহে পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব তথ্যাদি থেকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে সাত তাড়াতাড়ি কিছু একটা মন্তব্য কিংবা সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে। অবশ্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে তাঁকে বেশ কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার যথাযথ অনুশীলনচর্চার সময় বা অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন কিনা, অন্তত তা সঠিক আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন কিনা, তাতে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। ভাবনার কথা এই, আজ এই 'শতবার্ষিকী'র দিনে বিশেষ একটি গোষ্ঠী এবং কতিপয় ব্যক্তি শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী এবং সাচ্চা বিপ্লবী প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। এই কারণেই কথাটি আলোচিত হওয়া দরকার।

১৯২৪ সালে 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা' এবং ১৯২৫ সালে ডিসেম্বরের শেষে কানপুরে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনের পর লোকে সর্বপ্রথম এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বের কথা জানতে পারে। এরপর ১৯২৫-২৬ সালে বাংলাতে সর্বপ্রথম 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টি' গড়ে ওঠে। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসেই নজরুল, কুতুবউদ্দীন আমেদ, হেমন্তকুমার সরকার, সামসুদ্দীন হোসায়েন প্রমুখের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। পরে মুজফফর আহমদ ও আবদুল হালীমও এতে যোগদান করেন। প্রথমে সংঠগনের নামকরণ হয় 'লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।' ঐ বৎসর সংগঠনের মুখপত্র 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় সংখ্যায় হয় 'কৃষকের গান', আর তৃতীয় সংখ্যায় 'সব্যসাচী'। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে (৬-৭ই) নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কৃষ্ণনগরে। ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

* এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শ্রীতারাপদ সাঁতরার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খ্যাতনামা অ্যাডভোকেট এবং সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্তও এতে যোগদান করে ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র করেন নি। এই কৃষ্ণনগর সম্মেলনেই সংগঠনের নাম-পরিবর্তন করা হয়: 'বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল'। পরে অবশ্য ইংরাজীতে সারা ভারত কমিটির নাম হয়েছিল 'ওয়াকার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি অব বেঙ্গল'। বলাবাহুল্য তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরাই ছিলেন এর প্রধান সংগঠক ও নেতা। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক কলকাতা-কংগ্রেসের কয়েকদিন আগেই ওয়াকার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির সারা-ভারত সম্মেলন হয় এই কলকাতাতেই। সম্মেলনের শেষে বিশাল এক শ্রমিকমিছিল শোভাযাত্রা করে একরকম জোর করেই কংগ্রেস মণ্ডপে ঢুকে গিয়ে পূর্ণস্বাধীনতার দাবি জানিয়ে পতাকা উত্তোলন করে এসেছিল।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ-আকর্ষণ থাকলেও 'ওয়াকার্স এ্যাণ্ড পেজাণ্টস্' পার্টি'র সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল বলে মনে হয় না। অন্তত আজও পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মুজফফর আহমদ, আবদুল হালীম এবং আরও যাঁরা এই কালের এইসব সংগঠন ও আন্দোলনের কথা লিখেছেন, তাঁরা কেউই এ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেন নি। আরো বড়ো প্রমাণ, ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির আদর্শ লক্ষ্য কার্যসূচী এবং সভাসমিতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র স্বয়ং কোথাও কোন উল্লেখ করেননি। দলের মুখপত্র 'লাঙল' এবং 'গণবাণী'তে তাঁর কোন লেখা বা বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। নজরুলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু' ও 'লাঙল'-এ কবিতা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধু একটি শুভেচ্ছাবাণী ছাড়া আর কোন লেখা পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায় নি। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে অতুল গুপ্ত, নরেশ সেনগুপ্ত যোগদান করতে পারলেন অথচ শরৎচন্দ্র পারলেন না, এটাও ভেবে দেখার কথা। এর পর ১৯২৮ সালে কলকাতায় ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির ঐতিহাসিক সারা-ভারত সম্মেলনে তাঁকে যোগদান কিংবা শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতে দেখি না। কয়েক মাস পরে, রংপুরে 'বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর' সভাপতির ভাষণে (দ্র: 'তরুণের স্বপ্ন' নিবন্ধ) তিনি যুবকদের এত কথা এত উপদেশ দিলেন, অথচ ভারতের রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণের এবং তার বিরাট সম্ভাবনার কথা, ওয়াকার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির অভ্যুদয় ও কলকাতা সম্মেলনের কথা, কিংবা শ্রমিকদের কলকাতা কংগ্রেস মণ্ডপ অধিকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানোর বিরাট তাৎপর্যের কথাটা একবারও উল্লেখ করলেন না। এর থেকেই প্রমাণ হয় শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চেতনার স্তর কী পর্যায়ে ছিল।

এ কথা সত্যি, ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র এবং বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা বেরিয়ে আসার পর তিনি একটি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন এবং এই কালের কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘটে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবেও কিছুটা সাহায্য করেছিলেন —তৎকালীন কিছু কংগ্রেস কর্মীকেও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যান্টস্ পার্টির (এবং পরবর্তীকালেও কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টির) সঙ্গে তাঁর যে তেমন কোন সম্পর্ক গড়ে উঠল না, এটা একটা বাস্তব সত্য ঘটনা।

২। বিরোধী শক্তির সমন্বয়

১৯২৫-২৭ সাল শরৎচন্দ্রের এক নিদারুণ মানসসংকটের যুগ। একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত হতাশা, অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র অনিলবরণ প্রমুখের গ্রেপ্তার, এবং তার অল্পকাল পরেই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এই হতাশার মধ্যে তিনি যখন সন্ত্রাস-বাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বাংলায় এক ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেল। অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগেই, ১৯২৩ সালের শুরুতে। খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর মুসলিম এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলি খুবই কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। এই সময়ই হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলি,—বিশেষ করে 'আর্য সমাজ'—'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন করে জাতিচ্যুত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দু করে নেবার জন্য উদ্যোগী হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম সাম্প্রদায়িক 'তন্‌জীম্' ও 'তব্‌লীগ্' আন্দোলন করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষকে প্ররোচিত করতে থাকে। ফলে অচিরেই দেশের কয়েকটি জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে যায়। কংগ্রেস অবশ্য দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। ঐ বৎসরই (১৯২৩) সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাতে এই ঐক্যকে সংহত করার জন্য হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতারাই আবেগময়ী ভাষায় আবেদন জানালেন। মৌলানা আজাদ ছিলেন সভাপতি। শরৎচন্দ্রও এই দিল্লী সম্মেলনে যোগ দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক এই ঐক্যপ্রচেষ্টাকে তিনি খুব ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই সময়ই 'বিজলী'তে (২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০) তিনি এই ঐক্যপ্রচেষ্টা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিলেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'দিন-কয়েকের ভ্রমণকাহিনী' নামক তাঁর রচনাটিতেও ('বিজলী' ২৩শে কার্তিক, ১৩৩০ ; দ্রঃ শরৎচন্দ্রের রচনাবলী ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ ॥ পৃঃ ১০০০-৯) তিনি সেই একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িকতার বীজ তাঁর চিন্তা ও মানসের কোথায় এক জায়গায় গোপনে আশ্রয় নিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে পুষ্ট হচ্ছিল। ১৯২৬ সালের কলকাতার কুখ্যাত সেই হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পর তা স্পষ্টতঃ প্রকাশ পেল। কিন্তু শুধু শরৎচন্দ্রই নন—বাংলার প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাগুলি এই সময় এই দাঙ্গাহাঙ্গামার ও সাম্প্রদায়িক বিরোধবিদ্বেষকে প্ররোচিত করতে থাকে। শরৎচন্দ্র তাঁদেরই ফাঁদে পা দিলেন। এই সময়

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দুসংঘ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ ছড়ানো হচ্ছিল। বিপ্লবী অনুজাচরণ সেন ছিলেন তার সম্পাদক। এই 'হিন্দুসংঘ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশ করলেন। ঐ একই সংখ্যার সজনীকান্ত দাসের 'শুদ্ধি আন্দোলন' শীর্ষক রচনাটি প্রকাশিত হয়। এই রচনা দুটি প্রকাশের জন্য অনুজাচরণের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। শরৎচন্দ্র নাকি তাতে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছিলেন। সজনীকান্ত কিছুটা গর্বের সঙ্গেই তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

"সত্যেনদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি 'হিন্দুসংঘ' সাপ্তাহিকের সম্পাদক অনুজাচরণ সেনগুপ্ত। তিনি বলিলেন, পূজার বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপিবেন। আমি সানন্দে দীর্ঘকাল পরে প্রবন্ধটির ভারমুক্ত হইলাম। ১৯শে আশ্বিন ১৩৩৩ (৬ অক্টোবর, ১৯২৬) বুধবার 'হিন্দুসঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাহির হইল। এক খণ্ড হাতেও আসিল। আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম, আমার 'শুদ্ধি আন্দোলন' বাহির হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিলাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নামক একটি প্রবন্ধ 'শুদ্ধি আন্দোলনে'র পাশাপাশি ছাপা হইয়াছে। সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই আমার উল্লাস বাধাগ্রস্ত হইল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, শরৎচন্দ্র ও আমার প্রবন্ধের জন্য অনুজাচরণ ধৃত হইয়াছেন', 'হিন্দুসঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, বিচারেরও বিলম্ব হইল না। অনুজাচরণের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল। অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া পড়িলাম। এই অবস্থায় কালিদাসদা সংবাদ আনিলেন, শরৎচন্দ্র আমার সাক্ষাৎকামী। সেই দিনই হাওড়া টাউন হলে কোনও সভায় সায়াহ্নে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করিবেন, আমাকে সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে। অনুজাচরণের কঠোর শাস্তি এই আহ্বানের আনন্দ অনেকখানি খণ্ডিত করিয়া দিল, তবুও গেলাম।

"...একান্তে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমাদেরও ধরবে না কি হে? দেখ তো কি কাণ্ড! মনে হইল তিনি সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছেন। তিনি আমার লেখার অন্তর্নিহিত যুক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন।"

"প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনুজাচরণ সেনগুপ্ত কারামুক্তির কিছুকাল পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লালদীঘির ধারে তদানীন্তন কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া স্বদলীয় বোমার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।" [আত্মস্মৃতি, ১ম খণ্ড॥ পৃঃ ২৪১-৪৩]

এরপর সজনীকান্ত তাঁর নিজের সেই 'ঐতিহাসিক' রচনাটির দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত নিবন্ধটি পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত শরৎচন্দ্রের রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর নিবন্ধের এক জায়গায় লিখলেন,

"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

"একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

"দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে।

"...হিন্দু-নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনপুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করিব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।" [শরৎচন্দ্রের রচনাবলী ॥ পৃঃ ১৯৬-৯৭]

তিনি এই প্রবন্ধে হিন্দুদের সংঘ ও ঐক্যবদ্ধভাবে বীর্য এবং শক্তিসঞ্চয়ের জন্য আহ্বান জানালেন। এক কথায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলি এতদিন যা প্রাণপণ চিৎকার করে হিন্দুদের বোঝাবার চেষ্টা করে আসছিল শরৎচন্দ্র প্রায় একই সুরে সেই আবেদন জানালেন। তিনি আরও বললেন,

"...হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজের কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

"হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে—এ দেশে তাহার চিত্ত নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ

করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জল বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে ? আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবার আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারের পরম সত্য নয়।”··

এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িক চিন্তার মূল এই কালে শরৎচন্দ্রের মানসে কতখানি প্রবেশ করে বসেছিল। এইখানেই ছিল শরৎচন্দ্রের রাজ-নীতিক চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিরাট পার্থক্য। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের শেষ পর্বে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা যখন শুরু হলো তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল,—উভয়েই ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছিলেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের এবং নজরুলের চিন্তা ও ভূমিকা কী ছিল, অন্যত্র আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।*

উল্লেখযোগ্য, এই কালেই নজরুল তাঁর ‘পথের দিশা’, ‘হিন্দুমুসলিম যুদ্ধ’ প্রভৃতি দাঙ্গাবিরোধী কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। আরও উল্লেযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ১৯২৬ সালের এপ্রিলের ঐ ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হওয়ার মাস দেড়েক পরে ঐ কৃষ্ণনগরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (২২-২৩শে মে) হয়। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর থেকেই দেশবন্ধুর ‘হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট’ (‘সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট’) বাতিল করার জন্য উগ্রপন্থী এবং কংগ্রেসের জাতীয়তা-বাদী হিন্দুরা উঠেপড়ে লাগলেন। এই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে নজরুল এই সম্মেলনেই তাঁর বিখ্যাত ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কোরাস গানটি রচনা করে গেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণনগর সম্মেলনে তুমুল উত্তেজনা ও তর্কাতর্কির পর হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বাতিল হয়ে যায়। এই প্যাক্ট বাতিল হওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের মনে কোন বেদনা লক্ষ্য করা গেল না। কিন্তু শুধু শরৎচন্দ্রই নন,—বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের একটি বড়ো অংশ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর হিন্দুমুসলিম প্যাক্ট বাতিল করার জন্য কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে যাঁরা বিশেষ উদ্যোগী এবং নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমর চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ ছড়ানো, এমনকি

---

*এই সম্পর্কে লেখকের ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’ (২য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য। এই দাঙ্গার সময় কাজী নজরুলের রচনা ও ভূমিকা সম্পর্কে মুজফ্ফর আহ্মদ ডঃ সুশীল গুপ্ত প্রমুখ নজরুলের জীবনীকাররা বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছেন।

দাঙ্গাহাঙ্গামায়ও কয়েকটি বিপ্লবী গোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনুজা সেনগুপ্তর কথা পূর্বেই বলেছি। বস্তুত এই দিক থেকে বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মানসিকতার অদ্ভুত সাযুজ্য ও মিল ছিল, যেটা নজরুলের মধ্যে ছিল না।

শরৎচন্দ্র ও নজরুল প্রায় একই সঙ্গে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। উভয়ে প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। রাজদ্রোহমূলক কবিতা রচনার জন্য নজরুল কারাদণ্ড ভোগ এবং কারাগারে অনশনও করেন। অল্পকাল পরেই গান্ধীবাদী রাজনীতি সম্পর্কে উভয়েরই 'মোহমুক্তি' ঘটে, পরে উভয়েই সন্ত্রাসবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে শরৎচন্দ্রের ঝোঁকটা ছিল সন্ত্রাসবাদের দিকেই, পক্ষান্তরে নজরুলের ছিল সমাজতন্ত্রবাদের দিকে। নজরুল কোনোদিনও সন্ত্রাসবাদী পন্থার সমর্থক ছিলেন না। তিনি বিপ্লবীদের সাহস, আত্মত্যাগ ও কঠিন বীর্যবত্তার অকুণ্ঠ জয়গান করেছেন। নজরুল শুধু বিদ্রোহী যুবশক্তিরই জয়গান করলেন না, সেই সঙ্গে শোষিত সর্বহারা-শ্রমিক ও কৃষকের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বলিষ্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান জানালেন। স্মরণ রাখা দরকার, নজরুল এই কালেই (১৯২৫-২৭এ) 'সাম্যবাদী', 'কৃষকের গান', 'সব্যসাচী', 'শ্রমিকের গান', 'রক্তপতাকার গান' এবং বিখ্যাত 'ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীত'-এর তর্জমা ও সুর সংযোগ করে গাইলেন। শুধু কবিতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা করেই নয়,—নজরুল ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হিসাবে প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কাজে মেতে উঠলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁর সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক কাটিয়ে এমনভাবে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে উত্তরণ করতে পারলেন না। এমন যোদ্ধার বেশেও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতে আর এমন বলিষ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে কৃষক ও শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও অভ্যুত্থানেরও ডাক দিতে পারলেন না। এমনকি কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে নজরুলের কবিতা ও সঙ্গীত রচনাকেও তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। 'পথের দাবী'তে তিনি কবি শশী ও সব্যসাচীর কথোপকথন উপলক্ষে সেকথা স্পষ্টই ব্যক্ত করলেন। এই নিয়ে সেকালে সাহিত্যিক মহলে বেশ কিছুটা শোরগোল উঠেছিল যে, আসলে নজরুলকে লক্ষ্য করেই শরৎচন্দ্র ঐসব কথা সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন (দ্রঃ 'কাজী নজরুল ইসলাম-স্মৃতিকথা', মুজফ্‌ফর আহমদ ॥ পৃঃ ৪১০-১৩)।

আরও একটি লক্ষ্য করবার বিষয়, শরৎচন্দ্র কৃষকের বিশেষ করে রায়তের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন না থাকলেও, এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা সামান্যই

প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনা ও সাহিত্যকর্মে। 'মহেশ' (বঙ্গবাণী,-আশ্বিন ১৩২৯) এবং 'দেনাপাওনা', 'জাগরণ', 'বিপ্রদাস', 'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব) প্রভৃতি গল্পে উপন্যাসে কৃষকদের দুঃসহ দারিদ্র্য ও দুঃখযন্ত্রণার চিত্র আছে বটে, তবে জমিদার-মহাজনদের হিংস্র শোষণ-অত্যাচারের দিকটা প্রত্যক্ষভাবে এসব সাহিত্যকর্মে সামান্যই প্রকাশ পেয়েছে। পরন্তু জমিদারদের উদার মানবিক দিকটা তাঁর বেশ কিছু গল্পে-উপন্যাসে বড়ো হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তার গল্প-উপন্যাসের নায়ক এবং চরিত্র হচ্ছে,—সুরেন্দ্রনাথ ('বড়দিদি'), রমেশ ('পল্লীসমাজ'), বিপ্রদাস ('বিপ্রদাস'), নরেন ('দত্তা'), মিঃ রে বা রাধামাধব রায় ('জাগরণ')। তাছাড়া শরৎচন্দ্র কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠ বিদ্রোহ এবং সংগ্রামপ্রবণতাকে মহিমান্বিত করতে পারলেন না তাঁর সাহিত্যকর্মে। কৃষকজনতা তাঁর চোখে passive force হিসেবেই দেখা দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের গফুর আকাশের পানে মাথা তুলে অশ্রুবিসর্জন করেছে আর রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যাপূরণ' গল্পের অছিমুদ্দী কাটারি হাতে জমিদার বিপিনকে আক্রমণ করেছে কিংবা সামরু গোয়ালা ভোজালি হাতে শেঠ দুনিচাঁদের গদি থেকে ক্রোক-করা সুধিয়া গাইকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো—এ তুলনাও মনে আসবে।

শুধু গল্পে-উপন্যাসেই নয়, প্রবন্ধ-সাহিত্যে কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদিতে জমিদারি ও মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র খুব সামান্যই বলেছেন। এসব সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তিনি পাঠকের মনে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ সৃষ্টি করতেও সক্ষম হন নি। আরও একটা কথা, রায়তের স্বার্থে ভূমিসংস্কার আইন নিয়ে ১৯২০ সাল থেকেই যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতেও শরৎচন্দ্রের কোন ভূমিকা চোখে পড়ে না।

স্মরণ করা দরকার, ১৯২০ সালেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' নিবন্ধটি লিখে রায়তের রায়তী স্বত্বের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। এর প্রায় ছয় বছর পরে নিবন্ধটি প্রকাশের সংকল্প করে যখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে তার ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ জানান, তখনই কবি 'রায়তের কথা' শীর্ষক নিবন্ধটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে রায়তী স্বত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করেও তার সময় ও বাস্তব প্রয়োগগত সমস্যার প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে জমিদার-মহাজনের শোষণ-অত্যাচারের যে চিত্র তিনি উদ্‌ঘাটন করলেন তা 'গণবাণী'-গোষ্ঠী ছাড়া সমকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের কারুর রচনায় (রাজনীতিক-আর্থনীতিক নিবন্ধ) তেমন লক্ষ্য করা যায় না। স্মরণ রাখা দরকার— ১৯২৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংস্কার আইনে' বাংলার চাষীর সর্বনাশ

করে স্বত্ববান রায়তের জোত হস্তান্তরের সময় জমিদারদের অগ্রক্রয়াধিকার (pre-emption right) দেওয়া হয় (শতকরা ১০ অংশ বেশি ক্ষতিপূরণ)। তাছাড়াও জমির হস্তান্তরের সময় রায়তের কাছ থেকে জমিদারকে একটা সেলামি বা 'খারিজ ফী' দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসের সহায়তার জন্যই আইনসভায় এমন একটা মারাত্মক কৃষক-বিরোধী আইন পাশ হতে পেরেছিল এবং সুভাষচন্দ্র এই আইনের সমর্থন করেছিলেন। এই ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রকে কোন প্রতিবাদ বা কথা বলতে দেখা যায় না। স্মরণ রাখা দরকার, শরৎচন্দ্র ছিলেন বি. পি. সি. সি.-র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। কংগ্রেস নেতারা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনি প্রতিবাদ বা আপত্তি জানালে এমন একটা জমিদারতোষণ আইনের সমর্থন করা বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না।

পরবর্তীকালে, ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে 'সারা ভারত কিষাণ সভা' গঠিত হওয়ার পর তার নেতৃত্বে জমিদারি ও মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে যখন সারা দেশে আন্দোলন শুরু হলো তখনও শরৎচন্দ্রকে আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাই না। তাঁর কোন গল্প-উপন্যাসেও আর কৃষকসমস্যা কিংবা কৃষক-আন্দোলনের তেমন কোন মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া গেল না। বস্তুতপক্ষে 'পথের দাবী' রচনার পর তিনি আর কোন রাজনীতিক উপন্যাস লেখেন নি। তার কারণ কী, এ প্রশ্নটাও আমাদের খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকানাইলাল ঘোষ মশায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের এক জায়গায় লিখছেন (পৃঃ ২০৩) যে, ভবিষ্যতে সাহিত্য ছাড়া আর কোন রাজনীতিক রচনা লিখবেন না, শরৎচন্দ্র নাকি তাঁর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই শর্তে স্বাক্ষরদান করেছিলেন। এই ঘটনা সত্য হলে শরৎচন্দ্রের চারিত্রশক্তির খুব দৃঢ়তার পরিচয় মেলে না। কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে কানাইবাবু এই উক্তি করলেন তার তিনি কোন সূত্রে উল্লেখ করেন নি। অবশ্য এই উক্তির কোন প্রতিবাদও আজ পর্যন্ত কেউ করেন নি। এই ঘটনা সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিখানির কয়েকটি কথা বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন পর শবৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তার প্রতিবাদ জানাবার অনুরোধ জানালে পর কবি নীতিগত কারণেই তা করতে অসম্মত হয়েছিলেন। কবি তাঁর জবাবী পত্রের এক জায়গায় লিখেছিলেন (২৭শে মাঘ, ১৩৩৩) :

"...রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ

আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবি করি, নিজের কাছে নয়। ···কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেচে।”···[বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ॥ পৃঃ ৯৬-৯৭]

শরৎচন্দ্র অভিমানভরে তার জবাবে কবিকে লিখেছিলেন যে, সে-কথা তিনি জানেন এবং এর জন্য কঠিন শাস্তিও তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন। দুঃখের বিষয়, এর পরও তিনি ১০/১১ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ‘শ্রীকান্ত’ (৩য়, ৪র্থ খণ্ড) ও ‘শেষ প্রশ্নে’র মতো দীর্ঘ উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন কিন্তু কোন ‘রাজদ্রোহ’-মূলক উপন্যাস কিংবা গল্প লেখেননি।

এ কথা সত্য, ১৯২৭ সালে মে-জুন নাগাদ সুভাষচন্দ্র এবং বিপিন গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের মুক্তিলাভের পর শরৎচন্দ্র তাঁর হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাবটা কাটিয়ে পুনরায় নব-উদ্যমে রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। বাংলার ‘বিগ ফাইভ’-এর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করেই তিনি মুক্ত বিপ্লবীদের সংবর্ধনা-সভার (হাওড়া টাউন হল-এ) আয়োজন করে নিজেই সে-সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। শ্রমিক ধর্মঘট এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনের কাজেও তিনি যুবকদের উৎসাহ ও মদত দিতে লাগলেন কিন্তু তাও খুব বেশি দিন নয়। বছর দুয়েক পরে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি রাজনীতিক দল এবং আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বস্তুতপক্ষে এই সময় থেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন (বিশেষ করে শ্রমিক ধর্মঘট) যেমন প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’র দাবিতে সারা-দেশব্যাপী সংগ্রামের জোর প্রস্তুতি চলতে থাকে। এমনও হতে পারে, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার নেতারা শরৎচন্দ্রকে এই সংগ্রাম-সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য লাগে, যতীন দাসের মৃত্যুর (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) পর সারা কলকাতায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছিল, কিংবা ‘মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা’র আসামীদের গ্রেপ্তার এবং মামলা চলাকালে শরৎচন্দ্রের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার কোন পরিচয় বা সাক্ষ্য কোথাও তাঁর নিজের লেখা কোনো রচনায়, বিবৃতিতে কিংবা চিঠিপত্রে ধরা রইল না।

১৯৩০-এর 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলার সময়েই বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে, আর ১৯৩৪ সালেই তার অবসান ঘটে। এই চার বছর ধরে বাংলায় ইংরেজের যে কী ভয়াবহ পৈশাচিক নির্যাতন এবং পীড়ন চলেছিল, সে-ইতিহাস আজ সকলেরই জানা। দেশের এই দারুণ দুঃসময়ে ও দুর্যোগকালে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে-ছিলেন সকলের পুরোভাগে। একটার পর একটা বিবৃতি, খোলাচিঠি, তারবার্তা কিংবা প্রতিবাদসভা করে ইংরেজের পৈশাচিক দলননীতির নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেছিলেন তিনি! আফসোস হয়, তার সঙ্গে যদি শরৎচন্দ্রের নামটিও যুক্ত থাকতো তাহলে সেদিন সারা দেশে তার কী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াই না হতো! যে হিজলী-গুলিচালনার প্রতিবাদে কবি ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সে সভায় যদি শরৎচন্দ্রও বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদ জানাতেন তাহলে কী ভালোই না হত! কিন্তু আফসোস এই, হিজলীতে গুলিচালনার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের কোন প্রতিবাদ কিংবা বিক্ষোভ প্রকাশ কোথাও লিপিবদ্ধ রইল না।

এর কয়েক বৎসর পর—১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর—যখন ভারতবর্ষে বামপন্থী ও প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের সূচনা হল তখনও আমরা শরৎচন্দ্রকে তার সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাই না। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর জওহরলালের উদ্যোগে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য All India Civil Liberties Union গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার অনারারি প্রেসিডেণ্ট। এর পর বাংলা শাখা কমিটির উদ্যোগে বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। কয়েক মাস পরে, আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন শুরু করলে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে প্রবল আন্দোলন হয়। ২রা অগস্ট (১৯৩৭) টাউন হলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ব্রিটিশের এই বর্বর দমননীতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালেন। তখনও আমরা শরৎচন্দ্রকে আমাদের পুরোগামী অন্যতম জননেতারূপে পেলাম না।

স্মরণ রাখা দরকার, এই কালেই আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। এই কালেই League Against Fascism and War-এর ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু এর কমিটিতে কিংবা সঙ্ঘের উদ্যোগে কোন সভাসমিতিতে অথবা আন্দোলনে আমরা শরৎচন্দ্রের নাম পাই না।

কিন্তু এগুলি হলো প্রত্যক্ষ রাজনীতিক সংগঠন এবং আন্দোলন। শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই কালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'। ১৯৩৬ সালে ঐ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস মণ্ডপেই এর প্রথম সারা ভারত সম্মেলন হয়। এর পর আস্তে আস্তে প্রায় সারা দেশে এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। বাংলা শাখা কমিটি গঠনের দিনটিও ছিল খুব স্মরণীয়। ১১ই জুলাই (১৯৩৬) ভবানীপুরে আশুতোষ হলে গোর্কির স্মরণসভা উপলক্ষেই ঐদিন বাংলা শাখা কমিটি গঠিত হয়। ঐ স্মরণসভায় গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, আর্কুহার্ট, অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রমুখ যে কয়জন বাণী প্রেরণ করেন সভায় তা পাঠ করা হয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র কোন বাণী পাঠান নি। অথচ গোর্কি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অন্যত্র নানা উপলক্ষেই তাঁর গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত হলেন বাংলা শাখা কমিটির সভাপতি। সারা ভারত কমিটির সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত হিন্দী কথাসাহিত্যিক প্রেম চন্দ্। শরৎচন্দ্র যদি বাংলা কমিটির সভাপতি হতেন তাহলে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম হতো। একথা সত্যি, ১৯৩৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রুসেলস-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র পক্ষে যে যুক্তবিবৃতি পাঠানো হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ প্রবীণদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নামও ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এই সংগঠনের মধ্যে কিংবা তার সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পাওয়া গেল না—অন্তত সংবাদপত্রের বিবরণীতে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। কয়েক মাস পরে সঙ্ঘের পক্ষে 'প্রগতি' নামে যে সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতেও শরৎচন্দ্রের কোন গল্প বা রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অবশ্য এই সংগঠনের সূচনাকালে তিনি উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

একথা সত্যি, শরৎচন্দ্র শেষ জীবনে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তাছাড়া সভাসমিতিতে ভাষণ কিংবা বিবৃতিদান ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি খুব সংকোচ ও কুণ্ঠাবোধ করতেন। মানসিক ধাতুগত প্রকৃতিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন নম্র ও লাজুক মানুষ। কিন্তু এই ১৯৩৬ সালেই জুন-জুলাই মাসে তিনি 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেছেন। হিন্দুদের প্রতি সুবিচারের দাবিতে বিলেতে 'মেমোরিয়াল' পাঠানোর ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। কলকাতায় 'টাউন হল'-এর জনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাতে তিনি তুলসী গোস্বামী ও রাধাকুমুদ

মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ছুটে গিয়েছিলেন (৫ই জুলাই, ১৯৩৬) এবং কবির সম্মতিও আদায় করেছিলেন। দিন দশেক পরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী টাউন হলের ঐ জনসভায় (১৫ই জুলাই) কবিকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি যে ভাষণ দেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য। এর দিন দুয়েক পর অ্যালবার্ট হল-এ বাঁটোয়ারা-বিরোধী জনসভায় (১৭ই জুলাই, ৩৬) শরৎচন্দ্র স্বয়ং ভাষণ দেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন হিন্দুমহাসভা নেতা ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে। ঠিক এই সময়ই কলকাতায় 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি', 'প্রগতি লেখক সংঘ', 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম্ অ্যাণ্ড ওয়ার', 'কৃষক সভা' প্রভৃতি বামপন্থী ও প্রগতিশীল সংগঠনের জোর প্রস্তুতি চলেছিল।

সুতরাং শারীরিক অসুস্থতা কিংবা তাঁর মানসিক গঠনপ্রকৃতিই একমাত্র কারণ বা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এইসব আন্দোলনে তাঁর সক্রিয়ভাবে যোগদানের পথে। কারণ যাইই হোক, বাস্তব সত্য ঘটনা এই, ১৯২৯-৩০এর পরবর্তী যুগে দেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল আন্দোলন ও গণসংগঠনের সঙ্গে আর আমরা শরৎচন্দ্রকে—অন্তত সক্রিয়ভাবে—তেমন সম্পর্কযুক্ত দেখতে পাই না। বস্তুতপক্ষে ঐ সময় থেকেই, শরৎচন্দ্র ও নজরুল উভয়েই আস্তে আস্তে দেশের রাজনীতিক আন্দোলন থেকে সরে গেলেন। এইখানে তাঁরা কেউই বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নাগাল পান নি। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ বামপন্থী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সবচেয়ে কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিলেন, এই পর্বেই তিনি রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে বেশি করে যুক্ত ছিলেন।

বক্তব্য এই, বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এতে তাঁকে অবিচল সক্রিয় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে (consistently) আমরা পাইনি। রাজনীতির কথা বাদ দিলেও সামাজিক রীতিনীতি এবং নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা ইত্যাদির প্রশ্নেও তাঁর মধ্যে নানা স্ববিরোধী চিন্তা ও প্রবণতা কাজ করেছে। একদিকে হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ছেন অপরদিকে ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতি ও বর্ণ-বিচারকে তিনি মেনে চলেছেন। একদিকে নারীশিক্ষা এবং নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবি জানাচ্ছেন, অপরদিকে 'সনাতনী হিন্দু' -সমাজীদের মতো নারীর সতীত্ব ও পতিভক্তিকে মহিমান্বিত করছেন। এক কথায়, তাঁর চিন্তায় ও মানসে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া—এই উভয় শক্তিরই দ্বন্দ্বসংঘাত চলেছিল, যদিও শেষপর্যন্ত তিনি প্রগতিশক্তিরই জয়ধ্বনি করেছিলেন। প্রগতিশীলদের সঙ্গে সমান তালে পা-ফেলে তিনি চলতে পারেন নি বটে, তবে মানসিক দিক

থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল এবং বামপন্থী শিবিরেই ছিলেন। সর্বোপরি দেশের আশু এবং প্রধান শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিচারে তাঁর কোনো ভুল হয়নি। তার বিরুদ্ধে তিনি শেষদিন পর্যন্তও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং মিলন-মঞ্চ হিসেবে কংগ্রেসকে যেমন সমর্থন করেছেন তেমনি বামপন্থী দল ও গণসংগঠন-গুলির প্রতিও তাঁর সহানুভূতি এবং সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। আর ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি সব সময়ই গরিব ও উৎপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন, এবং তরুণ ও যুব কর্মীদের তিনি চিরদিনই সেই কাজে উৎসাহ ও মদত দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার, শরৎচন্দ্র 'বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করলেও তাঁর চিন্তা এসময় উগ্র সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ছিল না। অন্তত ১৯২৬ সালের সেই সাম্প্রদায়িকতার ঝোঁককে তিনি এই পর্বে সম্পূর্ণভাবেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, শেষ জীবনে তিনি মুসলিম সমাজকে নিয়ে সাহিত্যরচনা করবেন বলে স্থির করেন। এ কথা তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' দশম বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এবং সমসাময়িক আরও কয়েকটি ভাষণে ও রচনায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন। অবশ্য তাঁর সাহিত্যকর্মে কোনদিনই তিনি সম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। এই 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতির প্রতিবাদে যখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও এম. এস. আনে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে Congress Nationalist Party নামে একটা স্বতন্ত্র দল গঠন করে (জুলাই-অগস্ট, ১৯৩৪) গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন, শরৎচন্দ্র কিন্তু তখন তা সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি তাঁদের এই কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারের তীব্র সমালোচনা করে এই সময় লিখেছিলেন (নাগরিক, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১) :

"...তাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই যুক্তিহীন নিন্দাপ্রচার আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

"যাঁনি এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন, তাঁকে আমি একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করি, দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান তাঁর কম বলেও মনে করিনে। কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তাঁর কংগ্রেসের চেয়েও বেশী, এ কথা প্রমাণের জন্য নূতন কোন দল গঠনের প্রয়োজন বোধ

করি ছিল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকালই লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কারও কিছুমাত্র বেড়েছে কিনা জানি নে, কিন্তু দেশের গৌরববৃদ্ধি এতটুকুও বাড়ে নি।

"দেশসেবা জিনিসটা যত দিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, তত দিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতি দিন মর্মে মর্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ্। মহাত্মা জানেন এবং অ্যানের বিরুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে বিচলিত করেনি। সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তাঁর সঙ্গে এ গোলযোগের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজম্‌কে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।" [শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ ॥ পৃঃ ২৯০-৯১]

এই কালে শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চিন্তা কী ছিল তা এই রচনাটির মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, তৎকালীন কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁদের বিচারবিশ্লেষণ রাখছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, বোম্বাই-কংগ্রেসের কয়েক মাস পূর্বেই গান্ধীজী তাঁর এক বিবৃতিতে (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। এই বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে উদীয়মান সোস্যালিস্টদের মৌলিক মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন এবং তিনি যে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন সেটা তার অন্যতম কারণ বলে স্বীকারও করেন। তবে শরৎচন্দ্র এখানে গান্ধীজীর সীমাবদ্ধতার এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গান্ধীজী যখন সত্যসত্যই কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন সেই সময় তিনি দেশবাসীকে গান্ধীজীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর 'মহাত্মার পদত্যাগ' শীর্ষক রচনাটি ('কিশলয়', আশ্বিন ১৩৪৪) প্রকাশ করেন। মতবাদগত কোন সংকীর্ণতা কিংবা গোঁড়ামি তাঁর কোনদিনও ছিল না।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'

ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ

১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু হলে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বরং আর-একটি সংকল্পে তিনি স্থিরবদ্ধ হয়েছেন। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকেই তিনি 'গৃহদাহ' নামে একটি বৃহদায়তন উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন, কিছু অংশ লিখেও ফেলেছেন। ১৩ই মার্চ (১৯১৪) বন্ধুবর প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি চিঠিতে লিখছেন: 'বৈশাখের জন্য হরিদাসবাবুকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস গৃহদাহ নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি।' হরিদাসবাবু হলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র এ সময়ে রেঙ্গুনে। 'গৃহদাহ' অবশ্য বৈশাখ থেকেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। অন্যবিধ রচনায় হাত দিতে গিয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে 'গৃহদাহ' রচনার কাজ বিশেষ এগোয় নি। সে সুযোগ মিলেছে বছর দুয়েক পরে ব্রহ্মদেশ ত্যাগের পর কলকাতায় এসে। ১৩২৩ সনের মাঘ থেকে ১৩২৬ সনের মাঘ পর্যন্ত (মধ্যবর্তী দু-চারটি সংখ্যা বাদে) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরের মাসেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (ফাল্গুন ১৩২৬, মার্চ ১৯২০ খ্রী)।

ইতঃপূর্বে 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) লিখে শরৎচন্দ্র কিছু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, 'গৃহদাহ' তাতে নতুন মাত্রা সংযোজন করল। বিধবার নিরুচ্চার, সংযত ও পরিণতিহীন প্রেমের চিত্র নয়, পতিতা নারীর ভালোবাসার কাহিনীও নয়, বিবাহিতা নারীর অসামাজিক হৃদয়-সম্বন্ধের সমস্যাই এখানে প্রধান বিষয়। 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ীর তুলনায় 'গৃহদাহ'-এর অচলার সমস্যা প্রকৃতিতে পৃথক্ এবং জটিলও বটে। কিরণময়ী তার স্বামীকে ভালো-বাসতে পারে নি, অনঙ্গ ডাক্তারকে দেহদান করলেও সেখানে হৃদয়ের যোগ ছিল না—তাই উপেন্দ্রের প্রতি তার প্রেমচেতনা স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন হতে পেরেছে। কিন্তু অচলার ক্ষেত্রে দুই পুরুষের যুগপৎ আকর্ষণের ফলে সমস্যাটি অনেক জটিল। তার বিবাহ-পূর্ব জীবনেই এ সমস্যার সূচনা দেখা দিয়েছিল—"যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু কাহাকে ? কে সে ?" সেদিন অবশ্য আপন অন্তরকে চিনতে অচলার দেরি হয় নি। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনেও স্বামীর পাশাপাশি আর-একটি মানুষের ছায়া তাকে অনুসরণ করে ফিরেছে। নানা ঘটনার সঙ্গে ঘুলিয়ে আপন অন্তরকে সেদিন স্পষ্টভাবে অচলা বোঝে নি। অচলার জীবনে সমস্যা এসেছে এই পথে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটিও বিবাহিতা নারীর প্রেমজীবনের সমস্যার উপর স্থাপিত। নারীর জীবনে দুটি পুরুষের মধ্যে একজন তার স্বামী, অন্যজন তার প্রণয়প্রার্থী। 'ঘরে-বাইরে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩২২ সনের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এর অব্যবহিত পরেই (১৩ ৩ সন, ১৯১৬ খ্রী)। 'গৃহদাহ' যদিও এর পূর্বেই পরিকল্পিত হয়েছিল, কিন্তু রচনাটি সম্পূর্ণ লিখিত হয় 'ঘরে-বাইরে'র পরে। শরৎচন্দ্র যেরূপ রবীন্দ্র-রচনার ভক্ত ছিলেন--বিশেষত 'চোখের বালি' সম্পর্কে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা থেকে স্বাভাবিক অনুমান করা চলে যে 'ঘরে-বাইরে'র মতো রচনা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করলে 'গৃহদাহ'-এর উপর 'ঘরে-বাইরে'র প্রভাবের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ত্রিকোণ-প্রেমের সমস্যার দিক থেকে উপন্যাস দুটি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। প্রধান চরিত্র তিনটিও অনেকটা সদৃশ। দাম্পত্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মহিমের জীবন-দৃষ্টি নিখিলেশেরই অনুরূপ। স্ত্রীকে ভালোবাসায় যদি জয় করতে না পারে, তাহলে সামাজিক অধিকারের দাবিতে সে জবরদস্তি করবে না।

মহিমের উক্তি : (ক) ভালবাসার ওপর জোর খাটে না অচলা।

(খ) যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হবে, এত বড় অন্যায় উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার উপর করতে পারব না।

নিখিলেশের উক্তি : (ক) বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তাহলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

(খ) দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না।

(গ) আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেই জন্যেই আমি তালা দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাইনি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না।

অসংযত কামনা ও ন্যায়-নীতিহীনতার প্রতিমূর্তি রূপে সুরেশ সন্দীপকে স্মরণ করায়। অচলার দ্বিধাবিভক্ত সত্তার বিমলারই আর-এক রূপ।

অবশ্য কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে, পরিস্থিতিনির্মাণে, পরিণতির চিত্রাঙ্কণে শরৎচন্দ্র স্বকীয়তার পরিচয়ও রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকে ব্যবহার করেছিলেন, শরৎচন্দ্র সেক্ষেত্রে সমস্যাটিকে সামাজিক-পারিবারিক জীবনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রধান চরিত্র তিনটি জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের সত্যকে জেনেছে। আত্মকথনের ভঙ্গিতে লিখিত উপন্যাসটিতে তিনটি চরিত্রই প্রায় সম-প্রাধান্য লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনবোধের এই গভীরতার দিকটি বিশেষ নেই। ঔপন্যাসিক অচলা-চরিত্রটিকেই মুখ্যত লক্ষ্য করেছেন এবং তার সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষ চরিত্র দুটি সেই প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং একজন কিছুটা অস্পষ্ট ও অন্যজন অপরিণত।

শুধু 'ঘরে-বাইরে'ই নয়, পূর্ববর্তী 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও গোরা' উপন্যাসেরও কিছু প্রভাব 'গৃহদাহ'-এ পড়েছে। মহিম ও সুরেশ—বিপরীত-স্বভাব এই বন্ধুযুগলের চরিত্র-পরিকল্পনা 'চোখের বালি'র বিহারী ও মহেন্দ্রকে অনিবার্যভাবে স্মরণ করায়। দুই বন্ধুর একজন ধীরপ্রকৃতি, অন্তর্মুখী ও সংযতচিত্ত; অপরজন উদ্দাম, চঞ্চল ও প্রবৃত্তিপরবশ। একজন দরিদ্র, অপরজন ধনী। উভয়েই একই নারীর প্রণয়প্রার্থী। উপন্যাস দুটির উপসংহারে বিনয়-বিনোদিনী এবং মহিম-অচলা কথায় ও ভাবনায় বেশ কাছাকাছির মানুষ। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, চরিত্রবিশেষের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রকাশে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে 'চোখের বালি'র ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। মহিমের রোগশয্যায় বসে সুরেশের ভাবনা মনে আসতেই অচলার ভয় হয়েছে— সে কি নিজের অজ্ঞাতসারে সুরেশকে ভালোবেসে ফেলেছে? কিন্তু 'প্রতিবারই এ আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল।' 'চোখের বালি' উপন্যাসে দেখি, মহেন্দ্র যখন বিহারীর বিরুদ্ধে আশার প্রতি গোপন অনুরাগ পোষণের অভিযোগ এনেছে, তখন বিহারী একে 'অন্যায়, অসঙ্গত, অমূলক' বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে পরস্ত্রী কমলাকে নিয়ে রমেশের যে সংকট, 'গৃহদাহ'-এর সুরেশ আর অচলার জীবনেও অনুরূপ সংকটের চিত্র দেখা যায়। (রমেশকে কমলা স্বামী বলে জানে, এতেই যা পার্থক্য।) এই পর্বে 'নৌকা-ডুবি'-র চক্রবর্তী খুড়োরই বিকল্প চরিত্র 'গৃহদাহ'-এর রামবাবু। রামবাবুর

সংস্কারান্ধতার দিকটি বাদে দুটি চরিত্র মোটামুটি এক ধরনের। ব্রাহ্মসম্প্রদায়-ভুক্ত কেদারবাবু ও তাঁর কন্যা অচলার পারিবারিক জীবনের ছবি—এই পরিবারে হিন্দু যুবক মহিমের প্রবেশ—মহিম-অচলার প্রেম—অচলার পাণি-প্রার্থী মহিম প্রভৃতি প্রসঙ্গ 'নৌকাডুবি'-র ব্রাহ্ম পরিবারের—অন্নদাবাবু ও তাঁর কন্যা হেমনলিনী—হেমনলিনীর প্রেমাকৃষ্ট হিন্দু যুবক রমেশ কর্তৃক হেমনলিনীর পাণিপ্রার্থনা প্রভৃতি প্রসঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। 'নৌকাডুবি'র ক্ষেমংকরী 'গৃহদাহ'-এ সুরেশের পিসিতে রূপান্তরিতা। উভয়েই নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা—দীর্ঘকালীন অভ্যাস ও সংস্কারবশে হিন্দুসমাজের আচার মেনে চলেন, ছোঁয়াছুঁয়ির বাদবিচার করেন। কিন্তু সত্যিকারের ঘৃণা কাউকে করেন না।

সুরেশের পিসি অচলাকে বলেছেন : "আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে বলে কি এমনি নির্বোধ, এত হীন বৌমা, যে, শুধু ধর্মমত আলাদা বলে তোমার মত মেয়েকেও কাছে বসাতে সংকোচ বোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দূরের কথা।" ছোঁয়াছুঁয়ির বাদবিচার সম্পর্কে অচলার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—'সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার।' ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে বলেছেন—"কী করিব মা, সংস্কার, উহার ভালোমন্দ জানি না—না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই ছুঁই করি, কিছু মনে করিয়ো না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস।"

আবার, সুরেশের প্রচণ্ডতা ও অস্থিরতা, মহিমের সংযম ও ধীরতা, অচলার স্থৈর্য ও দৃঢ়তা সাধারণভাবে 'গোরা' উপন্যাসের গোরা, বিনয় ও সুচরিতাকে মনে করিয়ে দেয়। মহিমকে ব্রাহ্মপরিবারের প্রভাব হতে মুক্ত করতে গিয়ে ব্রাহ্ম-দ্বেষী সুরেশ নিজেই সেখানে জড়িয়ে পড়েছে। বন্ধু বিনয়কে ব্রাহ্ম মেয়ের আকর্ষণ হতে রক্ষা করতে গিয়ে গোরারও অনুরূপ অবস্থা ঘটেছে।

হিন্দু সুরেশের মুখের দুটি উক্তি স্মরণ করা যাক্ :—

(ক) "যখন হিন্দুর বংশে জন্মেচি, তখন হিন্দুসমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ।"

(খ) (মহিমের প্রতি) "তোমাকে ভালবাসি, এবং আরও কত বেশি ভালবাসি আপনার সমাজকে।"

আর গোরার চরিত্রেও এই হিন্দুত্বের গৌরবের দিকটিই তো প্রধান। সে বলে, "আমি যে হিন্দু। হিন্দুধর্মের গূঢ় মর্ম আজ না বুঝি তো কাল বুঝব—কোনোকালে যদি না বুঝি তবু এই পথে চলতেই হবে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে পূর্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই তো এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, এমনি করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের ভিতর

দিয়েই এর চরমে উত্তীর্ণ হব। যদি কখনো ভুলে অন্য পথের দিকে একটু হেলি আবার দ্বিগুণ জোরে ফিরতেই হবে।"

আরও কিছু সাধর্ম্যের উদাহরণ :

সুরেশের দৃষ্টিতে অচলা : "মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত মুখের ডৌলটিই সুশ্রী এবং সুকুমার। চোখ দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থির বুদ্ধির আভা।"

সুচরিতার বর্ণনা : "সে কী মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপোলের কোমলতার মধ্যে কী সুকুমারভাবে প্রকাশ পাইতেছে। হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কী আশ্চর্য আলোর মতো ফুটিয়া পড়ে। ললাটে কী বুদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা।"

অচলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর সুরেশের যে মানস প্রতিক্রিয়া, সুচরিতাকে দেখবার পর গোরার অনুভূতির সঙ্গে তা তুলনীয়। এই আশ্চর্য সৌন্দর্য উভয়কেই বিস্ময়ে অভিভূত করেছে—উভয়েরই মর্মমূলে নাড়া দিয়েছে। অবশ্য গোরার উপলব্ধিতে যে গভীর দার্শনিকতা ও কাব্যসৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে, সুরেশ সেখানে পৌঁছাতে পারেনি।

শরৎচন্দ্র যে সচেতনভাবে এ-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে যে ছাপ তাঁর মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে, আপন রচনায় তার প্রতিবিম্বন ঘটেছে। আত্মীকরণের ক্রিয়া সর্বত্রই প্রায় সার্থক, কেবল আত্মিক গভীরতা ও মনন-মূলকতার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আপেক্ষিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২

অধিকাংশ সমালোচক 'গৃহদাহ'কে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন। কয়েকটি অভিমত দেখে নেওয়া যেতে পারে।

(ক) "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

(খ) "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাতে নারীহৃদয়ের গভীরতম রহস্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস অদ্বিতীয়। কাহিনীর আরম্ভ, পরিণতি ও পরিসমাপ্তির মধ্যে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কোথাও একটি ঘটনা অনাবশ্যকরূপে বড় হইয়া উঠে নাই; কোন অংশ হঠাৎ খণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই। প্রত্যেকটি খণ্ডচিত্রই নিখুঁত হইয়াছে, আবার সকল খণ্ডচিত্রই হইয়াছে একটি বৃহত্তর অংশের ঐক্যমাত্র। (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

(গ) "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।...ইহাকে একখানি নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস বলিলে অতিরঞ্জিত উক্তি হয় না।...এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নরনারীর অজ্ঞেয় ও রহস্যময় মনের গভীরে আলোকপাত করিয়া বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির যে নিষ্ঠুর ও মর্মঘাতী সংগ্রামের রূপ দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।...লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ, সংস্কারমুক্ত ও পক্ষপাতশূন্য। গঠনকৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (ডঃ অজিতকুমার ঘোষ)

সন্দেহ নেই, কাহিনীর ঘনাপিদ্ধতা ও সংহতি, ঘটনার দ্রুতগতি ও ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবেশনির্মাণের কৌশল ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা 'গৃহদাহ' উপন্যাসটিকে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে এবং উপন্যাসশিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্র এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। নরনারীর হৃদয়সম্বন্ধের যে নিষ্ঠুর ও বাস্তব রূপ শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, স্বতন্ত্রভাবে দেখলে তার মূল্যও কম নয়। একালের বাংলা কথাসাহিত্য অন্ততঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কাছে যথেষ্ট ঋণী।

কিন্তু 'গৃহদাহ'-এর দুর্বলতাও কম নয়। ঘটনার মধ্যে প্রচুর আকস্মিকতা, চরিত্রব্যাখ্যাও বহুস্থলে অবিশ্বাস্য অথবা অসম্পূর্ণ। চরিত্রের কথা ও আচরণ অনেক সময় আতিশয্যদুষ্ট মনে হয়। বিভিন্ন ধরনের কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক্ :

(ক) মহিম ভিন্ন সমাজের মেয়ে অচলাকে বিবাহ করতে চায়। এ ব্যাপারে সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করতেও প্রস্তুত। কিন্তু দীর্ঘদিন মহিমকে অচলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে দেখা যায় নি। সে কখনও গ্রামে যায়, কলকাতায় আসে প্রয়োজনে, কিন্তু অচলার সঙ্গে দেখা করবার অবসর পায় না, বোধহয় প্রয়োজনও অনুভব করে না। অচলাকে সে চিঠিও লেখে না। এভাবে মহিমের অনুপস্থিতির সুযোগে লেখক সুরেশকে অচলাদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন, কিছু জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ তৈরি করেছেন। কিন্তু মহিমের এরূপ আচরণের সংগত কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি।

(খ) অচলার সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ের পরেই সুরেশ আপন বিবাহ-প্রসঙ্গে বলে বসে—"আপনাকে না জানিয়ে আপনার মত না নিয়ে এ-সব কখনো হবেই না, কারণ আপনাকে মহিমের সঙ্গে পৃথক্ করে দেখবার সাধ্য আমার নেই।" এ উক্তি আতিশয্যদুষ্ট।

তেমনি অস্বাভাবিক মনে হয় তার মুহূর্তকাল পরের উক্তি—"আমার ভয় হয়, যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনি কি সুখী হতে পারবেন ?"

অচলার সামান্য কথাতেই আত্মবিস্মৃত সুরেশ হঠাৎ আবেগভরে অচলার হাত টেনে নেয়, দু-একটি কথা বলেই আবার অপরিসীম লজ্জায় হাত ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এ-সব চিত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়।

(গ) অচলার অনেক উক্তি ও আচরণও অস্বাভাবিক মনে হয়। স্বামীর সঙ্গে কলহ ও অনেক কটুবাক্য বিনিময়ের পর অচলা এক সময়ে বলেছে—"এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেচে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।"

স্বামীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও সেই মুহূর্তের মানসিক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ রূপেও এ ধরনের উক্তি অতিশয়িত মনে হয়। অথচ উক্তিটিকে ঘটনাধারায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—সুরেশের অচলাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে এ উক্তির দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়েছিল।

আবার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে বায়ু-পরিবর্তনোদ্দেশে বহির্যাত্রায় সুরেশের সঙ্গে অচলার একান্তে অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলা, কথা বলতে বলতে লজ্জায় রাঙা হয়ে যাওয়া, সহযাত্রিণীর প্রশ্নে অন্যমনস্কভাবে সুরেশকে স্বামীরূপে পরিচয় দান, সুরেশের 'র‍্যাপারে'র খুঁট টেনে ধরে অচলার কথা বলা এবং সে দৃশ্যটি আবার মহিমের চোখে পড়া প্রভৃতি অনেক ঘটনাই বড়ো বেশি সাজানো মনে হয়।

(ঘ) মহিমের আচরণও সর্বত্র যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তার অতিরিক্ত গাম্ভীর্য একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়।

মৃণালের লেখা একটি চিঠি অচলার হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে ঔপন্যাসিক তার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন এবং স্বামী-স্ত্রীর বিরোধে নূতন ইন্ধন জুগিয়েছেন, কিন্তু এই মিথ্যা সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব কি মহিমের ছিল না? অচলার এরূপ ভুল হত না 'একবার যদি সে মৃণালের ঐ ভাষাটুকুর উপরেই তাহার সমস্ত চিত্ত ঢালিয়া না দিয়া সেই মৃণালকে একবার ভাবিবার চেষ্টা করিত।' অচলার এ সন্দেহকে যদিও বিশ্বাস করা যায়, মহিমের নিষ্ক্রিয়তাকে নয়।

এ চিঠির ভাষাও আতিশয্যদুষ্ট।

(ঙ) উপন্যাসে অতি-নাটকীয় মুহূর্তের বহুলতায় সামাজিক উপন্যাসের বস্তুধর্মিতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখানে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সুরেশ ও মহিমের উপস্থিতি ঘটে।

(চ) সবচেয়ে অবিশ্বাস্য হল সুরেশের অচলাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি।

প্রথমত, মহিম ও অচলা বিদেশযাত্রায় পৃথক শ্রেণীর যাত্রী কেন ? সামান্য অর্থ সাশ্রয়ের যুক্তি অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়ত, সুরেশের এ স্খলন কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে ?

তৃতীয়ত, অচলা এমন একটি অসম্মানজনক ঘটনা এবং তজ্জনিত অবস্থা-সংকটকে অসহায়ভাবে মেনে নেবে কেন ?

সুরেশের প্রতি মোহ থাকলেও তার পক্ষে এ স্বাভাবিক নয়।

(ছ) মৃণাল চরিত্রটি বিশেষভাবে উদ্দেশ্যমূলক এবং সে কারণেই চরিত্রটি অত্যধিক প্রাধান্য পেয়েছে। হিন্দুধর্মের অত্যাজ্য পতি-সংস্কারের আদর্শটি তার মাধ্যমে প্রচার করা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য এবং বড়ো সহজেই তাকে জয়ী করে তোলা হয়েছে। অচলার সমস্যাচিত্রণে শরৎচন্দ্র যতটা আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন, সেই বস্তুতন্ত্রতা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে মৃণালের মধ্য দিয়ে সংস্কারের মহিমা ঘোষণায়।

একদিকে রামবাবুর আচারপরায়ণতাকে আঘাত করে শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল আধুনিকদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, অন্যদিকে মৃণালের সতীত্ব সংস্কারের জয়ধ্বনি দিয়ে রক্ষণশীল প্রাচীনদের তুষ্টিবিধান করেছেন। উভয় গোষ্ঠীর কাছেই শরৎচন্দ্র প্রিয় হতে পেরেছেন, কিন্তু মনন-নির্ভর ঋজু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি।

৩

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহিমের চরিত্রের পরিকল্পনায় 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু নিখিলেশের মধ্যে জীবনবোধের যে গভীরতা, মহিম-চরিত্রে তা অনুপস্থিত। নিখিলেশ ভাবপ্রবণ, কল্পনাপরায়ণ ও আদর্শনিষ্ঠ। দাম্পত্য প্রেম সম্পর্কে, দেশসাধনা সম্পর্কে তার নিজস্ব একটি দর্শন আছে। তার চিন্তায় ও আচরণে এই জীবনাদর্শের প্রকাশ। কোথাও তাকে অস্পষ্ট অসমঞ্জস মনে হয় না। তুলনায় মহিম অনেক অস্পষ্ট। নিখিলেশের তুল্য ব্যক্তিত্ব বা জীবনবোধের অধিকারী হতে না পারায় অপরাধ নেই, চরিত্র হিসাবেই মহিম সত্য হয়ে ওঠে নি—চরিত্রসৃষ্টির দুর্বলতা সেখানে।

বিবাহ-পূর্ব জীবনে মহিম ঠিক কিভাবে অচলাকে আকর্ষণ করেছিল তা বোঝা যায় না। আর যে মহিম অচলাকে ভালোবেসে আপন সমাজ ও বন্ধুকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে প্রস্তুত, তার নির্বিকার ঔদাসীন্যের কারণও স্বচ্ছ

নয়। স্ত্রীর প্রতি তার আচরণ অকারণে কঠোর ও সহানুভূতিহীন। 'মহিম চিরদিনই নিঃশব্দ প্রকৃতির লোক; আবেগ উচ্ছ্বাস কোনদিন প্রকাশ করিতে পারে না'—এ ব্যাখ্যায় তার অকারণ কাঠিন্যের উত্তর মেলে না। যে অচলা সকল বাধা অগ্রাহ্য করে স্ত্রীরূপে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আবাল্য শহরবাসী হয়েও গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশে বাস করতে দ্বিধা করেনি, স্বামীর দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছে, তার প্রতি মহিমের নির্লিপ্ত ব্যবহারের মধ্যে একটি আশ্চর্য শীতলতা আছে। 'অচলাকে সে (মহিম) যথার্থই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালোবাসিয়াছিল।'—ঔপন্যাসিকের এ মন্তব্য সত্ত্বেও চরিত্রের মধ্যে সত্যটি সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি।

তাদের দাম্পত্য জীবনের পরিণাম অনেকটা তার নিজের সৃষ্টি। অচলার কাছে সে নিজেকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারেনি—প্রকাশ করবে না এই যেন তার সংকল্প। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের আবরণে সে নিজেকে আবৃত করে রেখেছে।

তবে তার স্বভাবে যে স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা আছে, তার গৌরব তার অবশ্য প্রাপ্য। বাইরের আঘাত ও আক্রমণের সঙ্গে প্রেমের অপমানের বেদনা সে নিঃশব্দে বহন করেছে। তার গৃহ বাহির ও ভিতর থেকে জ্বলে উঠেছে সে দাহিকাশক্তিকে সে আপনার মধ্যে সংহরণ করে নেবার সাধনা করেছে। তার পর একদিন তার কাছে আহ্বান এসেছে প্রতিকূল পরিপার্শ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের। অচলার সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে। সে সমাধান সহজসাধ্য নয়। অচলাকে গ্রহণ করা বা ত্যাগ করা—কোনোটিই সহজ নয়।

সেদিন দ্বিধা ছিল, কিন্তু একে জয় করবার ইচ্ছাও ছিল। সংস্কারান্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামবাবুর নিষ্ঠুরতায় মহিমের মনে প্রশ্ন জেগেছে এ কোন্ ধর্ম যা স্নেহের মর্যাদা অস্বীকার করে নিঃসহায় নারীকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে? মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তাই বা কী? ধর্মের নামে আচারপরায়ণতাকেই যে স্বীকার করে নিয়েছে, যার সামান্যতম স্খলনকেও সে পাপ বলে মনে করে, অন্তরে সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করছে? এ প্রশ্ন শরৎচন্দ্রেরই। হিন্দুধর্মের জড়তা ও সংস্কারান্ধতাকে তিনি এভাবে বারেবারেই আঘাত করেছেন। যে-মহিমের মধ্য দিয়ে এ-সব প্রশ্ন তিনি করেছেন, তার এ মুক্তদৃষ্টি ছিল। তবু শেষ গৌরবটুকু ঔপন্যাসিক প্রকাশ্যে তাকে দিতে চাননি। তাই আত্মবিশ্লেষণের অন্তরালে তার সাময়িক পলায়ন-প্রচেষ্টা এবং সেই দ্বিধা থেকে মৃণালের সাহায্যে তাকে রক্ষা পেতে হয়। ঔপন্যাসিক মৃণাল-চরিত্রের 'মহিমা বাড়াতে

না চাইলে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব মহিমকেই দেওয়া হত এবং সেটিই অনেক বেশি স্বাভাবিক হত।

সুরেশ-চরিত্রে সংরাগরক্ত কামনার দিকটি চমৎকার ফুটেছে। তার আবেগ, অভিমান, অসংযম, লোভ ও কামনার চিত্রগুলি অত্যন্ত সজীব। কামনায় অন্ধ হয়ে সে তার বিচারবুদ্ধি হারিয়েছে, ঈর্ষার তাড়নায় হীন ও কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করেছে, নিষ্ফলতার ক্রোধে নিষ্ঠুর আঘাত করেছে। এ-সব মুহূর্তে 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপের চেয়েও সে বাস্তব। 'চরিত্রহীন'-এর সতীশের ছাঁচে চরিত্রটি অঙ্কিত, কিন্তু তার মধ্যে চাঞ্চল্য ও তীব্রতা বেশি।

কিন্তু শুধু কামোন্মত্ততায় একটি চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় নয়। সামগ্রিক বিচারে সুরেশ-চরিত্রের পরিকল্পনায় ত্রুটি আছে। তার আচরণের অসংগতির কিছু উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। এমন একটি প্রচণ্ড-মনোবেগসম্পন্ন মানুষ- যে দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য—কিন্তু কথায় কথায় তার চোখে জল আসে। চরিত্রটির ভারসাম্য এর ফলে নষ্ট হয়েছে।

কয়েকটি চিত্র :

(ক) 'আমার ভয় হয়, যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন?' বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দুটো অশ্রুজলে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল।

(খ) 'তুমি যে আমার নও, আর একজনের, একথা আমি ভাবতেও পারিনে। তোমাকে পাব না মনে হলে আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত যেন টলতে থাকে।'······গাড়ী গলিতে ঢুকিতেই একটা উজ্জ্বল আলো সুরেশের মুখের উপর পড়িয়া তাহার দুই চক্ষুর টল্‌টলে জল অচলার চোখে পড়িয়া গেল।

(গ) 'ব্যস, এই আমার চিরজীবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশি আর চাইনে।' বলিয়া এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, 'তুমি যখন পাষাণ নও, তখন এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, কিন্তু তোমার হাত থেকে দুঃখই যখন শুধু পেয়ে এসেচি, তখন তোমারও সমস্ত দুঃখের বোঝা আজ থেকে আমার থাক—এই বর আজ মাগি—আমাকে ভিক্ষা দাও।' বলিতে বলিতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

এরূপ চিত্র আরও আছে। সুরেশের মধ্যে অনেক আপাত-বিরোধ ছিল, এটি লেখকের যুক্তি। কিন্তু সাহিত্যে এর সবটাই দেখাবার প্রয়োজন নেই। এই আতিশয্যমূলক চিত্রে চরিত্রটির গৌরব বাড়েনি। আর প্রয়োজনের কথা যদি তোলা যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—এই চোখের জলেই কি সে অচলার মন

জয় করতে চেয়েছিল, অথবা পেরেছিল ? আসলে ঔপন্যাসিক সুরেশ-চরিত্রে একটি আবেগপ্রবণ, খেয়ালী, ব্যর্থপ্রেম মানুষের বেদনার দিকটি দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য চোখের জলের উপর এত বেশি নির্ভর করার প্রয়োজন ছিল না।

চরিত্রটির পরিণতি সু-অঙ্কিত। অচলা সম্পর্কে তার বিচার ভুল হয়েছে, দেহধর্মকেই সে বড়ো করে দেখেছিল, যে-কোনো উপায়ে প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছিল—একদিন তার ভুল ভেঙেছে; সেদিন 'ক্ষমা চেয়ে কাব্য করবার' বা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা সে দেখায় নি। আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করবার বলিষ্ঠতা, অনিবার্য পরিণামকে মেনে নেবার শক্তি সে দেখিয়েছে।

অচলা-চরিত্রে শরৎচন্দ্র নারীর দ্বৈত আকর্ষণের চিত্র দেখাতে চেয়েছেন। অচলার কুমারী-জীবনে দুই বন্ধু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হৃদয় কাকে চায়, সেদিন এ নিয়ে তার মনে প্রশ্ন ছিল না। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য সুরেশের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কিন্তু এর বিনিময়ে সে মহিমকে অস্বীকার করে সুরেশকে বিবাহে সম্মত হয় নি। এমন কি, মহিমকে না পেলেও নয়। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেও সে ভয় পায় নি বা দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি।

কিন্তু দাম্পত্য জীবনে মহিমের অতি-নির্লিপ্ত ও নিরুচ্ছ্বাস প্রকৃতি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠবার পথে বাধা হয়ে উঠেছে। স্বামীর হৃদযের সন্ধান অচলা পায়নি, নিজেকেও পূর্ণ রূপে সমর্পণ করতে পারে নি। এর সঙ্গে মহিমের দারিদ্র্য, পল্লীর পরিবেশে অচলার নিঃসঙ্গ জীবন, মৃণালকে ঘিরে সন্দেহ প্রভৃতি অচলার মনকে আঘাত করতে শুরু করেছে। সমস্যাটি মূলত চরিত্রগত, সে সমস্যাকে পরিপার্শ্ব আবার প্রবল ও জটিল করে তুলেছে। সাময়িক উত্তেজনাবশে অচলা মুখে যদিও বলেছে যে স্বামীকে সে ভালো বাসে না, তার অন্তরের কথা কখনও তা নয়। দুঃখের দিনে এ সত্য আপনা থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। অগ্নিদাহের ফলে সর্বস্বান্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অচলার হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। এমন বিপদের দিনে সে তার সকল জাগতিক সম্পদ ও অন্তরের ঐশ্বর্য নিয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে। বলেছে—'আমার গলায় ছুরি দিলেও, এখন তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমি যেতে পারব না।' সেদিন মহিম সহজ মনে স্ত্রীর এ মনোভাবকে যথা-মূল্য দিতে পারলে ভালো হত।

আবার অসুস্থ স্বামীকে সেবাযত্নের মধ্য দিয়ে যেদিন অচলা কাছে পেয়েছে সেটি তার জীবনের স্মরণীয় দিন। মহিম আকুল কণ্ঠে তার সেবা-সান্নিধ্য

কামনা করেছে এবং এর প্রতিক্রিয়ায়—'আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর স্বর্গে যাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা মিশিয়া যেন তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল।'

অচলার দুর্ভাগ্য যে তার জীবন সরল পথে চলে নি। মাঝখানে সুরেশ এসে হিসাবে গরমিল করে দিয়েছে। কিন্তু সুরেশের প্রতি অচলার প্রকৃত মনোভাব কী ছিল? প্রথম পর্বে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা, আর ছিল করুণা ও সহানুভূতি। তাকে বিবাহ করবার জন্য সুরেশের কাতর অনুনয়ে ও চোখের জলে নারীর হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই হয়তো কখনও বিচলিত হয়েছে এবং এমন একটি মুহূর্ত এসেছে যখন "মুহূর্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েচেন।"

এ দুর্বলতা স্পষ্টতই করুণাপ্রসূত। সুরেশের প্রেমের প্রতিদান দেবার অক্ষমতায় অচলা যে বেদনা বোধ করে, সে দুর্বলতা মানবিক। সুরেশের শীর্ণ চেহারা দেখে অচলার উদ্বেগ প্রকাশ এবং তাদের সহযাত্রী হবার অনুরোধও সহানুভূতি ও মমত্ববোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। তবু অচলার চোখের জল নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

আপন বিকৃত কামনার দর্পণে সুরেশ অচলাকে দেখেছিল। অচলার বন্ধুত্ব, প্রীতি ও সহানুভূতিকে সে ভুল বুঝেছিল। এ ব্যাপারে অচলার দায়িত্বও ছিল। আপন জীবন দিয়ে সুরেশ একদিন অচলাকে বুঝেছে। মহিমকে সে বলেছে—'অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝ নি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি।' অচলাও বলেছে—'যাহাকে কোনদিন ভালবাসে নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না?' স্বামীর প্রতি গভীর ও অবিচল প্রেম ছিল বলেই প্রচণ্ড দুর্যোগের পরেও অচলা বলতে পেরেছে—'তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই', 'তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই করব', 'তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না।' দুর্বল দেহ নিয়ে স্বামীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে স্থির কণ্ঠে বলেছে—'আর আমি দুর্বল নই, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল, যেতে পারব।' বিবাহের সময় শুভদৃষ্টির মুহূর্তে মনে মনে যে শপথবাণী উচ্চারণ করেছিল—'প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিনে

কেন, সেই আমার স্বর্গ ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজ-প্রাসাদ ।' সেটিই এতদিনে এভাবে উপলব্ধির সত্য হয়ে উঠেছে ।

অচলার জীবনের মধ্যবর্তী একটি অধ্যায়ই সর্বাপেক্ষা জটিল। সুরেশ তাকে ভুল বুঝিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে এনেছিল। কিন্তু তারপর সুরেশের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও অচলা এ অবস্থা মেনে নিয়েছে কেন ? সে ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়ে—শিক্ষিতা ও স্বাধীনচেতা। স্বামী বা পিতার নিকট ফিরে যেতে যদি সেই মুহূর্তে সংকোচও থাকে, তবু সুরেশের আশ্রয় ছেড়ে সে স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবন যাপনের কথা ভাবেনি কেন ? এর একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে সুরেশের প্রতি তার অসংজ্ঞান মনের আকর্ষণ ছিল। এ ব্যাখ্যায় ঔপন্যাসিকেরও সমর্থন আছে। সুরেশকে আপন অগোচরে ভালোবেসে ফেলেছে কি না, এ সন্দেহ অচলার মনেও একসময়ে জেগেছে। রুগ্ন স্বামীর শিয়রে বসেও অচলাকে তার সম্পর্কে সুরেশের আগ্রহ-ঔদাসীন্য নিয়ে ভাবতে দেখা যায়। সুরেশকে ভালোবাসার সন্দেহকে সে অবশ্য 'অসঙ্গত অমূলক' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, তবু 'ছায়ার মত কথাটি তার মনের পিছনে' লেগে রয়েছে। তার ঘুমন্ত দেহের উপর সুরেশ আপন কম্বলটি সযত্নে বিন্যস্ত করে দিয়ে গেছে—কল্পনায় সুরেশের সেই মুহূর্তের 'আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি' অনুভব করে অচলা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। অচলার কিছু আচরণ ও উক্তিও এ মনোভাবের সমর্থনে দেখানো যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সন্ধান মেলে শেষ পর্বে অচলার আত্মসমীক্ষায়—"কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল ? কে বাধাইল ? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে, এই কি কেবল এত বড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে ? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ কোন মোহ ছিল না ? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই ?" পুরুষের কামনাপ্রবণ মূর্তিটি নারীর মনে মোহসঞ্চারও করেছিল। অচলার এই দ্বৈত সত্তার ব্যাখ্যা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য।

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সুরেশের প্রতি বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও তাকে সুখে রাখবার জন্য তার যে বিপুল আয়োজন, তার 'দুর্নিবার মোহ'ও অচলাকে এক দিক থেকে আকর্ষণ করেছে। যে সমাজ, সংস্কার ও জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে অচলা বড়ো হয়ে উঠেছে, সেখানে ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রতি মানুষের আকণ্ঠ পিপাসাকেই সে দেখেছে। হিন্দুধর্মের অনুকরণে সেখানে পরকালের আশায় ইহলোকের সুখভোগ থেকে মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করে না। অচলাও সেই

জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ও অভ্রান্ত। হিন্দুনারীর 'অত্যাজ্য সতীধর্মে'র সংস্কারেও তার বিশ্বাস নেই। তাই সুরেশের সঙ্গে তার অসামাজিক সম্বন্ধে লজ্জা ও অপমান বোধ করলেও ধর্ম ও পরকালের ভয় তার মনে জাগেনি।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে—সুরেশের প্রতি মোহের শক্তি কি এত প্রবল যা অচলাকে একত্র নিশিযাপনে প্রবৃত্ত করিয়েছিল? তাহলে অচলার পরমুহূর্তের মূর্তিটি কখনও এরূপ হত না—'তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।' ঘটনাটিকে ঔপন্যাসিক মূলতঃ পরিপার্শ্বনির্ভররূপে দেখিয়েছেন। এর সঙ্গে অচলার অসংজ্ঞান মনের আকর্ষণের কোনো সংযোগ নেই। ডিহরী-বাস পর্বে অচলার মূর্তিটি তাই সর্বদাই বিষণ্ণ, রিক্ত ও করুণ। কিন্তু অচলা আদৌ কেন এ অসম্মানজনক প্রতিদিনের একত্র বাসের ব্যাপারটিকে মেনে নিয়েছে, তার কোনো সংগত ব্যাখ্যা নেই। অচলা স্বামীকে ত্যাগ করে সুরেশকে গ্রহণ করতে পারে, অথবা, একক জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু এই মিথ্যাকে সে আশ্রয় করতে পারে না। ঔপন্যাসিক একটি দুঃসাহসিক দৃশ্য আঁকবার প্রলোভনে অচলার প্রতি অবিচার করেছেন। চরিত্রসৃষ্টির এটুকুই যা ত্রুটি।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে একই সঙ্গে রক্ষণশীল ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় এবং আশ্চর্য কৌশলে তিনি তাঁর সাহিত্যে এ দুয়ের সহাবস্থানও দেখিয়েছেন। হয়তো এভাবে একটা সমতা রক্ষা করার গোপন ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিল। তাই 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ীকে এঁকেছেন, তো পাশে সুরবালাও আছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অভয়া আছে, আবার অন্নদাদিদিও আছেন। শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা পেয়েছে অন্নদা-সুরবালারা—হিন্দুনারীর অত্যাজ্য পতি-সংস্কার ও স্বামী-স্ত্রীর জন্মজন্মান্তরীণ সম্বন্ধে যাদের বিশ্বাস অটল। 'গৃহদাহ' উপন্যাসেও শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অচলাকে এঁকেছেন, আবার তার বিপরীতে হিন্দুসমাজের বিধবা মৃণালকেও এনেছেন। পদে পদে তিনি মৃণালকেই জিতিয়ে দিয়েছেন। বাইরের দিক থেকে দেখলে সংসারে সে পায়নি কিছুই—বৃদ্ধ স্বামী, রুগ্না শাশুড়ীকে নিয়ে নিঃসন্তান নারীর সংসার; শেষ পর্যন্ত সে বিধবা। তার আদর্শ হিন্দু নারীর একনিষ্ঠতার সংস্কার। তার কথায়—'স্বামী জিনিসটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য।' স্বামী যে-ই হোন, যেমনই হোন, তিনিই তার ইহকাল, তিনিই তার পরকাল। এই সতীধর্মের জোরেই মৃণাল সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী—মহীয়সী নারী। সকলেই তার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। সুরেশ

বলেছে—'এ হতভাগ্য দেশের আজও যদি কিছু গৌরব করবার থাকে ত সে তোমার মত মেয়েমানুষ। ব্রাহ্ম কেদারবাবু পর্যন্ত বলেছেন—'এ মেয়ে স্ত্রী-লোকের মধ্যে রত্ন।' মহিমও শেষ পর্যন্ত মৃণালের 'পরেই অচলার আশ্রয় সন্ধানের ভার দিয়েছে। মৃণালের উত্তর কী হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো অনুমানের অবকাশ থাকে না এবং তার উত্তর স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট। মহিমকে সে বলেছে—"আশ্রমই বল আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এ-খবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।" গার্হস্থাশ্রম বা গৃহাশ্রয়ই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, পাতিব্রত্যই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ উপন্যাসের বক্তব্য কি তাহলে এই? একালের অচলাদের বিপরীতে মৃণালই কি শরৎচন্দ্রের উত্তর?

হিন্দুধর্মের শিক্ষায় মৃণাল সহজ উত্তরাধিকারসূত্রে যে বিশ্বাস লাভ করেছে, ব্রাহ্ম সমাজের অচলা সে শিক্ষা পায়নি বলেই তার জীবনের ভিত্তি এত দুর্বল—কেদারবাবু ও অচলা উভয়কে দিয়েই শরৎচন্দ্র এরূপ স্বীকারোক্তি করিয়ে নিয়েছেন। মৃণাল ও অচলাকে বলেছিল :—"আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার ধারা আলাদা ভাই,······তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু এ-কথা আমার ভুলেও অবিশ্বাস কোরো না যে, স্বামীকে যে স্ত্রী ধর্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক্, আর মুক্তই থাক্ এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যত বড় বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে।" জীবনের অভিজ্ঞতায় অচলাও এ সত্য স্বীকার করেছে।

কিন্তু এ বক্তব্য যেমন প্রচারমূলক ও অসম্পূর্ণ, তেমনি অন্যদিকে বড়ো বেশি সরলীকৃত। এ বক্তব্যে হৃদয়ের দিকটি উপেক্ষিত। সংস্কারের মধ্যে সকল মানুষের আশ্রয় ঘটলে তো হৃদয়সমস্যার উপসর্গই থাকত না। এ সংস্কার যাদের মধ্যে নেই, তারাই কি চোরাবালির শিকার? আর সংস্কারানু-গত্যেই কি জীবনের পূর্ণতা ও চরিতার্থতা?

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আঙ্গিক প্রসঙ্গে

ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কৈশোর এবং দুরন্ত দুঃসাহসিক গল্পের মতো দায়িত্বহীন যৌবন নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রায় মধ্যবয়সে তাঁর নাটকীয় কথাশিল্পগুণে 'অপরাজেয়' হয়ে উঠেছিলেন। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব তাঁর পক্ষে কিছুটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কারণে যে ঠিক সেই সময়ে বাঙালী তার সামাজিক সত্তায় এক বিশেষ বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল এবং শরৎচন্দ্র সেই বেদনাটিকেই তীব্র অভিমানক্ষুব্ধ ভাষায় ও আবেগসিক্ত কাহিনী-বিন্যাসে ফোটাতে পেরেছিলেন।

একদিকে তখন হিন্দুসমাজের প্রচলিত পুরোনো মূল্যবোধগুলো ভাঙতে শুরু করেছে, সামাজিক ছাপ-মারা মানুষ আর মনের মানুষ যে এক নয় তা আমরা বুঝতে শুরু করেছি, প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে, অন্যদিকে প্রতি-ক্রিয়াশীল মন স্বভাবতই সংকট দেখে পুরোনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। এই সামাজিক দ্বন্দ্বে যাঁরা নিরাসক্ত শিল্পী-দর্শক তাঁরা 'চোখের বালি'র মতো সূক্ষ্ম ও চতুর শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা সেই দ্বন্দ্বের অন্যতম 'দরদী' প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁদের পক্ষে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে আবেগ সংযত রাখা শক্ত, বরং অভিমানে রঙীন হওয়াই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই এসেছে। এই বিক্ষোভই তাঁর গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই বিক্ষোভই তাঁর গল্প-কাহিনীকে শিল্প হিসেবে যেমন দুর্বল করেছে, তেমনি এই গল্প-কাহিনীগুলির ঘরোয়া নিটোল রূপ সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে দিয়েছে। এই বিক্ষুব্ধ অথচ নিটোল কাহিনী রচনার কারণ শরৎ-চন্দ্রের মনের দ্বিধা। সামাজিক সংস্কারে বিক্ষুব্ধ হয়েও, তর্কে-বিতর্কে উত্তেজিত হয়েও, শেষ পর্যন্ত, পুরোনো সামাজিক কাঠামোকেই শরৎচন্দ্র অসীম মমতায় জড়িয়ে ধরতে গেছেন। কাঠামোর মধ্যেই বন্দী থেকে 'হা বিধাতঃ' বলে বিলাপ করেছেন—যেন দু-চারটি দোষত্রুটি ও অবিচার দূর করতে পারলেই এমন মজবুত ও সামাজিক কাঠামো আর হয় না! কিছু কিছু প্রশ্ন রইল, তির্যক বিদ্রূপ রইল, অভিমানের অশ্রু বয়ে গেল, অথচ কাহিনীর ঘটনা-নির্ভর নিটোল রূপ অক্ষুণ্ন রয়ে গেল। কাজেই পাঠককে কিছুটা উত্তেজিত করা হলো, কিন্তু তার সংস্কারকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হলো না। উপরন্তু, গল্পের নাটকীয় বেগে তাকে

আচ্ছন্ন করে রাখা গেল। হেমাঙ্গিনীর পাশে কাদম্বিনী রইল। এলোকেশীর পাশে অন্নপূর্ণাকে রাখা হলো। অচলার পাশে রাখা হলো মৃণালকে। বিক্ষোভ বা বিদ্রোহের পাশাপাশি এই রকম প্রাচীন মূল্যবোধের আদর্শরূপকে বজায় রেখে শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল—দু-রকম পাঠকগোষ্ঠীরই মন জয় করে নিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর অনেকগুলি পারিবারিক ও সামাজিক গল্প-কাহিনীতে ব্যক্তি-সম্পর্কের সহজ সূত্রগুলি ছেড়ে দিয়ে তির্যক সম্পর্কের আতিশয্যকে প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কগুলি বিশেষত স্নেহ-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর ছেলের সম্পর্ক, নারায়ণীর সঙ্গে তার অল্পবয়সী দেওর রামের সম্পর্ক, কিংবা, পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমার সঙ্গে রমা ও রমেশের সম্পর্ক —প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিজের সন্তানের সঙ্গে সহজ সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা না খুঁজে শরৎচন্দ্র নারীর তির্যক স্নেহ-সম্পর্কের আতিশয্যকে প্রকাশ করেছেন। এই তির্যক পথে সব সময়েই অবরুদ্ধ স্নেহের আবেগকে মুক্তি দিয়ে শরৎচন্দ্র প্রচণ্ড ভাবালুতায় সাধারণ পাঠককে আচ্ছন্ন করেছেন। কিন্তু জটিল চারিত্রিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে তিনি অনেক সময়েই এড়িয়ে গেছেন। পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমার মধ্যে রমেশের জ্যাঠাইমা আর বেণী ঘোষালের মা-র দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব দেখানো যেতো এবং সেই দ্বন্দ্বেই ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক টানা পোড়েন খুব গভীরভাবেই প্রকাশ পেতে পারতো। ব্যক্তিত্বের এই গভীর বিপর্যয়কে এড়িয়ে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে শিল্পী-সুলভ দুঃসাহসিকতাকেও অনেক-খানি এড়িয়ে গেছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র নানা দুঃসাহসিক সমস্যা এনেছেন, কিন্তু, দুঃসাহসিক শিল্পীর মতো সেই-সব সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি।

২

সাধারণভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্যই হলো চরিত্রসৃষ্টি। যদিও কাহিনী এবং চরিত্রসৃষ্টিকে সব সময়ে আলাদা করা যায় না, কাহিনী ও কাহিনীর অন্তর্গত নাটকীয়তাই চরিত্রকে গড়ে তোলে, তবু শরৎচন্দ্রের কাহিনী সাধারণত কোনো বিস্তৃত পটভূমি বা সাধারণ জনতাকে অবলম্বন করে অসংখ্য চরিত্র এনে তার মধ্য থেকে দু-চারটিকে বড় করে দেখায় না। বরং অল্প কয়েকটি চরিত্র এনে পটভূমির ওপর ততটা নজর না দিয়ে, তার থেকেই নায়ক-নায়িকা এবং আরও দু-চারটি চরিত্রকে ব্যক্তিত্বে ভূষিত করার চেষ্টা করে। যেখানে ব্যক্তিত্বের উপযোগী কাহিনী নেই, সেখানে অবিশ্বাস্য ঘটনা বা ভাবালু বক্তৃতা দিয়ে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা চলে। যেমন, 'দেবদাস'-এর মধ্যে

সঙ্গ নিতে শ্রীকান্তের অস্বীকার। প্রথমটির নিজস্ব রমণীয়তা যতই থাক, তাকে বর্ণনা দেবার কোন যুক্তি নেই। দ্বিতীয়টির পিছনে কোন তীব্র মানসিক বিক্ষোভ নেই। তৃতীয়টির ক্ষেত্রে শ্রীকান্তের ভয় অমূলক। এবং তার দুর্বলতা পাঠককে আঘাত করে। অন্নদাদিদি যে শ্রীকান্তের বুকের কষ্টিপাথরে সোনার কষ ধরিয়ে দিয়েছে, পতিতা পিয়ারীর মুখে যে শ্রীকান্ত ভোরের আকাশ দেখেছে—সে তো নতুন জন্ম পেয়েছে। তার আবার ভয় কী?

কাজেই শ্রীকান্তের এই অব্যাখ্যাত অস্পষ্ট আচরণ ও ঔদাসীন্যের আড়ালে এই দুর্বল পলায়নী মনোবৃত্তি দ্বিতীয় ভাগের কাহিনীকে দুর্বল ও শিথিল করে দিয়েছে। এই ত্রুটি সত্ত্বেও বলব প্রথম পর্বের আত্মজীবননির্ভর এই উজ্জ্বল স্মৃতিচিত্রমালা আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাসের নতুন ধরনের শিথিল-গ্রন্থিত গঠন-ভঙ্গিকে বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রথম আমদানি করল (১৩২৩)। এর বছর তিনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' আরেক ধরনের শিথিল ও আংশিক ভঙ্গির প্রবর্তন করেছিল বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয়পর্বে প্রথম পর্বের মতো অনেকগুলি কাহিনী আছে। নন্দমিস্ত্রী ও টগরের কাহিনী, মনোহর চক্রবর্তী ও ঠাকুর্দার কাহিনী ও অভয়ার কাহিনী ও রোহিণীবাবু-অভয়ার গল্প। এই গল্পগুলির মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ নেই—শ্রীকান্তের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত-শীর্ষ এগুলি। অবশ্য এই ঘটনাগুলি শ্রীকান্তের জীবনে কতখানি গুরুত্ব নিয়ে আসছে তা সবসময়ে বলা হচ্ছে না। এই ধরনের 'পিকারেস্ক'-জাতীয় রোমাঞ্চকর কাহিনী-সংকলনে লেখকের সে দায়িত্ব যে থাকবেই এমন কোন কথা নেই। তবে এটা ঠিক যে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের জীবনে অভয়ার সাহসী জীবনবোধ প্রেরণা দিয়েছে, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর নিষিদ্ধ প্রেমে দুঃসাহসের বেগ কিছুটা এনেছে।

কিন্তু তৃতীয়পর্বে শ্রীকান্ত দর্শকের ভূমিকা থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, দর্শক ধীরে ধীরে জীবনরঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু কাহিনী তার গতি হারিয়েছে; দর্শক অভিনেতা হয়েই যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। শ্রীকান্তের গঙ্গামাটির জীবনে বিলম্বিত লয় এসেছে। কাহিনী প্রথম দুই পর্বের মতো অসংলগ্ন নয়, উপন্যাসের মতোই অনেকটা ধারাবাহিক। কিন্তু আগেকার দুই পর্বের অসংলগ্ন ঘটনাগুলি উজ্জ্বল গতিশীল। এখানে ধারাবাহিক কাহিনী এলেও ধারার মধ্যে ম্লান মন্থরতা কৃত্রিমতার বিস্বাদ এনেছে। চতুর্থ পর্বে কমললতাকে কেন্দ্র করে রোমাণ্টিক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করে মন্থরতার কৃত্রিমতাকে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে। কমললতাকে কেন্দ্র

করে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের সম্পর্কও নতুন করে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টাই অত্যন্ত ক্লান্তিকর। প্রেমের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ চরিত্রের প্রাণশক্তি নষ্ট করেছে। এই আইডিয়ার চাপই 'শ্রীকান্তে'র শেষপর্বকে নষ্ট করেছে।

৪

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আঙ্গিক প্রসঙ্গে যেটুকু আলোচনা করা গেল তাতে অন্তত এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে, শরৎচন্দ্র কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা বজায় রাখবার চেষ্টা বরাবরই করেছেন এবং দু-একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে জটিল বা একাধিক কাহিনীর উপন্যাসে একধরনের ঐক্য আনবারও চেষ্টা করেছেন। এই নাটকীয় নিটোল সৃষ্টিই তাঁর গল্পকাহিনীর প্রাণ এবং এই প্রাণশক্তি রাখতে গিয়ে তিনি শিল্পীর ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করে আকস্মিকতা, ভাবালুতা, বৈপরীত্য ইত্যাদির আমদানি করেছেন। তার ওপর সামাজিক অবিচারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে শেষ পর্যন্ত অসীম মমতায় জড়িয়ে ধরেছেন। বিদ্রোহের উত্তেজনা শেষপর্যন্ত অভিমানে পরিণত হয়েছে, প্রগতিশীলতার ভাণ শেষপর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতারই স্বরূপ প্রকাশ করেছে!

নিটোল কাহিনীবৃত্ত রচনার যে গুণটি তাঁর সহজাত ছিল, শেষপর্যন্ত দার্শনিক ও আদর্শবাদী প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে সে গুণটিও শরৎচন্দ্র বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই জন্যই অভিজ্ঞতার তাগিদ ছেড়ে শ্রীকান্তকে তার স্বতঃস্ফূর্ত দুটি পর্বের পরে আরও দুই পর্বে টানতে গিয়ে শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতার স্বক্ষেত্র লঙ্ঘন করে আদর্শবাদী নিষ্প্রাণ কথক হয়ে বসেছেন, আর 'পথের দাবী'র প্রচারমূলক অতিনাট্যে এবং 'শেষপ্রশ্নে'র পরিবর্তনহীন চরিত্রের মুখে ভাবালু বক্তৃতায় নিজে সহজ গল্প বলবার গুণটুকুও নষ্ট করেছেন।

কমলিনী ও কমললতা

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা উপন্যাসে বৈষ্ণবচরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়লীলার দূতীরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসের গিরিজায়া বৈষ্ণবীয় ফোঁটা-তিলক এবং পদাবলীগীতি সমেত বৈষ্ণবীচরিত্র রূপে উপস্থিত। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে সূর্যমুখীর অন্তঃপুরে কীর্তন শুনিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের বৈষ্ণবী চরিত্রটি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের পদাবলীসম্বল ভিক্ষোপ-জীবিনী বৈষ্ণবীর মত হলেও শেষাংশে সাধারণ বৈষ্ণবীর তুলনায় তার চরিত্রটি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীশের জীবনের যে সাধন-স্তরগুলি দেখানো হয়েছে, তার অন্যতম হল বৈষ্ণবরসের সাধনা। সে সাধনার তত্ত্বগত পরিচয় না থাকলেও ভক্তপরিবেষ্টিত লীলানন্দ স্বামী কীর্তন-সমারোহের মাঝখানে বৈষ্ণবগুরুরূপে অধিষ্ঠিত।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বৈষ্ণব আখড়ার প্রত্যক্ষ চিত্র পাওয়া যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে। শরৎচন্দ্র অল্প বয়সে কৃষ্ণপুর গ্রামের রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ায় যেতেন। শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে মুরারিপুরের আখড়া সম্ভবত তাঁর কৈশোর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচিত্র। পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্তের ন্যায় রাধাকৃষ্ণমূর্তির আরাধনা করতেন এবং গলায় তুলসীর মালা ধারণ করতেন। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং কীর্তনগানে তাঁর দক্ষতা ছিল সে যুগে সর্বজনখ্যাত। সুতরাং একদিকে বাংলাদেশের বৈষ্ণব আখড়া সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আবাল্য পরিচয় এবং অপর-দিকে বৈষ্ণব ধর্মাচার ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে লেখকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ মনে হয় শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে মুরারিপুরের বৈষ্ণব আখড়ার চিত্রাঙ্কণে বিশেষ সহায়তা করেছে। আখড়ার কেন্দ্রীয় চরিত্র কমললতার পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত পদাবলীমুগ্ধ কণ্ঠে বলেছে: "ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান।...ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়।"

শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থখণ্ডে মুরারিপুরের আখড়াটি বস্তুত শ্রীকান্ত-কমললতার রোমান্টিক প্রেমের লিরিকক্ষেত্র। এখানকার অন্যতম সদস্য শ্রীকান্তের বাল্যবন্ধু গহর গোঁসাই স্বয়ং কবি। গহরের অনুরাগী মোহান্ত দ্বারিকা দাস স্বয়ং কবি না হলেও কবিতার অনুরাগী। কমললতার জীবন

পদাবলীর রাধার মতই কলঙ্কিত, কিন্তু পদাবলীমুখর এই চরিত্রটি প্রেমে, সেবায়, গানে আপনাকে পঙ্কজের মত শুচিসুন্দর করে তুলেছে। শ্রীকান্তের প্রতি তার অকুণ্ঠ প্রেম এবং মুমূর্ষু গহরের প্রতি তার সেবা—সমস্তই পদাবলী গীতির মত কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উধ্বায়িত। পরিশেষে স্থানীয় গোঁসাইদের প্ররোচনায় মুরারিপুর বৈষ্ণব আখড়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে কমললতা কৃষ্ণপদাশ্রয় লাভের জন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। শ্রীকান্ত-কমললতার প্রেম শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মত উপন্যাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বাস্তব গতিপথে অগ্রসর হয়নি, রোমান্সের ঘূর্ণাবর্তে উভয়ের প্রেম পদাবলীর মতো রোমাণ্টিক ও গীতিময় রূপ লাভ করেছে। এই প্রেমরোমান্সের পটভূমিরূপে মুরারি-পুরের আখড়ার যে চিত্র এখানে আছে তা বৈষ্ণব সাধনার রূপকে যথেষ্ট স্পষ্ট ও বাস্তব করে তুলতে পারে নি, রোমাণ্টিক প্রেমের একটি স্বাধীন লীলাক্ষেত্র রচনা করেছে মাত্র।

এখানেই তারাশঙ্করের উপন্যাসের বৈষ্ণব-পরিবেশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বৈষ্ণব পটভূমির প্রধান পার্থক্য। তারাশঙ্করের রাইকমল উপন্যাসে বৈষ্ণবের আখড়া বৈষ্ণব সাধনভজনের বাস্তব ক্ষেত্র, বৈষ্ণববৈষ্ণবীর আচার আচরণ ও বৈষ্ণবসাধক সম্প্রদায়ের জীবন ও সাধনার নিপুণ চিত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য জীবনতত্ত্ব। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বৈষ্ণব সাধনা ও সহজিয়া বৈষ্ণবতন্ত্রের যে বাস্তবচিত্র পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তা দুর্লভ। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে লেখক কুঞ্জ বোষ্টম ও বৃন্দাবন পরিবারের গার্হস্থ্য চিত্র এঁকেছেন। সেখানে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব জীবনাচরণের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। 'স্বামী' উপন্যাসে সৌদামিনীর স্বামীর নিরামিষ ভক্ষণ ও বৈষ্ণবীয় ক্ষমাগুণ ব্যতীত আর কোনো বৈষ্ণব পরিচয় লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীকান্ত উপন্যাসেও মুরারিপুরের বৈষ্ণব আখড়ায় পদাবলী কীর্তন ও সারাদিনব্যাপী ঠাকুরের গার্হস্থ্য সেবাসাধনা ছাড়া বৈষ্ণব সাধনতন্ত্রের বা সাম্প্রদায়িক জীবনাচরণের সুস্পষ্ট তথ্যচিত্র নেই। শ্রীকান্ত কমললতাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছে মুরারিপুরের আখড়ার বৈষ্ণব সাধনা প্রকৃতপক্ষে তাই—

"জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?
বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।
কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনাবাটা, কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া, মালা গাঁথা, কাপড় রঙ করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এসব ত কেবল ঘরগৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন সাধন কর কখন ?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন সাধন।"

বস্তুত শ্রীকান্ত উপন্যাসের শেষপর্বে কমললতাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব আখড়ার চিত্র আছে, বৈষ্ণববৈষ্ণবীর চরিত্রও আছে, কিন্তু বৈষ্ণবসমাজ ও সাধনার স্পষ্ট কোনো পরিচয় নেই। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ-জীবনের যে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, হিন্দুসমাজের বিচিত্র সামাজিক শাসন ও বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করে এখানে মানবজীবনের স্বাধীন প্রেমাচরণের যে সুযোগ আছে, শ্রীকান্ত-কমললতার প্রেম যেন তারই রোমান্স-চিত্র।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব রচনার বেশ কয়েক বছর আগেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুসমাজের শাসনবিধিবহির্ভূত বৈষ্ণবসমাজের এই প্রণয়স্বাধীন জীবনাবলম্বনে বৈষ্ণবজীবনকেন্দ্রিক গল্প 'রসকলি' ও উপন্যাস 'রাইকমল' রচনা করেছিলেন। রসকলির (১৯২৮) সঙ্গে রাইকমলের (১৯৩৪) প্রকাশ-কালের ব্যবধান খুব বেশী নয়। দুটোই তারাশঙ্করের প্রথমপর্বের রচনা। যদিও শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩) প্রকাশের একবছর পরে তারাশঙ্করের রাইকমল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু রাইকমল গল্পাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব রচনার আগে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ১৩৭৫ সালের কার্তিক সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন এক্ষেত্রে তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"তারাশঙ্করের রাইকমল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালের আশ্বিন-মাসে। কিন্তু সাময়িকপত্রে তার প্রকাশ এর অনেক পূর্বে। রাইকমল প্রথম গল্পাকারে প্রকাশিত হয় কল্লোলে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখেছেন, ১৩৩৬ সালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলের সম্পাদক-দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে গল্প লেখার জন্য অনুরোধ করে পত্র লেখেন। উত্তরে তিনি 'স্বৈরিণী' নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠান। অচিন্ত্যকুমার নাম বদল করে 'রাইকমল' নামে গল্পটি প্রকাশ করেন ১৩৩৬-এর কল্লোলের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব বিচিত্রা পত্রিকার ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩৩৯ সালের মাঘ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের কমললতা কাহিনী এসেছে ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে।

"কমললতা চরিত্র সৃষ্টির পূর্বে শরৎচন্দ্র যে তারাশঙ্করের 'রাইকমল'

পড়েছিলেন এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারও প্রমাণ রয়েছে। কল্লোলে 'রাইকমল' প্রকাশিত হবার পর গল্পটি সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত একআনা সিরিজের ছোটগল্প পুস্তিকামালার অন্তর্ভুক্ত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'রাইকমল' তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়কেই পাঠিয়েছিলেন। শিশির ভাদুড়ী তখন নাটকের জন্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাইকমলের নাট্যরূপ দেওয়ার কথা ভাবতে বলেন। শৈলজানন্দের কাছে শরৎচন্দ্র রাইকমলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।"

বৈষ্ণবজীবন অবলম্বনে রচিত রাইকমলের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে একবছর আগে লেখা 'রসকলি' গল্পটিতে। পুলিন-গোপিনী-মঞ্জরীর ত্রিভুজ প্রেমের মাঝখানে পুলিনকে কেন্দ্র করে মঞ্জরী ও গোপিনীর প্রণয়প্রতিযোগিতা এবং পরিশেষে মঞ্জরীর প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবদম্পতির পুনর্মিলন দেখানো হয়েছে। বৈষ্ণব সাধনপরিচয়ের পরিবর্তে লৌকিক জীবনরসই এ গল্পের উপজীব্য বিষয়। গল্পটিতে বৈষ্ণবসমাজের বিবাহবন্ধনশিথিলত, ফোঁটা-তিলক-রসকলি এবং মাঝে মাঝে সংলাপের মধ্যে পদাবলীর উদ্ধৃতি ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রসঙ্গ লৌকিক জীবনরসের উপর একটি বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। 'রাইকমল' উপন্যাসে বৈষ্ণবজীবন ও বৈষ্ণবসমাজের চিত্র আরও অনেক স্পষ্ট, বৈষ্ণব চরিত্রের সংখ্যাও অনেক বেশী। সহজিয়া বৈষ্ণবদের সাধনতত্ত্বের কথাও উপন্যাসে বৈষ্ণব চরিত্রের মুখে বসানো হয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষিত বৈষ্ণব ও ভেকধারী বৈষ্ণবের পার্থক্যের ফলে রঞ্জন-কমলিনীর বাল্য-প্রণয় বিবাহ-পরিণতি লাভ করতে না পারায় বিবাহ-অনিচ্ছুক কমলিনী কৃষ্ণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চাইলে প্রৌঢ় গোঁসাই রসিক দাস তাকে বলেছে— 'মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর পূজা করতে হয়।' এটা সহজিয়া বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্বের গোড়ার কথা। অতঃপর মায়ের মৃত্যুর পর কমলিনী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে রসিকদাসের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে এই নিষ্কাম সহজিয়া সাধনাকে সার্থক করতে চেয়েছে। মালাচন্দনের মধ্য দিয়ে সরল বিবাহপদ্ধতি বৈষ্ণব সমাজের বিবাহরীতির ছবি। কমলিনীকে পেয়ে রসিকদাসের অবদমিত দেহক্ষুধার পথ থেকে পদস্খলনের চিত্র। রসিকদাস-কমলিনীর গ্রামে প্রত্যাবর্তন, আখড়া বেঁধে বৈষ্ণব সাধনার চেষ্টা এবং পরিশেষে ইষ্টদেবতার সঙ্গে সাধনা-সঙ্গিনীর সমন্বয় করতে না পেরে কমলিনীকে ত্যাগ করে রসিকদাসের পলায়ন বিশ্লেষণ-বিরল ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততা লাভ করেছে। অতঃপর পুরুষের প্রলোভন ও নারীদের লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করে কমলিনীর সুদীর্ঘকালব্যাপী শ্যামসুন্দরের পটসাধনা বৈষ্ণব সাধননিষ্ঠার পরিচায়ক। এরপর জয়দেব-কেন্দুলীর পথে

বাল্যপ্রণয়ী রঞ্জনের সঙ্গে কমলিনীর সাক্ষাৎ, প্রসাদী মালার সাহায্যে রঞ্জনকে পতিত্বে বরণ, রঞ্জনের পূর্বপ্রণয়িনী পত্নীর মৃত্যুর পর ঝুলন-রাস-দোল প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবে বৈষ্ণবদম্পতির রাগাত্মিক সাধনা, কমলিনীর প্রতি মোহমুক্ত রঞ্জনের অন্য এক প্রণয়িনীর আবির্ভাবে রঞ্জনের গৃহত্যাগ করে বৈষ্ণব ভিক্ষুণীর বেশে কমলিনীর প্রস্থান ইত্যাদি সমস্তই বৈষ্ণবসমাজের বিবাহবন্ধন-শিথিলতা এবং সহজিয়া সাধনার নামে স্বাধীন প্রণয়বৃত্তির ব্যভিচারচিত্রকেই সুস্পষ্ট ও বাস্তব করে তুলেছে।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের সঙ্গে রাইকমলের তুলনা করলে দেখা যাবে যে শ্রীকান্তের তুলনায় রাইকমলের বৈষ্ণবসমাজ অনেক বাস্তব। যদিও বৈষ্ণব জীবনের রোমান্সচিত্র শ্রীকান্তের মতো রাইকমলেও আছে। কমললতা ও কমলিনী—উভয়েরই জীবনাচরণের সংযম ও প্রেমসাধনার বিদেহী বিশুদ্ধতা, জীবনযাপনের দৈনন্দিনতার মধ্যে পদাবলী-প্রেমাদর্শের রোমান্টিক স্বপ্ন-বিভোরতা এবং উভয়ের কথোপকথন, কৌতুকরহস্য ও আচার-আচরণের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী-প্রসঙ্গের নিপুণ ব্যবহারে সমস্ত জীবনটিকে পদাবলী গানের উঁচু সুরে তুলে ধরার ফলে যে কাব্যময়তার সৃষ্টি হয়েছে, তা বাংলাদেশের সাধারণ বৈষ্ণবজীবনের একটি আদর্শায়িত রূপান্তর।

শরৎচন্দ্র : আজ ও আগামীকাল

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আজ সঙ্গতভাবেই সারা দেশে তাঁর নামে স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রখ্যাতির মধ্যে যখন তিনি বর্মার অজ্ঞাতবাস থেকে হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মতো উদিত হয়েছিলেন, তখন বিক্ষুব্ধ বাঙালী পাঠক সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে। কে এই শরৎচন্দ্র? কী তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, কোন্ ক্ষমতাবলে জগৎ ও জীবনকে তিনি এমন নিখুঁত করে চিনলেন এবং সেই পরিচয়কে অপরূপ কাহিনীগুলির মধ্যে রূপ দিলেন? অনিবার্যভাবেই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অধিকার করে নিলেন তিনি বাঙালীর হৃদয়ানুরাগ। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য কবিপ্রতিভা, প্রমথ চৌধুরীর সমুজ্জ্বল বৈদগ্ধ্য, প্রভাতকুমারের অনাবিল কৌতুকরস দাঁড়াতে পারল না তাঁর পথ রোধ করে। প্রথম দুজনের পাশাপাশি তৃতীয় সাহিত্যাধিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি, যদিও তৃতীয়তম বলে মনে করলেন না অনেকেই তাকে। কুলবধূর নিভৃত কুলুঙ্গি থেকে কলেজ-পড়ুয়ার বইয়ের র‍্যাক ও সাহিত্যব্রতীর লেখার টেবিল পর্যন্ত যেমন প্রসারিত হল তাঁর আসন, তেমনি শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে এবং প্রমথেশ বড়ুয়া পর্দায় তুলে ধরলেন তাঁর কাহিনীগুলি সর্বজনের জন্যে।

শরৎচন্দ্রের সেই সার্বিক ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে আরো অনেকের মতো আমারও চোখের সামনেই, কেননা নিতান্ত অল্প বয়সে, একেবারে কলেজ জীবনের গোড়াতেই পরিচিত হয়েছিলাম আমি তাঁর সঙ্গে এবং সে পরিচয় অব্যাহত ছিল তাঁর জীবনান্তকাল অবধি। কিভাবে তিনি বহুজনের পিছনে এসেও নিছক কলমের জোরেই সমসাময়িকদের জনতা ঠেলে সামনের সারিতে দাঁড়ালেন, কিভাবে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিকূলতা ও অপভাষণের ব্যূহ ভেদ করে আপন সৃষ্টিকে সার্বভৌম স্বীকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা চাক্ষুষ করেছি আমি। এই জানাশোনার সুযোগে, বলা বাহুল্য, মস্ত একটা লাভই হয়েছে আমার। লেখার মধ্যে দিয়ে লেখককে যেভাবে ও যতটা বুঝেছিলাম, প্রতি-দিনের মানুষটির চিন্তাচর্চা, কাজকর্ম ও কথাবার্তার আলোয় তা যাচিয়ে নেবার অবকাশ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে আত্মিক ঐক্য দেখে পুলকিত বা অভিভূত হয়েছিলাম কি? না। এ জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর সমগ্র সত্তাটিই বিম্বিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। কিন্তু প্রমথ

চৌধুরী যত দ্যুতিমান ছিলেন সরাসরি আলাপে, লেখায় ফুটেছে তাঁর সেই ব্যক্তিত্বের ছোট্ট একটি ভগ্নাংশ মাত্র, আর শরৎচন্দ্র লেখায় ব্যক্ত হয়েছেন যে অতুলনীয় দীপ্তিতে, ঘরোয়া পরিচয়ে পৌঁছতেন না তার ধারেকাছেও! কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য কম ছিল না।

ছোটবড়- ও ভালমন্দ -নির্বিশেষে সকল পর্যায়ের মানুষ সম্বন্ধেই ছিলেন তিনি অসীম শ্রদ্ধাশীল। যদিও তিনি প্রধানত এবং প্রথমত ছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনভাষ্যকার, তবু চাষী কারিগর দোকানি ও বাউল বৈষ্ণব শ্রেণীর গরিবরা অথবা হাঘরী ভিখারী পতিতা সাপুড়ে লেঠেল জুয়াড়ী গেঁজেল শ্রেণীর নীচুতলার মানুষরাও কেউ তাঁর অচেনা ছিলেন না। তাঁদের দুঃখকষ্ট ও সংকটসমস্যার বার্তা যেমন তিনি জানতেন, তেমনি তাঁদের স্খলনপতন-অন্যায়-অনাচারের খবরও রাখতেন। এই প্রচুরায়ত অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন সন্ধিৎসু মন ও দরদী হৃদয় নিয়ে জীবনের পথেবিপথে পায়ে হেঁটে-হেঁটে পরিক্রমা করে। চলন্ত গাড়ি বা নৌকা থেকে জগৎ ও জীবনের মিছিল লক্ষ্য করলে, কিংবা বইয়ের পাতা থেকে এ দুইয়ের তত্ত্ব আহরণ করলে শরৎচন্দ্রের মতো প্রাণধর্মী শিল্পী হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র ছিলেন স্বভাব-শিল্পী, তাঁর চোখের দেখা ও মনের উপলব্ধিই তাঁর কাহিনীগুলির মধ্যে মূর্তি ধরেছে। কোন গুরুভার পাণ্ডিত্য বা প্রত্যয়ের চাপে সহজ সজীবতা পাণ্ডুর হয় নি তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির। এখানেই হয়েছে সর্বজনের লেখক বলে পরিগণিত হবার অপার সৌভাগ্য তাঁর। আবার বিচারশীল আধুনিক পাঠকের কাছে শিল্পী হিসাবে এই হয়তো তাঁর সীমা যা অতিক্রম করতে পারেন নি তিনি সারা জীবনেও এবং তা পারেন নি বলেই শক্তিধর ঔপন্যাসিক হলেও জোলা, বালজাক, তলস্তয়, টমাস মানের মতো মহান স্রষ্টা হয়ে ওঠেন নি তিনি।

কথাটা হয়তো ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবে, তাই আর-একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। বাংলা সাহিত্যের সীমিত গণ্ডীতে শরৎচন্দ্র অসাধারণ কথা-সাহিত্যিক, তাতে আর সন্দেহ নেই। চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর নিপুণ জহুরীপনা যেমন চোখে না পড়ে পারে না, তেমনি জীবনের দুঃখবেদনা ও আঘাত অবমাননা সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়বত্তাও ভিড়ে হারানোর জিনিস নয়। কিন্তু যেহেতু যৌথ পরিবারের সমস্যা, বৈধব্যের সমস্যা, কৌলীন্য ও জাতি-ভেদের সমস্যা, দাম্পত্য অসমন্বয়, এমনি সমস্ত সাম্প্রতিক সমাজসমস্যার ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি তাঁর উপন্যাসগুলি, কোন সার্বভৌম বা বিশ্বজনীন সমস্যার সম্মুখীন হন নি, কোন বৃহৎ জিজ্ঞাসা বা জীবনদর্শনের আলোও

প্রক্ষেপ করেন নি, তাই তাঁর রচনা আবেগ ও অনুভূতির রাজ্যকে আলোড়িত করে বটে, কিন্তু বুদ্ধিকে কোন তত্ত্বজ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত করে না। দেশ জাতি ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে তাঁর কোন সমস্যাই সর্বমানবের সমস্যায় রূপান্তরিতও হয় না, মুষ্টিমেয় দু-একটি রচনা ছাড়া। অর্থাৎ তিনি একান্তভাবেই বাঙালী সাহিত্যিক এবং বাঙালীর সাহিত্যিকও। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তুলনায় ঢের বেশী সার্বভৌম। রবীন্দ্রনাথ তো অবশ্যই। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দেবদাস, চন্দ্রনাথ, বামুনের মেয়ে প্রভৃতির তুলনায় বিচার করলেই পরিষ্কার হবে বক্তব্যটা। কিন্তু কথাসাহিত্যের সার্বভৌম আবেদন বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে তর্ক উঠবে। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সামাজিক ও ভাষাগত সংস্কারের গণ্ডীতে বদ্ধ যেহেতু সমস্ত মানুষই, তাই আপন আপন জাতির মাটি ও মানসিকতা থেকে ষোল আনা বিচ্ছিন্ন করে বলা বা লেখা যায় না মানুষের কথা। পৃথিবীর সেরা ঔপন্যাসিক কেউ তা পারেন নি। অর্থাৎ পারেন নি জোলা, বালজাক, ফ্লবেয়ার, হুগো, আনাতোল ফ্রাঁস, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, গোর্কি। তার মানে তাঁরা সবাই সীমিত অর্থে জাতীয় সাহিত্যিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বভৌম স্রষ্টা বলে গণ্য হন কেন তাঁরা? হন তার কারণ জীবনকে তাঁরা ত আঁকেন নি শুধু, তাকে অভিষিক্ত করেছেন সেই তত্ত্ববস্তুর আলোকে যা দেশকাল ও ধর্ম দিয়ে ঘেরা নয়। এই বিশেষ গুণটির জন্যেই তা ছুঁতে পারে সারা দুনিয়ার অন্তর। শরৎ-সাহিত্যের প্রাণলোকে এই শাশ্বত বস্তু নেই, তা বলছি না। আছে, খুবই কম পরিমাণে। তিনি প্রধানত ও প্রথমত এঁকেছেন চলমান জীবনের ছবি এবং তাতে সাম্প্রতিক কালের প্রত্যয় ও প্রয়োজনকেই দিয়েছেন প্রাধান্য। কাছে থেকে দূরে, মাটি থেকে আকাশে বড় একটা প্রসারিত হয় নি তাঁর ভাব-কল্পনা। শ্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে হঠাৎ হঠাৎ কেমন করে যেন এসেছে একটা সার্বভৌম অনুভূতির ছোঁয়া, প্রতিদিনের জীবন চিরদিনের দিগন্তে পা রেখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সুর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি আর পরবর্তী দুখণ্ডে।

এইসব কারণেই অসীম শরৎপ্রীতি সত্ত্বেও অনেকে ভাবেন যে-দ্রুততায় আজ পটপরিবর্তন হচ্ছে সমাজকাঠামোর, তাতে এমন দিন হয়তো দূরবর্তী নয় যখন এই নবমূল্যায়নে শরৎচন্দ্রের অবমূল্যায়ন হবে অনেকটাই। এ ভয় এই জন্যে যে শরৎসাহিত্যের প্রাণলোকে সাম্প্রতিক আবেগার্দ্রতার পরিমাণ যতটা, সে অনুপাতে চিরায়ত জীবনবোধ ও বৈদগ্ধ্যের বলিষ্ঠ পঞ্জরাস্থি দানা বাঁধে নি। আজ থেকে আগামী কালের পথে হাত ধরে নিয়ে যায় তো সাহিত্যকে

সেই জিনিসই, যদিও কলাকৈবল্যের নামে অনেকে কবুল করতে চান না কথাটা। প্রশ্ন হতে পারে, কেন এমনটা হল? হল—শরৎচন্দ্রের মানসিক গঠনের কারণেই। তিনি বিশ শতকের চতুর্থ দশক প্রায় স্পর্শ করেছিলেন মৃত্যুর আগে। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে তখনো কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন তার নজীর আছে শেষ প্রশ্নের অধ্যায়গুলিতে। আমার ধারণা, শরৎচন্দ্র নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে এগোতে হলে নূতনের পথে পা বাড়াতে হবে। কিন্তু সেজন্য প্রস্তুতির আর সুযোগ হয় নি তাঁর। অতিখ্যাতির উত্তাপে অভিভূত হয়ে তিনি অবিচ্ছিন্ন পৌনঃপুনিকতায় খালি একই ধাঁচের কাহিনী পরের পর গড়ে গেছেন, যার আদি উপকরণ মোটামুটি এক, শুধু ছাঁচ হিসাবে কোনটা রাম হয়েছে, কোনটা হয়েছে রহিম। তাঁর নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে তিনি অবশ্য অতুলনীয় শিল্পী। কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করতে পারলে তিনি আমাদের মতোই আর সকলেরও মনের মিতা হতেন, যা হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য দিকপালরা।

শরৎচন্দ্র : স্মৃতিতর্পণ

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

সে আজ প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বের কথা। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় একটি গল্প পড়িলাম—'কাশীনাথ'। দুই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছিল। লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নূতন লেখনশৈলী, নূতন প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তুতেও নূতন। কে এই শরৎচন্দ্র ?

কিছুদিন পরে একটা প্রচারপত্র পড়িলাম একখানা মাসিকপত্র বাহির হইবে—'ভারতবর্ষ'। দাম বৎসরে ছয়টাকা। অনুষ্ঠানপত্রে লেখকদের তালিকায় শরৎচন্দ্রের নাম ও ছবি ছিল। মুখে দাড়িগোঁফ, চোখ দুইটার দৃষ্টি তীব্র অথচ অন্তর্ভেদী, যেন আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিয়া লইতেছেন। অথচ দৃষ্টিতে তীব্রতা নাই। ভালমানুষির আবরণে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। দেখিতে জানে, দেখার ছাপও তুলিতে পারে।

এই দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হইল একদিন কলিকাতায় ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকানের উপরতলায়। জলধর দাদার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। গিয়া দেখি দাড়িগোঁফের সঙ্গে সেই চোখ দুইটি! জলধরদা বলিলেন, 'শরৎ চাটুজ্যে।' প্রণাম করিলাম। কথাবার্তার মাঝখানে মটরদানার মত কী একটা মুখে ফেলিয়া এক গেলাশ জল খাইলেন। এবং আমাকে একটা সিগারেট দিয়া নিজেও একটা সিগারেট ধরাইলেন। তিনি উঠিয়া গেলে জলধরদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনি কি খেলেন ?' 'আফিঙ', দাদা বলিলেন, 'দিনে তিন-চারবার খেতে হয়।'

২

নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের স্টার থিয়েটারের দোতলায় একটা ঘর ছিল। এই ঘরে যেমন আমি গিয়া আড্ডা জমাইতাম, তেমনই অনেক নামকরা সাহিত্যিকও আসিতেন। শরৎচন্দ্রও আসিতেন। স্টার আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কোম্পানি হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার হরিদাস চট্টোপাধ্যায় অন্যতম ডিরেক্টার—তিনিও আসিতেন। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কুমার, অ্যাটর্নি সতীশচন্দ্র সেন, খ্যাতনামা রাজেন কবিরাজের জামাই অনাথ কবিরাজ—ছোট বড় আরো অনেকে।

হাওড়া বাজে শিবপুরের ভূতনাথ দত্ত অ্যারেট কোম্পানির ঘড়ির দোকানে

(বৌবাজারে) কাজ করিতেন। তিনি প্রায় নিয়মিত আসিতেন। আড্ডা ভাঙিলে ট্রাম বন্ধ হইয়া যাইত, তখন হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিতেন। ইহারই বাড়ির নিকট শরৎচন্দ্র বাড়িভাড়া লইয়া বাস করিতেন। শরৎচন্দ্রকে লইয়া ভূতনাথের গর্ব ও গৌরবের অন্ত ছিল না। স্টার থিয়েটারে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাঁকিতেন, 'মশাই, শরৎসাহিত্যে নারী পড়েছেন ?'

ইনি একদিন বলিলেন, 'শরৎচন্দ্রকে দেখবেন ? কালকে যাবেন তাহলে !'

স্নানাদি সারিয়া সকালেই গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাড়ির আঙিনা পার হইলেই শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানার দরজা। তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়া শরৎ-চন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রণাম করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিলাম। সম্মুখের টেবিলে পরিষ্কার বাঁধানো লিখিবার খাতা, পরিচ্ছন্ন কলম-দানি, কয়েকটি ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র তামাক খাইতেছিলেন। বাড়ির ভিতর হইতে ইঙ্গিত পাইয়া আমার হাতে গড়গড়ার নলটি দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আধঘণ্টা আর মানুষটির দেখা নাই। আমি একলা বসিয়া মনে মনে তাঁহার এইরকম ব্যবহারের তারিফ করিতেছি, এমন সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চোখে জল। বলিলেন, 'পাখিটা মরে গেল। গিন্নীর বড় আদরের ছিল। প্রায় একমণ দুধ খেয়েছে।'

আমি আর কী সান্ত্বনা দিব !

কিছুক্ষণ পরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

৩

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন স্টার থিয়েটারের সাজঘরের বাহিরে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন, আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সেক্রেটারি প্রবোধ গুহ পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি এবং নাট্যকার নির্মল-শিব বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে ছিলাম। নির্মলশিবের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'এ তো আমার পূর্বপরিচিত।' তারপর আমার নাম শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিলেন, 'মস্ত লোক মশাই !' আমি ভাবিলাম বুঝি বা তিনি ঠাট্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'কাল নটায় আমার বাড়ি যাবেন।'

পরদিন উপস্থিত হইলাম। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে। দেখাইলেন—চেদীরাজ কর্ণের শিলালিপির আবিষ্কারক-রূপে আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বলিলেন, 'আমাদের সত্যানুসন্ধানই

কাজ। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন বসু এই লিপি পড়িতে পারেন নাই। বৃথাই তাঁকে বীরভূম নিয়ে গিয়েছিলেন। শেষে মাস্টারমশাই (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—তিনি তাঁহাকে মাস্টারমশাই বলিতেন) গিয়া পাঠোদ্ধার করেন। কিন্তু লিপির আবিষ্কার তো আপনার।'

আমি 'বৈকালী' দৈনিক কাগজের সম্পাদক ছিলাম। কাগজ দেখিতেন প্রবোধ গুহ। খরচ দিতেন নির্মলচন্দ্র। একদিন কোন কাগজে রাখালদাস স্টার থিয়েটারের কোন নাটকের পোশাক-পরিচ্ছদ ইতিহাস-সম্মত হয় নাই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। আমি কখনো কখনো আমার কাগজের সম্পাদকীয় লিখিতাম, কখনো লিখিত শচীন সেন। শচীন প্রায়ই আসিয়া প্রবোধ গুহের বাসায় আড্ডা দিত। সেই সুবাদে সে 'বৈকালী'তে চাকুরি পাইয়াছিল। পরে নাট্যকার হইয়াছিল। প্রবোধ গুহই তাহার নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। 'বাই দি বাই' এই কথার আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম 'কথার কথা'। এই বিভাগটা প্রতিদিন কাগজে আমিই দেখিতাম।

রাখালদাসের উক্ত লেখার উপরে ঐ বিভাগে টিপ্পনী কাটিলাম—'রাখালের কোদাল।'

একদিন, কোন্ রাস্তায় মনে নাই, আমি ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ বিপরীত দিকের ফুটপাত হইতে শরৎচন্দ্র আসিয়া হাজির হইলেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'হাঁ হে, তোমার এই কাজ! রাখালের মত বিখ্যাত ঐতিহাসিককে তুমি গালাগাল দিয়েছ! তুমিও তো লেখক, লেখার পরিশ্রম কত জান, লেখার মূল্য বোঝার ক্ষমতাও আছে। কারণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তোমার 'বীরভূম বিবরণ' পড়ে তোমাকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দিয়েছেন। কাজেই এই লেখাটা কি ভাল হয়েছে! কয়টা টাকাই বা পাও? যাও, রাখালের বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এস। আর লেখকদের গালাগালি দিও না।'

আমি শরৎচন্দ্রের পরামর্শে পরদিনই রাখালদাসের বাড়ি গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর আর কাহাকেও গালাগালি দিই নাই। তবে ভুল দেখিলে সমালোচনা করিয়াছি। বিশেষ পদাবলী-সাহিত্য লইয়া অনেকের সঙ্গে আলোচনায় নামিতে হইয়াছিল। দুই-চারিটা রূঢ় কথাও বলিয়াছি। হাজার হউক, পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো!

৪

শরৎচন্দ্র থাকিতেন বর্মা মুলুকে। কলিকাতায় তাঁহার একজন বন্ধু ছিলেন—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। 'ক্লিওপেট্রা'র লেখক। ইহারই সম্পর্কিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা

মধ্যভারতের ছতরপুর রাজের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। এবং জেলখানার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টও ছিলেন। আমি ছতরপুর গিয়া প্রমথর সম্পর্ক ধরিয়া তাঁহাকে বড়দা ডাকিয়া পরিচিত হই। বড়দা ত্রিদিবদাস ভট্টাচার্য। প্রবাসে বাঙালী বাঙালীকে কিরূপ স্নেহ করে বড়দার বাড়িতে গিয়া সেটা বেশ ভালরকমেই বুঝিয়াছিলাম। বৌদিদির স্নেহ আজিও মনে আছে, আমরণ মনে থাকিবে।

প্রমথনাথের সঙ্গে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌহার্দ্য ছিল। 'ভারতবর্ষ' বাহির হইবে শুনিয়া প্রমথ হরিদাসকে বলিলেন, 'আমার বন্ধুর লেখা একটা বই আমার কাছে আছে—সম্পূর্ণ উপন্যাস।'

স্থির হইয়াছিল 'ভারতবর্ষ' সম্পাদন করিবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'ভারতবর্ষ' প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বেই তিনি 'সুরধাম' ত্যাগ করিয়া সুরবাঞ্ছিত লোকে প্রস্থান করেন। (পত্নী সুরবালার নামে তিনি বাড়ির নাম রাখিয়াছিলেন 'সুরধাম'।) তাঁহার লিখিত 'ভারতবর্ষ' কবিতা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রমথনাথের নিকট হইতে লেখাটি লইয়া হরিদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালকে পড়িতে দিলেন। শরৎচন্দ্রের হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার। পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, 'এই বই আমি ভারতবর্ষে ছাপতে পারব না। কিন্তু খুব শক্তিশালী লেখক। এঁর যদি অন্য কোনো বই থাকে এনে দিতে বল!'—এই বইখানাই 'চরিত্রহীন' নামে বই আকারে বাহির হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের লেখা লইয়া 'ভারতবর্ষ' নাম করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নামও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন রেঙ্গুন হইতে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানা পত্র পাইলেন। পত্রলেখক শরৎচন্দ্র। লিখিয়াছেন—আমাকে বিশ্বাস করিয়া যদি চারিশত টাকা পাঠাইয়া দেন, আমি দেনাপত্র শোধ করিয়া চিরদিনের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া যাই। হরিদাস সে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বাঙলায় আসিয়া প্রথমে বাজে শিবপুরে বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস করেন। পরে রূপনারায়ণ নদীর তীরে পানিত্রাসে বাড়ি করিয়াছিলেন।

৫

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাহির হইয়াছে।

ধারাবাহিকভাবে পড়িয়াছিলাম। বইখানাও পড়িলাম। রাজনীতির গভীরতার কোন পরিচয় পাইলাম না। 'ভারতী'রই জয়জয়কার। তবে

দেশপ্রেমিকের সাক্ষাৎ পাইলাম, দেশের জন্য মানুষ কেমন করিয়া জাতি, ধর্ম, সংস্কার হেলায় বিসর্জন দেয়—তাহাও দেখিলাম। ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু সব্যসাচীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। গিয়া দেখি 'তসর কেটে'র কাপড় পরনে, কাপড়ের খুঁটটা গলায় জড়ানো, গলায় তুলসীর মালা —শরৎচন্দ্র। প্রণাম করিলাম, আদরে অভ্যর্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু খাবে এখন?' বলিলাম, 'না।' একটা পৃথক গড়গড়া দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কলকেটা নাও, তামাক খাও। ঐ গড়গড়াটা তোমাদের। আমি আমার গড়গড়া কাউকে দিই না। নলটা মুখে দিয়ে লালা মাখিয়ে দিয়ে যায়। আবার গড়গড়া না দিলে তো ধোপা নাপিত বন্ধ। তাই নিজেরটা ছাড়া আরো দুটো রেখেছি। একটা যারা সর্বভুক, বামুন কায়েত মানে না. আর একটা তোমাদের জন্য, যারা আবার সব মানে।'

দুপুরে একসঙ্গে খাইতে বসিলাম।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'খাও হে, প্রসাদ। বাড়িতে নারায়ণ আছেন। নিজের হাতে সেবা করি, গিন্নী ভোগ রাঁধেন।'

দেখিলাম সত্যই প্রসাদান্ন। মাথায় তুলসীপত্র। একটি বৈশিষ্ট্য দেখিলাম, এক পাথরবাটি দহির উপর একখানি মাঝারি রকমের গুড়ের বাতাসা। ফেণী বাতাসা। তিনি দই ভাতে মাখাইয়া খাইলেন। আমিও খাইলাম।

এইবার তামাক খাইতে খাইতে প্রসঙ্গ তুলিলাম, 'সব্যসাচী কার ছবি? রাসবিহারী বসুর না নরেন ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথের)?'

শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'না হে, এ রকম মানুষ আমি দেখেছি। আমি জাভা সুরবায়া অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওসব আমার নিজের চোখে দেখা। তবে কল্পনা কিছু আছে বৈ কি।'

আরো একবার পানিত্রাসে গিয়াছিলাম। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় 'পূর্ণিমা' নাম দিয়া একখানা মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। তাহার জন্য লেখা আনিতে গিয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র সমস্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'বড়লোকের ছেলে, পয়সা আছে, লিখবার শখও আছে। দুদিনে শখ মিটে যাবে, কাগজও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এক কাজ করতে পার, একটা লেখা দেব, দক্ষিণা একশত টাকা। টাকাটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে। শখ হয়েছে টাকা দেবে না কেন? তার শখ মেটাতে আমি বেগার খাটতে যাব কেন?'

লেখা আনা হয় নাই। রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

৬

হরিদাস চাটুজ্জে ভাল অভিনয় করিতেন। নাটক বুঝিতেন। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' শনিবারের চিঠিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। সজনীকান্ত দাস হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট গিয়াছিলেন, বইখানার প্রকাশক হইতে পারেন কিনা, বিনি পয়সায় ছাপানো যায় কিনা, তাহার ব্যবস্থা করিতে। হরিদাস বলিলেন, 'রেখে যাও, পাণ্ডুলিপিটা পড়ে দেখি।' পড়িয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তিনি 'মানময়ী গার্লস স্কুল' স্টার থিয়েটারে অভিনয় করাইয়াছিলেন।

হরিদাস চাটুজ্জে 'পল্লীসমাজ' নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। পড়িয়া ভালই লাগিয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পছন্দ হয় নাই। তিনি নিজে নাটক করিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয়-রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে, কেমন দেখলে?'

বলিলাম, 'আপনাকে নতুন একটা দৃশ্য লিখতে হবে।'

শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'কোন্‌টা?'

আমি বলিলাম, 'রমার সাক্ষ্য দেওয়ার সীন্‌টা। আসামীর কাঠগড়ায় রমেশ, সাক্ষীর কাঠগড়ায় রমা, ও-পাশে রমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বেণী। মিথ্যা কলঙ্কের দায়ে হিন্দু ঘরের সম্ভ্রান্ত বিধবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটত ভাল।'

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' যখন নাটকাকারে 'বিজয়া' নামে অভিনীত হয় তখনও বলিয়াছিলাম, যে-সীন্‌টায় রাত্রে বিবাহ হইবে বলিয়া নরেন ও বিজয়া উপবাসে কাটাইয়াছে—সেই সীন্‌টা বড় ফাঁকা লাগে। বলিয়াছিলাম, ঘোর হিংস্র নৃশংস হইলে পুনরায় গুণ্ডা লাগাইয়া কিছু অনর্থ ঘটাইত রাসবিহারী। কিন্তু সে পাকা খেলোয়াড়। সুতরাং তাহার দ্বারা বিজয়ার জন্য কিছু কাপড় গহনা পাঠাইবার ছোটখাট দৃশ্য থাকিলে সীন্‌টা ভরাট দেখাইত।

৭

তখন নির্বাক সিনেমা সবেমাত্র চালু হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের কী একখানা বই সিনেমা হইয়াছে। প্রথম রাত্রিতে আমন্ত্রিত হইয়া শরৎচন্দ্র দেখিতে গিয়াছিলেন। একদিন কী একটা কাজে গুরুদাস চাটুজ্যের নূতন দোকানে গিয়াছি। শরৎচন্দ্র আসিলেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় খুব রাগিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাদের নিমন্ত্রণ হল না, আর আপনি যে বড় গেলেন?' শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তাই গিয়েছিলাম।' হরিদাস চাটুজ্যে বলিলেন,

'আমরা প্রকাশক, আমাদের নিমন্ত্রণ হল না, আপনি একবার খোঁজও নিলেন না!' শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'এ তোমার অন্যায় কথা। আমি কি তাদের নিমন্ত্রণের লিস্ট সন্ধান করে বেড়াব?' হরিদাস বলিলেন, 'তা বেড়াবেন কেন! মুখে খানিকটা রং মাখিয়ে তারা আপনার ছবিটা সামনে লট্‌কিয়ে দিয়েছিল, আর তাইতেই আপনি সব ভুলে গিয়েছিলেন!' 'কি যে যা-তা বল', বলিয়া শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

হরিদাস ও সুধা দুই ভাই-ই দোকানে বসিতেন পাশাপাশি। দুপুরে সুধা উঠিয়া খাইতেন। তিনি দোকানের উপরতলায় সপরিবারে থাকিতেন। হরিদাস থাকিতেন রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর নূতন বাড়িতে।

একদিন গিয়া দেখি সুধা উঠিয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। হরিদাস বলিতেছেন, 'আপনিই বেণী, সুধাকে এসব কথা আপনিই বলেছেন!'

শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, 'বিশ্বাস কর, এসব কথার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না। আর সুধার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোন কথাই হয় নি।'

হরিদাস বলিতেছেন, 'আপনার কোন কথাই বিশ্বাস করি না। আপনিই বলেছেন। নইলে এসব কথা সুধা জান্‌লে কেমন করে? বেণীর কাজই করেছেন আপনি।'

শরৎচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না।

বেণী শরৎচন্দ্রের একটি চরিত্র, 'পল্লীসমাজে' আছে।

৮

দরদী লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের কিছুটা পরিচয় পাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্তদের স্তরেও নামিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। দরিদ্র গৃহস্থদের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারাশঙ্কর গ্রামের হাড়ি বাউড়ি বাগদী যাযাবর প্রভৃতির হাঁড়ির খবর জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তারাশঙ্কর যদি উচ্চতর শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিবার লোভ ও লালসা ত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখার ধরনই আলাদা হইত। শরৎচন্দ্রের এ লালসার বালাই ছিল না। তবে আশুতোষের পুত্রেরা মাসিক কাগজ বাহির করিয়া তাঁহাকে দলে টানিয়াছিলেন। বড়লোকদের সঙ্গ তাঁহার কিছু ক্ষতি করিয়াছিল। তথাপি তাঁহার লেখা কালজয়ী।

শরৎসাহিত্যপাঠের ভূমিকা

তপোবিজয় ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণত যে ধরনের আলোচনা প্রকাশিত হয়—তার দ্বারা এই দুঃসাহসী কথাশিল্পীর খাঁটি পরিচয় কখনও লাভ করা যায় না। মনে হয় শরৎচন্দ্র একজন হৃদয়সর্বস্ব আবেগপ্রবণ 'গল্প-লিখিয়ে' বা 'স্টোরি-টেলার' মাত্র—তার বেশী কিছু নয়! যেন তাঁর সাহিত্যে কোনো গভীরতা নেই, কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য নেই, কোন দীপ্ত জীবনদর্শন নেই। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ শরৎচন্দ্র যেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কথাসাহিত্যে নিতান্ত ছোট মাপের লেখক! এই অন্যায় অযৌক্তিক বক্তব্য শুধু যে ভাববাদী সমালোচকদের দ্বারাই প্রচারিত হয় এমন নয়, মার্কস-বাদী হিসেবে পরিচিত কিছু সমালোচকও ঠিক এই ধরনের মন্তব্যই করে থাকেন। তাঁদের অনেকের কাছেই বঙ্কিমের জীবনবিরোধী অনেক রচনাও ভাবকল্পনায় ও গঠননৈপুণ্যে উচ্চাঙ্গের বলে বোধ হয়; ভাব, ভাষা ও সংলাপের উজ্জ্বল আলংকারিক মহিমামণ্ডিত রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যকে মনে হয় বাংলা উপন্যাসের সর্বশেষ সীমা, চরম উৎকর্ষ; তুলনায় শরৎসাহিত্য নাকি আংশিকতা, আকস্মিকতা ও অতিরঞ্জনের দোষদুষ্ট, অগভীর তরল সাহিত্য!

আমরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নই। শরৎসাহিত্যকেও সর্বগুণান্বিত মনে করি না। কিন্তু কথাসাহিত্যে বঙ্কিমের ভূমিকা এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'গোরা'র উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা স্মরণে রেখেও আমরা খুব স্পষ্ট-ভাবেই বলতে চাই, শরৎসাহিত্যই বাংলাদেশের প্রথম জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্য—পুরাতন ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা ভেঙে যা অনায়াসে সর্বসাধারণের মনোজগতে শ্রদ্ধার আসন নিতে সক্ষম হয়েছে। বহমান জীবন ও সৃষ্ট কথাসাহিত্য যে সমার্থক, উপন্যাস যে মূলত সমাজবদ্ধ বাস্তব জীবনেরই প্রতিরূপ—শরৎসাহিত্যই প্রথম তা সার্থকভাবে প্রমাণ করেছে। আর শুধু এইটুকুই নয়, চলিষ্ণু জীবনের মধ্যে যে একটা বন্ধন-বিনাশের বিদ্রোহ আছে, আছে জড়তা ও সংস্কারান্ধতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ, অন্যায় শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ চিত্তের নিরন্তর সংগ্রাম, সুস্থ জীবনে উত্তরণের বাস্তব আর্তি ও অভীপ্সা—শরৎসাহিত্যই সর্বপ্রথম কখনো স্পষ্ট উচ্চারণে কখনো আভাসে ইঙ্গিতে সে কথা ব্যক্ত করেছে। শরৎসাহিত্য অশ্রুসজল ভাবাবেগের সাহিত্য নয়, তা সর্বাত্মক প্রতিবাদেরও সাহিত্য। এমন সাহিত্য বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে আর গড়ে ওঠে নি।

২

নিতান্ত সহজ ও সরল ভাষায় শরৎচন্দ্র রচনা করেছেন সাধারণ বাঙালি জীবনের বেদনার সাহিত্য, প্রতিবাদের সাহিত্য। তাঁর কাহিনী-বর্ণনার এই একমুখী সারল্যকে অনেক সমালোচক মনে করেছেন, উপযুক্ত শিক্ষার ন্যূনতা। যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত-পরিশীলিত হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই সাহিত্যরচনায় শরৎচন্দ্র আবেগের স্রোতে ভেসে গেছেন, ভাষাকে করে রেখেছেন নিতান্ত আটপৌরে, ভাবকল্পনাকে সংলগ্ন-মৃত্তিকার রূঢ়তা থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি ঊর্ধ্বলোকে, কোন 'চিরন্তন' 'সর্বজনীন' 'শাশ্বত' সত্যের সন্ধান লাভ করেও উঠতে পারেন নি!

এ অভিযোগ ভিত্তিহীন, সর্বৈব মিথ্যা। শরৎজীবনী ও শরৎসাহিত্য যাঁরা খুঁটিয়ে পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া এই সাদাসিধে সরল মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে কী গভীর অধ্যয়নশীল ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখন লেখার চেয়ে পড়াশুনার চর্চাই করতেন বেশী। একটি চিঠিতে বন্ধু প্রমথনাথকে লিখছেন, 'পড়িয়াছি বিস্তর, প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।' পরবর্তীকালে সামতাবেড়ের বাসভবনে তাঁর পঠিত ও রক্ষিত গ্রন্থের যে তালিকা শ্রীতারাপদ সাঁতরা প্রকাশ করেছেন—সেখানেও বিচিত্র বিষয়ের সমাহার। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন—এসব গ্রন্থ তো আছেই, উপরন্তু আছে মার্কসের The Civil War in France, টলস্টয়ের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ, ভেলেরিন মার্কুই ও ট্রটস্কির Lenin, ডাঙ্গের সম্পাদিত The Socialist পত্রিকা এবং এ ধরনের বেশ কিছু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বই-পত্রিকা। এই বিপুল অধ্যয়ন ছাড়াও শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সংগীতশিল্পী, একজন দক্ষ তৈলচিত্রশিল্পী। পূর্বোক্ত চিঠিতেই তিনি লিখছেন, আগুনে তাঁর সব পুড়ে গেছে, এখন আবার নতুন করে তিনি কি শুরু করবেন, "Novel, History, Painting—কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার শুরু করি বল ত?"

শরৎচন্দ্রের এই বিপুল পঠনপাঠন ও তাকে আত্মস্থ করার প্রমাণ রয়েছে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিত শরৎচন্দ্রের 'কানকাটা' প্রবন্ধটি নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ববিষয়ে একটি গভীর রচনা। তাঁর 'নারীর মূল্য' ও 'সমাজধর্মের মূল্য' সমাজজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞানের চিহ্নবাহী।

তাঁর 'সত্যাশ্রয়ী' নামক অভিভাষণ-প্রবন্ধটিও মুক্তদৃষ্টি ও স্বচ্ছচিন্তার এক উজ্জ্বল রচনা। 'সত্য' কী, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি ভাববাদী মনোভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিয়ে এর কোন শাশ্বত চিরন্তন রূপের সন্ধানে অগ্রসর হন নি, বস্তুবাদী সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ-কাল-পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।'—সত্যের এই স্বরূপ আবিষ্কারে শরৎচন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক চেতনা সত্যই বিস্ময়কর। একমাত্র বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ছাড়া 'সত্য'-র এই ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষার বিরোধ' নামক প্রবন্ধটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী যখন ছাত্রদের স্কুলকলেজ ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন (১৯২১) তখন রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করে লেখেন 'শিক্ষার মিলন'। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার দরজা বন্ধ করে না দিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মিলনের কথা বলেন। শরৎচন্দ্র এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে। দুটি প্রবন্ধ পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যায়—রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কত সঠিক ও যুক্তিসিদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থা—যা একটি জাতিকে শোষণ করারই শ্রেণীগত সাংস্কৃতিক হাতিয়ার, যার অনুশীলনে প্রকৃত বিদ্যা কিছুই লাভ হয় না, উপরন্তু মজ্জায় মজ্জায় দাস-মনোভাবের হীনম্মন্যতা সঞ্চারিত হয়—এই সত্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তখনও ধরা পড়েনি। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর অন্তসারশূন্যতা খুব সহজেই অনুভব করেছিলেন, এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসাধনা যে মূলত উপনিবেশ স্থাপন, রক্ষা ও বাণিজ্যবৃদ্ধিরই হিংস্র ও চতুর হাতিয়ার মাত্র—এ সত্য আবিষ্কারে অসুবিধা বোধ করেন নি।

এই দু-একটি উদাহরণ থেকেই শরৎচন্দ্রের ইতিহাসবোধ ও সমাজজ্ঞান যে কতখানি উন্নত ও অগ্রসর চিন্তার ছিল, তা অনুভব করা যায়। একজন নির্মোহ বস্তুতান্ত্রিক মননশীল লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে তিনি নিজেকে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। তাঁর বিপুল পঠনপাঠনের ছাপ কথাসাহিত্যে ফেলে অনায়াসেই ভাব, ভাষা ও গঠনগত ঔজ্জ্বল্যকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শুষ্ক বুদ্ধিধর্ম

অপেক্ষা হৃদয়ধর্মকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এ নির্বাচন তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাচন, তাঁর শিক্ষার ন্যূনতা নয়। সচেতন সামাজিক শিল্পী শরৎচন্দ্র বুদ্ধির প্রখরদীপ্তি ছড়িয়ে, সাহিত্যকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সাময়িক উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতে চান নি। তাঁর শিল্পসাধনার লক্ষ্য তা ছিল না। সাহিত্যের জন্যই তিনি সাহিত্য রচনা করতে বসেন নি। যে গভীর মানবপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তাঁর কথাসাহিত্যের জন্ম সেখানে উচ্চমার্গীয় ভাবকল্পনা ও পালিশ-করা অলংকৃত বাক্যবিন্যাসের স্থান নেই। "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত,, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন-দিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই"—এইসব মানুষের বেদনাই তো দিয়েছে তার মুখ খুলে, পাঠিয়েছে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্র পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় এদেরই কাছে নিবেদিতপ্রাণ। 'কোকিলের গান', 'প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথি', 'গন্ধব্যাকুল দক্ষিনা পবন'—এসব নিয়ে 'শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গাঁথা'র প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। অসত্যের দ্বারা সাহিত্যকে অনুরঞ্জিত করে সত্যভ্রষ্ট হতে চান নি এই সত্যদ্রষ্টা জীবনশিল্পী। এখানেই শরৎচন্দ্রের গৌরব, অদৃষ্টপূর্ব অনন্যসাধারণত্ব।

সামাজিক-দায়বদ্ধ এই মহান শিল্পী আপন অভিজ্ঞতার আলোকেই বুঝেছিলেন উৎপীড়িত বঞ্চিত মানুষের বেদনা ও নালিশকে যদি বৃহত্তর মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে হয়—তা হলে যে ভাষা, যে ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে তাও হবে সাধারণ, বাহুল্যবর্জিত, আবেগময়, ঋজু ও সরল। বঙ্কিমী অথবা রাবীন্দ্রিক ভাষাভঙ্গি কখনোই তার মাধ্যম হতে পারে না। এ কারণেই শরৎচন্দ্র অর্জিত পাণ্ডিত্যবুদ্ধির যাবতীয় প্রখরতাকে পরিহার করে সমাজ ও বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সহজ ও সরলতার পথ স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছিলেন। নিজের অধীত বিদ্যার গৌরবপ্রকাশের সমস্ত সুযোগ নিঃশব্দে সংহরণ করে সাধারণ মানুষের মনের কথা, ঠোঁটের ভাষাকে আশ্রয় করে কথা-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মানবজীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এত বড়ো সংযমী, এত বড়ো সামাজিক-দায়িত্ববোধসম্পন্ন কথাশিল্পী সেকালে আর কেউ ছিলেন না, একালেও বিরল।

৩

আমরা বলেছি, শরৎসাহিত্য শুধু বেদনার নয়, তা প্রতিবাদেরও সাহিত্য। বস্তুত সৎ সামাজিক-সাহিত্যের ধর্মই এই, তা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শুধু শোষিত-শ্রেণীর দুঃখবেদনার চিত্রকেই প্রকাশ করে না, তার সম্মিলিত ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণাকেও পবিত্র প্রতিবাদের ভাষায় মুখর করে তোলে। ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্র অভিজাত সামন্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন না। অসহনীয় দারিদ্র্যের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বড় হতে হয়েছে তাঁকে। দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে তাঁদের পৈতৃক বসতবাটী। অর্থাভাবে বিদ্যাশিক্ষার পথ হয়েছে রুদ্ধ। সামান্য চাকুরির জন্য তাঁকে ছুটতে হয়েছে রেঙ্গুনে।

এই দারিদ্র্যই তাঁকে সাহায্য করেছে সমাজের নীচুতলার মানুষগুলোর সঙ্গে মিশতে, তাঁদের দুঃখবেদনাময় জীবনের সংস্পর্শে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে। গ্রামের লম্পট জমিদার থেকে মুসলমান কৃষকের পর্ণকুটির এবং সন্ন্যাসী ফকির, আফিঙের চোরা-চালানদার ও বাজারের বেশ্যা, রাজনৈতিক মঞ্চের উচ্চসারির নেতা ও আত্মগোপনকারী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী—জীবনে কত পরস্পরবিরোধী মানুষই না দেখেছেন শরৎচন্দ্র! মানুষের সমাজ ও সমাজের মানুষ সম্পর্কে এত নিবিড় গভীর অঙ্গাঙ্গী অভিজ্ঞতা সেকালের আর কোন কথাশিল্পীরই ছিল না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই কথাসাহিত্য রচনার মূল উপাদান। শরৎচন্দ্র নিজেও একথা বলেছেন বহুবার: মানুষ ও মানুষের সমাজই শিল্পের উপজীব্য—যাঁরা তা দেখেন নি, জানেন নি, ভাবের তাত্ত্বিকতা বা কথার ফুলঝুরি দিয়ে কথাসাহিত্য রচনার অধিকার তাঁদের নেই।

সমাজের অন্ধিসন্ধিতে নিরাসক্ত নির্ভীকতায় শরৎচন্দ্র বিচরণ করেছিলেন বলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, কোথায় তার দৈন্য, তার ক্ষোভ, বেদনা, প্রতিবাদ। তথাকথিত 'চিরন্তন' বিশুদ্ধ' সত্যের প্রতি তাঁর যেমন কোন আকর্ষণ ছিল না, পুরাতনের প্রতি তাঁর তেমন মোহ ছিল না। বর্তমানের লজ্জাকর পরাধীনতা ও খরতপ্ত দারিদ্র্যের ধূসরতায় অতীত ঐতিহ্যের গৌরব উদ্ধারের প্রলেপ লাগানোর মানসিকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। 'যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে, পাথর খুঁড়ে বার করছেন আর বলছেন —এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল--আমি তাঁদের কথায় খুশী হই না। আমার বুক তাতে ফুলে ওঠে না। আমি বলি—আমাদের কিছুই ছিল না। দুঃখ করবার কিছু নেই।...দু'হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল না-ছিল —তার কথা পাথর খুঁড়ে আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই। আমার কথা—

পুরান জিনিস নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নূতন গড়ে তোল।' (চন্দননগরের আলাপসভায়)। শরৎচন্দ্রের এই চিন্তা রবীন্দ্রচিন্তার বিপরীত এবং এর মূলে নিহিত আছে গভীর স্বদেশ ও সমাজচেতনার মধ্যে। বর্তমানের দৈন্য ও গ্লানিকে কখনো ছোট করে দেখেন নি তিনি, তার দহনজ্বালায় বিদ্ধ হয়েছেন ভয়ংকরভাবে। অতীতের অলস ভাববাদী রোমন্থনের চেয়ে বর্তমানকে গ্লানিমুক্ত করে সুস্থ জীবন গড়ে তোলার ব্রতকেই তাঁর মনে হয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। এই মানসিকতা থেকেই ভাঙা ও গড়ার কাছে হাত দিয়েছেন শরৎচন্দ্র।

বর্তমানের পরাধীনতার দীনতাই শরৎচন্দ্রকে পীড়িত করেছে সবচেয়ে বেশী। কথাশিল্পী হয়েও তিনি সরাসরি যে রাজনীতিতেও নেমে এসেছিলেন এ শুধু শখ মেটানোর ক্ষণিক বিলাস কিংবা সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের কাঁটাতারে ঘেরা ক্ষুব্ধ অপমানিত স্বদেশের দুঃসহ লজ্জা ও বেদনা তাঁকে অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতায় পরিণত করেছে। একমাত্র নজরুল ইসলাম ব্যতীত তাঁর সমকালের আর কোন লেখক এমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজবিরোধী রাজনীতিতে যোগ দেন নি—এটাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। আবার তৎকালীন কংগ্রেসী রাজনীতির যে অংশ ছিল আপোসকামী, নরমপন্থী, চরকাকাটা, ও অসহযোগ ও অহিংসাকেই যারা ইংরেজ-বিতাড়নের একমাত্র উপায় বলে মনে করত—শরৎচন্দ্রের সংগ্রামী মানসিকতা সেই ক্লীবতার রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারে নি। বহু রচনায় তিনি বিদ্রূপ করেছেন এইসব দুর্বল, পঙ্গু চিন্তাধারাকে। গান্ধীজীর সঙ্গে কথোপকথনে সরাসরি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, চরকা কেটে অহিংস পথে স্বরাজ আসবে, এ তিনি বিশ্বাস করেন না ; তাঁর মতে 'Swaraji can be helped by soldiers and not by the spiders.' চৌরীচৌরায় পুলিশ-হত্যার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ গান্ধী সমগ্র আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অকস্মাৎ তা প্রত্যাহার করে নিলে ক্ষুব্ধ উত্তেজিত শরৎচন্দ্র প্রায় চীৎকার করে বলেন, 'গোটাকতক কনস্টেবল infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে, তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে—সেই শোণিতপ্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে? …নন্-ভায়লেন্স খুব noble idea কিন্তু achievement of freedom

is nobler—hundred times nobler.' গান্ধীজীর প্রতি ব্যক্তিগত গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর আপোসকামী সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতি ক্রমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র। তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' (১৩৪১) নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে, গান্ধীজী সম্পর্কে সেখানে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য: 'তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি ক'রে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।'

এই সামান্য ক'টি উক্তি ও উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামত কত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ছিল। দৃশ বৎসরের স্থায়ী এক সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তিকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত করা যায় না, এ কথা শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনভয় তুচ্ছ করে স্বদেশমুক্তির সঙ্কল্প নিয়ে যে-সকল মহৎপ্রাণ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী এই বলপ্রয়োগের দুর্গম পথে অভিযান শুরু করেছিলেন, তাঁদের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর। মার্কসবাদী বিচারে সন্ত্রাসবাদী-আন্দোলন ভুল ছিল, কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ, সাহস ও স্বদেশপ্রেমের অতুলনীয় মহিমাকে অস্বীকার করবে কে? সেকালের কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সমস্ত আন্দোলনকারীদের আপন শ্রেণীস্বার্থেই এড়িয়ে চলত। কিন্তু শরৎচন্দ্র এঁদের অভিনন্দিত করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন সবসময়। এই প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের শরৎচন্দ্র-প্রদত্ত নাগরিক-সংবর্ধনার কথা স্বতঃই মনে পড়ে। কংগ্রেসী চক্রান্ত ও ইংরেজের রক্তচক্ষু উভয়কেই উপেক্ষা করে হাওড়ায় এই সংবর্ধনা-সভা আহ্বান করেছিলেন তিনি। দীপ্ত ভাষণে বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সংবর্ধনা জানাবে না কেন? গভর্নমেণ্ট তাদের রেভোলিউশনারি বলেছে বলে?···গভর্নমেণ্ট কি হবে আজ আমাদের conscience-keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা identify করব গভর্নমেণ্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means. We must receive them and congratulate them openly and wholeheartedly.'

এই প্রসঙ্গে 'পথের দাবী' উপন্যাসটির কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। ১৩৩৩ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত ও তার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম

রাজদ্রোহের অপরাধে একজন কথাশিল্পীর উপন্যাস দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হল। সেদিন 'পথের দাবী' বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সমস্ত মানুষকে, বিশেষ করে বিদ্রোহী তরুণসমাজকে গভীরভাবে আন্দোলিত ও উত্তেজিত করেছিল। বিপ্লবীদের কাছে এই বই হয়ে উঠেছিল অবশ্যপাঠ্য একটি পবিত্র গ্রন্থ। এক খণ্ড বই গোপনে সংগ্রহ করে দলবদ্ধ ভাবে তাঁরা পাঠ করতেন। পাঠ করে ইংরেজ পশুশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত উদ্বেলিত হতেন। ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে 'পথের দাবী' এক প্রজ্বলন্ত সাহিত্যিক প্রতিবাদ। এর প্রতিবাদের ভাষা যেমন কঠোর, তেমনই নিরাবরণ নির্মম। এর ছত্রে ছত্রে পরাধীন ভারতবাসীর মর্মজ্বালা, ঘৃণা, বেদনা, প্রতিরোধ, প্রতিহিংসা। এর প্রতি বাক্যে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদের আহ্বান, স্বাধীন ভারতভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাকুল আগ্রহ। স্বদেশের প্রতি কী গভীর দায়িত্ববোধ থেকে যাবতীয় সিডিশনের ঝুঁকি নিয়েও সেকালে শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—আজ ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এর শিল্পগত ত্রুটি অনেক, কিন্তু সমস্ত ত্রুটিকে ঢেকে দিয়ে এর অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেমের মর্মবাণী কৃষ্ণমেঘ-আচ্ছাদিত আকাশে দীর্ঘ উজ্জ্বল বিদ্যুৎরেখার মতো অচঞ্চল উদ্ভাসনে প্রদীপ্ত হয়ে আছে। এই উপন্যাসের সকল গৌরব এখানেই।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রভাব এবং ব্যক্তিগত জীবনে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বহুবিধ গ্রন্থপাঠের ফলাফলও 'পথের দাবী'তে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে সব্যসাচীর বিভিন্ন উক্তি ও চিন্তার মধ্য দিয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিকট রামদাস তলোয়ারকরের বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন, দেশের প্রকৃত বিপ্লব শুধু মধ্যবিত্তের উপর নির্ভর করে না, অনিবার্যভাবেই তার সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের সহযোগিতা চাই। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যোগ না দিলে, প্রকৃত স্বাধীনতা কখনোই অর্জিত হয় না। দেশের শ্রমিক-শক্তিকে বিপ্লবের অনিবার্য অংশ বলে উপলব্ধি—'পথের দাবী'র এক তাৎপর্যময় দিক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ভারতের বিভিন্ন কল-কারখানায় শ্রমিকশক্তি সংগঠিত হতে শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও স্বাধীনতাকামী এই শক্তি কখনো বোম্বাইর সূতাকলগুলিতে, কখনো রাওলাত বিলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। এই ধর্মঘটের ঢেউ ক্রমশ উত্তাল হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। তারও কিছু পরে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এই পার্টি গঠনের ফলে আতঙ্কিত ইংরেজ সরকার

গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়। ১৯২৫ সালে কলকাতায় কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'লেবার স্বরাজ পার্টি'—পরে যার নাম হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি'। শরৎচন্দ্র যখন 'পথের দাবী' রচনা করেন, তখন এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নিতান্ত শৈশবাবস্থা। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট ও আন্দোলন তখন ভারতব্যাপী প্রসারিত। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রখর সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা থেকেই এই জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। শ্রমিক-ধর্মঘটের তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। এই প্রসঙ্গে হাওড়া পৌরসভার ধাঙ্গর ধর্মঘটের কথা স্মরণযোগ্য। এই ধর্মঘটের সমর্থনে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার কংগ্রেস সভাপতির পদ পরিত্যাগের সংকল্প পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড-ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। হাওড়ার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক-নেতা জীবন মাইতিকে কারখানায় কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

'পথের দাবী'তে শুধু শ্রমিক ধর্মঘটের প্রসঙ্গ নেই—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য এই ধর্মঘট যে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার—এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। কারখানার মালিকদের অবিরাম শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত হতে হয়। সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শক্তি যখন অনুভব করে, তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তাদের ভাগ্য বা নৈতিক চরিত্র দায়ী নয়, দায়ী ঐ নির্লজ্জ শোষণকারীর দল—তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে সবেগে তারা আঘাত হানতে পারে। রামদাস তলোয়ারকরের বক্তৃতায় এই শ্রমিক-সংহতি ও প্রত্যাঘাতের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে 'পথের দাবী'তে। গোরাসৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়েও এই নির্যাতিত বিপ্লবী মানুষটি সমবেত শ্রমিকদের ডাক দিয়ে বলেছেন, 'এই ডালকুত্তাদের যারা আমার বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েচে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার।·· শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটা-কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এ যে কেবল ধনীর

বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোনো কিছুই নেই, —আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক। তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়। অক্ষম, দুর্বল, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ! তাই মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশী তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোনদিন দেবে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন!'

'পথের দাবী' সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে সব্যসাচী ভারতীকে বলেছেন, জনকতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্য এ সংগঠন তিনি সৃষ্টি করেন নি, এটা কোনো চাষা-হিতকারিণী নয়। আসল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা অর্জন। কাদের নিয়ে তা অর্জিত হবে? সব্যসাচী বলছেন, 'শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানায়, ব্যারেকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটীরে।'—শরৎচন্দ্র এবং সব্যসাচী উভয়েই বুঝেছিলেন বর্তমান সমাজের অগ্রগামী শক্তি হল সর্বহারা শ্রমিক, কৃষক তার সহযোগী শক্তি। শ্রমিকের নেতৃত্বেই স্বাধীনতাসংগ্রাম ও বিপ্লব (যা আসলে একটা দ্রুত আমূল পরিবর্তন) সার্থক হতে পারে। এবং এই বিপ্লব শান্তি নয়। "হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, এই তার বর তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হাঙ্গেরিতে তাই হয়েচে, রুসিয়ায় বার বার এমনি ঘটেচে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলিমজুরদের রক্তে সেদিন শহরের রাজপথ একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান,—সেদেশেও দিনমজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।"

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার অগ্রসরমানতা এই সমস্ত উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীশোষণের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যথার্থ বিপ্লবের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে, অনিবার্য শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কিভাবে তার রক্তরঞ্জিত আবির্ভাব ঘটবে—এ সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ কোনো সন্দেহ ছিল না। 'পথের দাবী'তে ঘটনাপরম্পরায় এর রূপ তিনি ফোটাতে পারেন নি, এগুলো শুধু কথার কথা হয়েই থেকে গেছে, কিন্তু

শিল্পগত এই ত্রুটি সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, এদেশে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহিত্যরচনার প্রারম্ভিক লগ্নে কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র মধ্য দিয়েই তার আগমনী গান সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয়েছে।

'পথের দাবী'র প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ হলে রবীন্দ্রনাথ যে তার প্রতিবাদ জানাতে অস্বীকার করেছিলেন, তার কারণও মূলত এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। শরৎচন্দ্র শ্রেণী-সংঘাত ও সহিংস অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আজীবন শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারক ও প্রচারক। বিপ্লবীদের প্রতিশোধ গ্রহণের পবিত্র ইচ্ছা তাঁর কাছে বরাবরই ভয়ের ও ঘৃণার বস্তু। তাঁর এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে 'চার অধ্যায়' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে তিনি যেভাবে আদিগন্ত কালিমালিপ্ত করে প্রকাশ করেছেন—তার ক্ষোভ, বেদনা ও লজ্জা এখনও আমাদের পীড়িত করে। 'চার অধ্যায়' প্রকাশের পর সেকালের কারারুদ্ধ বিপ্লবীরাও যে কী গভীর বেদনাহত হয়েছিলেন তার পরিচয় আছে সরোজ আচার্যের একটি লেখায় (দ্র. চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৬৮)। অথচ স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক কোনো পথের সন্ধানও রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন নি। তত্ত্বকথার আবরণে রূঢ় সত্যকে বারংবার আবৃত করেছেন। শরৎচন্দ্র আজীবন রবীন্দ্রনাথকে গুরু-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করলেও কবির রাজনৈতিক মতামতের এই অস্পষ্টতা এক সময় তাঁকেও বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। একসময় তিক্ত কণ্ঠে তিনি মন্তব্য করেছেন, "দেশকে স্বাধীন করবার প্রয়াস narrow nationalism নয়, chauianismও নয়; বিশ্বমানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ, যে-দেশে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি, সে দেশকে পর-অধীনতার নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। ··রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বরবিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। এই পরম ভাগবত কবির সহস্র political যুক্তিতর্ক ভগবানের রুদ্ধ দ্বারে এসে আছড়ে পড়ে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস বিধাতার কল্যাণহস্তই সব কিছু করে চলেছে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কি তা আমরা জানি নে, তাঁর ইচ্ছার দোহাই politicsএ আসা কোনো কারণেই আমার ভাল হয় না···"

৪

শরৎচন্দ্রের সমকালে এ দেশের মুখ্য দ্বন্দ্ব ছিল ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির দ্বন্দ্ব। শাসনব্যবস্থা থেকে ইংরেজ সরকারকে সমূলে উচ্ছেদ করাই ছিল সেদিনের প্রধান জাতীয় কর্তব্য। শরৎচন্দ্র সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি ও শৈল্পিক ক্ষমতা নিয়ে এক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা

গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মতো দেশবরেণ্য নেতাও শরৎ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি আরও বড়।' আমরা অবশ্য এই মন্তব্য ঠিক এইভাবে স্বীকার করতে রাজী নই। শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সত্তার কোনো বিরোধ ছিল না। দুইয়ে অঙ্গাঙ্গী মিলেই শরৎব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা।

স্বদেশের পরাধীনতার ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন মুক্তিকামী প্রতিবাদী লেখক, স্বদেশের বহুবিধ সামাজিক-অনুশাসন, অবিচার-অনাচার, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি যে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদী হবেন—এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মানুষকে যেমন তিনি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন বিদেশী নাগপাশের গ্লানি থেকে, তেমনই চেয়েছিলেন সামাজিক ক্রীতদাসত্ব ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলি এই তাৎপর্যেই বিচার্য। 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি এবং দুটি আশ্চর্য অসাধারণ ছোটগল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' শরৎচন্দ্রের সামাজিক দায়িত্ববোধের অনাস্বাদিতপূর্ব ফসল। এই রচনাসমূহে শরৎচন্দ্র প্রায় মারমূর্তি ধারণ করে সবেগে আঘাত করেছেন শুষ্ক প্রাণহীন সামাজিক প্রথাকে, বর্ণাশ্রমে বিভক্ত ও শাস্ত্রাচারে বদ্ধ হিন্দুত্বকে, কৌলীন্যপ্রথা, তথা সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক উপসৌধকে।

শরৎচন্দ্র হিন্দু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেও ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। বিশেষত সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক। শরৎচন্দ্র নিজেই বহুবার বলেছেন, সাহিত্যিকের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই—মানুষের ধর্মই তার ধর্ম। ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতি শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে বিদ্বিষ্ট ছিলেন বলে যাঁরা এই বিদ্বেষকে সামগ্রিকভাবে লেখকের মুসলমান সমাজের প্রতি বিদ্বেষ বলে প্রচার করতে চান—তাঁরা মস্ত বড় ভুল করেন। যে লেখক 'মহেশে'র গফুরকে সৃষ্টি করেছেন অথবা 'দেনাপাওনা'র ফকির সাহেবকে এবং পল্লী-সমাজের অন্তর্গত মুসলমান প্রজাদের, তিনি যে এক আশ্চর্য উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির অধিকারী ছিলেন—এ সত্য আমরা বুঝি বা না বুঝি, অবিভক্ত বাংলার সমাজ- ও রাজনীতি-সচেতন মুসলমানেরা বুঝেছিলেন। তাই তাঁরা গভীর শ্রদ্ধায় শরৎচন্দ্রকে বরণ করেছিলেন 'মুসলিম সাহিত্যসমাজে'র দশম বার্ষিক অধিবেশনে, আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুসলমান সমাজ ও চরিত্র নিয়ে আরো লিখবার, এই সমাজের বেদনা প্রকাশ করবার। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতিও শরৎচন্দ্রের কোনো বিরাগ ছিল না, 'পরিণীতা'র গিরীন চরিত্রটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আসলে শরৎচন্দ্র ছিলেন যুক্তিবাদী। সমস্ত ধর্মমতকেই তিনি যুগধর্মের নিরিখে বিচার করে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বহুকাল ধরে একটা কিছু চলে আসছে বলেই তা মান্য ও পালনীয়, এ কথা তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। ধর্মের নামে অচল অনড় যাবতীয় জড়ত্ব ও সুবিধাবাদকে এবং জাতের নামে বজ্জাতিকে তিনি আক্রমণ করেছেন সমানভাবেই। ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলিম লীগ যখন রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেছেন, "রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়াল সকলের বড়? আর মানুষ হল ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয় নি, এই দুর্ভাগ্য দেশে তাই কি হল special and peculiar circumstances?" (দ্র. সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (২) ১৩৪৩) আবার সমাজের ক্ষেত্রে হীন দুশ্চরিত্র স্বার্থলোভী সমাজপতিরা যখন হিন্দুধর্মের বেদ-বেদান্তের দোহাই পেড়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করেছে প্রতিপদে তখন শরৎচন্দ্র প্রবল ক্ষুব্ধতায় বলে উঠেছেন, 'কোনো ধর্মগ্রন্থই কখনো অভ্রান্ত হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং এতে মিথ্যার অভাব নেই।' এই উক্তি চরিত্রহীনের কিরণময়ীর মুখ দিয়ে নির্গত হলেও এ যে আসলে শরৎচন্দ্রেরই প্রতিবাদের কথা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থাদি সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য তিনি বহুস্থানেই করেছেন। এর মধ্যে 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"সমস্ত ধর্মই মিথ্যা —আদিম দিনের সংস্কার। বিশ্বমানবতার এত বড় পরম শত্রু আর নেই।' শরৎচন্দ্র কখনো স্বীকার করেন নি, বেদ অপৌরুষেয়, ধর্ম সনাতন, শাস্ত্রাচার অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় (দ্র. সমাজধর্মের মূল্য)। যা বুদ্ধির বাইরে, যুক্তির অগম্য তাকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। নির্গুণ, নিরাকার, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়—এ সব ভাববাদী তাত্ত্বিক দর্শনকে সমূলে পরিহার করেছেন। নির্মোহ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন সমাজের দিকে—তাই সমাজের সকল কুশ্রীতা ও নগ্নতাই নিঃশেষে ধরা পড়েছে তাঁর দৃষ্টিতে। তিনি দেখেছেন সমাজধর্মের রক্ষক ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভণ্ডামি, অর্থগৃধ্নুতা, ঔদরিকতা, পাশবিক নির্মমতা। দেখেছেন বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের নারীলোলুপতা ও ভ্রূণহত্যার চক্রান্ত। ব্রাহ্মণের তথাকথিত কৌলীন্য বহুক্ষেত্রেই যে নাপিতের ঔরসজাত, নির্মমভাবে এ কাহিনীও ব্যক্ত করেছেন 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে। এই শাস্ত্রধর্ম-শাসিত সমাজব্যবস্থা মানুষের হৃদয়কে প্রতি মুহূর্তে দলিত পিষ্ট করে নিজের ক্ষমতা ও অস্তিত্ব বজায় রাখার কী হীন ও কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হয়—দেখিয়েছেন চোখে আঙুল দিয়ে। এর অনিবার্য ফল

হিসেবে শরৎচন্দ্রকেও ভোগ করতে হয়েছে সমাজের নির্যাতন। স্থিতাবস্থার রক্ষকেরা প্রতিবাদী সাহিত্যকে কখনও সহ্য করতে পারে না। কেননা এ সাহিত্য তার কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত করে। শরৎচন্দ্র 'একঘরে' হয়েছেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে, গ্রামের উৎসবে অনুষ্ঠানে বর্জন করা হয়েছে তাঁকে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে দাম্পত্যজীবনকে অবলম্বন করে কুৎসা রটনা করা হয়েছে। উড়ো চিঠি পাঠিয়ে শাসানো হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী লেখক সমস্তই অগ্রাহ্য করেছেন পরম উপেক্ষায়।

শরৎ-সাহিত্য শুধু ধর্ম ও সংস্কারের উপর আঘাত হানে নি, শুধু অভয়া, কমল বা কিরণময়ীর মতো সমাজবিদ্রোহী নারীচরিত্র সৃষ্টিতেই এর সকল গৌরব নিহিত নয়—সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সচেতন সোচ্চার প্রতিবাদে এ সাহিত্য মুখর। শরৎচন্দ্রই এ দেশের প্রথম কথাশিল্পী যিনি ঔপনিবেশিক শোষণের কুটিল অর্থনৈতিক চক্রান্তকে নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রাম্যসমাজে কৃষককুলের চরম আর্থিক দুর্গতির মূল কারণ যে ইংরেজ-প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'—এই সত্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যই জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির সৃষ্টি। 'জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নি কারবার করা—এই হচ্ছে বাংলায় ধনী হবার একমাত্র পন্থা। এরই জন্য কৃষক জমিহীন, ছিন্নমূল, দারিদ্র্যগ্রস্ত। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী বলেছে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে নিরতিশয় পবিত্রজ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদারগ এর স্বরূপ বোঝা শক্ত নয় বোন।' এই জমিদারশ্রেণী গ্রামে থাকলেও প্রজাশোষণ করে, না থাকলেও করে। জমিদারির অর্থই হল শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'প্রজার রক্ত জমাট-করা অসংখ্য টাকা'। গ্রামে থাকলে তারা বেণী ঘোষাল, জীবানন্দের রূপ পরিগ্রহ করে, গ্রামের বাইরে থাকলে তারা মিস্টার আর. এম. রে হয়ে দেখা দেয় (দ্র. অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'জাগরণ')। তখন 'কেবল দূর হইতে সত্ত্ব নিঙরাইয়া যে রস বাহির হয় তাহাই পান করিয়া' বাবুয়ানা না সাহেবীয়ানা দিব্য বজায় রাখে। যে গ্রামে সশরীরে জমিদার নেই সেখানে এককড়ি বা অধর রায়ের মতো নায়েব-গোমস্তারা আছে, যারা সদ্য মাতৃহীন একটি শিশুকেও শোষণ করতে ছাড়ে না।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যে কয়টি জমিদারজাতীয় জীব সৃষ্টি করেছেন—এক শ্রীকান্ত উপন্যাসের কুমার সাহেব ব্যতীত তারা আর কেউই বঙ্কিমের নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলালের সমগোত্রীয় নয়। বঙ্কিমের শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি জমিদারদের এক উচ্চ আভিজাত্য ও মর্যাদায় ভূষিত করেছে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে এই জীবগুলি সকল আভিজাত্য ও মর্যাদা থেকে ধূলি-লুণ্ঠিত। শুধু

'শেষ প্রশ্নে'র জমিদার আশুবাবুকে তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করে সম্পূর্ণ অন্যধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র। অন্যথা তাঁর প্রায় সব জমিদারই নিরতিশয় ক্ষুদ্রচেতা, মদ্যপ, নারীলোলুপ, দাঙ্গাবাজ, খুনী। গ্রামে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে জমিদারদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর কল্পনার প্রয়োজন হয় নি। যেটুকু অসম্ভব-কল্পনা সে শুধু জীবানন্দের হৃদয়-পরিবর্তনে! কিন্তু এই অসম্ভব পরিবর্তনের দ্বারাও জীবানন্দের প্রথম পর্বের কদাচারী নিষ্ঠুর প্রজাশোষক রূপটি আবৃত হয়ে যায় না। অথবা বিরাজ-বৌ উপন্যাসে বজরায় বিরাজের সংস্পর্শ ও তার নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর সতীত্ব ভয়ভীত রাজেন্দ্র নামক জমিদারের নারীসঙ্গ পরিহারের আকস্মিক ইচ্ছা-উৎপত্তির দ্বারাও তাঁর চারিত্রিক নীচতার গ্লানি আবৃত হয় না। এই জমিদার-শ্রেণীর মধ্যে স্বল্প রেখায় সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে 'মহেশ' গল্পের সেই চাটুকারপরিবৃত জমিদাররত্নটি, গফুরের মুখের অন্ন যে কেড়ে নিয়েছে, এমন কি ভাগে-পাওয়া কাহনখানেক খড়ও যার লোভের ইতরতা থেকে রেহাই পায় নি, যার নিষ্ঠুর প্রহারে গফুরের জ্বরতপ্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং যে ধারাবাহিক অত্যাচারের পরিণামে শেষপর্যন্ত তাকে গ্রামের ভিটেমাটি ছাড়তে হয়েছে। জমিদারি দাপট ও অত্যাচারের এমন নির্মম বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের খুব কম গল্পেই আছে। কৃষকের সর্বস্ব হারিয়ে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিতটুকুও গভীর তাৎপর্যময়।

শরৎসাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের পাশাপাশি কৃষকসমাজের প্রতিরোধের কথাও বলা হয়েছে। কখনো এই প্রতিরোধ অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে, কখনও গ্রামীণ কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছে। 'জাগরণ' অসম্পূর্ণ উপন্যাস, কিন্তু শরৎচন্দ্র এই রাজনৈতিক উপন্যাসে কৃষকসমাজের জন্য একটি বিশিষ্ট ভূমিকা যে নির্দিষ্ট করেছিলেন তা বোঝা যায়। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে অমরনাথের নেতৃত্বে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। এই কৃষক-জাগরণের আতঙ্কভীত জমিদারের এক হিতৈষীর মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে বলছে, 'কতকগুলো, স্বদেশী ছাপ-মারা প্যাট্রীয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দেওয়া। বল্‌শেভিক প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে!......গোড়াতেই বিশেষ একটু সাবধান না হলে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, আপনি নিশ্চয় জানবেন।"

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে হরিহর ও সাগর সর্দার এবং বিপিনসহ অন্যান্য দরিদ্র কৃষকেরা জমিদার জীবানন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বৃত্ত তৈরী করেছে।

জমিদার তাদের জমি/কে-এক মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রি করে দেবার চক্রান্ত করলে দলবদ্ধ ভাবে ষোড়শীর কাছে এসে প্রতিকার প্রার্থনা করেছে। ক্ষোভ ও ঘৃণার শুষ্ক দাহ্যস্তূপ তাদের অন্তরেই জমা ছিল, ষোড়শীর সামান্য অনুপ্রেরণায় তা আগুনের মতো জ্বলে উঠেছে। তারা সম্মিলিত ভাবে গভীর কণ্ঠে জমি রক্ষার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছে, 'শুধু গর্ভধারিণী মা নয়, যিনি পালন করেন তিনিও মা। যা হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।'

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে জমিদার বেণী ঘোষাল ও রমার বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধের রূপ আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বেণীর চক্রান্তে ও রমার মিথ্যা সাক্ষ্যে রমেশের জেল হওয়ার পর, গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা ঐক্য গড়ে উঠেছে। রমার বাড়ির দুর্গোৎসবে একটা মানুষও যোগ দিতে, প্রসাদ নিতে আসে নি। বেণীর ক্রুদ্ধ আস্ফালনের মুখে বৃদ্ধ সনাতন হাজরা পরিষ্কার বলেছে, 'মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামুনবাড়িতে পাত পাতবে না!' পীরপুরের দরিদ্র মুসলমান প্রজা ও হিন্দু প্রজা ঐক্যবদ্ধ, পরস্পর 'ভাই' পাতিয়েছে, রমেশের অবর্তমানে বেণী ও রমার বিরুদ্ধে তাঁরা একত্রে লড়াই করবে। এদেরই একজন তুষ্ট কলুর ছেলে বেণী ঘোষালের মাথাটি ফাটিয়ে দিয়ে এল। জাগ্রত কৃষকশক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে হিংস্র বেণী ঘোষাল তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সাহসই পায় নি! শরৎ-সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি কৃষকশক্তির এই প্রতিরোধও লক্ষ্য করবার মতো। রমেশ, ষোড়শী অথবা অমরনাথদের নেতৃত্বে এটা সম্ভব হয়েছে বলেই এর শক্তি ও তাৎপর্য ছোট হয়ে যায় না।

৫

আবেগসর্বস্বতা নয়, নিষিদ্ধ প্রেমের আকর্ষণজনিত উত্তেজনার কারণেও নয়, শরৎসাহিত্য সমকালীন জীবনের পটভূমিতে বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের সাহিত্য হয়ে উঠেছে বলেই—বাঙালি ঘরের প্রায় নিরক্ষর কুলবধূ থেকে শিক্ষিত নাগরিক ও সাহসী সংগ্রামী দেশপ্রেমিক পর্যন্ত—সকলের কাছেই তা সমান উপভোগ্য ও আদরণীয় হয়েছে। এত বিপুল জনপ্রিয়তা, গ্রন্থে, মঞ্চে, অবাক্ ও সবাক্ চলচ্চিত্রে—বাংলা দেশের আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে জোটে নি। জোটে নি তার কারণ, শরৎচন্দ্রের মতো আর কেউই ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির উচ্চতলশায়ী সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা ভেঙেচুরে তাকে যথার্থ সর্বসাধারণের গ্রহণোপযোগী করে তুলতে পারেন নি, আর কেউই

পারেন নি ঘন বেদনার তুলিতে এমন নিপুণ করে প্রতিবাদের ছবি আঁকতে। এ কারণে শরৎসাহিত্যই মধ্যযুগের কৃত্তিবাস ও কাশীরামের পর আধুনিক বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক-সাহিত্য। কী বিষয়বস্তুতে, কী চরিত্রচিত্রণে, কী ভাষা ব্যবহারে এর লক্ষ্য গণতান্ত্রিক বাস্তবতা, এর প্রতিফলিত জীবনভাবনা তথা জীবনদর্শনেও এই উদার সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। শরৎ-সাহিত্যের এই মৌল লক্ষণটি অনুধাবন না করে, যারা এর ব্যাপক বিশাল সমগ্র-ভারতবর্ষ-ব্যাপী জনপ্রিয়তার মূলানুসন্ধান করেন নিছক আবেগতারল্য, স্নেহবাৎসল্য কিংবা গল্প-গঠনের তরল-সহজ-কাঠামোর মধ্যে—তাঁরা শুধু শরৎসাহিত্যের উপর অবিচার করেন না, পক্ষান্তরে এই বিরাট ভূখণ্ডের এক বিশাল জনসমষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদর্শন করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই শরৎ-সাহিত্য যে কিছু অভিজাত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্তের ঘরে আলমারির শোভাবর্ধক হয়ে না থেকে পৌঁছে গেছে সাধারণ দরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে, আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী ভারতের সর্বকোণে, যার বিপুল জনগ্রাহ্যতায় সানন্দে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন এমন কি রবীন্দ্রনাথও, তার মূল্যের পরিমাপ কি 'তরলতা' 'অগভীরতা' 'আংশিকতা' কিংবা 'আকস্মিকতা' জাতীয় শব্দের ব্যবহারে এত সহজেই করা যায়? শরৎ-সাহিত্যের পাঠকপাঠিকা এই বিশাল জনসমষ্টি কি এতই 'নাবালক', এতই 'নির্বোধ' যে সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের ন্যূনতম ক্ষমতাও তার নেই? তা শুধু অর্জন করেছি আমরা—স্বল্পসংখ্যক কিছু বুদ্ধি-জীবী, যারা কিনা ইংরেজের পাঠশালায় 'উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত' রক্তের ভিতরে এখনও ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসত্বের হীনম্মন্যতা বহন করি, বুর্জোয়া জীবন-দর্শনের দ্বারা চেতনে-অচেতনে আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন, মার্কসবাদী শিবিরে কখনো পা রাখলেও মগজটা রেখে দিই আসলে ভাববাদী শিবিরেই?

এই ধরনের 'ইন্‌টেলেকচুয়াল স্নবারি' আর যারই থাক কোন সৎ মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচকের থাকা উচিত নয়। কেননা 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্ব আমরা অস্বীকার করি, 'জীবনের জন্য শিল্প' তত্ত্বেও আমাদের সংশয় দূর হয় না, আমরা স্পষ্ট উচ্চারণে বলি—'জনগণের জন্য শিল্প'। 'A thing is good only when it brings real benefit to the masses of the people'—শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেছেন মাও সে-তুঙ। যে শিল্প তত্ত্বের দিক দিয়ে অতিশয় মনোহর, ভাবের দিক থেকে চমৎকাররূপে গভীর এবং ভাষার দিকে অতিশয় কারুকার্যময়, বক্তব্য বা চরিত্রের দিক থেকে সে যদি গণমানুষের স্বার্থপোষক না হয়, যদি মুষ্টিমেয় শিক্ষাগর্বীর ভ্রইংরুম ছেড়ে রাজ-পথে নেমে আসার যোগ্যতা অর্জন না করে—তাকে নিয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য

করার আমরা পক্ষপাতী নই। আমরা নিশ্চিতভাবে সন্দেহ করি, সে সাহিত্যে সব থাকলেও আসল বস্তুটাই নেই—যা কিনা সতেজ সহজ প্রাণশক্তি—সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের অনিবার্য দ্বন্দ্বসংঘাত থেকে যার জন্ম, যা নদীর মত বহমান, মাঠভরা ফসলের মত আন্দোলিত, আকাশের ধ্রুবতারার মত যার নিশ্চিত অবস্থান ব্যাপক বৃহত্তর মানবসমাজের দিকেই। শিল্প জীবন-অতিরিক্ত কোন স্বয়ম্ভু বস্তু নয়, আপনাতে আপনি সে বিকশি ওঠে না, সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার সে একটি উপরিসৌধ মাত্র। সমাজ যেমন একটা জড়বস্তু নয়, নানা দ্বন্দ্বসংঘাতে সর্বদাই ক্রিয়াশীল, অগ্রসরমান, সমাজান্তর্গত মানুষেরাও তেমনি জড়বুদ্ধি, নির্বোধ নয়, কেননা তারাই সমাজের মূলীভূত শক্তি সমাজগতির ধারক ও বাহক, সকল শিল্প ও সংস্কৃতির মৌল উপাদান, সকল পরিবর্জন ও পরিবর্তনের শেষ বিচারক। সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করে সেই লোকায়ত সৃষ্টি সমাজবিজ্ঞানীর যেমন গভীর শ্রদ্ধার ও অনুশীলনের বস্তু, অনুরূপভাবেই চলমান মানবস্রোতের একটি বৃহৎ অংশ যখন কোন ব্যক্তিবিশেষের সাহিত্যকে গভীর আবেগের সঙ্গে গ্রহণ করে, অনুরাগে ভালবাসায় লালন করে—তখন তার বিচার বিশ্লেষণ সম্পর্কেও আমাদের অতিমাত্রায় সতর্ক ও শ্রদ্ধান্বিত হওয়া প্রয়োজন। দুচার-দশজন বুদ্ধি-জীবীর বিচারে ভুল হতে পারে, কিন্তু একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী কখনো ভুল করে না, দীর্ঘকাল ধরে তো কখনই না। সে তার সামাজিক অবস্থানে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের মৌল অন্তর্নিহিত বোধ ও প্রেরণা থেকেই জীবনের শত্রুকে যেমন নির্ভুলভাবে চেনে, মিত্রকেও তেমনি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যা তার জীবনের স্বপক্ষে যায় না, যা তার আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের সহায়ক নয়—তাকে সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করে। এর সংখ্যাতীত প্রমাণ ইতিহাসে আছে।

শরৎসাহিত্য যে এই উপমহাদেশের সংখ্যাতীত মানুষের দ্বারা গৃহীত ও লালিত হয়েছে—এর দ্বারাই বোঝা যায় সাধারণ মানুষ এই সাহিত্যকে তার আনন্দবেদনার অংশীদার, তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের হাতিয়ার বলে মনে করেছে। এইখানেই শরৎসাহিত্যের অনন্য গৌরব। জনচিত্তজয়ী এই গৌরব তিনি অর্জন করেছেন তাঁর গভীর বাস্তববাদী জীবনদর্শন, মুক্ত স্বচ্ছ সমাজদৃষ্টি এবং অসাধারণ শৈল্পিক সরলতা ও সহজতার গুণে। এ ফাঁকি দিয়ে আদায় করা নয়, বুর্জোয়া সমাজের পিঠচাপড়ানি বা পুরস্কারের তকমা গলায় ঝুলিয়ে চোখ-ধাঁধানো নয়—এ তিনি অর্জন করেছেন মানুষের সঙ্গে থেকে, মানুষের শিল্পী হয়ে আপন সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে। এ কারণেই তাঁর অসম্ভব

জনপ্রিয়তাকে নির্বোধের হাততালি মনে না করে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত :

Glorious is the writer who can express a complex and valuable social idea with such powerful artistic simplicity that he reaches the hearts of millions. Glorious is also the writer who can reach the hearts of these millions with a comparatively simple, elementary content ; and the Marxist critic should highly value such a writer. [Thesis of the Problems of Marxist Criticism. A. Lunacharsky. On Literature and Art. মস্কো, ১৯৬৫ । পৃ. ২২]

শরৎ-উপন্যাসের স্ব-কৃত নাট্যরূপ

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা নাটক ও উপন্যাসের জন্ম যেমন প্রায় একই সময়ে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, তেমনি সৃষ্টিধারার অগ্রগতিও সমান্তরাল রেখায়, সমশক্তিতে। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রত্যেকটি লেখকই হয় উপন্যাস, নয় নাটক—যে-কোন একটি সৃষ্টিশাখাতেই তাঁদের শক্তিকে একাগ্র করেছেন ; একাধারে ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের সার্থক সব্যসাচী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর ক'জনেরই বা উল্লেখ করবার মত ? বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী, প্রভাতকুমার, ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখ আদিযুগের ঔপন্যাসিক বা রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু অথবা গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকাররাই তার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র মৌলিক নাটক ত লেখেনই নি, এমনকি তাঁর একটি উপন্যাসের নাট্যরূপও নিজে দেননি। বাংলার মঞ্চরসিকদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে তুলে ধরেছিলেন গিরিশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মৌলিক নাটক অনেক লিখেছিলেন, কিন্তু প্রথম দুটি উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'র নাট্যরূপ তিনি দিলেও, যে উপন্যাসগুলি তাঁকে গৌরব দিয়েছে, সেই 'চোখের বালি' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ তিনি নিজে দেননি। এগুলির নাট্যরূপ দেওয়ার সময়, অভিনয়ের জন্য মঞ্চ ও অভিনেতা, এবং বলা বাহুল্য, নাট্যরূপ দেওয়ার মত দক্ষতা তাঁর নিঃসন্দেহে ছিল। এরপরই আসে শরৎচন্দ্রের কথা। মৌলিক নাটক শরৎচন্দ্রও লেখেন নি। তবে তাঁর তিনটি উপন্যাস 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ' এবং 'দত্তা' শরৎচন্দ্রের নাট্যরূপ নিয়েই যথাক্রমে 'ষোড়শী', 'রমা' এবং 'বিজয়া' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। আরও একাধিক স্বরচিত উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সরাসরি উপন্যাস রচনার যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধা আছে উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণে। উপন্যাসে লেখকের কল্পনা বল্গাহীন, চরিত্রসমূহ অবাধ, মুক্তপক্ষ, লেখকের কলম নির্দিষ্ট সময় অনুসারে চলতে বাধ্য নয়। যেমন 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে তিনশ পৃষ্ঠার বেশী পরিসরে শরৎচন্দ্র যত কথা বলতে পেরেছিলেন সেই কথাগুলি নাট্যরূপায়িত 'ষোড়শী'র দেড়শ পৃষ্ঠার মধ্যে বলা সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র যদি প্রফুল্ল নাটক উপন্যাসায়িত

করতেন তাহলে নাটকের ত্রুটি উপন্যাসে অনেকটা ঢাকা পড়ত। তবে পৃথিবীতে যত নাটক উপন্যাসায়িত হয়েছে, এবং যত উপন্যাস নাট্যায়িত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে ত্রুটি থাকতে বাধ্য ; তার কারণ উপন্যাস এবং নাটকের জগৎ স্বতন্ত্র, উভয়ের শিল্পরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালির চিত্তমুকুরে যেরূপে মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁদের উপন্যাসের নাট্যরূপ ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করলেও সেই চিরন্তন গৌরব পায়নি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপগুলি অসাধারণ মঞ্চসফল। বাংলার রঙ্গমঞ্চে তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রখর যৌবনোত্তাপ সঞ্চারিত। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ। এঁদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মণিকাঞ্চনযোগে বাংলা মঞ্চে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র একবার তাঁর নাটকের সংলাপ পরিবর্তনের জন্য আপত্তি তুলে বলেছিলেন—'আমার বইয়ের পাত্রপাত্রীদের মুখে যে সব ডায়ালগ আছে, তা সবাই পছন্দ করে। আমার বই কুকুরের গলায় বেঁধে দিলেও সবাই পড়বে।' উত্তরে শিশিরকুমার বলেছিলেন—'না, শরৎবাবু, তা নয়। কেউ পড়বে না, কিন্তু এই শিশির ভাদুড়ী কোন ডায়ালগ না বলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু যদি এ. বি. সি. ডি. আবৃত্তি করতে থাকে তাহলেও লোকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে ও দেখবে। অন্য লোকেও ত আপনার বই অভিনয় করল। কিন্তু কই, তারা তো আপনার বই আদৌ জমাতেই পারল না।' শরৎ-শিশিরের এই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে দুজনেই অহংকার প্রকাশ করেছেন। তবে এর কারণ শরৎ-নাট্যের ব্যাপক মঞ্চসাফল্য। শিশিরকুমারই শরৎচন্দ্রকে বাংলা নাট্যদর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন, এ কথা বলা যায়। শরৎ-কৃত তিনটি নাট্যরূপ ছাড়াও তাঁর 'বিরাজ বৌ' এবং 'বিন্দুর ছেলে' উপন্যাসের নাট্যরূপ শিশির-অভিনয়-প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শিশির-উত্তর বাংলা নাট্যশালা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'কাশীনাথ', 'পরিণীতা', 'নিষ্কৃতি', 'শ্রীকান্ত' ইত্যাদি উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করে ব্যাপক জনস্বীকৃতি ও ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। তবুও আগের কল্পনাতেই ফিরে গিয়ে বলি, এই নাট্যসাফল্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কণামাত্র গৌরব-অংশ পেয়েছে। তবে নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে যেমন শিশিরকুমার পরিচিত করিয়েছেন, তেমনি শিশিরকুমারের অভিনেতাজীবনের ফল ও খ্যাতিলাভের পিছনেও শরৎ-উপন্যাসের শরৎ-কৃত নাট্যরূপের ভূমিকা যথেষ্ট। শরৎচন্দ্রের সংযমহীন, নিয়মহীন, অভিশপ্ত জীবানন্দই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের পরিচিতির মূল সোপান।

শরৎচন্দ্রের নাট্যকার-জীবন দীর্ঘায়ত নয়। গ্রন্থাকারে 'ষোড়শী'র প্রকাশ ১৩ই অগস্ট ১৯২৭, 'রমা'র প্রকাশ ৪ঠা অগস্ট ১৯২৮ এবং 'বিজয়া'র প্রকাশ ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৪। এই সাত বছরে শরৎচন্দ্র নাটক নিয়ে বিশেষ কিছু ভেবেছিলেন এমন কথা জানা যায় না। তা যদি ভাবতেন তাহলে মৌলিক নাটকই লিখতেন। তবে 'ষোড়শী' বার হবার সাত মাস পরে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—'আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে।···ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুন্ন করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়' (৫ঠা ফাল্গুন ১৩৩৪)। এই পত্রের কথা অনেকেই জানেন এবং প্রসঙ্গক্রমে অনেকেই তা থেকে উদ্ধৃতি দেন, কিন্তু কেন যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এমন তীব্র আক্রমণ করেছেন তা বলেন না। আমাদের মনে হয়, সাহিত্যে বাস্তবতা, আধুনিক সাহিত্য, শাশ্বত সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যানধারণাই এর পিছনে কাজ করেছিল। 'তার দামও পেয়েচ' বলতে কবি নিশ্চয়ই মঞ্চসাফল্য বোঝাতে চেয়েছেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ যদি শরৎচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার দৈন্য নিয়ে আলোচনা করতেন তাহলে বলার কিছু ছিল না; কিন্তু নাট্যবিষয় বা চরিত্র সম্পর্কে তাঁর উক্তিতে ফাঁক আছে। বরং উত্তরে শরৎচন্দ্র যা লিখেছিলেন তাই ঠিক—'আমি পূর্বে কখনও নাটক লিখিনি। এখন দু একটা লেখার ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন।···উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।' (২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪)

শরৎচন্দ্রের দু-একটা নাটক লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাধার ফলে উপন্যাসের নাট্যরূপই দিতে হল। সেখানেও বাধা এল অন্য রূপ নিয়ে। 'দেনাপাওনা'র পরিণতি গেল পাল্টে, 'পল্লীসমাজে'র বৃহত্তর সমাজসমস্যা কেন্দ্রায়িত হল ব্যক্তির সমস্যায়। 'দত্তা' উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় গুণের অভাব নাট্যরূপেরও ত্রুটির কারণ হয়েছে। পল্লীসমাজের জীবনরস যেমন 'রমা' নাটকে অনুপস্থিত, তেমনি 'দত্তা'র কাহিনীহীনতা 'বিজয়া'তেও সঞ্চারিত। তবুও যে শরৎ-কৃত অথবা অন্যান্য নাট্যকার-কৃত নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়েছিল তার কারণ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের বিপুল জনখ্যাতি। নাটক হিসাবে নয়, বঞ্চিত মানুষের জীবন-গাথা হিসাবে প্রচারিত উপন্যাসের নাট্যরূপ বলেই সেগুলির মঞ্চসাফল্য এত বেশী।

ছায়াছবি, বেতার এবং মঞ্চে শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক অভিনীত নাট্যরূপ হল 'ষোড়শী'। এটি শরৎ-কৃত প্রথম নাট্যরূপ। শিশিরকুমারের দ্বিতীয় অভিনীত সামাজিক নাটক (প্রথম ছিল 'প্রফুল্ল') 'ষোড়শী' (প্রথম অভিনয় ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪)। এটি শরৎ-কৃত নাট্যরূপ কিনা সে নিয়ে দু-একজন প্রশ্ন তুলেছেন। 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য' গ্রন্থে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, 'শিবরাম চক্রবর্তী 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ দেন এবং 'শরৎচন্দ্র সে লেখা আগাগোড়া দেখে পরিমার্জনা করে দিলেন এবং তাঁর নামেই ষোড়শী ছাপা হলো ভারতীর এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে।'···অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখছেন—'এই নাটকখানা লিখেচি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে; তাতে যত কথা বলতে পেরেছি এতে তা পারিনি।' দ্বিতীয় আর-একজন শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে সৌরীন্দ্রমোহনের মতই বলেছেন যে, ষোড়শীর নাট্যরূপ দিয়েছেন শিবরাম চক্রবর্তী। আবার সেই হেমেন্দ্রকুমারই গ্রন্থান্তরে শিশিরকুমার-অভিনীত 'জীবানন্দ' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কি মধুর সুধার আস্বাদলাভের সুযোগ উপস্থিত, না দেখে তার ধারণা করা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব।' আমাদের মনে হয়, যতদিন না এই স্ববিরোধী উক্তির অবসান হচ্ছে এবং যতদিন না অন্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে ততদিন 'ষোড়শী'র নাট্যরূপদাতা যে শরৎচন্দ্রই, তাতে সন্দেহ থাকছে না।

মঞ্চরসিকদের কাছে নাটকের ট্রাজেডি-রসের আবেদন সর্বাপেক্ষা নিবিড় বলেই শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা'র মিলনান্তক পরিণতিকে 'ষোড়শী'তে বিষাদের করুণ রাগিণীতে পরিবর্তিত করেছেন। এ ছাড়া নাটকের আর কোথাও তেমন কোন নূতনত্ব সংযোজিত হয়নি। অবশ্য উপন্যাসের চেয়ে নাটকে মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল জীবানন্দ চরিত্র বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে ষোড়শীর রুক্ষ ঊষর চিত্তের পরিবর্তন উপন্যাসের চেয়ে নাটকে যেন অনেক আকস্মিক। এই দ্রুতি অবশ্য নাটকের গৌরবই দিয়েছে। তাছাড়া নাটকের পরিণতিও স্বাধীন। উপন্যাসের শেষে ছিল, "ষোড়শী জীবানন্দের নৌকাতে বসে তখন ধীরে সুস্থে ভেবে দেখবো কি কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না। —সেই ভালো, বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।"

অপরদিকে 'ষোড়শী'র শেষাংশ :

জীবানন্দ। উঃ, পৃথিবীতে কি আর হাওয়া নেই প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। কষ্ট কি খুব বেশী হচ্চে দাদা ? ডাক্তারকে কি একবার ডাকব ?

জীবানন্দ। না না, আর ডাক্তার বদ্যি নয় প্রফুল্ল, শুধু তুমি আর আমি আর অলকা। উঃ—কি অন্ধকার! সূর্য কি অস্ত গেল ভাই ?

প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে কি আজ সত্যই ছুটি দিলে দাদা ?

যথাস্থানেই 'ষোড়শী'র যবনিকা পড়েছে। সেই তুলনায় বিজয়ার পরিণতি করুণ হলেও দুর্বল। শোনা যায়, শরৎচন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশিরকুমারের বারংবার অনুরোধে 'ষোড়শী'র শেষে জীবানন্দের মৃত্যুর ছবি এঁকেছেন।

'ষোড়শী'র একবছর পরেই পল্লীসমাজের নাট্যরূপ 'রমা' বার হয়। 'রমা'য় শরৎচন্দ্র প্রায় পুরোপুরি উপন্যাসকে নাটকে উপস্থিত করেছেন। এর ফলে নাটকের পঞ্চসন্ধি দূরে থাকুক, চরমোৎকর্ষটুকুও পাই না। উপন্যাসে রমা ও রমেশ চরিত্রের তথাকথিত নিষিদ্ধ প্রেমকে শরৎচন্দ্র সহানুভূতির তুলিতে স্ফুটবাক্ করে তুলেছেন। নাটকে এই বিষয়টি প্রাধান্য পেলেও উপন্যাসের রমেশ যে আদর্শবাদ ও সমাজসংস্কারের প্রদীপ নিয়ে পথ চলেছিল তাকে খুঁজে পাই না। শেষদিকে রমা-রমেশের বিচ্ছেদের অংশটি অবশ্য দর্শকমনে রেখাপাত করে। কিন্তু আগেই বলেছি, শিল্পবিচারে অংশটি দুর্বল।

মঞ্চের পাদপ্রদীপে 'বিজয়া' যতখানি প্রিয়, নাট্যসাহিত্যের অঙ্গনে সেটি ততখানি উপেক্ষিত। এইটিই শরৎচন্দ্রের শেষ নাট্যচর্চা। 'রমা' রচনার পর তিনি ছ বছর নীরব ছিলেন। এ সময় নাটক নিয়ে কোন উৎসাহ শরৎচন্দ্র দেখান নি। সমস্যাবিরহিত, সংশয়দীর্ণ, অম্লমধুর যে দু-একটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন তার একটি 'দত্তা'। নরেন-বিজয়ার প্রেমকাহিনী উপন্যাসে যে সিদ্ধি লাভ করেছে নাটকে তা অনুপস্থিত।

শরৎচন্দ্রের সব নাটকেই চরিত্রের সংখ্যা বেশী। 'রমা'য় নামাঙ্কিত পুরুষ-চরিত্র ঊনত্রিশ, তা ছাড়া আছে দীনু ভট্টাচার্যের ছেলেমেয়েরা, কৃষক-গণ, ভিখারীগণ, খরিদ্দারগণ। স্ত্রী-চরিত্র আটটি, এ ছাড়া ভিখারীগণ। 'ষোড়শী'তে পাইকের সংখ্যা দুজন ধরলে মোট পুরুষের সংখ্যা পঁচিশ। স্ত্রী-চরিত্র অবশ্য কম। 'বিজয়া'য় চরিত্রের সংখ্যা সবচেয়ে কম—যদিও প্রায় কুড়ি জনের কাছাকাছি। মনে হয়, উপন্যাসের নাট্যরূপ বলেই চরিত্রের সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে।

অঙ্ক- ও দৃশ্য -সজ্জার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের মতই কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেন নি। 'ষোড়শী' চার অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য (এর দ্বিতীয় দৃশ্যে কেবল একটি গান আছে), তৃতীয় অঙ্কে ও চতুর্থ অঙ্কে একটি করে দৃশ্য। রমাও চার অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে ছটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি এবং চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য আছে। 'বিজয়া' প্রথাসিদ্ধ পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটক। মোট দৃশ্যসংখ্যা অবশ্য বেশী নয়, ষোলটি। দৃশ্যপরিচয় কখনও সংক্ষেপে সেরেছেন আবার কখনও দীর্ঘতর করেছেন।

'বিজয়া'র দৃশ্যপরিচয় সংক্ষিপ্ত; ১/১ বিজয়ার বসবার ঘর, ১/২ গ্রাম্যপথ···ইত্যাদি। আবার 'রমা'র দৃশ্যপরিচয় উপন্যাসের মত বর্ণনাত্মক।

> ৺যদুনাথ মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীর পিছনের দিক। খিড়কীর দ্বার খোলা, সম্মুখে অপ্রশস্ত পথ। চারিদিকে আমকাঁঠালের বাগান। এবং অদূরে পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। সকাল বেলায় রমা ও তাহার মাসী স্নানের জন্য বাহির হইয়া আসিল। এবং সেই সময়েই বেণী ঘোষাল আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিল। রমার বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া হাতে কয়েকগাছি চুড়ি ছিল, এবং থানের পরিবর্তে সরু পাড়ের কাপড় পড়িত। বেণীর বয়সও পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক হইবে না। (১ / ১)

শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাসের নাট্যরূপ দিচ্ছিলেন তখনও বাংলার মঞ্চে পৌরাণিক নাটকের প্রবল প্রতাপ এবং সেই সূত্রেই রঙ্গালয়ে সুরের উৎসার। হয়তো জন-তাগিদেই তাঁর সামাজিক নাটকেও গান এসেছিল। লক্ষণীয়, এই গানগুলিও পৌরাণিক নাটকের গানের মতই ভক্তিরসার্দ্র। 'ষোড়শী'র ভিক্ষুকের গান 'তোর পাওয়ার সময় যখন ছিল ওরে অবোধ মন' (১/৩); গাজনের সঙ 'বড় প্যাঁচে পড়েচে এবার ভোলা দিগম্বর' (২ / ২); গ্রাম্য ব্যক্তির গান 'পূজা করে তোরে তারা / সার যদি হয় নয়নধারা' (৩ / ১); এবং 'রমা'য় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কীর্তন 'শ্রীমতী করিছে বেশ ' ইত্যাদি (৩/২) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন যে, শরৎচন্দ্রের নাটক রচনার শক্তি ছিল। শরৎচন্দ্র নিজেও তা জানতেন। তবু কেন তিনি মৌলিক নাটক লিখলেন না তারও জবাব দিয়ে গেছেন একটি চিঠিতে—'নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন

সাজবে, এমন একটি অভিনেত্রী তো নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না।' এই অভিমত অবশ্য একান্তই শরৎচন্দ্রের নিজের। তবু যদি তিনি এই বাধা কাটিয়ে নাটক লেখায় যথেষ্ট সময় দিতেন তাহলে বাংলা সাহিত্য আর-একজন কুশলী নাট্যকারকে পেত।

শরৎ-সাহিত্যে হাস্যরস

নলিনীকান্ত রায়

১

লৌকিক জীবনের আটপৌরে হাসিই শৈল্পিক উপকরণ সহযোগে সাহিত্যের হাস্যরসে পরিণত হয়। সাহিত্যের লক্ষ্য রসসৃষ্টি, সুতরাং 'রস'ই সাহিত্যের আদিকথা এবং হয়তো শেষকথাও। আদিম মানুষের জীবনে হাসির স্থান ছিল নগণ্য, তার রসবোধও ছিল গ্রাম্য। তাই মানুষের প্রাচীন সাহিত্যে 'হাসি' এবং 'রস' দুয়েরই অভাব—অর্থাৎ হাস্যরসের স্বল্পতা—স্পষ্ট চোখে পড়ে। বস্তুত, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য যেমন বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি ও রসবোধ প্রয়োজন, হাস্যরস উপভোগের জন্যও তেমনি প্রয়োজন বিশেষ মানসিকতা। মানব সভ্যতার উন্নত পর্যায়েই এই ধরনের জীবন-দৃষ্টি ও মানসিকতা গড়ে ওঠা সম্ভব। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসের স্বীকৃতি আছে, কিন্তু মহৎ হাস্যরস সৃষ্টির নজির নেই। একমাত্র সংস্কৃত নাটকেই একধরনের হাস্য-রসের দেখা মেলে আধুনিক দৃষ্টিতে এবং ভাষায় যা ভাঁড়ামি এবং অশ্লীলতারই নামান্তর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও হাস্যরসের ছদ্মবেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সেই ভাঁড়ামি এবং অশ্লীলতারই অনুবর্তন চলেছে। চলেছে প্রায় ঈশ্বরগুপ্তের কাল পর্যন্ত।

উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি হাস্যরসের রূপবদল এবং রঙবদল হল। রসাস্বাদেও এল বৈচিত্র্য। বলা বাহুল্য, এ-সময়েই হাস্যরস প্রকৃত সাহিত্যপর্যায়ে উন্নীত হল। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য এবং রসাবেদনের ভিন্নতা অনুসারে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রকৃতিভেদকে মোটামুটি তিনটি শীর্ষে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—হিউমার, স্যাটায়ার এবং উইট। জগৎ এবং জীবনের নানান অসঙ্গতি সম্পর্কে কৌতুকদৃষ্টি থেকেই হিউমারের সৃষ্টি। অবশ্য শ্রেষ্ঠ হিউমারের মূল উপাদান গভীর ও ব্যাপক মানব-সহানুভূতি, যাকে স্টিফেন লীকক বলেছেন kind contemplation of incongruities of life expressed in art। শ্রেষ্ঠ হিউমারে কারো প্রতি বিদ্বেষ বা অসূয়ার প্রকাশ থাকে না, কাউকে আঘাত করার প্রবণতাও উহ্য। শিশুর খেয়ালি-খেলায় নানান অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা দেখে বয়স্ক প্রাজ্ঞ পিতার ওষ্ঠে যে ধরনের মমতাসিক্ত সহানুভূতিমিশ্রিত হাসি

উদ্রিক্ত হয় হিউমারের হাসি সেই গোত্রের। হিউমারের আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে।

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারাও এক ধরনের হাস্যরস সৃষ্টি হয়, তা হিউমারের হাসির চেয়ে নিম্নমানের। সামাজিক কোন প্রথা বা আচার, রাষ্ট্রিক কোন নিয়ম বা নীতি, এমন কি ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধেও শাণিত বা চাপা আক্রমণই স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য। স্যাটায়ারের মধ্যে আক্রমণকারীর একধরনের নির্মমতা উদ্যত থাকে। স্যাটায়ারের হাসি সম্পর্কে মেরিডিথ বলেছেন—The laughter of satire is a blow in the back or on the face"। স্যাটায়ারের আবেদন প্রধানত মানুষের বুদ্ধির কাছে।

কথার মারপ্যাঁচে বা শব্দ ও শব্দার্থ নিয়ে খেলার মজা থেকে যে হাসি উৎপন্ন হয় তাই উইট। উইটের উদ্দেশ্য বুদ্ধির আনন্দ বিধান। উইটের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি থাকতে পারে, আবার তা হিউমার বা স্যাটায়ারের সঙ্গে মিশেও থাকতে পারে।

২

কৌতুকহাস্য সৃষ্টির উপাদান জগৎ ও জীবনে সব সময়েই বিদ্যমান থাকে, কেননা এই হাস্যরস সৃষ্টির প্রবর্তনার মূলে যে অসংগতি, অসম্পূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য, মানবজীবন যত সভ্য এবং উন্নতই হোক, কোনকালেই এগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। তবে মানুষের সভ্যতা, কৃষ্টি, রুচি ইত্যাদি ভেদে কৌতুকহাস্যেরও রূপগত এবং গুণগত তারতম্য ঘটে। উন্নত মানের ব্যঙ্গহাস্যের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে সমাজ বা জাতীয় জীবনে যখন কোন প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ভগ্নপ্রায় এবং অন্য কোন নূতন আদর্শও গড়ে ওঠেনি, সেই ট্রানজিশন-কালেই সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাব ঘটে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বা তার একটু আগে থেকে বিশ শতকের বেশ কিছুটা সময় পর্যন্ত ট্রানজিশনেরই জেরটানা চলেছে—সমাজ রাজনীতি ধর্ম প্রভৃতি কোনক্ষেত্রেই আদর্শগত স্থিতিশীলতা বা বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। উনিশ শতকের এই ট্রানজিশনকাল বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘর্ষ-সংঘাতে আন্দোলিত। একদিকে ইংরাজী-শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রভাবজাত জীবনচর্চা, ফলে নূতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, নানাবিধ সমাজ-সংস্কার, উদার সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় চেতনা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি। অন্যদিকে গোঁড়ামি, দলাদলি এবং সর্বপ্রকার প্রগতিপরিপন্থী মনোভাব—এই বিপরীতমুখী উভয়বিধ জীবনপ্রবাহের

বিচিত্র অসংগতি ও আতিশয্য রঙ্গব্যঙ্গশিল্পীদের হাস্যরস সৃষ্টির প্রচুর উপাদান জুগিয়েছে। প্রতিভার বিশিষ্টতা অনুসারে এইসব উপাদান থেকে কেউ বা রঙ্গরস, কেউ বা ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নকশাজাতীয় রচনায় সদ্য-গজিয়ে-ওঠা নববাবু ও নববিবিদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। মধুসূদন তাঁর প্রহসনে ওল্ড এবং ইয়ং—দুই বেঙ্গলকেই ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতে রঙ্গের মধু ও ব্যঙ্গের হুল দুইই আছে। গুপ্তকবির একশিষ্য দীনবন্ধু কৌতুকহাস্য বা রঙ্গরসের কারবারী, অন্য শিষ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গরসের রসিক। তাঁর আর-এক সুযোগ্য শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাস্পর্শে হাস্যরস এক নূতন ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে শুচি-শুভ্র রুচি-স্নাত হাস্যরসের তিনিই প্রবর্তক। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র হাস্যরসে একদিকে গভীর জীবনানুভূতির সংবেদনশীলতা, অন্যদিকে বিশিষ্ট দার্শনিক প্রতীতির নির্লিপ্ততা। বস্তুতঃ কমলাকান্তের দপ্তরেই হাস্যরস যথার্থ হিউমারের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। হাসিকান্নার গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমই কমলাকান্তের জীবনতীর্থ। বঙ্কিমের কিঞ্চিৎ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য হাস্যরসস্রষ্টারা হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ব্রাহ্মসমাজের ভণ্ডামি ও ভড়ং ইন্দ্রনাথ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র উভয়েরই ব্যঙ্গের টারগেট। ইন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর প্রখ্যাত ব্যঙ্গকাব্য 'ভারত-উদ্ধার'-এ তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা ও অবাস্তবতার উপর ব্যঙ্গের যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন তা মর্মান্তিক হলেও উপাদেয়। ত্রৈলোক্যনাথের হাসিতে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন, রঙ্গই প্রধান।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসসৃষ্টির তুলনা নেই। হিউমার, স্যাটায়ার এবং উইট—হাস্যরসের এই ত্রিবিধ রূপনির্মাণে তাঁর দক্ষতাও বড় কম নয়। হাস্যরসের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাঁর যাবতীয় সাহিত্যকর্মের মধ্যেই তাঁর গভীর জীবনরসিকতার হাস্যোজ্জ্বল প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বহমান। তার কারণ জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে প্রসন্ন, সার্বভৌম ও সংবেদনশীল দৃষ্টিই তাঁর রসসৃষ্টির উৎস।

৩

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বিশ শতকে। উনিশ শতকের বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাত-সংঘর্ষের উগ্রতা তখন প্রায় স্তিমিত ; ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়প্রচেষ্টা সক্রিয়। কিন্তু রাজনৈতিক

আন্দোলনের তখন এক নূতন জোয়ার। চরমপন্থী ও নরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা সমাজ-জীবনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, এই শতকের প্রায় তৃতীয় দশক থেকে সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়েও বিভিন্ন সাহিত্যিক, সমালোচক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লেখনীযুদ্ধ শুরু হয়েছে। অবশ্য উল্লেখ্য যে, এ ধরনের তর্কযুদ্ধ বঙ্কিমের আমলেও কিছু কম হয়নি। সুতরাং এ সময়কার সামাজিক প্রতিবেশে উনিশ শতকীয় ট্রানজিশনের আলোড়ন-বিক্ষুব্ধ চেহারা না থাকলেও রঙ্গব্যঙ্গের উপাদানের ঘাটতি দেখা যায় নি। আর সমকালীন বিশুদ্ধ হাস্যরসস্রষ্টারা এইসব উপাদানের সদ্ব্যবহারও করেছেন।

সাহিত্যিক প্রতিভা এবং জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে শরৎচন্দ্র ভিন্ন গোত্রের—নির্ভেজাল হাস্যরসস্রষ্টার প্রকৃতি ও প্রবণতা তাঁর মধ্যে নেই। শরৎচন্দ্র দরদী শিল্পী। মানবজীবনের ব্যথাবেদনা—তার অশ্রুসজল দিকটিই বিশেষভাবে তাঁর সাহিত্যে শিল্পরূপ লাভ করেছে। গভীর এবং ব্যাপক মানবপ্রীতিই তাঁর সৃজনী প্রতিভার নিয়ন্ত্রীশক্তি। এখানে আর-একটি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। শিল্পীর নির্লিপ্ততার চেয়ে শিল্পীর আসক্তিই তাঁর জীবনদর্শন এবং জীবনচিত্রনের ব্যাপারে ক্রিয়াশীল; autobiographical element বা আত্মজীবনকথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের উপাদান। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি শিল্পীসত্তাকে আচ্ছন্ন করে পরিব্যাপ্ত হয় তবে তা মহৎ সৃষ্টির অনুকূল হয় না। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি থেকেই জানা যায় যে, তিনি যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, কল্পনা করে কিছু লেখেন নি। এটাই বাস্তববাদী শিল্পীর বড় গুণ কিনা, তা অবশ্যই বিচারের অপেক্ষা রাখে। সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যবেক্ষণ-শক্তির সঙ্গে উপযুক্ত কল্পনা-শক্তির মিশ্রণ না হলে সৃষ্টিকার্য সুসম্পন্ন হয় না; গভীরতা ও ব্যাপ্তি পায় না। শরৎচন্দ্রের ব্যাপক এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি মহৎশিল্পীসুলভ কল্পনা-শক্তির সুষ্ঠু সংমিশ্রণ ঘটত তা হলে হয়তো আমরা তাঁর কাছ থেকে আরও মহৎ সৃষ্টির ফসল পেতাম। অন্তত হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি আরো সার্থক হতে পারতেন।

শরৎপ্রতিভার আর-একটি বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত ভাবালুতা। শরৎচন্দ্র শিল্পে সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুবার বলেছেন; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর নিজের শিল্পকর্মেই সংযমের বাঁধ বহুবার ভেঙেছে।

শরৎসাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনায় উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কেননা হিউমার সৃষ্টির মূল উপাদান—গভীর মানব-সহানুভূতি—শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টিতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিউমার-শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রের স্থান যে উঁচুতে নয়, একথা অপ্রিয় হলেও সত্য। ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের একজন অনুরাগী পাঠকও ছিলেন। ডিকেন্সের সাহিত্যেও, শরৎসাহিত্যের মতো, করুণরসের সঙ্গে হাস্যরসের সংমিশ্রণ ও আত্মকথার প্রাধান্য ঘটেছে। ডিকেন্সের হিউমার অনেক স্থলে করুণরসের আশ্রয়ে সংযম হারিয়েছে। শরৎচন্দ্রে এ ঘটনা আরও বেশি। করুণরসের সঙ্গে হিউমারের আত্মীয়তা থাকলেও, হাস্য ও করুণ উভয় রসের ভিয়েনে মিশ্র-আস্বাদযুক্ত শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা অল্প লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। ডিকেন্সের মধ্যে এ ক্ষমতার কিছুটা অভাব আছে, শরৎচন্দ্রে এ অভাব আত্যন্তিক। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, শরৎচন্দ্র মানুষের ব্যথা-বেদনার কাব্যকার, করুণ রসই তাঁর সাহিত্যের অঙ্গীরস, হাস্যরসের স্থান সেখানে নিতান্তই গৌণ। সমাজের অবিচার-অনাচার-ভণ্ডামিকে শরৎচন্দ্র নির্মমভাবে আঘাত করেছেন সত্য, কিন্তু সে আঘাতে ব্যঙ্গের হুল নেই, আছে মর্মপীড়াজনিত ক্ষোভ। অথচ আশ্চর্য এই যে, শরৎচন্দ্র ব্যবহারিক জীবনে একজন মজলিশী ও পরিহাসরসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর বৈঠকী গল্পের হাস্যপরিহাস তো প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্রেও রঙ্গব্যঙ্গ কিছু কম নেই। দু-একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই তাঁর পরিহাসপ্রিয়তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

দিলীপকুমার রায়ের (ডাকনাম মণ্টু) সন্ন্যাসগ্রহণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র তাঁকে লেখেন—"মণ্টু, তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে? ব্যস, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চলে আসবে। আবার না হয় দিনকতক পরে যেয়ো, ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও-অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানীদের পিঠের চামড়া ছাড়া আর কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। এ বাঙালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চলে এসো। * * * শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মণ্টু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আজকালকার দিনে কিছু মজা নেই। [সামতাবেড়, ১৩.৬.২৯]

প্রখ্যাত হাস্যরসস্রষ্টা শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি (বাজে শিবপুর, হাওড়া, ১২.১০.২০)—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—কেদারবাবু, আপনার অবস্থা শুনিলাম, এবার এ অধীনের অবস্থাটা শুনুন।

কিছুদিন হইতে পিঠের উপরটায় শিরদাঁড়া ধরিয়া একটা অল্পস্বল্প ব্যথা উপভোগ করিতেছিলাম, বিশেষ কাহারো তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। না আমার না গৃহিণীর। * * * তাহার উপরে আবার একদিন মোটর শ্লিপ করায় কোমরেও দারুণ হ্যাঁচকা লাগিয়া আছে। তবে আফিম ভরসা। ইহাতে যদি অচলাভক্তি রাখিতে পারি, তবে দুর্দিন কাটিবেই কাটিবে। ভগবান শ্রীদেবাদিদেব আমাদের প্রতি বর দিয়াছিলেন যে রক্তবাহ্য না করিয়া আর আমরা কৈলাস গমন করিব না। সেটার সূচনা না হওয়া পর্যন্ত আমিই বা কি আর আপনিই বা কি নির্ভয়ে থাকিতে পারেন—কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

ভাগলপুর থেকে ১৫ই কার্তিক ১৩৩২ ভারতবর্ষ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি—

ভায়া—অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, ভরসা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল।

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে এসে আটকে গেছি। আমার ভোলা চাকর কালাজ্বরে শয্যাগত। বহু ইনজেকসান দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আনি। এখানে পূজাবাড়ীর নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পিলে এমনি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। আর আমার?

১৫।২০ দিন পূর্বে কানে কাঠি দিয়ে আর শুনতে পাইনে। এখানে এসে এমন সুন্দর হয়েছে যে পিছনে কামান দাগলেও চমকাইনে। আমার সম্পূর্ণ আশা হয় যে শ্রীযুক্ত জলধর দাদাকে এবার আপনি বিদায় দিয়ে আমাকে ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুক্ত করলে আপনাদের ট্রাডিসনের কোন প্রকার অমর্যাদা হবে না। এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা যেন বিস্মৃত হবেন না। এই ত সম্বাদ। আপনার শ্রীঅর্শ কেমন আছে জানতে পারলে সুখী হব। আশা করি সেরে গেছে এরূপ দুঃসম্বাদ দেবেন না।

['ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন কানে খুবই কম শুনতেন। এ ছাড়া এক সময় বীরেন্দ্রনাথ বসু জলধরবাবুর সহকারী ছিলেন। তিনিও কানে খাটো ছিলেন। তাই কালা হওয়াটাকেই 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক হওয়ার অন্যতম যোগ্যতা বলে শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করেছেন।—শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড)—গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ১৭৬]

বৈঠকী গল্প বা চিঠিপত্রের হাস্যপরিহাস আর সাহিত্যের হাস্যরসে একটি

মৌল প্রভেদ আছে। প্রথমটার সুর ব্যক্তির অনুরাগ-বিরাগের তারে একান্ত-ভাবে বাঁধা, দ্বিতীয়টির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। প্রথমটায় ব্যক্তির, দ্বিতীয়টায় শিল্পীর উপস্থিতি প্রকট। বৈঠকী গল্প বা চিঠিপত্রের রসের ভোক্তা অত্যন্ত অন্তরঙ্গজন, কিন্তু সাহিত্যের রসাবেদন সার্বজনিক, এমন কি সার্বকালিকও। চিঠিপত্রকে আজকাল অবশ্য সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, পত্র যদি পত্র হিসেবেই লিখিত হয়ে থাকে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা যদি সেখানে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট না থাকে, তা হলে চিঠিপত্রের একান্ত ব্যক্তিগত সুর, লেখকের নিতান্ত ঘরোয়া মেজাজ এবং উদ্দিষ্ট পাঠকের অশরীরী উপস্থিতি সাহিত্যিক রস ও মানের হানি ঘটায়। তাই ডাকসাইটে পত্রলেখক যেমন কেবল উৎকৃষ্ট পত্ররচনাশক্তির জোরেই সাহিত্যিক হতে পারেন না, তেমনি চিঠিপত্রের পরিহাসরসিক মানুষটিও কেবল ঐ পুঁজির জোরেই হাস্যরসস্রষ্টা হতে পারেন না। বৈঠকী গল্পেও চিঠিপত্রের পরিহাসরসিক শরৎচন্দ্রের যে মর্যাদা ও সমাদর —বলতে বাধা নেই, সাহিত্যে হাস্যরসস্রষ্টা হিসেবে শরৎচন্দ্রের তা নেই।

শরৎসাহিত্যে হাস্যরসের বৈচিত্র্য মাঝারি মানের হিউমার এবং স্যাটায়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উইট নেই বললেই হয়। কেননা উইট সৃষ্টির জন্য যে বিশিষ্ট পরিশীলিত মনন, যে মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত বাচন-ভঙ্গি এবং শব্দচয়ন ও প্রয়োগে যে বিশেষ শৈল্পিক কলা-কৌশল প্রয়োজন, শরৎচন্দ্রের তা ছিল না। তা ছাড়া উইটে থাকে স্রষ্টার নাগরিক মানসিকতার অভিব্যক্তি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মানসিকতা বিশেষভাবেই গ্রামীণ। তাঁর সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস ও আশ্রয় পল্লীসমাজ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস চরিত্রপ্রধান। তাই হিউমার বা স্যাটায়ার প্রধানত চরিত্রকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য ঘটনা-সংস্থান বা পরিস্থিতি-সৃষ্টি, বর্ণনা এবং সংলাপের দ্বারাও যে কিছু হাস্যরস পরিবেশিত হয়নি তা নয়। কিন্তু শরৎসাহিত্যে হাস্যরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে এবংবিধ মাধ্যম তেমন উল্লেখ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও স্মর্তব্য। শরৎসাহিত্যে অধিকাংশ পুরুষ-চরিত্রই আত্মভোলা, সংসারানভিজ্ঞ, সরল এবং নারীর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত। পক্ষান্তরে নারী-চরিত্রগুলি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, ব্যক্তিত্বময়ী, কর্তৃত্ব-সম্পন্না এবং কর্মচঞ্চলা। আত্মভোলা, সংসারানভিজ্ঞ পুরুষ-চরিত্রগুলিই বিশুদ্ধ হাস্যরসসৃষ্টির বিশেষভাবে সহায়ক, কেননা ঐ চরিত্রগুলির মধ্যে অসংগতি, অসম্পূর্ণতা এবং সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানের অভাব সাংসারিক মানুষের কাছে কৌতুকের বিষয় এবং তাদের সারল্য, যা সাধারণ বৈষয়িক মানুষের বিচারে বোকামিরই নামান্তর, সহজেই সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

আত্মভোলা চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রিয়নাথ ডাক্তার (বামুনের মেয়ে), নরেন ডাক্তার (দত্তা), গোকুল (বৈকুণ্ঠের উইল), গিরিশ (নিষ্কৃতি), সুরেন (বড়দিদি), কৈলাশ খুড়ো (চন্দ্রনাথ) প্রভৃতি।

প্রিয়নাথ বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। ডাক্তারিটা ঠিক তার পেশা নয়, নেশা বা বাতিক। প্রকৃতপক্ষে বাতিকের বাড়াবাড়ি। রামময়ের পা খোঁড়া দেখে তিনি তাকে যেভাবে কমলাকান্তীয় ভঙ্গিতে জেরা করতে শুরু করলেন তা কেবলমাত্র তাঁর মতো বাতিকগ্রস্ত লোকের পক্ষেই সম্ভব। "কি রকমের বেদনা? ঘর্ষণবৎ না মর্ষণবৎ, সূচিবিদ্ধবৎ না বৃশ্চিকদংশনবৎ। কনকন করছে না ঝনঝন করছে?" এ রকম অদ্ভুত ডাক্তারি জেরার চোটে রোগীর অবস্থা কাহিল—সে পালাতে পারলে বাঁচে। তারপর পায়ের বেদনা সারাবার ওষুধ না দিয়ে ওষুধ দিলেন মৃত্যুভয় থেকে উদ্ধার পাবার, কেননা রোগীর মনে মৃত্যুভয় ঢুকেছে। এই হল তাঁর 'রেমিডি সিলেক্ট' করা। এ ধরনের ডাক্তারিতে রোগী হয় না, রুজি-রোজগারও না। অথচ প্রিয়নাথের অহংজ্ঞান ষোল আনা। মেয়েকে বলেন—"আমার কি নাবার খাবার ফুরসৎ আছে তোরা ভাবিস? যে রুগীটির কাছে না যাব তারই রাগ, তারই অভিমান। প্রিয় মুখুজ্জের হাতের একফোঁটা ওষুধ না পেলে যেন আর কেউ বাঁচবে না! প্রিয় মুখুজ্জে ত একটাই দুটো তো নয়।" এই অহং-এর সঙ্গে মিশে আছে হোমিওপ্যাথির প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। তাই পরাণ ডাক্তার যখন তাঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে দেখিয়ে দেন যে ও ওষুধ ছাই—ওতে কিছুই কাজ হয় না, তখন প্রিয়নাথও মহাত্মা হ্যানিমেনের মান রক্ষার্থে ফলাফলের কথা না ভেবেই বিনা দ্বিধায় পরাণের দেওয়া ক্যাস্টরওয়েল খেয়ে ফেলেন। এরকম মানুষকে ঘরেবাইরে অশেষ লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়। প্রিয়নাথের আত্মভোলা ভাব এবং নির্দোষ অহংজ্ঞান আমাদের মনে কৌতুকবোধ জাগ্রত করে, আর ঘরেবাইরে তাঁকে যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় তার জন্য জাগে আমাদের বেদনামিশ্রিত সহানুভূতি। বস্তুত সমগ্র শরৎসাহিত্যে বোধ হয় এই একটিমাত্র চরিত্র যাকে আশ্রয় করে শরৎচন্দ্র সার্থক হিউমার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। হোমিওপ্যাথি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই হয়তো প্রিয়নাথ চরিত্রাঙ্কনের কিছুটা উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু আমাদের ধারণা প্রিয়নাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার খাদ মেশানো গিনি সোনা। তাই ব্যক্তি শরৎচন্দ্র এবং প্রিয়নাথের মধ্যে যে শৈল্পিক দূরত্ব থাকা প্রয়োজন এখানে তা বজায় আছে বলেই প্রিয়নাথ চরিত্রটি শুধু অনবদ্যভাবে ফুটেই ওঠেনি তাকে অবলম্বন করে শরৎচন্দ্রের কল্পনার পাত্র থেকে কিছুটা বিশুদ্ধ হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে।

'দত্তা'র নরেনও ডাক্তার। সাংসারিক অনেক ব্যাপারেই সে অনভিজ্ঞ এবং বহু বিষয়েই অন্যমনস্ক। তাঁর অনভিজ্ঞতা, বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের অভাব এবং অন্যমনস্কতাই কৌতুকরসের উৎস। কিন্তু প্রিয়নাথের মতো এ চরিত্রটি আমাদের ওষ্ঠে অতখানি সহানুভূতিমিশ্রিত কৌতুকহাস্য উদ্রিক্ত করতে পারে না। কারণ প্রিয়নাথের ক্যাস্টর ওয়েল খাওয়ার মতো অদ্ভুত বোকামি এবং নির্দোষ অহংজ্ঞান নরেনের মধ্যে নেই। আর প্রিয়নাথ চরিত্রের পরিণতিতে যে ট্র্যাজিক সুর অনুরণিত, বিজয়া-নরেনের মধুর মিলনে পরিণতি ঘটায় পাঠকমনে তার জন্য বেদনামিশ্রিত সহানুভূতির পরিবর্তে স্বস্তিবোধ তথা তৃপ্তিবোধই সক্রিয় থাকে।

গিরিশের মতো আত্মভোলা লোক বিরল। তিনি আবার একজন পাকা উকিল। ওকালতিতে তাঁর বাৎসরিক আয় চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মতো। এ রকম একজন পাকা উকিলের কাঁচা সাংসারিক জ্ঞান ও অবাস্তব বৈষয়িক বুদ্ধি কৌতুকবোধ উদ্রিক্ত করে। খুড়তুতো ভাই রমেশ পাটে দালালি করতে গিয়ে তাঁর চার-পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট করেছে। যাই হোক, তাহলেও রমেশকে তিনি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারবেন না—তাকে কাজ করেই খেতে হবে। এবং তার এই কাজ করে খাওয়ার জন্য তিনি যে অদ্ভুত বিলি-ব্যবস্থা করলেন সে রকম অপূর্ব ব্যবস্থার কথা বিন্দুমাত্র সাংসারিক-জ্ঞানসম্পন্ন লোকও চিন্তা করতে পারে না। একবারে চার হাজার গেছে —গেছেই। "কুচ পরওয়া নেই—আর চার হাজার দাও। না হয় আরো চার হাজার দাও। তা বলে আমি খেটে মরব, আর তুমি বসে বসে খাবে। ...আমি পাটের দালালি-টালালি বুঝিনে, তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে শুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জমা রাখবে। এটা নষ্ট হলে তবে ও টাকায় হাত দেবে—তার আগে নয়। বুঝলে?" দাদার এই বৈষয়িক জ্ঞানের বহর দেখে রমেশ নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি ও হরিশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু গিরিশের এই সারল্য ও ঔদার্য থেকে যে প্রবল হাস্যের ঝরনা নেমেছে পাঠকচিত্ত তাতে অবগাহন করে তৃপ্তি পায়। এই গিরিশই আবার শেষ পর্যন্ত রমেশের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এবং তাকে জব্দ করার জন্য তার স্ত্রীর নামে দেশের সব বিষয়সম্পত্তি রেজেস্ট্রি করে দানপত্র করে দিলেন। জব্দ করার কী অপূর্ব পন্থা! গিরিশের মতো সংসারানভিজ্ঞ, আত্মভোলা, অন্যমনস্ক অথচ সহজ সরল উদার এবং হৃদয়বান লোক সাংসারিক লোকের কাছে যেমন কৌতুকের তেমনি সহানুভূতির পাত্রও বটে।

পাকা উকিলের অজস্র হাস্যকর কাঁচা কাজের অপর নাম গিরিশ—দেবাদিদেব গিরিশের মতোই ভাবভোলা।

'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুল ঠিক আত্মভোলা চরিত্র নয়, তবে অপকট এবং হৃদয়বান। বৈমাত্রেয় ভাই 'অনার গ্রাজুয়েট' বিনোদের প্রতি তার ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য সবরকম মাত্রা ছাড়িয়েছে। আর এটাই হাস্যরসের কেন্দ্রবিন্দু। বিমাতার প্রতিও তার ভালোবাসার অন্ত নেই। বাবা মারা যাবার সময় গোকুলের বৈমাত্রেয় ছোটভাই বিনোদকে বঞ্চিত করে তাকেই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, এটা তার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে —"বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে বল্লেন, 'বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা'······এই হল বাবার আসল উইল।" বিমাতাকে এইভাবে দাবি করার মধ্যে সাধারণ সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানের যে অভাব, অপর দিকে যে হৃদয়বত্তার পরিচয়—অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের মাত্রাছাড়ানো আতিশয্য—এসবই এ চরিত্রটিকে নির্মল হাস্যরসাত্মক চরিত্রে পরিণত করেছে।

'চন্দ্রনাথে'র কৈলাস খুড়োর সারল্য ও অতিরিক্ত দাবাপ্রীতি, 'বড়দিদি'র সুরেনের অস্বাভাবিক অন্যমনস্কতা ও আত্মভোলাভাব, 'নিষ্কৃতি'র সিদ্ধেশ্বরীর ছোট জাকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই জায়ের সন্তান দুটি খেতে পাচ্ছে কিনা ভেবে ভেবে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন, এবং পরিশেষে মামলা করে সেই শিশুসন্তান দুটিকে নিজের কাছে নিয়ে আসার অদ্ভুত প্রস্তাব—এ সবই অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের মুসলমান কবি গহরও একটি ভোলানাথ গোছের চরিত্র। মুসলমান হয়েও সে রামায়ণের সীতাহরণের ঘটনা অবলম্বনে একটি করুণরসাত্মক কাব্য লিখেছে। গ্রামের নয়ন চক্রবর্তী এই কাব্য শুনে গহরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বলে—"বাবা, তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস—তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।" নয়নের এই প্রশংসা ও কাব্যপ্রীতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গহরের বাবা নয়নের যে বাস্তুভিটা পুকুর ইত্যাদি দেনার দায়ে নিলেম করিয়ে নিয়েছিলেন গহর তার কাব্যের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে নয়নকে সে সবই ফেরত দিয়েছে। তার আমবাগানের আম নয়নের ছেলেমেয়েরাই খায়। গহরের বন্ধু শ্রীকান্তের মতে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতার' কেদার কর্তৃক বৈকুণ্ঠকে প্রতারণার মতোই এটাও একটা প্রতারণা। বৈকুণ্ঠের মতো গহরও ভালোমানুষ এবং বোকা। তাই শ্রীকান্তের স্বগতোক্তির মধ্যে যেন শরৎচন্দ্রেরই বক্রোক্তি শোনা যায়—'বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি

যৎকিঞ্চিৎ লইতে পারে হানি কি? তা ছাড়া গহর কবি। কবি মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে।' এ বক্রোক্তির মধ্যে আঘাতের মনোভাব উদ্যত নেই, বিদ্বেষ বা অসূয়াও নেই, তাই এটাকে নিছক রঙ্গরসিকতা বলেই গণ্য করা যেতে পারে।

আত্মভোলা, অন্যমনস্ক, সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্ব-সম্পদে আশ্চর্য রকমের বিত্তবান চরিত্রগুলি নির্মল হাস্যরস পরিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হয়নি বলেই আমাদের ধারণা। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীরা অনেকটা অসহায়, তাদের মানবিক অধিকার সংকুচিত, কিন্তু শরৎসাহিত্যে তাদের প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। মনে হয় নারীদরদী শরৎচন্দ্র বিশেষ উদ্দেশ্যেই এটা করেছেন। নারীর প্রতি অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের দ্বারা সমাজ যখন তার 'সত্যিকার সীমাটি' লংঘন করেছে শরৎচন্দ্র তখন সমাজের 'মোহভঙ্গ' করে তার চৈতন্যোদয় করতে চেয়েছেন। তথাকথিত সামাজিক অভিধা সতীত্ব-অসতীত্বের বিশেষ মাপকাটিতে নারীর সত্যকার বিচার বা তার মহিমা বোঝা সম্ভব নয়। নারীর সত্যকার পরিচয় তার নারীত্ব যা তথাকথিত সতীত্বের চেয়ে অনেক বড়ো। আত্মভোলা, অন্যমনস্ক উদাসীন পুরুষচরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে নারীর সেই নারীত্ব উদ্‌বোধনের এবং বিকাশের সহায়ক হয়েছে। 'দত্তা'র নরেন, 'বড়দিদি'র সুরেন, এবং অংশত ও গৌণত 'শ্রীকান্ত'র গহরের সেই ভূমিকা।

'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথ ডাক্তার, 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ, 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর গোকুল প্রভৃতি চরিত্রগুলি অবশ্য স্রষ্টার অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। বৈষয়িক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সংসারিতে পাকা মানুষের কাছে প্রিয়নাথ, গিরিশ, গোকুল প্রভৃতি লোক বোকা এবং বাস্তবকাণ্ডজ্ঞানরহিত, তাই উপহাসের পাত্র। কিন্তু এইসব আপনভোলা উদাসীন লোকগুলির মানবিকবোধ, সততা, সৎসাহস ও চারিত্রিক ঔদার্যের তুলনা নেই। মনুষ্যত্বের নিরিখে তারা সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন তথাকথিত ভালোমানুষ যারা সমাজের পাণ্ডা তাদের চেয়ে অনেকাংশই শ্রেষ্ঠ। অথচ এইসব উদাসীন প্রকৃতির মানুষগুলি বাস্তবজগতে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে ঐসব উদাসীন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেখিয়েছেন বৈষয়িক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষগুলি এদের তুলনায় কতো ছোটো, কত নীচ এবং জয়-পরাজয়ের আসল বিচারে পরিণামে এদের কাছেই পরাজিত। পতিতা ও সামাজিক নীতি-নিয়মে ঘৃণ্য নারী এবং বাস্তববোধহীন ও সাংসারিক বুদ্ধির মাপকাঠিতে হেয় পুরুষ—শরৎসাহিত্য এদেরই জয়ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ। নারী ও পুরুষ

যারা তথাকথিত সামাজিক বিচারে হেয় অথচ মনুষ্যত্বের বিচারে শ্রদ্ধেয়—এদের সম্বন্ধে সমাজের দীর্ঘকাল-লালিত ভ্রান্ত সংস্কারের মূলেই শরৎচন্দ্র আঘাত হানতে চেয়েছেন। ভোলানাথ জাতীয় পুরুষচরিত্র সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য তাই হাস্যরস পরিবেশন নয়। তাই এ প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, এ-জাতীয় চরিত্রগুলি তাদের অস্বাভাবিক আচার-আচরণের দ্বারা স্বভাবতই কিছুটা হাসির খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত হাস্যরসাত্মক চরিত্রের বিশিষ্ট প্রকৃতি এদের মধ্যে নেই বললেই হয়। এরা শেক্সপীয়রের 'ফলস্টাফ', দীনবন্ধুর 'নিমে দত্ত', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠে'র ঠিক আপনজন নয়।

চরিত্র, পরিস্থিতিসৃষ্টি বা ঘটনাসংস্থান, বর্ণনা, সংলাপ, লেখকের নিজস্ব মন্তব্য—সবকিছুই হাস্যরস পরিবেশনের মাধ্যম হতে পারে। হাস্যরসস্রষ্টা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি, প্রবণতা এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এগুলির মধ্যে যে কোন একটি বা একই সঙ্গে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন। শরৎচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় চরিত্র এবং উদ্ভট পরিস্থিতি, শরৎচন্দ্রের সমকালীন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্র এবং সংলাপ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধানত অদ্ভুত ঘটনা-সংস্থান বা পরিস্থিতি সৃষ্টি, এবং পরশুরাম চরিত্র, ঘটনা-সংস্থান এবং সংলাপের দ্বারা হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের কৌতুকহাস্য পরিবেশনের প্রধান মাধ্যম চরিত্র, যদিও গল্প এবং উপন্যাসের কোন কোন স্থানে পরিস্থিতি সৃষ্টি বা ঘটনা-সংস্থানের দ্বারাও হাস্যরস পরিবেশনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হাস্য-রসাত্মক সংলাপ শরৎসাহিত্যে অল্পই চোখে পড়ে।

ঘটনা-সংস্থান বা ঘটনা-বর্ণনার দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রধানত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে দত্তদের বাড়ি কালীপূজা উপলক্ষে শ্রীকান্তের মেঘনাদ বধ থিয়েটার দর্শন অনাবিল হাস্যরসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মেঘনাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ অদ্ভুত ব্যক্তিটির অত্যদ্ভুত আকৃতি এবং অত্যাশ্চর্য অভিনয়দক্ষতার বর্ণনা শ্রীকান্তের মুখেই শোনা যাক। "মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড। তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা সাড়ে চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই।" লক্ষ্মণ স্টেজে অল্পস্বল্প বীরত্ব প্রদর্শন করছেন। "এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া—ফুটলাইটের গোটা

পাঁচছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেটবাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল……কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ। ……বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া পেণ্ট্‌লানের মুট চাপিয়া ডান হাতে শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধন্য বীর! ধন্য! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।”

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে মেজদার অপূর্ব অধ্যয়ননিষ্ঠা ও পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তার ঘোরতর অসামঞ্জস্য এবং এহেন মেজদার তত্ত্বাবধানে শ্রীকান্ত, যতীন প্রভৃতির পড়াশুনা, ভাইরা যাতে অযথা সময় নষ্ট না করতে পারে তার জন্য 'থুতুফেলা', 'নাকঝাড়া', 'তেষ্টা পাওয়া' প্রভৃতি টিকিট প্রবর্তনের দ্বারা মেজদার অসাধারণ সময়নিষ্ঠার পরিচয়জ্ঞাপক হাস্যাত্মক বিবরণী পাঠ করে পাঠক নিঃসন্দেহে প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে। মেজদা এবং ভাইদের এই অদ্ভুত সারস্বত সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগাররূপী ছিনাথ বহুরূপী। তার অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মেজদার আঁ আঁ শব্দ করে প্রদীপ উল্‌টিয়ে চিত হয়ে পড়া, পিসেমশাই আর তাঁর ছেলেদের মধ্যে চীৎকারের প্রতিযোগিতা এবং এই ডামাডোলের মধ্যে পূজনীয় ভট্টাচার্য মশায়কে চোর মনে করে হিন্দুস্থানী দরওয়ানদের তাঁকে বেদম প্রহার এবং পরিশেষে ইন্দ্রকর্তৃক ব্যাঘ্র-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর ভট্টাচার্য মশায়ের মুখের অনবদ্য হিন্দুস্থানী বুলি—'এই বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া'—এইসব প্রবল কৌতুকোদ্দীপক বর্ণনা—নিতান্ত 'রাম গরুড়ের ছানা'র মধ্যেও দমকা হাসির বেগ সঞ্চারিত করতে সক্ষম বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনগামী জাহাজে ওঠবার জন্য অপেক্ষমান কাবুল থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সকল প্রদেশের যাত্রীদের হাস্যাত্মক বর্ণনা, 'পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি'র অপূর্ব চাঞ্চল্যকর বিবরণ, যাত্রীদের নিজ নিজ 'national' সংগীতের ঐকতানে রোমাঞ্চকর মহাকোলাহল, এমন কি জাহাজের খোলরূপী 'বাণীর পীঠস্থানে' কাবুলিওয়ালার সঙ্গীতচর্চার মতো অভূতপূর্ব ব্যাপার এবং সেই সঙ্গে শ্রীকান্তর মন্তব্য—'এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে, এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা সেইখানে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম—' পড়তে পড়তে পাঠকের নিশ্চয়ই 'উঠবে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে'।

এই পর্বেরই আরেকটি উল্লেখ্য হাস্যাত্মক ঘটনা জাত বোষ্টমের মেয়ে টগরের তার বিশ বছরের সঙ্গী নন্দ মিস্ত্রীর সঙ্গে অদ্ভুত কলহ। নন্দ মিস্ত্রী টগরকে নিজের পরিবার বলে শ্রীকান্তের কাছে পরিচয় দিতে না দিতেই বড় দুটো ভাঁটার মতো চোখ ও মোটা জোড়া ভুরুর অধিকারিণী বিগতা যৌবনা স্থূলাঙ্গী টগরের ক্রুদ্ধ গর্জন : "পরিবার! আমার সাতপাকের সোয়ামী বলছেন পরিবার। খবরদার বলছি মিস্তিরী, যার তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না বলে দিচ্ছি। ···হলোই বা বিশ বছর। পোড়া কপাল। জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবর্তের পরিবার। কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করছি বটে, কিন্তু এক দিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি!···টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাত জন্ম খোয়াবে না—তা জানো?" এখানে হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে মূলত টগরের জাত্যাভিমানকে কেন্দ্র করে—যে টগর নন্দ মিস্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে ঘর করছে এবং তাকে সর্বস্ব দিয়েছে কিন্তু জাতজন্ম খোয়াবার ভয়ে কেবল হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি! টগরের জাতিগত মিথ্যা অভিমানজনিত যে অহং, এখানে সেই অহং একদিকে যেমন হাস্যরসের উৎস আর একদিকে তেমনি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলও হয়েছে। মানুষের মধ্যে অহংবোধ থাকে এবং থাকাও স্বাভাবিক—এটা কিছু দোষের নয়। কিন্তু সেই অহং কখন রঙ্গ আবার কখন বা ব্যঙ্গের লক্ষ্য হবে তা নির্ভর করছে সেই অহংবোধকে লেখক কিভাবে প্রকাশ করেছেন তার উপর অর্থাৎ লেখকের উদ্দেশ্যের উপর। শ্রীকান্তের এই পর্বেই আরো গোটা দুই ঘটনা আছে যেখানে চারিত্রিক অহংবোধ কেবল কৌতুকহাস্যই সৃষ্টি করেছে, ব্যঙ্গের টারগেট হয়নি। রেঙ্গুনের বিখ্যাত হরিপদ মিস্ত্রীর কাছে শ্রীকান্ত রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রীর ঠিকানা জানতে চাইলে সে "সসম্ভ্রমসূচক এক প্রকার মুখভঙ্গী" করে বলল, "ও মিস্তিরী! অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়। মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছে, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখতে পাইনে, তখন বড় সাহেবের কাছে কতোখানি উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশ-খানি। আর কাম্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম? কেটে যে জোড়া দিতে পারি।" এখানে নন্দ মিস্ত্রীর প্রতি হরিপদর একটু অবজ্ঞামিশ্রিত কটাক্ষ থাকলেও হরিপদর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, মিস্ত্রী হিসেবে নিজের কৃতিত্ব জাহির করা।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে মধুডোমের মেয়ের সঙ্গে ভগবতী ডোমের ছেলের বিয়ের ঘটনা বর্ণনায় রাখাল, শিবু এবং রতনের পারস্পরিক অহংবোধ থেকেই

হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। রাখাল ও শিবু দুজনেই জাতিতে ডোম, কিন্তু ডোমদের পুরোহিতের কাজ তারাই করে থাকে। রাখাল বরকে "মধু ডোমার কন্যায় নমঃ" এবং কনেকে "ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ" এই মন্ত্র পড়াচ্ছিল। শিবু গর্জন করে উঠল, ও মন্তরই নয়, বিয়েই হলো না। অবশেষে অনেক কথাকাটি ও তর্জনগর্জনের পর শিবুপণ্ডিতের মন্ত্রই রাখাল বরকনেকে আবৃত্তি করাতে বাধ্য হল। শিবুর মন্ত্র—'মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ যতদিন জীবনং ততদিন ভাত কাপড় প্রদানং স্বাহা।' রাখালের মন্ত্রের চেয়ে এ মন্ত্রের ভাব ভাষা আরও পরিষ্কার, বিয়ের মূল উদ্দেশ্য যে সারাজীবন বউকে ভাত কাপড় প্রদান—এটাও বেশ স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়েছে। তাই উপস্থিত সকলেই স্বীকার করলো যে আসল মন্ত্র কেবল শিবুই জানে, রাখাল এতকাল তাদের ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে রতন নবশাকের উক্তিটিও উদ্ধারযোগ্য। রাখাল ও শিবুর ঝগড়া ও তর্কাতর্কি দেখে সে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করেছিল—ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত। এ কি আমাদের বামুন কায়েত নবশাক পেয়েছিস যে বিয়ে দিতে আসবে বামুন ঠাকুর?

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টগর বোষ্টমীর উক্তির মতো রতনের উক্তিতেও মিথ্যা জাত্যভিমানের অহংবোধ উদ্যত। কিন্তু টগর বোষ্টমীর উক্তির মধ্যে লেখকের যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন, এতে তা নেই। কেননা সমাজস্বীকৃত জাতির আভিজাত্যগৌরবে নবশাক রতন শিবু ডোম ও রাখাল ডোমের অনেক উচ্চে, এবং তাদের মধ্যে সামাজিক দূরত্বও বিদ্যমান। কিন্তু নন্দ কৈবর্ত ও টগর বোষ্টমীর মধ্যে জাতিগত পার্থক্য থাকলেও তথাকথিত সামাজিক দূরত্ব নেই; কেননা তারা বিশ বছর ধরে একাদিক্রমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই বসবাস করে আসছে। নন্দের স্বামিত্ব একমাত্র টগরের হেঁসেলে প্রবেশাধিকার ছাড়া আর সর্বক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত। টগরের উক্তির মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি-বর্জিত, কেবলমাত্র সংস্কার-লালিত, এই অসংগতিই লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে।

সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিপত্রে, রসালাপে এবং সাহিত্যের অনেক স্থানেই রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন। শরৎচন্দ্র নিজে কয়েকবার সন্ন্যাসী হয়ে (দিলীপ রায়কে লেখা পত্রে তার উল্লেখ আছে) বহু স্থানে ঘুরেওছেন; সাধু-সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনের ভণ্ডামি ও ভড়ং সম্পর্কে তাঁর বহু অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়েছিল। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের সাধুবাবা এবং 'চরিত্রহীন-এর থাকোবাবা হয়তো তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ, তাদের গায়ের পুরু

চামড়ার (শরৎচন্দ্রের ভাষায় হিন্দুস্থানী চামড়া) তির্যক উল্লেখ এবং তাদের অত্যাধিক ভোজনবিলাস, মদ-গাঁজা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নেশায় আসক্তি ইত্যাদি বর্ণনার স্তরেই সীমাবদ্ধ। আর এসব বর্ণনায় যেটুকু বা হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে তার মান অত্যন্ত নীচু, তাতে লেখকের কিছুটা রুচি-বিকৃতি এবং শৈল্পিক সংযমহীনতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে স্বামী-স্ত্রীর একটি বিদায়-দৃশ্যের মাধ্যমেও কিছুটা হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বর্মী স্ত্রীকে প্রতারণা করে বাঙালী যুবক দেশে ফিরে যাবার প্রাক্কালে ক্রন্দনরতা বর্মী মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গি করে তার অবোধ্য বাঙলা ভাষায় বলছে—"ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।" যে পরিস্থিতিতে এ উক্তি করা হয়েছে, তাতে কারো হাসি উদ্রিক্ত হয় কি না সন্দেহের বিষয়; আর যদি বা কারো হয়, তা হলে তার রুচির সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙালী যুবকটির বর্মী স্ত্রীকে (যে স্ত্রী তার ভরণপোষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ভারই এতদিন বহন করেছিল) এরূপভাবে পরিত্যাগ, তার আচার-আচরণ, তার উপর্যুক্ত উক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে যুবকটির হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা এবং নীচতাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে রূপ ক্ষেত্রেও এরূপ উক্তি— যার মধ্যে একটা অতি স্থূল হাস্যাত্মক ভঙ্গি দিয়ে লোক হাসানোর প্রচেষ্টা বিদ্যমান, লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয়নি। বরং সমস্ত দৃশ্যটির করুণ পরিবেশ এর দ্বারা কিছুটা নষ্ট করাই হয়েছে। করুণরসের আশ্রয়ে হাস্যরসসৃষ্টির চরম ব্যর্থতার এটি একটি নিদর্শন।

ঘটনাসংস্থান, বর্ণনা ও সংলাপের দ্বারা দু-একটি গল্পেও তাঁর হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস আছে। গল্পগুলির ক্ষেত্রে হাস্যরস—তার মনে যাই হোক না কেন গল্পগুলির আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছে এবং সেদিক থেকে বিচার করলে হাস্যরসসৃষ্টি এখানে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক, এ কথা বিশ্বাস করার সংগত কারণ আছে। আর যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক, তাই সচেতন প্রয়াসও এখানে লক্ষ্য করা যায়। 'ছেলেধরা' ও 'লালু' সিরিজের গল্পগুলি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

'ছেলেধরা' গল্পটিতে হাস্যরস পরিমাণে অত্যল্প এবং মানেও নিম্ন। ডাকাত সেজে মুখুজ্জে দম্পতিকে ভয় দেখাতে গিয়ে লতিফ ও মামুদ দু ভাইকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাতে কিছুটা হাসির উপকরণ আছে বটে, কিন্তু গল্পটির করুণ পরিণতি হাস্যরসকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। তবে

বিশেষ করে লতিফ ও মামুদের ছদ্মবেশের বর্ণনায় এবং তাদের নিজেদের শক্তি ও পরাক্রম জাহির করার অভিনেতাসুলভ প্রচেষ্টায় কিছুটা হাসি উদ্রিক্ত হয় বটে।

হাস্যরসাত্মক গল্প হিসেবে 'লালু' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পটিতে মায়ের গুরুদেবকে জব্দ করার জন্যে লালুর অদ্ভুত কৌশলকে কেন্দ্র করেই হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। লালুদের নতুন তৈরি বাড়িতে লালুর মা নন্দরাণীর বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁর গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়ল। গুরুদেবের আগমনে নন্দরাণী নিজেকে ধন্য মনে করলেন; গুরুদেবের আদর-অভ্যর্থনার সে কী বহর! পরিপাটি শয্যায় শায়িত পথশ্রান্ত গুরুদেবের গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপুষ্ট পেটের উপর জল পড়ছে—উঃ কী ঠাণ্ডা জল। ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে খাট টানাটানি করেও গুরুদেব ঠাণ্ডা জলের মার এড়াতে পারলেন না। এদিকে আবার ভয়ও হতে লাগল, 'কি জানি ফাটা ছাত ভেঙে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে।' অবশেষে ঘরের বাইরে বেঞ্চির উপর বসে পশ্চিমী মশার নৃশংস দংশনে কাতর গুরুদেব যে দুর্ভোগ ভুগলেন তার তুলনা বিরল। অবশেষে আবিষ্কৃত হল মাতৃদেবীর পূজ্যপাদ গুরুদেব যে ঠাণ্ডা জলের তাড়ায় প্রায় সারারাত ছুটোছুটি লুটোপুটি করে বেড়িয়েছেন সেটা প্রাকৃতিক বৃষ্টি নয়, তাঁরই কল্যাণীয়া শিষ্যার সুযোগ্য সন্তানের সৃষ্টি কৃত্রিম বৃষ্টি—মশারিতে সুকৌশলে ন্যাকড়ায় বেঁধে রাখা বরফের-চাঙড়-গলা জল। এ গল্পটিতে শরৎচন্দ্র কিছুটা বিশুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন কি লালুর চক্রান্তে গুরুদেবও নিজের নির্বুদ্ধিতায় হাঃ হাঃ করে হেসেছেন এবং বলা বাহুল্য, গুরুদেবের সেই অনাবিল হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হো হো করে হাসতে পাঠকের পক্ষেও কোন বাধা থাকে না।

লালুর দ্বিতীয় গল্পে মনোহর চাটুয্যের তাঁর বাড়িতে কালীপুজো উপলক্ষে পাঁঠাবলি বন্ধ করার জন্য লালুর 'ভয়ানক' কৌশলের রোমহর্ষণ বর্ণনা। আগের গল্পটিতে মায়ের গুরুদেবকে জব্দ করা, এটাতে চাটুয্যেকে জব্দ করা। আগেরটিতে গুরুদেবের আদর-অভ্যর্থনার যে বহর এবং তার সঙ্গে গুরুদেবের সেই আদর অভ্যর্থনা পুরোপুরি ভোগ করতে না পাওয়ার হাস্যকর বৈপরীত্য উপাদেয় হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে চাটুয্যেকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে খাঁড়াধারী লালুর তাঁকে মায়ের কাছে বলি দেবার ইচ্ছাজ্ঞাপন—চাটুয্যের কাকুতি-মিনতি—এবং পরিশেষে লালুর মিথ্যা ভয় দেখানোর চালাকি ফাঁস হয়ে যাওয়া—সবকিছু মিলে একটি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্ট হলেও এ হাসিতে প্রথম গল্পটির প্রাণখোলা ভাব নেই। প্রথম গল্পটির ঘটনা-

সংস্থান এবং বর্ণনার মধ্যে একটি সুন্দর হাস্যময় ভঙ্গি বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছে। দ্বিতীয়টির ভীতি-উৎপাদক পরিবেশ হাস্যরস সৃষ্টির তেমন সহায়ক হয় নি।

৪

শরৎ-সাহিত্যে যেমন একদিকে আছে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও স্নেহসিক্ত সহানুভূতি, তেমনি অন্যদিকে আছে সমাজের অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার, মানুষের শোষণ-পীড়ন-দমন এবং তথাকথিত ভালোমানুষের নীচতা-স্বার্থপরতা-ভণ্ডামি-ভড়ংয়ের বিরুদ্ধে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। এবং উল্লেখ্য যে, এই প্রতিবাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও সমালোচনার কোনো না কোনো স্থানে হয় বিষয়, নয় চরিত্র, নয় বর্ণনা, নয় সংলাপ, না হয়তো লেখকের মন্তব্যকে আশ্রয় করে ব্যঙ্গরস দানা বেঁধেছে। শরৎসাহিত্যে হিউমার পরিমাণে কম, মানেও উন্নত নয়। স্যাটায়ার মানে উঁচু না হলেও পরিমাণে কম নয়।

শরৎসাহিত্যে হিউমার প্রধানত চরিত্রাশ্রয়ী, স্যাটায়ার তা নয়। স্বার্থপর নীচ কুটিল ভণ্ড শয়তান জাতীয় কয়েকটি নারী-পুরুষ চরিত্র ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গরস পরিবেশনের প্রধান দায়-দায়িত্ব বহন করেছে বর্ণনা, সংলাপ ও লেখকের নিজস্ব মন্তব্য প্রভৃতি। প্রবন্ধ ও সমালোচনায় তো লেখকের মন্তব্যই হয়েছে ব্যঙ্গের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত'-র নতুনদা, 'চরিত্রহীন'-এর শশাঙ্ক-মোহন, 'শেষপ্রশ্ন'-র অক্ষয়, 'দেনা-পাওনা'র জনার্দন রায় ও গোমস্তা এককড়ি নন্দী, 'পল্লীসমাজ'-এর গোবিন্দ গাঙ্গুলি, 'বামুনের মেয়ে'র গোলোক চাটুয্যে এবং 'দত্তা'র রাসবিহারী প্রভৃতি মনুষ্যত্ব-সম্পদে একেবারে দেউলে অথচ বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও স্বার্থসিদ্ধির কৌশলে আশ্চর্য রকমের পটু মানুষগুলির উদ্দেশ্যে লেখক ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শায়ক নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেন নি।

নতুনদা'কে বোঝবার পক্ষে তার সম্পর্কে শ্রীকান্তের জবানিতে শরৎচন্দ্রের একটি ছোট্ট মন্তব্যই যথেষ্ট—'বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি।' দর্জিপাড়ার এই সর্ববিদ্যাবিশারদ বাবুটির স্বার্থ-পরতা, নীচতা, মানুষের প্রতি ঘৃণা—সবকিছুই তীক্ষ্ণব্যঙ্গের টারগেট হয়েছে। শরৎচন্দ্র এই মানুষটিকে কেবল ব্যঙ্গবিদ্ধ করেই থামেন নি, তার উপযুক্ত

শারীরিক শাস্তিবিধানও করেছেন। তার কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' এবং তার সঙ্গে হাততালির সংগতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের কুকুরগুলো দলবদ্ধভাবে তাকে তাড়া করেছিল। প্রাণ বাঁচাতে তিনি পাম্পশু, ওভারকোট, দস্তানা, গলাবন্ধ ও টুপি সমেত জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। এবং দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে অর্ধঘণ্টা কাল আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কিন্তু এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির করুণ পরিণতিতেও তার স্বার্থ-চেতনা ক্ষণকালের জন্যও লুপ্ত হয়নি—এটাই আশ্চর্য! বাবু জল থেকে ডাঙায় উঠেই প্রথম কথা বললেন—'আমার একপাটি পাম্প।'

নতুনদা'র বিচিত্র সাজ-পোশাক, তার সঙ্গীত, এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি পড়েছিলেন তার বর্ণনায় হাসির উদ্রেক হয় সত্য, কিন্তু চরিত্রটি আসলে রঙ্গ নয়—ব্যঙ্গেরই আলম্বন বিভাব।

শশাঙ্কমোহনের উগ্র সাহেবিয়ানাই লেখকের ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। তাঁর 'রংটা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ, তিনি বাংলা বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজী বলিতেন ভুল।'

শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এ জমিদার রে সাহেবের, বিশেষ করে তাঁর আধুনিকা কন্যার সাহেবি ধাঁচের বিলাসবাহুল্যকেও শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি, যদিও 'রে' সাহেব নিজে যথার্থই একজন ভালো মানুষ। রে সাহেবের বদান্যতার কথা প্রচারিত হলে বিপদ হতে পারে—রে সাহেবের আধুনিকা কন্যা আলেখ্য এরূপ মন্তব্য করলে রে সাহেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, "বিপদ হবে ?" উত্তরে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অমরনাথের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শোনা যায়—'বিপদ হবে না, আপনি ভয় পাবেন না। ড্রেসিং টেবল আর কাঁটা চামচে ডিশের নীচে সমস্ত চাপা পড়ে যাবে—।' বাঙালীর উগ্র সাহেবিয়ানাকে উনিশ শতকের অনেক ব্যঙ্গরসিক লেখকই ব্যঙ্গের বিষয় করেছেন। শরৎচন্দ্র এখানে সেই পথেরই পথিক।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। হিন্দুধর্ম এবং সমাজনীতি রক্ষার দায়িত্ব যেন একা তারই। শিবনাথের লাম্পট্য ও মদ্যপান এবং কমলের চরিত্রহীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে সে আগ্রার বাঙালী সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। কিন্তু হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী এই লোকটিই আবার কমলের ছোট্ট একটি চিঠি পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। তার উগ্র গোঁড়ামি এবং অসঙ্গত আচরণই উপহাসের বিষয় হয়েছে।

'দেনাপাওনা'র গোমস্তা এককড়ি নন্দী এবং জনার্দন রায়—দুজনেই ঘুঘু ব্যক্তি। স্বার্থপরতা, কূটবুদ্ধি এবং নীচতায় কেউ কারো কম যায় না।

প্রজাদের নালিশ জানাবার জন্য দুর্দান্ত ও দুশ্চরিত্র জমিদার জীবানন্দের কাছে যেতে হবে। জনার্দন গোমস্তা এককড়ির ওপর এই ভার দিয়েছিলেন—সে তা পালন করেনি। অগত্যা জনার্দন নিজেই যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। "সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন, শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার নাম লাল কালি দিয়া কাগজের উপর লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন, এবং হাঁচি টিকটিকি শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।" এই চিত্রের মাধ্যমে লেখক জনার্দনের ভীরুত, দুর্বলতা এবং ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং রাসবিহারী অনেকটা একধরনের চরিত্র। দুজনেই নীচ, শঠ, ভণ্ড, কূটকৌশলী এবং দক্ষ অভিনেতা। গোবিন্দ সদালাপী ও পরোপকারী ব্যক্তির ছদ্মবেশে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপর। সুযোগ বুঝে কখনো রমেশের পক্ষে, কখনো বা বেণী ঘোষালের পক্ষে যোগ দেবার ভান করে নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়। রাসবিহারীও অভিনয়কলায় নিপুণ। পুত্র বিলাসবিহারীর সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে দিয়ে বিজয়ার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করাই তার লক্ষ্য। অথচ তার এই উদ্দেশ্য সে সুচতুরভাবে গোপন রাখতে চেষ্টা করে তবে শেষ রক্ষা হয়নি। তাঁর মুখোশ সেই বিজয়ার কাছেই খুলে পড়েছে যার অভিভাবকত্বের বোঝা তিনি নাকি নিছক পরোপকারবৃত্তির তাগিদেই এতদিন বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই দুই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির আসল উদ্দেশ্য ও আচার-আচরণের মধ্যে ঘোরতর অসঙ্গতিই হাসির কারণ হয়; কিন্তু যেহেতু এই বৈষম্য ও অসঙ্গতির মূলে নীচতা ও স্বার্থপরতার অস্তিত্ব, তাই এই হাসি ব্যঙ্গের হাসি।

গোলক চাটুজ্জে আসলে একটি ভিলেন—মনুষ্যনামের অযোগ্য। অথচ সেই-ই সমাজের পাণ্ডা। একদিকে আশ্রিতা নারীর সর্বনাশ, আফ্রিকার যুদ্ধের মরশুমে ছাগলভেড়া চালানের কারবার, এমন কি গোরু চালান দেবার জন্যেও মুসলমান ব্যবসায়ীকে চড়া সুদে টাকা ধার দেবার প্রস্তাব ইত্যাদি অপকর্মের কর্তা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পতাকাবাহী ও ভগবান শ্রীমধুসূদনের একনিষ্ঠ ভক্ত এই হিন্দুচূড়ামণির বাইরের এবং ভেতরের স্বরূপের মধ্যে উৎকট বৈষম্যই ব্যঙ্গাশ্রিত হাসির কারণ হয়েছে। গোলোককে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে শরৎচন্দ্র যেন তাবৎ ভণ্ড সমাজপতিদের মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেছেন।

ব্যঙ্গাত্মক নারীচরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল 'অরক্ষণীয়া'র স্বর্ণমঞ্জরী,

'চন্দ্রনাথ'-এর হরিবালা, "বিন্দুর ছেলে'র এলোকেশী, 'পল্লীসমাজ'-এর মাসী, 'বামুনের মেয়ে'র রাসমণি এবং 'বড়দিদি'র সুরেনের সৎমা প্রভৃতি। যে কোন কারণেই হোক, নারী যখন তার সহজাত নারী-প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে তখন সে হয়ে ওঠে সংসারের পক্ষে মারাত্মক জীব—বোধ হয় শয়তান পুরুষের চেয়েও ভীষণ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কুল-নির্বিশেষে শরৎচন্দ্র নারীর মহিমাই বেশি করে উপলব্ধি করেছেন, তাদের স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু নারীর মধ্যে যখন নারীত্ব অর্থাৎ তার সহজাত ও স্বাভাবিক কোমল প্রবৃত্তিগুলির অবলুপ্তি ঘটে তখন তাকে আঘাত করাই বোধ হয় শ্রেয়। শরৎচন্দ্রও তাই করেছেন। বাঙালীর সৎমা ট্রাডিশনের ধারাবাহিনী সুরেনের সৎমার প্রতি শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ তাঁর নিজের ভাষাতে বললেই বোধ করি বেশি স্পষ্ট হবে: "হাসির নীচে ছুরির বাঁকা ধার"এর মতো "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর পূর্ব হইতেই তাহাকে সমগ্র রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য তাহার নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জন দিতে হইত।" তিরস্কার লাঞ্ছনার পরমুহূর্তে সুরেনের চোখমুখ ছলছল করলে তার বিমাতা সেটাকে জ্বরের পূর্বলক্ষণ মনে করে তিন দিনের জন্য তার সাগু পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন। সুরেন্দ্রনাথের গায়ে আধুনিক রুচিসম্মত কিংবা পরিষ্কার বস্ত্রাদি দেখলেই সেটাকে শৌখিনতা বা বাবুয়ানার লক্ষণ মনে করে দুই-তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রনাথের বস্ত্রাদি ধোপার বাড়িতে দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিতেন। শরৎচন্দ্রের তির্যক মন্তব্যে ব্যঙ্গের ধার যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে—"আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে। পাড়া-প্রতিবেশীরা একমুখে রায়গৃহিণীর সুখ্যাতি করিয়া উঠিতে পারে না।"

এলোকেশীর স্বার্থপরতা এবং নীচতাকে লেখক ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। বড়লোকের মেয়ে বিন্দুর কাছে অমূল্যের চেয়ে নরেনকে সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে স্বার্থসিদ্ধি করাই তার উদ্দেশ্য। এইজন্যেই সে বিন্দুর কাছে নরেনের বিদ্যে জাহির করার চেষ্টা করে। নরেন পরীক্ষায় পাশ করে ক্লাসে উঠতে না পারার অদ্ভুত কারণ দেখায়—"এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ করে ফেলত। শুধু মুখপোড়া মাস্টারের জন্যই হচ্ছে না।······বাছাকে সে যে কি বিষ নজরেই দেখেছে, তা সেই জানে। ওকে কি তুলে দিচ্ছে? দিচ্ছে না। হিংসে করে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেছে।"

আগেই উল্লিখিত হয়েছে আত্মভোলা, অন্যমনস্ক ও উদাসীন পুরুষ এবং নারীচরিত্রগুলি হিউমার সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে অঙ্কিত হয়নি। ঐ চরিত্র-

গুলির আশ্রয়ে যেটুকু রঙ্গরস সৃষ্ট হয়েছে তা নেহাতই byproduct। কিন্তু আমাদের ধারণা, ব্যঙ্গরস পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়েই শরৎচন্দ্র উপরি-লিখিত নারী-পুরুষ চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের সমাজনীতির মূল কথা সমাজকে আঘাত করা নয়, সমাজের অমানবিক নীতি-নিয়ম, অবিচার-অনাচার প্রভৃতিকে আঘাত করে সমাজের মোহভঙ্গ করে তাকে প্রকৃতিস্থ করা। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের একস্থানে কিরণময়ী দিবাকরকে বলেছে—ঠাকুরপো, সমাজকে আঘাত এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিস নয়। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।" বলা বাহুল্য, কিরণময়ীর জবানিতে এটা শরৎচন্দ্রেরই মন্তব্য।

'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস। এর আবহাওয়া ভারী, পরিবেশ গম্ভীর। এর নায়ক 'সব্যসাচী'ও সিরিয়াস চরিত্রের মানুষ। এই চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কৌতুকহাস্য পরিবেশন বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ নয়। তবু তাঁর নামকরণের উৎস সন্ধানের দ্বারা এবং ছদ্মবেশের বর্ণনায় লেখক কিছুটা কৌতুক-রস পরিবেশন করেছেন; আর তাঁর মন্তব্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ইংরেজ ভারতের তদানীন্তন অন্তঃসারশূন্য স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ ধিক্‌কৃত ও ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে।

পণ্ডিতমশায়ের বাগানের আমগাছ থেকে ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়তে গিয়ে ডান হাত ভাঙে, তাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়। পণ্ডিতমশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন—যাক, এবার বোধ হয় দু-একটা পাকা আম মুখে দিতে পারবেন। কিন্তু আমপাড়া বন্ধ হল না। পণ্ডিতমশাই খবর পেয়ে হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন—"ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী, আমের আশা আর করিনে। ডানটা ভেঙেচে, বাঁ হাত চলছে, বাঁ-টা ভাঙলে বোধ হয় পা দু'টো চলবে।" পণ্ডিতমশায়ের 'অনেক দুঃখের দেওয়া নাম' এই সব্যসাচী।

গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর বিচিত্র সাজ-সজ্জা ও আকৃতির বর্ণনা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। "তাহার মাথার সম্মুখ দিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি—অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন রুক্ষ কেশ হইতে নিদারুণ লেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার বুক পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা

যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা।"

তদানীন্তন স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছিল। শরৎচন্দ্র নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্যান্য স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দের নানা বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। স্বাধীনতার অর্থ শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল একটিই—পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে আপোস বা কোন রকম রফা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কংগ্রেসী নরমপন্থীদের তাই তিনি অপছন্দ করতেন। তাঁদের আইন বাঁচিয়ে দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টাকেও তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। অপরপক্ষে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা তাঁর আন্তর সহানুভূতি লাভ করেছে।

'পথের দাবী' উপন্যাসে শিল্পকলাগত এবং অন্যান্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এর নায়ক সব্যসাচী স্রষ্টার স্নেহ-প্রীতিধন্য এবং অনেকাংশে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের বাহক। আইন বাঁচিয়ে "ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দের" দেশোদ্ধারের আন্দোলন সম্পর্কে সব্যসাচীর মন্তব্যে শরৎচন্দ্রের মত এবং কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "আইনের বাইরে এই সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোনদিন কোন কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশের মাঞ্চুরাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরেজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এরা কোনমতেই বে-আইনী প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলেই আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক।" ভারতের তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য নয়, আড়াই হাত পরাধীনতাকে একটু কেটে ছেঁটে সওয়া দু'হাত করার জন্য—অর্থাৎ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বা ঐ জাতীয় কিছু একটা নামকো বাস্তে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য।

ভারত সরকার শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কার করবেন বলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ শুনে সব্যসাচী উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন—তাঁর ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় নেতারা হয়তো স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশের সঙ্গে আপোস করে বসবেন। তিনি ভারতীকে বলেছেন—"বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল কতটুকু মেকি—কি পেলে শরীর

ধাপ্পাবাজী হয় না এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে।
বিদেশী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরমবাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি, আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে, হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্বি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়।" সব্যসাচীর এই উক্তিতে তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের নরমপন্থী দিক এবং ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আপোসে একটা রফা করার মনোভাবকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত, কি তার পরেও, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ধারাটি ইংরাজের সঙ্গে আপোসে রফা করার খাতেই বহমান ছিল। শরৎচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী প্রখ্যাত স্যাটায়ারিস্ট ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গকাব্য 'ভারত উদ্ধার'-এ ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপোস রফা করার মনোভাবকে চমৎকারভাবে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যের সমাপ্তিপর্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অভিনব কৌশলে পরাজিত (?) ইংরেজের সঙ্গে বিজয়ী (?) ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে অভাবনীয় সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন তার বয়ানটা যেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দে সম্বন্ধে সব্যসাচীর জবান-বন্দির ভাষাতেই লেখা :

জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকিল সম্মতি দিল ; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া ; থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।

* * * * *

হউক বা না হউক ভারত উদ্ধার
চারি আনা পাই, সদা এই উপকার।

বিপ্লবী সব্যসাচীর নিদারুণ ইংরেজ বিদ্বেষ তাঁর আর-একটি উক্তিতেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীর সঙ্গে জলাজঙ্গলের পথে

ধরে সব্যসাচী শশী কবির বাড়ি যাচ্ছেন। ভারতী শাপের ভয়ের কথা তুললে তিনি বললেন—"সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।"

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেও প্রচলিত নীতির প্রতি ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন। প্রচলিত অর্থে যাকে চরিত্রহীন বলা হয়ে থাকে সেই সতীশ চারিত্রিক ঔদার্যে, পরোপকারবৃত্তিতে, এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের মহিমায় কতো বড়ো, লেখক যেন গোঁড়া সমাজপতিদের কাছে তাই তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিকেও ব্যঙ্গ করেছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিরণময়ীর অধিকাংশ সংলাপ যেন ছুরির বাঁকা-ধারের মতো চক্‌চকে। এইসব সংলাপের মধ্যে ব্যঙ্গের যে বিদ্যুৎ-বিস্ফুরণ তা নিঃসন্দেহে বঞ্চিতা নারীর মর্মপীড়াজনিত। 'শেষপ্রশ্ন'-র কমলের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলিতেও কোথাও কোথাও ব্যঙ্গের চকিত দীপ্তি, আবার কোথাও বা উইটের তির্যকভঙ্গি অনতিপ্রচ্ছন্ন। বলে রাখা প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের সংলাপেই হৃদয়ের প্রাধান্য; কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' এবং অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ' ও 'আগামীকাল'-এর সংলাপে কিছুটা তির্যক বাচনভঙ্গি এবং বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ এগুলির মধ্যে উইটের আলগা স্পর্শ অনুভব করা যায়।

শরৎচন্দ্রের 'সতী' ও 'বিলাসী'—এ দুটি গল্পেও ব্যঙ্গের তীব্রতা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। 'সতী' নামকরণের মধ্যেই তথাকথিত সতীত্বের প্রতি ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন। নির্মলার সতীত্বের দাপট এবং স্বামীর খবরদারিতে সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়োজিত রাখা তার স্বামীটির পক্ষে যে কতোখানি মর্মান্তিক ও অসহনীয় ব্যাপার, নিপুণ ব্যঙ্গাত্মক-ভঙ্গি এবং বর্ণনার সাহায্যে এ-গল্পটিতে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবশ্য স্বামী হরিশ ও সাধ্বী স্ত্রী নির্মলার নিদারুণ দাম্পত্য সমস্যাকে বৈষ্ণব ভিখারীদের গাওয়া দূতীসংবাদে শ্রীরাধার প্রতি ব্রজনাথের নিষ্ঠুরতা—এই বিপরীত পটভূমিতে স্থাপন করে শরৎচন্দ্র একপ্রকার কৌতুক-রস পরিবেশন করতেও সক্ষম হয়েছেন। দূতীসংবাদে ব্রজনাথের নিষ্ঠুরতাই প্রকট—শ্রীরাধাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই অপরাধী। কিন্তু হরিশ ব্রজনাথের পক্ষে 'বিনি পয়সার উকিল' দাঁড়িয়ে ব্রজনাথকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য মনে মনে যে অপূর্ব তর্কযুদ্ধ করেছে তা যেমন হাস্য-রসাত্মক তেমনি আবার তার মর্মপীড়ার দ্যোতকও বটে। "ওগো দূতি, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিষ, সংসারে তার তুলনা নাই। কিন্তু তুমি ত সব কথা বুঝবে না—বললেও না। আমিও জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে

পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশো বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি। কংসটংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম।” পাঠকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্রজনাথের উকিল হরিশ এখানে আত্ম-পক্ষই সমর্থন করেছেন।

গল্প এবং প্রবন্ধরীতির মিশ্রণে ‘বিলাসী’ ভিন্ন স্বাদের গল্প। গল্পটির পাদটীকায় বলা হয়েছে যে এটা “জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল।’ শরৎচন্দ্রের মন্তব্যে এখানে ব্যঙ্গের আগুন জ্বলে উঠেছে— “সংগ্রামস্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অতবড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি ‘নারায়ণে’র* কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। ...শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহার গায়ে জোর নাই তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর নারী যাই হোক না কেন।”

পল্লীমানুষের অদ্ভুত সংস্কার এবং কূপমণ্ডুকসুলভ সংকীর্ণতাও এই গল্পে ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। “আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে শুনিলে আপনারা অবাক হইবেন। এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার (বিলাসীর) হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা। কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী। কিন্তু তাই বলিয়া ভাত। লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়—ভাত খাওয়া যে অন্নপাপ।”

‘বিলাসী’ গল্পটিতে আগাগোড়াই একটি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি উদ্যত, যদিও এর মূল সুরটি করুণ। লক্ষণীয় যে করুণরস এখানে ব্যঙ্গরস সৃষ্টির বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

শরৎচন্দ্রের প্রায় অনালোচিত প্রবন্ধ এবং আলোচনাগুলিতে সমাজনীতি, সাহিত্য, আর্ট, নীতি-দুর্নীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে। এগুলিতে শরৎচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত, তাঁর গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন, স্বমতের পক্ষে এবং পরমতখণ্ডনে যুক্তি-তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ, ভাষার দৃঢ়

* ‘নারায়ণ’ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা

বাঁধুনি, সর্বোপরি ব্যঙ্গবিদ্রূপকে তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রত্যক্ষ এবং ধারালো করে তুলতে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা—বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার মত।

'নারীর মূল্য' নামক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধগ্রন্থে সমাজে নারীর সঠিক মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে তাঁর যে যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ মতামতের প্রকাশ দেখা যায় এবং তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের মর্যাদা দিতে হয়। এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ হাস্যময় নয়, জ্বালাময় হয়ে উঠেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

এক। "অবশ্য একথা স্বীকার করিতে অনেকেরই লজ্জা হইবে, কিন্তু পতিহীনা নারীর এখানে যখন আর তত আবশ্যক নাই তখন কোনমতে ওপারে রওনা করাইয়া দিতে পারিলে স্বামী মহাশয়ের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা, এ ইচ্ছাই যে এ প্রথার (সহমরণ-প্রথা) মূলে একথা অস্বীকার করা এক গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুতেই পারা যায় না।"

দুই। "অসভ্যদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে স্ত্রীবধপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমাদের সুসভ্য এই প্রাচীন দেশ, (ভারতবর্ষ) যে দেশে আত্মার স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হইয়া গিয়াছিল, ঈশ্বরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপিয়া শেষ করা হয়েছিল, সে দেশের পণ্ডিতরাও যে বিশ্বাস করিতেন, বধ করিয়া সঙ্গে পাঠান হয়, ইহাই আশ্চর্য।"

উদ্ধৃতিগুলির বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ব্যঙ্গ কিছুটা চাপা হলেও লক্ষণীয় যে তা শুধু বক্তব্যে নয়, ভাষার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

'রস-সেবায়েত' নামক আলোচনাটি আসলে 'আত্মশক্তি'র সম্পাদককে লেখা একটি চিঠি।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলার একদল তরুণ সাহিত্যিক নীতি, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, নারীত্ব, সতীত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে সাহিত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শোনা যায়, 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের অনুরোধে, এই বিতর্কে যোগদান করে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'সাহিত্যধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে তরুণ সাহিত্যিকদের 'যৌনমনস্কতা'র বাড়াবাড়ি, বিলাতী কারি পাউডারে ভারতীয় খানা বানাবার চেষ্টা প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করেন। প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাহিত্যিক ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামক প্রবন্ধে তরুণ সাহিত্যিকদের পক্ষই সমর্থন করেন। এর জবাবে এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্যধর্মের সীমানাবিচার' প্রবন্ধটিও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। এই

ভাবে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ চলতে থাকে। শরৎচন্দ্র প্রথমে এই তর্কের আসরে নামতে চান নি। কিন্তু তদানীন্তন তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতিভার ওপর তাঁর আস্থা ছিল বলেই এবং তাঁদের বাস্তববোধ ও তথাকথিত প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীমনোভাবকে তিনি প্রীতির চোখে দেখতেন বলেই শেষপর্যন্ত তিনিও এই তর্কযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ না দিয়ে পারলেন না। এবং যুদ্ধে নেমেই তিনি 'রস-সেবায়েত' নামক ব্যঙ্গ-শাণিত তীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে বস'লন।

"রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া এবং নরেশ ছিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনিই যুক্তি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম, ভাবিলাম, ব্যাস, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি-ঠাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় 'সীমানাবিচারে'র রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাপারে। কত কথা কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বলনীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত, বাপরে বাপ। মানুষ এত পড়েই বা কখন, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া।

"ইহার পার্শ্বে লাল-শালু-মণ্ডিত বংশদণ্ডনির্মিত ক্রীড়া-গাণ্ডীবধারী নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন। * * * নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি যুক্তহস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।"

প্রচলিত নীতি-দুর্নীতি, নারীত্ব-সতীত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সাহিত্যিক এই তর্কযুদ্ধ ও বাক্‌বিতণ্ডাকে প্রখ্যাত রঙ্গব্যঙ্গরস-স্রষ্টা পরশুরাম "ভুষণ্ডীর মাঠে" পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন এবং এটাকে একটা হাস্যকর উৎকট ভৌতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করেছেন। এই সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর অনুরোধ-তাঁর মুখেই শোনা যাক—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে।" কেননা "ভূত জাতি অতি নাছোড়বান্দা,

ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব—এসব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে।"

'রস সেবায়েত'—এ ব্যঙ্গ অত্যন্ত ধারালো ও প্রত্যক্ষ, আর নরেশচন্দ্রের বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনাটি রঙ্গব্যঙ্গের মিশ্রস্বাদে বেশ উপভোগ্য।

'সাহিত্যের রীতিনীতি' প্রবন্ধটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম'-প্রবন্ধের প্রতিবাদই বলা যেতে পারে। কবিগুরুর প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, এবং তাঁর এই মনোভাব গড়ে ওঠার পিছনে তাঁর ভক্তবৃন্দের যে ভূমিকা রয়েছে, শরৎচন্দ্র অনেকস্থলে এ-দুটিকেই ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন।

কবির তথাকথিত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্রনিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গবাণের তীক্ষ্ণতা তথা লক্ষ্যভেদে অব্যর্থতা বোঝাবার জন্য দু-একটি উদ্ধৃতির প্রয়োজন :

"* * * প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, আমরা ত আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়। গদা ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি আধুনিক সাহিত্যিক পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

"* * * কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক, শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির 'গদা', 'ধনুর্বাণ' এবং 'অন্ধকারে' শব্দত্রয়ীর একটু টীকা-ভাষ্য প্রয়োজন আছে মনে করি। 'ধনুর্বাণে'র আঘাত তীক্ষ্ণ হলেও তাতে মাত্র একজনই বিদ্ধ হতে পারে, অথচ অনেকের উপরই আঘাত হানার প্রয়োজন—তাই গদা চাই। তাছাড়া, আঘাত স্থূল ধরনের হওয়াও বাঞ্ছনীয়, কেননা ঐ সব অতি-আধুনিক সাহিত্যিকের গায়ে গণ্ডারের চামড়া যে! 'অন্ধকারে' শব্দটির দ্যোতনা হচ্ছে কবি নিজে ভালো করে না জেনে না দেখে অপরের কাছে শুনেই আধুনিক সাহিত্যের বিরোধী হয়ে উঠেছেন। এই কথাটাই শরৎচন্দ্র আরো স্পষ্ট করে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতেই বলেছেন। "কবি ত থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরো মাস বিলেতে। কি জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচিধর্মী শৈলজা প্রেমেন্দ্র নজরুল কল্লোল কালি-কলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন মহীয়সী জননী অতি আধুনিক সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলিমজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কবির নাই।

তাঁহার অনেক কাজ।" সাহিত্যের সামগ্রী সম্পর্কে কবিগুরুর মতামতের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার নমুনা নীচের উদ্ধৃতিটিতে পাওয়া যাবে :

"কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটি ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপজাম-ফুলও না, যদিচ সে শিরীষফুলের সর্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গা-দেবীর মকরের কাছে। অথচ হাতের কাছে বাগেদবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষ উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না। কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিলফুলের সহিত নাসিকার, কদলীবৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিল্বফল অনেকে তরকারী রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎসাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃই এরূপ করে।"

শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের জবাব হিসেবেই লিখিত। এই নিবন্ধে শরৎচন্দ্র ভারতে পাশ্চাত্ত্য ধাঁচের শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক মতামতের বিরোধিতা করেছেন। এবং এই বিরোধিতা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ও যুক্তির আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজরা ভারতে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতামত ব্যঙ্গাশ্রিত হলেও, এই মতামতের মধ্যে শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় বিদ্যমান।

"তার (ইংরাজের) বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি, সে কি নিজের সর্ব-নাশের জন্যেই তৈরী করিয়ে দেবে ? সে কেবলমাত্র এইটুকু দিতে পারে যে যাতে তার নিজের কাজগুলো সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল মোক্তার. মুন্সেফ, হুকুমমত জেলে দিতে ডেপুটি সব ডেপুটি, ধরে আনতে আবার ছোটবড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মাষ্টার, কলেজে ভারতের হীনতা বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসর, আপিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানী—তার শিক্ষা-বিধান এর বেশি দিতে পারে, এও যে আশা করতে পারে সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি।"

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের আর-একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনাও উল্লেখ্য। রচনাটির নাম 'গুরুশিষ্যসংবাদ'। এর আক্রমণের লক্ষ্য যে রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে লেখাটির বক্তব্য বিষয় অনুধাবন করে এবং internal evidence বিচার করে এরকম একটা কিছু অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। শরৎচন্দ্র প্রকৃত রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রকে স্নেহের চোখেই দেখতেন। তবে এক সময় এই দুই সাহিত্যরথীর নানা বিষয়ে মতান্তর থেকে মনান্তর বা মনকষাকষি যে হয়েছিল সেটাও ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য এর মধ্যে পারস্পরিক ভুল-বোঝাবোঝির অবকাশও ছিল প্রচুর। এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ভুল-বোঝাবোঝির জন্যে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র নিজেরা ততটা দায়ী নন যতটা দায়ী তাঁদের উভয়েরই ভক্তবৃন্দ।

গুরুঃ···পরব্রহ্মই ভূমা। তাঁর আনন্দের নামই ভূমানন্দ।···

ভূমা অন্তবিশিষ্ট অনন্ত, আকারবিশিষ্ট নিরাকার—অর্থাৎ নিরাকার কিন্তু সাকার, যেমন কালো কিন্তু সাদা—।

ত্যাগানন্দ বলতে শিষ্য প্রাপ্ত বস্তু ত্যাগের দ্বারা আনন্দই বুঝেছিলেন। সুতরাং তাঁর ভয় 'ত্যাগ করিলেই ত হাতছাড়া হইয়া যাইবে,' পাওয়া যাবে না আর পাওয়া না গেলে আনন্দ কোথায়? গুরুর উত্তর—"তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, ত্যাগের দ্বারা পাইতে বলিতেছি। অর্থাৎ পাঁচজনে ত্যাগ করিতে থাকিলে সম্ভবতঃ তোমার যে প্রাপ্তি ঘটিবে, সেই যে ত্যাগের পাওয়া, সেই যে বড় দুঃখের পাওয়া, তাহাকে বিশ্বপতির দান বলিয়া হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবে বরণ করিয়া লইলেই তোমার ত্যাগানন্দ জন্মিবে।···আমার সেই 'আমি'টার মত সর্বনেশে বস্তু সংসারে নাই। এই 'আমি'টাকে পাঁচজনের মধ্যে, বিশ্বমানবের মধ্যে ডুবাইয়া দিবে। তখন, তোমার আর আত্মপরভেদ থাকিবে না, পাঁচ-জনকে আর আলাদা করিয়া দেখিবে না।"

ভূমানন্দ এবং ত্যাগানন্দ সম্পর্কে যে অপূর্ব ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে তাই হয়েছে ব্যঙ্গরসের আশ্রয়। তাছাড়া ভূমানন্দ ত্যাগানন্দ সম্পর্কে গুরুদেবের নিজস্ব উপলব্ধিও ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে।

অনিলা দেবীর ছদ্মনামে লিখিত "কানকাটা" আলোচনাটিও ব্যঙ্গরসাত্মক। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে (১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন যে, "কানকাটা, কন্দকাটা বা উড়িষ্যার খোন্দজাতিরা বাইবেল-কথিত কানানাইট জাতি ভিন্ন

আর কিছুই নয়।” শরৎচন্দ্র তাঁর এই অযৌক্তিক, অবাস্তব এবং উৎকট সিদ্ধান্তকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন।

জাতিতত্ত্ব বিষয়ে ভালোভাবে পড়াশুনা না করে কেবল ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে এই ধরনের সিরিয়াস প্রবন্ধ লেখার প্রচেষ্টাকে শরৎচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গেই ব্যঙ্গ করেছেন। “কিন্তু জাতিতত্ত্ব জিনিসটি শুধু যদি খেলনার জিনিস হইত কিংবা সখ করিয়া খান দুই এ ও-তা বই নাড়াচাড়া করিলেই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিত, তাহা হইলে আমার এ প্রতিবাদের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু তাহা নহে। ইহা সত্য উদ্‌ঘাটন, চুটকি গল্প লেখা নহে। অতএব জাতিতত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিবার পূর্বে কিছু সলিড পরিশ্রমের আবশ্যক।”

১৯৩১ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে প্রমথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিতে ‘ভারতবর্ষ’-এ প্রকাশিত গল্প প্রবন্ধ কবিতার সমালোচনা আছে। সমালোচনাটিতে ব্যঙ্গের আঘাত অত্যন্ত জোরালো—বলা যেতে পারে একেবারে মর্মভেদী। একটি কবিতার সমালোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। কবিতাটির নাম ‘অন্ধকার বৃন্দাবন’। “করে না দধিমন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার”। কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধিমন্থ করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি ভালোই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও দধিমন্থ করতেন, চন্দ্রহার পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না বলে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখছি।…এই কবিতাটির তৃতীয় stanza—“যমুনা-জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম চন্দ্রমার।” শ্যামচাঁদ তখন কোথায় শুনি? বোধ করি মথুরা থেকে bagpipe বাজাচ্ছিলেন, না হলে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা-জল শিহরে কি করে? অতদূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশী বাজালে? তবে দেবতাদের কথা বলা যায় না, ওরা জাহাজের বাঁশীর মত ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন। সম্ভব বটে।”

কবিতাটির সমালোচনায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শের কিছু পরিচয় ধরা পড়েছে।—এক: সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রকাশের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দুই: কল্পনা যা বাস্তবের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন, কবিতাতেও সেরূপ কল্পনার প্রকাশকে তিনি শিল্পের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র সমকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের সমর্থন করায় অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে তিনি বুঝি সাহিত্যে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার পরিপোষক। তাঁরা শরৎচন্দ্রের এই সমালোচনাটি পড়ে দেখেছিলেন কিনা জানি না, আর পড়ে

থাকলেও তাদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হয়েছিল তাও জানা নেই। শরৎচন্দ্রের তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতিভার ওপরে আস্থা ছিল ঠিকই, তবে তার অর্থ এই নয় যে, তাদের লেখায় যদি অশ্লীলতা বা দুর্নীতির প্রশ্রয় থাকত তবে তাও তিনি নির্বিবাদে মেনে নিতেন।

শ্রীপরশুরাম ছদ্মনামে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'বেণু' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'নূতন প্রোগ্রাম' পুরোপুরি ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

"অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরী, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসরমত দু মুঠো ঘাস ছিঁড়িলেই ত মাসিক দশ বারো অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়।···ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ. আই. সি. সি. একটা মিটিং ডাকিয়া Nanceise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাঁড়াগাঁয়ে আসিতে হইবে। কারণ শহরে ঘাস মেলে না। অতএব এইরূপ মেলামেশায় পল্লীসংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। অন্ততঃ শহরের মধ্যে মোটর হাঁকাইয়া লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা।"

রবীন্দ্রনাথও চরকা প্রোগ্রামের বিরোধী ছিলেন। তিনি এটাকে utterly childish বলেন। শরৎচন্দ্রও আত্যন্তিকভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি স্বয়ং গান্ধীজীর, 'But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning —এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র যে ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করেছিলেন তা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, স্পষ্টবাদিতা, এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সৎসাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি গান্ধীজীর মুখের ওপরেই বলেছিলেন -- No, I don't believe. I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.

৫

শরৎচন্দ্রের আসল পরিচয় হিউমারিস্ট বা স্যাটায়ারিস্ট হিসেবে নয়। হিউমার বা স্যাটায়ারের স্থান তাঁর সাহিত্যে নিতান্তই গৌণ, মানও উন্নত নয়। তবু স্যাটায়ার সৃষ্টিতে তাঁর কিছু কৃতিত্ব চোখে পড়ে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, স্যাটায়ার সৃষ্টি তিনি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সচেতনভাবেই করেছেন। প্রচলিত সামাজিক নীতি ও ধ্যানধারণা যেখানে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করেছে শরৎচন্দ্র সেখানে শুধু ক্ষুব্ধ নয়, ক্রুদ্ধও হয়েছেন। তাঁর এই ক্ষোভ এবং ক্রোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গের আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাঁর ব্যঙ্গ

তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ, এবং বলতে দ্বিধা নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত আক্রমণের স্তরেই সীমাবদ্ধ। সমাজনীতি যদি ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়, তবে তার দ্বারা উন্নতমানের স্যাটায়ার সৃষ্টি সম্ভব যদি না স্রষ্টার ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ক্রোধ তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। শ্রেষ্ঠ হিউমারের ক্ষেত্রেও যেমন উন্নত স্যাটায়ারের ক্ষেত্রেই তেমনি স্রষ্টাকে শুধু নির্লিপ্ত হলেই চলে না—হিউমার এবং স্যাটায়ারের বিষয়ও হতে হয়। অর্থাৎ স্রষ্টাকে অপরের সঙ্গে নিজেকে নিয়েও রঙ্গ বা ব্যঙ্গ করতে হয়। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র তা পারেন নি। তবে এর জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। হাস্যরসের ক্ষেত্র তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র নয়। তিনি মানুষের ব্যথা-বেদনার দরদী শিল্পী। মানবজীবনের অতি সাধারণ কাহিনীও তাঁর প্রতিভার জাদুস্পর্শে অসাধারণ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান এবং তাঁর দান সেই দিক থেকেই বিচার্য।

শরৎ-সাহিত্যের চলচ্চিত্র ও মঞ্চরূপ

অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবি করার প্রথম প্রচেষ্টা আজ থেকে দীর্ঘদিন আগে, বাংলা ছবির প্রায় গোড়াপত্তনের যুগেই বলা চলে। তখন ছবি ছিল নির্বাক, যান্ত্রিক কুশলতা ছিল সীমিত। অভিনয়ের ধারাও তদানীন্তন প্রথানুযায়ী অনেকটা মঞ্চধর্মী। সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, শরৎকাহিনীর চিত্রায়ণ অব্যাহত গতিতে চলছে। সেজন্য বাংলা চলচ্চিত্রের সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে শরৎচন্দ্রকে বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সফলতম কাহিনীকার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। চিত্ররূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাস, বড়গল্প, ছোটগল্প। বহু ক্ষেত্রেই একই কাহিনী একাধিকবার। একটা কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে ছবি হবে এমন কোন পরিকল্পনা মনের মধ্যে পোষণ করে কিন্তু শরৎচন্দ্র কোন সাহিত্যসৃষ্টি করেন নি। তাঁর সাহিত্যের সীমাহীন জনপ্রিয়তাই প্রযোজকদের ছবি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব শরৎচন্দ্রের অনেক আগে ঘটলেও শরৎসাহিত্যের প্রথম চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে রবীন্দ্র-কাহিনী অবলম্বিত চিত্রের আগেই।

চিত্রপ্রতিষ্ঠানের নাম তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি, বাঙালী প্রতিষ্ঠান। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' অবলম্বনে ছবি করা শুরু করলেন। পরিচালনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী। চিত্রগ্রহণ চলার সময় শিশিরকুমার একটি দুর্ঘটনায় আহত হবার ফলে ছবির আংশিক পরিচালনার ভার পড়ল নরেশচন্দ্র মিত্রের ওপর। তখনকার যুগের চিত্রনাট্য লেখার পদ্ধতি এ যুগের মত নয়। প্রখর সূর্যালোকে ক্যামেরাকে দাঁড় করিয়ে বলতে গেলে একের পর এক ছবি তুলে যাওয়া। দমদম রোডের এক বাগানবাড়িতে চলত ছবির চিত্রগ্রহণ। ক্যামেরা-ম্যান ছিলেন ননী সান্যাল। ভূমিকালিপি : শিশিরকুমার ভাদুড়ী (সত্যেন্দ্র-নাথ), দুর্গারাণী (বিজলী), লীলা (একটি বিশিষ্ট ভূমিকা), নরেশচন্দ্র মিত্র (অঘোরকালী), যোগেশ চৌধুরী (দেওয়ান)। নরেশচন্দ্র মিত্র ও যোগেশ চৌধুরীর এই প্রথম চিত্রাভিনয়। অহীন্দ্র চৌধুরী আত্মজীবনীতে (নিজেরে হারায়ে খুঁজি) লিখেছেন, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবিতে দেখা দিয়েছিলেন। কোন অভিনয়ের অংশে অবশ্য নয়, জমিদারবাড়ির বাঈজী নাচের দৃশ্যে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন।

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে 'অাঁধারে আলো' প্রথম প্রদর্শিত হয় তদানীন্তন রসা থিয়েটারে (বর্তমানে পূর্ণ সিনেমা)। ছবি কেমন হয়েছিল এ কথা সঠিকভাবে আজকে বলা সম্ভব নয়। তবে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বক্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায়। তিনি লিখেছেন, "বাংলা দেশে প্রথম উচ্চতর শ্রেণীর ছবি বলতে আঁধারে আলোকেই বোঝায় এবং বাংলা দেশে গম্ভীররসের প্রথম আধুনিক ছবি বলতেও বোঝায় তাকেই। বাঙালী সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনয়ও দেখেছিল ঐ ছবির ভেতরেই। আঁধারে আলো ছবি তোলার পরেই বাংলা চলচ্চিত্র সূতিকাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবার শক্তি অর্জন করেছিল এবং সেই হিসেবেও ঐ ছবিখানা বরাবর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

নির্বাক যুগে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য যেসব কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে তা হল :

(১) চন্দ্রনাথ—তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। পরিচালক—নরেশচন্দ্র মিত্র। চিত্রশিল্পী—ননী সান্যাল। অভিনয়ে : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দ্রনাথ), মিস লাইট (সরযূ), নরেশচন্দ্র মিত্র (কৈলাস), যোগেশ চৌধুরী (মামা) ও শিশুবালা। মুক্তি লাভ করে ১৯২৪ সালে।

(২) দেবদাস—ইস্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেট। পরিচালক—নরেশচন্দ্র মিত্র। চিত্রশিল্পী—নীতিন বসু। অভিনয়ে : ফণী বর্মা (দেবদাস), মিস লাইট (পার্বতী), নরেশচন্দ্র মিত্র (চুনীলাল), তিনকড়ি চক্রবর্তী (ধর্মদাস), মণি ঘোষ (দ্বিজদাস), কনকনারায়ণ (জমিদার), নীহারবালা। প্রথম দেখানো হয় ১৯২৯ সালে।

(৩) শ্রীকান্ত—রাধা ফিল্মস। পরিচালক—তারাকুমার ভাদুড়ী। চিত্র-শিল্পী বিমল মিত্র। অভিনয়ে : কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত), তারাকুমার (ইন্দ্রনাথ), শান্তাকুমারী (রাজলক্ষ্মী), মলিনা (ছোট বয়সের রাজলক্ষ্মী)। ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর চিত্রা সিনেমায় প্রথম দেখানো হয়। শ্রীকান্ত চিত্রা সিনেমার উদ্বোধনী চিত্র।

(৪) চরিত্রহীন—ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ লিমিটেড! পরিচালনা : ডি. জি (ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়)। ক্যামেরাম্যান : পি. সান্যাল। অভিনয়েঃ হেম গুপ্ত (সতীশ)। নমিতা দেবী। ডি জি। অবাঙালী মেয়ে শীলা টমকিনস সাবিত্রী চরিত্রে রূপ দেন—তখন তাঁর নাম দেওয়া হয় সুচারু দেবী। বেহারী চরিত্রে ছিলেন কল্লোলের দীনেশরঞ্জন দাস। ডি. জি এ সম্পর্কে লিখেছেন, "স্থির করলাম শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন প্রস্তুত করবো। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত খুসী হলেন। স্বত্বটি মাত্র ১২০০ টাকায় নেওয়া হল। এ সময়ে

শরৎচন্দ্র দেউলটি হতে প্রায়ই আমাদের স্টুডিওতে আসতেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে শিল্পী নির্বাচনে আমাদের সাহায্য করতেন। কিরণময়ীর অংশ কাকে দেওয়া যায় এ নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লাম। চরিত্রহীনে কোন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে একেবারে অচল। যাদবপুর কলেজের প্রফেসর আমার একটি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বেশ সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁকে কিরণময়ীর অংশে বেশ মানাবে বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। যেমনটি ভাবা তখনি বন্ধুটির কাছে উপস্থিত হলাম।

কি ধীরেন, কি মনে করে ?

তোমার কাছে একটা জরুরী কাজে এসেছি, আশা করি নিরাশ করবে না।

আগে বলই না কি চাই ?

তোমার স্ত্রীটিকে আমাদের স্টুডিওতে অভিনয়ের জন্যে দিতে হবে।

উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তা বেশ কথা ধীরেন, নিজের বৌটি ত নামকরা সুন্দরী। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, তাকে ঘরে রেখে আমার বৌটিকে নিতে এসেছ ?

সবটাই ঠাট্টার মাধ্যমে কথা হল কিন্তু আমি সব কথাগুলোই সীরিয়াসলি নিলাম। বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে বললাম, কাল থেকে আমার সঙ্গে তোমাকে স্টুডিওতে যেতে হবে। আমার স্ত্রী প্রেমিকা দেবী বাধ্য হয়ে স্টুডিওতে এলেন এবং তাঁরই সহায়তায় মহিলাশিল্পী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বন্ধুপত্নীটিও এলেন।" চরিত্রহীন মুক্তিলাভ করে ১৯৩০ সালের ৯ই মে।

নির্বাক যুগে শরৎসাহিত্যের শেষ রূপায়ণ 'স্বামী'। নির্মাতা ফিল্মস্ অব দি ঈস্ট লিমিটেড। পরিচালনা করেন বিখ্যাত শিল্পী চারু রায়। সহকারী পরিচালক : ফণী বর্মা। ক্যামেরাম্যান : দেবী ঘোষ ও পঞ্চানন চৌধুরী।

অভিনয়ে : ফণী বর্মা (ঘনশ্যাম), বীণাপাণি (সৌদামিনী), তিনকড়ি চক্রবর্তী (মামা), রেণু দেবী (মেজ বৌ)। প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৩১ সনের ১১ই জুলাই।

নির্বাকযুগে শরৎসাহিত্যের যে কটি চিত্র গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যর্থ 'শ্রীকান্ত' এবং 'চরিত্রহীন'। জনপ্রিয় সাহিত্যের চিত্রায়ণে সামান্যতম বৈশিষ্ট্য না থাকাতে সে দিনের দর্শকেরা ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন।

সাফল্যমণ্ডিত ছবি ছিল চন্দ্রনাথ, দেবদাস ও স্বামী। আজকের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখলে এসব ছবির মূল্য কী হত, এ নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সংরক্ষণ-ব্যবস্থা না থাকায় নির্বাকযুগের এসব ছবি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। যাঁরা অতীত দিনের এসব ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে হয়তো কিছু কিছু আছে, আর আছে বিলুপ্ত পত্র-পত্রিকায় এসব ছবি সম্পর্কে সে দিনের সমালোচকদের আলোচনা।

চলচ্চিত্রজগতে এল দিনবদলের পালা। ছবি এবার মৌন ভাঙছে। নির্বাক থেকে সবাকে উত্তরণ। শরৎচন্দ্রের কাহিনী এবার সংলাপবদ্ধ হয়ে দেখা দিল।

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর প্রথম সবাক চিত্ররূপ 'দেনাপাওনা'। সবাক ছবির সেটা প্রাথমিক অধ্যায়। ১৯৩১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর চিত্রা সিনেমায় মুক্তিলাভ করল। স্মরণীয় সাহিত্যের বাংলা চিত্ররূপ এই প্রথম। ইতিপূর্বে যে কটি বাংলা সবাক ছবি মুক্তিলাভ করেছিল সেগুলো ছিল ফরমায়েসী গল্প বা মঞ্চের সফল নাটক—যার সাহিত্যিক মূল্য ছিল না বিন্দুমাত্র।

দেনাপাওনার নির্মাতা নিউ থিয়েটার্স। চিত্রস্বত্ব বিক্রি হয়েছিল মাত্র এক হাজার টাকায়।

পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সাহিত্যিক হিসেবে আতর্থী বাংলা দেশে তখন সুপরিচিত। এই তাঁর প্রথম চিত্র-পরিচালনা। সাহিত্যিকের চিত্র-পরিচালনা এই প্রথম। আলোকচিত্রশিল্পী নীতিন বসু—সম্পাদনার কাজও করেছিলেন তিনি। ব্যবস্থাপনায় অমর মল্লিক। শব্দগ্রহণে মুকুল বসু। সুর-সংযোজনায় রাইচাঁদ বড়াল। ছবির বিশেষ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে রবীন্দ্র-সংগীতের সুর সংযোজিত হয়েছিল। সবাক ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের সুর-সংযোজনা বোধহয় এই প্রথম। ভূমিকা-লিপিতে ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় (জীবানন্দ), নিভাননী (ষোড়শী), অমর মল্লিক (এককড়ি). হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জনার্দন) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (শিরোমণি), চানী দত্ত (তারাদাস), জহর গাঙ্গুলী (সাগর সর্দার), পশুপতি সামন্ত (ফকির সাহেব), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়—বড় (প্রফুল্ল), ভূপেন রায় (নির্মল), কমলা (হৈমবতী), উমাশশী (গাজনের মেলার একটি দৃশ্যে)।

শরৎসাহিত্যের চিত্ররূপের পরিসংখ্যান নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বাংলা দেবদাস। নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে এ ছবি পরিচালনা করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। বাংলা ছবির জগতে দেবদাস একদা এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অসংখ্য বার দেখার পরও পরিতৃপ্ত হননি, এমন দর্শক সে যুগে ছিল অগণিত। সাধারণ সিনেমার দর্শকও দেখেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিকবার। অসাধারণ জনপ্রিয় এই ছবি দর্শকদের মনে যে গভীর রেখাপাত করে আজও তার রেশ

মুছে যায়নি। পরিচালক বড়ুয়া প্রকৃত চলচ্চিত্রের শর্ত মেনে যথাসম্ভব সিনেমার আঙ্গিকে গড়ে তোলেন দেবদাসকে। গতানুগতিক তদানীন্তন প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে সমগ্র ছবিটিকে শিল্প সম্মত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বক্সঅফিস-হিট-করা সমগ্র বাংলা ছবির তালিকা প্রস্তুত করলে দেবদাস আজও অন্যতম শীর্ষস্থানাধিকারীর তালিকাভুক্ত হবে। শরৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ হিসেবে দেবদাসকে চিহ্নিত করা উচিত, একথা বলেছেন সমালোচকেরা।

দেবদাস ছবি শরৎচন্দ্রের নিজেরও ভাল লেগেছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

"আমি খুশী হয়েছি এই দেখে যে গল্পের সঙ্কটের স্থানগুলি এই ছবির মধ্যে সংযম ও সতর্কতায় অবাধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পরিচালকের এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। দেবদাসের দুঃখের অবসান যে পথে এঁরা এঁকেছেন তা মনকে অভিভূত করে। ছবিখানি সত্যিই ভাল লেগেছে।"

দেবদাস ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে দেখা দিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া (দেবদাস), যমুনা (পার্বতী), চন্দ্রাবতী (চন্দ্রমুখী), অমর মল্লিক (চুনীলাল), দীনেশরঞ্জন দাস (ভুবন চৌধুরী), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (ধর্মদাস), শৈলেন পাল (মহেন), কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক), অহি সান্ন্যাল (গাড়োয়ান), কুন্দনলাল সায়গল (পতিতালয়ের গায়ক), শ্যাম লাহা (পতিতালয়ে আগন্তুক)। ছবির চিত্র গ্রহণ করেছিলেন ইউসুফ মূলজী, শব্দ-গ্রহণ লোকেন বসু, ব্যবস্থাপনায় অমর মল্লিক, সম্পাদনায় সুবোধ মিত্র। সংগীত পরিচালনা করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল।

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস'এর কোন প্রিন্ট এখনও আছে কি না, সঠিক ভাবে একথা কেউ বলতে পারেন না। পুনা সংগ্রহশালার ভাণ্ডারে রাখবার জন্যে সবরকম সম্ভাব্য চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। বিশেষ অনুসন্ধানের পর যেটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয় সর্বশেষে প্রদর্শিত পূর্ব বঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) কোন পরিবেশকের কাছে হয়তো বা ছবির জরাজীর্ণ একটি প্রিন্ট পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

সবাক যুগে শরৎচন্দ্রের যেসব কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা (ছবির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, পরিচালক, মুক্তিদিবস ও প্রধান শিল্পী সহ) নিচে দিলাম :

১। দেনা পাওনা—নিউ থিয়েটার্স। পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ২৪. ১০. ৩১

২। পল্লীসমাজ—নিউ থিয়েটার্স—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশির-কুমার ভাদুড়ী (রমেশ), কঙ্কাবতী (রমা), প্রভা (জ্যাঠাইমা), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (বেণী), যোগেশ চৌধুরী (গোবিন্দ গাঙ্গুলী), তারাকুমার ভাদুড়ী (আকবর সর্দার), অমলেন্দু লাহিড়ী (ধর্মদাস), শৈলেন চৌধুরী (পরাণ হালদার)। ১. ৭. ৩২

৩। দেবদাস—নিউ থিয়েটার্স। প্রমথেশ বড়ুয়া। ৩০. ৩. ৩৫

৪। গৃহদাহ—নিউ থিয়েটার্স। প্রমথেশ বড়ুয়া। প্রমথেশ বড়ুয়া (মহিম), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (সুরেশ), যমুনা (অচলা), মলিনা (মৃণাল), অমর মল্লিক (কেদার)। ৯. ১০. ৩৬

৫। বিজয়া—নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস। কল্লোলের দীনেশরঞ্জন দাস। চন্দ্রাবতী (বিজয়া), পাহাড়ী সান্যাল (নরেন), শ্যাম লাহা (বিলাস), অমর মল্লিক (রাসবিহারী)। ২১. ১০. ৩৬

৬। পণ্ডিতমশাই—পপুলার পিকচার্স। সতু সেন। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বৃন্দাবন), শান্তি গুপ্তা (কুসুম), রবি রায় (কুঞ্জ), তিনকড়ি চক্রবর্তী (ঘোষাল)। ২৮. ১১. ৩৬

৭। বড়দিদি—নিউ থিয়েটার্স। অমর মল্লিক। মলিনা (মাধবী), পাহাড়ী সান্যাল (সুরেন্দ্র), চন্দ্রাবতী (শান্তি), যোগেশ চৌধুরী (ব্রজনাথ), মেনকা (মনোরমা), শৈলেন চৌধুরী (মিঃ রায়)। ৭. ৪. ৩৯

৮। পরিণীতা—পি আর প্রোডাকসন্স। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যারাণী (ললিতা), প্রমোদ গাঙ্গুলী (শেখর), ছবি বিশ্বাস (নবীন রায়), জীবেন বসু (গিরীন), হরিমোহন বসু (গুরুচরণ)। ১৯. ১২ ৪২

৯। কাশীনাথ—নিউ থিয়েটার্স। নীতিন বসু। অসিতবরণ (কাশীনাথ), সুনন্দা (কমলা), ভারতী (বিন্দু), অমর মল্লিক (নতুন ম্যানেজার), উৎপল সেন (জমিদার)। ২. ৪. ৪৩

১০। বিরাজ বৌ—নিউ থিয়েটার্স। অমর মল্লিক। সুনন্দা (বিরাজ), ছবি বিশ্বাস (নীলাম্বর), সিধু গাঙ্গুলী (পীতাম্বর), রাজলক্ষ্মী (সুন্দরী), দেবী মুখার্জী (জমিদার রাজেন), হরিমোহন বসু (নিতাই)। ৫. ৭. ৪৬

১১। পথের দাবী—অ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্স। সতীশ দাসগুপ্ত ও দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়। দেবী মুখার্জী (সব্যসাচী), সুমিত্রা (ভারতী), চন্দ্রাবতী (সুমিত্রা), জহর গাঙ্গুলী (শশী কবি), মিহির ভট্টাচার্য (অপূর্ব), কমল মিত্র (তলোয়ারকর), তুলসী চক্রবর্তী (তিওয়ারী)। ৭. ৩. ৪৭

১২। রামের সুমতি—নিউ থিয়েটার্স। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। ছবি

রায় (রাম), শিশির বটব্যাল (শ্যাম), মলিনা (নারায়ণী), রাজলক্ষ্মী (দিগম্বরী), ফণী রায় (নীলমণি ডাক্তার)। ২৪. ১২. ৪৭

১৩। শেষ নিবেদন—ডি জি পিকচার্স। শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া' অবলম্বনে। ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি)। ছবি বিশ্বাস (যজ্ঞদত্ত), মলিনা (সুরমা), সরযূবালা (প্রতুল), ডি. জি (নায়েব)। ৩১.১.৪৮

১৪। অরক্ষণীয়া—পি আর প্রোডাকসন্স। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যারাণী (জ্ঞানদা), রবীন মজুমদার (অতুল), সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় (দুর্গা), নিভাননী (ভামিনী), ইন্দু মুখোপাধ্যায় (অনাথ), ভুজঙ্গ রায় (প্রিয়নাথ)। ২৫. ৬. ৪৮

১৫। অনুরাধা—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল টকীজ। প্রণব রায়। কানন দেবী (অনুরাধা), জহর গাঙ্গুলী (গগন), মোহন ঘোষাল (বিজয়), তুলসী চক্রবর্তী (ত্রিলোচন)। ২৫. ৬. ৪৯

১৬। স্বামী—কলালক্ষ্মী চিত্রমন্দির। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সুমিত্রা (সৌদামিনী), পাহাড়ী সান্যাল (ঘনশ্যাম), প্রদীপকুমার (নরেন), অমিতা বসু (মুক্তো), গৌতম মুখোপাধ্যায় (মামা), সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় (সৎমা)। ২৫. ৯. ৪৯

১৭। বামুনের মেয়ে—শ্রীমতী পিকচার্স। সব্যসাচী। অনুভা গুপ্তা (সন্ধ্যা), তুলসী লাহিড়ী (গোলক), শোভা সেন (জ্ঞানদা), পাহাড়ী সান্যাল (প্রিয়নাথ), মায়া বসু (জগদ্ধাত্রী), প্রভা (রাসমণি), সুপ্রভা (তারা)। ২. ১২. ৪৯

১৮। বৈকুণ্ঠের উইল—যুগান্তর চিত্র প্রতিষ্ঠান। মানু সেন। মলিনা (ভবানী), জহর গাঙ্গুলী (গোকুল), বিকাশ রায় (বিনোদ), রেণুকা রায় (মনোরমা), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), সন্তোষ সিংহ (নিমাই রায়)। ২৪. ২.৫০

১৯। মেজদিদি—শ্রীমতী পিকচার্স। সব্যসাচী। কানন দেবী (হেমাঙ্গিনী), জহর গাঙ্গুলী (বিপিন), রেণুকা রায় (কাদম্বিনী), বিজয় কুমার (কেষ্ট), তুলসী চক্রবর্তী (নবীন)। ১০. ১১. ৫০

২০। দত্তা—এস বি প্রোডাকসন্স। সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়। সুনন্দা (বিজয়া), পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (নরেন), অহীন্দ্র চৌধুরী (রাসবিহারী) জহর গাঙ্গুলী (বিলাস)। ৫. ১০. ৫১

২১। পণ্ডিতমশাই (২য় বার)—এমার প্রোডাকসন্স। নরেশচন্দ্র মিত্র। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বৃন্দাবন), সুনন্দা (কুসুম), কানু বন্দ্যো-

পাধ্যায় (কুঞ্জ), সন্ধ্যারাণী (ব্রজেশ্বরী), নরেশ মিত্র (তারিণী মুখুজ্যে)। ৭. ১২. ৫১

২২। মন্দির—চিত্ররূপা। চন্দ্রশেখর বসু। জহর গঙ্গোপাধ্যায় (রাজনারায়ণ), বিকাশ রায় (অমরনাথ)। সমর রায় (শক্তিনাথ), যমুনা সিংহ (অপর্ণা)। ৬. ৬. ৫২

২৩। পল্লীসমাজ (২য় বার)—এস বি প্রোডাকসন্স। নীরেন লাহিড়ী। সুনন্দা (রমা), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (রমেশ), মলিনা (জ্যাঠাইমা), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (বেণী), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (গোবিন্দ), তুলসী চক্রবর্তী (ধর্মদাস), নীতিশ মুখো (আকবর), প্রভা (মাসী), রবি রায় (ভৈরব আচার্য)। ৫. ৯. ৫২

২৪। বিন্দুর ছেলে—যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান। চিত্ত বসু। সন্ধ্যারাণী (বিন্দু), মলিনা (অন্নপূর্ণা), রেণুকা রায় (এলোকেশী), পাহাড়ী সান্যাল (যাদব), অজিত বন্দ্যো (মাধব), বিভু (অমূল্য), সুখেন (নরেন)। ১৯. ৯. ৫২

২৫। শুভদা—এস বি প্রোডাকসন্স। নীরেন লাহিড়ী। সুনন্দা (শুভদা), ছবি বিশ্বাস (হারাণ), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (ললনা), শিখারাণী বাগ (ছলনা), পাহাড়ী সান্যাল (সদানন্দ), তুলসী চক্রবর্তী (গাঁজার আড্ডার খুড়ো)। ৫. ১২. ৫২.

২৬। দর্পচূর্ণ—শ্রীমতী পিকচার্স। শ্রীমতী পিকচার্স ইউনিট। কানন-দেবী (ইন্দু), রাধামোহন ভট্টাচার্য (নরেন), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (গগন), পদ্মা দেবী (বিমলা)। ১২. ১২. ৫২।

২৭। পথনির্দেশ—অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকসন্স। সারথি। বীরেন চট্টোপাধ্যায় (গুণেন), সুমনা ভট্টাচার্য, (হেমনলিনী), জীবেন বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২. ১. ৫৩

২৮। হরিলক্ষ্মী—এস. বি. প্রোডাকসন্স। অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যারাণী (হরিলক্ষ্মী), সুনন্দা (কমলা), অসিতবরণ (বিপিন), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (শিবচরণ)। ২৯.৫.৫৩

২৯। নিষ্কৃতি—কলারূপা লিমিটেড। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। মলিনা (সিদ্ধেশ্বরী), রেণুকা রায় (নয়নতারা), সন্ধ্যারাণী (শৈল), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (গিরিশ), অসিতবরণ (রমেশ), কালী সরকার (হরিশ)। ২০. ১০. ৫৩

৩০। নববিধান—শ্রীমতী পিকচার্স : হরিদাস ভট্টাচার্য। কানন দেবী

(উষা), কমল মিত্র (শৈলেশ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (ক্ষেত্রমোহন), মঞ্জু দে (বিভা)। ১৯. ৩. ৫৪

৩১। সতী—জ্যোতির্বাণী। অমর মল্লিক। ভারতী (নির্মলা), অরুন্ধতী (লাবণ্য), ধীরাজ ভট্টাচার্য (হরিশ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (হরমোহন), কমল মিত্র (রাজমোহন)। ২৩. ৭. ৫৪

৩২। ষোড়শী—নভেলটি ফিল্মস লিঃ। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ছবি বিশ্বাস (জীবানন্দ), দীপ্তি রায় (ষোড়শী), অরুন্ধতী (হৈম), কমল মিত্র (জনার্দন), গঙ্গাপদ বসু (এককড়ি)। ২৯. ১০. ৫৪

৩৩। পরেশ—চারুচিত্র। অজয় কর। নির্মলকুমার (পরেশ), পাহাড়ী সান্যাল (গুরুচরণ), কমল মিত্র (হেড মাস্টার), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (গৌরী), মঞ্জু দে (ছোট বৌ)। ২১. ১০. ৫৫

৩৪। মামলার ফল—এস. এন. প্রোডাকসন্স। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। মলিনা (গঙ্গামণি), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (সুবি), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (শিবু সামন্ত), অসিতবরণ (শম্ভু), ছবি বিশ্বাস (জমিদার) দেবাশিস্ ও অসিত (ছোট ও বড় গয়ারাম)। ১ . ৭ ৫৬

৩৫। বড়দিদি (২য় বার)—শরৎবাণী চিত্র। অজয় কর। সন্ধ্যারাণী (মাধবী), উত্তমকুমার (সুরেন্দ্রনাথ), দীপ্তি রায় (শান্তি), মঞ্জু দে (মনোরমা), ছবি বিশ্বাস (ব্রজনাথ লাহিড়ী), পাহাড়ী সান্যাল (সুরেন্দ্রর বাবা), ধীরাজ ভট্টাচার্য (মণ্টু)। ২৫ ১. ৫৭

৩৬। আঁধারে আলো—শ্রীমতী পিকচার্স। হরিদাস ভট্টাচার্য। সুমিত্রা দেবী (বিজলী) বসন্ত চৌধুরী (সত্যেন্দ্রনাথ), বিকাশ রায় (কুমার বাহাদুর), যমুনা সিংহ (রাধারাণী), নীলিমা দাস (সুবি)। ১২. ৪. ৫৭

৩৭। চন্দ্রনাথ—স্ক্রীন ক্লাসিকস। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। উত্তমকুমার (চন্দ্রনাথ), সুচিত্রা সেন (সরযূ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (কৈলাস), কমল মিত্র (মণিশঙ্কর), চন্দ্রাবতী (সুলোচনা), নীতিশ মুখোপাধ্যায় (রাখাল ভট্টাচার্য) ১৪. ১১. ৫৭

৩৮। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত (শ্রীকান্ত ১ম পর্ব অবলম্বনে)—শ্রীমতী পিকচার্স। হরিদাস ভট্টাচার্য। উত্তমকুমার (শ্রীকান্ত), সুচিত্রা সেন (রাজলক্ষ্মী), তুলসী চক্রবর্তী (রতন), অনিল চট্টোপাধ্যায় (কুমার বাহাদুর)। ২৮. ২. ৫৮

৩৯। ছবি—ইন্দো-বর্মা ফিল্মস কর্পোরেশন। নীরেন লাহিড়ী। মালা

সিনহা (মা শোয়ে), ছবি বিশ্বাস (বা কো), আশিস্ কুমার (বা থিন), বিকাশ রায় (পো থিন)। ৭. ৮. ৫৯

৪০। ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি—শ্রীমতী পিকচার্স ('শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব অবলম্বনে)। হরিদাস ভট্টাচার্য। পার্থপ্রতিম চৌধুরী (ইন্দ্রনাথ), সজল ঘোষ (শ্রীকান্ত), কানন দেবী (অন্নদাদিদি), বিকাশ রায় (শাহজী) অতনু ঘোষ (নতুনদা), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পিসেমশাই), মলিনা (পিসিমা)। ৩. ১০. ৫৯

৪১। জয়া—বলাকা চিত্রম। বারোয়ারী উপাখ্যান "রসচক্র" অবলম্বনে —১২ জন সাহিত্যিক রচিত কাহিনী।

১ম পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র। চিত্ত বসু। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (জয়া), অনিল চট্টোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণ), সন্ধ্যারাণী (বড় বৌ), অনুভা (মেজ বৌ), পাহাড়ী সান্যাল (শিবরঞ্জন), অনুপকুমার (শিশির) লিলি চক্রবর্তী (গিরিবালা)। ১২. ৩. ৬৫

৪২। অভয়া ও শ্রীকান্ত—শ্রীমতী পিকচার্স। (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব অবলম্বনে) হরিদাস ভট্টাচার্য। মালা সিনহা (অভয়া), বসন্ত চৌধুরী (শ্রীকান্ত), বিকাশ রায় (পূর্ণচন্দ্র গুহ) দিলীপ রায় (রোহিণী), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দ মিস্ত্রী), সীতা দে (টগর), বাসবী নন্দী (চারুর বর্মী স্ত্রী)। ২৭. ৮. ৬৫

৪৩। গৃহদাহ (২য় বার)—উত্তমকুমার ফিল্মস। সুবোধ মিত্র। সুচিত্রা সেন (অচলা), উত্তমকুমার (মহিম), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (মৃণাল), প্রদীপকুমার (সুরেশ), পাহাড়ী সান্যাল (কেদার), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (রাম)। ৫. ৫. ৬৭

৪৪। পরিণীতা (২য় বার)—চিত্রলিপি ফিল্মস। অজয় কর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (শেখর), মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (ললিতা), বিকাশ রায় (গুরুচরণ), কমল মিত্র (নবীন রায়), শমিত ভঞ্জ (গিরীন), ছায়া দেবী (ভুবনেশ্বরী)। ১৩. ৬. ৬৯

৪৫। কমললতা—চারুচিত্র। (শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে)। হরিসাধন দাশগুপ্ত। সুচিত্রা সেন (কমললতা), উত্তমকুমার (শ্রীকান্ত), নির্মলকুমার (গহর), পাহাড়ী সান্যাল (দ্বারিকাদাস বাবাজী), ছায়া দেবী (রাসু গোয়ালিনী), জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্ম)। ২. ১০. ৬৯

৪৬। মা ও মেয়ে—বি এন রায় প্রোডাকসন্স। (শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' অবলম্বনে)—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

(জ্ঞানদা), স্বরূপ দত্ত (অতুল), সন্ধ্যারাণী (ছোটমণি), করালী (ভামিনী), তরুণকুমার (বিনোদ)। ১৬. ১০. ৬৯

৪৭। বিরাজ বৌ—(২য় বার) কে সি দাস প্রোডাকসন্স। মানু সেন। উত্তমকুমার (নীলাম্বর), মাধবী মুখোপাধ্যায় (বিরাজ) অনুপকুমার (পীতাম্বর), সুব্রতা চ্যাটার্জী (মোহিনী), দিলীপ রায় (জমিদার রাজেন)। ১৮. ২. ৭২

৪৮। বিন্দুর ছেলে (২য় বার)—এস এস প্রোডাকসন্স। গুরুদাস বাগচী। মাধবী মুখোপাধ্যায় (বিন্দু), সন্ধ্যারাণী (অন্নপূর্ণা), বিকাশ রায় (যাদব), নির্মলকুমার (মাধব), শ্রীমান দিব্যেন্দু (অমূল্য), প্রেমাংশু বসু (প্রিয়নাথ), নীলিমা দাস (এলোকেশী)। ২৪. ৮. ৭৩

৪৯। আলো ও ছায়া—এইচ এম ফিল্মস (২য় বার)। গুরু বাগচী। দিলীপ রায় (যজ্ঞ দত্ত), সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (সুরমা), জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতুল), শিবানী বসু (মাধবী), পদ্মা দেবী (যজ্ঞর মা)। ৮. ৩. ৭৪

শরৎ শতবার্ষিকীকে শরৎকাহিনীর কয়েকটি নতুন চিত্ররূপ দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে। মুক্তির অপেক্ষায় যে ছবিটি আছে তা হল 'সব্যসাচী' (পথের দাবী অবলম্বনে)। পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু। অভিনয়ে আছেন উত্তমকুমার (সব্যসাচী), সুপ্রিয়া (সুমিত্রা), জয়শ্রী রায় (ভারতী), তরুণকুমার (শশীকবি), বিকাশ রায় (নিমাই দারোগা), কিরণ লাহিড়ী (অপূর্ব), অনিল চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্র), প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের তিনটি ছোটগল্পের চিত্ররূপ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনটি ছবি একই চিত্রের বিভিন্ন স্তবক হিসেবে শতবার্ষিকী উৎসবের সময় দেখাবার সঙ্কল্প রাজ্য সরকারের। সম্ভবত এতে থাকবে মহেশ, অভাগীর স্বর্গ ও আরেকটি গল্প। পরিচালনায় থাকবেন পূর্ণেন্দু পত্রী ও আরো দুজন বিখ্যাত পরিচালক। অজয় কর এবার তুলছেন 'দত্তা'—যার নামভূমিকায় থাকবেন সুচিত্রা সেন।

শরৎ-চিত্রায়ণে সাহিত্যিকদের সহযোগিতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শরৎকাহিনী পরিচালনা করেছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাস। চিত্রনাট্য লিখেছেন সজনীকান্ত দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোর্তির্ময় রায়। সংলাপ লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী।

শরৎচন্দ্রের (জীবদ্দশায় প্রদর্শিত) ছবি সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য কী ছিল সঠিকভাবে বলা যায় না। দেবদাস ও বিজয়া দেখার পর তিনি লিখিত ভাবে মতামত জানিয়েছিলেন। ভালো লেগেছিল তাঁর। তবে অন্য ছবি-

গুলো সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা জানা না গেলেও তাঁর বিভিন্ন উক্তি ছবিগুলোর অনুকূলে ছিল না। অমর মল্লিকের বড়দিদির যখন চিত্রগ্রহণ হয় তখন তিনি রোগশয্যায়। সেই অবস্থাতেই তিনি স্নেহাস্পদ অমর মল্লিককে সাফল্যের আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

বিজয়ার চিত্রগ্রহণকালে তিনি একবার নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আসেন। স্টুডিওর সমস্ত কাজকর্ম তাঁকে বিশেষভাবে দেখানো হয়। তাঁর এই স্টুডিও পরিদর্শন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়। পরে "আশীর্বাণী" নাম দিয়ে বিজয়া চিত্রের সঙ্গে দেখানো হয়। সম্ভবত এটি চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই মূল্যবান সংবাদচিত্রটি থাকলে শরৎচন্দ্রকে ছবিতে দেখবার সুযোগ পাওয়া যেত। বিশেষ করে এই জন্মশতবার্ষিকীতে এর একটা অসাধারণ মূল্য ছিল।

হিন্দী ভাষায় শরৎ-কাহিনীর চিত্ররূপ

(১) শরৎ-সাহিত্যের প্রথম হিন্দী চিত্ররূপ 'দেবদাস'। প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে নির্মিত হয়। হিন্দী দেবদাস সারা ভারতে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অর্থকরী দিক থেকেও এ এক বিরাট সাফল্যমণ্ডিত ছবি। হিন্দী দেবদাস ছবিতে নাম-ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন কুন্দনলাল সায়গল। তাঁর অভিনয়ে যেটুকু ত্রুটি ছিল তা ঢেকে দিয়েছিলেন অনুপম কণ্ঠমাধুর্যে। অন্যান্য চরিত্রে যমুনা (পার্বতী), রাজকুমারী (চন্দ্রমুখী) প্রমথেশ বড়ুয়া (মহেন্দ্র), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (নারায়ণ), নেমো (ধর্মদাস) শোর, পাহাড়ী সান্যাল (পতিতালয়ের গায়ক)।

(২) প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "গৃহদাহ" হিন্দীতে নাম পেয়েছিল মঞ্জিল। এটিও নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে তোলা। অভিনয়ে ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, যমুনা, সিতারা, মলিনা, নেমো, কেদার, শোর।

(৩) নিউথিয়েটার্স "দেনাপাওনা" হিন্দীতে তুলেছিলেন, নাম পূজারীণ। পরিচালনা করেছিলেন প্রফুল্ল রায়। সুরসংযোজনা তিমিরবরণ। ষোড়শী চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন চন্দ্রাবতী। অন্যান্য ভূমিকায় রাজকুমারী, কে. এল. সায়গল, পাহাড়ী, নবাব।

(৪) নিউ থিয়েটার্সের বাংলা বড়দিদির মতো হিন্দী বড়দিদিরও পরিচালনা করেছিলেন অমর মল্লিক। প্রধান শিল্পী মলিনা ও পাহাড়ী সান্যাল। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নেমো, নবাব, জগদীশ শেঠী, মেনকা। ছবির নাম বড়ীদিদি।

(৫) দেবদাস থেকে বড়দিদি অবধি গৃহীত হয়েছিল কলকাতায়। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র-নির্মাতারা এবার আগ্রহশীল হলেন শরৎসাহিত্যের হিন্দী চিত্ররূপ দিতে। বোম্বাইয়ের সুদামা পিকচার্স "পণ্ডিত মশাই" অবলম্বনে তুললেন চিঙ্গারী। পরিচালনা সর্বোত্তম বাদামী। প্রধান চরিত্রে পৃথ্বীরাজ কাপুর ও সবিতা দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় ই. বিলিমোরিয়া, কেশবরাও দাঁতে, ভগবান দাস, সুনলিনী দেবী, খাতুন, মীরা ইত্যাদি আরো অনেক খ্যাত অখ্যাত শিল্পী। ছবিটি রসোত্তীর্ণ হতে পারল না—একটি অতি সাধারণ ছবি হিসেবেই গণ্য হল। কাহিনীকেও কিছু বিকৃত করা হয়েছিল। চরণের মৃত্যু দিয়ে শেষ না করে চরণকে আবার বাঁচিয়ে তুলে মিলনান্তক পরিণতির মধ্যে দিয়ে ছবি শেষ করা হল।

(৬) বোম্বাইয়ের লক্ষ্মী প্রোডাকসন্সের ইনকার। অরক্ষণীয়ার হিন্দী চিত্ররূপ। পরিচালনা সুধীর সেন। অভিনয়ে ছিলেন লীলা দেশাই, পাহাড়ী সান্যাল, স্বর্ণলতা, সুনলিনী দেবী।

(৭) বোম্বাইয়ের ন্যাশানাল স্ক্রীন সার্ভিসের সৌদামিনী, স্বামীর হিন্দী চিত্ররূপ। পরিচালনা পি সি যোশী। বিভিন্ন চরিত্রে পি. সি. যোশী, এস. এন. ত্রিপাঠী, সোনা চ্যাটার্জী, লীলা চীৎনীস, মাবুতি, কাক্কু। কলকাতায় মুক্তি পায় ১৯. ১০. ৫১।

(৮) কলকাতার নিউ থিয়েটার্সের কাশীনাথ। পরিচালনা নীতিন বসু। নামভূমিকায় অসিতবরণ। অন্যান্য চরিত্রে সুনন্দা (কমলা), ভারতী, নেমো, নবাব।

(৯) সব্যসাচী পথের দাবীর হিন্দীরূপ। কলকাতার অ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্সের পক্ষে তুলেছিলেন অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী।

চরিত্রলিপি : কমল মিত্র (সব্যসাচী), সন্ধ্যারাণী (ভারতী), মীরা মিশ্র (সুমিত্রা), বিপিন গুপ্ত (তলোয়ারকর), সুন্দর (শশী), পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (অপূর্ব)।

(১০) নিউ থিয়েটার্স রামের সুমতির হিন্দী সংস্করণের নাম দিয়েছিলেন ছোটাভাই। পরিচালনা কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। নামভূমিকায় সুক্কুর। অন্যান্য চরিত্রে মলিনা, রাজলক্ষ্মী, পল মহীন্দ্র, অসিত সেন, নটবর।

সারা ভারতে ছবিটি শুধু অসাধারণ জনপ্রিয়তাই লাভ করেনি—শিক্ষামূলক ছবি বলে এক প্রাদেশিক সরকার এর প্রমোদকরও রহিত করে দিয়েছিলেন।

(১১) কলকাতার এইচ এম ফিল্মসের ছোটী মা—বিন্দুর ছেলের হিন্দী

রূপ। পরিচালনা হেমচন্দ্র চন্দ্র। বিন্দু চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন মীরা মিশ্র। অন্যান্য শিল্পী—মলিনা, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, মাঃ আনন্দকুমার, সক্কর। কলকাতায় মুক্তি ২৮. ২. ৫৩।

(১২) বোম্বাইয়ে গৃহীত শরৎসাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য হিন্দী চিত্ররূপ পরিণীতা। অভিনেতা অশোককুমার এ ছবির প্রযোজক। অশোককুমার প্রোডাকসন্সের এ ছবির পরিচালনা করেছিলেন বিমল রায়। ছবিটিতে পুরো বাঙালী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল সর্বকিছুতেই। অভিনয়ে মীনা কুমারী, অশোককুমার, অসিতবরণ, নাজির হোসেন, বদ্রীপ্রসাদ, প্রতিমা দেবী, বেবী শীলা। কলকাতায় প্রথম মুক্তি ১৫. ৮. ৫৩।

(১৩) বোম্বের জিতেন চৌধুরী প্রোডাকসনের ছবি বিরাজ বহু, পরিচালনা বিমল রায়। চিত্রনাট্য নবেন্দু ঘোষ। নামভূমিকায় কামিনী কৌশল। অন্যান্য ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্য (নীলাম্বর), প্রাণ (জমিদার) রণধীর, শকুন্তলা, নাজির হোসেন, মনোরমা। কলকাতায় মুক্তি ১৭. ৯. ৫৪।

(১৪) বোম্বেতে বিমল রায় প্রোডাকসনের দেবদাস। প্রযোজনা ও পরিচালনা বিমল রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাসে বিমল রায় ছিলেন চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন ভূমিকায়: দিলীপকুমার (দেবদাস), সুচিত্রা সেন (পার্বতী), বৈজয়ন্তীমালা (চন্দ্রমুখী), মতিলাল (চুনীলাল)। এ ছাড়া নাজির হোসেন, কানাইয়ালাল, নানা পালসিকর, প্রতিমা দেবী, বেবী নাজ, জনি ওয়াকার, প্রাণ ইত্যাদি। কলকাতায় মুক্তি পায় ১২. ১. ৫৬।

(১৫) কলকাতার এস বি প্রোডাকসন্স তুলেছিলেন শোভা, শুভদার হিন্দী। পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী। নামভূমিকায় সুনন্দা। অন্যান্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, অভি ভট্টাচার্য, মঞ্জু দে, শিখারাণী বাগ, বোম্বের সে যুগের জনপ্রিয় নায়িকা ঊষাকিরণ। কলকাতায় মুক্তি ২. ৫. ৫৮।

(১৬) বোম্বের আলোকভারতীর সওতোলা ভাই বৈকুণ্ঠের উইলের হিন্দী রূপান্তর। পরিচালনায় ছিলেন লোকান্তরিত মহেশ কাউল। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন গুরুদত্ত (গোকুল), প্রণতি ভট্টাচার্য (ভবানী), বিপিন গুপ্ত (বৈকুণ্ঠনাথ), রাজকুমার (বিনোদ), কানাইয়ালাল, এস এন ব্যানার্জী, অসিত সেন, বেলা বসু প্রমুখ। কলকাতায় মুক্তি পায় ৩.৪.৬২।

(১৭) মাদ্রাজের ভেনাস পিকচার্সের ছোটাভাই। রামের সুমতি অবলম্বনে। পরিচালনা কে. পি আত্মা। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নূতন সমর্থ, রেহমান, শ্রীমান মহেশ কুমার, ললিতা পাওয়ার, নাজির হোসেন,

জাগীরদার, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী ইত্যাদি। কলকাতায় মুক্তি পায় ১০. ২. ৭।

(১৮) মঝলি দিদি—বোম্বের কে. জি পিকচার্স। নবেন্দু ঘোষের চিত্রনাট্যে পরিচালনা করেছিলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রে মীনা কুমারী (হেমাঙ্গিনী)। অন্যান্য শিল্পী: ধর্মেন্দ্র (বিপিন), ললিতা পাওয়ার (কাদম্বিনী), বিপিন গুপ্ত (নবীন). শ্রীমান শচীন, লীলা চীৎনীস, কেষ্ট মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। কলকাতায় মুক্তি .৮. ৬. ৬৮।

(১৯) ডি লুক্স প্রোডাকসন্সের ছোটি বহু—বিন্দুর ছেলে অবলম্বনে। ছবিটি ঈস্টম্যান কলারে রঞ্জিত। শরৎসাহিত্যের প্রথম রঙীন চিত্ররূপ। পরিচালনা: কে বি তিলক। অভিনয় করেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, নিরূপা রায়, শ্রীমান সুরজ, মেহমুদ-জুনিয়র, আই এস জোহর, তরুণ বসু, শশিকলা ইত্যাদি। কলকাতায় এই ছবি প্রথম মুক্তি পায় ২৪. ৯. ৬১।

দক্ষিণী ভাষায় শরৎ-কাহিনীর চিত্ররূপ

দীর্ঘদিন আগে তেলুগুতে তোলা হয়েছিল দেবদাস। পরিচালক ছিলেন ওয়াই ভি রাও। প্রমথেশ বড়ুয়াব দেবদাসের সামান্য পরে এই ছবিটি তোলা হয় কলকাতায়। ইতিপূর্বে কোন একটি কাহিনী অবলম্বনে বাংলা, হিন্দী ও তেলুগু ছবি গৃহীত হয় নি। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজের নরসু স্টুডিওতে নতুন করে আবার তামিল ও তেলুগুতে দেবদাস গৃহীত হল। পরিচালনা বেদান্তম রাঘবিয়া। দেবদাস—এ নাগেশ্বর রাও, পার্বতী—সাবিত্রী। অন্যান্য চরিত্রে এম এম নাম্বিয়ার, এস সি রঙ্গরাও, ললিতা ইত্যাদি। উভয় সংস্করণই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বিন্দুর ছেলের তেলুগু রূপ "মুদ্দু বিদ্দা"। মাদ্রাজের অনুপমা ফিল্মসের এ ছবির পরিচালক তিলক। বিভিন্ন চরিত্রে যমুনা, নাগিয়া, জগ্‌গায়া, মাঃ ভেঙ্কটেশ্বর, রানা রেড্ডী ইত্যাদি।

ভারনী স্টুডিওতে তামিল ও তেলুগুতে তোলা হয় বড়দিদি। ছবির নাম হয় "কানাল নীড়" ও "বাটাসারী"। প্রযোজনা ও পরিচালনা রামকৃষ্ণ। রূপারোপে ভানুমতী, নাগেশ্বর রাও, দেবিকা, বি. আর. পান্তুলু, সওকার জানকী, জেওয়র সীতারাম, বিশ্বনাথন, সূর্যকান্তন ইত্যাদি।

রামের সুমতির তামিল রূপ "আন্নী" ও পরিণীতার তামিল চিত্ররূপ "মানা মালাই" আশাপ্রদ হয়নি।

ভারতের সীমারেখার বাইরেও শরৎকাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। দেবদাসের হিন্দী ও তামিল সংস্করণ সিংহলে প্রদর্শনের পর জনপ্রিয়তা লাভ করায় জনৈক স্থানীয় প্রযোজক এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে ইচ্ছুক হন। সিংহলের পটভূমিকায় দেবদাস জাতীর কাহিনী গড়ে তোলা হয়। এস. এম. নয়াগাম-এর পরিচালনায় ছবি 'রামায়লথা'—এককথায় সিংহলী দেবদাস—১৯৫৬ সালে প্রদর্শিত হয়। এ ছবিতে অভিনয় করেন স্থানীয় শিল্পী অরুণা, শান্তি, রীতা, রত্না, ইয়াকা, ক্লারিস ডি সিলভা।

শরৎচন্দ্রের 'ছবি' ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় লেখা। রেঙ্গুনে এই ছবির কিছু বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছিল। বাংলা 'ছবি' যখন তোলা হচ্ছিল রেঙ্গুনে সেই সময় রেঙ্গুনের এক প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান বর্মী ভাষায় 'ছবি' গল্পের এক চিত্ররূপ দেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় তোলা হয়েছিল 'দেবদাস'। প্রযোজনা ও পরিচালনায় ছিলেন সরফরাজ। লাহোরে গৃহীত এ ছবির সুর-সংযোজনা করেছিলেন আখতার হোসেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন নায়ার সুলতানা, মায়া দেবী, আজাদ, সাজ্জিদ, শামিল আরা, রাজিয়া, তালিশ, সাহারা, হাব্বি, রাণীকিরণ ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশে দেবদাস চিত্রায়িত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। উত্তরা ফিল্মসের পক্ষ থেকে এ ছবির নির্মাতা আজাহার ও শেখ আতাউর রহমান। সুর-সংযোজনায় থাকবেন খোন্দকার নুরুল আলম। দেবদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বাংলা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক রাজ্জাক।

মঞ্চে শরৎচন্দ্রের নাটক

(১) বিরাজ বৌ—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী অভিনয়ে শরৎচন্দ্রের প্রথম নাটক বিরাজ বৌ। গিরিমোহন মল্লিক তখন লেসি হয়ে স্টার থিয়েটারের ভার নিয়েছেন। তাঁরই চেষ্টায় রসরাজ অমৃতলাল বসুর পরিচালনায় স্টারের ১৯১৮ সালের ৩রা আগস্ট মঞ্চস্থ হল বিরাজ বৌ। প্রধান চরিত্রে দেখা দিলেন—তারক পালিত—নীলাম্বর, ক্ষেত্রমোহন মিত্র—পীতাম্বর, কুসুমকুমারী—বিরাজ, অমৃতলাল বসু—যদু, বসন্ত—সুন্দরী। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাট্যরূপ পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে গেছে, মুদ্রিত হয়নি।

২য় পর্যায়ে বিরাজ বৌ অভিনীত হয় নবনাট্য মন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায়। নাট্যরূপদাতার নামে শরৎচন্দ্রের উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে

নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অভিনয়ে ছিলেন নামভূমিকায় কঙ্কাবতী। শিশিরকুমার—নীলাম্বর, রাণীবালা—মোহিনী, পীতাম্বর—প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়—নিতাই, রাধারাণী—সুন্দরী। ১ম অভিনয় ২৮. ৭ ৩৪। তৃতীয় পর্যায়ে বিরাজ বৌ অভিনীত হল হাওড়ার "শীষমহল" থিয়েটারে। উদ্বোধন ৭ ৬ ৬৯। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা বিধায়ক ভট্টাচার্য। অভিনয়ে তৃপ্তি মিত্র—বিরাজ, তরুণকুমার—নীলাম্বর, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়—পীতাম্বর, শিখা ভট্টাচার্য—ছোট বৌ, ভানু বন্দ্যোপোধ্যায়—জমিদার।

(২) ষোড়শী—শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসকে প্রথমে নাটকে রূপান্তরিত করে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেন শিবরাম চক্রবর্তী। পরবর্তী কালে শিশিরকুমারের অনুরোধে স্বয়ং শরৎচন্দ্র "ষোড়শী" নাটক করেন। নাট্যমন্দিরে ১৯২৭ সালের ৬ই অগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে ষোড়শী। পরিচালনায় ছিলেন শিশিরকুমার। অভিনয়ে শিশিরকুমার—জীবানন্দ, চারুশীলা—ষোড়শী, সাগর সর্দার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল—রবি রায়, জনার্দন—যোগেশ চৌধুরী, নির্মল—শৈলেন চৌধুরী, এককড়ি—গোপাল ভট্টাচার্য, শিরোমণি—অমলেন্দু লাহিড়ী পরে কঙ্কাবতীও দীর্ঘদিন ষোড়শীরূপে দেখা দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মঞ্চসফল নাট্যরূপ বলতে ষোড়শীকেই বোঝায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'জীবানন্দ' অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। বিখ্যাত অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও জীবানন্দরূপে দেখা দিয়েছিলেন কয়েকবার।

(৩) রমা—"পল্লীসমাজ" নামে প্রথম অভিনীত হয় ৫. ৮. ২৭ স্টার থিয়েটারে। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী—রমেশ, নীহারবালা—রমা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—বেণী, তারাসুন্দরী জ্যাঠাইমা, প্রফুল্ল সেন—গোবিন্দ। পরবর্তী পর্যায়ে অভিনীত হয় নাট্যমন্দিরে "রমা" নামে। অভিনয়ে শিশিরকুমার—রমেশ, প্রভা—রমা, কঙ্কাবতী—জ্যাঠাইমা, যোগেশ চৌধুরী—গোবিন্দ, অমলেন্দু লাহিড়ী—ধর্মদাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—বেণী, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়—আকবর সর্দার। বর্তমানে এই নাট্যরূপই সকলে অভিনয় করেন।

(৪) বিজয়া-দত্তা উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাটক করেছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী—রাসবিহারী, কঙ্কাবতী—বিজয়া'

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—নরেন, শৈলেন চৌধুরী—বিলাস, রাণীবালা—নলিনী, শীতল পাল—দয়াল, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—পরেশ। প্রথম অভিনয়ের দিনটি ছিল ১২. ১২. ৩৪.।

(৫) মিনার্ভা থিয়েটারে চন্দ্রনাথ প্রথম অভিনীত হয় অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায়। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনয়ে শরৎ চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রনাথ, অহীন্দ্র চৌধুরী—কৈলাস, রেণুবালা (সুখ) ও আসমানতারা—সরযূ, চারুশীলা—সুলোচনা, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—মণিশঙ্কর, ব্রজেন সরকার—রাখাল, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়—ব্রজকিশোর, বেদানা—হরকালী, গণেশ গোস্বামী—হরিদয়াল। উদ্বোধনরজনী ৩. ৯. ৩১। নবপর্যায়েও চন্দ্রনাথ অভিনীত হয় মিনার্ভাতে। এবার নাট্যরূপ দেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। উদ্বোধন ২৩. ৩. ৫১। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা দেন ছবি বিশ্বাস—চন্দ্রনাথ, সরযূবালা—সরযূ, অহীন্দ্র চৌধুরী—কৈলাস, নরেশচন্দ্র মিত্র—দয়াল, অর্পণা—সুলোচনা। শেষোক্ত নাট্যরূপেই বর্তমান চন্দ্রনাথ অভিনীত হয়।

(৬) চরিত্রহীন—প্রথম অভিনীত হয় রঙমহলে। নাট্যরূপ—যোগেশ চৌধুরী। পরিচালনায়—সতু সেন, নরেশচন্দ্র মিত্র। অভিনয়ে শান্তি গুপ্তা—কিরণময়ী, শেফালিকা (পুতুল)—সাবিত্রী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—উপেন, যোগেশ চৌধুরী—শিবপ্রসাদ, ধীরাজ ভট্টাচার্য—দিবাকর, নরেশচন্দ্র মিত্র—বিহারী / হারাণ, সুহাসিনী—সুরবালা, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়—সতীশ। উদ্বোধন ২০. ১২. ৩৫।

(৭) অচলা—গৃহদাহের নাট্যরূপ। নাট্যরূপদাতা সম্ভবত যতীন্দ্রনাথ রায়। নবনাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হয়। পরিচালনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ব্যর্থ নাটক—প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুদিন অভিনয়ের পর আর অভিনীত হয়নি। অভিনয়ে কঙ্কাবতী—অচলা, শিশিরকুমার ভাদুড়ী—সুরেশ। শৈলেন চৌধুরী—মহিম। এই নাটকটি স্বল্পদিনই অভিনীত হয়েছিল। এই নাট্যরূপে আর অভিনয় হয় না।

(৮) পথের দাবী—নাট্য নিকেতনে প্রথম অভিনয় ১৩ই মে ১৯৩৯। নাট্যরূপ—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পরিচালনায়—সতু সেন ও অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনয়ে সব্যসাচী—অহীন্দ্র চৌধুরী, শশী—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, থেন মং—ছবি বিশ্বাস, নিমাই—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা—প্রভা, ভারতী—শেফালিকা (পুতুল), অপূর্ব—ভূপেন চক্রবর্তী, তলোয়ারকর—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালের ৯ই মে ইংরাজ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করে

পথের দাবীর অভিনয় বন্ধ করে দেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর নবপর্যায়ে পথের দাবীর অভিনয় শুরু হয় রঙমহলে। এবার সব্যসাচীরূপে আবির্ভূত হন কমল মিত্র। এখনও বিশিষ্ট শিল্পীর সমন্বয়ে পথের দাবীর সম্মিলিত অভিনয় হয়।

(৯) দেবদাস—নাট্যভারতী (অধুনা লুপ্ত)। নাট্যরূপ—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৯৪৩ সালে প্রথম অভিনীত হয়। দেবদাস—জহর গাঙ্গুলী, পার্বতী—সরযূবালা, ধর্মদাস—রবি রায়, ভুবন চৌধুরী···বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, চুনীলাল—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, দ্বিজদাস—বেচু সিং, বসন্ত—নরেশচন্দ্র মিত্র। পরবর্তীকালে মিনার্ভাতে দেবদাস রূপে দেখা দিতেন ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রমুখী—রাণীবালা।

(১০) বিপ্রদাস—শ্রীরঙ্গম (বর্তমানে বিশ্বরূপা)। নাট্যরূপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে প্রথম অভিনীত হয়। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—বিপ্রদাস, মলিনা—বন্দনা, মিহির ভট্টাচার্য—দ্বিজদাস, রঞ্জিত রায়—শশধর, শৈলেন চৌধুরী—রায়-সাহেব, নিভাননী—কৃপাময়ী। অধুনা লুপ্ত কালিকা থিয়েটারে বিপ্রদাস—নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজদাস—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১) বিন্দুর ছেলে—শ্রীরঙ্গম। নাট্যরূপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরি-চালনা—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। প্রথম অভিনয় ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪। সাবিত্রী—বিন্দু, প্রভা—অন্নপূর্ণা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—যাদব।

(১২) বৈকুণ্ঠের উইল—অধুনা লুপ্ত কালিকা থিয়েটারের উদ্বোধনী নাটক। নাট্যরূপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা—নরেশচন্দ্র মিত্র। প্রথম অভিনয় ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭। মলিনা—ভবানী, জ্যোতির্ময়কুমার—গোকুল, ধীরাজ ভট্টাচার্য—বিনোদ, নরেশচন্দ্র মিত্র—নিমাই রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়—বৈকুণ্ঠ, রঞ্জিত রায়—হারাণ, ফণী রায়—জয়লাল।

(১৩) মেজদিদি—কালিকা থিয়েটার। নাট্যরূপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য। মলিনা—হেমাঙ্গিনী, নরেশচন্দ্র মিত্র—নবীন, ধীরাজ ভট্টাচার্য—বিপিন. রঞ্জিত রায়—বৃন্দাবন, ফণী রায়—কবিরাজ, ইন্দু মুখোপাধ্যায়—দেবু।

(১৪) কাশীনাথ—মিনার্ভা থিয়েটার। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। ছবি বিশ্বাস—কাশীনাথ, সরযূবালা—কমলা, অহীন্দ্র চৌধুরী—প্রিয়নাথ, সন্তোষ সিংহ—দেওয়ান, শ্যাম লাহা—নতুন ম্যানেজার।

(১৫) রামের সুমতি—রংমহল। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রথম অভিনীত হয় ২ শে জুন ১৯৪৪। রাম—বুদ্ধদেব, নারায়ণী—সুহাসিনী,

শ্যামলাল—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি ডাক্তার—অহীন্দ্র চৌধুরী, দিগম্বরী—প্রভা।

(১৬) **অনুপমার প্রেম—রংমহল। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। অহীন্দ্র চৌধুরী—জগবন্ধু, শরৎ চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রনাথ,** মিহির ভট্টাচার্য—**ললিত, তুলসী চক্রবর্তী—সনাতন।**

(১৭) **স্বামী—সুন্দরম** (কোরিন্থিয়ান থিয়েটার—বর্তমানের অপেরা সিনেমা)। নাট্যরূপ—অমর বসু। পরিচালনা—ছবি বিশ্বাস। ছবি বিশ্বাস—ঘনশ্যাম, সরযূবালা—সৌদামিনী, মিহির ভট্টাচার্য—নরেন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রজ, সন্তোষ সিংহ—বঙ্কু।

(১৮) নিষ্কৃতি—রংমহল। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। উদ্বোধন ২. ১০. ৫১। জহর গঙ্গোপাধ্যায়—গিরিশ, ভানু চট্টোপাধ্যায়-হরিশ, প্রভা—সিদ্ধেশ্বরী, রাণীবালা—নয়নতারা, ঝর্ণা—শৈলজা, অবনী মজুমদার—রমেশ, সুখেন—অতুল।

(১৯) পরিণীতা—স্টার থিয়েটার। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—ললিতা, অসিতবরণ—শেখর, জহর গঙ্গোপাধ্যায়—নবীন, সন্তোষ সিংহ—গুরুচরণ, সরযূবালা—মা, নবকুমার, অনুপকুমার—মিহির ভট্টাচার্য।

(২০) পণ্ডিত মশাই—রংমহল। নাট্যরূপ—অবিনাশ ঘোষাল (?)। প্রথম অভিনীত হয় ৭. ৬. ৫১। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন কুঞ্জ—জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কুসুম—মলিনা, বৃন্দাবন—ভূপেন চক্রবর্তী, বৃন্দাবনের মা—প্রভা, ব্রজেশ্বরী—রাণীবালা, চরণ—মঞ্জু, কেশব—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২১) শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব)—স্টার থিয়েটার। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। উদ্বোধন ৭. ১. ১৯১৭।

শ্রীকান্ত—মাঃ শান্তিগোপাল, নির্মলকুমার, ইন্দ্রনাথ—সুখেন, অন্নদাদি—অপর্ণা, অভয়া—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নতুনদা—অনুপকুমার, শাহজী—কৃষ্ণধন, রাজলক্ষ্মী—শিপ্রা, রতন—তুলসী চক্র, নন্দ—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২২) রাজলক্ষ্মী—(৩য় ও ৪র্থ পর্ব)—স্টার থিয়েটার। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রথম অভিনয় ২. ৬. ৫৮।

রাজলক্ষ্মী—শিপ্রা, শ্রীকান্ত—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্ন ঠাকুর্দা—জহর গঙ্গোপাধ্যায়, গহর—প্রশান্তকুমার, কমললতা—মিতা চ্যাটার্জি, ব্রজানন্দ—অনুপ—কুমার, রতন—তুলসী চক্রবর্তী।

শরৎ-নাট্যাভিনয়ে শৌখীন সম্প্রদায়েরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

বহুবাজারের আনন্দ পরিষদ নামে এক শৌখীন নাট্যসম্প্রদায় প্রথম শরৎ-সাহিত্যের নাট্যরূপ দেন। আনন্দ পরিষদের পরিচালক লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্রের যত্নে ও চেষ্টায় দেবদাস, গৃহদাহ, পণ্ডিত মশাই, চরিত্রহীন, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাট্যকারে রূপান্তরিত হয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্যগৌরবে অভিনীত হয়। আনন্দ পরিষদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ মঞ্চে শরৎ-নাট্যাভিনয় শুরু করার ব্যবস্থা করেন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ। শৌখীন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন অফিস ক্লাব নিয়মিত না হলেও প্রায়ই আসরে আসেন শরৎচন্দ্রের নাটক নিয়ে। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে শৌখীন নাট্যাভিনয়ের বেশ একটা বড় অংশ জুড়ে আছেন শরৎচন্দ্র। পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয় না, মূলত অপেশাদার সংস্থায় যেসব শরৎকাহিনী অভিনীত হয় তা হল: মহেশ, শেষপ্রশ্ন, শুভদা, বড়দিদি, শেষের পরিচয়, ছবি, বিলাসী, নববিধান, অভাগীর স্বর্গ, বামুনের মেয়ে, পথনির্দেশ, অরক্ষণীয়া। অধিকাংশই অবশ্য পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে আছে। বহুল-অভিনীত নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় শৌখীন সম্প্রদায়েরা নতুনভাবে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করে থাকেন। সেজন্যে চরিত্রহীন অভিনীত হয়েছে কিরণময়ী, যোগবিয়োগ ইত্যাদি নামে, পথের দাবী ভারতী নামে, মহেশ গফুর নামে। অপেশাদার সংস্থার যেসব শরৎ-নাটক অভিনীত হয়, সেই সব নাটকের নাট্যরূপদাতার নামের তালিকায় যে কয়েকজনের নাম প্রথমেই মনে পড়ে তাঁরা হলেন: সন্তোষ সেন—শেষপ্রশ্ন, সুললিত গোস্বামী, হারু রায়—শুভদা, শচীন মুখোপাধ্যায়, মণি দত্ত—বড়দিদি, অতীন মজুমদার, প্রভাংশু সেনগুপ্ত—মহেশ ইত্যাদি।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় শরৎ-নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে।

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নৃত্যনাট্যরূপও দেওয়া হয়েছে। মূকাভিনয়ের মাধ্যমেও শরৎসাহিত্যকে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেছে।

যাত্রায় শরৎ-সাহিত্যের উপস্থিতি মাত্র কিছু দিন আগে। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা অবলম্বনে যাত্রানাটক করার যে প্রবণতা দেখা গেছে সেই সূত্রে শরৎকাহিনীর প্রথম যাত্রারূপ শ্রীমা নাট্যকোম্পানীর বৈকুণ্ঠের উইল। পরবর্তী কালে যেগুলি যাত্রা-নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে তা হল:

(১) বিন্দুর ছেলে: নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি। পালা—ব্রজেন্দ্রকুমার দে। যাদব—কমল মিত্র। অন্নপূর্ণা—ফণী ভট্টাচার্য। বিন্দু—ক্ষেত্রমোহন। এলোকেশী—শতদল।

(২) চন্দ্রনাথ—নট্টকোম্পানী যাত্রাপার্টি। পালা : সত্যপ্রকাশ দত্ত। পরিচালনা—মহেন্দ্র গুপ্ত।

(৩) দেবদাস—নিউ আর্য অপেরা। পালা : সত্যপ্রকাশ দত্ত। স্বপনকুমার।

(৪) শুভদা—ভারতী অপেরা। পালা : ব্রজেন্দ্রকুমার দে। পরিচালনা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। শুভদা—বন্দনা দেবী।

(৫) চরিত্রহীন—জনতা অপেরা। পালা : আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না চক্রবর্তী, চিত্রা মল্লিক।

(৬) পথের দাবী—নিউ আর্য অপেরা। পালা : সত্যপ্রকাশ দত্ত। সব্যসাচী—স্বপনকুমার।

(৭) দেনাপাওনা—নাট্যভারতী। পালা : সত্যপ্রকাশ দত্ত। স্বপন-কুমার—জীবানন্দ, স্বপ্নাকুমারী ষোড়শী। লিলি মণ্ডল—প্রফুল্ল।

(৮) বিপ্রদাস—দি কমলা অপেরা। পালা : গৌতম মুখার্জী। বিপ্রদাস—বিজন মুখার্জী। বন্দনা-ঝর্ণা চৌধুরী। দ্বিজদাস —প্রণয়কুমার।

আগামী দিনে যাত্রার আসরে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে : শ্রীকান্ত (নট্ট কোম্পানী, পালা : ব্রজেন্দ্রকুমার দে), পল্লীসমাজ (শ্রীমা অপেরা—পালা : গোপাল চট্টোপাধ্যায়), বিপ্লবী শরৎচন্দ্র (আনন্দলোক। পালা : অরুণ রায়)

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে শরৎচন্দ্র নাট্যকার নন। বাজারে প্রচলিত চারটি নাটকের রচয়িতা বলে তাঁর নামের উল্লেখ অবশ্য আছে। এর মধ্যে চারটিই তাঁর স্বকৃত নাট্যরূপ কিনা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। বিভিন্ন সময়ে লেখা পত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হচ্ছে "আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। তাঁদের রায়ই হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। সুতরাং এ বিপদের মধ্যে ঢুকে পড়তে খামোকা মন চায় না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়তো লিখতে পারি। কিন্তু আশা বড় করি নে।"

শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' শব্দটির প্রয়োগ দীর্ঘ-দিন থেকে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয়-কালে প্রথম এই কথাটির প্রবর্তন করেন বিজ্ঞাপনে। আজও এই শব্দটি সগৌরবে ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বত্র।

দেশের খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সব শিল্পীই শরৎনাটকে অভিনয় করেছেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষের ইতিহাসে অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় সগৌরবে

অধিষ্ঠিত আছেন শরৎচন্দ্র। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, তা সত্ত্বেও আজও শরৎচন্দ্রের নাটক দর্শককে অভিভূত করে।

মঞ্চে শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনীত হয়েছে, সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে নাটক অভিনয় করেছেন শৌখীন সম্প্রদায়। শরৎকেন্দ্রিক প্রথম অভিনীত নাটক নন্দদুলাল চক্রবর্তীর 'শরৎচন্দ্র'। শরৎচন্দ্রের জীবনের শৈশব থেকে বর্মা যাত্রার ঘটনাবলী অবলম্বনে নাটক সত্যকাম সরস্বতীর 'নির্জন স্বাক্ষর'। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তত্ত্বগত মতবিরোধ নিয়ে দুই স্রষ্টার কয়েকটি চরিত্রকে উপস্থাপিত করে এবং আসামী রূপে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে দাঁড় করিয়ে নাটক 'কালের বিচার'। নাট্যকার বঙ্কিমচন্দ্র দাস।

শরৎসাহিত্যের অভিনয়ের প্রসঙ্গ উঠলে বেতারে শরৎ-নাট্যাভিনয়ের কথাও বলা উচিত। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি রচনাই বেতারে অজস্রবার অভিনীত হয়েছে। বহু নাটকই শুধু কলকাতা বেতার কেন্দ্রেই নয়, সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। গ্রামোফোন রেকর্ডেও শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নাটক আছে।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও আজও রূপলোকে শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী বিশেষ ভাবে মনে আসে। রবিবাসরে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মোৎসবে বিশ্বকবি স্বয়ং উপস্থিত থেকে যে লিখিত ভাষণ দেন তার একটি অংশে বলা হয়েছে যে, "শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"

শরৎ-সাহিত্যে নারী

ড. অজিতকুমার ঘোষ

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নারীচরিত্রগুলিও কোনো দূরবর্তী রোমান্সের স্বর্ণ-কুহেলিমণ্ডিত জগতের অধিবাসিনী নয়, কিংবা আদর্শরঞ্জিত কোনো কল্পলোকবিহারিণী নয়; তারা পরিচিত বাস্তব জগতের সামাজিক বিধিব্যবস্থা, পারিবারিক আচার ও আচরণ এবং অর্থনৈতিক বাধা ও বশ্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলার নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ অবস্থা আলোচনা করলে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির বাস্তব পটভূমি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

যে সমাজের অভিজ্ঞতা শরৎ-সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে তা হল ভূমি-স্বত্বজীবী যৌথ পরিবারকেন্দ্রিক পল্লীসমাজ। তখনও শিল্পের প্রসার হয়নি; সেজন্য শিল্পাশ্রয়ী নাগরিক জীবন যেমন সংকুচিত ছিল, তেমনি বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনজনিত আর্থিক প্রাচুর্য এবং শিল্পের অধীন বিচিত্র বৃত্তি গ্রহণের ফলে বহু লোকের সচ্ছল জীবনযাপনের সুযোগ সমাজের মধ্যে ছিল না। জমিদারতান্ত্রিক সমাজে বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুঞ্জীভূত হয়েছিল শোষণজীবী কয়েকটি জমিদার পরিবারের মধ্যে। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত, বিনা পরিশ্রমে লব্ধ, অনর্জিত সম্পদের অধিকারী হয়ে তারা বহু ক্ষেত্রে হয়ে উঠত খেয়ালী, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত ও অত্যাচারী। শরৎ-সাহিত্যে এ ধরনের জমিদার-চরিত্র পাওয়া যায় রাজেন্দ্রকুমার (বিরাজ বৌ), দেবদাস, জীবানন্দ, সতীশ ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে। মুষ্টিমেয় জমিদারশ্রেণী ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ লোক ছিল স্বল্পবিত্তভোগী জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী, ভূমির সামান্য উপস্বত্বজীবী অসচ্ছল গৃহস্থ, পুরোহিত দোকানদার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনমণ্ডলী, যথা, ভূমিহীন কৃষক, তাঁতী, জেলে, জনমজুর এবং গ্রাম্য বৃত্তিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী। এরা দারিদ্র্যের নির্মম আঘাতে পিষ্ট; জমিদার, জোতদার অথবা মহাজনদের দ্বারা উৎপীড়িত; অশিক্ষা, কুসংস্কার ও রোগব্যাধিতে অভিশপ্ত। এই হতভাগ্য মানুষগুলির পরিচয় পাওয়া যায় পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে, দেনাপাওনা প্রভৃতি রচনায়। ভূমি-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়

পল্লীজীবনের যুগযুগবাহিত আচার- ও সংস্কার-সর্বস্ব সংকীর্ণ ধর্মধারা, যুক্তি-হীন, অনড় বিধিনিষেধ ও প্রথা-অনুশাসন, এবং অলঙ্ঘ্য বর্ণবৈষম্যের অচ্ছেদ্য নাগপাশ তখন সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল। তখন নাগরিক জীবনযাত্রা কলকাতা এবং আরও দু-একটি বড় শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে-ছিল। তার মূলে যন্ত্রশিল্পের প্রভাব ছিল না, তা সরকারী ও সওদাগরী অফিসের কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখনকার শহরবাসীদের অনেকেরই জীবিকা পল্লীগ্রামের ভূমির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। দেবদাস, সতীশ, জীবানন্দের মতো অনেক জমিদারই পল্লীর জমিদারির উপর নির্ভর করে কলকাতায় বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। কলকাতার কেরানী ও স্বল্পবেতনভোগী চাকরিজীবীদের অনেকেই শুধু চাকরি উপলক্ষে কলকাতায় থাকত, কিন্তু গ্রামের সঙ্গেই তাদের স্থায়ী ও অচ্ছেদ্য যোগ ছিল। সুতরাং তখনকার শহরবাসীও গ্রামকেন্দ্রিক বৃহত্তর সমাজব্যবস্থারই অধীন ছিল। বর্ণাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ও চিরনির্দিষ্ট প্রথা- ও অনুশাসন-বদ্ধ জীবনযাপনপ্রণালী প্রায় একইভাবে গ্রামে ও শহরে বর্তমান ছিল।

উপরে বর্ণিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাঙালী নারীর জীবন যে কতখানি সংকুচিত পরাধীন ও বাধানিষেধে কণ্টকিত ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র আত্ম-বিকাশের সুযোগ ছিল না, সেজন্য বাধ্য হয়ে তাকে পুরুষশাসিত যৌথ পারি-বারিক জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে হত। তার কাছ থেকে সমাজ ও পরিবার শুধু কেবল আদায় করতেই চাইত, বিনিময়ে তাকে দিতে চাইত না কিছুই। সে কী পরিমাণে পতিব্রতা, সহিষ্ণু ও সেবাপরায়ণা, তার উপরেই তার মূল্য নির্ভর করত। শরৎচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেছেন, "নারীর মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া মানুষের কি পরিমাণে সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতকটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন।" (নারীর মূল্য) রমা ও বিজয়ার মতো ভূম্যধিকারিণী নারী তখন সমাজে বেশি ছিল না। মনে রাখতে হবে, ওই দুটি নারীচরিত্রের মধ্যে যে তেজস্বিতা ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা গেছে, তার মূলে রয়েছে তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা। নিদারুণ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে নারীর প্রত্যাশিত স্বাভাবিক জীবনধারা যে কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত মেলে বিরাজ, অভয়, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। শরৎচন্দ্র যে বাঙালী বিধবার চরিত্র অপরিসীম

সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন, তার দুঃখ-দুর্গতির মূলে রয়েছে তার অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অক্ষমতা। শরৎচন্দ্রের কথায়, "আবার ভদ্রঘরের বিধবার অবস্থা ঠিক নীচজাতীয় সধবার অনুরূপ। তাহাকেও স্বাধীনভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে দেওয়া হয় না। কারণ তাহাতে পিতৃকুলের বা শ্বশুরকুলের মর্যাদাহানি হয়, অথচ বাড়ির মধ্যে ভদ্র বিধবার অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই।" (নারীর মূল্য) স্বাধীনভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো উপায় না থাকাতে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীকে পিতৃকুল অথবা শ্বশুরকুলের পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতে হত। সেখানে তারা স্নেহের দাবি নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পদে পদে বিড়ম্বিত হত এবং সংসারের মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত জটিলতা ও অনর্থ সৃষ্টি করত। তাদের বঞ্চিত ও অসম্মানিত ব্যক্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও তিক্ত কলহে প্রকাশ পেত। কিন্তু তাদের সর্বপ্রকার হীন আচরণ এবং শাণিতরসনা-নিঃসৃত বিষবাক্য প্রয়োগের মূলে তাদের বঞ্চিত ও ব্যগ্র অধিকারলিপ্সা সত্তাই বর্তমান ছিল, এ-কথা চিন্তা করলে তাদের প্রতি করুণাই উদ্রিক্ত হয়। রামের সুমতির দিগম্বরী, বিন্দুর ছেলের এলোকেশী, পল্লীসমাজের মাসী, অরক্ষণীয়ার স্বর্ণমঞ্জরী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে। সমাজের বিধিনিষেধ ও শাস্তিবিধান নারী সম্পর্কেই বেশি সক্রিয় ছিল। নারীর সামান্যতম দোষত্রুটিও তখন ক্ষমা পেত না। তাই একটু-আধটু দুর্বলতা ও শিথিলতা নারীচরিত্রে প্রকাশ পেলেই তাকে অনপনেয় কলঙ্কে চিহ্নিত হতে হত। অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কমললতা প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করবার পিছনে নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং ক্ষমাহীন বিধানের দায়িত্ব ছিল অনেকখানি। কৌলীন্য ও পণপ্রথা যেমন বহুক্ষেত্রে বিবাহে দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে দেখা দিত, তেমনি বিবাহব্যাপারে নারীর সম্পূর্ণ উপায়হীন পরবশ্যতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের অসম ও অবাঞ্ছিত বিবাহে আবদ্ধ হতে হত এবং এর অনিবার্য পরিণতিরূপেই আত্মহত্যা, কুলত্যাগ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দেখা দিত।

গ্রাম্যসমাজের নারীর কিরূপ অবস্থা ছিল তা উপরে আলোচনা করা হল। এই নারীসমাজের পাশে শহরে আর-এক শ্রেণীর শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা, আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদিনী নারী ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরা স্কুল-কলেজে পঠন পাঠন শুরু করেছিল, সমাজসেবা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মেও কিছু কিছু যোগদান করেছিল। চিন্তা ও বুদ্ধিতে পরিশীলিত, কথা ও

আচরণে অকুণ্ঠিত মানসিক দৃঢ়তায় দৃপ্ত এ-সব নারীর প্রতিও শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বিজয়া, অচলা, সরোজিনী, বন্দনা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শরৎ-সাহিত্যে নারীচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে নারীসমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সমাজের রীতিনীতি ও বিধিবিধানগুলি অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতে পারেন নি। তিনি যেমন একদিকে সেগুলির যুক্তিযুক্ততা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সমাজের অন্যায়-অবিচারে মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদ ও সহানুভূতি বোধ করেছেন। অর্থাৎ, সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কিছুটা মননশীল ভাবনা এবং কিছুটা হৃদয়গত বেদনাসিক্ত অনুভূতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর মূল্য, সমাজধর্মের মূল্য প্রভৃতি প্রবন্ধে, তাঁব বহুতর ভাষণে এবং শ্রীকান্ত (১ম ও ২য়), চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব অসংখ্য উক্তি এবং চরিত্রগুলির মুখ থেকে নির্গত নানা স্পষ্ট ও জোরালো মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাজ সম্পর্কে তাঁর সচেতন ভাবনা ও মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি ঘটনা-উপস্থাপনা ও চরিত্রচিত্রণের মধ্যে তাঁর করুণার্দ্র চিত্তের অফুরন্ত দরদও পরিস্ফুট হয়েছে। নারী সম্পর্কে সমাজের চিরবদ্ধমূল ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। তিনি একজায়গায় বলেছেন, "জীবনের সত্যকে যত বড় কবিই হউক, লঙ্ঘন করিতে পারেন না; নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা যে কত মিথ্যা, তাহা আমি জানি বলিয়াই কোন কবি, বিশেষ করিয়া যিনি খুব বড় কবি বলিয়াই সম্মান পাইয়া থাকেন তাঁহার লেখার দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে—নারীর জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তাহাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাতে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা কবিকল্পনার গৌরব কোথায়?' (জীবনদর্শনে শরৎচন্দ্র) শরৎচন্দ্র তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, পুরুষশাসিত সমাজে অকারণে অথবা নিতান্ত তুচ্ছ কারণে নারীর কলঙ্ক প্রচারিত হয়। সেজন্য সেই কলঙ্কে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, 'নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।' (শ্রীকান্ত ১ম)। অন্নদা দিদির মত অনেক নারীই আসলে মোটেই কলঙ্কিনী নয়, কিন্তু চিরকাল তারা দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় বয়ে

চলে। যেখানে নারী সত্যই কলঙ্কিত হয় সেখানেই সেই কলঙ্কের জন্য দায়ী নারীমাংসলোলুপ প্রতারক পুরুষ সমাজ। জ্ঞানদা (বামুনের মেয়ে), সাবিত্রী-কমললতার মত কত সরল ও অনুগত মেয়ে পুরুষের সর্বগ্রাসী লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে চিরকলঙ্কের টীকা কপালে নিয়ে সমাজ থেকে বিলুপ্তির অন্ধকারে ছিটকে পড়েছে। নারীর এই ধরনের কলঙ্ককে শরৎচন্দ্র কলঙ্ক বলে বিশ্বাস করেননি। সমাজের যে নীতিবোধ ও ধর্মবোধের দৃষ্টিতে নারীর এই ধরনের দুর্ভাগ্য কলঙ্করূপে প্রতিভাত হয় সেই নীতিবোধ ও ধর্মবোধ সম্বন্ধেই তিনি প্রশ্ন ও প্রতিবাদ তুলেছেন। নীতিবোধ তো পরিবর্তনীয়, 'আজ যেটা নীতি, ভালমন্দের যে মাপকাঠি দিয়ে তাকে বিচার করা হচ্ছে কাল যে সে বদলে যাবে না তাই বা কে জানে?' (প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য-সভায় ভাষণ)।

নারী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক বক্তব্য হল এই যে তিনি সতীত্ব অপেক্ষা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে শ্রেষ্ঠতর বলেছিলেন। 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম।···সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?' (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি) হিন্দুসমাজে নারীর পুনর্বিবাহ স্বীকৃত নয় বলে শাস্ত্রে সমাজে ও সাহিত্যে নারীর সতীত্বকেই তার শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রই বোধহয় সর্বপ্রথম নারীর সব অবস্থাতেই তার সতীত্বই একমাত্র অত্যাজ্য ধর্ম কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ও বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। অভয়া, কিরণময়ী ও কমলের মধ্য দিয়ে এই দুঃসাহসিক সমাজবিপ্লবের মতবাদই ব্যক্ত করেছেন। অভয়া এক জায়গায় বলেছে: 'একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য আর সমস্তই একেবারেই মিথ্যা? এত বড় অন্যায় এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার, কিছুই একেবারে আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ সংসার আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয় মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?' (শ্রীকান্ত ২য়)

নিষিদ্ধ নারীচরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ বেশি ছিল বটে কিন্তু তাঁর

কোনো গোঁড়ামি কিংবা একপেশে মনোভাব ছিল না। তাই তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহের অগ্নিধ্বজাবাহী নারীচরিত্রের পাশে সনাতন-আদর্শসর্বস্ব নারীকে দেখতে পাই। সংসারের সীমানার মধ্যে যে নারী সুখে-দুঃখে কাজেকর্মে এবং সহজ দেনাপাওনার মধ্য দিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপন করে, এবং যে নারী সংসারচ্যুত ও সমাজত্যক্ত, অপমানে লাঞ্ছনায় বেদনায় অশ্রুজলে গড়া কলঙ্কিত বিষাদের প্রতিমূর্তি—উভয়কেই তিনি সমান সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। নীরব কষ্টভোগকে কেউ জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছে, অনির্বাণ দহনজ্বালায় কেউ অহরহ দগ্ধ হয়েছে, অপমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউ বজ্রাগ্নিশিখার তেজ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা সকলেই এসে ভিড় করেছে শরৎ-সাহিত্যের আঙিনায়। বিচিত্ররূপিণী নারীকে সেখানে দেখলাম—কন্যা প্রেয়সী জায়া জননী ভর্তৃহীনা স্বাধীনভর্তৃকা বারবধূ ইত্যাদি। সকলের প্রতিই লেখকের সমান কৌতূহল সমান আকর্ষণ সমান দরদ।

শরৎ-সাহিত্যে যে নারীচরিত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আলোচনা করা যেতে পারে সেই শ্রেণীর নারীদের নিয়ে যারা সমাজের চিরাচরিত আদর্শ ধ্রুব বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে আছে। বিরাজ অন্নদা দিদি সুরবালা মৃণাল প্রভৃতি চরিত্রকে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এরা পাতিব্রত্যকেই পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করেছে, স্বামী এদের কাছে জীবনের অংশীদার নয়, আরাধ্য দেবতা ; এদের সুখ-দুঃখ, বাসনা-কামনা সবকিছু স্বামীর সেবায় ও পরিবারের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, কিছু করা নয় হওয়ার লক্ষ্যেই এদের জীবন নিবেদিত। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক জায়গায় সমালোচনা করেছেন কিন্তু এই সব চরিত্রচিত্রণে তিনিও প্রচলিত সমাজনীতি রক্ষা করে চলেছেন। সামান্য ভুলের জন্য বিরাজকে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা কম কঠোর নয়। উপন্যাসের শেষদিকে ভুবনমোহিনী বিরাজের যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটেছে তাতে উৎকট নৈতিকতাজনিত অমানুষিক শাস্তির চিত্রই ফুটে উঠেছে। অন্নদাদিদির জীবনও আত্মবিলোপী স্বামী-ভক্তির মহিমায় প্রদীপ্ত কিন্তু পাষণ্ড নারীঘাতী স্বামীর জন্য তার সর্বত্যাগী ভালোবাসার মূল্য কোথায় এ প্রশ্ন মনের মধ্যে দেখা দেয়। নারী যে কতখানি সহনশীলা ক্ষমাপরায়ণ ও পতিব্রতা হতে পারে তার দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র অন্নদা চরিত্রের মধ্যে দেখিয়েছেন। অথচ সমাজের চোখে সে কুলত্যাগিনী ভ্রষ্টা নারী ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজের বিচার কতখানি ভ্রান্ত, সতী-অসতীর ধারণা কতখানি অসংগত তা এই চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুরবালা চরিত্রটির মধ্যে সহজ বিশ্বাসের অটল শক্তি, ঐকান্তিক স্বামী-ভক্তির অবিচল

আত্মতৃপ্তি এবং তর্কাতীত নিষ্ঠার এক পরম শান্তি ফুটে উঠেছে। চরিত্রহীন উপন্যাসে জ্বলন্ত অগ্নিশিখারূপিণী কিরণময়ীর পাশে চিরস্বীকৃত নীতি ও আদর্শের বেদীতে নিবেদিতা সুরবালাকে কিভাবে শরৎচন্দ্র এতখানি আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে গড়ে তুললেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। গৃহদাহের মৃণালের চিত্তে মহিম সম্পর্কে শুধু কেবল নির্দোষ স্নেহের ভাবই ছিল, না, তার হাস্য-পরিহাসের গভীরে কোনো অবদমিত কামনার অস্তিত্ব ছিল—তা উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু সেও বাঙালী ঘরের অধিকাংশ মেয়ের মতই পরিবারের প্রয়োজনে নিজেকে লুপ্ত করে দিয়েছে। তাই তার কোনো আশা নেই চাওয়া নেই দাবি নেই। স্বামী তার কাছে রক্তমাংসের মানুষ নয়, ভাবের বিগ্রহ। তাই বৃদ্ধ স্বামীতে তার ক্ষোভ নেই, স্বামীর মৃত্যুতে ব্যক্তিগত অভাববোধের তীব্রতা নেই। সে শুধু সংসারের কাজে গুরুজনের সেবায় এবং দৈনন্দিন কর্তব্যপালনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এই চরিত্রটির প্রতি লেখকের যেন একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। গৃহদাহ উপন্যাসে সে যেন একখণ্ড দক্ষিণা বাতাসের মত বিষাদের জমাট তুষারস্তূপকে বারে বারে বিগলিত করে ফেলেছে। স্বামী গল্পের সৌদামিনীও অনেকটা বিরাজের মত, অর্থাৎ সাময়িক মানসিক বিভ্রান্তির পর এখানেও সতীধর্মের সোচ্চার ঘোষণা। তবে বিরাজের গৃহত্যাগের মূলে ছিল স্বামীর প্রতি সাময়িক অভিমান, পরপুরুষের প্রতি আসক্তি নয়; কিন্তু সৌদামিনী তার প্রণয়ী নরেনকে বিবাহের পূর্বে ভালোবাসত এবং বিবাহের পরেও তাকে ভুলতে পারেনি। হঠাৎ কিভাবে নরেন তার কাছে নরেনদাদা হয়ে পড়ল এবং যে স্বামীকে কোনোদিন সে ভালোবাসে নি তার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠল তা সত্যই রহস্যের বিষয়! এখানে লেখক অনিবার্য মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি উপেক্ষা করে সতীধর্মের প্রশস্তি রচনাকেই মুখ্য করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে গল্পের শিল্পগত ত্রুটি প্রকট হয়ে পড়েছে।

শরৎ-সাহিত্যের দ্বিতীয় আর-একশ্রেণীর নারীচরিত্রের আলোচনা এবার করব। একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনে স্নেহ ও বাৎসল্য অবলম্বনে যে রস ও মাধুর্যের সৃষ্টি হয় তারই একান্ত প্রীতিপ্রদ চিত্র পাওয়া যায় কয়েকটি নারী-চরিত্রে। রামের সুমতির নারায়ণী, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, মেজদিদির হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে। পারিবারিক যেসব সম্পর্কের মধ্যে স্নেহবাৎসল্যের ধারা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত শরৎচন্দ্র সেগুলির দিকে আগ্রহ বোধ করেননি, কিন্তু যেসব চরিত্রের মধ্যে স্নেহবাৎসল্যের ধারা অপ্রত্যাশিত সেইসব স্থলেই স্নেহ-বাৎসল্যের উৎস আবিষ্কার করে পাঠকচিত্তের চমৎকৃত

আনন্দ বিধান করেছেন। মাতৃহীন দেবরের প্রতি নারায়ণীর যে অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। নারায়ণীর স্বামী পুত্র এবং মা থাকা সত্ত্বেও তার অন্তরের সবটুকু স্নেহই এই দুর্দান্ত ও সকলের তিরস্কৃত বালকটির উপর উপচে পড়েছে। এই স্নেহবৃত্তি মানবিক করুণার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে এতে এক দুর্লভ মহিমার আরোপ হয়েছে। অমূল্যের প্রতি বিন্দুর যে স্নেহ তা আপন সন্তানের প্রতি মায়ের জৈবিক স্নেহবৃত্তি নয়, তা জায়ের সন্তানের প্রতি সচরাচর অদৃষ্ট প্রবল বাৎসল্য—যা আমাদের চমৎকৃত কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে রাখে। বিন্দুর অভিমান ক্রোধ কলহ অসহিষ্ণু আচরণ—সবই অপরের গর্ভজাত সন্তানকে কেন্দ্র করে, সেজন্য তার সংযমহীন অধৈর্য, মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য ও বিসদৃশ কথা ও আচরণ—সবকিছুই আমরা কৌতূহলরসসিক্ত অনুকূল দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করি। পল্লীসমাজের মধ্যে আপন পুত্রের প্রতিপক্ষ রমেশের প্রতি বিশ্বেশ্বরীর অপার স্নেহ স্বাভাবিক জৈব বৃত্তির উপরে এক উদার ও নির্বিশেষ মাতৃত্বের মহিমায় চরিত্রটিকে ভূষিত করেছে। মেজদিদি গল্পে বহু স্নেহের পাত্র থাকা সত্ত্বেও এক অভাগা কাঙাল ছেলে কেষ্টর জন্য তার হৃদয়ের উৎস থেকে সবটুকু স্নেহই বর্ষিত হয়েছে। তার করুণামিশ্রিত বাধাবিজয়ী স্নেহ এবং কেষ্টর নীরব প্রকাশ, ভীরু মনের প্রবল আকর্ষণ লেখক কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনা, বিষম আচরণ ও মৌন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে একান্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

শরৎ-সাহিত্যের তৃতীয় আর-এক শ্রেণীর নারীচরিত্রের কথা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। এরা নাগরিক সমাজের আধুনিকা, ব্যক্তিত্বময়ী ও স্বাতন্ত্র্যবাদিনী নারী। এদের বাক্যে ও আচরণে একটা অকুণ্ঠিত ও অনাড়ম্বর ভঙ্গি দৃশ্যমান, এদের বুদ্ধি ও চিন্তা কোনো সামাজিক শাসনের কাছে নতিস্বীকার করে না, এবং এদের হৃদয়বৃত্তির স্পষ্ট ও সাহসিক প্রকাশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ললিতা বিজয়া সরোজিনী বন্দনা ভারতী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে। এদের প্রণয়িনীরূপেই আমরা দেখেছি। এদের মধ্যে ললিতা ও বিজয়ার প্রণয় রোমান্সের বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে স্নিগ্ধ কমেডির রসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ললিতার দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতার জন্য তার ভালোবাসা নীরব, অন্তর্মুখীন ও সাময়িক বিষাদের ছায়ায় একটু মলিন। কিন্তু বিজয়া নিজেই সম্পত্তির অধিকারিণী, সেজন্য তার ভালোবাসাও কিছুটা প্রকাশ্য ও ভ্রূক্ষেপহীন। তবে শরৎচন্দ্র তার চরিত্রেও বাঙালী-নারীসুলভ লজ্জা, কম্পমান আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, অকারণ অভিমান ও গোপন বেদনা সঞ্চার করেছেন। বিজয়া অসাধারণ শক্তিমান, রাসবিহারীর কাছে

অপরাজিতা কিন্তু পঞ্চশরের কাছে সে পরাজিতা, এবং এই পরাজয়ের মধ্যেই তার সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিহিত। কঠোর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোমল নারীত্বের এই সুষম মিশ্রণের ফলেই চরিত্রটি এত আকর্ষণীয় হয়েছে। সরোজিনীও রোমান্টিক প্রণয়িনী, কিন্তু সতীশের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্বন্ধটি তেমন গুরুত্ব ও বিস্তার লাভ করেনি। সরোজিনীর মত বন্দনাও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার উৎকট সাহেবিয়ানার পরিবর্তন হয়েছে। তবে শুধু কেবল বাহ্য কথা ও আচরণে তার ব্যক্তিত্বময় ও আত্মনির্ভরশীল সত্তা যতখানি প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তরসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত ও গাঢ় অনুভূতি ততখানি প্রকাশ পায়নি। তার প্রণয়ের পাত্র অস্পষ্ট ও সতত পরিবর্তনশীল। সেজন্য চরিত্রটি পাঠকের মনে কোনো স্থায়ী রস সৃষ্টি করতে পারে না। ভারতী বিজাতীয় খ্রীষ্টান সমাজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও স্নেহে প্রেমে সেবায় সহিষ্ণুতায় শরৎচন্দ্র তাকে বাঙালী ঘরের চিরপরিচিতা মেয়ে রূপে সৃষ্টি করে তুলেছেন। অপূর্বর মত ভীরু দুর্বল অপটু ও পরনির্ভরশীল একটি চরিত্রের প্রতি তার সীমাহীন ও অপুরস্কৃত প্রেমের মহিমায় সে মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু কেবল সযত্ন, শুভৈষী প্রেমের মধ্যেই তার চরিত্র নিঃশেষ হয়ে যায় নি, রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে তার যোগদান এবং নিজের স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের সক্রিয় স্বাবলম্বী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুমিত্রা বিপ্লবের অগ্নিবাহী নায়িকা বটে, কিন্তু তার চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ দেখা যায় নি। নায়িকা হয়েও সে যেন একটু নেপথ্যবর্তিনী। তার চরিত্রের প্রত্যাশিত সম্ভাবনা গ্রন্থমধ্যে পূর্ণ হয়নি।

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট নারীচরিত্রগুলির আলোচনা এবার আমরা করব। নারীচরিত্রের চতুর্থ শ্রেণীতে আমরা সেইসব প্রসিদ্ধ চরিত্রের আলোচনা করব যারা নিষিদ্ধ ভালোবাসার বেদনা ও অভিশাপ নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। এদের চরিত্রচিত্রণেই শরৎচন্দ্র তাঁর সবটুকু সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন এবং তাঁর সাহিত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। ভালোবাসা কোথাও কোথাও সমাজের চোখে নিষিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তার মাধুর্য শক্তি ও মহিমা কখনো ছোটো হবার নয়। নরনারীর ভালোবাসার প্রতি সমাজের হৃদয়হীন অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি অনেক জায়গায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়। কিন্তু এর একান্ত নির্দয়মূর্তি

দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় এইখানে···পুরুষের তত মুশকিল নয়, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী।' (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি) শরৎ-সাহিত্যে নারীর এই তথাকথিত নিষিদ্ধ ভালোবাসা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন বিধবার ভালোবাসা, বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি ভালোবাসা, এবং পতিতার ভালোবাসা। আজ বিধবার ভালোবাসা সমাজের মধ্যে কোনো বড় সমস্যা নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময়ে এই ভালোবাসা নিষিদ্ধ ছিল—আইনের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু দেশাচারের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি শরৎচন্দ্রের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির দিক দিয়ে বিধবার ভালোবাসার সমস্যাটি দেখেছিলেন, সেজন্য সেই ভালোবাসায় বেদনা অপেক্ষা তার নীতিভ্রষ্টতাই তিনি বড় করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর ভালোবাসার মধ্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটি দেখেন নি, ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণেই তিনি তাঁর লেখনীকে নিয়োজিত রেখেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই ভালোবাসার বেদনা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য অপূর্ব শিল্পরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং যে সমাজ ও দেশাচার এই ভালোবাসা স্বীকার করে না তার বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বিধবার বিবাহ দিয়ে এই ভালোবাসার সহজ সমাধান করতে চাননি। তিনি সমাজ-সংস্কারক নন, শিল্পী; শিল্পীর কাজ কোনো নিশ্চিন্ত সমাধান ঘটানো নয়, সেই সমাধানের দিকে বিচলিত পাঠকের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করে দেওয়া। সেই কাজই শরৎচন্দ্র করেছেন। তাঁর বিধবা নায়িকারা সচেতন সংস্কার ও অবচেতন হৃদয়ের দুর্বশ প্রেমের দ্বন্দ্বে অসহায়ভাবে পীড়িত। মাধবী, রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী—সকলেই এই দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই দ্বন্দ্বের জ্বালা, অবসাদ, শূন্যতা ও অশ্রুর মন্দাকিনীধারা শরৎ-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে আসক্তির চিত্র অচলা, অভয়া, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। অভয়া ও কিরণময়ীর কথা পরে আলোচনা করা হবে। এখানে অচলার কথাই শুধু আলোচনা করা যাক। অচলার মুখে কোনো তাত্ত্বিক বিতর্ক কিংবা কোনো মননশীল প্রতিবাদ আমরা শুনিনি। দুই বিপরীতমুখী হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ড আকর্ষণ-বিকর্ষণে তার চরিত্র যে অনিবার্য ট্রাজেডির পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে তারই সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ এই উপন্যাসে পাই। অচলার চরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্র নৈতিকতার প্রশ্নটি গৌণ রেখেছেন; মুখ্য করে তুলেছেন মানুষের হৃদয়বৃত্তির অনিবার, অলঙ্ঘ্য ক্রিয়া-

কলাপ। শরৎচন্দ্র পতিতার ভালোবাসার চিত্র আঁকবার সময় দুটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন। পতিতা হলেও যে ভালোবাসার পরশমণির পরশে অন্তর সোনা হয়ে যেতে পারে তার চিত্র পাই আঁধারে আলোর বিজলী ও দেবদাসের চন্দ্রমুখীর মধ্যে। এই দুটি উপন্যাসই গোড়ার দিকে লেখা বলে বিজলী ও চন্দ্রমুখীর চরিত্র একটু বেশি রকমের আদর্শায়িত হয়ে পড়েছে। পতিতা-জীবনের কামনাপঙ্কিল রূপ এদের মধ্যে দেখা যায় না, কামগন্ধহীন নিকষিত হেমসদৃশ প্রেমের দীপ্তিতে তাদের চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শরৎ-সাহিত্যে আর-এক শ্রেণীর তথাকথিত পতিতা-চরিত্র আছে যারা পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেনি, কিন্তু সমাজের চোখে তারা পতিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা হল সাবিত্রী, ষোড়শী, রাজলক্ষ্মী, কমললতা ইত্যাদি। এরা হয়তো জীবনে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করেছে; যেমন, সাবিত্রী মেসের ঝি, ষোড়শী মন্দিরের ভৈরবী, রাজলক্ষ্মী মোহিনী বাঈজী এবং কমললতা নিবেদিতা বৈষ্ণবী। শরৎচন্দ্র দেখালেন, এদের বিচারে সমাজ কতখানি ভ্রান্ত, অন্ধ ও হৃদয়হীন। এরা কেউ কেউ পুরুষের বিকৃত কামনার শিকার হয়ে পতিতার কলঙ্কিত আখ্যা লাভ করেছে, যেমন সাবিত্রী ও কমললতা; কেউ ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করেও কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়, যেমন ষোড়শী; এবং কেউ বা নিরুপায় হয়ে পতিতার মনোরঞ্জনী বৃত্তি গ্রহণ করেছে, যেমন রাজলক্ষ্মী। আসলে পতিতার কলঙ্ক এদের কপালে লেপে দেওয়া একটা বাহ্য চিহ্ন মাত্র, মনের গভীরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এদের সমস্যা অন্যত্র। সমাজের দেওয়া কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াবার আগে তারা যে সামাজিক অবস্থায় জীবন যাপন করত তার বিশ্বাস, সংস্কার, বেদনা ও যন্ত্রণাই তাদের মনকে অধিকার করে থাকে। সেই সমাজবশ্য নারীসত্তার সঙ্গে শাশ্বত প্রেমের আবেগে আলোড়িত নারীসত্তার অন্তহীন দ্বন্দ্বের রূপই এদের মধ্যে দেখা গেছে। এই দ্বন্দ্ব বিধবা সাবিত্রীর সঙ্গে প্রণয়িনী সাবিত্রীর, বিধবা ও মৃতা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী রাজলক্ষ্মীর, ভৈরবী ষোড়শীর সঙ্গে বঞ্চিতা পত্নী অলকার।

শরৎচন্দ্রের পঞ্চম শ্রেণীর নারীচরিত্রের মধ্যেও সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের অবতারণা দেখতে পাই। কিন্তু এখানে প্রেমের নীরব বেদনা, নির্বাক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্রন্দিত পরিণতি নয়—প্রেমের দুর্জয় আত্মঘোষণা, যুক্তিনিশিত ঝলসানি ও প্রতিবাদমন্দ্রিত প্রতিষ্ঠাই দেখতে পাই। অভয়া, কিরণময়ী, কমল—এরা এক-একটি খাপখোলা তলোয়ার, যেন গর্জিয়ে-ওঠা এক-একটি আগুনের চাবুক। এরা সকলেই বিবাহিতা নারী, কিন্তু ইবসেন ও বার্নাডশ-এর নায়িকাদের মতই এরা বিবাহের অন্তর্নিহিত ফাঁকি, অসংগতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতি-

বাদে মুখর। এদের মধ্যে অভয়া ও কিরণময়ী বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবনের তিক্ত ব্যর্থতা থেকেই বিদ্রোহের তীক্ষ্ণ ভাষা লাভ করেছে। অভয়া তার বঞ্চিত নারীজীবনে রোহিণীকে অবলম্বন করে ভালোবাসার স্বপ্নলোক রচনা করেছে। কিন্তু তবুও স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে সে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হল যখন নির্দয় অত্যাচার সহ্য করে সে তার নরপশু স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হল। তখনই সে পুনরায় রোহিণীদার কাছে ফিরে এল এবং অবশেষে তাকেই তার যথার্থ স্বামিরূপে গ্রহণ করল। বিবাহের কতকগুলো প্রাণহীন মন্ত্র দিয়ে ফাঁকিভরা পাওয়ার চেয়ে হৃদয়ের ভালোবাসার সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে হৃদয়নিংড়ানো পাওয়া যে অনেক বড়, অভয়া-চরিত্রের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। কিরণময়ী চরিত্রের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক বেশি। আমার মতে, কিরণময়ী শরৎসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা। সে অসামান্যা সুন্দরী। বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী ও জেবউন্নিসার মত তার রূপের আগুন অপ্রতিহতভাবে আকর্ষণ করে এবং অনিবার্যভাবে দগ্ধ করে। তার অতৃপ্ত কামনার আগ্রাসী ক্ষুধা অবশেষে অকৃত্রিম প্রেমের অমৃতধারায় শান্ত হল। জ্ঞানবত্তা ও মননশীলতার দিক দিয়েও তার সঙ্গে অপর কোনো নায়িকার তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে হৃদয় ও মননের এরূপ বিস্ময়কর মিশ্রণ শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। সে প্রতি মুহূর্তে যেমন অপরিজ্ঞাত রহস্যের দিকে আমাদের সম্মোহিত চিত্তকে আকর্ষণ করে, তেমনি অচিন্তিত কোনো তত্ত্বের প্রতি আমাদের উদ্দীপ্ত বুদ্ধিকে কৌতূহলী করে রাখে। কমলের বিদ্রোহ সবচেয়ে জোরালো, সবচেয়ে ধারালো, সবচেয়ে শাঁসালো। তবে সে যেন তর্ক-বিতর্কের একটি শুষ্ক অরণিকাষ্ঠ, বেদনা ও আকুতির স্পর্শে সবুজ কোনো প্রাণস্পন্দনময়ী লতা নয়। বহুদিন ধরে শরৎচন্দ্রকে নারীজীবনের যেসব প্রশ্ন ও সমস্যা ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করেছে সেগুলি কমলের মুখে শাণিত যুক্তি ও তর্কের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তা থেকে তাত্ত্বিক সত্তাই বড় হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের রাজনীতি-চিন্তা

দেবদাস জোয়ারদার

পরাধীন ভারতবর্ষের বড়ো বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে শুধুমাত্র শরৎচন্দ্র ও নজরুলেরই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নজরুল যে কারার লৌহকপাট ভেঙে লোপাট করতে চান, সেই কারা কিসের কারা ? শুধু কি বিদেশী শাসনের ? না, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অত্যাচারের কারাও ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সে যুগের কোনো সাহিত্যিকের কাছ থেকেই বোধহয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাই নি। তবু যেসব বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় এই প্রশ্নের উত্তরের একটা আভাস ফুটে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র একজন।

গ্রামের গফুর জোলাকে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের কারা থেকে ফুলবেড়ের পাটকলের পুঁজিপতি প্রভুদের আরেকটি নতুন কারায় বাধ্য হয়ে এসে প্রবেশ হয়। এ যেন জ্বলন্ত কড়াই থেকে উনুনের মধ্যে এসে পড়ে যাওয়া! কিভাবে গ্রামের কৃষক কারখানার শ্রমিক হতে বাধ্য হচ্ছে, কিভাবে আমাদের সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনের কাঠামোতে ধনতন্ত্রের ধাক্কা লাগছে—এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন ইতিহাস-চেতনার আলোয় উজ্জ্বল ছিল। তাই 'মহেশ' নামক সেই আশ্চর্য গল্পে গফুরকে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যে ফাগুলালদের রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'র প্রতীকের আড়ালে দেখিয়েছেন, সেই মজুরদের নিয়ে আন্দোলনের কথা শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে সোজাসুজি প্রথম বলেছেন। কল-কারখানার সংস্পর্শে এসে মজুরদের "সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবনযাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে তা সাহিত্য হবে না কেন ?" শরৎচন্দ্রের নিজেরই কথা এগুলি। এগুলি কথার কথা নয়। তাঁর নিজের বিশ্বাসে দীপ্ত এর প্রতিটি শব্দ।

তাঁর 'পথের দাবী'তেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সুর বেজেছে। এই উপন্যাসের ভারতী অপূর্বকে শ্রমিকদের ব্যারাকে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের আন্দোলনের মস্ত বড়ো ধারালো হাতিয়ারটি সম্পর্কে ডাক্তার ভারতীকে বলছে, 'ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে। কিন্তু 'নিরুপদ্রব ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোনো ধর্মঘট কখনো সফল হবে না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

মালিক পক্ষ ধর্মঘট ভাঙার জন্য যখন হিংসার পথ নেয়, তখন নিরুপদ্রব ধর্মঘটের শান্তির স্তোকবাক্যে মনকে চোখ ঠারানো যায়, হাসিল করা যায় না। শান্তির কথা সবচেয়ে বেশি বলে থাকে যারা পশুর মতো শক্তিমান, সেই পুঁজিপতি প্রভুর দলই। তাই শান্তি সম্পর্কে বীতমোহ হয়ে ডাক্তার ভারতীকে বলছে, 'শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে।' মনিবের হাতে বাঁধা গোরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরলে মনিবের শান্তি রদ্ হয় বটে, কিন্তু মজুররা পুঁজিপতি প্রভুদের হাতে বাঁধা গোরুর মতো কেন দাঁড়িয়ে মরবে? মজুরদের ছিঁড়ে ফেলতে হবে 'সেই জীর্ণ দড়িটা।' ইতিহাসের নিয়মে সেই দড়ি আজ জীর্ণ। তার সেই দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে অশান্তি বাঁধে তো বাঁধুক। রেঙ্গুনের ফয়ার ময়দানে সেই অবিস্মরণীয় শ্রমিকসভায় রামদাস তলওয়ারকর 'পথের দাবী'তে বলেছে, 'শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাহলে এই গোটা-কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্ম-রক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ, কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক, তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক (১৭ পরিচ্ছেদ)। রামদাসের অন্তর থেকে যে সহজ-সরল ভাষায় আগুন-ধরানো কথাগুলি বেরিয়ে এসেছে, সেগুলি পড়তে পড়তে বারবার মনে পড়ে গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পাভেলের কথা। ডাক্তার, রামদাস—এরা একটি সত্য স্পষ্ট বুঝেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শ্রমিক-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। কেননা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ধনতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে আঘাত হানতে বাধ্য। ফয়ার ময়দানের সভাপ্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণ করি। এই সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল অপূর্বর। কিন্তু অপূর্ব অনেক পাণ্ডিত্যমূলক তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে যে বক্তৃতাটি মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে গেল, সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে সে সবটা ভুলে গেল। জনজীবনের সঙ্গে যোগ ছিল না বলেই এই অঘটনটি ঘটে-ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনে মাটি ও মানুষের সঙ্গে যোগের অভাবে অনেক সময়ই কোনো ফল ফলে না। মধ্যবিত্ত জীবনের এই সীমা সম্পর্কে 'পথের দাবী'র লেখক নিঃসন্দেহে অবহিত ছিলেন। তার প্রমাণ বক্তৃতামঞ্চে অপূর্বর এই শোচনীয় ব্যর্থতা।

রামদাসের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলা কথাগুলির ।টি বাক্য বিশেষভাবে মনে রাখার মতো—'তোমরা······যত হও, তবুও মানুষ।' শিক্ষা সব সময় নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখায় না। তাই তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধরিক্ত মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর অভাব নেই। দেশের সব লোক প্রথম শিক্ষিত হোক, তারপর মুক্তির কথা।—এ জাতীয় আত্মপ্রতারণা করতে শরৎচন্দ্র নিজেও প্রস্তুত ছিলেন না। কৃষক-শ্রমিকদের জাগিয়ে তোলাই বড়ো কথা। দেশজোড়া শিক্ষার সুদিনটির আশায় হাত-পা গুটিয়ে থাকলে দেশ পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। এ বিষয়ে ১৯২৯ সালে রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'যে শিক্ষা সভ্য জগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষা বিস্তার গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না।······কিন্তু এ কথা যাঁরা বলেন যে, দেশের সবাই লেখাপড়া না শেখা পর্য্যন্ত তার গতি নেই, মুক্তির দ্বার আমাদের একান্ত অবরুদ্ধ এবং এইজন্যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করে লেখাপড়া শেখান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের 'পরে আমার ভরসা কম।

তাঁদের 'পরে ভরসা শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র সব্যসাচী ও তার অনুগামীদেরও কম। সব্যসাচী তার 'পথের দাবী' নামক বিপ্লবী সংগঠনটিকে অনেক বেশি মৌলিক কাজে লাগাতে চায়। তার ভাষায় পথের দাবী 'চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে। কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটিরে।' এ কথা সত্য, আঘাতে আঘাতে খেত-খামারের কৃষকের চেয়ে কারখানার শ্রমিকের চেতনা অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু আমাদের দেশের মতো অর্ধ-শিল্পায়িত দেশে কৃষকসমাজের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের আকবর আলির মতো চরিত্রের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র নিজে যে এ দেশের সর্বতোমুখী মুক্তির ক্ষেত্রে কৃষকের গুরুত্বের কথা জানতেন না—তা নয়।

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধকে সমগ্র বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলেই সব্যসাচী অনুভব করেছে। কেননা সব্যসাচী বুঝতে পেরেছে আজকের যুগে বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কোনো দেশই স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। স্বাধীনতা-যোদ্ধার সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। একেকটি বিশেষ রাজনীতিক পরিস্থিতির সুযোগ বুদ্ধিমানের মতো নিতে হবে। এই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলি থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধের

দুর্যোগময় দিনগুলিতে সুভাষচন্দ্রের ভারতত্যাগ পর্যন্ত আমাদের বিপ্লবীদের ধারণা। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী চরিত্র সৃষ্টির জন্য তিনি অনেক বিপ্লবীর জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। বাঘাযতীন, ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালের বিখ্যাত এম. এন. রায়), বিবেকানন্দের ছোটোভাই ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাস—এমন অনেক বিপ্লবীর চরিত্র থেকে তিনি তিলতিল সৌন্দর্যকণা আহরণ করে এক তিলোত্তম সৃষ্টি করেছেন। এসব কথা 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' বইটির লেখক শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'শরৎচন্দ্র' বইটিতে এ প্রসঙ্গে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা My Brother's Face বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধকারকে ডক্টর সেনগুপ্ত বলেছেন যে শরৎচন্দ্রের কাছে সব্যসাচী চরিত্রের উৎস সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। তখন শরৎচন্দ্র নিজে বলেন যে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা বিপ্লবীদের অনেক ঘটনা থেকে এই চরিত্রসৃষ্টির কল্পনা তাঁর মনে প্রথম আসে। সব্যসাচী নিঃসন্দেহে পুরনো দিনের অনেক বিপ্লবীর জীবনের অনেক ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যের এক সংহত রূপ। আবার একই সঙ্গে এই চরিত্রে পাই 'পথের দাবী' রচনার অনেক পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝোড়ো দিনগুলিতে উত্তালতরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঘটনাসমুদ্রে দেশ থেকে দেশান্তরে ভাসমান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বাভাস। সুভাষচন্দ্র নিজেকে বার বার pragmatist বলেছেন। যখন যে বাস্তব পরিস্থিতি আসছে তার সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে হবে—এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। সব্যসাচীরও অনুরূপ বিশ্বাস তার বিভিন্ন কথায় বারবার ব্যক্ত হয়েছে। ব্রিটিশের শত্রুকেই ভারতের মিত্র ভাবতে হবে। ব্রিটিশের সেই শত্রু শ্রদ্ধার্হ, না ঘৃণার্হ—এ প্রশ্ন অবান্তর। যে শ্রদ্ধেয় নয়, প্রয়োজনবোধে তার সঙ্গে হাত মেলানো নীতিশাস্ত্রবিরোধী হতে পারে, কিন্তু রাজনীতি-বিরোধী নয়। শরৎচন্দ্রের কাল্পনিক চরিত্র সব্যসাচী ও ইতিহাসের বাস্তব চরিত্র সুভাষচন্দ্র—দুজনই নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন।

সৃষ্ট চরিত্র থেকে স্রষ্টার মনের পরিচয় খুঁজে বেড়ানো পাঠক হিসেবে আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস। তাই 'পথের দাবী'র বিভিন্ন চরিত্রের সারগর্ভ কথাগুলিকে শরৎচন্দ্রের নিজের কথা বলে চালিয়ে দিতে পারলে আমরা তৃপ্তি পাই। কিন্তু তার একটা বিপদও আছে। কেন না স্রষ্টার মন অনেক জটিল ও রহস্যময়। তাঁর বহুমুখী মনের একেকটি টুকরো একেকটি চরিত্রে ছড়াতে ছড়াতে তিনি সৃষ্টির পথ ধরে চলেন। তাই

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে তাঁর রাজনীতি-চিন্তার সন্ধান এখানেই থাক। এবারে চলে যাই শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে ও ঘটনাবিধৃত জীবনে। মাটি, মানুষ, ক্ষেতখামার, কলকারখানা—সবকিছুর সঙ্গেই যোগ থাকা চাই। শরৎচন্দ্রের জীবনে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চাষী, ধাঙড়, কুলি-মজুর এমনকি বেশ্যা, যে যে-ই হোক্ না কেন, তাকে মানুষরূপে দেখতে হবে, ব্যক্তি হিসেবে তাকে মূল্য দিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে সেই মূল্য তিনি দিতে জানতেন। বাজেশিবপুর, পানিত্রাস—যেখানেই যখন তিনি কাটিয়েছেন, তখন সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন সকলের 'দাদাঠাকুর'। তাই সাধারণ মানুষের প্রতি অপার মমতাই তাঁর স্বদেশচিন্তায় সবচেয়ে বেশি মূল্য পেয়েছে। এজন্যই হাওড়া পৌরসভার ধাঙড় ধর্মঘট তাঁর সমর্থন পেয়েছে। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা তাঁর রাজনীতি-চিন্তা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের তিনি বন্ধু ছিলেন, সুভাষচন্দ্রের 'দাদা'-স্থানীয় ছিলেন। অসহযোগের সময় জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছিল। 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে'ই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের বিরোধিতা করে রচিত 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ পড়েছিলেন। তিনি এ সময় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলার অধ্যাপনা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে শরৎচন্দ্রের পরিকল্পনামতো সেদিন গড়ে .ওঠে ভবানীপুর নারী-কর্মমন্দির। শরৎসাহিত্যের নিষ্ঠাবান পাঠক চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন যে, কর্মী না হলেও নারীদরদী শরৎচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও পরিকল্পনা ঠিকই দিতে পারবেন এবং তিনি তা পেরে-ছিলেনও। স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে চিত্তরঞ্জনকে যে-সব তরুণী চিঠি লিখছিলেন, তাঁদের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সমন্বয়মুখী মননে শরৎচন্দ্র সায় দিতে পারেন নি। তাই তিনি 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে লিখলেন, বিদ্যার জাত নেই একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে culture জিনিসটারও জাত নেই, এ কথা কিছুতেই সত্য নয়।' কবির সঙ্গে তাঁর অসহযোগের সেই দিনগুলিতে বিরোধ ঘটলেও একটি ব্যাপারে আশ্চর্য মিলও ছিল। কবির মতোই তিনি চরকা ও খদ্দরের পক্ষপাতী ছিলেন না। উপমার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ চরকাকাটুনিদের মৌমাছি বলেছিলেন, আর শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, স্বাধীনতা আনবে যোদ্ধারা, একাজ মাকড়শাদের দ্বারা হতে পারে না। একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বয়ং গান্ধীজীকেই বলেছেন। তবু দলীয় শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এজন্যই তিনি নিজে চরকা কেটেছেন এবং খদ্দর পরেছেনও। অহিংস

অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করলেও অহিংসাকে একটি জীবন-দর্শন হিসেবে তিনি আঁকড়ে থাকতে চাননি। চৌরিচৌরা নামক একটা গ্রামে হিংস্র জনতার হাতে গোটা কয়েক পুলিশ নিহত হলে গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ নামক অমোঘ অস্ত্রটি খাপে ভরে ফেললেন। তখনকার অনেক নেতার মতোই শরৎচন্দ্রও মর্মাহত হলেন। তাঁর কাছে অহিংসার মূল্য সুভাষচন্দ্রের মতোই—তত্ত্বগত নয়, পদ্ধতিগত। সোজা ভাষায়, যখন যে অস্ত্রে ঘায়েল করা যায়, তখন সেই অস্ত্রটি বিদেশী শাসকের উদ্দেশে আমাদের ছুঁড়তে হবে। কেননা স্বাধীনতা লাভটাই আমাদের কাছে জীবনমরণ সমস্যা। সেদিনকার বাংলার রসারোডের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত সেই বিখ্যাত বাড়িটিতে অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে তিনি একদিকে যেমন পরিচিত হয়েছিলেন অহিংস অসহযোগীদের সঙ্গে, আবার চিনেছিলেন বোমা-পিস্তলহাতে ঘরছাড়া তরুণ বিপ্লবীদের। তাঁদের তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁদের আদর্শের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। ১৯২৭ সালে বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেলেন। নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীরা এঁদের সংবর্ধনার আয়োজনে যোগদান করছেন না দেখে শরৎচন্দ্র নিজেই অগ্রণী হলেন এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন ? সম্বর্ধনা জানাবে না কেন ? গভর্নমেণ্ট তাদের রেভলিউশনারি বলেছে বলে ? তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে এই কথা গভর্নমেণ্ট রটিয়েছে বলে ? গভর্নমেণ্ট কি আমাদের conscience-keeper ?' অহিংসার শান্তিমন্ত্ররূপে এদেশে বারবার জনতার যে অভ্যুত্থান ঘটেছে, তাকে নিরুপদ্রব শান্তির অতল জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাছে এ অসহ্য। এ বিষয়ে তাঁর নিজের বিশ্বাস 'কোন movement-ই কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে co-operation, non-co-operation, violence, non-violence, সবই সমান সবই সমান ফলপ্রসূ'। ('আমার কথা')। ভারতের স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন তাঁকে ব্যাকুল করেছিল। তাই স্বাধীনতালাভের উপায় নিয়ে তাঁর শুচিবায়ু ছিল না। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্ব তাঁকে ব্যথিয়ে তুলেছিল। এই সংগ্রামের স্ববিরোধগুলি বার বার তাঁকে ভাবিয়েছে। যখন তিনি দেখেছেন কংগ্রেসী আন্দোলনের পুরোগামীদের সমাজতন্ত্রের প্রতি ভীতি আছে, তখন তিনি দুঃখ পেয়েছেন। গান্ধীজীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান হয়েও অপ্রিয় সত্য উচ্চারণে নির্ভীক—'তাঁর আসল ভয়

সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।' তিনি যখন মন্তব্য করেন, 'বড় বড় ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্তের দলই এ যাবৎ দেশের politics নিয়ে নাড়াচড়া করচে। যাঁদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরা হলেন politician'—তখনও গান্ধীজীর প্রতি ইঙ্গিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেননা শরৎচন্দ্র রাজনীতিকে নীতি-শাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিশ্বাস থেকে দূরে দেখতে চেয়েছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'political যুক্তিতর্ক ভগবানের রুদ্ধ দ্বারে আছড়ে' পড়তে দেখে তিনি কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

শরৎচন্দ্র রাজনীতিকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সেদিনকার সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় অভ্যস্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের একটি ছোট্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। একালের বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিক রচনাগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে পাওয়া গেছে। কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের কোনো কোনো বইও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র সাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে পাঠক হিসেবে তিনি বিচরণ করেননি। দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজ-নীতিবিষয়েও তাঁর ব্যাপক পড়াশুনোর পরিচয় রয়েছে ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহে। রাজনীতিক রচনাকে পাঠ্য হিসেবে তিনি সাদরে বরণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত লাজুক হয়েও এবং কর্মী না হয়েও রাজনীতি তাঁর আগ্রহকে চঞ্চল করে তুলেছে। এই আগ্রহ শুধু বুদ্ধিকেই জাগায়নি, হৃদয়কেও জাগিয়ে-ছিল। তাঁর রাজনীতি-চিন্তার উৎস ছিল গভীর দেশাত্মবোধ। এজন্যই শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি আরও বড়।' ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ পরিচয় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির এক মহান দেশপ্রেমিক সাহিত্য-ক্ষেত্রের আরেক দেশপ্রেমিক সম্পর্কে এই মন্তব্য এমন দৃঢ়ভাবে করতে পেরেছেন।

শরৎচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ

সুনীল দাশ

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে শরৎচন্দ্রের জীবন- ও সাহিত্য-বিচারের বিবিধ ও বহুমুখী প্রচেষ্টাসমূহই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করি।

আলোচ্য নিবন্ধে একদেশদর্শী নিন্দা-স্তুতিকে পরিহার করে শতবর্ষের আলোয় শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। নিবন্ধের বক্ষ্যমান বিষয়ে বিদগ্ধ জনের মধ্যেও যে পরস্পরবিরোধী মতামত বিদ্যমান, তা তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা নিরসনের চেষ্টাও বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ বিদ্বজ্জনমহলে সুবিদিত। আলোচ্য নিবন্ধের সীমারেখা উক্ত অভিযোগের সত্যতা ও কার্যকারণ নির্ণয়-প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত থাকা উচিত বলে মনে করি। বস্তুতঃ, সমকালীন শরৎ-বিরোধী সুবিস্তৃত অধ্যায়ের ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত একটি খণ্ড অধ্যায় এখানে আলোচিত হবে। আলোচনার শুরুতে একটি সিদ্ধান্তকে সূত্ররূপে গ্রহণ করা যায়—সাধারণভাবে কোন বিদ্বেষই স্বয়ম্ভু বা অন্যনিরপেক্ষ নয়। বিদ্বেষমাত্রই প্রতিবিদ্বেষের স্বভাবজ ফসল।

অতঃপর প্রশ্ন আসবে, প্রাথমিক সূত্র অনুসন্ধানের, আক্রমণের শুরু কোন্ তরফে? কে আগে আক্রান্ত, কেই বা আক্রমণকারী?

আপাতভাবে প্রথম আক্রমণকারীকে সনাক্ত করার কোন সহজগ্রাহ্য প্রমাণ-উপকরণাদি বর্তমান নিবন্ধকারের হাতে নেই। বস্তুত আলোচ্য উভয়পক্ষই যুগপৎ একত্রে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করার জন্য পূর্বপটভূমিকার বিচার প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাক্‌পর্বে সনাতন হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতা ও সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি উগ্র বিরূপতাবশতঃ ইঙ্গ-বঙ্গী সমাজের যে ক্রুদ্ধ যুবকেরা 'আমরা গরু খাই গো' কিংবা 'বাংলায় ব্যুৎপত্তি কিছু কম' বলতে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন, মূলতঃ তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ অংশ এবং তাঁদের অনুগামীরা পরবর্তীকালে প্রাথমিক উগ্রতা পরিহার করে, যুক্তি ও কর্মের দ্বারা পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদের প্রচারে ব্রতী হন। একদিকে এঁরা সমাজ ও ধর্মসংস্কার-কল্পে সমাজ-সংস্কার ও ধর্মসংস্কারে চেষ্টিত হন, অপরদিকে এঁদেরই একটি

অংশ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে, স্বীয় প্রতিভায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করে, বিশ্বসভায় নিজেদের, তথা ভারতের, আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উজ্জ্বল ফসল, এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-রাজি কিন্তু কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা আদর্শের নিগড়ে সুসংবদ্ধ সম্প্রদায় হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয় নি। সাধারণভাবে মানব-মুক্তির আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ চিন্তা ও ধারণামত কর্মপন্থা ও মতামত ব্যক্ত করেছেন। সে কারণে কয়েকজন চিন্তাশীল যে ক্ষেত্রে ধর্ম-সংস্কার-কল্পে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচলিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক-ব্রহ্মবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করেন, সেক্ষেত্রে অপরদিকে কয়েকজন সংস্কারক সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে, কিছু কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ধর্ম ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। এই উভয়বিধ আদর্শ-প্রবাহের উৎস ও মোহনা এক হলেও নব্য-তন্ত্রের ব্রহ্মবাদীরা অধিকতর প্রগতিবাদীরূপে চিহ্নিত হন।

যে কারণে সদ্য আলোকপ্রাপ্ত, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহক, উচ্চকোটির ও উচ্চশিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনার প্রাথমিক পর্বে ব্রহ্মবাদী ধর্ম-দর্শনের প্রতি আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ছাড়াও, নব্যতন্ত্রের প্রতি মোহ এবং নিজেকে অধিকতর প্রগতিবাদী, আলোকপ্রাপ্ত ও আধুনিকরূপে চিহ্নিত করার ঝোঁক যে কিছুটা কাজ করেনি, একথা জোর করে বলা যায় না। তাছাড়া এই সম্প্রদায়ভুক্তির দ্বারা নিজেকে উচ্চকোটির মানুষের সংস্পর্শে আসা এবং সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর প্রতিনিধি-রূপে উপস্থাপিত করাও বহুলাংশে সম্ভব ছিল।

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকের ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্তিতে সনাতন হিন্দু-ধর্মের সমর্থকরা স্বভাবতঃই উদ্বেগ বোধ করেন। একদা হিন্দুধর্মের কুসংস্কারে বীতশ্রদ্ধ যুবকবৃন্দকে ধর্মত্যাগ থেকে বিরত করতে সংস্কারপন্থী যে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্ব অচলায়তনের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, জাতিভেদ, সুরাপান, বহুবিবাহ প্রভৃতি বহুবিধ কুপ্রথার অবসান ঘটাতে চেষ্টিত হয়েছিল, অচিরে সেই ব্রাহ্মধর্মকেই সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থকরা প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু মনে করতে দ্বিধা করেন নি।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকগণের, নিজেদের সম্প্রদায়কে অভিজাত, শিক্ষাভিমানী ও বিশিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে কৃতিত্ব যতখানি ছিল, অক্ষমতাও ততখানি ছিল ব্রাহ্মধর্মকে জনসমাজের মধ্যে সাধারণীকরণে সক্ষম না হওয়ার মধ্যে।

সেই কারণে নগরকেন্দ্রিক উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে পৌঁছে দিতে পারেনি।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের এই অক্ষমতা, এবং সাধারণ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অগণিত হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মকে নিয়ে কোন উদ্বেগ না থাকলেও সাধারণভাবে উচ্চকোটিভুক্ত নন এরূপ শিক্ষিত শহুরে সনাতন হিন্দুধর্মানুরাগীরা-ও বিষয়ে নিরুদ্বেগ থাকতে পারেননি।

আলোচ্য দ্বন্দ্বে প্রচারক বা নেতারূপী কোন ভূমিকা শরৎচন্দ্রের ছিল না। বস্তুতঃ, যৌবনে চাকরির প্রয়োজনে স্বদেশত্যাগী সাধারণ শিক্ষিত শরৎচন্দ্রের মানসিক গঠন ও জীবনযাত্রার মধ্যে এ ইচ্ছা ও সম্ভাবনাও সম্ভব ছিল না। তাঁর ব্রাহ্মবিদ্বেষ ব্রহ্মবাদী অধ্যাত্মদর্শনের প্রতি ধর্মীয় বিরোধিতা বা চ্যালেঞ্জ-রূপে দেখা দেয়নি। শুধুমাত্র অসবর্ণবিবাহ, জাতিভেদবিরোধিতা ইত্যাদি কিছু কিছু হিন্দুসমাজবিরোধী সামাজিক জীবনচর্চাকে তিনি সুনজরে দেখেন নি। সে কারণেই তাঁকে তাঁর সাহিত্য ও জীবনাদর্শের নিরিখে শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভূরূপে চিন্তা করতে অসুবিধা হয় না।

শরৎচন্দ্রের রচনাকালের পূর্বেই ব্রাহ্মধর্ম তার বয়ঃপ্রাপ্তিহেতু প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে কিয়দংশ গাদ ও খাদে মলিন হয়। একদিকে মতান্তর, বিবাদ ও বিভাজন, অপরদিকে একাংশের নিজেদের sophisticated sectarian-রূপে পৃথকীকরণ তাঁদের একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট করে তুলেছিল। এই-সব কারণে হিন্দুধর্ম-অনুরাগী শিক্ষিত সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজের উপরোক্ত জীবন-যাত্রাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁদের ব্রাহ্মধর্মবিরোধিতা এবং তারই প্রতিক্রিয়ারূপে ব্রাহ্মদের সনাতন হিন্দুবিদ্বেষ হেতু হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধের ধারা শরৎচন্দ্রের আমলেও কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহত ছিল। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের বৃহদংশের আচরণগত কৃত্রিমতা ও আতিশয্য অনেকের মত শরৎচন্দ্রও আদৌ সহ্য করতে পারতেন না।

শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রকে চিত্রিত করার প্রয়াসে এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর পূর্বোক্ত মনোভাবের পরিচয় দেন। গৃহদাহ, দত্তা, স্বামী ও নববিধান প্রভৃতিতে অল্পাবিস্তর এ মনোভাব প্রকাশ পায়। বিশেষ করে গৃহদাহ উপন্যাসে কেদার মুখুজ্জে এবং দত্তা উপন্যাসে রাসবিহারী, বিলাস উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বিষয় আরো লক্ষণীয়, যে শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে ব্রাহ্মমহিলাদের সুনজরে দেখেননি, সেই ব্রাহ্মমহিলা-চরিত্র বিজয়া ও অচলার প্রতি তাঁর সহানুভূতির ঘাটতি ছিল না—যদিও গৃহদাহ-র সুরেশের মুখ দিয়ে

ব্রাহ্মমহিলাদের একহাত নিতে তিনি ছাড়েন নি। অধিকাংশ ব্রাহ্মমহিলাদের প্রতি ব্যক্তিগত বিরূপতার চূড়ান্ত নিদর্শন জনৈকা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি। ঐ চিঠিতে তিনি বলেন—

"ব্রাহ্ম মহিলারা? তাঁরা নিরাপদে থাকুন। তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধকরি আমার প্রবৃত্তি হয় না।······ঐ দূরে থেকেই ব্রাহ্ম মহিলারা উচ্চশিক্ষিতা। দু চার জন ছাড়া তাঁরা আমাকে ভারি ভয় করেন। তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি। তাই তাঁরা আমার সামনে কিছুতেই স্বস্তি পান না। অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম এমনি সংকীর্ণতায় ভরা। দিদি, আমি কোনকালে খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছ-বিচার করিনে। কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েদের হাতে আমি কোন কিছু খাইনে। ····· ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেলানো জাত হলে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাইনে। তাঁরা বলেন—শরৎবাবু লেখেন বড় বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বড় গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, শুধু রাগ করে এদের হাতে খাইনে। আর এটা দেখেছ বোধ হয়, ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই কুরূপা। সাবান পাউডার জামা কাপড়ের দ্বারা আর নাকী খোনা গলায় কথা বলে যতদূর চলে। কেবল ২/৪টা দেখেছি যাঁরা সত্যই শ্রদ্ধার পাত্রী।······এতই ভাল, মনে হয় তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।

"এঁদের নিন্দেয় হয়তো রাগ হচ্ছে—কিন্তু জান তো দিদি তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা, কত স্নেহ। শুধু তাদের ন্যাকামী, বিদ্যের জাঁক্ আর কুসংস্কারবর্জিত আলোর দম্ভ, এবং যা নয় তার ভান—এই দেখেই আমার এত অরুচি।"

উক্ত চিঠি এবং পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি তাঁর ব্রাহ্মবিদ্বেষের সাক্ষ্য বহন করলেও আগেই বলেছি, এ বিদ্বেষকে আদৌ কোন মিশনরূপে অভিহিত করা যায় না। তৎসত্ত্বেও একথাও ঠিক যে কিছু কিছু কুপ্রথার বিরোধিতা করলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল অনুরাগই এই ব্রাহ্মবিদ্বেষের অন্তর্নিহিত কারণ। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঐ চিঠির একটি কথা, যেখানে তিনি বলেন—"এতই ভাল, মনে হয় তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।"

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে, চিঠিপত্রে এবং অন্যভাবে প্রকাশিত তাঁর ব্রাহ্মবিদ্বেষ অচিরে ব্রাহ্মধর্মী বিদগ্ধ মহলে এবং শরৎবিরোধী মহলেও যুগপৎ লোষ্ট্রনিক্ষেপে সাড়া জাগায়। এঁদের দু-দলের মধ্যে আপাতভাবে কোন যোগসূত্র ছিল না। যদিও কিছু ব্যক্তির মধ্যে উভয়বিধ সত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

একদল নিতান্ত তাঁদের স্ব-সমাজে মূল্যবোধগুলি আক্রান্ত হয়েছে মনে করে এগিয়ে এসেছিলেন ; অপরদিকে অনেকেই বিদ্যাভিমানবশতঃ, সাধারণ শিক্ষিত, আপাত-অনভিজাত উচ্চ-সামাজিক ঐতিহ্য-ওউত্তরাধিকারবর্জিত, সর্বোপরি পল্লী-গ্রামের চাষাভূষা, দরিদ্র, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ, কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে অথবা সৃষ্টিছাড়া বাউণ্ডুলে জীবনবর্ণনায় অভ্যস্ত শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-গগনে আবির্ভাব মাত্র যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ব্যক্তিগত বিচারবোধ দ্বারা তাঁরা শরৎ-সাহিত্যের সমালোচনায় ব্রতী হন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ শরৎসাহিত্যে স্পষ্ট ব্রাহ্মচরিত্র অঙ্কনকে তাঁর অনধিকারচর্চারূপে আখ্যাত করেন এবং উপন্যাসগুলিকে সে কারণে ব্যর্থ রচনা বলে অভিহিত করেন। তৎকালীন কয়েকজন তরুণ, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা ও ভাবধারায় স্নাত, শক্তিশালী লেখক শরৎচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। শক্তিমানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বয়সোচিত বাহাদুরি-বোধ দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে উজ্জ্বল করার প্রবণতাও কিছুটা থাকা অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে নিজের কথাপ্রসঙ্গে এমন একটা কথা বলেছিলেন—বাছুরের নতুন শিং উঠলে যেমন মহীরুহকে অহরহ গুঁতোতে যায়, আমিও তেমনি এক সময় মধুসূদনকে আক্রমণের চেষ্টা করেছিলাম।

সমকালীন সাহিত্যভূমে শরৎচন্দ্র সত্যই মহীরুহ।

এই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের পরিমণ্ডলটি ক্রমে ক্রমে বহু বিষয়ের বাদ-প্রতিবাদের অবতারণায় ক্রম-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বর্তমান কালের কয়েক-জন সুবিখ্যাত লেখক, সমালোচক, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই বিতর্ক-বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান নিবন্ধটি শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ সেহেতু তদ্‌বহির্ভূত বিষয়ে অধিক আলোচনার অবকাশ নেই।

শরৎচন্দ্রকে ব্রাহ্মবিদ্বেষীরূপে চিহ্নিত করে যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে তীব্র ও কটু আক্রমণ এসেছিল আজকের শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে। বাংলা ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'স্বদেশ' পত্রিকায় তিনি লীলাময় রায় ছদ্মনামে শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' ও 'পথের দাবী' উপন্যাসের অতি তীব্র সমালোচনা করেন। সমালোচনাটি যদিও মূলতঃ নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পগত গুণাগুণ বিচার, তবুও এবিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে, "শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মেয়েদের চেনেন না, তাদের

বিষয় কিছু জানেন না, তাই এ বিষয়ে লেখার তাঁর অধিকার নেই।" প্রসঙ্গক্রমে আরো বলেছিলেন, 'দত্তা'র বিজয়া এবং 'গৃহদাহ'র অচলা যে সমাজের মানুষ সেখানে তাঁর প্রবেশ নাই।···কুক্ষণে তিনি মডার্ন হবার জন্য অনধিকারচর্চা শুরু করলেন।" আমাদের আলোচ্য না হলেও বলা যায় যে তাঁর সমগ্র সমালোচনাটির ভাষা ও ভঙ্গী যথেষ্ট অশোভন মনে করে অনেকেই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন। ঐ তীব্র আক্রমণে শরৎ-অনুরাগী যাঁরা অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জনৈকা আশালতা সিংহ, এবং স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় স্বয়ং। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৩৩৮ সালের ১১ অগ্রহায়ণ তারিখের 'নবশক্তি' পত্রিকায় একটি মনোজ্ঞ ও বিশ্লেষণী প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন—"শরৎ-চন্দ্রের যে শিক্ষিত তরুণী সমাজে প্রবেশ নাই, একথা তিনি (লীলাময় রায়) জানলেন কি করে।······তিনি মিথ্যা জেনেছেন।"

আশালতা সিংহ লীলাময় রায়ের প্রবন্ধটি স্বদেশ পত্রিকায় পড়ে ক্ষুব্ধ হন, এবং দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে সে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। লীলাময় রায়ের "শরৎচন্দ্র শিল্পী বলেই অচলা ও বিজয়াকে টেনে তুলেছেন, যদিও তাতে করে ওঁরা কল্পনার সত্য রয়ে গেছেন, বাস্তবে সত্য হয়ে উঠতে পারেননি"—এই অভিযোগের জবাবে ঐ চিঠিতে তিনি বলেন—"এ ধরনের কথাগুলি ভারি ঝাপসা, নয় মণ্টুদা ?"

আশালতা সিংহের ঐ চিঠির উত্তরে দিলীপকুমার রায় বলেন, "তুমি উল্লিখিত পত্রে লিখেছিলে যে, অন্নদাশঙ্করেরও কথাগুলো ভারি ঝাপসা যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে শরৎচন্দ্রের অচলা বা বিজয়া বাস্তব দিক থেকে সত্য নয়, যেমন সত্য তাঁর অভয়া কিংবা সাবিত্রী। তাছাড়া অন্নদাশঙ্কর রায় গায়ের জোরে সেই তার্কিক ভুলটি করে বসেছেন যাকে ইংরেজীতে বলে begging the question······অর্থাৎ শরৎবাবু ব্রাহ্মসমাজের খবর রাখেন কি না রাখেন।······অন্নদাশঙ্কর যদি দত্তা, অচলার মত মেয়ে সমাজে না দেখে থাকেন, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।"

দিলীপকুমার রায় অন্নদাশঙ্করের সমালোচনার বিষয়ে আশালতা সিংহকে দেওয়া চিঠিতে ছাড়া তাঁর সুপরিচিত অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী লীলা রায়কে লেখা চিঠিতেও অভিযোগের আকারে উল্লেখ করেছেন। তার উত্তরে অন্নদা-শঙ্কর রায়ও দিলীপকুমার রায়কে একটি সুদীর্ঘ চিঠি দেন, এবং চিঠিটি তাঁর অনুরোধমত ১৯৩৮ সালের 'নবশক্তি' পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর পূর্বোক্ত সমালোচনার সমর্থনে বহু

বিষয়ে বহু যুক্তির অবতারণা করলেও শরৎচন্দ্র যে ব্রাহ্ম মেয়েদের চিনতেন না, একথা আর উল্লেখ বা প্রমাণের চেষ্টা করেননি।

এইখানে উল্লেখযোগ্য, শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"আমার অনেক ব্রাহ্ম মহিলা বন্ধু আছেন। তাঁহাদের পত্র লিখিতে এবং বন্ধুর মতই অসঙ্কোচে লিখিতে আমার বাধবাধ করে না।'

যদিও ব্রাহ্মমহিলাকে লেখা কোন চিঠি পরবর্তীকালের শরৎচন্দ্রের চিঠি-পত্রের সংকলনে পাওয়া যায়নি, তবুও ঐ চিঠিটিকে ব্রাহ্মমহিলাদের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

পরবর্তী অভিযোগ আসে তৎকালীন উদীয়মান ও শক্তিশালী লেখক শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে। কিন্তু সে লেখা শরৎপ্রয়াণেরও দশ বছর পরে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ An Acre of Green Grass-এ একটি লাইনে বলেন—"Sarat Chandra ruined a delicious story with anti-Brahma propaganda."

বুদ্ধদেব বসুর এই শরৎ-বিরোধিতা প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের উল্লেখ বিষয়ে বলা যায়, শরৎপ্রয়াণের পরবর্তীকালে সাহিত্যসমালোচনাসূত্রে এই শরৎ-বিদূষণের বীজ সম্ভবত পূর্বাহ্নেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের জীবিত-কালে বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাস "যবনিকা পতন" পড়ে জনৈকা আশালতা সিংহ, দিলীপকুমার রায়ের কাছে কিছু অভিযোগ করেন। অঞ্জলি বসু নামক অপর একজন মহিলা বলেন—"যবনিকা পতন সমগ্র নারীজাতির অপমান"। দিলীপকুমার রায় ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'পুষ্পধনু' পত্রিকায় 'বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা ও প্রসঙ্গত' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পত্রাকারে শ্রীমতী সিংহকে লেখা ঐ চিঠিতে বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠির উল্লেখ ছিল যাতে এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের কিছু সমালোচনা ছিল। পরে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি চিঠিতে দিলীপকুমার রায়ের উক্ত প্রবন্ধ উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসুরও কিছু সমালোচনা করেন। বুদ্ধদেব বসুর চিঠি থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে শরৎচন্দ্র সাহিত্যচিন্তায় নিশ্চিতরূপে অন্য শিবিরে অবস্থিত ব্যক্তিত্ব।

এ নিবন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি, শরৎচন্দ্রের শিক্ষা ও জীবনযাত্রার অনভিজাত অবস্থান সত্ত্বেও আবির্ভাবমাত্রই অসামান্য জনপ্রিয়তাহেতু তাঁকে নস্যাৎ করার একটা বয়সোচিত প্রচেষ্টা হয়তো কিছু তরুণ নবাগত লেখকদের মধ্যে ছিল, কিন্তু নবীন-প্রবীণের সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ে সংজ্ঞা ও মান সংক্রান্ত ধ্যানধারণায় স্বাভাবিক ও সঙ্গত জেনারেশন গ্যাপকেও অস্বীকার করা যায়

না। নারী-অসম্মানের অভিযোগে অভিযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর ঐ চিঠিতে তা আভাসিত হয়েছিল।

এছাড়া আরো পরে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত অজিত দত্তের 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থেও শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিরোধিতার উল্লেখ ছিল। তিনি লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী ছিলেন, কেননা তিনি সমাজব্যবস্থার গুরুতর কোন পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের শরৎ-বিরোধিতার ধারার অন্তরালে যে মানসিকতাই ক্রিয়াশীল থাকুক, বহিরঙ্গ বিচারে তা একটি নীতি ও বিশ্বাস-সঞ্জাত সাহিত্যবিচারের ধারা। এ নিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে সামান্য উল্লেখ ছাড়া সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। আমাদের আলোচ্য ব্রাহ্মবিদ্বেষ বিষয়ক তাঁদের বক্তব্যে শরৎচন্দ্রকে মোটামুটি রক্ষণশীলরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাহিত্যগগনে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নূতন ও পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধের আগমন-নির্গমনের এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণ। নূতন-পুরাতনের আগমন-নির্গমন বিশ্ববিধানে অনন্তকাল ধরে চলছে, চলবে। কিন্তু সন্ধিক্ষণের বিচিত্র যুগলক্ষণটি অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য। যে শরৎচন্দ্রকে সমাজব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তনবিরোধীরূপে গণ্য করে ব্রাহ্মবিদ্বেষী আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই শরৎচন্দ্রকেই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছ থেকে নিন্দাবাদ শুনতে হয়েছে। তিনি ৭।১।১৪ তারিখে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন,—"কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন, আমি নাকি ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন, ঠিক হিন্দু নই। অথচ হিন্দুধর্মকে আমি একতিলও আক্রমণ করি নাই। ইহার গোঁড়ামীকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র।...আমার এক মামা লিখলেন—আমি মনে মনে ব্রাহ্ম, বাহিরে হিন্দু। অথচ আমার গলায় তুলসীর মালা আছে। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্যন্ত খাই না।"

উপরোক্ত অবস্থা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধ হয় না যে উত্তাল সামাজিক রূপান্তরের পরিবর্তন ও প্রতিরোধের তরঙ্গায়িত দোলাচলাচলের আবর্তে শরৎচন্দ্র সম্যকরূপে আবর্তিত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ প্রসঙ্গে একমাত্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ব্রাহ্ম মহিলাদের বিষয়ে লেখা চিঠি শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা অনুদার ও সংকীর্ণচিত্তরূপে উপস্থাপিত করেছে। যদিও একথাও ঠিক যে সরল ও স্পষ্টবাদী স্বভাবের মানুষ শরৎচন্দ্র রেখে ঢেকে কথা বলায় বা মুখে এক কথা,

মনে আর এক কথার কপটতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। এটিকে বাদ দিলে এ বিষয়ে বাদানুবাদ প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য-দ্বন্দ্বের নামান্তর মাত্র। শরৎ-উপন্যাসের কয়েকটি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত চরিত্রকে দূষণীয় রূপে চিত্রিত করাকে ব্রাহ্মবিদ্বেষের চূড়ান্ত প্রমাণ বলা যায় না। কারণ ঐ সমাজের কয়েকটি চরিত্রকে আবার মহৎরূপেও চিত্রিত করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সে কারণেই সম্ভবত সমকালীন কোন ব্রাহ্ম-সমাজী নেতা বা প্রচারক এ বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি।

নিবন্ধের উপসংহারে অতঃপর আশা করি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসমীচীন হবে না যে হিন্দু সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাবান শরৎচন্দ্র উক্তমূল্যবোধবিরোধী ব্রাহ্ম-সমাজীয় লৌকিক ও সামাজিক আচার-আচরণকে মেনে নিতে পারেন নি—এটুকুই শরৎচন্দ্রের বহুকথিত ব্রাহ্মবিদ্বেষের সুনির্দিষ্ট পরিমাপ। তাছাড়া, যেহেতু শরৎচন্দ্রের একটি ক্ষুব্ধ চিঠি ছাড়া ঐ মনোভাব সর্বক্ষেত্রে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত, সে কারণে ব্রাহ্ম-অনুরাগী তাঁর প্রতি-পক্ষও সাহিত্যসমালোচনাপ্রসঙ্গে এই বিদ্বেষের নিন্দা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁদের প্রথম পরিচয় তাঁরা স্রষ্টা, সাহিত্যিক, সাহিত্যসমালোচক। ব্রাহ্ম-সমাজী নন। সমকালীন সমাজ, ধর্মবোধ, আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তে আবর্তিত আবেগপ্রবণ মানবদরদী একটি মহৎপ্রাণ মানুষ কথাশিল্পী তথা জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র। আজকের পরিবর্তিত মানসচিন্তার আলোয় মূল্যায়িত মানুষটির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি, অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হলেও সমগ্র বাঙালী জাতি তথা মানবদরদী সকল সমাজেই তিনি চিরকাল মহৎ স্রষ্টা হিসাবে সমাদৃত হবেন।

শরৎ-বিদূষণ

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১

১। It is our grave misfortune that Sarat Chandra was guided by his admirers into imagining that he was anything except a storyteller.

—An Acre of Green Grass : 1948 ed.
by Buddhadeva Basu

২। তাঁহার উপন্যাসের প্লটগঠন প্রশংসনীয় নহে, চরিত্রের আচার আচরণেও সর্বদা সঙ্গতি ও পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, জীবন সম্বন্ধে তাঁহার রবীন্দ্রনাথের মত কোন বৃহৎ দার্শনিক বোধও নাই ; রচনারীতি যে নির্দোষ তাহাও নহে। হিসাব করিলে তাঁহার গল্পগুলি পাসমার্কা পাইবে কিনা সন্দেহ। মানুষগুলির মধ্যেই বা এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য আছে ? না আছে রোমাণ্টিক উজ্জ্বলতা, না আছে আধুনিক মানুষের হাতিয়ারবদ্ধ জীবনসংগ্রামের রক্তাক্ত চিত্র। বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্লীহাক্লিষ্ট কয়েকটা নরনারীর বিবর্ণ কাহিনী—ইহাই তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : পৃষ্ঠা ৩৩০
১ম সংস্করণ ১৯৬১ : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
[পরবর্তী সংস্করণে এই অংশ বর্জিত হয়েছে]

৩। Many of the so called problems and much of the so called psychology of our later day sex novelists are divorced from our life. Sarat Chandra Chattopadhyay and his followers brought them readymade from third rate English novels.

—Bengali Literature : Oxford University,
Page 168. 1948 ed. by Dr. J. C. Ghose

৪। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'পথের পাঁচালী'র মত মহৎ সৃষ্টি শরৎবাবুর একখানিও নেই।

বাংলা উপন্যাসের ধারা : অচ্যুত গোস্বামী

৫। শরৎচন্দ্রের অভাব কিন্তু ঠিক রবীন্দ্রনাথের অভাবের মত অতটা তীব্রভাবে আমরা অনুভব করি না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মধ্যবিত্ত জীবন ও মানুষের যে কল্পরূপ সৃষ্টি করেছিল আমাদের বাস্তবজগৎ ইতিমধ্যেই তা থেকে অনেকখানি সরে গেছে।

সরোজ আচার্য : বই পড়া : ১২২ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ

৬। শরৎচন্দ্রের গল্প রোমান্টিক অবাস্তব কল্পনায় রঙীন, ভাবালুতায় কোমল, অগভীর আবেগপ্রবণতায় মুখরোচক।···গতানুগতিক সমাজ, গতানুগতিক জীবন, গতানুগতিক পরিবেশ নিয়ে তিনি তার মধ্য থেকে ভাবালুতাময় বা সেণ্টিমেণ্টাল রোমান্স সৃষ্টি করেছেন···শরৎচন্দ্রের গল্পের রস লঘুমানস আলস্যযাপনেই উপভোগ্য, কিশোরমনের কল্পনাকেই সে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারে।···তাঁর রচনায় প্রকৃত হাস্যরসের সন্ধান অল্পই মেলে। তাঁর রচনায় কৌতুকবোধের অভাব স্বভাবতঃই দেখতে পাওয়া যায়।

অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস : পৃষ্ঠা ৩৮১-৮৫
১ম সংস্করণ ১৯৬০

৭। তিনি বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী নিখুঁত প্রথম শ্রেণীর কোন ছোটগল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় : সেরা ছোটগল্প (৮ম শ্রেণীর উপপাঠ্য)
১ম সংস্করণ ১৯৭৪

৮। কোন সন্দেহ নেই, কল্পনার সেই সীমাহীন বিস্তার তাঁর রচনায় দুর্লভ —যা আমরা রবীন্দ্রনাথে পাব। বঙ্কিমের নিত্য সৃজনশীল কথা-কল্পনাও তাঁর সাধ্যাতীত।

ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : শরৎচন্দ্র : 'মিলনমেলা' শরৎ সংখ্যা ;
পৃঃ ১৩। ১৯৭৪

৯। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিন্যাসের পাশাপাশি শরৎসাহিত্যের ভাষার গঠনকৌশলের দুর্বলতা নজরে পড়বে।···শব্দপ্রয়োগ ও শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সর্বদা নিখুঁত মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নি। কোন কোন স্থানে ভাষার আড়ষ্টতা ও দুর্বলতা সহজেই নজরে পড়ে।

কিরণশংকর সেনগুপ্ত : শরৎস্মরণী : ১৯৫৯ : পৃষ্ঠা ৭৬

১০। শরৎচন্দ্রে দার্শনিকতার অভাব লক্ষণীয়। তাঁর কোন কোন উপন্যাসে তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা খোঁজার চেষ্টা আছে। সে চেষ্টা অর্থহীন বলে মনে হয়।···প্রকৃতি বর্ণনার দিকে তাঁর আকর্ষণ নেই, মহাকাব্যিক

পটভূমি রচনার বাসনা নেই। কাব্যিক সৌন্দর্য, কল্পনামণ্ডিত চিত্র, বর্ণবহুলতা, রোমাণ্টিক সুদূরার্তি, দার্শনিক জিজ্ঞাসা তাঁর ভাষারূপে বা বর্ণনাভঙ্গিতে ফুটে ওঠেনি।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের আলোচনা (১ম)
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১৮ এবং ৬২

১১। দেশকাল এবং পাত্র-পাত্রীকে গভীর অভিনিবেশ ও তাৎপর্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কখনও ধরবার চেষ্টা করেন নি।······স্বাভাবিকতা কখনও শরৎচন্দ্রের স্বধর্ম নয়।·····সহস্র কৃত্রিমতায় ও অসঙ্গতিতে শরৎ-সাহিত্য পরিপূর্ণ।
শরৎচন্দ্র জীবনের আকস্মিকতাকে শিল্পে আনতে গিয়ে শিল্পের ন্যায়কে লঙ্ঘন করেছেন।

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।
১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা ১২৮ ও ১৪৩।

১২। শরৎচন্দ্রের মানস ও রাজনীতিক চিন্তার মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গতি এবং স্ব-বিরোধী চিন্তার প্রবণতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত লক্ষ্য করা যায়·····যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক ও সমাজ-অর্থনীতিক তত্ত্বাদির সুদীর্ঘ ও সুকঠিন অনুশীলনের সাহায্যে চেতনার স্বচ্ছতা এবং যুক্তিপারম্পর্যবোধ জন্মে তা তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি।

নেপাল মজুমদার : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা,
চতুষ্কোণ : শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৮২

১৩। শক্তিধর ঔপন্যাসিক হলেও জোলা, বালজাক, তলস্তয়, টমাস মানের মত মহান স্রষ্টা হয়ে ওঠেন নি তিনি।
দেশ জাতি ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে তাঁর কোন সমস্যাই সর্ব মানবের সমস্যায় রূপান্তরিত হয় না।······বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তুলনায় ঢের বেশী সার্বভৌম। রবীন্দ্রনাথ তো অবশ্যই। কাছে থেকে দূরে, মাটি থেকে আকাশে বড় একটা প্রসারিত হয় নি তাঁর ভাব-কল্পনা।···
এমন দিন হয়ত দূরবর্তী নয় যখন এই নব মূল্যায়ণে শরৎচন্দ্রের অব-মূল্যায়ণ হবে অনেকটাই। এই ভয় এই জন্যে যে শরৎ-সাহিত্যের প্রাণলোকে সাম্প্রতিক আবেগার্দ্রতার পরিমাণ যতটা, সে অনুপাতে চিরায়ত জীবনবোধ ও বৈদগ্ধ্যের বলিষ্ঠ পঞ্জরাস্থি দানা বাঁধে নি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র, আজ ও আগামীকাল :
চতুষ্কোণ : শরৎ সংখ্যা ১৩৮২।

২

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই রকমই হল বাংলার পণ্ডিত-সমালোচকদের বৃহৎ একাংশের মূল্যায়ন। উচ্চশিক্ষিত সমাজের একটা স্তরে শরৎচন্দ্র বরাবরই অপাংক্তেয়। বাংলার আর কোন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত এবং সগোত্র সাহিত্যসেবী সমালোচকদের দ্বারা এত বেশি নিন্দিত ও নিগৃহীত হন নি। তিনি যত গণ-অভিনন্দন লাভ করেছেন ইনটেলিজেন-সিয়ার দ্বারা তত ধিক্কৃত হয়েছেন। সাধারণ পাঠক তাঁর উপন্যাস পাঠ করে যত মুগ্ধ হয়েছে পণ্ডিতেরা তত বিরক্ত হয়ে নাক কুঁচকেছেন। একদিকে লক্ষ লক্ষ অনুগ্রাহী পাঠক শরৎচন্দ্রের 'অপরাজেয়' কথাশিল্পী বিগ্রহ নির্মাণ করেছে; অন্যদিকে আঁতেলেকচুয়ালরা তাঁকে নিগ্রহ করে চলেছেন।

সাধারণ নিয়ম এই যে, সাহিত্যের সমালোচকগণ পাঠক ও লেখকের মধ্যে দৌত্য করে থাকেন; তাঁরা হন লেখক ও লেখাবিশেষ আস্বাদন ও অনুধাবনের জন্য পাঠক ও লেখকের মধ্যে সেতু।

কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি সমালোচকগণের আনুকূল্য, অনুগ্রহ ও দৌত্য ছাড়াই সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছেন। পণ্ডিত-সমালোচকেরা সাহিত্য-সমালোচনার minimum ethics-টুকুও না মেনে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নঞর্থক ও নিগ্রহাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এঁদের গাত্রদাহ হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তায় এই শ্রেণীটি অস্বস্তিবোধ করেন এবং ব্যাখ্যা দেন যে জনসাধারণ হলো 'গণেশ', একটা নির্বোধ mass বা জনপিণ্ড, যার brain বা বুদ্ধির বালাই নেই, আছে কেবল 'ইমোশন' এবং শরৎচন্দ্র 'রবীন্দ্রনাথের তরল সংস্করণ' [বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল] হয়ে শুধু ঐ ইমোশনের জন্যই সাময়িক ও তাৎক্ষণিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পৃথিবীর অন্যত্র সাহিত্য-সমালোচকগণকে কোন bestseller-কে নিন্দা করার জন্য পাঠককে গালমন্দ করতে দেখা যায় নি। ডিকেন্সের পরবর্তীকালে যথেষ্ট অবমূল্যায়ন হয়েছে, সেজন্য ইংরেজ পণ্ডিতগণ ডিকেন্সের অনুগ্রাহী বিপুল মধ্যবিত্ত পাঠকশ্রেণীর ওপর ক্রুদ্ধ হন নি। কিন্তু এ দেশে শরৎচন্দ্র সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের স্বীকৃতি লাভ করায় পণ্ডিতেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পাঠককেও অশিক্ষিত, মেয়েলী, অপরিণতবয়স্ক ইত্যাদি বলে নিগ্রহ করেছেন।

শরৎনিগ্রহের সামাজিক ও সাহিত্যিক দুটি দিক আছে। সামাজিকভাবে হয়েছে তাঁর চরিত্রহনন (character assassination) এবং সাহিত্যিক-

ভাবে হয়েছে তাঁর রচনার অবমূল্যায়ন। স্মৃতিচারণার নামে প্রায় সকলেই কমবেশি শরৎচন্দ্রের চরিত্রহনন করেছেন। তাঁর জীবনীকারগণ স্রেফ গুজব এবং শরৎচন্দ্রের নিজের সম্পর্কে পরিহাস-রহস্যগুলিকে অবলম্বন করে যথেচ্ছ গল্প বানিয়েছেন।

তবে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় শরৎ-সাহিত্যের নিগ্রহ ;—শরৎচরিত্রের বিদূষণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। তাই চরিত্রহননের প্রসঙ্গটি আপাততঃ আমাদের এক্তিয়ারে নেই।

শরৎ-সাহিত্যের নিগ্রহের ইতিহাস শুরু হয়েছে শরৎ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনতিবিলম্বে। এর অগ্রণী ছিলেন 'শনিবারের চিঠি' এবং তার অন্যতম নায়ক সজনীকান্ত দাস। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে পণ্ডিত-সমালোচকগণের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য কোন্ পর্যায়ে ছিল তা সজনীকান্তের জবানবন্দী থেকেই নেওয়া যাক :

'বাংলা দেশে এমন একদিনও গিয়াছে যেদিন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে শরৎচন্দ্র অপাংক্তেয় ছিলেন—কলেজী শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁহার নাম করাও দোষের ছিল।'

['ক্রমোপলব্ধি—শরৎচন্দ্রকে' : শরৎজয়ন্তী সংখ্যা : দিশারী]

মজার বিষয় হল, শরৎচন্দ্র যুগপৎ অর্থডক্স হিন্দু এবং মডার্ন 'এলাইট' উভয়ের দ্বারা সমানে লাঞ্ছিত হয়েছেন। 'প্রবাসী'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং 'ভারতবর্ষের'র' ডি. এল. রায় তাঁর 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছেন, কেননা তাঁদের মতে উপন্যাসটি immoral! অর্থডক্স বা সনাতন-পন্থী হিন্দু জ্ঞানী-গুণীজনেরা যখন বলেছেন 'চরিত্রহীনের চরিত্রহীন', তখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানীরা বলেছেন, শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী ও ভাববাদী, রক্ষণশীল এবং আচারপন্থী! সুরেশ সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডি. এল. রায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ শরৎ-সাহিত্যকে revolutionary, immoral, obscene, excessive progressive বলে অভিযুক্ত করলেন এবং বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ প্রগতিপন্থীগণ বললেন, শরৎসাহিত্য irrational, reactionary, sentimental, puritan, conventional! অর্থাৎ কি রক্ষণশীল কি প্রগতিশীল—কাউকেই শরৎচন্দ্র খুশী করতে পারেন নি।

কিন্তু শরৎচন্দ্র খুশী করতে পেরেছিলেন পাঠকসাধারণকে। এইখানেই তাঁর সাফল্য ও জিত।

বিভূতিভূষণ ভট্ট তাঁর স্মৃতিকথায় শরৎ-নিগ্রহের ইতিকথা উল্লেখ করে

লিখেছেন : শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূল্য নিরূপণ উপলক্ষে একটা সাহিত্যিক লাঠালাঠির সূচনা হইয়াছে এবং এমন কি বর্তমান সাহিত্য-সম্রাটও [রবীন্দ্রনাথ] সেই তর্কধূলার মধ্যে তাঁহার ঋষিকল্প মুখখানি লইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন। [শরৎদা : শরৎস্মৃতি : পৃষ্ঠা ৬]

এই লাঠালাঠির প্রধান লাঠিয়াল ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র আখড়ার সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়। সজনীকান্ত শরৎচন্দ্রকে বেধড়ক পিটেছিলেন। তাঁর নিজের স্বীকৃতিই এ সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য হবে : "কোলাহল জমিয়া উঠিল। আমার তখন বয়স অল্প, এই বিবদমান সম্প্রদায়ের সর্বকনিষ্ঠ আমি, আমার স্বভাবতঃ গরম রক্ত আরও গরম হইয়া উঠিল ; আমি প্রবল বেগে তাঁহাকেই আক্রমণ করিলাম……সমালোচনার নামে আমি শরৎচন্দ্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিলাম। [আত্মস্মৃতি : ৫০ পৃষ্ঠা : ১৩৬১ সংস্করণ]

সজনীকান্ত দাস পরে শরৎ-নিগ্রহের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন : "আমি যৌবনের হঠকারিতায় শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করিয়াছিলাম।…… আমার ক্রমশঃ এই উপলব্ধি জন্মিয়াছে যে, শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মত বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হইয়া বিস্মৃত বা অজ্ঞাতলোকে বিদায় লইবার জন্য আসেন নাই। ['ক্রমোপলব্ধি—শরৎচন্দ্রকে' : শরৎ স্মরণী, ১৩৬৬ দিশারী প্রকাশিত]

প্রসঙ্গতঃ শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাম্প্রতিককালে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রদ্ধামূলক ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন এবং তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের নতুন সংস্করণে এ প্রবন্ধে উল্লেখিত কঠোর মন্তব্যগুলি বাদ দিয়েছেন। সজনীকান্তের পর শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেন 'লীলাময় রায়' নামে অন্নদাশংকর রায় ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকায়। এই প্রবন্ধে তিনি 'শেষ প্রশ্নে'র তীব্র নিন্দা করেন। এতেই তিনি যথারীতি মন্তব্য করেন : শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা যথেষ্ট আধুনিক নয়।

অন্নদাশংকর রায় উক্ত প্রবন্ধে 'শেষ প্রশ্ন' ও 'পথের দাবী'কে অতি নিকৃষ্ট রচনা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস দুখানিকেও ব্যর্থ রচনা প্রমাণ করে ছেড়েছেন। প্রমাণের বহর এইরকম : 'দত্তার বিজয়া, গৃহদাহের অচলা যে সমাজের মানুষ সে সমাজে তাঁর প্রবেশ নেই। শিক্ষিতা তরুণীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। কুক্ষণে তিনি মডার্ন হবার জন্য অনধিকার চর্চা শুরু করলেন।' কী অনবদ্য যুক্তি এবং বাংলা সাহিত্য সমালোচনার কী অপরিসীম সৌজন্য ও মান! বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তো

বটেই, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও মন্তব্য করার সময় যেটুকু বিবেচনা, সংযম ও শালীনতার পরিচয় সমালোচকগণ দিয়েছেন—শরৎচন্দ্রের বেলায় সেটুকুও তাঁরা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শরৎচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ ও নীচতা কোন্ নরকে নেমেছিল তার চরম একটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রবন্ধ থেকেই উদ্ধৃত হল : "এর পরে তিনি আরও দুঃসাহসিক হয়ে, আরেক ডিগ্রি অনধিকার চর্চা করলেন। লিখলেন—পথের দাবী।······ভাগ্যক্রমে বইখানা বাজেয়াপ্ত হল !"

'পথের দাবী'র শিল্পমূল্য নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক হতে পারে। 'আনন্দমঠে'র শিল্পমূল্য নিয়ে হতে পারে না কি ? কিন্তু হয় না, কেননা আনন্দমঠ 'শিল্পে'র চেয়ে বড়—তা একটা জাতির মুক্তিমন্ত্র ও বেদ হয়ে গেছে—আরোপিত হলেও তা এখন fact। 'পথের দাবী'-ও ঠিক তাই। একজন বাঙালী পণ্ডিত 'পথের দাবী' সম্পর্কে 'ভাগ্যক্রমে বইখানি বাজেয়াপ্ত হল' লিখছেন বিশ্বাস করা যায় কি ? এর নাম সাহিত্যসমালোচনা ! শরৎচন্দ্রের সমালোচনা যে এক শ্রেণীর পণ্ডিতের হাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষজাত বিদূষণ হয়ে উঠেছিল লীলাময় রায়ের এই উদ্ধৃতিগুলিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

অনেকটা অন্নদাশংকর রায়ের অনুরূপ শরৎ-নিগ্রহ করেছেন নীরেন্দ্রনাথ রায় 'পরিচয়' পত্রিকায় 'শেষপ্রশ্নে'র ওপর একটি প্রবন্ধে : 'শেষপ্রশ্নে' তাঁর সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না।······ অসুস্থ আকস্মিকতার অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত গল্পটিকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে।······শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার monstrosity-র জননী হইয়া বসিয়াছে।"

এই মন্তব্যের পর নীরেনবাবু কমল চরিত্রটিকে আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র ব্যর্থ অনুকরণ প্রমাণ করে মন্তব্য করেছেন : 'শেষ প্রশ্নে' যে সকল তথ্যকে বড় গলায় প্রচার করা হইয়াছে, তাহা যে ইওরোপীয় সাহিত্যের হাটে বাসি মাল, প্রায় বস্তাপচা হইতে চলিল ! এইভাবে হাটের দালালিই কি তবে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব ? [পরিচয় : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৩৮ ; প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা।]

য়ুরোপের বাসিমাল বাংলা-সাহিত্যের বাজারে 'মডার্ন' মাল বলে চালিয়ে যারা 'গুণী' হয়েছেন তাদের মুখে শরৎচন্দ্রের মত একেবারে খাঁটি মাটির শিল্পীকে বিদেশী মালের 'দালাল' বলাটা বাস্তবিকই উপভোগ্য পরিহাস !

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে শরৎচন্দ্র বাসি বিদেশী মালেরই কারবার করেছেন, তাতেও বা এত নিগ্রহ কেন ? এ দেশে তো imported মালেরই

কদর ! তাহলে নীরেন্দ্রবাবুদের শরৎবাবুর ওপর ঐ 'ফরেন' মাল আমদানীর জন্য দ্বেষ কেন ? কারণটা কি এই নয় যে নীরেন্দ্রনাথ-অন্নদাশঙ্কর-বুদ্ধদেব-অজিত দত্তদের মনের কথাটা এই রকম যে য়ুরোপীয় মাল বাংলা সাহিত্যে যা import করবার তা তাঁরাই করবেন, কেননা তাঁরাই তো livestock-এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত importer। তাঁদের monopoly-তে ডিগ্রীহীন শরৎবাবুর প্রবেশ ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁরা বরদাস্ত করেন নি।

নীরেন্দ্রনাথের 'শেষপ্রশ্নে'র ওপর 'গোরা'র প্রভাব খুঁজে পাওয়াটাকে শরৎচন্দ্র অনবদ্য শ্লেষাত্মক ভাষায় প্রকাশ করেছেন একখানি চিঠিতে: 'পরিচয়' বলে একখানা ত্রৈমাসিক অভিজাত শ্রেণীর কাগজ বেরিয়েছে। তাতে তোমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় শেষপ্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন।······তাঁর মোদ্দা কথাটা এই যে যেহেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু কমল-চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ যেহেতু নীরেনের চোখ দুটো কটা সেই হেতু তার বুদ্ধি ঠিক বেড়ালের মতো ! [দিলীপকুমার রায়কে লিখিত চিঠি। ৬ ভাদ্র ১৩৩৮]। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !

শরৎচন্দ্র চিঠিপত্রে অন্নদাশঙ্কর ও বুদ্ধদেব সম্পর্কেও কঠোর মন্তব্য করেছেন। অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য : 'এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায়।·· ···

'ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ্ 'আদেক্‌লে-পনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে।' [দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭]

অন্নদাশঙ্কর রায় বা নীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য ছিল নিভৃত —একজনকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠির মতামত। তাঁদের তা জানবার কথা নয়। সুতরাং শরৎচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া তাঁদের শরৎ-নিগ্রহের কারণ হতে পারে না।

শরৎ-নিগ্রহকারীদের champion হিসাবে অন্নদাশঙ্করকে হারিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Comparative Literature বিভাগটি তাঁরই নেতৃত্বে শরৎ-বিদূষণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে— স্বাধীনতা-উত্তরকালে। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সজনীকান্ত দাস সাময়িক উত্তেজনায় যে বিদূষণ শুরু করেন, অন্নদাশঙ্কর-নীরেন্দ্রনাথ-শিবনারায়ণ বুদ্ধদেব-অজিত দত্তগণ সে ধারাটিকে স্থায়িত্ব দান করেন। এই যাদবপুরিয়া-গণেরই একজন 'কলকাতা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সুবীর রায় চৌধুরী ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সংকলন 'একতা'য় 'বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষ'

নামে একটি প্রবন্ধে Dr. J. C. Ghose-এর মন্তব্য সমর্থন করে শরৎচন্দ্রকে একজন তৃতীয় শ্রেণীর নগণ্য লেখক প্রতিপাদিত করেন।

শরৎ-নিগ্রহের এই tradition সমানে চলেছে। এমন কি জন্মশত-বার্ষিকীর সৌজন্য সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ও establishment-এর বুদ্ধিজীবী-মহলের অনীহা, তাচ্ছিল্য ও বিতৃষ্ণার মনস্তত্ত্ব দূর হয় নি। যাদবপুর তো শরৎচন্দ্রকে 'তুলনামূলক সাহিত্যে'র তুলনায় বাতিল করে দিয়েছেই,—অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তেমন কিছু ঘটাপটা করতে নারাজ। জগত্তারিণী পদকের অতিরিক্ত মর্যাদা সে তাঁকে দেয়নি। ঐ পদকটি অনেক রাম-শ্যামও পেয়েছেন। অতএব শরৎচন্দ্রও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লেখক হিসাবে একজন রাম বা শ্যাম! বাংলা অনার্সে শরৎচন্দ্র পাঠ্য নন; স্পেশাল বাংলা পর্যন্ত শরৎচন্দ্র উঠতে পারেন, তার বেশি নয়। স্পেশাল পেপারে সমগ্র author হিসাবে আছেন মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র কদাপি নন! পাশকোর্সে চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্র, কখনো শরৎচন্দ্র নন! এম. এ-তে শরৎচন্দ্র কোন একটা পত্রের অর্ধেকও পাঠ্য হতে পারেন না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্রের নামে এ বছরে একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হল, কিন্তু এত দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীরব উপেক্ষায় যথেষ্ট শরৎ-নিগ্রহ হয় নি কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. দিয়ে সম্মানিত করেছিল। এপার বাংলার বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের কাছে শরৎচন্দ্রের মত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিহীনের এই সম্মাননা আদৌ মনঃপূত হয় নি। শরৎচন্দ্র ডি. লিট. পাওয়ায় "তাঁকে নিয়ে কাগজপত্রে গালিগালাজের বন্যা বয়ে গেল।" [অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা : পৃষ্ঠা ৭২] ঢাকায় শরৎচন্দ্র মুসলমান সমাজকে নিয়ে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস রচনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছিলেন এই ব্যাপারটি অজুহাত করে শরৎচন্দ্রের ডক্টরেট পাওয়ার জন্য এপার বাংলার ইন্‌টেলিজেনসিয়ার আসল গাত্রজ্বালাটি প্রকাশ পেল কুৎসিত ভাষায়: 'হায় শরৎচন্দ্র, তোমার প্রাণের দায়ে কাঙ্গালপনা দেখিয়া সত্যই তোমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়।' [একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়] "বহুবাঞ্ছিত ডি-লিট যখন নভেল লিখেই পাওয়া গেল এবং তা যখন রহমান সাহেবের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) হাত দিয়েই এলো, তখন এই ব্রাহ্মণবটু আতিশয্যে বলে ফেললেন, তিনি অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়েই নভেল চালাবেন!" আর-একটি পত্রিকার এই মন্তব্য তৎকালীন শিক্ষিতা-ভিমানী শ্রেণীর শরৎচন্দ্রের প্রতি মনোভাবটি পরিস্ফুট করছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎ-নিগ্রহের প্রসঙ্গে বলেছেন : এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিবুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। [আমাদের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র : শরৎস্মৃতি।]

ধূর্জটিপ্রসাদ একান্ত রবীন্দ্র-পরিকর বলেই শরৎ-নিগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামটা জুড়ে দিয়েছেন। সুরেশ সমাজপতি, ডি. এল. রায়, নরেশ সেনগুপ্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে রবীন্দ্রনিগ্রহ ছিল সম্পূর্ণ সাহিত্য-শিল্পগত এবং অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র ডি. এল. রায়ের 'আনন্দবিদায়' প্রহসনে রবীন্দ্র-নিগ্রহ আছে ; অন্যত্র যে নিন্দাবাদ আছে তা কাব্য-বিচারের প্রথানুমোদিত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীজাত অভিমত। নোবেল প্রাইজ পাবার পর আর রবীন্দ্র-নিগ্রহের সাহস কারও হয় নি। বরং অতঃপর রবীন্দ্র-বিগ্রহই আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। তাই ব্যক্তিগত-অসূয়াজাত বুদ্ধিজীবীদের মাত্রাহীন ও যতিহীন শরৎ-বিদূষণের সঙ্গে অন্য কারও সমালোচনার কোন তুলনাই চলে না।

৩

শরৎ-নিগ্রহের কারণ কয়েকজন ব্যক্তির অসূয়া (jealousy), মর্জি (discretion), উন্নাসিকতা (cynicism), অস্মিতা (egotism) এবং প্রাতিস্বিকতার (idosyncrasy) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্যই কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এগুলির কোন কোনটি বা সবগুলিই মনস্তাত্ত্বিক কারণ। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে শরৎ-বিদূষণ হয়েছে তার কারণ বাংলার তথাকথিত রেনেশাঁসের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রতি কেতাবী পণ্ডিতগণ যে মানসিকতা বহন করে এসেছেন তার শিকড় রয়েছে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সামাজিক-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক জমিনের গভীরে। তাই শরৎ-নিগ্রহের বিষয়টিকে ছোট বা বিচ্ছিন্ন করে না দেখে বাংলার তৎকালীন ইতিহাসের বা সমাজবিকাশের অংশ হিসাবেই দেখা যেতে পারে, এবং তা হলে দেখা যাবে যে এই নিগ্রহব্যাপারটি শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই প্রতিভাস।

এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হয়েছে সামাজিক স্তরে—হিন্দু-ব্রাহ্ম ; সাহিত্যিক স্তরে—রবীন্দ্র-শরৎ ; এবং রাজনৈতিক স্তরে—গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বে। দ্বন্দ্বের এই আপাত ও খণ্ড বিকাশগুলি কিন্তু মূলতঃ ফিউডাল-বুর্জোয়া দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ।

[ক] হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব : উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও অর্থনীতির প্রবর্তনায় যে স্বদেশী মুৎসুদ্দি শ্রেণীর উদ্ভব হল, চলতি কথায় যাদের বলা হয় মধ্যবিত্ত বা বাবুশ্রেণী, তাদের একটা মেধাবী অংশ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। রামমোহন-দ্বারকানাথ এই মুৎসুদ্দিশ্রেণীর প্রতিভাবান অগ্রণী প্রতিনিধি। এঁদের প্রবর্তিত সমাজ-সংস্কার ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। বৌদ্ধধর্ম যেমন একদা হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, ব্রাহ্মধর্মও তেমনি সনাতন বা অর্থডক্‌স হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অবশ্যই ব্রাহ্ম আন্দোলন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও অর্থনীতির জারজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এও ঠিক যে হিন্দুত্বের সঙ্গে ব্রাহ্মত্বের যে বিরোধ তা হল ফিউডালিজমের সঙ্গে বুর্জোয়ার দ্বন্দ্ব। হিন্দু রক্ষণশীলতা ছিল সামন্ততান্ত্রিকতাকে রক্ষার প্রয়াস। অবশ্যই ব্রাহ্ম আন্দোলন আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল ছিল। এই শতাব্দীর সাতের দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ৫০ বছর বাংলা এবং ভারতের উত্তরাঞ্চলে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে তা ছিল সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের প্রাথমিক স্তর। ব্রাহ্মসমাজ বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে স্মরণীয় যে দেশের আপামর মানুষ ছিল হিন্দু অর্থাৎ প্রচলিত ফিউডাল স্থিতাবস্থার পক্ষে। দেশের নিম্নবিত্ত ও গ্রামীণ গরিব মানুষের কাছে ব্রাহ্মরা ছিলেন ম্লেচ্ছ, হাফখ্রীষ্টান, এবং জ্ঞানী-গুণী ব্রাহ্মদের পর্যন্ত সাধারণ মানুষ 'বেহ্ম' নামে ডাকত।

নিম্নবিত্তের আপনজন গ্রামীণ লেখক শরৎচন্দ্র হিন্দু জনসাধারণের উপরিউক্ত সেণ্টিমেণ্টকেই কথাসাহিত্য করে তুলেছেন। তাঁর ব্রাহ্মবিরোধিতা সুবিদিত এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে তাঁর নিগ্রহ ও সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর বিগ্রহ নির্মিত হওয়ার অন্যতম হেতু আছে এখানেই। 'দত্তা' 'গৃহদাহ' 'নববিধান' প্রভৃতি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মদের প্রতি বিরূপতা চাপতে পারেন নি। তাঁর ব্রাহ্মবিদ্বেষ যে কত সত্য ও অযৌক্তিক ছিল তার দৃষ্টান্ত মেলে এই পত্রাংশে : ব্রাহ্ম মহিলারা ? ঐ দূর থেকে শুনতেই ব্রাহ্ম মহিলারা শিক্ষিতা।···অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সংকীর্ণতায় ভরা! [লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা ১৪.৮.১৯১৯-এর চিঠি] শরৎচন্দ্র এ চিঠিতেই জানিয়েছেন যে তিনি ব্রাহ্মমহিলার হাতে খান না।

শরৎচন্দ্রের এই তীব্র ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ তাঁর প্রতি ব্রাহ্মদেরও বিদ্বিষ্ট করেছিল। দেশের জ্ঞানী-গুণী প্রতিভাবানদের অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্ম। ফলে অধিকাংশ

পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী শরৎ-সাহিত্যের প্রতি অনীহা ও বিরূপতা বোধ করেছেন। শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিরূপতা যে তাঁর প্রতি ইনটেলিজেন্‌সিয়ার বিদ্বেষের অন্যতম আদি কারণ তার পরোক্ষ সাক্ষ্য বহন করেছে শরৎপ্রসঙ্গে নীচের দুটি মন্তব্য : 'শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন' [অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস] এবং 'He ruined a delicious story with anti-Brahmo propaganda.' [Buddhadeva Basu : An Acre of Green Grass.]

এটা লক্ষণীয় যে শরৎচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং এমন কি তিনি হিন্দু আচরণতন্ত্রেরও ঘোর সমর্থক ছিলেন। আবার তিনি হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি আচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছেন। তাঁর এই স্ব-বিরোধিতার ব্যাখ্যা তৎকালীন হিন্দু সমাজের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বে (inner-cofliction) অন্তর্নিহিত আছে। হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বহির্দ্বন্দ্ব চলছিল তেমনি উভয় গোষ্ঠীর ভিতর নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বও ছিল। এরই দরুন প্রগতির মাত্রা ও প্রকরণ নিয়ে ব্রাহ্মরা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। অনুরূপভাবে হিন্দুসমাজ গোষ্ঠীবিভক্ত না হয়ে থাকলেও তার ভিতরেও রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল কিংবা স্থিতাবস্থাকামী ও পরিবর্তনকামীদের দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন শেষোক্ত দলে। তিনি ছিলেন radicalist। এজন্য orthodox হিন্দু-সমাজ শরৎচন্দ্রকে immoral বলে নিগ্রহ করতে ছাড়ে নি। কিন্তু অধিকতর radical humanist ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিরোধে যেহেতু শরৎচন্দ্র তাদের সঙ্গে ছিলেন, তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পাঠককুল শরৎচন্দ্রকে বিগ্রহ করে অপরাজেয় কথাশিল্পীর মহিমা দিতে বিলম্ব করে নি। শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিরোধিতা কার্যতঃ হয়ে দাঁড়ায় বুদ্ধিজীবী বিরোধিতা এবং কতকটা আধুনিক-শিক্ষা-বিরোধিতা। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনিও বুদ্ধিজীবীদের নিগ্রহের বস্তু হয়ে ওঠেন।

হিন্দু ও ব্রাহ্মদের দ্বন্দ্ব কতকটা Catholic ও Protestant দ্বন্দ্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত গতিশক্তি সব দ্বন্দ্বই আত্মসাৎ করে অগ্রগামী শক্তিকে নিজের করে নিতে পারে বলে এখানে সব সমাজ বা ধর্মীয় আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত হিন্দুত্বের কাছে বিলীন হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মের মত ব্রাহ্মরাও তাই বিলীন হয়েছে। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের হিন্দুধর্মকে সমর্থন সার্থক ও সঠিক মানসিকতা বলা চলে। ব্রাহ্মদের উগ্রতা বাদ দিয়ে হিন্দুসমাজকে শোধন করে গতিশীল করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। এখানেই তাঁর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। অতএব ব্রাহ্মসমাজী বা বুদ্ধিজীবীদের তাঁর প্রতি নিগ্রহের সামাজিক কারণ থাকলেও সাহিত্যিক যৌক্তিকতা নেই।

[খ] শরৎ-রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ব: এই দ্বন্দ্বটিকে হিন্দু-ব্রাহ্ম-দ্বন্দ্বের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করা যায়, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। শরৎচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রদ্বেষের অন্যতম হেতু কবির ব্রাহ্ম-সমাজী হওয়াটা বিচিত্র নয়।

শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রভক্তি একটি প্রবাদবাক্যের মতোই স্থায়ী সত্য। তাঁর মত গভীর রবীন্দ্রানুধ্যান সম্ভবতঃ কোন শান্তিনিকেতনী আশ্রমিকও করেন নি। শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রানুরাগ ও রবীন্দ্রানুধ্যানের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রভক্তি যেমন আন্তরিক, রবীন্দ্রদ্বেষও তেমনি খাঁটি। শরৎচন্দ্রের হরেক স্ব-বিরোধিতার মধ্যে এও একটি। চেতনায় তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-শিষ্য কিন্তু অবচেতনায় ছিলেন রবীন্দ্রদ্বেষী। হিন্দু-ব্রাহ্ম-দ্বন্দ্ব এর কতকটা কারণ হতে পারে, কিন্তু অধিকতর কারণ হল দুই মনীষীর সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা এবং অসূয়া। শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য সৌজন্য ও স্নেহের ত্রুটি ঘটে নি, তথাপি রবীন্দ্রনাথেরও অবচেতনে শরৎচন্দ্রের প্রতি যে অসূয়া ছিল তা অনুভব করার মত পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে। এখানে তার উল্লেখের অবকাশ নেই। লোকে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় ঔপন্যাসিক বলছে, একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখে-ছিলেন—গল্প-উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তিনি নিশ্চিত জানেন কবিতায় তাঁরই জিত!

শরৎ-রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অতি গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অবচেতনে পারস্পরিক সূক্ষ্ম-ঈর্ষার দ্বন্দ্ব থাকলেও উভয়ের চেতনায় যথা-ক্রমে ভক্তি-অনুরক্তি এবং স্নেহ-আশিস অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উভয়েরই ছিল একটি করে ভক্ত-শিষ্যমণ্ডলী। এই দুই মণ্ডলী নিজ নিজ বিগ্রহ দুটির মধ্যে বিসম্বাদ বাঁধাবার কাজে লিপ্ত থাকতেন। শরৎ-চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের থেকে থেকেই যে সংঘর্ষ হয়েছে তার মূলে উভয়ের ভক্তমণ্ডলীর লাগানি-ভাঙানি নিত্য ক্রিয়াশীল ছিল। তিনটি ঘটনায় শরৎ-রবীন্দ্র দ্বন্দ্ব বেশ ঘোঁট পাকিয়েছিল। সাহিত্যে শ্লীলতা ও আধুনিকতার প্রশ্নে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বনাম রবীন্দ্রনাথের যে মসীযুদ্ধ হয় তাতে শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে লেখেন 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। বিরোধের এই হল সূত্রপাত। দ্বিতীয়-বার রবীন্দ্রনাথের জবাবে শরৎচন্দ্র ভয়ানক চটে যান। এই তৃতীয় গুরুতর দ্বন্দ্ব ছাড়াও শরৎ-রবির ভুল-বোঝাবুঝি আরও বহুবার হয়েছে। 'ষোড়শী' নাটকের জন্য শরৎচন্দ্র কবির কাছে কয়েকটি গান চেয়েছিলেন।

কবি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। শরৎচন্দ্র মর্মাহত হন। রবীন্দ্রনাথ কেন শরৎচন্দ্রের অনুরোধ রাখেন নি, তা কেউ জানেন না। শরৎ-জয়ন্তীতে কবির সভাপতি হতে অনিচ্ছাও শরৎচন্দ্রের অভিমানের কারণ হয়েছিল। অসহযোগ-চরকা-কংগ্রেস-রাজনীতি নিয়েও শরৎ-রবির মতভেদ নানা দ্বন্দ্বের ও অভিমান সৃষ্টি করেছিল।

শরৎ-রবির এই দ্বন্দ্ব ও মান-অভিমান রবীন্দ্রনাথের কোন ক্ষতি করে নি ; কারণ নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত কবি অমরত্ব ও দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কবিকে কেউ কোথাও কটূক্তি বা কটাক্ষ করলে (তার সঙ্গত কারণ থাকলেও) বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যসেবীরা তাঁকে তেড়ে আসতেন। এখনও দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করার উপায় নেই—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটন কেউ করতে ভরসা পান না—চারদিক থেকে মার মার করে সবাই তেড়ে আসেন। সে সময়ে এই কাজ আজকের থেকে আরও অবাঞ্ছিত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর ভাবাবাবেগপ্রবণ অভিমানী ও অসাবধানী স্বভাবের জন্য আত্যন্তিক ভক্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মৌখিক ও লিখিত-ভাবে বারবার কটাক্ষ করে রবীন্দ্রানুরাগী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যসেবীদের বিরাগভাজন হয়েছেন। দেখা গেছে, বিশেষভাবে রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলই শরৎ-অরিমণ্ডলে পরিণত হয়েছে। এইভাবে শরৎ-নিগ্রহের পিছনে শরৎ-রবি সম্পর্কও অনেকটা কার্যকর হয়েছে।

[গ] গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্ব : শরৎচন্দ্র ১৯২০ সাল থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বেশ কিছুকাল কলম ছেড়ে চরকা নিয়ে পড়ে থাকেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ও অনুগত। কংগ্রেস-রাজনীতিতে হিংসা-অহিংসা, বাম-দক্ষিণ অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি ছিলেন সুভাষবাদী অর্থাৎ বিপ্লবপন্থী। গান্ধীজীর সঙ্গে দেশবন্ধুর বিরোধে তিনি দেশবন্ধুকে সমর্থন করে চরকা ও অসহযোগ ছেড়ে দেন। তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজদলের কর্মী ও প্রার্থী হিসাবে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু ১৯২০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে গান্ধী-শিষ্য প্রফুল্ল ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে দেশবন্ধু-শিষ্য সুভাষচন্দ্রের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাতে শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষের পক্ষে। এই সময় যতীন্দ্র-মোহনই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাছাড়া গান্ধী সুভাষ-দ্বন্দ্বে দেশের ইনটেলিজেন্‌সিয়া বা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী সুভাষের বিপক্ষে গান্ধীবাদের পক্ষে ছিল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতি এবং তাও গান্ধী-বিরোধিতা করা গা-বাঁচানো সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের খারাপ লাগবারই কথা। শরৎচন্দ্রের দেশ-

প্রেমের এই সততা ও সক্রিয়তা 'অরাজনৈতিক' কিংবা নিষ্ক্রিয় গান্ধীবাদী পণ্ডিতপ্রবরদের বিবেককে পীড়িত করে থাকবে। তাছাড়া অন্নদাশংকর রায়ের মত 'আই সি এস' বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে 'পথের দাবী'র লেখককে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর মত 'অরাজনৈতিক' 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য-সেবীদের বিবেকও শরৎচন্দ্রের মত সৎ সাহিত্যিকদের বরদাস্ত করবে কি ভাবে? রবীন্দ্রনাথের মত ভাববাদী, আধ্যাত্মিক, সীমা-অসীম ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মিলনকামী মহাকবি এই বুদ্ধিজীবীদের পূজ্য হবেন এবং শরৎচন্দ্রের মত শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী বস্তুবাদী সাহিত্যিক যিনি রাজনীতিকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ বলে জানেন—এঁদের হাতে যে নিগৃহীত ও অস্বীকৃত হবেন, তাও নিতান্ত প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক।

হিন্দু ও ব্রাহ্ম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথ, এবং গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্বগুলি মূলতঃ সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। ব্যক্তিগত সম্পর্কও অবশ্যই এই দ্বন্দ্বগুলির কারণ; কিন্তু তদাতিরিক্তভাবে দেশ-কাল-পাত্রের পরি-প্রেক্ষিতটিও এই কারণ বিশ্লেষণে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়। দ্বন্দ্বের এই মাত্রাগুলিকে সংশ্লেষিত করে বলা যায় যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের যে বিরোধ তা হল প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে বুর্জোয়ার চিরন্তন দ্বন্দ্ব। শরৎচন্দ্র গোর্কির মতই প্রোলেতারিয়েত ছিলেন। জীবনের পাঠশালা থেকেই তিনি পাঠ নিয়েছিলেন এবং শোষিত মানবতার জন্য গভীর দরদ ও আকুতিই তাঁদের উভয়কে সাহিত্যিক করেছিল। শরৎচন্দ্রের লেখায় শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী সামান্যই স্থান পেয়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষই তাঁর কথা-সাহিত্যের মূল আশ্রয়। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের এই মধ্যবিত্ত মানুষ আর্থিক দিক থেকে সর্বহারা। আত্মার সন্ধানে তাই তাদের বিদ্রোহ। ব্যক্তিজীবনে শরৎচন্দ্র নিজে আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন প্রোলেতারিয়েত। শরৎচন্দ্রের এই এই নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য বাংলার পেটিবুর্জোয়া মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবীদের ভাল লাগে নি। তাই তাঁরা তাঁকে মনে মনে ছোটলোকের অর্ধশিক্ষিত লেখক মনে করে তাচ্ছিল্য করেছেন। আবার তাঁর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা, তাঁর অপরাজেয় কথাশিল্পীর প্রতিষ্ঠালাভ তাঁদের আত্মমর্যাদাকে আঘাত দিয়ে উত্তেজিতও করেছে। তাই তাঁরা এই mass-এর লেখককে অবহেলা করে ভুলে থাকতেও পারেন নি—আলোচনার নামে তাঁর যথাসাধ্য অবমূল্যায়ন, লঘুকরণ ও বিদূষণ করে গেছেন। শরৎ-নিগ্রহ বাংলা দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক বিকাশের একটি কৌতূহলোদ্দীপক উপাদান এবং অধ্যায়।

উত্তরকালের অগ্রদূত : শরৎচন্দ্র

পল্লব সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের একালের অনেক ক্ষোভ। তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়েও আমরা ভিন্ন মতের সুযোগ রাখি না। একই ধরনের চরিত্র বারংবার ঘুরে এসেছে তাঁর লেখায়, কাহিনীর মধ্যে এক ধরনের আবর্তন হয়েছে, জগৎ কিংবা জীবনের কোন সার্বভৌম সমস্যা প্রতিবিম্বিত হয়নি তাঁর রচনায়। এ সবই ঠিক। তাঁর প্রায় নায়িকাই বোবা প্রেমের যন্ত্রণায় কাতর, নায়কেরা বহু-ক্ষেত্রেই সংসারে থেকেও সত্ত্বগুণসংবলিত উদাসীন নায়ক, তাঁর আঁকা মাতৃমূর্তির বৃহদংশই পরের ছেলের মা : এক-ছকে-আঁকা দজ্জাল গ্রাম্যস্বভাব-সম্পন্না নারীবাহিনী, কুচক্রী বিষয়ী গ্রাম্য মাতব্বরকুল ইত্যাদি তাঁর বহুল-ব্যবহৃত কাহিনী-উপকরণ। ফলে ধারাবাহিকভাবে শরৎ-সাহিত্য পড়তে বসলে অবশ্যই পৌনঃপুনিকতাদোষে দুষ্ট বলে মনে হয়।

এ সমস্ত ঠিকই। কিন্তু আজকের সমালোচক যদি শরৎচন্দ্রকে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করেন, তাহলে এসব অভিযোগগুলিই ধ্রুব হয়ে থাকবে উত্তরকালের কাছে। শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাই প্রযোজন হয়ে পড়ছে তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়নের, আমাদের সংস্কৃতি এবং সমাজে কোন্ ভূমিকা পালন করেছে শরৎ-সাহিত্য, তার বিচারের।

শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাঙলাদেশের সাহিত্যে সামান্য দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সমস্ত ভাবনাই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী অর্থাৎ সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের নিয়ে—এককথায় ইংরেজিতে যাকে বলে এসটাবলিশমেন্ট। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সমাজ' এবং 'সংসার', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র প্রথমার্ধ এবং লালবিহারী দের 'বেঙ্গল পেজ্যান্ট লাইফ' বাদ দিলে আর যেখানেই নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষেরা এসেছেন, সেখানেই তাঁরা বর্ণহীন পার্শ্বচরিত্র ; প্রভৃতির দলভুক্ত। রাজা, বাদশা, নবাব, আমীর, ওমরাহ, জমিদার, সেনাপতি, সর্বমান্য সন্ন্যাসী—এঁদের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন এই মানুষগুলি। শরৎ-সাহিত্যের আগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে তাঁদের কোন কোন সময়ে দেখা গেছে অন্যতম প্রধান চরিত্রের অভিনেতা হিসেবে। কিন্তু সামগ্রিক রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুপাতে তা কতটুকু ?

ব্যাপকভাবে এই ম্লানমুখ মানুষগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে। এই ভ্রষ্টজ্যোতি, শীর্ণ, নিরন্ন মানুষকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন তিনি। আজকের গণসাহিত্যের সূত্রপাত সেইখান থেকেই বলতে

পারি। সেদিক থেকে আজকের গণজীবনের চিত্রকর যে কথাসাহিত্যিকরা, শরৎচন্দ্র তাঁদের যথার্থ অগ্রনায়ক—একথা ভুলে গেলে চলবে না। তেমনি ভুলে গেলে চলবে না যে ঐ বৃহত্তর গণজীবনের প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র আধুনিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত নীতিবোধের পুনর্মূল্যায়নও করেছেন। অর্থাৎ চিন্তার মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তিনি এদেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির বহু নতুন ভাবনার দিশারী।

প্রশ্ন ওঠে যে, শরৎচন্দ্র কোথা থেকে এইসব নতুন ভাবনার উৎসারণ ঘটালেন? যে দুজনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ—প্রেরণার উৎসস্থল হিসেবে তিনি তাঁদের পথের পথিক নন। বঙ্কিমের তো ননই, রবীন্দ্রনাথেরও নন। বঙ্কিম কোনদিন তেতলার মানুষের জীবনের বাইরের কথা ভাবেন নি, বরং গাছতলার মানুষকেও তেতলায় তুলে নিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ এবং সমাজচিন্তা কোন দিনই সনাতনী রক্ষণশীলতার গণ্ডীকে ছাড়ায় নি। রবীন্দ্রনাথ কখনো যদি বা একতলা-গাছতলার বাসিন্দাদের কথা বলেছেন, যে কথা একটু আগে বলেছি, কিন্তু তাঁর নীতিবোধ এবং সমাজচেতনারও নিশ্চয়ই একটা সীমারেখা আছে। আপাতদৃষ্টিতে যা অসুন্দর, অনৈতিক, হয়তো অনাচার—যা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্ক এবং নীতিবোধকে পীড়িত করে, রবীন্দ্রনাথ তার সীমানার মধ্যে পদার্পণ করার আগেই পদসঞ্চারণ বন্ধ করেছেন।

অথচ সামাজিক আইনের মাপকাঠিতে যা অনভিপ্রেত বলে সমাজপতিদের মনে হয়, তা জীবনের বহুক্ষেত্রেই ঘটে। একদিন সমাজও ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাকে মেনে নেয়। যে শিল্পী সেই বদলকে চিত্রায়িত করতে পারেন, শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নতুন যুগের মানুষের কাছে তিনি বরেণ্য। শরৎচন্দ্রও এই গোত্রেরই শিল্পী, কারণ সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে তিনি আঘাত হেনেছেন, নীতি এবং অর্থনীতি দুই ক্ষেত্রেই। সীমাবদ্ধতা সেখানেও আছে অবশ্য; সে তাঁর যুগমানসিকতাকে যেখানে অতিক্রম করতে পারেন নি তিনি। সে কথা পরে আলোচ্য।

প্রজাপীড়ন ও গণবিক্ষোভের ছবি বঙ্কিম কোনদিন আঁকেন নি। বরং মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'জমীদারদর্পণ' প্রকাশিত হলে তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' সে গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করার জন্য সালিশি করেছিলেন। 'নীলদর্পণ'-কে উদ্দেশ্য-মূলক নাটক বলে নিন্দা করেছিলেন। নিজের শ্রেণীস্বার্থেই বঙ্কিম প্রজাপীড়ন এবং গণবিক্ষোভের ছবি আঁকতে পারেন নি, পারা সম্ভব ছিল না। বিবাহোত্তর প্রেম এবং বৈধব্যোত্তর প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কেও একই দৃষ্টি-

ভঙ্গীতে, সমান সংরক্ষণশীলতার মনোভাব নিয়ে, বিচার করতে বাধ্য হয়েছেন বঙ্কিম। সতীত্ব, সাধ্বীতা, নৈতিকতা ইত্যাদির কায়েমী স্বার্থসংরক্ষক চিন্তা নিয়ে বঙ্কিম যেখানে দেদীপ্যমান, সেখানে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে তিনি কিভাবে ভাবপ্রেরণা হতে পারেন ?

কূটতার্কিক বলবেন, বঙ্কিম শরতের ভাবপ্রেরণা ননই বা কেন ? বঙ্কিমের দেবী, জনগণ-হিতৈষণা চুলোয় দিয়ে, পতিব্রতা সতীর মতো স্বামীর ঘর করতে চলে গেল, জনগণের সম্পত্তি তছরূপ করে অত্যাচারী জমিদার শ্বশুরের বিপন্মুক্তি ঘটাল, অর্থাৎ 'নিষ্কাম কর্মসাধনা' করল ; আর শরতের ষোড়শীও গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব করতে করতে, এতদিন যার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই, তাকে স্বামী বলে চিনতে পেরে তার সেবাতেই উৎসর্গীকৃতপ্রাণা হল, চুলোয় গেল গণবিক্ষোভ ! তাহলে তফাতটা কোথায় ? রোহিণীকে মরতে হল, আর কিরণময়ীকে পাগল হতে হল। পার্থক্য কতটা ? বিধবা এবং প্রেমের জন্য কুলত্যাগিনীর শাস্তির মাত্রার তফাত হল মাত্র ! স্বামীর ঘর ছেড়ে শৈবলিনীকে নরক-দর্শন করতে হল, আর বিরাজকে গাছতলায় ভিখারীর মতো মরতে হল, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কী ? তাহলে বঙ্কিম-নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে গেলেন কোথায় শরৎচন্দ্র ?

এ তর্কের জবাব এভাবে দেওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি বিচার করি, তাহলে দেখব, তথাকথিত সতীত্বের সংজ্ঞাটাই পরিবর্তিত হয়েছে, যে সংজ্ঞা হয়তো আজকের বিচারে পুরোপুরি প্র্যাগম্যাটিক। রাজলক্ষ্মীর মতো বাইজী থাকতে পারে, সাবিত্রীর মতো মেসের ঝি, কিংবা অন্নদাদিদির মতন কুলত্যাগিনী। আজকের সমাজ এবং সাহিত্যের বিচারে এঁরা খুব অভিনব নন, বরং একটু বেশী আদর্শান্বিত বলেও এঁদেরকে মনে হতে পারে। কিন্তু এইভাবে এই চরিত্রগুলিকে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল করে তোলা বঙ্কিমের পক্ষে কি সম্ভব ছিল ? নারীর রূপের পরমতম চরিতার্থতা ততদিনই, যতদিন তার সন্তান-ধারণের মতো যৌবন থাকে, কিরণময়ীর মতো এতবড় স্পর্ধিত উক্তি বঙ্কিমের কোন নায়িকার পক্ষে করা কি সম্ভব ছিল ? প্রচলিত বিবাহবন্ধনের বাইরেও যে সন্তান আসতে পারে, উভয়পক্ষের ভালবাসার সম্মতি থাকলে, তার পবিত্রতা অন্যদের থেকে বিন্দুমাত্র যে কম নয়—অভয়ার এই যে প্রদীপ্ত ঘোষণা, বঙ্কিমের নায়িকারা এর থেকে কত,—কত লক্ষ যোজন দূরবর্তী, কে তার হিসেব করবে ? কমলের মতো অসংকোচে নিজের জন্মবৃত্তান্ত বলে যাবার মতো মানসিক দৃঢ়তা বঙ্কিম কল্পনাও করতে পেরেছিলেন কি ?

আসল কথা, শরৎচন্দ্র আমাদের জমিদারতন্ত্র তথা বর্ণাশ্রমভেদী বাঙালী-হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু সংরক্ষণী মনোবৃত্তির বহিঃসৌধটির ওপর আঘাত হেনে নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ডিকেন্স এবং ফরাসি সাহিত্যে জোলার সমধর্মী। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নির্বিত্ত নির্বিশেষে তাদেরকে নায়ক করে, প্রচলিত মূল্যবোধের আবর্তের মধ্যে অনাগত সমাজভাবনাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেছেন নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে। পিছটান আছে যেটুকু, সেটুকু অনিবার্য।

ডিকেন্স তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। জোলার উল্লেখ তিনি করেছেন। 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে টলস্টয়ের 'রেজারেকশ্যন'-এর কথা অত্যন্ত আস্থা সহকারে বলেছিলেন ; পড়েছিলেন হামসুন, জোহান বজ্যার। কাজেই রাতারাতি এক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তাঁর মানসলোকে নবযুগের অনুভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তা ঠিক নয়। রিঅ্যালিজমের পাঠ তিনি নিয়েছিলেন যথাবিধি। আর সেই পাঠ আত্মস্থ করেছিলেন তিনি নিজের জীবন দিয়ে ; জীবনের মর্মান্তিক দারিদ্র্যের, সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ; মাত্র দুটি দশ টাকার নোটের অভাবে একদা যিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি, এবং বর্ণাশ্রমভেদী সমাজে একঘরে হয়ে থেকেছেন, তাঁর পক্ষে রিঅ্যালিজমকে আত্মস্থ করাই ত স্বাভাবিক। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছিলেন শরৎচন্দ্র, এবং সেই রাজনীতি যা তখনকার বিচারে সবচেয়ে প্রগতিশীল। রাজরোষে পড়েছেন 'পথের দাবী' লিখে। সুতরাং জীবনের পাঠ আর বইয়ের পাঠ তিনি মিলিয়ে নিতে পারবেন না, তা পারবেন কে ?

হয়তো জীবনের এই আনুবীক্ষণিক অধ্যয়নের জন্য শরৎচন্দ্রের লেখায় দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে যাবার মতো মহৎ উপন্যাস—যা গোটা পৃথিবীতেই লেখা হয়েছে মুষ্টিমেয়—সৃষ্টি হয়নি। বড়োমাপের ক্যানভাসে তিনি জীবনকে আঁকেন নি ঠিকই, কিন্তু সীমাবন্ধনের মধ্যেই যে জীবনচর্চা তিনি করেছেন, তাই অনন্যপূর্ব।

হয়তো রবীন্দ্রনাথও কথাসাহিত্যের মধ্যে সামাজিকতার সংস্কারের ফলে দ্বিধাচ্ছন্ন। বঙ্কিমের মতো না হলেও, শ্রেয় ও অশ্রেয়ের দ্বন্দ্বে তাঁর রায় শেষ পর্যন্ত যা হলে সমাজের নীতিবোধের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয় না তার পক্ষেই গেছে। অনাত্মীয় যুবক বিনয়ের সঙ্গে ললিতা স্টীমারে করে আসার ফলশ্রুতিতে দুজনের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হয় 'গোরা'র লেখককে ; অমলকে চারুর ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়, 'নষ্টনীড়ে'র চারু নীড়ভ্রষ্টা হয় না। বিনোদিনী,

বিমলা, শর্মিলা—শেষপর্যন্ত সবাই নিজেদের সরহদ্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। রোহিণীর সঙ্গে অভয়ার স্টীমারযাত্রা, অথবা দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর স্টীমারযাত্রার ক্ষেত্রে এমন কোন বাধ্যবাধকতায় গ্রস্ত হননি শরৎচন্দ্র, সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য। 'শেষের কবিতা'য় অমিত, লাবণ্য, কেটি এবং শোভনলালকে নিয়ে বিবাহ, প্রেম, ইমোশ্যনাল অ্যাটাচমেণ্ট ইত্যাদির যে এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে, কমল-শিবনাথ এবং মনোরমা-অজিতকে জোড়বদল করিয়ে 'শেষপ্রশ্নে' তার থেকে আরো দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন শরৎচন্দ্র। কোন্‌টা অভিপ্রেত আর কোন্‌টা অভিপ্রেত নয়, কিংবা কী সংগত আর কী অসংগত—সে প্রশ্ন এখানে নিষ্প্রয়োজন। কী হতে পারে, সেটাই এখানে বিচার্য,—কী হওয়া উচিত, সেটা নয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে বঙ্কিমের মতো গ্রস্ত হননি—কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরও মনে শ্রেয়ত্বের কথাই ধ্রুব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা হয়তো অনভিপ্রেত, তাকে সাহিত্যে বর্জন করে চলতেই হবে, এই সংস্কার থেকে শরৎচন্দ্র আমাদের মুক্তি। আর এখান থেকেই তিনি উত্তরকালের সাহিত্যের অগ্রদূত; শুধু গণসাহিত্যেরই নয়, সংস্কারমুক্ত সাহিত্যেরও।

শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা

ড. রথীন্দ্রনাথ রায়

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর বহু বছর কেটে গেল। এর মধ্যেই শরৎসাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ের নানামুখী প্রচেষ্টা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো, যে পরিমাণে আমরা মুখে শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছি, ঠিক সেই অনুপাতে শরৎসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিচার করিনি। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থটির পরে শরৎচন্দ্রের তেমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি লেখা ছাড়া সাম্প্রতিক কালেও শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে তেমন মৌলিক আলোচনা চোখে পড়েনি। অবশ্য নিতান্ত বিশেষত্ব-বর্জিত ও মামুলি ধরনের লেখা সব সময়েই কিছু কিছু চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যেন এখনও আমরা নূতন করে ভাবতে অভ্যস্ত হইনি—গোটাকতক বিশেষণের চারপাশ দিয়েই আমরা শুধু আবর্তিত হচ্ছি।

শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত আলোচনায় এযাবৎকাল যেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত 'সমাজ-সংস্কারক' শরৎচন্দ্রের ভূমিকা। কারণ এক সময় এই নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। আরো তিনটি বিশেষণ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে খুবই প্রচলিত—সে তিনটি হলো 'দরদী', "মরমী' ও 'পতিতা'-সাহিত্যস্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষণ তিনটির পেছনে কোন বিশ্লেষণী চিন্তাধারা কাজ করেনি, যতটা করেছে পঞ্চমুখ আবেগপ্রবণতা। শরৎচন্দ্রের সাম্প্রতিক সমলোচকেরা যদি প্রচলিত সমালোচনার বেড়াজাল অতিক্রম করতে না পারেন, তবে সার্থক শরৎসাহিত্যসমালোচনা গড়ে উঠতে আজো অনেক দেরি আছে বলতে হবে।

শরৎসাহিত্য-সমালোচকের প্রথম কর্তব্য হবে প্রচলিত সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। শরৎচন্দ্র সত্যই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন কিনা? যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে কোন্ অর্থে এবং কি ভাবে? সমাজসমস্যার বহু আলোচনা শরৎসাহিত্যে আছে। কিন্তু তার যথার্থ প্রকৃতি কী, বিচার করার অবকাশ আজ এসেছে। সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—শরৎচন্দ্রের চরিত্রসমূহের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। সম্ভবত মানবসভ্যতার মধ্যে এতো বড় দ্বন্দ্ব আর নেই। শরৎচন্দ্র এই সংঘাত ও বিরোধের পূর্ণতর চিত্র এঁকেছেন—অথচ, মানবিক সহানুভূতি কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে আর-একটি প্রশ্নও জাগে,—চিরাচরিত সংস্কারকে

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র অতিক্রম করতে পেরেছে কিনা। কমল ও অভয়া ছাড়া আর কোন নারীচরিত্রই বোধ হয় প্রচলিত সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারেনি। কমল সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ ও পরিবেশের মানুষ—এইজন্য প্রচলিত সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব তার জীবনে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। অভয়া বিদ্রোহিণী সন্দেহ নেই—অথচ সেই বিদ্রোহে নারী-মনের স্বাভাবিক মমতা ও হৃদয়মাধুর্য কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয়নি। একদিকে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, সহজ শক্তি; অন্যদিকে নারীর যুক্তি, সহজাত নমনীয়তা—এই দুয়ের সমন্বয় শরচন্দ্রের এই নারীচরিত্রটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। অচলা ও কিরণময়ী—শরৎ-সাহিত্যের এই বহু-আলোচিত চরিত্র দুটি তথাকথিত বৈধতার সীমা বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু আবার তাদের প্রচলিত সামাজিক জীবনের সীমায় ফিরে আসতে হয়েছে। ডিহিরী-যাত্রার আগে ও পরে শরৎচন্দ্র যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি এঁকেছেন শিল্পাংশে তার তুলনা নেই। মেঘ-বৃষ্টি-ভরা দুর্দিন, প্রায়ান্ধকার গ্রাম্য স্টেশনের ছায়া-ধূসর পরিবেশ, বর্ষণ-ক্লান্ত ছায়া-পাণ্ডুর সকালবেলা—সমস্ত কিছু যেন এক গভীরসঞ্চারী ইঙ্গিতে শঙ্কাতুর। এ দৃশ্য যেন আত্মদ্বন্দ্বজর্জরিতা অচলারই মনোজীবনের প্রতিচ্ছবি। ডিহিরীর সেই দুর্যোগের রাত্রি—যেখানে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তার পরবর্তী চিত্র সঙ্কেতমূলক—অচলার শীর্ণগণ্ড ও পাণ্ডুর মুখশ্রীর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

কিরণময়ী দিবাকরের কাছে দেহনির্ভর নারীসৌন্দর্য ও দেহনিষ্ঠ প্রেমের ব্যাখ্যা করেছে। বাক্-বৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধিদীপ্তিতে ও মননশীলতায় কিরণময়ী অনন্য। কিন্তু তার মর্মান্তিক পরিণতির চিত্রটির সঙ্গে পূর্বতন জীবনাচরণের পাশাপাশি তুলনা করলেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কিরণময়ীর মনোবিকারের সঙ্গে তার অপরাধ-চেতনা ও অন্তস্তলশায়ী সংস্কার-বোধ যে অনেকখানিই জড়িত ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। সতীশ-সাবিত্রীও তাদের একদা-আচরিত জীবন থেকে এক আদর্শরঞ্জিত জ্যোতির্লোকের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। সংস্কার-স্বীকৃতির প্রচলিত পথে জীবনের ক্ষণ-বিদ্রোহ দূর-বিস্মৃত কালের স্মৃতিরেখার মতোই জেগে থাকে।

তথাপি এ কথাও অনস্বীকার্য যে শরৎচন্দ্র আগামীকালের দিশারী। তাঁর নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে সংস্কারপ্রবণতা যতই থাক না কেন, তবুও অচলায়তন সমাজব্যবস্থার সামনে তারা এক নূতন প্রশ্ন এনেছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে শরৎচন্দ্র আঘাত করেছেন, তার ভিত্তিমূল ধরে তিনি নাড়া দিয়েছেন। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে বর্ণিত নিরুদিদির পদস্খলনের কাহিনীকে

অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে : "কিন্তু সেই নিরুদিদি ত্রিশ বছর বয়সে যখন পা-পিছলাইয়া গেল, এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকেই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।" 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পল্লীসমাজ'—এই কাহিনী-ত্রয়ীতে শরৎচন্দ্রের সমাজসমালোচনা চূড়ান্ত স্তরে আরোহণ করেছে, সমাজরক্ষার মুখোশ পরে অত্যাচার যে কতদূর নির্মম হতে পারে, শরৎচন্দ্র তা আমাদের দেখিয়েছেন। সচরাচর নির্মম শ্লেষাত্মক কশাঘাত এবং সহানুভূতিপ্রবণতা—এই দুই বৃত্তিকে পরস্পর-বিরোধী হিসেবেই আমরা দেখতে অভ্যস্ত। শরৎচন্দ্র এখানে অপূর্ব সমাধান করেছেন—কঠোর ও সুস্পষ্ট-লক্ষ্য সামাজিক বিদ্রূপের সঙ্গে সমবেদনার অশ্রু-জলরেখা মিশিয়ে দিয়েছেন। এইদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র যেমন অভ্রান্ত সমাজ-সমালোচক, তেমনি নবযুগের নবীন জীবনবাদের উদ্গাতা। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত ঐতিহ্যের বাণীবাহক হয়েও তিনি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের পুরোধা। মধ্যবিত্ত ও গ্রামজীবনের রূপকার হিসেবে তিনি এক নূতন দলিল আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'চোখের বালি' ও 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলিতে আমরা সমস্যামূলক কথাসাহিত্যের নূতন পথনির্দেশ পাই। সামাজিক ও পারিবারিক ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্পের প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে মধ্যবিত্তের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সাধারণ ছবিই আঁকা হয়েছে—কবির মুক্তপক্ষ কল্পবিহার এক দুর্নিরীক্ষ্য জগতের স্বতন্ত্র রহস্য সন্ধানের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজ-জীবন চিত্রণে অতি-নিবদ্ধ। শরৎচন্দ্রের সমাজদৃষ্টিতে সামাজিক অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত কোন রহস্যজিজ্ঞাসা অথবা আধ্যাত্মিক আবেদন নেই—তাই তাঁর জীবনবাদ সমাজঘনিষ্ঠ। সমাজনির্ভর জীবনের তিনি যে নূতন মূল্য নির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকদের হাতে তারই বিচিত্রমুখী সম্প্র-সারণ ঘটেছে। শরৎচন্দ্র পুরাতন সমাজজিজ্ঞাসার শেষ প্রতিনিধি ও আধুনিক সমাজজিজ্ঞাসার পথিকৃৎ—কথাসাহিত্যের দুই কালচিহ্নের মধ্যমণি ও সংযোগসূত্র।

দুই

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনার কালপরিধি বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম চল্লিশ বছর। তখন 'age of interrogation' শুরু হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশেরই রচনাকাল যুদ্ধোত্তর যুগ। এই দ্বিধান্বিত ও প্রশ্ন-সঙ্কুল যুগের উত্তাপ শরৎসাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত, এ কথা বলা যায় না। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধ্যে বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা-সুলভ দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠতার অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ জাতিগঠনের যুগ—তাই সে যুগে 'চরিত্রের' প্রয়োজনীয়তা ছিল। বঙ্কিম-সাহিত্যের নরনারী-চরিত্রে একটি প্রবণতা লক্ষণীয়—তারা যেন সবসময় উঁচু সুরে বাঁধা। অর্ধ শতাব্দী পরে শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা শুরু করেছেন, তখন বাংলাদেশের সমাজজীবন পরিবর্তিত। মধ্যবিত্ত সমাজের সামান্যতম মোহটুকু ধূলিসাৎ হয়েছে। জোয়ারের দিনে যাকে শতবর্ণরঞ্জিত বলে বোধ হয়েছিল, ভাঁটার দিনে তার কঙ্কালসার জীর্ণমূর্তি চোখে পড়লো। বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসসমূহ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনী—অধিকাংশ স্থলেই জমিদার বা ঐ জাতের সম্পন্ন সমৃদ্ধ শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের কাহিনী। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসও ঐতিহাসিক উপন্যাস-সুলভ রোমাঞ্চ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। শরৎচন্দ্রের সম্পন্ন গৃহস্থরাও সাধারণ, অধিকাংশ স্থলে বিলুপ্তবৈভব। তাঁরা আর যাই হোন না কেন, কৃষ্ণকান্ত রায়ের মতো বলতে পারেন না: 'আমিই জজ, আমিই ম্যাজেষ্টর।' বঙ্কিমের উপন্যাসে নব-জাগ্রত ভূস্বামিবৃন্দের 'শিভালরি'র কথা দূরকালের ইতিহাসের মতোই বর্ণরঞ্জিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের নায়করা যেন সদ্য ইতিহাস-প্রত্যাগত—তাই ইতিহাসের মধ্যযুগীয় গরিমার রং এখনো তাদের দেহে ও মনে। শরৎচন্দ্রে এসে তারা সেই অসাধারণত্ব হারিয়েছে। পায়ের নীচে যে কঠিন বনিয়াদ ছিল, তাও ধীরে ধীরে সরে গেল—মনের মদ শুকিয়ে এলো, তাই বাইরের মদ নিয়ে মাতলামি শুরু হলো। তারা এখন বেকার, ভবঘুরে, মাতাল—বাল্যপ্রেমিক প্রতাপ পরিণত হলো দেবদাসে। এখন তাদের দিয়ে সন্তান-সম্প্রদায় গঠন করা অসম্ভব; তাদের বড় জোর সহানুভূতি দেখানো যায়—স্খলিত চরিত্রকে চোখের জলে একটু শোধন করা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রশ্নচঞ্চল ঋজুদৃষ্টি সমাজ-জীবনের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ছাড়া শিল্পীজীবনের অপরাপর ক্ষেত্রও আছে, কিন্তু সে জগৎ শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাসার অঙ্গীভূত নয়। সমাজ ও তথাকথিত প্রচলিত 'ধর্মের' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র জীবনকে নির্ণয় করেছেন।

সমগ্রভাবে সামাজিক রুগ্নতা ও শ্রীহীনতা শরৎ-সাহিত্যে ফুটে উঠলেও শরৎসাহিত্যের নরনারী-চরিত্রে তথাকথিত রুগ্নতা নেই। সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে যে মনোবিকলন ও মানস-বিকৃতির ছবি ধরা পড়েছে, শরৎসাহিত্যে তা অনুপস্থিত। কিরণময়ীর মনোবিকারের চিত্র আছে, কিন্তু সেখানেও যেন সেই নগ্নতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আসল কথা, শরৎচন্দ্র যে সমাজকে দেখেছেন, তখন সে ভাঙনের পথে চলেছে, কিন্তু তার চূড়ান্ত অবস্থা তখনও আসেনি। মধ্যবিত্ত সমাজে তখন দুর্বলতা এলেও, নানামুখী বিকৃতি দেখা দেয়নি। এই কারণেই আধুনিক যুগের সমাজচিত্রের তুলনায় শরৎচন্দ্রের সমাজচিত্র অপেক্ষাকৃত সহজ, অজটিল ও অরুগ্ন। কথাসাহিত্যের এই বিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের সমাজজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। শহর ও শহরতলীর মানুষের রক্তহীন, পাণ্ডুর জীবনযাত্রা শরৎ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আজকের মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-জীবীর কাছে শরৎ-সাহিত্যের নরনারী নিষ্পাপ, অজটিল ও অরুগ্ন।

এ তো গেল সামাজিক পরিবর্তনের কথা। শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির দিক থেকেও প্রশ্নটি বিচার করা চলতে পারে। শরৎচন্দ্রের শিল্পবোধের একটি বড়ো দিক তার অপূর্ব কলাসংযম। এই সংযমই শরৎসাহিত্যে লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে। শরৎচন্দ্র মানবজীবনের যে অংশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তার একটু এদিক-ওদিক হলেই স্থূল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সতর্ক শিল্পী শরৎচন্দ্র শিল্পের সূক্ষ্মতার ও সৌকুমার্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটতে দেন নি। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে চলন্ত ট্রেনে অচলা ও সুরেশের আদিম বৃত্তি বহিঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করেই ফুটে উঠেছে: "বাহিরের মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়জল তেমনি ভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুইটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।" সংস্কার-স্বীকৃতি ও কলাসংযম—এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। শরৎসাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রেই যাকে চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি আনুগত্য বলা হয়, তা আসলে হয়তো আর্টের সংযম। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কামিনী বাড়িওয়ালীর বাড়ির পঙ্কিল পরিবেশ ও দিবাকর-কিরণময়ীর জীবনযাত্রার অত্যন্ত বাস্তব-সমৃদ্ধ বর্ণনায় শরৎচন্দ্র অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নরনারীর চূড়ান্ত অধঃ-

পতনকেও শরৎচন্দ্র সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। আরাকানের সেই বিবর্ণ পরিবেশে কিরণময়ীর মূর্ছাতুর অবস্থার একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে শরৎ-চন্দ্র তার পরবর্তীকালের মনোবিকারের মোটামুটি সংগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবার এর মধ্যে সংযমের পরিচয়ও আছে—ব্যাধিটিই কিরণময়ীকে ও লেখককে নগ্নতার চূড়ান্ত অসম্মান থেকে বাঁচিয়েছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে যে চূড়ান্ত বিকৃতির চিত্র অপেক্ষা করেছিল, সতীশের আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে যে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। শরৎসাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কার-স্বীকৃতি ও কলাসংযমের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল জীবানন্দের ঘরে মূর্চ্ছিতা ষোড়শীর সেই অসাধারণ দৃশ্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শরৎচন্দ্রের কলাসংযম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ে: "আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কারণ সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার।" শরৎসাহিত্য-প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি অত্যন্ত সংগত।

তিন

'শরৎসাহিত্যে পতিতা'—এই কথাটি শরৎসাহিত্য-সমালোচনায় অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে মনে হয় 'পতিতা' শব্দটির যথার্থ অর্থ একটু অন্যভাবে দেখা হয়েছে। যে অর্থে বালজাক্, জোলা, কুপারিন 'পতিতা' উপন্যাস লিখেছেন, ঠিক সেই অর্থে শরৎচন্দ্র একখানাও 'পতিতা' উপন্যাস রচনা করেন নি। বার্নার্ড শ 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশ্যান'-এ ঠিক যে জাতীয় সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, শরৎচন্দ্র ঠিক তাও করেন নি। এ-ক্ষেত্রে পতিতা কথাটিই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। বার্নার্ড শ তাঁর 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশ্যান' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন: "Mrs Warrens Profession was written in 1893 to draw attention to the truth that prostitution is caused, not by female depravity and male licentiousness, but simply by underpaying, undervaluing, and overworking women so shamefully that the poorest of them are forced to resort to prostitution to keep body and soul together." —শরৎসাহিত্যে যদি কোন পতিতা থাকে তো তা 'prostitute'-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নয়। শরৎচন্দ্র একমাত্র কামিনী বাড়িওয়ালীর বাড়ির পরি-বেশ ছাড়া কোন বিকৃত ও কুৎসিত পরিবেশের চিত্র আঁকেন নি। এক

চন্দ্রমুখী ছাড়া যথার্থ পতিতা শরৎসাহিত্যে নেই, আর যারা আছে তারা সামাজিক যন্ত্রের পেষণে বিকল হয়ে আছে। শরৎসাহিত্যে এই কারণেই যথার্থ পতিতা থাকা সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র পতিতা-সাহিত্য রচনা করেছেন, একথা না বলে তিনি নারীর অভিনব মূল্য নির্দেশ করেছেন, এ কথা বলা বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থের প্রথমেই যে বেদনাতুর মন্তব্য করেছেন, তা থেকেই তাঁর জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যায়: "জল জিনিষটি নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন—যদি কোন দিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।" শরৎচন্দ্রের নারীর মূল্য নির্ধারণের পশ্চাতে শুধু সুলভ ভাবাকুলতাই নেই। দীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর মধ্যেও বহু জায়গায় এর প্রমাণ আছে। এক সময় শরৎচন্দ্র সমাজ নির্যাতিতাদের অনেকগুলি কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন, 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

নারীর মূল্য নির্ধারণে সহানুভূতিমিশ্র হৃদয়াবেগ ও যুক্তিবাদ—দুয়েরই বাঞ্ছিত মিলন ঘটেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে যাচাই করার জন্য সবচেয়ে বেশী পড়েছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার। তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে তিনি স্পেন্সারের 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ সোশিওলজি' গ্রন্থ থেকে বহু স্থান উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। ইংরেজ দার্শনিকের তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা শরৎচন্দ্রের ওপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এক জায়গায় স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। স্পেন্সারের দৃষ্টি তথ্যসন্ধানী নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি মমতাতুর শিল্পীদৃষ্টি। তাই শরৎচন্দ্রের মানবিক চেতনা তাঁর ব্যক্তিচরিত্র ও শিল্পীমানসের এক মৌলিক অধিকার। তাই শরৎচন্দ্র স্পেন্সার-সংগৃহীত তথ্যের ওপর টিপ্পনী ও মন্তব্য করতেও ছাড়েননি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন: "এদেশেই সম্পত্তির লোভে গুরুজনকে বাঁধিয়া পোড়ানো হইত। অথচ পুরুষের নানাবিধ জবাবদিহি Spencer সাহেবের পুস্তকে লেখা আছে,—It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands, which

had become common among Hindoo women''—খবরটি কোন্ পণ্ডিত তাঁহাকে দিয়াছিল জানি না, কিন্তু পোড়ানোর ধরন দেখিয়া সে বেচারা বিদেশীর চোখে বোধ করি নারীর এমনি একটি কিছু গুরুতর অপরাধের কথাই সম্ভবপর বলিয়া ঠেকিয়াছিল। হায়রে, পুড়িয়া মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই!" (নারীর মূল্য, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১০১) শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকেই তাঁর মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীর যুক্তিনিষ্ঠা ও সহৃদয় মানবিক চেতনা শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

যেসব সমস্যার কথা তিনি তুলেছেন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তার আবেদন কমে এসেছে। তাই 'অরক্ষণীয়া' বা 'বামুনের মেয়ে'র সমস্যা আজ এক বিলীয়মান যুগের কাহিনী বলে মনে হয়। কিন্তু সেই বিশেষ কালের ও বিশেষ যুগের পটভূমিকায় তিনি মানুষের জীবনের যে তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন, তা দেশকালাতীত একটি চিরন্তন সত্য। মানুষ হিসেবেই দোষত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের যে একটি মৌলিক পরিচয় আছে, শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী তারই অভ্রান্ত মূর্তি দেখেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি রচনায় যে সুপ্রচুর মানবধর্ম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, তা শুধু সাহিত্যেরই নয়, একটি জাতির চিন্তাচেতনার ইতিহাসে এক অভিনব সম্পদ। বিশেষ কোন মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, একেবারে স্বাভাবিক মানুষের সুস্থ জীবনবোধ থেকেই শরৎচন্দ্র এই দৃষ্টি পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই উদার মানবীয় চেতনার দৃষ্টি-প্রদীপের আলোয় জীবনকে দেখলে সব কিছু মিলিয়ে একটি গোটা মানুষকে পাওয়া যায়। সহজ সুস্পষ্ট গদ্যরীতি, যেন শরৎচন্দ্রের সেই মানবীয় চেতনারই যথার্থ ভাষা। তাই শরৎচন্দ্রের শব্দ-নির্বাচন, বিশেষণ-প্রয়োগ এতো যথার্থ। তাঁর গদ্যরীতি তাঁর জীবনদর্শনের বাণীবাহক। এই রীতির মধ্যেই যেন মানুষ শরৎচন্দ্রের আন্তরিক প্রকাশ। তাই বাংলাদেশের বিশেষ কালের বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্র বিশ্বরূপ দেখেছেন। এখানে তিনি বিশেষ কালের হয়েও চিরকালের, সঙ্কীর্ণ-পরিসর হয়েও গভীর-স্পর্শী, খ্যাতকীর্তি শিল্পী হয়েও মানুষ। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা নির্মম, কুটিল, চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল, ভবঘুরে যাই হোক না কেন, তাদের সবার আড়ালে একটি করুণ কোমল দৃষ্টির সজল আলো তাদেরই সঙ্গে চলেছে। সে দৃষ্টি মানুষ শরৎচন্দ্রের। শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে এ যুগের শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট। গণতান্ত্রিক ভাবনা ও মানবিক চেতনার সম্প্রসারণের যুগে শরৎচন্দ্রের উদার দৃষ্টিই আমাদের পথ দেখাবে।

বিবাহপ্রথা ও শরৎ-চেতনা

ড. শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজজীবনে বিবাহ আদিমতম না হলেও বহু-পুরাতন প্রথা। সমাজের শৃঙ্খলারক্ষায় সহায়তা করবে, সমাজকে সমৃদ্ধ করবে, এই আশাতেই বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। মোটামুটি বলা যেতে পারে, সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যেও বিবাহপ্রথা এই মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করে এসেছে। সমকালীন সামাজিক বিধিবিধানে অভ্যস্ত মানুষের কাছে বিবাহপ্রথা শুধু স্বীকৃতিই পায়নি, সংস্কার হিসাবে মনে জায়গা পেয়েছে।

বিবাহ নরনারীর মিলন। এই মিলনের পিছনে সমাজের অনুমোদন থাকে। সমাজ চায় বিবাহিত নরনারী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হোক, তাদের যৌথ জীবনের ভিতর দিয়ে পরিবার প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হয়ে সমাজদেহে বলসঞ্চার করুক।

দাম্পত্যজীবন বিবাহিত নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসায় মাধুর্যমণ্ডিত হবে, এও সমাজের কামনা। এই প্রত্যাশার অনুপূরক হিসাবে অধিকাংশ দেশেই সমাজ বিবাহ-অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগের সুযোগ নিয়েছে। সমাজ চেয়েছে বলে এই সমাজবিধান সহজেই রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করেছে। এইভাবে ধর্মের ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে নিহিত মূল্যকে ছাপিয়ে গেছে এবং বাস্তব অসুবিধার ক্ষেত্রেও সমাজের অনুমোদিত বিবাহ-ব্যবস্থাকে বিবাহিত নরনারী মান্য করতে অভ্যস্ত হয়েছে। ঘরে বাইরে পুরুষের জীবনের বিস্তৃতির জন্য একথা পুরুষের চেয়ে মেয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্য। বিবাহপ্রথাকে মান্য করা কালপ্রবাহে সংস্কারে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বিবাহের পর নরনারী যেখানে নানাকারণে পরস্পরকে ভালবাসতে পারেনি, সেখানেও মানিয়ে চলার অভ্যাস বা বিবাহ-সংস্কার বিবাহিতদের বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবন প্রাচ্যদেশের তুলনায় আগেই শুরু হয়েছে, সেখানে মেয়েদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের কঠিন প্রশ্ন আগেই সমাজ-চিন্তায় চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের মত প্রাচ্যদেশে এ পরিবর্তন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে একরকম অনুভূতই হয়নি, আরও পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বা শরৎ-চন্দ্রের জীবিতকাল পর্যন্ত এদিক থেকে মেয়েদের অধিকারবোধ অথবা অধিকারলাভ বড় করে বলবার মত এগোয়নি। শরৎচন্দ্র জীবনধর্মী সামাজিক

কথাসাহিত্যিক, আপন কালের সমাজরূপকে বা সমাজবদ্ধ নরনারীকে বাস্তব দৃষ্টিতে তিনি ফুটিয়েছেন, কাজেই তাঁর লেখায় বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের, বিশেষ করে মেয়েদের বিবাহসংস্কার-প্রভাবিত-সমাজবোধ দৃঢ়ভিত্তিক দেখা যায়।

বিবাহপ্রথাটা মূলতঃ পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার অবদান বলে এবং সমাজের কর্তৃত্ব বরাবর পুরুষের হাতেই থেকে গিয়েছে বলে দাম্পত্য-জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলতে গেলে, 'হরণ থেকে বরণ'—নানা প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই মেয়েদের বিবাহ অথবা সমাজ-অনুমোদিতভাবে আয়ত্ত করেছে। বিবাহ-ব্যবস্থায় মেয়েদের ভূমিকা বরাবরই গৌণ। শারীরিক অসম গঠনের জন্যই হোক বা মানসিকতার ধর্ম-অনুমোদিত সমাজবিহিত প্রথার প্রতি অভ্যাসগত অনুরক্তির জন্যই হোক, মেয়েরা পুরুষকেন্দ্রিক বিবাহ-কর্মকাণ্ডে সহায়িকার ভূমিকা নিয়েছে। বিবাহের পরও ব্যবস্থা একইভাবে চলেছে। বিবাহ-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সঙ্গে মেয়েদের যে ধর্মচেতনা জাগ্রত হয়েছে তা সমাজ-সংস্কার দৃঢ়মূল করে সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভাবেই বিবাহিত জীবনকে সহজে মেনে নিতে মেয়েদের প্রেরণা দিয়েছে। সুখ বা দুঃখ তাদের নিকট কর্মফল না হয়ে অদৃষ্টফলরূপে গৃহীত হয়েছে। পুরুষদের মানসগঠন ভিন্নরূপ, বিবাহ-স্বীকৃতি আর বিবাহ-সংশ্লিষ্ট কর্তব্য স্বীকৃতি তাদের কাছে এক হয়নি। এইজন্য বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে স্বীকার করে তাকে অনায়াসে অবহেলা করার বা বঞ্চিত করার ইতিহাস পুরুষের ক্ষেত্রে যত্রতত্র দেখা গেছে এবং বিবাহের 'এক সঙ্গে চলা, বলা, চিন্তা করা'র মত মিলিত জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিবাচক মন্ত্রোচ্চারণের বিপরীতে পুরুষ স্ত্রীকে বঞ্চনা-লাঞ্ছনা করে ব্যভিচারী হলেও মেয়েদের বুদ্ধি-নিরপেক্ষ ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার-জনিত পাপবোধ তার মধ্যে না থাকায় এই ভ্রষ্টাচারে পুরুষ নিজের মনের কাছ থেকে বিশেষ বাধা পায়নি। শরৎচন্দ্র কিছুটা আধুনিক কালের সাহিত্যিক হলেও এবং তাঁর সমুন্নত সমাজ- ও ধর্ম-চেতনায় ন্যায় অন্যায় স্বরূপে প্রতিফলিত হলেও গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মানসিকতা সৃষ্টিতে তিনি বিবাহ-সংশ্লিষ্ট সংস্কার থেকে তাদের সরাতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর আপন মনের দ্বন্দ্ব বা তাঁর ভাবদৃষ্টির ছাপ শরৎচন্দ্রের লেখার লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু লেখক-মানসের সেই প্রতিফলের জন্য কথাসাহিত্যের নায়কনায়িকারা নিজেদের যুগকে অতিক্রম করেনি। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসে যে ধনী ও ব্রাহ্মকন্যা বিজয়া মনের দাবিতে প্রবল ও প্রচণ্ড রাসবিহারীর পক্ষপুটে আশ্রিত ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান কর্মী বিলাসবিহারীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব বাগ্‌দানের পর ভেঙে দিয়েছে, সে কিন্তু স্বামিরূপে হিন্দু নরেনকে

বিবাহ করবার সময় নরেনদের কুল-পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ করতেই বিবাহের পিঁড়িতে বসেছে। নরেন বিলাতফেরত এবং তজ্জন্য সমাজে একরকম একঘরে। সে উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার। হিন্দুর আচার-বিচার নরেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে মানে, উপন্যাসে এমন প্রমাণ তো নেই-ই, অধিকন্তু এসব ব্যাপারে তার সংস্কারহীন মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহে বসবার সময় হিন্দু প্রথার আয়োজনে তার কোন ইতস্ততঃভাব পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার মত কোন ভাবভঙ্গী নরেনের মধ্যে দেখা যায়নি।

বিবাহসংস্কার তথা স্বামি-সংস্কারের দৃষ্টান্ত শরৎ-সাহিত্যে অনেক। স্বামী হীন হলেও স্ত্রী প্রাণপণে সেই স্বামীকে পাবার, তাকে সেবা করবার চেষ্টা করেছে, শরৎ-সাহিত্যে এ ছবির অভাব নেই। অল্প বয়সে লেখা 'শুভদা' থেকে পরিণত বয়সে লেখা 'দেনাপাওনা,' অনেক লেখাতেই একথা প্রমাণিত হবে। 'শুভদা' উপন্যাসে স্বামী হারাণ দুশ্চরিত্র, নেশাখোর, মনিবের টাকা চুরি করে সে জেলে যেতে বসেছে, শুভদা কুলমহিলা হয়েও স্বামীকে বাঁচাবার জন্য মনিব জমিদারের হাতেপায়ে ধরতে তাঁর বাড়ি গিয়েছে। পরে অকৃতজ্ঞ হারাণ যখন তাকে নিদ্রিতা মনে করে ছদ্মবেশে শুভদার সামান্য সঞ্চয় চুরি করতে তার ঘরে ঢুকেছে, চিনতে পেরে কোন অভিযোগ না করে শুভদা তার হাতে বাক্সের চাবি তুলে দিয়েছে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অন্নদা এবং দ্বিতীয় পর্বের অভয়া দুজনের স্থানই শরৎসাহিত্যের নারী-চরিত্রগুলির পুরোভাগে। দুজনকেই শরৎচন্দ্র বিশেষ যত্ন করে ফুটিয়েছেন। অভয়াকে শেষ দিকে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্রোহিণী রূপে শরৎচন্দ্র তাকে যুগবৃত্তের বাইরে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন; কিন্তু এই বিদ্রোহ করবার আগে হীন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বধূ অভয়া যে কঠিন চেষ্টা করেছে, সেখানে অন্নদার সঙ্গে তার মিল আছে। অন্নদার স্বামী দুশ্চরিত্র ও কাপুরুষ, সে শ্বশুরালয়ে বিধবা শ্যালিকার ধর্ম নষ্ট করে তাকে হত্যার পর ফেরার হয়ে মুসলমান হয় এবং সেই বিধর্মী অমানুষ স্বামীর সেবাযত্নে মহীয়সী হিন্দু বধূ অন্নদা দুঃসহ সীমাহীন দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নেয়। অভয়ার প্রতি গ্রাম সম্পর্কে রোহিণীদাদার বোধ হয় আগে থেকেই দুর্বলতা ছিল, অভয়া বুদ্ধিমতী, সম্ভবতঃ রোহিণীর সেই দুর্বলতার কিছুটা সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে অভয়া বাংলাদেশের এক গণ্ডগ্রাম থেকে অপরিচিত সুদূর ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছে। যে স্বামী তাকে ফেলে চলে গেছে, তার খাওয়াপরা, বেঁচে থাকার কোন দায় নেয়নি, যে স্বামী ব্রহ্মদেশে বর্মীরমণী বিবাহ ক'রে পুত্রকন্যার জনক হয়ে

সংসার করছে, সেই স্বামীকে ফিরে পাওয়া ছিল অভয়ার দুঃসাহসী অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য। অভয়া যখন রেঙ্গুনে অসহায় রোহিণীকে একা ফেলে পাষণ্ড স্বামীর সঙ্গে প্রোমে চলে গেল, তখন রোহিণী নয়, তার মনে বিরাজ করেছে তার স্বামী। বর্মী স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি অভয়াকে পৈশাচিক শারীরিক নির্যাতন না করে একটু স্বস্তিকর আশ্রয় দিত, অভয়া সম্ভবতঃ রেঙ্গুনে রোহিণীর কাছে আর ফিরে আসতো না। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে চণ্ডীগড়ের জাগ্রতা দেবী চণ্ডীর জপ-তপ-কৃচ্ছ্রসাধন-পরায়ণা ভৈরবী ষোড়শী তার বহু পূর্বে ফেলে আসা, বালিকা জীবনে বরমাল্য দেওয়া স্বামীকে শান্তি-কুঞ্জের ভয়ঙ্কর পরিবেশে দুশ্চরিত্র, মদপ, অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দের মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পেল; সেই মুহূর্তেই ষোড়শীর গৈরিক বসনান্তরালে শুষ্ক-প্রায় হৃদয়নদীতে বন্যা বয়ে গেল, সময়ের সমুদ্র পার হয়ে ধূসর বিস্মৃতির যবনিকা ঠেলে বালিকা অলকা অপরাজেয় নারীজীবনের মহিমায় আবির্ভূত হয়ে ষোড়শীকে তপঃক্লিস্ট শরীরের সীমার অবরুদ্ধ করে ফেলল। 'বিরাজ বৌ'-এ বিরাজ বা 'স্বামী' গল্পে সৌদামিনী স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামিগৃহ ত্যাগ করেছে, বহু দুঃখ সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা স্বামীর পায়ে ফিরে এসেই কৃতার্থ হয়েছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ দীর্ঘকাল গ্রামান্তরে অন্য বাঘিনী নিয়ে আনন্দে বাসা বেঁধেছিল, অসহায় স্ত্রী-পুত্রের অন্নবস্ত্রের ভাবনার দায়টুকুও তার ছিল না, মৃত্যুর সময় সেই স্বামী রসিকের পায়ের ধুলো পেয়েই অভাগী কৃতার্থ হয়েছে, অসহায় কিশোর পুত্র কাঙালীকে কঠিন সংসারে একা ফেলে যাবার গভীর বেদনা ছাপিয়ে স্বামীর পদধূলিলাভের তৃপ্তি মুমূর্ষু তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্ত্রী-পুরুষের বিহিত মিলনে সমাজ ক্রমেই সংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী, সমাজের বনিয়াদ বিবাহসূত্রে মিলিত নরনারীর উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে, অথচ এই ব্যবস্থায় মেয়েদের মৌলিক মানবিক অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কি না, সমাজ সেকথা কদাচিৎ ভেবেছে। তাদের সংখ্যার জন্য, অথবা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থার হারাহারি অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার জন্য, বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের সংখ্যাগত প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে কখনও কখনও কম-বেশি হয়েছে, কিন্তু মৌলিক মানবিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন এসব ক্ষেত্রে মোটামুটি উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণেরা যত খুশি বিবাহ করতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, পরিচয়ও তাঁদের মনে বা স্মরণে না থেকে খাতায় লেখা তালিকায় স্থান পেত। কিন্তু যারা এইরকম স্ত্রী হবার জন্যই কুমারী

অবস্থায় অপেক্ষা করেছে, সেই সব অবহেলিতা মেয়েদের বিবাহ-ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন, কিংবা মানুষ হিসাবে তাদের মর্যাদা বা ভবিষ্যতের প্রশ্ন সমাজের বিবেচনায় কখনও বড় হয়ে ওঠেনি। শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নয়, সারা জীবনের হিসাবে মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের এই অবহেলার ভাব চলে আসছিল। মেয়েরা ছিল শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। তবু আপনজনের অধীনতায় কিছু সুখশান্তির সম্ভাবনা ছিল, এই রকম আপনজনের অভাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় তারা দূর সম্পর্কের আত্মীয়, এমন কি অনাত্মীয় পুরুষ অভিভাবকের অধীন হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হত। তাদের এই বাধ্যতামূলক পুরুষের বশ্যতা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, এবং নিজের প্রতি মমতা অনুকূল আশ্রয় পায়নি বলে তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের বা আত্মসম্মানের বিবেচনাবোধে জড়তা লাভ করে ক্রমে স্বামী, সন্তান, পরিজন বা কাছের মানুষ যাদের পেত তাদের দিকেই স্বাভাবিকের অতিরিক্ত ভালবাসা ছড়িয়ে দিত। সমাজ একরকম আশ্বস্ত হয়েই 'নারী দেবী', 'নারী যেখানে পূজা পায় দেবতারা সেখানে প্রসন্ন হন', এই রকম দু-চারটি গালভরা স্তুতিবাক্য আউড়ে নারীর ভালবাসার উদ্‌-বৃত্ত মূল্য শোষণ করেছে। অধিকারবোধের জড়তার জন্য মেয়েরা অপমান, অবহেলা বা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দুর্বহ বেদনা ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে স্বামিপূজা চালিয়ে গেছে এবং যে স্ত্রী জীবনে কদাচিৎ বহুবিবাহিত স্বামীর সাক্ষাৎমাত্র পেয়েছে, সেও স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসা মাত্র অক্ষয় স্বর্গলাভের সোপান হিসাবে স্বামীর সঙ্গে একশয্যায় সহমরণে 'সতী' হতে চেয়েছে। সাধারণভাবে এতদিন যে মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, তাদের অধিকাংশকেই কার্যত এক ধরনের বন্দীজীবন যাপন হয়েছে। বাট্রাণ্ড রাসেলের মতে এই রকম মেয়েরা গৃহস্থের ঘরের লাভজনক পশুর সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত।* উচ্চবিত্ত-দের ঘরে তবু এরা বন্দীত্ব বা মানসিক দুঃখ সত্ত্বেও অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, তাদের পরিশ্রমও কম করতে হয়েছে, কিন্তু নিম্নবিত্ত বা চাষী-মজুরদের ঘরে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীনতার কথা বাদ দিলের এদের কঠোর পরিশ্রমের এবং পরাধীন জীবনযাপনের দুর্দশার অবধি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে জন্মেও এরা এই অসম্মানের জীবন বহন করে এসেছিল এই জন্য যে, জীবনযাপনের রীতিগত অভ্যাস এদের মনে নিশ্চল ঔদাসীন্য সৃষ্টি করেছিল,

* Thus the primary function of a wife comes to be that of a lucrative domestic animal, Bertrand Russel—Marriage and Morals.

আর যেক্ষেত্রে সামান্য মানসিক চাঞ্চল্য জেগেছিল, সেখানেও প্রবল অন্তর্নিহিত হীনতাবোধে মনের আলোড়ন দ্রুত স্তিমিত হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা মেনে নিয়ে এদের সহজ হবার ক্ষমতা বা প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। মেয়েদের গতানুগতিক, গতিহীন, ম্লান জীবনের বিপরীতে সমাজের যা-কিছু উজ্জ্বলতা পুরুষের জীবনচর্যাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষই প্রধানত মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পুরুষই মেয়েদের ভরণপোষণ করেছে, মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করেছে, মেয়েদের অসহায় অবস্থার বিপরীতে এই পুরুষরাই আপন প্রাধান্যবোধ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেছে। মাঝে মাঝে এই অন্যায় অবিচার সম্পর্কে যেটুকু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, সে প্রতিবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এসেছে হৃদয়বান মানবপ্রেমিক স্বল্পসংখ্যক পুরুষদের কাছ থেকে, বিপুল স্বার্থপরতন্ত্র-প্রভাবিত সমাজ ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনায় মাথা না ঘামিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য আন্দোলন প্রতিহত করেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীকল্যাণের চেষ্টা পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য লাভ করলে হয়তো নারীমুক্তির প্রবল আন্দোলনে পরিণত হত, কিন্তু সমাজের এই বাধাদানের জন্যই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সরকারী আইন সত্ত্বেও কার্যত ব্যর্থ হওয়ায় বৃহত্তর মুক্তি-আন্দোলনের বিপুল সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্র ২৭ বছর বয়সে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে চলে গিয়েছিলেন, অল্পদিনের জন্য মাঝে মাঝে দেশে এলেও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পৃথিবীব্যাপী মানুষের মূল্যবোধের পুনর্নির্ধারণের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা না দিলেও প্রচলিত সমাজ ও ধর্মচিন্তায় বড় রকমের ফাটল ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে। বলতে গেলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, এই সময় তাঁর 'বাগান খাতা' নামে বিখ্যাত খাতা হাতে লেখা 'বড়দিদি' প্রভৃতি কয়েকটি লেখায় পূর্ণ হয়। কাজেই বাঙালী মেয়েদের, বিশেষ করে গ্রামবাংলার মেয়েদের অবস্থা আগের হিসাবে কিছুটা ভাল হলেও তখনও পর্যন্ত শোচনীয়ই ছিল, এবং সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ। সংবেদনশীল, মানবদরদী কথাসাহিত্যিক হিসাবে আপন ভাবদৃষ্টি-সিঞ্চনে এই অসহায় জীবন-আলেখ্য নির্মাণ করে সহৃদয় পাঠকের অন্তর স্পর্শ করবার তথা এই অন্যায় বিদূরণে বলিষ্ঠ গণচেতনা জাগ্রত করবার প্রয়াস শরৎচন্দ্র সাধ্যমত করেছেন। মেয়েরা প্রায় সকলেই অসহায়, পরনির্ভর; আত্মদীপ হবার সাধনা বা সামর্থ্য তাদের ছিল না। এদের সকলের দুঃখ-কঠিন জীবনরূপ মোটামুটি বিবাহরূপ সুতোর উপর ঝুলেছে। বিবাহপ্রথা মেয়েদের

স্বাভাবিক মানস-উন্নয়ন বা জীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতির আনুকূল্য করলে মেয়েদের জীবনে দুঃখের অবসান ঘটার সম্ভাবনা তো হতোই, স্বাধিকারবোধের আলোতে মেয়েরা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে পারতো, শরৎচন্দ্র একথা বিশ্বাস করেছেন। নারীর পশ্চাৎপদতা, নারী-মানসের অনুন্নতি সামাজিক শক্তির অপচয়, এই অনগ্রসরতা বিদূরণে বিবাহপ্রথার পরিবর্তন যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, জীবনশিল্পী জর্জ বার্নার্ড শ'র মত শরৎচন্দ্রের এরূপ ধারণা ছিল। মেয়েদের অসহায় দুঃখময় জীবনের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, মেয়েদের হীনতার বদ্ধজলে ডুবিয়ে রাখবার স্বার্থবাদী চক্রান্তের মুখোস উন্মোচিত করে প্রবল মানবতাবোধে জাগ্রত শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' রচনা করেছিলেন। 'নারীর মূল্যে' তথ্যসন্নিবেশে কিছুটা পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় থাকতে পারে, গ্রন্থখানিতে বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় পটুত্বের কিছু অভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু নাট্যকার বার্নার্ড শ তাঁর কঠিন সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক নাটকগুলির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে যেমন মুখবন্ধগুলি (prefaces) লিখেছেন, শরৎচন্দ্রও বলতে গেলে তেমনি গল্প-উপন্যাসগুলির নারীচরিত্রসমূহের মূলে তাঁর যে ভাবদৃষ্টি ক্রিয়াশীল, 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে সেই মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে মেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হোক, এই আন্তরিক কামনা শরৎ-সাহিত্যে ও শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে বারবার দেখা যায়, কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ত্রী নিজেকে বিবাহের ভিতর দিয়ে স্বামীর দাসীত্বে প্রতিষ্ঠিত মনে করবে, শরৎচন্দ্র এই সংস্কারের প্রতিবাদ করেছেন। বাজে শিবপুর থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তাঁর স্নেহধন্যা শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র স্পষ্টই লিখেছেন : 'এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়ে রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।' বিবাহ সমাজের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা, কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি হিসাবে মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে, শরৎচন্দ্র এ চিন্তা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করেছেন। বিধবার ভালবাসা বা বিবাহের অধিকার আছে, এই মত প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে উপরোক্ত ২৯।৭।১৯১৯ তারিখের চিঠিতে তাই লিখেছিলেন : 'যে (বিধবা) একবার (স্বামীকে) জানিয়াছে, চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে

পাইব, ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারই গোপন আছে যে, স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।' পুরুষের চোখে পুরুষের হিসাবে নারীর অমর্যাদা শরৎচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করেছে।* তিনি এই অসম্মানজনক অবস্থা থেকে সম্ভাবনাময় নারীচিত্তের মুক্তি চেয়েছেন। নারীর অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে তিনি 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে পুরুষের মালিকানাসূচক মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন, "সুতরাং লড়াই করিয়া নিজেরা মরিলে বা কন্যা হত্যা করিলে নারীর অনুপাত বাড়ে না, কমেও না, অনুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে না। করে, পুরুষের এই ধারণার উপর—নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু! তাই নিজের কন্যাবধ, তাই পরের কন্যা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা! নিজের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহাগৌরব! এইজন্য এক পুরুষের বহু স্ত্রী সম্মান ও বলের চিহ্ন।"

সমগ্র সাহিত্যকেই জীবনের সমালোচনা বলা হয়, কিন্তু এই সংজ্ঞালাভের অগ্রাধিকার কথাসাহিত্যের। সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ কথাসাহিত্যের মূল কাজ। কাজেই একথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না যে, সমাজের এক বৃহৎ অংশ নারীদের জীবনরূপের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দানের সাফল্য কথাসাহিত্যের সাফল্যের বড় মাপকাঠি। তরুণী পর্যায়ের যে প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, তাদের অনেকেরই জীবনে বিবাহের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহ উপলক্ষ করে তাদের অনেকেরই হৃদয় প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে, বিচিত্র ভাবতরঙ্গ চিত্তলোক প্লাবিত করেছে এবং পরবর্তী জীবন এই আলোড়নে বা প্লাবনে বিশেষ রূপ পেয়েছে। প্রেমের চিত্র যেখানে দেখা যায়, তার প্রায় সব জায়গাতেই বিবাহের প্রশ্ন থেকে যায়। বিবাহের পূর্বে প্রেম সাফল্যকামনা করে বিবাহের পরিসমাপ্তিতে, বিবাহোত্তর দাম্পত্যপ্রেম বিবাহ-অনুষ্ঠানের বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, বিবাহিতার অবৈধ প্রেমের মূল

* সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের এ ক্ষুব্ধতা 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গাত্মক উক্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, 'ভগবান শঙ্করাচার্য স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evils, অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল। ইউরোপপ্রসিদ্ধ লাটিন ধর্মযাজক টারটুলিয়ান নারীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন, Thou art the devil's gate, the betrayer of the true, the first deserter of the divine law. ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন, যিনি সেন্ট পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it is in the person of mother or sister ; we have to be beware of the Eve in every woman. সেন্ট আমব্রোস, ইনিও সেন্ট, তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body, not a part of his soul to make her.'

প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিজীবনে বিবাহজাত শূন্যতায় আশ্রয় পায়। শরৎচন্দ্র ভালবাসার যেসব অপরূপ ছবি এঁকেছেন পাঠকচিত্তে সেগুলির স্থায়ী স্থানলাভ বিবাহকেন্দ্রিক ভাব-ভাবনা-নির্ভর সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র প্রেমের মহিমা-বর্ণনায় কার্পণ্য করেন নি, প্রেমকে পবিত্র মনোধর্মরূপেই তিনি চিত্রিত করেছেন, কিন্তু প্রেমের জন্য ব্যর্থতার বেদনায় ও দুঃখবরণে তাঁর নায়িকা বা নায়করা যখন আর্ত হয়ে ওঠে, সেই আর্তির ভিতর দিয়ে প্রায়ই প্রতিফলিত হয় বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব। সমাজের ত্রুটিবাচক বিবাহ-প্রথার দৈন্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কটাক্ষ তাঁর বিশাল সাহিত্যে নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। বার্নার্ড শ'র মতই শরৎচন্দ্র বিবাহপ্রথার দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই প্রথা সমাজের পুরানো কাঠামো টিকিয়ে রাখবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যাপকভাবে মানুষের সুখশান্তি বা কল্যাণসাধন এর প্রধান লক্ষ্য নয়। বার্নার্ড শ'র মতই তাঁর ধারণা জন্মেছিল, পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি বিবাহ-প্রথা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধিত না হয় তাহলে অবশ্যই হয় বিবাহপ্রথা বাতিল হয়ে যাবে, আর না হয় সমাজবদ্ধ মানুষদের চরম অবক্ষয় ঘটবে।* প্রেম-জীবনের বেদনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্য বিবাহপ্রথার গুরুত্ব এমনি প্রকাশ করেছে, তবে সেই প্রকাশের ফাঁকে ফাঁকেই বেদনাম্লান জীবনের সুস্থ পুনর্বাসনের আবেগ এমনভাবে স্পন্দিত হয়েছে যাতে এর ভিতর আর্তির মূল বিবাহ-ব্যবস্থার উপর লেখকের ভাবদৃষ্টির প্রক্ষেপ ধরা পড়ে।

শরৎসাহিত্যে বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ধারণা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব ভাল ছিল না, মানস গঠনের হিসাবেও তাঁর মধ্যে স্থায়ী নৈষ্ঠিক দৃঢ়তার অভাব ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক চেতনা তাঁর মনোধর্ম হলেও এবং পাপ-প্রবঞ্চনা-মিথ্যাচারের সঙ্গে সংগ্রামে তিনি প্রাণের আবেগে অনেক সময় বিনাদ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লেও চলতি সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা চূর্ণ করে দেবার মত ভাঙনশিল্পী তিনি

* বার্নার্ড শ তাঁর বিখ্যাত নাটক Getting Married-এর সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রথমে বিবাহ-প্রথার দৈন্য সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন, 'Our marriage law is inhuman and unreasonable to the point of downright abomination.' কিন্তু এরপর বর্তমান অবস্থার চিন্তায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'There is, therefore, no question of abolishing marriage ; but there is a very pressing question of improving its conditions.

এরপরই তিনি উচ্চারণ করেছেন সাবধানবাণী, 'There is no shirking it. If marriage cannot be made to produce something better than we are. marriage will have to go or else the nation will have to go.

ছিলেন না। আসলে তাঁর মধ্যে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার প্রবল ছিল, অথচ অন্যায়ের বেড়াজাল থেকে সত্যকে মুক্ত করবার, সুস্থ সুন্দর জীবনকে পুনর্বাসিত করবার আবেগ তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে। এইজন্যই দেখা যায়, সামাজিক দুর্নীতির উপর আঘাত হানার আন্তরিকতা তাঁর যতখানি ছিল, নিষ্ঠা ছিল তার চেয়ে কম। ফলে কোন কোন সময় শরৎচন্দ্রের লেখায় চেতনার বলিষ্ঠ ঋজু প্রকাশের সঙ্গে মৃদু প্রকাশ, এমনকি প্রকাশ-দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোল্লিখিত 'দত্তা' উপন্যাসে নরেন-বিজয়ার বিবাহ এ হিসাবে একটি ভাল দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্র নিজে হিন্দু হয়েও হিন্দু-ব্রাহ্মের এই বিরোধের যুগে হিন্দু নরেনের সঙ্গে ব্রাহ্ম-কন্যা বিজয়ার বিবাহ দিয়ে আশ্চর্য সাহস ও ঔদার্য দেখিয়েছেন এবং সংস্কারগত গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে ভালবাসাকে বিবাহের ভিত্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এই উজ্জ্বল আধুনিকতার সঙ্গেই নরেনদের কুল-পুরোহিতের দ্বারা হিন্দুপ্রথায় বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে বাস্তব জীবনের রূপকার হিসাবে দেখতে হবে এবং সমাজের প্রভাব বা ক্ষমতা পরিমাপ করে সমকালীন জীবনরূপ অঙ্কনের প্রয়োজনও স্মরণ রাখতে হবে। বিবাহ-প্রথার মত সার্বজনীন সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথার উপর অভিমত প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্রের ন্যায় জীবনধর্মী কথাসাহিত্যিকের পক্ষে বাঙালীর জীবনরূপের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলের ও বাঙালী জীবনের গতিহীনতার কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য ব্যক্তিগত অভিমতের স্পষ্ট প্রকাশে তাঁকে সাবধান হতে হয়েছে। তবু প্রথাটির অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তিনি প্রথাটির পুনর্মূল্যায়ন অবশ্যই চেয়েছিলেন। 'বিলাসী' গল্পের উপসংহারের নিম্নোদ্ধৃত তীক্ষ্ণ মন্তব্য থেকে শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবের সম্যক পরিচয় মিলবে, "আমার মনে হয় দেশের নরনারীর মধ্যে হৃদয় জয় করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ এবং ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞসমাজ সর্বপ্রকার হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন যেমন ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract, তা সে যতই কেন না বৈদেশিক

document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে।"

ইউরোপে সমাজের একদেশদর্শী বিধানের নাগপাশ থেকে নারীর বন্ধনমুক্তি শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ফরাসী বিপ্লব হতে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী এই বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপীয় জনসমাজকে উদ্বেল করে নারীকে আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং তার মনে স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করেছিল। বাংলাদেশে এই আবেগের সূচনা বিলম্বিত হয়েছে, বলতে গেলে বহুকালের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে সমগ্রভাবে মেয়েদের জাগিয়ে তোলার মত সক্রিয় বলিষ্ঠ আদর্শবোধ এখনও এদেশে সঞ্চারিত হয়নি। তবু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নারীজাতির প্রতি গভীর মমতাবোধ ও নারীকল্যাণের প্রয়াস সূচিত হবার পর মানবমুক্তির আবেগবিজড়িত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাপেই বাংলাদেশে এই নারীর বন্ধনমুক্তির সত্যকার স্পন্দন অনুভূত হয়েছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে নারীর সামাজিক মুক্তি আন্দোলন বাস্তব রূপ পেয়েছে বলা চলে। শরৎচন্দ্র একরকম এই ইতিহাসের গোড়ার দিকের মানুষ, তাঁর জীবনের প্রস্তুতি-পর্বের দুর্বলতার কথা আগেই বলা হয়েছে, কাজেই তাঁর লেখায় নারীমুক্তির দাবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও* এবং নারী-জীবনের বনিয়াদস্বরূপ প্রচলিত ব্যবস্থায় বিবাহপ্রথা সম্পর্কে তাঁর আপত্তি থাকলেও সমকালীন জনমানসের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথার প্রশ্নে তিনি আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের কীর্তিস্বরূপ তাঁর তিনজন প্রসিদ্ধ স্ত্রী-চরিত্রের জীবন-রূপের তুলনামূলক বিচারে বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানছি। চরিত্র তিনটি হল 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অন্নদা, 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের অভয়া এবং 'শেষপ্রশ্নে'-র কমল।

* "স্বদেশ ও সাহিত্য" গ্রন্থের "স্বরাজসাধনায় নারী' এ হিসাবে শরৎচন্দ্রের একটি মূল্যবান রচনা। এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, আমার জীবনের অনেক দিন আমি Sociology-র পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকে আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে।...

এইখানে একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা! যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও।...আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মেয়েমানুষ হয় এবং স্বাধীনতায়, ধর্মে ও জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী স্বীকার করি ত এ দাবী আমাদের মঞ্জুর করতেই হবে। তা সে ফল তার যাই হোক। ...আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এসো তোমার হিতের জন্যে মুখে পরদা ও পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি।"

'শ্রীকান্ত' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'শেষপ্রশ্ন' ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এ হিসাবে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীকান্ত' ১ম ও ২য় পর্ব শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের উপন্যাস এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শেষপ্রশ্ন' তাঁর শেষদিকের উপন্যাস। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, অন্নদা এবং অভয়া—দুটি চরিত্রই শরৎচন্দ্র সুন্দর করে এঁকেছেন, দুটি চরিত্রই অত্যুজ্জ্বল, কিন্তু জীবনদৃষ্টির হিসাবে চরিত্র দুটিতে গুরুতর পার্থক্য আছে। অন্নদা বিবাহ-সংস্কার বা স্বামী-সংস্কারের উপর পরিকল্পিত হয়েছে। মুসলমান স্বামীর ঘর করলেও অন্নদা নিষ্ঠাবতী হিন্দুবধূরূপ বজায় রেখেছে এবং বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামীকে দুনিয়ার অন্য সব কিছু বিচার-বিবেচনা-নিরপেক্ষভাবে স্বামী হিসাবে দেখেছে। অন্নদা সাধ্বী হিন্দুনারীর আদর্শে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীন জীবন যাপন করেছে। অভয়ারও প্রথম দিকে অন্নদার মতই স্বামিসংস্কার ছিল, সেও তাকে-ফেলে-বার্মায়-চলে-যাওয়া স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে বহু দুঃখ বরণ করে অনাত্মীয় এক পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছে। অন্নদার সঙ্গে অভয়ার মিল এই পর্যন্ত। দুজনের স্বামীই দুর্বৃত্ত এবং অত্যাচারী। অন্নদা স্বামীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে, অভয়া কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলনের বহুলালিত আকাঙ্ক্ষা স্বামীর হীনতার পঙ্কে নিক্ষেপ করে বিদ্রোহিণী হয়েছে। সে চিরকালের জন্য অত্যাচারী স্বামীকে ত্যাগ করে পরপুরুষ হলেও যে পুরুষ তাকে সত্যকার ভালবাসে সেই রোহিণীবাবুর সঙ্গে রেঙ্গুন শহরে ঘর বেঁধেছে। শরৎচন্দ্রের নায়ক শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের ছায়া আছে, এমন কথা অনেকেই বলেন। শ্রীকান্ত এই দুই বিপরীতমুখী স্ত্রী-চরিত্রকেই পৃথক পৃথকভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কিন্তু সেই শ্রদ্ধানিবেদনে মাত্রার তারতম্য আছে। অন্নদাকে শ্রীকান্ত দেবী বলেছে, প্রথম দর্শনেই অন্নদাকে তার মনে হয়েছে, 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।' শ্রীকান্তের অন্নদা সম্পর্কে এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। অভয়া সম্বন্ধে শ্রীকান্ত উচ্চধারণা পোষণ করেছে, অভয়া প্রোমের স্বামীর ঘর থেকে রেঙ্গুনে রোহিণীর কাছে ফেরার পর শ্রীকান্ত তার সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক রেখেছে, তার গুণের সামগ্রিক বিচারে মুগ্ধ শ্রীকান্তের চোখে অভয়া বরাবর বড় হয়েই আছে। কিন্তু তবু প্রথম দিকেই এই উপন্যাসপর্বে শরৎচন্দ্রের ভাবদৃষ্টিতে বিবাহপ্রথার তথা স্বামী-সংস্কারের উপর আঘাত দেবার

মত উজ্জ্বল নারীচরিত্র উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের অন্তরে কিন্তু অন্নদাদিদিই উচ্চতর স্থান পেয়েছেন, অভয়া সেখানে তুলনায় পিছিয়ে গেছে। এই দুই নারী সম্পর্কে শ্রীকান্তের আপেক্ষিক অনুরক্তি তার নিজের ভাষাতেই নিম্নে বর্ণিত হল, "তাহার (অভয়ার) চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহার অন্তরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি একাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনটা কাটাইয়া দিতেন ; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না।"

মনে হয়, অন্নদাকে শ্রীকান্তের তথা শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা খাঁটি সোনাকে স্বীকার করবার মত অন্তরের স্বতঃউৎসারিত হৃদয়ভাবের প্রকাশ, জটিল তত্ত্বের বিবেচনার প্রয়োজন সেখানে স্থান পায় নি। অভয়ার ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে, সে বিশ্লেষণে জয়ী হয়েছে অভয়া। অভয়া শ্রীকান্তের তথা শরৎ-চন্দ্রের স্বীকৃতি আদায় করেছে, তার মাধ্যমে নিপীড়িত নারীজাতির ক্ষোভের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এবং বিদ্রোহিণী অভয়ার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।* কিন্তু একাজ যিনি করেছেন, তিনি মানবতাবাদী ক্রান্তদর্শী আবেগ-প্রবণ শরৎচন্দ্র, অভয়ার বিদ্রোহের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁর বিদ্রোহী মন আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার অন্নদার তুলনার শ্রীকান্ত যখন অভয়াকে পিছনে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন প্রাধান্য পাচ্ছে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে আবদ্ধ হৃদয় ; এই অনুপমা-নারী-চরিত্রে পবিত্রতাবোধ এবং মানস-সৌন্দর্যের প্রচলিত ধারণার সার্থক অভিব্যক্তিতে শরৎচন্দ্রের এই সমাজমুখী মনের অংশ পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাওয়ার আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

এখানে আগের যুগের লেখায় দুই প্রান্ত আপন আপন ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান হয়ে ফুটলেও একই সঙ্গে উভয়ের বিচার করবার মানসিকতায় শরৎচন্দ্রের আধুনিক মন পিছিয়ে গেছে বলা চলে। অন্নদা ও অভয়া 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে একসঙ্গে উপস্থিত হয়নি, পৃথক পর্বে এসেছে। লেখক

* শরৎচন্দ্র অপরিমেয় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অভয়াকে ;—"আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন নয়—মৃত্যু, সেও তার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এইসব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।'

ইচ্ছা করলে বা সতর্ক হলে এই তুলনামূলক বিচারে অন্নদাকে অভয়ার উপরে তুলে দেবার প্রয়োজনই হয়তো হত না। কিন্তু প্রথম দিকে এই তুলনা-সন্নিবেশের সঙ্গে লেখক শরৎচন্দ্রের কঠিন সমাজ-সমস্যা মোকাবিলার উপযুক্ত দৃঢ় মানস-গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তাঁর মনের দুই পৃথক অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল, তাই অভয়ার কথা হৃদয়াবেগের সঙ্গে উপস্থাপিত করেও এবং চরিত্রটি উজ্জ্বল করে গড়ে তুলেও অন্নদামুখী তথা সমাজমুখী মনের অংশকে শরৎচন্দ্র জিতিয়ে না দিয়ে পারলেন না।

অভয়া-চিত্রণের তেরো বৎসর পরে 'শেষপ্রশ্নে'-র কমলের সৃষ্টি হল। 'শেষপ্রশ্নে'-র নায়িকা কমল বিবাহপ্রথার প্রয়োজনের উপরই প্রশ্ন রেখেছে। শিবনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, শিবনাথ কমলকে ত্যাগ করে মনোরমার প্রতি আসক্ত হয়। কমল শিবনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কমল বলে, শিবনাথের ভালবাসাই যখন হারাল, শিবনাথের স্ত্রী হয়ে থাকা তার পক্ষে অর্থহীন। কমল স্পষ্টই বলে, শিবনাথের ভালবাসা না পেয়েও শিবনাথের সঙ্গে বিয়ের উপর যদি সে বাঁচতে চায় তাহলে তার পক্ষে সে বাঁচা মহা-দুঃখের, বিয়ের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদ আদায় হয়তো চলতে পারে, কিন্তু আসল তো ডুববে। এরপর কমল আবার ঘর বাঁধতে এগিয়েছে অজিতের সঙ্গে। এবার কিন্তু কমল নিজেকে আর বিবাহের বন্ধনে জড়ায়নি। অজিত চেয়েছিল বিবাহ হোক, বিবাহ করতে কমলকে সে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কমল বিবাহের মন্ত্রের চেয়ে ভালবাসার পাথেয়ই দাম্পত্যজীবনের কাম্য আশ্রয়, এই সত্যোপলব্ধির উপর জোর দিয়ে অজিতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। কমল দরদের সঙ্গে অজিতকে বলেছে, "তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, এত নিষ্ঠুর আমি নই।"

'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বের অভয়া এবং 'শেষপ্রশ্নে'-র কমল দুজনেই বিবাহ না করে ভালবাসার উপর ঘর বেঁধেছে এবং দুজনেই আশা করেছে, বিবাহিত জীবনের চেয়ে এই ভালবাসার জীবন সুখের হবে। দুজনেরই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসে অভয়া এবং কমলের এই ভালবাসা-নির্ভর দাম্পত্য রূপের প্রস্তাবনামাত্র ঘটেছে, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন-রূপ বিবৃত হয়নি। তবু এই প্রস্তাবনার দীপ্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু এই বিবাহ-অস্বীকার-করা ভালবাসার ঘর বাঁধায় শরৎচন্দ্রের প্রসন্ন পূর্ণ সম্মতি আছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। অভয়ার চেয়ে অন্নদাকে শরৎচন্দ্র যে অধিক

মর্যাদা দিয়েছেন, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'শেষপ্রশ্ন' শরৎ-চন্দ্রের পরিণত বয়সের লেখা, বইখানি শরৎচন্দ্রের প্রিয়,—একথা জীবনীকার-গণ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশেষভাবে জানিয়েছেন। 'শেষপ্রশ্নে' কমল-অজিতের মিলনের প্রস্তাবনাই হয়েছে, সে মিলিত জীবন ফলপ্রসূ হবে কিনা, তাদের বিবাহের চেয়ে বড় জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, সেকথা উপন্যাসে বলা হয়নি। এইজন্য পরিণতবুদ্ধি শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে' বিবাহকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছেন, এমন কিছু ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তবে একথা ঠিক যে, পার্বতীর বেদনার্ত জীবনের ছবি এঁকে শরৎচন্দ্র বিবাহ-ব্যবস্থার উপর যে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, অভয়া-কমলের প্রেম-নির্ভর দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিতবাহী রচনার সঙ্গে দৃষ্টি-ভঙ্গির একটা কোণ থেকে তার মিল আছে। যে বিবাহপ্রথা নরনারীর সম-অধিকারের ভিত্তিতে চলে না, পুরুষ-প্রধান যে ব্যবস্থা নারীর মনুষ্যত্বের অপমান এবং নারীত্বের প্রতি লাঞ্ছনা বহন করে, সেই প্রথার অন্ততঃ পুন-র্বিন্যাস অত্যাবশ্যক—এই অন্যায় ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না, একথাই শরৎচন্দ্রের এইসব কাহিনী উপস্থাপনের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। বিবাহকে শরৎচন্দ্র সরাসরি অস্বীকার করেননি, অস্বীকার করবার সাহসের প্রশ্ন এক্ষেত্রে ঠিক ওঠে না, অস্বীকার করে বিকল্প কিছু উপস্থাপনের শক্তি তাঁর ছিল না, একথাই বড়। 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের উজ্জ্বলতা যাই থাক, কমলের স্নিগ্ধ জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী আশুবাবুর কথাবার্তার মধ্যে শরৎমানস যেভাবে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে, তাতেও কমলের মতামতে শরৎচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থনের সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে। 'শেষ প্রশ্নে'র তিন বৎসর পরে 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্ব এবং চার বৎসর পরে "বিপ্রদাস" প্রকাশিত হয়েছে। "শ্রীকান্ত" ৪র্থ পর্বেও বিবাহ-সংস্কার তথা সমাজ-সংস্কারে অবদমিত দুটি মিলনকামী প্রেমিক-প্রেমিকা আগের তিন পর্বে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, কমলের প্রভাবে রাজলক্ষ্মী বরাবরের মত কাছাকাছি পেয়ে এই পর্বেও শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধবার মত কোন উদ্যমই দেখায়নি। এ পর্বেও তার অন্তরবাসনার প্রতিরোধ ঘটেছে তার নিজেরই মনের দ্বারা, তার সমাজ-সংস্কারে। 'বিপ্রদাসে' সতীর উপর আবার অনেকটা 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের সাধ্বী অন্নদার ছায়া পড়েছে। কমলের পর সতী-চরিত্র আঁকার মধ্যেও কমলের বিবাহ অস্বীকৃতির সমর্থনে শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতির প্রশ্ন কিছুটা তরল হয়ে গেছে।

মোটের উপর, শরৎচন্দ্র বিবাহ-প্রথা একেবারে বর্জন করতে না চাইলেও

প্রথাটির সংশোধন চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভক্ত ছিলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল কিন্তু বর্তমান বিবাহ-প্রথার গুরুত্বই অস্বীকার করেছেন। রাসেলের মতবাদ শরৎচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও শরৎচন্দ্র এ হিসাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত চরমপন্থী হননি। তিনি ঔপন্যাসিক, তাত্ত্বিক নন। মানবতাবোধ বা হৃদয়াবেগের চাপেই তিনি প্রচলিত বিবাহ-প্রথার দোষত্রুটি এবং নারীদের বিবাহজনিত দুর্গতির ব্যাপকতায় ব্যথাবোধ করেছেন, পারলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সতীত্ব-ধারণা বিবাহের বাধ্যতামূলক আদর্শবোধ থেকে জন্মেছে, মোটামুটি সতী সেই যে স্বামীর দোষগুণনিরপেক্ষভাবে স্বামী-সেবায় অভ্যস্ত, শরৎচন্দ্র নারীর এই মনোভাবকে হীনম্মন্যতার পরিচায়ক বলে মনে করতেন। জৈবিক কামনা-বাসনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কেউ কেউ নানা মহৎ গুণ সত্ত্বেও এ হিসাবে দুর্বলতা দেখায়, শরৎচন্দ্র বলেছেন এই দুর্বলতা প্রশংসার্হ না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শুধু এই দুর্বলতার জন্যই এইসব গুণ উপেক্ষা করা অন্যায়। মেয়েদের পক্ষে অন্য দুর্বলতা সত্ত্বেও এর বিপরীতে মহৎ গুণের সন্ধান পেলে শরৎচন্দ্র সেই গুণের স্বীকৃতি ও তজ্জন্য প্রশংসা করতে এগিয়ে গেছেন। শ্রীকান্তর গ্রাম-সম্পর্কিত দিদি বিধবা নিরুর * নৈতিক চরিত্র-দুর্বলতার ছবি এঁকেও নানা গুণের জন্য তিনি তাকে সম্মান জানিয়েছেন। তিনি অনুরূপ সম্মান জানিয়েছিলেন সতীপদবাচ্য না হলেও অভয়াকে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব চলতি বিবাহ-ব্যবস্থার উপর অন্ধ-নির্ভরতা-অনুগ নয়। ১৩৩১ সালের চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে সাহিত্যশাখায় প্রদত্ত ভাষণে এইজন্যই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।'

* নিরুদিদির কাহিনী উল্লেখ করে পরে শরৎচন্দ্র মেদিনীপুরের এক সভায় বলেছেন, 'দিদির হয়তো সতীত্ব নেই কিন্তু তাই বলে তার নারীত্ব থাকবে না কেন?...নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বালবিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে না পেরে থাকে, তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না?...এইজন্যই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করে দেখেছি।'

উত্তরকালের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সর্বাপেক্ষা পঠিত লেখক হলেও তাঁর উপযুক্ত মূল্যায়ন আজও অপ্রতুল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের মতো শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র, সংগ্রামের ময়দান, সংস্কৃতিচর্চার প্রয়াসে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে উঠলেন না, বরং বলা যায়, উত্তরকালের বিস্মৃতি যেন তাঁর বিপুল অসামান্য সৃষ্টির উপর ছায়া-পাত ঘটিয়েছে। একদিকে সাধারণ মানুষের উদাসীনতা ও অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অবজ্ঞা—এই পরস্পরবিরোধী ব্যাপারটাকে মেলানো খুব কঠিন। উত্তরকালের মানুষের কাছে তাঁর আবেদন, "দেশের জন্য অবহেলিত মানবসমাজের জন্য আমি কতটুকু করেছি তা স্থির করার ভার রইল ভাবী-কালের সমাজের উপর।" লেখকের বক্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে দেশ ও অবহেলিত মানবসমাজের জন্য তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে দায়িত্ব পালন করার প্রয়াস করেছেন। আর সমকালের পাঠক যখন সাগ্রহে তাঁর সৃষ্টি উপভোগ করেছে তখন একথা বলতেই হবে যে অন্ততঃ সমকালীন সমাজ তাঁর সাহিত্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু শরৎচর্চায় উত্তরকালের বিমুখতা লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র অবশ্য এ বিষয়ে খুবই নিস্পৃহ মনের পরিচয় দিয়েছেন : "যে কাল আজও আসে নি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানের সত্যোপ-লব্ধি যদি ভবিষ্যতে সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তাকে তো ছাড়তেই হবে।···এক যুগে, যে মূল্য মানুষে খুশী হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্ধেক দাম দিয়েও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে শিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।" কবির এই উক্তি বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার পরিপোষক। তাই শরৎসাহিত্য আলোচনার অবকাশে তাঁর সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত একান্তই প্রাসঙ্গিক।

দেড়শত বর্ষেরও বেশী ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস হল নিরঙ্কুশ লুণ্ঠন ও শোষণ, আর সেই শোষণকে তীব্রতর করার জন্য রেলপথ, যন্ত্রশিল্প ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন হয়েছিল। এই নতুন ঘটনাবলীর অনিবার্যতা প্রতিরোধশক্তির জন্ম দিয়েছিল। মার্কস বলেছিলেন, আধুনিক শিক্ষার

প্রভাব ভারতে দেখা দেবে। দেখা দিয়েও ছিল, যা নবজাগরণ নাম পেয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তার পক্ষপুষ্ট সামন্ততন্ত্র এবং আরও অসংখ্য ছোট বড় বাধা দেশের অনিবার্য পরিবর্তনে সূচিত অগ্রগতির দ্রুততায় পিছুটান সৃষ্টি করে চলেছিল, বিশেষ করে চিন্তার জগতে। কী উদ্যম, কঠিন অধ্যবসায় ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে, নিজের ভিতরের হাজার হাজার বৎসরের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে, ভেদ-বিভেদ-ব্যবধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে তবে মুক্তিকামী শক্তি এক-পা এক-পা করে এগোতে পারছিল। এই অগ্রগতিতে নবোদ্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তানায়কদের বিবিধ অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এদের শ্রেণীসুলভ সীমাবদ্ধতা, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা, সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে বন্ধন, শোষকশ্রেণীর ঈর্ষা-দ্বেষ-মাৎসর্য-প্রভাবিত ভেদ-বিভেদ, অগ্রগতিকে কিরূপ আড়ষ্ট করেছে, তাও ভুলবার নয়। সংস্কৃতিতে শেষোক্তের প্রতিফলন হয়েছে ধর্মের মোহসৃষ্টি, পুনরুজ্জীবনবাদ, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা, এমন কি সাম্প্রদায়িক বৈরিতার পরিচর্চায়। আর তার সঙ্গে রয়েছে ইংরেজের রোষ সম্বন্ধে সচেতন থেকে বিচক্ষণ সাবধানী পদক্ষেপ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কার্ল মার্কস বলেছেন, "এইসব ক্ষুদ্র গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্যমানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা।" এই স্থবির ভারতীয় সমাজে জঙ্গমতা আনতে উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শাসন খানিকটা পদক্ষেপ নিলেও সামন্ত-শোষণের ভিত্তিটা উপড়ে ফেলে পূর্ণাঙ্গ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি, শুধুমাত্র উপনিবেশিক লুণ্ঠনে দক্ষতা আনার জন্য যেটুকু শিল্পায়ন ও সংস্কার-সাধন প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু করেনি, বরং সামন্ত-শোষণের উপর সিংহ-ভাগ বসিয়ে তাকে দৃঢ়প্রোথিত করেছে—যার অবশেষ একালেও বহন করে চলতে হচ্ছে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক বিকাশের অসম্পূর্ণতা ও সামন্তব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুতার পটভূমিতে ভারতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলে থাকল। এই বিচিত্র অবস্থার অভিশাপ ভারতবর্ষের জনগণের মুক্তির সংগ্রামকেও সরল-পথে বিকশিত হতে বাধা দিচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, নবজাগরণের আলোকে আলোকিত মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তামুক্তির বেনামিটুকু ব্যাপক কৃষক-শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারেনি। বাংলা তথা ভারতীয়

সমাজ প্রগতি-অপ্রগতি, স্থিতি-অস্থিতির দ্বৈধতায় সংক্ষুব্ধ। তাই সমকালের চিন্তাচেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এই বৈপরীত্য, এই স্ববিরোধিতার সাক্ষ্য বহন করে রয়েছে।

শরৎচন্দ্রে এই স্ববিরোধিতা স্থূলভাবে প্রকটিত। তাঁর সাহিত্যে, জীবন-চর্যায় রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় বিপরীত শক্তির প্রকাশ বড় বেশী উচ্চকিত। প্রধানত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টিতে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পরিচয় কম, সামন্তবাদী উপনিবেশিক শোষণের পরিণতিতে মূলতঃ পল্লীবাংলার নিঃস্ব রিক্ত হতচ্ছাড়া রূপ অসামান্য বস্তুনিষ্ঠভাবে ধরা পড়েছে, অর্থনৈতিক শোষণসহ সামাজিক সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়নের নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, আদি-প্রলেতারিয়েত নারীর বঞ্চনা, বিকাশের পথে বাধা, ব্যক্তিত্বের সমস্যা চিত্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার কণ্ঠস্বর। কিন্তু ইতিহাসনির্দিষ্ট স্ব-বিরোধিতা তার বিপরীত সাক্ষ্যও তাঁর সাহিত্য-রাজনীতিচর্চায় কম রেখে যায়নি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-ব্যবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতি fragmentation অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলির ভাঙন তিনি মেনে নিতে পারেননি, বরং তাঁর সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে আছে এই পরিবারগুলির জন্য অসীম মমতা। তথাকথিত সতীত্ব নয়, নারীত্বের শ্রেষ্ঠ মূল্য তার স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশে—এ তাঁর বহু-উচ্চারিত চিন্তা হলেও স্থূল, আপোসকামী জীবনের স্ফূর্তির বিনিময়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষার যুগ-যুগব্যাপী জরাজীর্ণতায় গলা-পচা সতীত্বের মহিমাকীর্তনও তাঁর সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে। গণিকাবৃত্তির উৎস, প্রাণহীনতার স্থির চিত্র, গণিকার বারবধূবৃত্তির ঊর্ধ্বে প্রেমতৃষ্ণা ও ব্যক্তিসীমায় তার স্বীকৃতির আকৃতিও বর্ণিত হয়েছে অজস্রধারায়। কিন্তু গণিকা-জীবনকে ঘিরে অভিজাত ও সামন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের লালসা, ভণ্ডামি ও শোষণের প্রতি ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি এবং গণিকার সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নটি চাপা থেকে গেছে। সামন্ত-শোষণের বর্ণনা আছে, সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচারের চিত্রও আছে, কিন্তু ব্যবস্থা হিসেবে সামন্ততন্ত্রের অবসানের অনিবার্যতা সম্পর্কে বিশ্বাসের ছবি নেই। যদি থাকত, তাহলে জমিদারদের শহরবাস ও গ্রামে বসবাসের মধ্যে অবস্থার রকমফের সম্পর্কে আস্থা থাকত না, গ্রামবাংলার শ্রমবিযুক্ত পরগাছা মানুষগুলির জন্য হাহুতাশ দেখা যেত না, তৎকালীন জনসংখ্যার আশীভাগেরও বেশী কৃষক সম্প্রদায়ের শক্তি সম্পর্কে এত অনাস্থা থাকত না। শরৎচন্দ্রকে বুঝতে হলে এই বিষয়গুলির আলোচনা নিরাসক্ত মন নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জাতকতার কারণে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির জগতে অবহেলিত বঞ্চিত নিম্নবিত্ত মানুষের পদসঞ্চার স্ফূর্তি লাভ করলেও উচ্চবিত্ত পরিবার ও সমাজের আড়ষ্ট পদবিক্ষেপও লক্ষণীয়। তাঁর পল্লীভিত্তিক বহু উপন্যাসের মধ্যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত সনাতন ধ্যানধারণা ও লোকাচারদীর্ণ সংস্কারের জয়গান। যেমন হিন্দুনারীর প্রথাগত সতীত্বের আদর্শ (অন্নদাদিদি, বিরাজবৌ, শুভদা, কুসুম, সরযূ, অলকা), নির্বিকার সেবাপরায়ণতার আদর্শ (মৃণাল, পার্বতী), গ্রাম্য একান্নবর্তী পরিবারের অক্ষুণ্নতায় বিশ্বাস (নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে), জমিদারি শাসনের মহিমার উদ্ঘাটন (বিপ্রদাস) প্রভৃতি। বিপরীত চিত্রও রয়েছে—যেমন, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধতা (বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, অনুরাধা প্রভৃতি); সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের ব্যথা-বেদনার চিত্র (মহেশ, পল্লীসমাজ, অভাগীর স্বর্গ, জাগরণ, দেনাপাওনা প্রভৃতি), সমাজপরিত্যক্তা পতিতা নারীতে মানবিকতার আরোপ (চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি), সমাজদ্রোহিণী নারীচরিত্র (অভয়া, কমল, কিরণময়ী প্রভৃতি)। শরৎচন্দ্রের পল্লীভিত্তিক গল্প-উপন্যাসগুলিই সর্বজনীন পাঠকহৃদয়ের আতিথ্য অর্জনে সার্থকভাবে সমর্থ হয়েছিল, আলোচকদের অধিকাংশের এই মত অনস্বীকার্য। এর মধ্যে সবিশেষভাবে সামাজিকসমস্যাচিত্রণমূলক কাহিনীগুলি উত্তরকালের পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

সামন্তসমাজের অত্যাচার নিপীড়ন এখানে মুখ্য স্থান অধিকার করলেও পরিবর্তনের সজ্ঞান আদর্শবোধে যে তা উদ্‌বুদ্ধ ছিল, নিঃসন্দেহে তা বলা যায় না। কারণ তাঁর পল্লীসমস্যাভিত্তিক গল্প-উপন্যাসগুলি বেশীর ভাগই তীব্র অভিজ্ঞতার স্থির চিত্র হয়ে সমকালীন দলিলের গৌরব অর্জন করে আছে। সচেতন বস্তুবাদ অভিজ্ঞতার কালীন বাস্তবতার ঊর্ধ্বে পটপরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। শরৎ-সাহিত্যে এই মননশীল বস্তুবাদের চেয়ে হৃদয়ধর্ম-আশ্রিত বাস্তবতাই সুলভ। একটি বাঞ্ছিত সমাজদর্শনের আলোকে তাঁর পল্লীকাহিনীগুলিতে অবক্ষয়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে ওঠেনি। পরিবর্তন যে তিনি চাননি তা নয়, কিন্তু পরিবর্তনের অনিবার্য গতিপ্রকৃতি তাঁর চিন্তাচেতনায় যথার্থরূপে ধরা পড়েনি। তাঁর পল্লীভিত্তিক উপন্যাসগুলির কালীন স্থিতি মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক। এই কালসীমা ছিল রাজনীতি, ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে উত্তাল—কিন্তু তাঁর লেখায় এর প্রতিফলন সামান্যই। শরৎ-জীবনীকে অনুসরণ করে এগোলে দেখা যাবে, তাঁর দেখা গ্রাম হল প্রধানতঃ হাওড়া ও হুগলী জেলায়। অথচ এই অঞ্চলের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পল্লীচিত্রণ কি করে একেবারেই শহরে প্রভাবমুক্ত

হল তা বিস্ময়ের বিষয়। যদিও 'পল্লীসমাজ' খানিকটা ব্যতিক্রম। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশ সেখানে নাগরিক ধ্যানধারণার কিছুটা ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। অরক্ষণীয়া, পণ্ডিতমশাই, শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব প্রভৃতি বহু উপন্যাসে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের মহামারীরূপে বিধ্বস্ত গ্রামবাংলার বাস্তব চিত্র তিনি নির্মোহভাবে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু 'পল্লীসমাজ'-এ লেখক এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। "তিন দিন জ্বর ভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন গিলিয়া লইয়া জানলার বাইরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া [রমেশ] ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কিনা।" তবে বাধা কোথায়? "কিন্তু পরের ডোবা বোজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এসকল তাহার নিজের কৃত নহে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা ও উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ।" সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের এই দ্বন্দ্বে তৎকালীন সমাজ ছিল ক্ষতবিক্ষত।

প্রাকৃতিক কারণেই, ভারতীয় সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে যে যৌথ সত্তা বজায় ছিল তা ইংরেজের শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বিদেশী ধনতন্ত্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, বিকল্প উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। মার্কসের ভাষায়: "পুরোনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোন জগতের অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে। বৃটেন-শাসিত হিন্দুস্তান তার সমগ্র ঐতিহ্য তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।" এই হাজা-মজা, হতশ্রী গ্রামবাংলার কথাকার শরৎচন্দ্র। ইংরেজ আমলে প্রাচীন ভারতীয় সেচব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়—নদী-নালা-পুকুর বুজে যেতে থাকে, জমিদার আবার বাঁধ দিয়ে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। পরিণতিতে কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের দ্বন্দ্ব, যা সংঘর্ষে পরিণত হয়। এরই ছবি রয়েছে 'পল্লীসমাজ'-এ। শরৎ-সাহিত্যে অন্তত একবারের জন্য হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্ফুলিঙ্গ সার্থকভাবে জ্বলে উঠেছে। 'মহেশ' গল্পের মধ্যেও শ্রেণীস্বার্থের দুই বিপরীত কোটির নির্মম রূপ প্রকটিত হয়ে উঠেছে, একথা বলতেই হবে। তাই 'পল্লীসমাজ' ও 'মহেশ'-এর আধুনিকতার প্রতি উত্তরকালের পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে। জীবনের প্রধান অভিশাপ জমিদারি প্রথা—আর এই জমিদারি ব্যবস্থার উত্তরোত্তর স্ফীতির যে বর্ণনা 'মহেশ' বা

'পল্লীসমাজে' আছে তা ঐতিহাসিক। নিজের মাছচাষের স্বার্থে বাঁধ কাটতে না দিয়ে কৃষকের ফসল ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে রমেশ যখন বলছে, "এরা সারাবছর খাবে কী? বেণী: (হাসিয়া মাথা নাড়িয়া থুথু ফেলিয়া অবশেষে স্থির হইয়া) খাবে কী? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার নিতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল। কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে চেড়ে, গুছিয়ে গাছিয়ে, খেয়ে দেয়ে আবার ছেলেদের জন্য রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কী? ধার কর্জ করে খাবে। নইলে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?" 'অভাগীর স্বর্গ'-এ গাছ কাটার অধিকার থেকে বঞ্চিত প্রজার বেদনা অসামান্য রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

'পল্লীসমাজ'-এ কী বলতে চেয়েছেন, এ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন: "এই পাড়াগাঁয়ের সমাজ। যাকে শহর থেকে মনে করছি—সেখানে পদ্ম ফুটেছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগালি করছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে—সেখানেও শালুক ফুটছে, বিলাতী কচুরিতে সব ছেয়ে গেছে, দলাদলির তো অন্ত নাই।" (প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহিত্যসভায় অভিভাষণ, আগস্ট, ১৯২৩)। এই দলাদলি, বিভেদ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই নয়, আচার, ধর্ম, জাতি প্রভৃতির ভূমিকাও অপরিসীম। এঙ্গেলস বলেছিলেনঃ "দি ঈস্ট ফেল টু দি ওয়েস্ট বিকজ অব সিগ্রিগেশন অব ম্যান ফ্রম ম্যান।" এই জাতি, ধর্ম, আচার-কেন্দ্রিক ভেদভেদের চিত্রও তাঁর সাহিত্যে সুনিপুণ-ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর স্ববিরোধিতা বড় বেশী প্রকট।

কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি নিঃসন্দেহে নারীচরিত্রে অঙ্কনে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে নারীচরিত্রগুলির তুলনায় পুরুষ-চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ। নারীজাতির সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত মমত্ববোধ তাঁর সমাজসচেতন সত্তাটিকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। মেয়েদের সমস্যাকে তিনি গবেষকদের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী সবচেয়ে বেশী নিগৃহীতা ও বঞ্চিতা, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের সামান্যতম সুযোগও এ সমাজে অবলুপ্ত। পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীর মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন: "নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখ-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ কি পরিমাণে মানুষের সুখ সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিতে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ

ও তৃপ্ত রাখিতে পারিলেন। দাম কষিবার এছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।" কিন্তু তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলির বিচারে দেখা যাবে ব্যক্তিপর্যায়ে তিনি স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা অতিক্রম করতে সর্বত্র সক্ষম হননি। প্রথাগত সতীত্বের ধ্যানধারণাকে তীব্র কশাঘাত করেও পতিগতপ্রাণা অথচ বঞ্চিতা নারী-চরিত্রগুলিকেও তিনি স্রষ্টার সমস্ত হৃদয়ানুভূতি দিয়ে গড়ে তুলে সাধারণ পাঠকের মনে আসন করে দিয়েছেন। স্বামীর চরম নোংরামি সত্ত্বেও অন্নদাদিদির সতীত্বে চিড় খায়নি। শুভদার অসীম সহিষ্ণুতা, বিরাজের সতীত্বের জয়, ষোড়শীর স্বামিত্বের সংস্কারের ফল্গুধারার জাগরণ, মৃণালের স্বামিগতপ্রাণতা ইত্যাদি অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে বুদ্ধিবাদের বিস্তার ও জীবনসংগ্রামের প্রবাহে শরৎচন্দ্রের একান্নবর্তী পরিবারের মহিমাকীর্তন-বিষয়ক, সতীত্বের মহত্ত্ব-বর্ণনামূলক প্রথানুগ বিষয়বস্তু সম্বলিত গল্প-উপন্যাসগুলির চেয়ে বরং নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্যা বিজড়িত প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে উচ্চকিত উপন্যাসগুলিই উত্তরকালের পাঠকদের দৃষ্টি বেশী করে আকর্ষণ করেছে। শরৎপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর বিদ্রোহিণী নারী-চরিত্রগুলি। এর মধ্যে শিল্পসিদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা সফল হয়ে উঠেছে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের অভয়া চরিত্র। অভয়া শুধু বাক্‌বৈদগ্ধ্যে বিদ্রোহিণী নয়, জীবনেও বিদ্রোহের বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়েছে। এই চরিত্রটি শিল্পায়ন হিসেবেও অসামান্য, খুব সাবলীলভাবেই তার বিদ্রোহ সম্ভব হয়ে উঠেছে। হিন্দুধর্মের প্রথাবদ্ধ স্বামিত্বের সংস্কার তারও ছিল এবং সে আপোস করার জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর বর্মা মুলুকে এসেছে স্বামীর সন্ধানে। কিন্তু সেখানে এসে স্বামীর দেওয়া বঞ্চনা ও আঘাতে তার নারীব্যক্তিত্ব প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। সে জীবনসমস্যার সমাধান খুঁজে নিয়েছে রোহিণীর ভালবাসার মধ্যে। অভয়ার দৃপ্ত উক্তি: "আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হলো না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হতো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা?

"রোহিণীবাবুকে তো আপনি দেখে গেছেন। তাঁর ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাই পঙ্গু করে দিয়ে আমি আর

সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।" সামাজিক বিবাহের ব্যর্থ পরিণতির শেষে ভালবাসার নবজন্মের মধ্য দিয়ে যে নবীন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার ফলশ্রুতিতে জাত সন্তানাদির সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিষয়েও অভয়ার উক্তি বিস্ময়করভাবে বিদ্রোহমূলক এবং যুগ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। অভয়া বলছে : "আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশী বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মলাভ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না।" আরও অভিভূত হতে হয় যখন দেখি রোহিণী-অভয়ার নতুন জীবন সার্থক করে তোলার জন্য রোহিণীর অকাতর পরিশ্রম। বুর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া অর্থনৈতিক নিরাপত্তার তথাকথিত উদারতার মধ্যে নয়, শ্রমজীবী মানুষের নৈতিকতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তির বিনিময়ে এই নতুন মূল্যবোধ অসামান্য তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে—যা সমগ্র শরৎসাহিত্যে একটি স্তম্ভিত উপত্যকার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

তুলনামূলকভাবে কিরণময়ীর বিদ্রোহ পরিণতিহীন। তার সমাজদ্রোহের সূর্যদীপ্তি যখন সুরবালার পতিসেবার সন্ধ্যাপ্রদীপের কাছে ম্লান হয়ে যায়, উপেনের প্রতি অস্ফুট ভালবাসার যূপকাষ্ঠে দিবাকরের আবেগকে বলি দেয় এবং সবশেষে উন্মাদ হয়ে যায়, তখন চরিত্রটির অপমৃত্যুর জন্য দুঃখ হয়। strictly moral করতে গিয়ে যে কিরণময়ী চরিত্রের অপমৃত্যু ঘটেছে তাই নয়, সাবিত্রীর মত এমন একটি সম্ভাবনাময় চরিত্রও গতি হারিয়ে সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পুরুষশাসিত, সামন্ত-অবশেষ-কবলিত সমাজে নবোদ্ভিন্ন গণতান্ত্রিকতার পদসঞ্চারের যুগে নারীত্বের বিভিন্ন সমস্যার ভিত্তিতে নানা প্রশ্ন 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী কমলের বিদ্রোহাত্মক চরিত্রে অসামান্যভাবে ফুটে উঠেছে। কমল চরিত্রের পরিকল্পনায়, তার জাতকতার উৎস রচনায় শরৎচন্দ্র শুধু যে জাতিধর্মসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন তাই নয়, তার অবৈধ জন্মের প্রতি জমিদার আশুবাবু থেকে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সকলেরই সম্মান আদায় করতে সমর্থ হওয়া এক অসাধারণ সিদ্ধি। ব্যক্তিত্বের মুক্তি অর্জনের স্বার্থে একবার যখন কমলকে ধনাঢ্যদের সমস্ত করুণার দানকে পায়ে ঠেলে স্ব-শ্রমের উপর নির্ভরশীল হতে দেখি, তখন পরিণতি সম্পর্কে যে আশা জাগ্রত হয়, পরিণতিতে প্রেমবর্জিত অজিতের বিপুল সম্পদের security-র পিছনে ধাবিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্রের আরেকটি বিদ্রোহী চরিত্র শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দা। সুনন্দার বিদ্রোহ প্রেম-ভালবাসার কেন্দ্রে নিবদ্ধ নয়। সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সুনন্দার প্রতিবাদ শুধু নয়, পরিবারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শরৎপ্রতিভার এক মহৎ দৃষ্টান্ত।

পথের দাবী—বাজেয়াপ্ত ও রাহুমুক্তি

ড. প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের জন্ম ৩১ ভাদ্র ১২৮২ সাল। গ্রন্থাকারে 'পথের দাবী'র প্রকাশ-কাল ১৭ ভাদ্র ১৩৩৩ সাল।

ঘটনাটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত—লেখকের শততম জন্মবর্ষে তাঁর সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত সাহিত্যসৃষ্টি 'পথের দাবী'র পঞ্চাশ-বর্ষপূর্তি।

আধুনিক যুগের সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী আলোচিত ও বিতর্কিত। প্রথমটি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক, দ্বিতীয়টি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস। দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুই সমসাময়িক কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত। দুটি গ্রন্থই পরাধীন ভারতে রচিত এবং শাসক ইংরেজের রাজরোষে পতিত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত। নাট্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে বিশেষজ্ঞরা বই দুটির অনেক ত্রুটি নির্দেশ করেছেন এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্তু তথাপি জনপ্রিয়তার সর্বতোমুখী অর্থে গ্রন্থ দুটির আকর্ষণ ও আবেদন অপরিসীম।

বেশ কিছু দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা (১৩২৯ সাল) থেকে। মোট তিন বছর তিন মাস ধরে বেরোয়—মাঝে মাঝে কয়েকটি সংখ্যায় ছাপানো হয় নি (১৩২৯ ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বৈশাখ)।

বঙ্গবাণী পত্রিকায় 'পথের দাবী' প্রকাশের প্রথম থেকেই লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক এবং সর্বোপরি উৎসুক পাঠকদের সদা-আশঙ্কা ছিল যে-কোনও দিন ব্রিটিশ সরকার এর প্রকাশ বন্ধ করে দিতে পারেন। প্রকাশক ও সম্পাদক 'পথের দাবী'র শেষাংশ (বৈশাখ ১৩৩৩) প্রকাশের পর এক কৌশল অবলম্বন করেন—মুদ্রিত লেখার শেষে 'ক্রমশ' কথাটি ছেপে দিয়ে পাঠক এবং সরকারকে বোঝাতে চাইলেন আরও কিছু লেখা বাকি আছে। আসলে ইতিমধ্যে 'পথের দাবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়াস চলতে থাকে।

বঙ্গবাণীতে 'পথের দাবী' বেরোনোর এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার

মধ্যবর্তী ইতিহাস মোটামুটিভাবে অনেকের জানা আছে—তাই পুনরুল্লেখ করছি না।

মুদ্রিত গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ) রূপসজ্জা আদৌ ছিল না। সাদা কাগজ দিয়ে মোড়া পিজবোর্ডের মলাট, মাথার ওপর লাল হরফে ছাপা—পথের দাবী। নীচের দিকে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। দাম তিন টাকা। ছাপানো হয় তিন হাজার কপি। বই-এর প্রকাশ-তারিখ ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল। প্রকাশক—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। [এ-ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে অমৃত শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পথের দাবী-র প্রকাশন প্রসঙ্গ' শীর্ষক নিবন্ধে]।

কয়েকদিনের মধ্যেই মুদ্রিত সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে লেখক, প্রকাশক এবং শুভানুধ্যায়ী অসংখ্য মানুষ সরকারী প্রতিক্রিয়া ও হুকুমনামার অপেক্ষায় থাকেন।

অপরদিকে সরকারী মহলেও তখন নানান আলোচনা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে। অবশেষে তখনকার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়ে এ ব্যাপারে তদানীন্তন বঙ্গ সরকারের অস্থায়ী মুখ্যসচিব মিস্টার প্রেনটিসের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন :

From Sir Charles Tegart, K. T., C. I. E., M. V. O. Commissioner of Police, Calcutta (Confidential) No 5272 to the Chief Secretary to the Govt. of Bengal, Political Department, Calcutta, 23 November 1926.

Sir, I have the honour to forward herewith for the consideration and orders of government, the translation of objectionable passages from the book entitled 'Pather Dabi'—written by Sarat Chandra Chatterjee, a well-known novelist of Bengal, printed by Satya Kinkar Banerjee from the Cotton Press 57, Harrison Road and published by Umaprosad Mukherjee from 77 Ashutosh Mukherjee Rd., Bhowanipore, Calcutta. A printed copy of the book was sent to the public prosecutor, Calcutta for his opinion and he advises

that the book is liable to be proscribed under section 99A of the Criminal Procedure Code and the author and printer to be prosecuted under section 124A of the Indian Penal Code.

The translation may kindly be returned after perusal.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
(Signature illegible)

উপরের চিঠিতে ফর কমিশনার-এর ওপর স্বাক্ষরকারীর নাম জানা যায়নি।

চিঠির সঙ্গে মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে বিভিন্ন অংশের ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে এগুলি হলো :—

১৯ ৪৮ ৬৮ ৬৯ ৭৫ ৭৬ ৮১ ৮২ ১২৭ ১৫১ ১৫২ ১৮৪ ১৯৬ ১৯৮ ২০৫ ২১১ ২১৩ ২১৫ ২১৬ ২২৫ ২৪৩ ২৪৪ ২৬৫ ৩০১ ৩০৯ ৩২২-২৪ ৩২৬ ৩২৮ ৩৩৩ ৩৩৫ ৩৩৭ ৩৩৯-৪৩ ৩৪৫ ৩৫৮ ৩৭৯ ৩৯৫-৯৭ ৩৯৯ এবং ৪১৫।

মূল নথির মার্জিনে কালি দিয়ে লেখা আছে : কালেকটেড বাই কে. ডি. রায়। বিটি অফিস ১৬-১১-২৬। বিটি অফিস মানে বেঙ্গল ট্রানস্লেটরস অফিস।

দুর্ধর্ষ টেগার্ট সাহেবের চিঠি—সুতরাং ব্যবস্থাগ্রহণ শুরু হয়ে গেলো।

মূল নথির প্রথম পৃষ্ঠাটি নিম্নরূপ :—

Put up early.

স্বাক্ষর—এস এন রায়
২৪-১১-২৬

This may be submitted to C. S. for orders. It may be noted that it has been the policy of the Govt. not to proscribe any book or newspaper unless there are very good grounds to show that a prosecution would be successful vide precedent.

(Signature illegible)
২৫-১১-২৬

এর পরপৃষ্ঠায় মুখ্যসচিব প্রেনটিস লিখছেন (কালো ভুষো কালিতে লেখা—হাতের লেখা খুব জড়ানো) :—

This is a poisonous production but as an order under/of 99A can be questioned to the High Court, I think we should have the Advocate-General's opinion whether a prosecution would be under/of 124 of I. P. C.

Sd. W. D. R. Prentice
25-11-26

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করার সরকারী নির্দেশনামা

NOTIFICATION

No 193P.—The 4th January 1927—In exercise of the power conferred by Section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal and Amendment Act, 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to his majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled "Pather Dabi" written by Sri Sarat-Chandra Chattopadhyay, printed by Sri Satya Kinkar Bandyopadhyay at the Cotton Press, 57 Harrison Road, Calcutta and published by Sri Umapada Mukhopadhyay 77, Ashutosh Mukharji Road, Calcutta, on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124 A of the Indian Penal Code.

W. D. R. PRENTICE
Chief Secretary to the Government of Bengal (offg)

এরপর গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য নবাব বাহাদুর আলী সাহেব লিখছেন—

Better get the book itself first.

(Sig.) 25-11-26

তিনি নথিটি পাঠান এ ডি এস-কে। এ ডি এস ২৬-১১-২৬-এ (স্বাক্ষর অস্পষ্ট) বলছেন—'সি পি মে বি আস্কড ফর দি বুক এম ভি।'

তারপর কমিশনার অব পুলিশ মূল বইটি নথিভুক্ত করলেন।

নথির এই পৃষ্ঠার মার্জিনে অস্পষ্ট স্বাক্ষরসহ (২৬-১১-২৬) পেন্সিল-নোট আছে—It has been ascertained from B.T. and the librarian Bengal Library that the only copy available in the Bengal Library is with C. P.

উপরোক্ত নথিভুক্ত লিপিবদ্ধ বিষয়ের প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি।

(১) সমকালীন ব্রিটিশ এবং এদেশীয় উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজ হস্তে কালি দ্বারা স্বীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে তারিখসহ স্বাক্ষর দিতেন।

(২) একটি গল্প প্রচলিত আছে যে পথের দাবী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের শাস্তিবিধান করতে মনস্থ করেছিলেন কিন্তু সে সময়ের বাঙালী পাবলিক প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন এবং শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত করার হুকুমনামা জারীর ব্যবস্থা করেন।—কমিশনারের চিঠির শেষাংশের বক্তব্য উপরোক্ত গল্পের অসত্যতা প্রমাণ করছে।

(৩) উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আরো কারো কারো কাছে শুনেছি পুলিশ প্রকাশকের বাড়ি সার্চ করতে গিয়ে পথের দাবীর কোনো কপি না পেয়ে শেষে অনুরোধ করেন, যে-কোনও ভাবে হোক একটি কপি জোগাড় করে দিতে। তখন এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ি থেকে একটি কপি সংগ্রহ করে পুলিশের হাতে অর্পণ করেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রাপ্ত সেই কপিটি সংগ্রহের আগে সুচতুর টেগার্ট সাহেব যে বেঙ্গল লাইব্রেরির একটিমাত্র কপি হস্তগত করেছিলেন, তা নথির মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে লেখা থেকে জানা গেল।

পুলিশ কমিশনার মূল বইটি নথিভুক্ত করার পর এ ডি এস একটি মজার নোট দিলেন :

"The I. B. wanted the whole of this book be translated. This would have involved entertaining addi-

tional staff in the B. T.'s office. On consulting the I. B. I learnt that they would be satisfied with what C. P. had called for. I presume that H. M. now desires the whole book to be prosecuted.

নোটটি মুখ্য সচিবের কাছে গেল। তিনি প্রথমে লিখলেন :

H.M. for orders with reference to his note of 25th.

তারপর স্বাক্ষর করে (২৯-১১-২৬) আবার লিখছেন (যেটি আইন-ঘটিত একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন):—

"I noted that on the third leaf of the book appears a notice that this novel appeared in serial form in the Bangabani newspaper. A point that will have to be looked into after H. M. has passed orders is whether the passages now objectionable had actually appeared in the Bangabani, and if so, whether any action was taken regarding them then.

Sd/ W. Prentice
29. 11. 26

মাননীয় সদস্য দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তিনি সুস্পষ্ট কোনো আদেশ না দিয়ে লিখলেন—

I had not in view that the whole book should be translated but wanted it should be in the file in case the Advocate-General invited for reference of it. Will L. R. now please obtain his opinion.

স্বাক্ষর—২৯-১১-২৬

লীগাল রিমাামব্রান্স ৩০।১১।১৬ তারিখে অ্যাডভোকেট-জেনারেলের কাছে নথিতে লিখে পাঠালেন—

Forwarded to Advocate-General for favour of opinion whether prosecution would be made of 124-A I. P. C.

এরপর অ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীবি এল মিটার কালো ভুষো কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা প্রায় সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী (ফাইলে ৩-৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) নোট দিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯২৬-এ। প্রকারান্তরে আসলে এই বাঙালী মিত্র সাহেবের কাছ থেকে শাসক ইংরেজ পথের দাবী সম্বন্ধে প্রয়ো-

জনীয় শাস্তিবিধানের আদেশ জেনে নিলেন। অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র পরবর্তীকালে বড়লাটের কাউন্সিল (একজিকিউটিভ) সদস্য এবং আইন পরামর্শদাতার পদ অলঙ্কৃত করেন। এবং আরো পরে স্বাধীন ভারতে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন পশ্চিবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

নোট-এর প্রথম দিকে তিনি লেখক সম্বন্ধে এবং পথের দাবীর উপন্যাস-গত দোষ-গুণ আলোচনা করেছেন :

"I have carefully read the book 'Patl er Dabl.' The author is one of the foremost novelists in Bengal and is widely read. His previous novels dealt with social problems. This is to my knowledge the first book dealing with political matters. As a novel the book is inartistic. But it has considerable literary merit. Certain political doctrines are propounded with force and skill. The caution observed in the earlier parts of the book has not been maintained in the latter part.

এরপর শ্রীমিত্র পথের দাবী নামকরণের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"The title 'Pather Dabi' is explained at the top of P 127. A literal translation of the title is—"the right of unobstructed passage".

Sabyasachi or Doctor starts a club or association named 'Pather Dabi' with Sumitra as President and Bharati as Secretary. The hero is a revolutionary who is avoiding arrest by Police.

এরপর পথের দাবী গ্রন্থের রাজনৈতিক দিক সম্বন্ধে শ্রীমিত্রের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"There are three dominant ideas which run through the book. First, that in a dispute between Indians on the one hand and Europeans or Eurassians on the other hand, the former get no justice in the courts in India. Secondly, that the cupidity of the European millowners has brought about grinding

poverty of the labourers in India and brutalized them. And thirdly, that the British Government in this country is run in the interests of British merchants resulting in inhuman exploitation and reducing the people to a state of abject poverty and helplessness. Towards the end of the book the hero works himself up to a state of frenzy, throws away all restraint and preaches pure bolshevism. He says he is out to destory Christian civilsation and Western civilization. . . . But reading the book as a whole I have no doubt that the author has failed to conceal his real intention which is to excite hatred and disaffection towards the Government established by the English in India.

এরপর নোটের শেষাংশে তাঁর সিদ্ধান্তস্বরূপ বলছেন :—

'I am not unmindful of the fact that the precise method to be employed in bringing about the revolution is nowhere clearly indicated in the book. Nor am I unmindful of the fact that the story ends with the dissolution of the Association implying that the country is not ripe for a revolution. Nevertheless the attempt to bring the Government into hatred is abundantly clear.

I think therefore that this comes within the scope of Sec. 124A, I. P. C. to justify action under Sec 99A of I. P. C. Sd.—B. L. Mitter

11th Dec. 1926

স্যার বি এল মিটারের উপরোক্ত নোট পেয়েও মুখ্যসচিব প্রেনটিস সাহেব কিন্তু পুরোপুরি খুশী হলেন না। তিনি তাঁর মত জানিয়ে ১৪।১২।২৬ তারিখ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার আর্লি সাহেবের কাছে পাঠালেন। তাঁর বক্তব্য হোল ঃ

I am inclined to proscribe this book Pather Dabi under the 99A I. P. C. and not start a prosecution

under G 124-A I.P.C. The success of a prosecution is to my mind open to question, not that I disagree with the Advocate-General but because in a criminal case the court might give to accused the benefit of doubt. In a case under G99 supporting the order under G99A is objected to the proceedings will be before a special bench of the three judges and no question of punishment of the author and the printer will be arrived to cloud the issue whether such a publication contains seditious matter. কাউন্সিল মেম্বার আলী সাহেব আরো চতুর ব্যক্তি ছিলেন। এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ না দিয়ে তিনি সমগ্র ব্যাপারটি গভর্নর লর্ড লীটনের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে লিখলেন (১৪।১২।২৬) :—

The Advocate-General has dealt with the case in considerable detail. I agree that we should proscribe the book under G99A I. P. C., but as the author is a novelist of some repute and more is likely to be heard of the matter, the case should be submitted to his Excellency.

গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারির হাত ধরে নথিটি লর্ড লীটনের কাছে গেলে তিনি 'আই এগ্রি' এই ছোট্ট কথাটি লিখে ১৬।১২।২৬ তারিখে স্বাক্ষর করে নথিটি ফেরত পাঠালেন। এরপর ড্রাফট পেশ করতে বলা হল। ড্রাফটি প্রয়োজনীয় সকলের সম্মতি নিয়ে অ্যাডভোকেট-জেনারেল মিটার সাহেব ২৬।১২।২৬ তারিখে অনুমোদন করলেন। সেটি ৩।১।২৭ তারিখে আলী সাহেবের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করার পর মুখ্যসচিব প্রেনটিস সাহেব ৪।১।২৭ তারিখে সরকারী আদেশ জারীর হুকুমনামায় স্বাক্ষর করলেন। পথের দাবী গ্রন্থ বাজেয়াপ্তকরণের এই সরকারী হুকুনামাটি (গেজেট নোটিফিকেশন —ইংরাজিতে মুদিত কপি) এখানে হুবহু লিপিবদ্ধ করা হল :—

NOTIFICATION

Calcutta No 103 P. The 4th January 1927. In exercise of the power conferred by Section 99A of

the Code of Criminal Procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal and Amendment Act, 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled "Pather Dabi" written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay, printed by Sri Satya Krishna Bandyopadhyay at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta and published by Sri Uma Pada Mukhopadhyay, 77, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta, on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under Section 124A of the Indian Penal Code.

W. D. R. Prentice, Chief Secretary to the Gcvernment of Bengal (.off.),

উক্ত .আদেশে লক্ষণীয় বিষয় হল—খসড়া তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট কেরানীর ভুলটি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—প্রকাশকের নাম "উমাপ্রসাদের" জায়গায় 'উমাপদ' ছাপা হয়েছে।

যাইহোক, উক্ত আদেশের প্রতিলিপি অতি সত্বর ব্রিটিশ ভারতের শাসন-বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ মারফত সারা ভারতে যথাযথ-ভাবে পাঠানো হল এবং নির্দেশ দেওয়া হল তৎপরতার সঙ্গে উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের।

প্রসঙ্গত, আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। মুখ্যসচিবের উপরোক্ত হুকুমনামা জারির পর কাউন্সিল অব বেঙ্গলের অন্যতম সদস্য নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মহাশয় মুখ্যসচিবকে একটি চিঠি লেখেন :

Member of Council
Bengal

Calcutta
16-1-27

CONFIDENTIAL

My dear Prentice,

I find that the book 'Pather Dabi' by Sarat Ch. Chatterjee has been proscribed by the Government. Could you kindly let me have a copy of the book to enable me to read it and let me know which portions have been found objectionable. If possible, I shall like to see the Police report of the book, with Mokerji's permission.

Yours faithfully
Sd/- K. C. Roy.

মুখ্যসচিব যথাযথভাবে মাননীয় সদস্য শ্রীরায়ের অবগতির ও মতামতের জন্য মূল নথিটিসহ এক কপি 'পথের দাবী' গ্রন্থ পাঠান।

ক্ষৌণীশচন্দ্র সর্বকিছু দেখেশুনে ৬-২-১৯২৭-এ একটি লিখিত মতামত জানালেন, যার কিয়দংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"Many thanks. I have read the book 'Pather Dabi' and I must confess that I am greatly disappointed in this production of its author who is a popular novelist. This book has hardly any literary or artistic merit. The author has made no secret, or has failed in doing so, in preaching the doctrines of (1) rank sedition (2) revolutionary ideals (3) labour strikes (4) hatred against the English people and Christianity (5) Bolshevism and (6) disaffection against the Government. The Advocate-General's criticisms

are quite correct and its proscription is fully justified.

The entire idea of the book is one of disruption and not construction.

I have an idea that this story first appeared as a serial in a Bengali monthly journal, which I do not think, has been proscribed."

Sd/- K. C. Roy
6-2-27

ক্ষৌণীশচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্যের ওপর আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

বলাবাহুল্য সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় পথের দাবী বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়, যেগুলি শাসক ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে তো যায়নি, বরং সেগুলি সযত্নে নথিভুক্ত করে রাখা হয়েছে এবং এই সমস্ত আলোচনা ও মতামতের ওপর সরকারী ভাষ্যও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

সরকারী হুকুমনামাকে সমালোচনা করে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকাশিত আলোচনা :—

(১) বেঙ্গলী পত্রিকায় ১৫।১।২৭ তারিখে প্রকাশিত রিভিউ।

(২) ইংরাজি অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৫।১।২৭ তারিখে প্রকাশিত 'দি ওয়ে' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

(৩) কলকাতার 'অর্চনা' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯২৭) প্রকাশিত সুদীর্ঘ আলোচনা।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুদীর্ঘ এগারো বছরে বঙ্গপ্রদেশে অনেক উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত-এর মধ্য দিয়ে বহুমুখী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। পরাধীন ভারতে দেশের মানুষ শাসনকার্য নির্বাহের বেশ কিছু ক্ষমতা অর্জন ও অধিকার করেন।

শরৎচন্দ্রেরও পরিণত জীবনের এই এগারো বৎসর নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনায় সমুজ্জ্বল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ৬২ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্রের তিরোধান ঘটে। দেশের আপামর জনসাধারণের অন্তর এই অসাধারণ স্রষ্টার বিয়োগে মুহ্যমান।

বঙ্গপ্রদেশে তখন মৌলভী এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচলনা করছেন। বঙ্গপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব।

লোকমুখে প্রচারিত হল যে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ পার্শ্ববর্তী প্রদেশ অর্থাৎ বিহার সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

বঙ্গপ্রদেশের অ্যাসেম্বলিতে মিস্টার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবিষয়ে জরুরী প্রশ্ন (স্টার কোশ্চেন) উত্থাপন করলেন (স্টার কোশ্চেন নম্বর ৩৩, ৫ অগস্ট, ১৯৩৮। ভাইড বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিংস ১৯৩৮, ভল্যুম ৫৩, নম্বর ১, জুলাই ২৯, অগস্ট ২ ৩ ৫) অ্যাসেম্বলি প্রশ্নোত্তর-গুলি হুবহু মূল ইংরাজিতে উদ্ধৃত করা হোলো :—

Subject : Withdrawal of ban on Sarat Chatterji's 'Pather Dabi'.

Q. 33

Mr. Dhirendra Nath Dutta :—(a) Is the Hon'ble Minister in charge of the Home (Press) Department aware that the ban on the fiction 'Pather Dabi' by the late Sarat Chandra Chatterjee has been removed by the Bihar Government ?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Bengal Govt. contemplate removal of the ban for the said book ?

(c) If the ban is decided not to be removed, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons for not removing the ban in this province.

Ans. The Hon'ble Khwaja Sir Nazimuddin : (a) I have no authoritative information ; (b) & (c) Do not arise.

Q. Mr. Syed Jalaluddin Hashemy : Will the Hon'ble Minister kindly communicate with the Bihar Government and inform us of the result of that communication at the next session of the Assembly ?

Ans. The Hon'ble Khwaja Sir Nazimuddin : I do not think it necessary to do so.

Q. Mr. Dhirendra Nath Dutta : Having regard to the fact that the ban has been removed by the Bihar Government, will the Hon'ble Minister consider the desirability of removing the ban here also ?

Ans. The Hon'ble K. N. : No.

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চের কর্মাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের উদ্যোগ ও প্রয়াস এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২ জানুয়ারি ১৯৩৯ গুহ মহাশয় বঙ্গপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবকে এই বিষয়ে একটি পত্র লেখেন। নাট্যনিকেতনের ছাপানো চিঠির কাগজে ইংরাজি ভাষায় টাইপকরা এই চিঠিটি হুবহু উদ্ধৃত করা হল :—

P. C. Guha
Natya-Niketan,
Phone : B. B. 951.

Calcutta
12th Jan, 1939.

Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq, Chief Minister to the Government of Bengal.

Through the Press Officer and the Director of Public Information, Bengal.

Sir,

I have the honour to request the favour of your kindly withdrawing the ban proscribing late lamented Sarat Chandra Chatterjee's novel 'Pather Dabi' under the Press Act.

The ban has been withdrawn by the Government of Bihar and Assam and we humbly request you to remove the ban from Bengal, for which act of kindness we shall ever pray.

Yours faithfully
Sd/- P. C. Guha.
Managing Director,
Natya Niketan Ltd.

১২ জানুয়ারি তারিখেই চিঠিটি সরকারী নথিভুক্ত হয়।

নথিটির প্রথম নোট দিচ্ছেন ১২-১-৩৯ তারিখে প্রেস অফিসার ও ডাই-রেকটর অব ইনফরমেশন মিস্টার এ হুসেন। সংবেদনশীল কিন্তু বলিষ্ঠ সমগ্র নোটটিই উল্লেখযোগ্য :

HCM may kindly see p.u.d. in which the proprietor of Natya Niketan prays that the ban of the book 'Pather Dabi' by the late Dr. Sarat Chandra Chatterjee may be lifted by Government presumably because he wants to have it dramatised and staged. He mentions that the Governments of Assam and Bihar have lifted the ban. This may perhaps be ascertained. The matter does not fall within the purview of this Deptt, except in an indirect way, because the book may be dramatised and then the Radio Station may want to broadcast it when we would be asked to censor it.

I feel that it is high time that the question of lifting the ban were considered by Government. If there is nothing really objectionable in the book in view of changed condition in the country, perhaps HCM might like to examine, in conjunction with the Home Deptt, the advisability of withdrawing the ban from it. If that course were decided upon we in this Deptt could exploit it to Govt's advantage.

Sd/-A. Hussain
12-1-39.

উপরোক্ত নোটটি মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস্টার এস আর মুরশেদের কাছে গেলে তিনি তারিখবিহীন স্বাক্ষরসহ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখে পাঠালেন—HCM will no doubt wish to consult the Home (Pol.) Department in the first instance। স্বাক্ষর—এস আর মুরশেদ।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব ১৩।১ তারিখে স্বাক্ষর করে লিখলেন—Will HM (Home) please advise ? স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর কাছ থেকে মুখ্যসচিবের কাছে নোট দেওয়া হোলো : Will PS kindly let me have his views ? As far as I remember this was considered by Government sometime ago।

স্বাক্ষর—কে এন
১৬-১-৩৯

মুখ্যসচিব স্বরাষ্ট্র বিভাগে (রাজনৈতিক শাখায়) ১৬।১।৩৯ তারিখে লিখে পাঠালেন—Previous papers please। এরপর স্বরাষ্ট্র বিভাগের (রাজনৈতিক শাখার) সচিব মিঃ আর এইচ হাচিংস ১২।১।৩৯এ নোট দিলেন—

The Adv.-General's opinion of the 11.12.26 and subsequent notes and orders in confidential file No. 605/26 may be seen.

The reply given by HM to an assembly question last year may also be read with this Govt. letter No. 18229 Pub. of the 12th December, 1938 to the Govt. of Assam.

A copy of the book is put up. I do not consider that the fact that the ban have been lifted elsewhere forces us to do so, although it is naturally a ground for again examining the matter in the light of present conditions.

From the very full analysis given by the Advocate-General in 1926, it seems to me that the doctrine and tendency of the book, undoubtedly advocate at law, is just as dangerous now as then, if not were so. HM has asked for Chief Secy's views.

Sd/- R. H. Hutchings
20.1.39

এই নোট প'ড়ে মুখ্যসচিব একটি সুদীর্ঘ নোট দিয়েছেন ২১।১।৩৯ তারিখে :

"HM's note, dated 16th Jan, 1939 prepage will recall. The book, Pather Dabi has been fully reviewed in Sir B. L. Mitter's note, dated 11th December 1926, in the file below. In my opinion very little is gained by proscribing if under section 69A, Criminal Procedure Code. I understand that the book is known to practically every student of Bengali literature and to all who read Bengali literature for the sake of diversion. It follows that the object of proscribing the book cannot be attained so that against the advantages of proscription, i.e., restricting to some extent the sale and purchase of the book must be set off the following disadvantages.

(a) Ineffectiveness of proscription in preventing perusal of the book. It is always undesirable to use the law in a manner which must be ineffective.

(b) Attachment of a certain amount of odium to Government for the proscription of a book which is now regarded as a Bengali classic.

Furthermore, we are so accustomed now to the vituperation of 'capitalism, Imperialism and 'exploiters' that it seems useless proscribing a less virulent book like Pather Dabi, while allowing, or failing to suppress a much greater degree of licence in present-day speeches and writings.

On the whole, I should be inclined to let the proscription drop if it is considered that any political advantage can be gained in showing that the Ministry takes a liberal view.

It has not been confirmed that Bihar Govt. have removed the ban on 'Pather Dabi', but I should think it is quite probable that they have done so. If so, the

argument for lifting the proscription is, in my opinion, strengthened to some extent because it would be anomalous for e.g. a passenger from Patna to Calcutta to liable to have his copy of Pather Debi confiscated when he crosses the Bengal boundary.

Sd/. Illegible
21.1.39

এই নোট পেয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ২২।২।৩৯ তারিখে স্বাক্ষর করে আদেশ দিচ্ছেন—

"In view of the considerations stated above I agree that the ban may be withdrawn. I do not consider that this will in any way help the ministry."

এরপর ২২।২ তারিখে স্বরাষ্ট্র বিভাগের নোটে বলা হচ্ছে—Orders accordingly. HCM should see before issue। তারপর অস্পষ্ট স্বাক্ষরযুক্ত ঐ তারিখেরই নোট-এ বলা হয়েছে—Order overpage. Draft put up. After HCM has seen it will be shown to legisletive department before issue.

২২।২ তারিখেই মিঃ হাচিংস্ লিখছেন, I will mention to HCM. We need not hold up orders।

এরপর আদেশের মুশাবিদা পরীক্ষা করে লেজিসলেটিভ বিভাগ ২৭।২।৩৯ তারিখে লিখছেন—The draft notification is in order. (This file was receivcd to-day.)

স্বাক্ষর—অস্পষ্ট ২৭।২।৩৯

এরপর স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশ হোলো খসড়া আদেশ জারী করার। সেইমত ১ মার্চ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হোলো যার দ্বারা সুদীর্ঘ বার বছরের বেশি সময় ধরে পথের দাবী গ্রন্থের ওপর বাজেয়াপ্তকরণের যে আদেশ বলবৎ ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

নথিভুক্ত আদেশের অনুলিপি নীচে লিপিবদ্ধ করা হোলো :

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by Sec. 99A of the code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) read with Sec. 21 of the General Clauses Act 1897 (X of 1897) the Governor is pleased to rescind notification no 103 P of the 4th January 1927 declaring forfeited to His Majesty as copies of the Bengali book Pather Dabi written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay printed by Sri Satya Kinkar Bandyopadhyay at the Cotton Press 57 Harrison Road, Calcutta and published by Sri Umapada Mukhopadhyay 77 Ashutosh Mukherji Road Calcutta. By Order.

S/d. E. M. Blandy
Secy, Home (Pol) Dept.

এইভাবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ পথের দাবী গ্রন্থের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের রাহুমুক্ত ঘটলো।

প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় স্বনামধন্য নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দিয়ে সত্বর 'পথের দাবী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সতু সেন ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনায় নাট্যনিকেতন মঞ্চে (১৩ই মে ১৯৩৯) পথের দাবী নাটকের প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়। নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলিতে ছিলেন, যথাক্রমে, সব্যসাচী—অহীন্দ্র চৌধুরী, শশীকবি—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, থেনমং—ছবি বিশ্বাস, নিমাই—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। সুমিত্রা—প্রভাদেবী, ভারতী—শেফালিকা (পুতুল), অপূর্ব—ভূপেন চক্রবর্তী, তলোয়ারকর—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়। ২০।২১ রাত্রি অভিনয়ের পর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে ইংরেজ সরকার ড্রামেটিক পারফরমেন্স অ্যাক্‌ট অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করে পথের দাবীর অভিনয় বন্ধ করে দেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর নবকলেবরে পথের দাবী নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয় রঙমহল মঞ্চে। সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কমল মিত্র।

এরপর থেকে পেশাদার ও অপেশাদার মঞ্চে বিভিন্ন দল অথবা বিশিষ্ট শিল্পী-সমন্বয়ে পথের দাবী অভিনীত হয়ে আসছে।

৭।৩।১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্সের উদ্যোগে সতীশ দাসগুপ্ত ও দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পথের দাবীর চলচ্চিত্রায়ন মুক্তিলাভ করে। দেবী মুখার্জি—সব্যসাচী, সুমিত্রা দেবী (ভারতী), চন্দ্রাবতী দেবী (সুমিত্রা), জহর গাঙ্গুলি (শশীকবি), মিহির ভট্টাচার্য (অপূর্ব), কমল মিত্র (তলোয়ারকর) এবং তুলসী চক্রবর্তী (তিওয়ারী) প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেন।

শরৎ-শতবার্ষিকী বৎসরে পথের দাবী অবলম্বনে 'সব্যসাচী' শীর্ষক চলচ্চিত্রটি পীযূষ বসুর নির্দেশনায় মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ভূমিকাভিনয়ে আছেন—উত্তমকুমার (সব্যসাচী) সুপ্রিয়া দেবী (সুমিত্রা), জয়শ্রী রায় (ভারতী) তরুণকুমার (শশীকবি) বিকাশ রায় (নিমাই দারোগা), কিরণ লাহিড়ী (অপূর্ব), ও অনিল চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্র)। মূল উপন্যাসটির ইতিমধ্যে কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পথের দাবীর ওপর অনেক আলোচনা-নিবন্ধাদিও প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ঋণস্বীকার

স্বরাষ্ট্র বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কর্তৃপক্ষ। বিধানসভা গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ। জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা। জাতীয় মহাফেজখানা, দিল্লী। মানিক সরকার, সরোজ চক্রবর্তী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়। সাপ্তাহিক 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ। চতুষ্কোণ, শরৎচন্দ্র সংখ্যা। মাসিক বাংলাদেশ, শরৎ-সংখ্যা।

গুজরাতী কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব

ড. চন্দ্রকান্ত মেহেতা

মহাত্মা গান্ধী গুজরাতী পাঠককে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করান। গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই এবং তাঁর বন্ধু নরহরি পরিখ ভাল বাংলা জানতেন। তাঁরাই শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'মেজদিদি' গুজরাতীতে অনুবাদ করেন। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে গুজরাতী পাঠকদের কাছে প্রথম শরৎচন্দ্রকে পরিচিত করান। বিষয়বস্তু ও রচনারীতি —উভয় দিক থেকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব গুজরাতী কথাসাহিত্যে খুব বেশী।

শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর উপন্যাসে নারীর কল্যাণময়ী মাতৃভাবের সৌন্দর্য দেখিয়েছেন, তেমনি গুজরাতী ঔপন্যাসিকেরা নারীর কল্যাণী জননীরূপের ছবি অঙ্কিত করেছেন। পান্নালাল প্যাটেলের 'মানবীনী ভবাই' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, এই রাজু (উপন্যাসের নায়িকা) ঠিক গুজরাতের মেয়ে নয়। গুজরাতী সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের যে প্রভাব পড়েছে তারই ফলে এই রাজুর সৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, অলকা, অন্নদা এবং পার্বতী চরিত্র থেকে রাজু জন্ম নিয়েছে। শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি গুজরাতীতে বহুবার অনূদিত হয়েছে এবং গুজরাতী পাঠক-পাঠিকা সেইসব কাহিনী ও চরিত্রাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। লেখকের মতে, গুজরাতের মানুষের উপর যে দুজনের প্রভাব সর্বাধিক তাঁরা হলেন গান্ধীজী এবং শরৎ-চন্দ্র। বস্তুতঃ বর্তমান গুজরাতী উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে আমরা শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রের চিত্রগুলিকে যেন চিনে নিতে পারি। স্নেহরশ্মি তাঁর 'তুটেলা তার' (ছেঁড়া তার) উপন্যাসের ভূমিকাতে স্বীকার করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি থেকেই তিনি উপন্যাস রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই যে পারিবারিক ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনাধারার মধ্যেই কাহিনী এগিয়ে চলেছে এবং চরিত্রগুলিও অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। গুজরাতী উপন্যাসেও ঠিক এই ধরনের ছোট ছোট পারিবারিক ঘটনার মাধ্যমে কাহিনীবিন্যাস লক্ষিত হয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী-চরিত্রাঙ্কনে বাঈজীর জীবনকে মহিমান্বিত করে দেখিয়েছেন। পূর্বে গুজরাতী উপন্যাসে বাঈজীর চরিত্রকে ঘৃণ্যভাবেই আঁকা হত। এই উপন্যাস পাঠের পর গুজরাতীতে বাঈজী চরিত্রকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে মহৎভাবে অঙ্কনের আদর্শ দেখা দিয়েছে। রমনলাল দেশাইয়ের

'পূর্ণিমা' উপন্যাসের নায়িকা রাজেশ্বরী রাজলক্ষ্মীর আদর্শেই রচিত। সেও প্রেমের তাগিদে রাজলক্ষ্মীর মত তার বাঈজী জীবন ত্যাগ করেছিল। শ্রীকান্ত দালালের 'রূপোজীবনী' উপন্যাসের নায়িকাও বাঈজী এবং উপন্যাসকার তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত বক্সীর উপন্যাস 'আকার'-এর নায়িকা বাঈজী, আর শ্রীকান্তরাজলক্ষ্মীর অনুরূপ এখানেও নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজ উপন্যাসে আমাদের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। পল্লীসমাজের ভাল ও মন্দ—উভয় দিকই সেখানে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে চিত্রিত হয়েছে। গুজরাতী সমাজে গ্রামজীবনের প্রতি আকর্ষণ গান্ধীজীর আদর্শে এসেছে সত্য, তবে সেখানে এই জীবনের সুন্দর আদর্শবাদী দিকটাই দেখানো হয়েছে। শরৎচন্দ্রের লেখা পল্লীসমাজের মাধ্যমেই প্রথম গ্রামজীবনের অসুন্দর দিকগুলির বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পেলাম। পান্নালাল প্যাটেল, ঈশ্বর পেটলীকর, চুনীলাল মডিয়া ইত্যাদি ঔপন্যাসিক তাঁদের পল্লীসমাজভিত্তিক উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের মতই গ্রামজীবনের ভাল ও খারাপ—উভয় দিকই সমান গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গ্রামে দেবতা নন, মানুষই বাস করে, আর সে মানুষগুলি শহরের মানুষদের থেকে কিছু বেশী মহৎ নয়। একথা শরৎচন্দ্রও যেমন স্বীকার করেছেন, এইসব গুজরাতী লেখকরাও অনুরূপ আদর্শের ছবি এঁকেছেন। শহরের আদর্শবাদী ছেলে রমেশ যেমন পল্লীতে এসে আশাহত হয়েছে, ঈশ্বর পেটলীকরের 'কল্পবৃক্ষ' উপন্যাসের গণেশ, পীতাম্বর প্যাটেলের 'খেতবনে কোলে' (ক্ষেতের কোলে) উপন্যাসের জয়ন্ত, রমনলাল দেশাইয়ের 'গ্রামলক্ষ্মী' উপন্যাসের অবিনাশেরও তেমনি পল্লীতে এসে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বস্তুতঃ, পল্লীসমাজ উপন্যাসটি লিখে শরৎচন্দ্র শুধু বাংলার নন, গুজরাতেরও পল্লীজীবনের ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত নারী-চরিত্রগুলিতে দুটি বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ ঘটেছে। একদিকে তারা যেমন নারীসমাজের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি আবার কোমল জননী-স্নেহের দ্বারা সমাজকে রসসিক্ত করেছে। তার প্রভাবে গুজরাতী উপন্যাসেও এই দুটি গুণের সমাবেশ ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী বা শৈলজা—প্রতিটি চরিত্রই সমাজের নানাবিধ অবিচারের বিরুদ্ধে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করেছে। পান্নালাল প্যাটেলের 'মানবীনী ভবাই' উপন্যাসের ভূমিকায় দর্শক দেখিয়েছেন যে

গুজরাতী উপন্যাসের নর-নারীর বেশভূষায় শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত নর-নারীর বেশভূষার প্রভাব সুস্পষ্ট। ঈশ্বর পেটেলীকরের জনপ্রিয় 'জনমটীপ' উপন্যাসের নায়িকা চন্দ্রাকে বস্তুতঃ বাঙালী মেয়ে বলা যায়। সে শরৎচন্দ্রের নায়িকার মতোই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে আর হেমাঙ্গিনীর মতো পতির গৃহ ত্যাগ করেছে। স্নেহরশ্মির 'অন্তরপট' উপন্যাসের নায়িকা রামীও পতির অন্যায় সহ্য করতে না পেরে পতিগৃহ ত্যাগ করে সম্মান বাঁচিয়েছে। স্নেহরশ্মি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'টুটেলা তার'-এর ভূমিকায় বলেছেন যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অঙ্কিত নারী-চরিত্রগুলির দ্বারা তিনি এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাদের আদর্শে গুজরাতী উপন্যাসের নারী-চরিত্র চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'অন্তরপটে'ও শরৎচন্দ্রের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এইভাবে আরও বহু লেখকের উপন্যাস থেকে দেখানো যেতে পারে যে শরৎচন্দ্র বাঙালী নারীকে গুজরাতের সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন।

গুজরাতী উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রভাব হল ছোট ছোট ঘটনা-চিত্রণে। তিনি যেমন বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি উপন্যাসে পারিবারিক কলহের চিত্র দেখিয়েছেন এবং নারীর স্নেহ সেই ভগ্নপ্রায় পরিবারকে কিভাবে যুক্ত করে তাঁর ছবি এঁকেছেন, গুজরাতী উপন্যাসেও অনুরূপ বহু চিত্র লক্ষিত হয়। পান্নালাল প্যাটেলের 'ভাগ্যানা ভেবু' (দুর্দিনের বন্ধু) উপন্যাসের নায়ক কালু ও তার খুড়তুতো ভাইয়ের কলহচিত্র এবং পরিণামে আবার তাদের মিলন শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়। সারঙ্গ বাবোটের 'রেন বসেবা' (রাতের আশ্রয়) উপন্যাসেরও মূল বস্তু ভ্রাতৃকলহ ও পরিণামে মিলন। এইরূপ অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস চুনিলাল মডিয়ার 'ব্যাজনো বাবশ' (সুদেব অধিকারী)। বস্তুতঃ গুজরাতী ঔপন্যাসিকেরা শরৎচন্দ্রের আদর্শ থেকেই অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বস্তুও যে উপন্যাসের কাঠামো গড়নে কত মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে তার সন্ধান পেলেন।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রে যেমন শক্তি ও স্নেহের সমাবেশ ঘটেছে, পুরুষ-চরিত্রেও উদার সহনশীল একটি বিশিষ্ট আদর্শের চিত্র পাওয়া যায়। বিপ্রদাস, একাদশী বৈরাগী বা বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুল চরিত্রগুলির প্রভাব গুজরাতী উপন্যাসে সুস্পষ্ট। করের চন্দ্র মেঘানি (যিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য গুজরাতীতে অনুবাদ করেছেন) তাঁর 'তুলসী কাব্য' (তুলসীমঞ্চ) উপন্যাসের সোমেশ্বরের চরিত্রটি উদারতা ও ক্ষমাশীলতায় বিপ্রদাসের আদর্শেই গড়ে তুলেছেন। পুত্রবধূর বহু অপরাধ ক্ষমা করে সে তাকে আবার সংসারে

ফিরিয়ে এনেছে। কাহিনীটি শরৎচন্দ্রের স্বামী গল্পকে মনে পড়িয়ে দেয়। সারঙ্গ বারোটের 'নীলাম্বরী'র নায়ক নাগেশের পিতা ধর্মদাসও বিপ্রদাসের প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। যে পুত্র তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাঁকে ঘৃণা করেছে, সেই পুত্রকেও তিনি ক্ষমা করেছেন। শিবকুমার যোশীরও সব উপন্যাসে দেখা যায়, বয়স্ক পুরুষ-চরিত্রগুলি বিপ্রদাসের আদর্শে রচিত।

শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাস গুজরাতী পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এই উপন্যাসের কৈশোর-প্রেমের স্বপ্ন বেদনা গুজরাতী ঔপন্যাসিকেরা ফুটিয়ে তুলেছেন। শিবকুমার যোশীর 'কঞ্চুকী বন্ধের' মহেশ ও উমা দেবদাস উপন্যাসের দেবদাস ও পার্বতীরই প্রতিরূপ। মহেশ-উমারও প্রেমের সূচনা বাল্যকালে পাঠশালায় পড়বার সময় থেকে। এখানেও উমার অন্যত্র বিবাহ হওয়াতে মহেশের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। শিবকুমার যোশী শরৎচন্দ্রের দেবদাসকে গুজরাতীতে নাট্যরূপায়িত করেছেন। বোধ হয় সে কারণেই উপন্যাস লিখতে গিয়েও দেবদাসকে ভুলতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে কমল চরিত্রে যে বৈপ্লবিক আদর্শ দেখিয়েছেন শিবকুমার 'অনঙ্গরাগ' উপন্যাসের অনুরাধা-চরিত্রে অনুরূপ বিপ্লবী আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। ঈশ্বর পেটলীকরের 'জনমটীপ' উপন্যাসের চন্দা, 'প্রেমপন্থা' উপন্যাসের যূথিকা, শিবকুমার যোশীর "আভ রুবে এনী নবনখ ধারো'র (আকাশ নব লক্ষ ধারায় ক্রন্দনরতা) নায়িকা কাজল, চন্দ্রকান্ত বক্সীর 'রোমা' উপন্যাসের রোমা—সবগুলি চরিত্রই কমলের আদর্শে রচিত।

গুজরাতী উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের প্রভাব অপরিসীম। ভবঘুরে শ্রীকান্তের আদর্শে চন্দ্রকান্ত বক্সী তাঁর "একলতানা কিনারা" (নির্জন সৈকতে) নায়ককেও ভবঘুরে করে এঁকেছেন। নায়িকাকেও রাজলক্ষ্মীর মত বাঈজীরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর 'এক অনে এক' (এক আর এক) উপন্যাসের নায়কও শ্রীকান্তের আদর্শে রচিত।

শরৎচন্দ্র গুজরাতী পাঠককে এত বিমোহিত করেছেন যে তাঁর একই উপন্যাস একই বছরে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অনূদিত হয়েছে। পথের দাবীর গুজরাতী অনুবাদ 'অপূর্ব ভারতী', 'পতিমন্দির', 'রূপমাধুরী', 'রঙ্গনাথ' ইত্যাদি নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিরাজবৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'দত্তা', 'চরিত্রহীন', 'পরিণীতা'র গুজরাতী সংস্করণ তিন-চার মাসে শেষ হয়ে যেত।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গুজরাতীদের এত আত্মীয়তা হয়ে গেছে যে আমরা শরৎচন্দ্রকে গুজরাতের বাইরের কথাশিল্পী বলে স্বীকার করি না।

শরৎচন্দ্রের শিল্পের জগৎ

নারায়ণ চৌধুরী

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পের জগৎ মূলতঃ বাংলার গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাংলার গ্রামের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল—জন্মসূত্রে এবং সহানুভূতিগত সূত্রে। যদিও তিনি জীবনের উত্তরপর্ব মূলতঃ শহরেই অতিবাহিত করেছেন, প্রথমে রেঙ্গুন ও পরে কলকাতায়, তাহলেও বলা যায় শহর অপেক্ষা গ্রামই তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে অধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই যে অতি বাল্যকালে বাংলার পল্লীর সঙ্গে তিনি গভীর সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন, সেই সখ্যবন্ধন পরে আর কখনও শিথিল বা মলিন হয়নি। খুব সম্ভব পল্লীর প্রতি তাঁর সহজাত দরদ ও ভালবাসার জন্যই তিনি পরিণত বয়সেও একটা উল্লেখযোগ্য সময় শহরে না থেকে গ্রামেই বাস করেছেন। রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে আসার পর অনেক দিন হাওড়া জেলার রূপনারায়ণ-নদতীরে সামতাবেড়-পানিত্রাস পল্লীতে বাস এ কথার সাক্ষ্য বহন করছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে-চোখে বাংলার গ্রামকে দেখেছেন তা কিন্তু আমাদের দেশের পল্লীগতপ্রাণ 'নস্টালজিক' লেখকদের চোখে দেখা থেকে বেশ কিছু ভিন্ন রকমের দেখা। শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকেরা সচরাচর বাংলার পল্লীকে একটা আদর্শ জনপদরূপে কল্পনা করে আনন্দ পেতেন। তাঁদের অভ্রান্ত লেখনীতে গ্রাম প্রতিভাত হতো সুখ-সমৃদ্ধি-প্রাচুর্য ও শান্তির আগাররূপে। ক্ষেতে সোনার ধানের ঐশ্বর্য, গোহালে দুধের বন্যা, পুকুরে মাছের সমারোহের কল্পিত স্মৃতি স্মরণ করে প্রায়ই এই সমস্ত লেখকদের—তার মধ্যে কবি ও কথাসাহিত্যিক দুই বর্গের ব্যক্তিরাই আছেন—অন্তরে পিছনে-ফেলে-আসা গ্রামের জন্য সকাতর দীর্ঘশ্বাস পড়তো। কিন্তু বলাই বাহুল্য, গ্রামের এই সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের চিত্র যত না এঁদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল তাঁদের কল্পনায়। কল্পনার রঙীন তুলিকাপাতে বাংলার গ্রামকে বর্ণাঢ্য ভঙ্গিমায় অঙ্কিত করে এই সমস্ত লেখকের দল তাঁদের বাস্তব জীবনের অতৃপ্তিকে ভুলে থাকার ও অবাস্তব চিত্রণ থেকে কাল্পনিক সন্তোষ লাভের একটা উপায় খুঁজে বার করেছিলেন। বাংলার গ্রাম যথার্থ যা নয় তা-ই তাকে ভেবে নিয়ে এঁরা নিজেকেও ভুলিয়েছেন, অপরকেও ভোলাবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র এই কৃত্রিম আদর্শায়নের ধার দিয়েও যাননি। তিনি

যেহেতু ছিলেন রিয়ালিস্ট ধাতের শিল্পী, সেই কারণে বাংলার গ্রামকে তিনি তাঁর ভালোয়-মন্দে আলো-আঁধারিতে কালো ও ধলোতে মিলিয়েই উপস্থিত করেছেন। তাঁর শিল্পের পরিকল্পনায় যেমন বাংলার গ্রামের মানুষদের অপরিমেয় হৃদয়বত্তার সম্পদের সন্ধান পাই, তেমনি অন্যদিকে সেই হৃদয়বত্তাকে কাচিয়ে তোলবার জন্য গ্রামেরই অন্য এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কুটিলতা, কলহপ্রিয়তা, শত্রুতাবুদ্ধিরও আয়োজন বড় কম দেখি না। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র গ্রামকে তার স্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন—তার ভালর দিকটা দেখাতে যেমন কার্পণ্য করেন নি তেমনি মন্দের দিকটাও সমান নির্লিপ্ততায় হাজির করেছেন। বাস্তববাদী শিল্পীর এইটেই রীতি। নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠায় হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য দুটোই পরিবেশন করতে তাঁর হাত কাঁপে না।

হৃদয়ের ঐশ্বর্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি নারীসমাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হৃদয়বত্তায় নারীর এই অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি অযৌক্তিক মনে হয় না। বাংলার গ্রামগুলি অশিক্ষায় ও কুশিক্ষায় জর্জরিত এবং বৃহত্তর পৃথিবীর আলোর স্পর্শ থেকে শোচনীয়রূপে বঞ্চিত হলেও তার সাধারণ নর-নারীর মধ্যে, বিশেষ নারীর মধ্যে, এখনও যে কত প্রাণের সম্পদ নিহিত আছে তার পরিচয় দুহাতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রাম-ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাসগুলির ভিতর। দেবদাস, শুভদা, বিরাজবৌ, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি উপন্যাস এবং রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মামলার ফল, বিলাসী, অনুরাধা প্রভৃতি বড় ও ছোট গল্পগুলির কাহিনীবৃত্তের মধ্যে নারীর এই হৃদয়ৈশ্বর্যের প্রমাণ অজস্র পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। বলা হবে, বাংলার গ্রামীণ নারীকুলের প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কিন্তু এই পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগত ভিত্তি আছে। গাঁয়েই জন্ম তাঁর, এবং বাল্য ও কৈশোরের অনেকটা কালই তিনি গ্রামে কাটিয়েছিলেন। কাজেই গ্রামকে তাঁর খুব কাছে থেকে দেখার অবসর হয়েছিল। সেই নিকট-অভিজ্ঞতারই ফলজাত তাঁর এইসব নারীচরিত্র। কোনটাই রোমাণ্টিকতার পরকলা চোখে এঁটে দেখা চরিত্র নয়। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, শরৎচন্দ্রের সহজাত মানবপ্রীতি ও সমৃদ্ধ হৃদয়াবেগ এইসব বাস্তব চিত্রণের উপর এক ধরনের স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়েছে, কিন্তু মানবপ্রেম আর হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্য ছাড়া কে কবে বড় শিল্পী হতে পেরেছেন? শরৎচন্দ্রের অফুরন্ত হৃদয়াবেগ তাঁর শিল্পের স্ফূর্তির অন্তরায় হয়নি, বরং সহায়ক হয়েছে। তবে কখনও কখনও যথার্থ শিল্পোৎ-কর্ষের বাধক হয়েছে, সে কথা মানতেই হবে। নারীর চোখের জলের বন্যা-

স্রোতের সঙ্গে/কোন কোন বইয়ে অজানিতে মেলোড্রামার উপকরণ ভেসে এসেছে।

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের দেখা ও দেখানো গ্রামের একটা সমাজতাত্ত্বিক জরীপ করলে মন্দ হয় না। তা থেকে বোঝা যাবে কেন তাঁর গ্রামের মানুষগুলির জীবনে মিশ্র আলো-ছায়ার লীলা, ভাল ও মন্দের অনিবার্য দ্বৈধতা। শরৎচন্দ্র যে-গ্রামকে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত করেছেন সে-গ্রাম এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের নিকষ সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার আশ্রিত নির্জীব হৃতস্বাস্থ্য নিরানন্দ গ্রাম। বেশীর ভাগই অজ-পাড়াগাঁ, কালাজ্বর-ম্যালেরিয়া রোগে বিশীর্ণ, কূপমণ্ডুকতায় জর্জরিত। বাইরের আলো-হাওয়া তাতে সামান্যই প্রবেশ করতে পায়, প্রবেশের কোন ছিদ্রপথও নেই। অদূরেই কলকাতা শহর (শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত অধিকাংশ গ্রামই হাওড়া কিংবা হুগলী জেলায় অবস্থিত, আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে সে কথা বোঝা যায়) কিন্তু কলকাতা শহরের কোন অগ্রসর রাজনৈতিক আন্দোলনের বার্তা অথবা প্রগতিশীল সমাজসংস্কার আন্দোলনের জাগরণ-ধ্বনি ওইসব এঁদো গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে কোন ঢেউ তোলে না। এমনকি বঙ্গভঙ্গের মত এতবড় একটা আলোড়ন-সৃষ্টিকারী আন্দোলনের সামান্য রেখাপাতেরও প্রমাণ নেই ওইসব গল্প-উপন্যাসের পরিবেশের ভিতর। এতে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার অভাব বোঝায় না, (তিনি যে কতখানি রাজনীতিসচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর পথের দাবী উপন্যাসে ও বিবিধ প্রবন্ধাবলীতে, বিশেষ করে তরুণের বিদ্রোহ প্রবন্ধ-গ্রন্থে) ; বোঝায় এই কথা যে, তিনি তাঁর সময়কার চোখে-দেখা বাংলার গ্রামকে তার অবিকৃত স্বরূপেই উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন, তার উপর কৃত্রিমতার পোঁছ চড়াতে যাননি। কিন্তু গ্রাম অনুন্নত আর শিক্ষাদীক্ষা-সময়চেতনাবিহীন হলেও তার কিছু কিছু মানুষের ভিতর যে প্রাণের ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না—এটা তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। আর এ কাজে তিনি যে প্রভূত পরিমাণে সফল হয়েছিলেন, শরৎ-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সে কথা জানেন।

শরৎ-বর্ণিত গ্রামে জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপ। চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার আওতায় লালিত এইসব জমিদার নিজ নিজ এলাকার দণ্ডমুণ্ডের এক-একজন ক্ষুদে রাজা-বিশেষ। এর নজির হিসাবে পল্লীসমাজ-এর বেণী ঘোষাল, দেনা-পাওনার জীবানন্দ চৌধুরী, মহেশ গল্পের শিবচন্দ্র রায়, বামুনের মেয়ের গোলক চাটুজ্যে প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের অত্যাচার ও শোষণের সহায় রূপে উপস্থিত যাজকতন্ত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ কতকগুলি

শাস্ত্রব্যবসায়ী কুচুটে ব্রাহ্মণ ; যেমন পল্লীসমাজের গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস ও পরান, দেনা-পাওনার শিরোমণি, মহেশ গল্পের তর্করত্ন। প্রত্যেকেই মনুষ্যত্ব-হীনতার এক-একটি জ্বলজ্যান্ত প্রতিমূর্তি। অত্যাচারী জমিদার আর কুচক্রী পুরোহিতেই শোষণের বৃত্ত পূর্ণ হয়নি, সেই সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে সুদখোর মহাজনের অপরিমিত অর্থলালসার অক্টোপাশ-বন্ধন। এই তিনের শাঁড়াসি-চাপে গ্রামজীবন অতিমাত্রায় ক্লিষ্ট, পীড়িত ও অবসন্ন। রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র আর বণিকতন্ত্রের গ্রাম্য সংস্করণের একত্র সমাহার বাংলার গ্রামকে প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলেছে—এই ছবিই শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন তাঁর পল্লীভিত্তিক রচনাবলীর মাধ্যমে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই এক মৌলিক পার্থক্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসেই জমিদারকে তাদের নায়করূপে অঙ্কিত করেছেন। বয়সে তারা যুব এবং বহু নায়কোচিত গুণে তারা ভূষিত। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত জমিদারেরা অধিকাংশই প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ এবং চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই পার্শ্বভূমিকায় স্থাপিত। অত্যাচার ও শোষণের তারা এক-একটি মোক্ষম যন্ত্রবিশেষ। কাজেই এই একটা মূল জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎ-চন্দ্রের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। জমিদারি ব্যবস্থা দিন থেকে দিনে বাংলাদেশে কতটা ক্রূরতামণ্ডিত আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল বঙ্কিম থেকে শরৎ সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যে তার একটা ছক ধরা পড়বে। জমিদারি ব্যবস্থাকে ঘিরে বঙ্কিম-যুগের রোমান্টিক স্বপ্নকুয়াশার আবরণ শরৎচন্দ্রের যুগে একেবারেই খসে গিয়েছিল—চুন-বালির পলেস্তারার ভিতরকার হাঁ-করা ইট বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। অন্য অনেক দিকের মতো এই দিক দিয়েও শরৎচন্দ্রের বাস্তবতা অগ্রসর চিন্তা-ভাবনার পথিকৃৎ। তিনি জমিদারি ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুতাকে খুব ভাল করেই এঁকে গিয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এমন যে অনগ্রসর অনুন্নত পশ্চাৎপদ গ্রাম —তারই ভিতর কত স্নেহশীলা মমতাময়ী সেবাপরায়ণা মাতৃহৃদয়া নারীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তাদের চরিত্র তিনি তাঁর প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে এঁকেছেন। এঁদো ডোবা-সদৃশ গ্রামগুলির মধ্যে অফুরন্ত হৃদয়ের সম্পদ লুকিয়ে ছিল—এ শরৎচন্দ্রের আগে কে কবে ভাবতে পেরেছিল! পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিরাজ বৌ ও অন্নদাদি (শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব), স্নেহশীলতায় নারায়ণী (রামের সুমতি), বিন্দুবাসিনী (বিন্দুর ছেলে), গঙ্গামণি (মামলার ফল), সিদ্ধেশ্বরী (নিষ্কৃতি), হেমাঙ্গিনী (মেজদিদি), ধরিত্রীকল্প সহিষ্ণুতায় শুভদা (শুভদা), ক্ষমাশীলতায় (সরযূ), সেবাপরায়ণতায় মাধবী (বড়দিদি)

ও মৃণাল (গৃহদাহ), অন্যায়ের প্রতিরোধে সুনন্দা (শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব) ও পোড়াকাঠ ভামিনী (অরক্ষণীয়া), অপক্ষপাত ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বেশ্বরী (জ্যাঠাইমা, পল্লীসমাজ) ; স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েও স্বামিত্বের সংস্কারের কাছে অনিবার্যরূপে আত্মসমর্পিতা অথচ মর্যাদাপরায়ণা কুসুম (পণ্ডিত মশাই) ও ষোড়শী (দেনাপাওনা)—কত নাম করব। গ্রামের পশ্চাৎপদতার পৃষ্ঠপটে এই নারীচরিত্রগুলি যেন আরও মহীয়সী হয়ে ফুটে উঠেছে। অঙ্কনের এতই ঔজ্জ্বল্য যে এক-এক সময় এমন অবৈজ্ঞানিক কথা পর্যন্ত ভাবতে ইচ্ছা হয় যে, সমাজব্যবস্থার ওই সমর্থনের অযোগ্য অবস্থানই যেন শরৎ-অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলির হৃদয়ের এত মহিমা আর ঐশ্বর্যের কারক।

আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শরৎচন্দ্র গ্রামীণ অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীচরিত্রের মহিমা প্রকটিত করেছেন সত্য, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তিনি গ্রামীণ অনগ্রসরতাকে সমর্থন করতে চেয়েছেন কিংবা তার সপক্ষে যুক্তি জুগিয়েছেন। বরং তাঁর অভিপ্রায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের সমাজে নারী নিতান্ত অনাদৃতা-অবহেলিতা-বিড়ম্বিতার জীবন যাপন করে। মনুর বিধানে চালিত এ সমাজে পুরুষই সমস্ত মূল্যবোধের নিয়ন্তা এবং তার স্বার্থেই বিবিধ প্রকারের নিয়মবিধি রচিত। শাস্ত্রগুলিতে নারীকে দেবীরূপে অনেক স্তব-স্তুতি করা হলেও কার্যতঃ তাকে দাসীরও অধম জীবন যাপনে আমরা বাধ্য করি। নারীর কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণ সেবা আদায় এবং নারীকে ভোগের উপকরণ রূপে ব্যবহার—এই দুই ভূমিকা ছাড়া নারীর আর কোন ভূমিকা যেন স্বীকৃতই নয় পুরুষের চোখে।

নারীর প্রতি আচরিত এই দীর্ঘদিনের অন্যায় শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীল অন্তরে খুবই বেজেছিল। তাই তিনি তাঁর প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে নারীচরিত্রগুলি এঁকেছিলেন। এমনকি সমাজে যেসকল নারী নীতিস্খলিতা বলে ধিক্কৃত এবং সেই কারণে সমাজের স্বীকৃত গণ্ডীর বাইরে নিক্ষিপ্ত, তাদেরও তিনি ঘৃণা করেন নি, তাদের স্খলন-পতনের মধ্যেও তাদের নারীত্বের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনি কয়েকটি চরিত্র হলো চন্দ্রমুখী (দেবদাস), বিজলী (আঁধারে আলো), সাবিত্রী (চরিত্রহীন) ও রাজলক্ষ্মী (শ্রীকান্ত গ্রন্থপর্যায়)। এসব চরিত্রায়ণ ভিন্ন কতকগুলি অন্য ধরনের স্বাধীন চরিত্রও তিনি এঁকেছেন, যারা ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠা, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে তেজস্বিনী। যেমন অভয়া (শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব), বিজয়া (দত্তা), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), কমল (শেষপ্রশ্ন), সুমিত্রা (পথের দাবী) প্রভৃতি। এগুলি অবশ্য গ্রামীণ নারীচরিত্র নয়, তবু ভারতীয় নারী

তো বটে। আর, সর্বক্ষেত্রে নারীত্বের মনুষ্যত্বকেই তিনি বড় করে দেখিয়েছেন, দুই-একটি ছোটখাট চরিত্র ছাড়া নারীকে হেয় করে আঁকেন নি কোথাও। জটিল কুটিল কুচক্রী পুরুষের তুলনায় শরৎসাহিত্যে এমনিধারা স্বভাবের নারীর সংখ্যা খুবই কম।

নিশ্চয়ই এ ঘটনার কিছু তাৎপর্য আছে। খুব সম্ভব শরৎচন্দ্রের মনোগত বাসনা ছিল এই দেখানো যে, এই পুরুষশাসিত অত্যাচারে উৎপীড়িত অসম সমাজেই যখন নারীর হৃদয়ে এত ঐশ্বর্য, অবিচার- ও শোষণ-মুক্ত সমসমাজে না জানি নারীর মহিমা আরও কত সু উচ্চ হতে পারত। সমাজের এত পশ্চাদ্‌বর্তী অবস্থা সত্ত্বেও নারী তার স্বাভাবিক হৃদয়বত্তাকে খোয়ায়নি, অত্যাচার-নিষ্পেষণেও তার স্নেহমমতা-প্রেম-প্রীতিসেবার ইচ্ছা অবদমিত হয় নি। তাই যদি হয় তো অত্যাচারমুক্ত উন্নত সমাজে আরও কত দিকেই না তার চরিত্রের বিস্ফার হতে পারত, আরও কত ভাবেই না তার অধিকারের বিস্তৃতি ঘটতে পারত। শরৎসাহিত্য বাংলার নারীজাতির মর্মকথার দর্পণ-স্বরূপ। এমন করে আর কোন লেখক বাংলার নারীকুলকে মর্যাদা দিয়েছেন কিনা সন্দেহ।

শরৎচন্দ্রের পল্লীভিত্তিক রচনার জগৎ ছেড়ে নগরভিত্তিক গল্প-উপন্যাসের জগতে এলে দেখতে পাই, এসব রচনায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যত প্রখরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, শিল্পরসের স্ফূর্তি ততদূর সার্থকতায় প্রকাশিত হতে পারে নি। শিল্পোৎকর্ষের বিচারে শরৎচন্দ্রের পল্লীভিত্তিক রচনাগুলিই নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে সমধিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। নিষ্কৃতি বা পল্লীসমাজ বা দেনা-পাওনা তাঁর যে-কোন নগরভিত্তিক রচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও সমালোচকদের একাংশের মত হল এই যে সব জড়িয়ে বিচার করলে একটি নিটোল শিল্প-কর্মরূপে গৃহদাহ উপন্যাসটিকেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে হয়। এই মতের যথার্থতা-অযথার্থতা নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে চাইনে। তবে সবিনয়ে একটা কথা বলতে চাই যে, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তির উদ্‌ঘাটনেই কথা-শিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্রের উৎকর্ষ বেশী প্রকাশ পেয়েছে। এরকম ঘটবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, গ্রামের সঙ্গে তাঁর যেমন নিবিড় অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, শহরের সঙ্গে তেমন ছিল না। যদিও তথ্যের দিক থেকে এ কথা অকাট্য যে, শহরেও তাঁর যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব আর বার্ধক্যের অনেকগুলি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, তথাপি গ্রামেই ছিল তাঁর চৈতন্যের মূল শিকড়। সেই যে ছোটবেলায় জন্ম ও শৈশবের বন্ধনসূত্রে গ্রামকে তিনি অত্যন্ত আপন করে পেয়েছিলেন, সেই গভীর নৈকট্যচেতনা আর সারা জীবনে

ঘোচেনি। বিচিত্র অবস্থান্তর আর বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির মধ্যেও তাঁর বাল্যের দেখা গ্রাম তাঁর অস্তিত্বের মর্মমূলে সংযুক্ত হয়ে ছিল। চেতনার এই ধরনের সংলগ্নতা এক প্রকারের fixation, তার হাত থেকে কারও পার পাবার উপায় নেই। চৈতন্যের সংসক্তি বা সংলগ্নতার বিষয়ের ভেদ হতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন বিষয়বস্তুতে চেতনা সংসক্ত হয়ে থাকবে—এইটেই নিয়তি। শরৎচন্দ্রের বেলায় দেখা যায় তাঁর চৈতন্য পরিণত জীবনেও গ্রামে সংলগ্ন হয়ে ছিল, তাঁর রেঙ্গুনপ্রবাস বা জাভা বোর্নিও সুমাত্রা পরিভ্রমণের পরিপক্ক অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কোনই কাজে লাগেনি। শরৎচন্দ্রের গ্রামভিত্তিক রচনাগুলি কেন এত জনচিত্তহারী, শহরের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলি তাদের স্বীকৃত মননশীলতা আর বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও কেন জনমনে গ্রামীণ রচনাগুলির মত দাগ কাটতে পারেনি—তার মূল উপরের ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, শরৎচন্দ্র যতগুলি বিদ্রোহী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—কি নারী কি পুরুষ—তার প্রায় সবই নাগরিক উপন্যাস-গুলির অন্তর্গত। যেমন অভয়া, কিরণময়ী, কমল, সুমিত্রা, ইন্দ্রনাথ, রাজেন, সব্যসাচী। এরকম হতেই হবে। বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ হৃদয়ের ধর্ম নয়, মস্তিষ্কের ধর্ম। ভাব বা আইডিয়ার একত্ব তার মূল সঞ্চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে। এবং যেহেতু শরৎচন্দ্রের নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলিতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বেশী, মস্তিষ্কজীবিতা বেশী, স্বভাবতঃই সেই মস্তিষ্কজীবিতার হাত ধরে বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী চরিত্রগুলির আবির্ভাবের পথ অধিকর সুগম হয়েছে। গ্রামে এ জিনিস তেমন সম্ভব হত না, তার কারণ গ্রামের পরিবেশ গতানু-গতিক, সেই পরিবেশে লালিত মানুষগুলির মনের গড়নও বেশ কিছু পরিমাণে গতানুগতিক। সনাতন ধ্যান-ধারণারই সেখানে কমবেশী আধিপত্য। শরৎচন্দ্র মূলতঃ গ্রামের মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর নরনারীর ছবিই বেশী এঁকেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই কাঠামোর চরিত্রে বিদ্রোহের আকৃতির সুযোগ তেমন নেই। তিনি মধ্য ও নিম্নবিত্ত হিন্দুসমাজের চিত্র-চরিত্র না এঁকে যদি চাষী সমাজের চিত্র ব্যাপকভাবে পরিবেশন করতেন তাহলেও না হয় অর্থনৈতিক সংগ্রামের সূত্রে বিদ্রোহ, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের ছবি ফুটিয়ে তোলার কিছু অবকাশ থাকত। কিন্তু সে পথে তিনি তেমন পা বাড়ান নি। একমাত্র পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, জাগরণ প্রভৃতি উপন্যাস এবং মহেশ গল্পে ছাড়া কৃষকনিপীড়নের চিত্র তাঁর লেখনীতে পরিবেশিত হয় নি। বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কথা স্বাভাবিক কারণেই তাঁর গ্রামাশ্রিত বইগুলির কাহিনীবৃত্তের ভিতর অনুক্ত থেকে গেছে।

এই অবশ্য-করণীয় কার্যটি তিনি করেছেন তাঁর নগরাশ্রিত উপন্যাসাবলীর কাহিনীর সাহায্যে। পথের দাবীর সব্যসাচী ইংরেজদের ঘোরতর শত্রু এবং এ দেশ থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় ইংরেজ বিতাড়নে বদ্ধপরিকর। এ দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যবিত্তসুলভ আবেদন নিবেদন-সম্বল রাজনৈতিক কর্মসূচীর সার্থকতায় তার একতিল আস্থা নেই, প্রকৃতপক্ষে যে-কোন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেরই সে একজন আপসহীন সমালোচক। সে বিপ্লবী কর্মপন্থায় বিশ্বাসী এবং দেশে দেশে তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন বিস্তৃত। একাধিক বিদেশী রাষ্ট্র থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে তার সাহায্যে আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সে এদেশ থেকে ইংরেজ-উৎখাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এমন একটি দুর্ধর্ষ চরিত্রের আদল শহরজীবনের পটভূমিতেই কল্পনা করা যায়, গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এ জিনিস অকল্পনীয়।

কিংবা কিরণময়ী চরিত্রের কথা ভাবা থাক। কী অসাধারণ ধীশক্তিশালিনী স্বাধীনচিত্তবৃত্তিসম্পন্না নারীচরিত্র। গ্রামের কাঠামোয় এরকম প্রখর বুদ্ধি-দীপ্তা স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর কথা কল্পনাই করা যায় না। কিরণময়ী শাস্ত্র মানে না, সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসিনী, ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি তার কণামাত্র শ্রদ্ধা নেই, এমনকি প্রচলিত নীতিবোধেরও সে বড় একটা ধার ধারে না। তার আচরণই এ কথার প্রমাণ। কিন্তু এমন যে অসামান্যা স্বাধীনা নারী, সে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। সে নিজের ভারে নিজে ভেঙে পড়েছে। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন কিরণময়ীর বিদ্রোহিণী সত্তার তলায় তলায় ভালবাসার জন্য একটা প্রবল পিপাসা ছিল; সে পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য সে যে-কোন প্রকার ত্যাগস্বীকার ও কষ্টবরণে প্রস্তুত ছিল। একদিকে বিদ্রোহের বৈনাশিক প্রবৃত্তি, অন্যদিকে ভালবাসার দুর্দমনীয় আবেগ—এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রক্ষোভের ভিতর সামঞ্জস্য ঘটাতে না পারার দরুন কিরণময়ীর জীবনে ট্রাজিডি ঘটল—কিরণময়ী পাগল হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র যে কত নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক শিল্পী, কিরণময়ীর পরিণাম-চিত্রণে তাঁর অসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। কিরণময়ীর উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াটা লেখককর্তৃক বাইরে থেকে চাপানো কোন আরোপিত পরিণাম নয়, কিরণময়ীর স্বভাবেরই ন্যায়সংগত প্রত্যাশিত পরিণতি। এক্ষেত্রে লেখক শিল্পের নিজস্ব নিয়মকেই অনুসরণ করেছেন, সমাজশাসনের দণ্ডভার নিজের হাতে গ্রহণ করতে যাননি। বাস্তব-বাদী লেখককে সমাজশাসনের রাশ আপন হাতে তুলে নিলে চলে না, তাঁকে বাস্তববাদের স্বকীয় ঝোঁকটাকেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়। শরৎচন্দ্রের শিল্পকর্মে এমনতর বাস্তবনিষ্ঠার ছবিই আমরা পাই।

শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য'

আশালতা রায়

শরৎচন্দ্রের পূর্বেই বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলন একটা সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করেছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারে নারীমুক্তিচিন্তারই অগ্রাধিকার। সাহিত্যেও তার স্বীকৃতি পাই বঙ্গসুন্দরী, মহিলাকাব্য এবং মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদা-প্রমীলায়।

বঙ্কিমের শিল্পজগতে নীতির প্রশ্ন মুখ্য, কিন্তু তিনিও সজাগ মন নিয়ে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিত্তবৃত্তির দাহ ও যন্ত্রণা এঁকেছেন। তারপর রবীন্দ্র-নাথ—সে এক দ্বিতীয় বিশ্ব। তাঁর প্রবন্ধে, কথাশিল্পে এবং কাব্যে ব্যক্তির সর্বতোমুখী মুক্তির অঙ্গ হিসেবেই নারীমুক্তি মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর পারি-বারিক পটভূমিও ছিল উদার নারীচেতনার অনুকূলে। মনে রাখতে হবে, সনাতন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের লড়াই মূলত স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিয়ে। ব্রাহ্ম সমাজের নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' পত্রিকা বার করেন এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব' নামে পরিচিত ছিলেন।

এঁদের সকলকে পেরিয়ে এসেছেন শরৎচন্দ্র। তখন সমাজে, অন্তত কলকাতার নাগরিক সমাজে, মেয়েদের কিছু কিছু অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তখন আর বেথুন সাহেবের স্কুলে ছাত্রীর অভাব হয় না। অনেক মফঃসল শহরেও কর্তৃপক্ষ মেয়েদের কলেজ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্তের ছড়া কেটে তখন আর শিক্ষিত মেয়েদের কেউ টিট্‌কারি দেয় না।

কিন্তু গ্রাম-বাংলার ছবি খুব বেশি বদলায় নি। নারীপ্রগতির দু-এক টুকরো আলো এসে ঠিকরে পড়েছিল মাত্র।

শরৎচন্দ্র এই গ্রামের মানুষ। তাঁর শিল্পের জগৎ এই মানুষদের নিয়ে। তারা শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত, প্রকৃতিতে আবেগপ্রবণ, সংস্কারগ্রস্ত কিন্তু সহৃদয়। এই সীমিত রেখার মধ্যেও তাঁর শিল্পসৃষ্টির মহত্ত্ব সুপরিস্ফুট।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি এই নিরিখেই বিচার্য। তাঁর মেয়েদের সম্পর্কে ভাবনা যে কত গভীর সংবেদনযুক্ত ছিল তার পরিচয় আছে 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে। মিলের subjection of women বা বিদ্যাসাগরের 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক বিচার' প্রভৃতির ধরনে রীতিমত প্রবন্ধ নয়। নিরাসক্ত, বিবিক্ত ভঙ্গিতে তথ্যের সমাবেশ এবং মননদীপ্ত

বিশ্লেষণের চেয়ে বড় হয়েছে প্রাণের আকূতি ; সেই ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণা —যা গভীর ভালবাসারই অনিবার্য শর্ত, অনিবার্য প্রতিক্রিয়া।

১। "একটা শ্লেট পেন্সিল লইয়া বসিলে নারীর বিশেষ অবস্থার বিশেষ মূল্য বোধ করি আঁক কষিয়া কড়া ক্রান্তি পর্যন্ত বাহির করা যায়।"

২। "নারীত্বের মূল্য কি ? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন।"

৩। "শাস্ত্র বলিয়াছেন, এক মাতৃত্বের কারণে সে পূজার্হা, সুতরাং সে সুযোগ না থাকিলে তাহাকে লইয়া আর কি হইবে ? তারপর ছোট বড় কীর্তিস্তম্ভ উঠিয়াছে গল্পের মধ্যে, দৃষ্টান্তের মধ্যে তখন সে স্ত্রীর দাম চড়িয়া গিয়াছে।"

শরৎচন্দ্র সমাজের ঠিক মর্মস্থলে হাত রেখেছেন। কখনো সনাতন ভারতীয় আদর্শের মহিমাকীর্তনের আড়ালে নারীব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন প্রচ্ছন্ন ; কখনো সেবা, যত্ন, ভালবাসার নামে মেয়েদের 'দেবী' বলে 'দাসী' বানানো হয়েছে। আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণ-নিপীড়নের যে পিরামিড ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সাজানো আছে, নারীনিপীড়ন তারই অচ্ছেদ্য অংশ। ক্লারা জেটকিনকে লেখা লেনিনের একটি চিঠিতে এ বিষয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের কাছে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যার পর্যালোচনা আশা করা যায় না।

কিন্তু তিনি সমস্যার কেন্দ্রে পৌঁচেছিলেন। ভারতীয় সমাজে নারী-নির্যাতন যে আসলে পুরুষশাসিত সমাজের সুযোগ-সুবিধা ভোগেরই নামান্তর মাত্র, তিনি আমাদের লোকাচারের অন্তর্লীন অসংগতিগুলি বিশ্লেষণ করে তা দেখিয়েছেন।

ধরা যাক, সতীত্বের মূল্য। সতীত্ব যদি নারীত্বের চরম আদর্শ হয়, পুরুষের পক্ষে 'সৎ' হওয়া নয় কেন ? অভিধানে 'সতী' শব্দের পুংলিঙ্গ-প্রয়োগ নেই। তাই নারীর প্রতি পুরুষের বলপ্রয়োগের শাস্ত্রীয় নাম পৈশাচ বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ। অর্থাৎ একপক্ষের অত্যাচারকে শাস্ত্র সম্মতি দিয়েছে।

"এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়াছিল সহমরণে। কবে এবং কি হইতে ইহার সূত্রপাত সেকথা ইতিহাস লেখে না।" শরৎচন্দ্র গবেষক বা ঐতিহাসিক না হয়েও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রামায়ণ-মহাভারতকে দেখেছেন। যা সহমরণ-

পক্ষীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার পারেন নি। রামায়ণে দশরথের মৃত্যুতে তিন রাণীর কেউ সহমরণে যাননি। কৌশল্যা সহমরণের ভয় দেখিয়েছিলেন মাত্র। মহাভারতে মাদ্রী ছাড়া আর কেউ সহমরণে যাননি। অথচ দাক্ষিণাত্যে সতীর কীর্তিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে। হয়তো দক্ষিণ থেকেই এই প্রথা আর্যাবর্তে এসেছে। অন্তত অশোকের কালে উত্তর অঞ্চলে বিধবাকে দগ্ধ করার প্রথা আর্যাবর্তে ছিল না। শরৎচন্দ্র শ্লেষের সঙ্গে লিখেছেন, 'বড় মন্দ মতলব বাহির করে নাই—ঠিক ত। পরলোক যদি সত্যই কিছু থাকে ত সেখানে সেবা করে কে? অমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন এবং এত বিধবা দগ্ধ করিলেন যে স্পেনের ফিলিপেরও লোভ হইত।' 'যে দেশে আত্মার স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছিল, ঈশ্বরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপা হয়েছিল, সে দেশের পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করতেন, 'বধ করিয়া সঙ্গে পাঠানো হোক!'

যদি স্বামী-স্ত্রীর আত্মার অভিন্নতা এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী সহমরণে যায় না কেন? বিপত্নীকের বিবাহ নিষিদ্ধ নয় কেন? বস্তুত 'পুরুষ যে কেবলমাত্র নিজের সুখ ও সুবিধা ব্যতীত আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই সে কথা চাপা দিয়া গর্ব করিয়া প্রচার করিয়াছে, যে দেশে নারী হাসিতে হাসিতে চিতায় গিয়া বসিত, স্বামীর পাদপদ্ম ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল-মুখে নিজেকে ভস্মসাৎ করিত—ইত্যাদি। ব্যাপারটি সত্য নয়। সেজন্যই স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার সিদ্ধি ও ধুতুরা পানের বিধি ছিল। আগুনে ধুনো ও ঘি ছড়ানো, ঢাক ঢোল শাঁখ কাঁসি সজোরে বাজানো হত। যেন সতীর আর্তনাদ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে, কানে না পৌঁছয়।"

শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল যে সহমরণের এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সত্যই পণ্ডিতেরা প্রাণ-মন দিয়ে বিশ্বাস করতেন না। যাঁরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী, কর্মফলবাদী, দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি পথের নির্দেশ করতেন, তাঁরা নিশ্চয় দুটি ভিন্ন কর্মফলের শরিককে একসঙ্গে বেঁধে পোড়ালেই পরলোকে সহবাস হয়,—বিশ্বাস করতেন না।

যদি নিরাভরণা, একাহারী বিধবা দেবী হয়, তবে দেবীর জন্য এত কৃচ্ছ্রতার বিধান কেন? বিয়ের ছাঁদনাতলায় তার প্রবেশ নিষেধ, মঙ্গল-উৎসবে নয়, 'দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে।'

'যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, একথা বোধ করি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি এখানেই তাহার মূল্য।' লোকাচারবশে পুরুষের ইচ্ছাকেই সে নিজের ইচ্ছা বলে ভুল করে এবং ভুল করে সুখী হয়।

অবশ্য সব পুরুষ নির্দয় নয়। নিজের কন্যা, নিজের ভগিনীর অবমাননা এবং মর্মন্তুদ মৃত্যুতে অনেকেই বিচলিত হন। কিন্তু সকলেই লোকাচারের কাছে অসহায়। লোকাচার ধর্ম।

শরৎচন্দ্র প্রাচীন গ্রীস মিশর আফ্রিকা, সমকালীন ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকার ছিনুক, এসিয়ার চুকচি প্রভৃতি জাতির লোকাচার সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি এর জন্য হার্বাট স্পেনসারের Descriptive Sociology, সার হেন্‌রি মেনের Ancient Law, কে পিয়ারসনের Ethics of Free Thought, হ্যাডন-এর Headhunters, ক্যাপটেন্‌ স্পেকের Discovery of the Source of Nile, জন এফ লেনানের Primitive Marriage, সি এল র‍্যাগের The Romans of the South Seas প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করেছেন, নারীর প্রতি গভীর সমবেদনা কেবল অশ্রুবিসর্জনেই নিঃশেষিত হয়নি। প্রচুর পরিশ্রম অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার দ্বারা একটি বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেই সমবেদনাকে প্রতিবাদে রূপান্তরিত করেছেন। এই একটিমাত্র নিবন্ধেই আমরা জানতে পারি পলিনেশিয়া, নিউকালিডোনিয়া এবং ফিজি দ্বীপের কোন কোন জাতি স্ত্রীলাভের জন্য লড়াই করে, কিন্তু যখন অ-পছন্দ হয়, তখন, এডমিরাল ফিজারয়, হমবোল্ড প্রমুখের মতে—মেরে খেয়ে ফেলে। আরো জানতে পারি, একজন ডাহমী সর্দারের মৃত্যুতে শতাধিক মেয়ে বিধবা হত, প্রাচীন ইহুদী সমাজে অপুত্রক বিধবা দেবরের উপপত্নী হত, কোথাও বা স্বামীর গোরে সহমরণ, কোথাও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা ধর্মীয় লোকাচার রূপে গণ্য হয়েছে।

শিক্ষার বিরোধ প্রবন্ধে এবং সব্যসাচীর উক্তিতে পূর্ব-পশ্চিমের তুলনায় লেখক প্রাচ্যপন্থী। কিন্তু নারীর মূল্যে শরৎচন্দ্রের সেই অন্ধতা, সংকীর্ণ প্রাচ্যাভিমান নেই। তিনি পাশাপাশি মনু শংকরাচার্য বাইবেল এবং খ্রীষ্টীয় সন্তদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, মেয়েদের সম্পর্কে সকলেই সমান। নারীর মূল্য কেবল পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয়। তাই আমাদের দেশে বলা হয়, নারী নরকের দ্বার. সেণ্ট বার্নাড মাকে লিখতে পারেন, "What have I to do with you? What have I received from you, but sin and misery?

অতিথিসৎকারে স্ত্রীকে বিলিয়ে দেওয়া অনেক দেশে ধর্ম বলে গণ্য হয়। তিনি আফ্রিকার এবং আমেরিকার অসভ্য জাতির এরূপ অভ্যাসের কথা লিখেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের উল্লেখ

করেছেন। বণিক অতিথি বিল্বমঙ্গলকে লালসাপরায়ণ জেনেও অহল্যাকে পাঠিয়েছে—তার তৃপ্তির জন্য।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মেরুতন্ত্রের প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটিকেও ভবিষ্যদ্‌বুক্তি বলে চালিয়েছেন। অথচ তাঁর পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত এই শ্লোকটির অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করেছেন। বিদ্যার উদ্দেশ্য হৃদয় প্রশস্ত করা, কিন্তু শাস্ত্র পণ্ডিতদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে। শ্লোক মুখস্থ করাকেই তাঁরা জ্ঞান মনে করেন। সেজন্যেই উচিত-অনুচিত বিচারবোধকেই তাঁরা সচ্ছন্দে বিসর্জন দিতে পেরেছেন। খ্রীষ্টধর্মে হিন্দুধর্মের মতই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে চিরকালীন বলত, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের বিধান লঙ্ঘন করে সেখানে divorce প্রচলন হয়েছে। এর মধ্যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছে। তার মানে এই নয় যে শরৎচন্দ্র divorce-এর পক্ষে। 'divorce জিনিসটা যে বাঞ্ছনীয় নয় একথা তাহারাও বোঝে।' তবু শৃঙ্খল-মোচনের এও একটা পথ। কিন্তু আমাদের এই যে স্বয়ং ভগবানের দেশ, যে দেশের শাস্ত্রের মত শাস্ত্র নাই, ধর্মের মত ধর্ম নাই, যেখানে জন্মাইতে না পারিলে মানুষ মানুষই হয় না, সে দেশে নারীর জন্য এতটুকু পথ উন্মুক্ত রাখা হয় নাই।'

সমস্যার কেন্দ্রে পৌঁছেও তিনি সমাধানের হদিশ পাননি। তিনি অনেক sociologyর বই পড়ার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, তাই ইতিহাসের এক-এক পর্যায়ে নরনারীর যে বিশেষ সম্বন্ধ, তা বিশ্লেষণ করা হয় নি। আফ্রিকা আমেরিকা গ্রীস ও লণ্ডন কোন স্থির সমাজচিত্র নয়, পরিণীয়মান আলেখ্য। সেই পরিবর্তনের সূত্র ধরেই যে পুরুষ নারীকে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, সেই আবার নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছে। যে খ্রীষ্টধর্ম নারীস্বাধীনতার পরিপন্থী ছিল, সমাজবিবর্তনের বিশেষ স্তরে দাঁড়িয়ে সেই খ্রীষ্টধর্মই নারীব্যক্তিত্বকে পুরুষের সমানাধিকার দিয়েছে।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের পূর্বেও অনেকের মনে স্ত্রী-স্বাধিকারের কথা জেগেছিল। কিন্তু সামাজিক শাসনের ভয়ে তাঁরা বেশিদূর এগোতে পারেননি। এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি যে তা পেরেছিলেন তার কারণ তখন ইংরেজের স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পালটেছে। অনেক বিদেশী জাতি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে, কিন্তু ইংরেজ শাসনেই প্রথম ঘটেছে 'কালান্তর'। যদি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অন্তরায় হত, তাহলে স্যার উইলিয়াম বেণ্টিক নারীপ্রগতি আন্দোলনকে মদত দিতে ভরসা পেতেন না। আগে কালের স্বীকৃতি, কালেরই আলোয় যুক্তি হয়েছে শাস্ত্রের চেয়ে বড় এবং কালোচিত

বচন শাস্ত্র থেকেও উদ্ধার করা গেছে। যেমন মহানির্বাণ-তন্ত্রের 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' শ্লোকটি।

লেখক বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে নিজেই নিঃসংশয় নন। বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ বছর আগে বা পেরেছেন, পঞ্চাশ বছর পরে শরৎচন্দ্র তা পারেননি। একটি উদ্ধৃতি—'বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ সে তর্ক তুলিব না। কিন্তু এ বিবাহ যদি শুধু এই বলিয়াই উচিত হয় যে অন্যথা তাহাকে সুপথে রাখা শক্ত হইবে তা হইলে আমি বলি, বিধবা-বিবাহ না হওয়াই উচিত।' এ কেমনতর কথা? আসক্তি যদি জৈব ধর্ম হয়, তবে নারী- ও পুরুষ-চরিত্রে সেই জৈব আবেগ এবং তজ্জাত সমস্যা—হৃদয়ের রক্তাক্ত যন্ত্রণা—সেই তো সাহিত্যের উপজীব্য। আসলে প্যাশানকে পাপ মনে করায় তিনি নরনারীর মনস্তত্ত্বের অনেকটাই দেখতে পাননি। অনুভব করেননি। তাই মাধবী, সাবিত্রী, রমা প্রভৃতির কোন সুস্থ পরিণতি নেই, কিরণময়ী শৈবলিনীর চেয়ে অনেক নরকের মধ্য দিয়ে হেঁটেও নিস্তার পায়নি, অপমান-ধিক্কারের পর শেষে পাগল হয়েছে। কমল বা অচলার মধ্যেও নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠা পেল কই? কমল সতীত্ব, নারীত্ব, বিবাহ বিষয়ে সনাতন সংস্কার মানে না। শিবনাথের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হবার পর বিবাহের বেড়িকে সে অস্বীকার করেছে। কিন্তু অজিতকে গ্রহণ করে কমল কেন শতদলে ফুটে উঠতে পারলো না? অজিতের সামনে বসে পাথরের থালায় ফলাহার কি বস্তুত বৈধব্য-আচরণ নয়? যে অন্নদা দিদি সনাতন সংস্কারের দাসী, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে উদ্বন্ধনে মরবার জন্য যে স্ত্রী হ্যালিডে সাহেবের সামনে আঙুল পুড়িয়েছিল তাদের সঙ্গেই অন্নদা দিদির মিল। অথচ শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে অন্নদার স্থান সকলের উর্ধ্বে। কমলের চেয়ে বন্দনাকে নিয়ে তিনি বেশী তৃপ্ত।

নিজের মধ্যেই স্ববিরোধিতা বলে তিনি সাহিত্যে 'নারীর মূল্য' প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। অবশ্য পাতিত্য সম্পর্কে তিনি খুব উদার ছিলেন। তাঁর সহানুভূতিও ছিল আন্তরিক। তাই প্রচলিত নিরিখে যারা পতিত, তাদের মধ্যেও মনুষ্যত্বের খাঁটি সোনা তিনি চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু যথার্থ পতিতা চরিত্র একটিও নেই। দেবদাসের চন্দ্রমুখীও নয়। এখানেই তাঁর নারীর মূল্যবোধ।

অজস্র দৃষ্টান্ত যোগে তিনি একটি সিদ্ধান্ত পেয়েছেন—পৃথিবীর কোন সমাজেই নারীর মূল্য পুরুষের সমান নয়। যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে একবিবাহই আইনসিদ্ধ, তবু সমাজের কোন্ পরিবর্তনের চাপে যে আইন নারীকে এই অধিকার দিল তার পর্যালোচনা নেই। অথচ তাঁর গ্রন্থধৃত

আলোচনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, বর্তমানে সবদেশেই নারীর অবমাননা কমছে, স্বাধিকারবোধ বাড়ছে। সুতরাং নারীর মূল্য স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজে প্রবন্ধের উপসংহারে এটুকু বলতে পারেননি।

"নারীর মূল্য কেন হ্রাস পাইয়াছে এবং বাস্তবিক পাইয়াছে কিনা এবং মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি এইমাত্র।" লেখকের উদ্দেশ্য এইটুকুমাত্র হলে কিছু বলার নেই। তিনি সম্পূর্ণ সার্থক। তিনি যে একটি সুস্থ নরনারীসম্বন্ধই কামনা করেন, সেটি বোঝা যায় হার্বার্ট স্পেনসারের বচন উদ্ধারে। এই সদিচ্ছা শুভেচ্ছা জানিয়েই গ্রন্থ সমাপ্ত।

আসামে শরৎচন্দ্র

গোপালচন্দ্র রায়

স্বাধীনতা লাভের আগে আসামের শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার ছাত্ররা একত্রে এক সময় প্রতি বছর 'সুরমা ভ্যালি স্টুডেণ্টস কন্‌ফারেন্স' করতেন। এই কন্‌ফারেন্স প্রথম বছরে হয়েছিল কাছাড়ের সদর শহর শিলচরে, দ্বিতীয় বছর শ্রীহট্টে। এইভাবে এক বছর শিলচরে, পরের বছর শ্রীহট্টে করে বদলে বদলে কন্‌ফারেন্সে হত।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ও ২০শে জুন তারিখে সুরমা ভ্যালি স্টুডেণ্টস্ কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় শিলচরে। সেবার ঐ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—শরৎচন্দ্র।

আসামের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সেই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং অনেকে সম্মেলনে যোগদান করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে উদ্যোক্তা-দের কাছে চিঠি ও তার পাঠিয়েছিলেন।

প্রথম দিনের সভায় শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছতে না পারায় সেদিনের জন্য সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, শ্রীহট্টের স্বরাজ্যদলের নেতা বসন্তকুমার দাস এম. এল. সি. মশায়। সভা হয়েছিল শিলচরের রীডিং অ্যাণ্ড ড্রামাটিক ইনস্টিটিউশনের হলে। এই উপলক্ষে হলকে বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

২০শে সকালে শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছলে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ রেল স্টেশনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁকে বিপুল ভাবে সংবর্ধনা জানান। তারপর সাদর আহ্বানে তাঁকে তাঁর বিশ্রামস্থানে নিয়ে আসেন। বিকালে ছাত্রদের সভায় ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি একটি মৌখিক বক্তৃতা দেন।

পরে এক সভায় ছাত্ররা শরৎচন্দ্রকে একটি মানপত্রও দিয়েছিলেন। সেই মানপত্রটি আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। সেটি এই—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে—

মানুষের মর্মতলের অনুভূতি তোমার লেখনীর মোহনস্পর্শে মূর্তিলাভ করিয়াছে। নারীত্বের তেজোময়ী মহিমা দিয়া তুমি বঙ্গভারতীর পূজা করিয়াছ। শিল্পি! আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর।

শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল তৈরি করিয়া সমাজ মানুষের অন্তরের দেবতাকে

অপমানিত করিতেছিল, তুমি নাগপাশ কাটিয়া দিয়াছ; দেবতাকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছ। নির্ভীক! আমাদের নবীন প্রাণ তোমাকে বরণ করিয়া লইতেছে। নমস্কার গ্রহণ কর।

চিরাচরিত পথের চিন্তাহীন আরামে, অন্ধযুক্তির জটাজালে মূঢ় ভক্তের দল শিকল দেবীর পূজা করিতেছিল। তোমার অতর্কিত আবির্ভাব তাহাদিগকে আতঙ্কিত করিয়াছে। তুমি তাহাদের সুপ্তি ভাঙ্গিয়াছ। কশাঘাতে জর্জরিত তাহারা বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। প্রবীণ তোমাকে মানিতে চায় না। তুমি তরুণের মত হৃদয়ের নতি গ্রহণ কর।

সঙ্কীর্ণতা সুন্দরকে কুৎসিত বলিয়া প্রচার করিতেছিল। দেবপূজার ফুলকে ধূলিমলিন করিয়া রাখিয়াছিল। দ্রষ্টা! জঞ্জালস্তূপের অন্তরাল হইতে তুমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেবতার পূজা করিয়াছ। যাদুকর! তোমার কোমল স্পর্শে বঙ্গবাণীর পুষ্পকাননে পারিজাত ফুটিয়াছে। আমাদের বিস্ময়া-প্লুত চিত্তের নিবেদন গ্রহণ কর।

সৃষ্টির ধারা মানুষের নীতির নিয়ম অনুবর্তন করে না। তাহা উপলব্ধি করিয়াছ বলিয়া তুমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহী! তোমাকেই অগ্রদূত করিয়া শঙ্খ-নিনাদে আমরা মুক্তির বার্তা প্রচার করিব। ধরা কাঁপাইয়া তুলিব। নেতৃত্ব স্বীকার কর—আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর।

শিলচর — গুণমুগ্ধ—

৬ই আষাঢ়, ১৩৩৩ বাং। — শিলচর ছাত্র সংঘ।

এই মানপত্র প্রদানের সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন শিলচর নর্মাল স্কুলের অঘোরনাথ অধিকারী মশায়। অঘোরবাবু এক সময় (সম্ভবতঃ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে) শরৎচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। সেদিনের সভা প্রসঙ্গে অঘোরবাবু লিখেছেন—

একবার এক সাহিত্যসভায় শরৎচন্দ্রকে একখানি মানপত্র দিবার আয়োজন হয়। ঐ সভায় ঘটনাচক্রে আমাকেই সভাপতি হইতে হয়। ঐ সভাক্ষেত্রেই সর্বজনসমক্ষে শরৎচন্দ্র আমার পায়ের ধূলা লইয়া শ্রোতাদিগের নিকট তাঁহার এই অযোগ্য মাষ্টার মহাশয়ের এরূপ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একজন উঠিয়া শরৎবাবুর এই ব্যবহারকে গুরুভক্তির একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন।

শরৎচন্দ্র সেবার শিলচরের ছাত্র সম্মেলনে এসে এখানে কয়েকদিন ছিলেন এবং শিলচরের আশেপাশে ঘুরে দেখেছিলেন। তখন শিলচর ও এর নিকটস্থ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও আলাপ করতে এসে-

ছিলেন। সেই সময়কার একদিনের একটি ঘটনা সম্পর্কে পূর্বোক্ত অঘোরনাথ অধিকারী লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র একবার শিলচরে এক সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করিতে গমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে আমিও শিক্ষকতাকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিলচরে বাস করিতেছিলাম। ঐ শহরের কতিপয় ভদ্রলোক শরৎ-চন্দ্রের সহিত সামাজিকভাবে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আমাকেই ঐ কার্যের ব্যবস্থা করিতে বলেন। আমি তাঁহাদিগকে এক সান্ধ্য-ভোজে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করি। আহারাদির পর তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে লইয়া আলাপ করিতে বসিলেন। বাহিরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি। আসামের বৃষ্টি একবার আরম্ভ হইলে শীঘ্র থামিতে চায় না। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সাপ ও সাপ ধরার গল্প চলিল। ৯টার সময় বৃষ্টি থামিলে তাঁহারা সকলে একত্রে শরৎচন্দ্রকে তাঁহার বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রওনা হইলেন। ঐ দুর্যোগের রাত্রিতে গাড়ি পাওয়া গেল না। তাঁহারা হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। যে বাড়িতে শরৎচন্দ্রের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সে বাড়ি আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে। তাঁহারা অর্ধপথ গিয়াছেন, এমন সময় শিলচরের নর্মাল স্কুলের সম্মুখে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একটা সাপ রাস্তার এধার হইতে ওধারে যাইতেছে। শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই সাপটিকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন মোহিনীমোহন লাহিড়ী ও নির্মলচন্দ্র দত্ত ইঁহারা দুইজনেই সে সময় শিলচরে পোস্টাল সুপারিন্টেনডেণ্ট ছিলেন। তাঁহারা শরৎচন্দ্রের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—সাপকে আমরা ইন্দ্রনাথের মত 'কিছু নয়' মনে করি না—বরং ওটাকে একটা বড় কিছুই মনে করি। যদি এই সাপ ধরিতে গিয়া আপনার কোনও বিপদ ঘটে, তবে সমস্ত বাঙ্গলাদেশের লোক আমাদের মুখে চুন কালি দিবে। শরৎচন্দ্র এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরদিন জানা গেল যে, সেটা গোখুরা সাপ। শিলচর নর্মাল স্কুল ও কমিশনার অফিসের কম্পাউণ্ডের মাঝখানে একটা গর্তে দুইটা গোখুরা সাপ ছিল। তাহার একটা সাপকে কমিশনার অফিসের দপ্তরী গুলি করিয়া মারে। অপরটি তাহার সঙ্গী খুঁজিবার জন্য মাঝে মাঝে রাত্রিতে বাহির হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের এই সাপ ধরিবার বাতিক বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।"

এই লেখাটি 'শরৎচন্দ্রের সাপ ধরার বাতিক' নামে ১৩৫০ সালের ভাদ্র সংখ্যা পাঠশালা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না। তবে আমি জেনেছি, এটি অঘোরবাবুরই লেখা।

শরৎচন্দ্র শিলচরে থাকার সময় আসামের চা-বাগান দেখেছিলেন এবং তাঁর দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপের সময় অনেকের কাছে এখানকার চা-বাগান সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিয়েছিলেন। এরই ফলে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেষপ্রশ্নে'র মূল চরিত্র কমলের এইখানেই সন্ধান পেয়েছিলেন।

কমলের জন্ম এই আসামেরই চা-বাগানের এক বড় সাহেবের ঘরে। তার বাপ ছিল ইংরাজ ও মা ছিল বাঙালী। কমলের প্রথম বিয়েও হয়েছিল এখানকারই এক অসমীয়া ক্রিশ্চানের সঙ্গে।

এই কমলকে বাঙলার বাইরের কোন পরিবেশে ফেলে গল্প রচনা করবার জন্য শরৎচন্দ্র আগ্রায় গিয়ে কিছুকাল কাটিয়েও এসেছিলেন। এবং সেখান থেকেও উপন্যাসের প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

তাঁর আগ্রার সংগৃহীত উপকরণগুলি সম্বন্ধে কিভাবে কী জেনেছি, তা বলছি—

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন সেখানে প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তাঁর খুব স্নেহভাজন ছিলেন। এই প্রতুলবাবুর এক ভগ্নীপতি ছিলেন প্রতিভারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন আগ্রা-প্রবাসী। প্রতিভারঞ্জনবাবু একবার আগ্রা থেকে শ্যালক প্রতুলচন্দ্রের হাওড়ার বাড়িতে এলে তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

প্রতিভারঞ্জনবাবু শেষ বয়সে আগ্রা থেকে চলে এসে প্রতুলবাবুর বাড়ির নিকটেই হাওড়ার শিবপুরে থাকতেন। আমি যখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহের জন্য হাওড়ার বাজে শিবপুর ও শিবপুর অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম, সেই সময়েই একদিন প্রতুলবাবুর বাড়িতে এই প্রতিভারঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেইদিনই শরৎচন্দ্রের কথা উঠলে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তা এই—

শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্ন' লিখবার কয়েক মাস আগে একবার আগ্রায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। একদিন বিকালে তিনি রাস্তার ধারে কালীমন্দিরের গেস্ট হাউসের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি সেই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ শরৎচন্দ্রকে দেখে আমি খুবই বিস্মিত হই। তারপর শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। তখন আমি শরৎচন্দ্রকে বললাম—এখানে আর আপনাকে আমি কিছুতেই থাকতে দেব না। আমাদের বাড়িতে যেতে হবে এবং সেইখানেই যতদিন ইচ্ছা হয় আপনাকে থাকতে

হবে। আমার কাকা প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখন তিনি এখানে ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার। পরিচিত অপরিচিত অনেক বাঙালীই আগ্রায় এসে আমাদের বাড়িতেই ওঠেন। আমার কাকা অতিশয় সদাশয় ও অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি। আমি এখানে কাকার কাছেই থাকি।

আমার আগ্রহ দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—আচ্ছা বাছা, চল তবে তোমাদের ওখানে গিয়েই থাকা যাক।

এরপর আমি শরৎচন্দ্রের বিছানা ও জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা ও গোছগাছ করে গাড়ি ডেকে আনলে, শরৎচন্দ্র মালপত্র সহ আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চলে এলেন।

আসার পথে গাড়িতে শরৎচন্দ্রকে বললাম—দিলীপকুমার রায় এখন আগ্রায় আমাদের বাড়ির পাশেই তাঁর এক আত্মীয়র বাড়িতে আছেন। দিলীপবাবুকে কেন্দ্র করে আগ্রায় এখন খুব গানের আসর চলছে।

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—তাই নাকি ? মণ্টু এখন এখানে আছে ? তাহলে তো তোমাদের বাড়িতে দিনকতক থাকতেই হল দেখছি। মণ্টু তোমাদের বাড়ির কতদূরে থাকে ?

—আজ্ঞে নিকটেই। তিনি এসে উঠেছেন—রায় বাহাদুর ডাঃ রমাপ্রসাদ বাগচি এম. ডি. মশায়ের বাড়িতে। রমাপ্রসাদবাবুর বড় ছেলে হরপ্রসাদ বাগচি সেদিন আমাকে বলছিলেন—দিলীপবাবু নিজে তো গান করেনই, এমন কি তাঁকে কেন্দ্র করে আরও অনেক বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েও আসেন। ওস্তাদী গান, হিন্দি গান, বাঙলা গান, এমন কি ইংরাজি গানও হয়। বাঙালী অবাঙালী, স্থানীয় বহু ইংরাজও এই গানের আসরে আসেন। এখানকার কলেজের অধ্যাপকরা তো আসেনই, অনেক রাজকর্মচারীও আসেন।

প্রতিভারঞ্জনবাবু আমাকে বললেন—শরৎচন্দ্র দিলীপ রায়কে কিরূপ স্নেহ করতেন, সে তো আপনি জানেনই ! যাই হোক্, দিলীপবাবু আগ্রায় আছেন শুনে শরৎচন্দ্র মহা খুশী হলেন। আমাদের বাড়িতে এসেই আমাকে বললেন—মণ্টুকে ডেকে আনো।

আমি দিলীপবাবুকে ডেকে আনলাম। সেইদিন থেকে কোন দিন আমাদের বাড়িতে, কোনদিন বা বাগচি মশায়ের বাড়িতে গানের আসর বসতে লাগল। শরৎচন্দ্র প্রতিদিনই সভায় উপস্থিত থাকতেন।

কিছুদিন পরে দিলীপবাবু আগ্রা ছেড়ে মথুরায় গেলেন চন্দন চৌবের কাছে ধ্রুপদের অনুশীলনের জন্যে। তার কিছুদিন পরে শরৎবাবুও আগ্রা ছেড়ে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতে চলে এলেন। আগ্রায় আমাদের বাড়ি থেকে

তাঁর চলে আসার দিনটা আমার আজও বেশ মনে আছে। সারা আগ্রা শহরে তখন ভীষণভাবে ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। আমাদের বাড়িতেও তখন সবার জ্বর, কেবল আমি আর কাকা ভাল আছি। কাকীমা, আমার খুড়তুতো ভাইবোন, এমন কি বাড়ির ঠাকুরচাকরগুলোরও জ্বর। আমিই কোনরকমে রান্না করে শরৎচন্দ্রকে খেতে দিতে গেলে তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি আন্‌ছ যে ?

আমি বাড়ির সকলের অসুখের কথা গোপন করে শুধু বললাম—আমিই আনলাম আজ।—কিন্তু খাওয়ার পর তাঁর হাত ধোয়ার সময়, ভৃত্যের পরিবর্তে আমিই যখন আবার তাঁর হাতে জল ঢেলে দিতে গেলাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমাদের চাকরগুলো কোথায় ? তুমি যে হাতে জল ঢেলে দিতে এলে ?—এবার আর মিথ্যা বলতে পারলাম না। চাকরের জ্বর হয়েছে বলতেই হল। আমার অপটু হাতের রান্না খেয়েও হয়তো তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। তাই এবার তিনি বললেন—আজ রেঁধেছে কে ?—বাধ্য হয়ে বললাম—আমি। ঐ সঙ্গে কাকীমার এবং রাঁধুনী বামুনেরও যে জ্বর হয়েছে, সে কথাও বললাম।

শরৎচন্দ্র এই শুনেই বললেন—আর তোমাদের এখানে নয়। তোমাদের বাড়িশুদ্ধ সবার অসুখ। সে কথা গোপন করে তুমি কষ্ট করে আমার সেবা করছ! আর নয়। তোমার কাকা অফিস থেকে ফিরে এলেই পালাব। সত্যিই করলেনও তাই। কাকা শত অনুরোধ করা সত্ত্বেও আর রইলেন না। বললেন—আমি থাকলে, আপনাদের আরও কষ্ট হবে। সেই দিনই তিনি আগ্রা ছেড়ে চলে এলেন।

প্রতিভারঞ্জনবাবু শেষে বললেন—আগে কলকাতার সিটি কলেজে যখন কো-এডুকেশন ছিল তখন ঐ কলেজে কলকাতার এক বিখ্যাত ডাক্তারের এক মেয়ে ও এক ভাগ্নী পড়তো। ডাক্তারের মেয়ে পড়তো আর্টস আর ভাগ্নী পড়তো সায়েন্স। তখন সিটি কলেজে কেমিস্ট্রির ডিমন্‌স্ট্রেটর ছিলেন জনৈক রায়। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তিনি ডাক্তারের ভাগ্নীর সঙ্গে প্রেম জমাবার চেষ্টা করলে, কলেজের কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে তাঁকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি কলকাতা ছেড়ে বারাণসীতে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। এখানেও পাড়ায় এক নারীঘটিত ব্যাপারে তাঁর স্কুলের চাকরি চলে যায়। শেষে তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। বৃন্দাবনে এসে ভেক্ নিয়ে এক সেবাশ্রমে থাকতেন। তারপর একদিন সেবাশ্রমের এক যুবতীকে নিয়ে সরে পড়েন। বৃন্দাবন ছেড়ে তিনি সেই বৈষ্ণবী সহ আগ্রায় চলে আসেন। আগ্রায় এসে তিনি

শোয়েব মহম্মদিয়া স্কুলে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করতেন। তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর বৈষ্ণবী সঙ্গিনীকে নিয়ে এই আগ্রা শহরের এক প্রান্তে বাস করতেন।

আগ্রায় তখন দুটো কলেজ ছিল—আগ্রা কলেজ ও সেণ্ট জন্‌স কলেজ। ঐ দুটো কলেজেই তখন কয়েকজন করে বাঙালী অধ্যাপক ছিলেন। যেমন—জীবন তালুকদার, অতুল দত্ত, লোকেন ঘোষ, নগেন মুখুজ্যে ইত্যাদি। এঁরা সকলেই শোয়েব মহম্মদিয়া হাই স্কুলের ঐ মাস্টার মশায়কে জানতেন। আগ্রায় তখন মুষ্টিমেয় যে ক ঘর বাঙালী ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতেন এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কও ছিল। কিন্তু এই মাস্টার মশায়কে আগ্রার কোন বাঙালীই বাড়িতে আমন্ত্রণ করা তো দূরের কথা, প্রীতির চোখেও দেখতেন না। কারণ, তাঁরা কিভাবে এঁর সমস্ত পরিচয় পেয়েছিলেন। ঐ মাস্টার মশায়ও অবশ্য এজন্য কারও কাছে কোন আক্ষেপ করতেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তেই তাঁর বৈষ্ণবী সঙ্গিনী বা বৈষ্ণবী স্ত্রীকে নিয়ে শহরের একপ্রান্তে বাস করতেন। ওখানকার বাঙালী সমাজের সঙ্গে তাঁর মিশবারও আগ্রহ দেখা যেত না।

আগ্রা কলেজ ও সেণ্ট জন্‌স কলেজের বাঙালী অধ্যাপকরা 'বাগচি ভবনে' এবং আমাদের বাড়িতে দিলীপ রায়ের গানের আসরে আসতেন। আমাদের বাড়িতে এসে তাঁরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও আলাপ করতেন। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় শরৎচন্দ্র স্থানীয় বাঙালীদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। আর ঐ সময়েই কোন অধ্যাপক ঐ মাস্টার মশায়ের কথা শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন।

এই যে কাহিনীটা এখানে বললাম, এতে দেখা যাচ্ছে—এর মধ্যেকার শোয়েব মহম্মদিয়া স্কুলের শিক্ষক, বাগচি ভবনে ও প্রকাশবাবুর বাড়িতে গানের আসর, সেই সময়কার আগ্রায় ভীষণ ডেঙ্গু জ্বর প্রভৃতি অনেকের এবং অনেক কথাই শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষপ্রশ্নে'র কাহিনীতে দিয়েছেন। তবে এ কথা ঠিক যে সেই মাস্টার মশায়ের অশিক্ষিতা বৈষ্ণবী সঙ্গিনী বা স্ত্রী কখনই কমল চরিত্রের আদর্শ নয়। শরৎচন্দ্র কমল চরিত্র আসলে এই চা-বাগান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন এবং আগ্রার ঘটনার সঙ্গেই তা মিশিয়েছিলেন।

একবার কবি কালিদাস রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা খণ্ড খণ্ড অনেক ঘটনাকেই লিখবার সময় এক সময়ের একটি সম্পূর্ণ ঘটনা করে লিখেছি। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে আনতে গেলে, তাকে হয় কল্পনা দিয়ে,

নয়তো অন্যান্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা কাহিনী দিয়ে পূরণ করে, সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়।

শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে'র ক্ষেত্রেও তাই করেছেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বলেছিলেন—'আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।'—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—"কোন কবি, এমনকি শেক্সপীয়রও এতখানি কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না যে, চোখে না দেখিয়া এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন।"

আমার দৃঢ় ধারণা, কমলও এমনি এক শরৎচন্দ্রের চোখে দেখা বা তার সম্বন্ধে অন্ততঃ বিস্তৃত ভাবে কানে শোনাও একটি চরিত্র। আর সেই চরিত্র এই আসামেরই চা-বাগানে স্বচক্ষে দেখা অথবা এখানকার কারও কাছে শোনা।

তাই যে শেষপ্রশ্ন উপন্যাসকে মহান্ বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় 'গীতাঞ্জলি'র উপরেও স্থান দিয়েছেন (পারসোন্যালি, আই উড প্লেস শেষপ্রশ্ন অ্যাবাভ গীতাঞ্জলি—ফ্র্যাগমেণ্টস অব এ প্রিজনার্স ডায়ারি—বই এম. এন. রায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকরা যার উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং অগণিত পাঠক-পাঠিকাও যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, শরৎ-সাহিত্যের সেই নতুনত্বের দাবিদার শেষপ্রশ্ন উপন্যাসের মূল কমল-চরিত্রকে সরবরাহ করার জন্য শরৎসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা আসাম, বিশেষ করে আসামের এই কাছাড় জেলার কাছে কৃতজ্ঞ।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমরা, সাধারণ পাঠকেরা উপন্যাসই বেশি পড়ি, পড়তে চাই। এবং নিঃসন্দেহে, এই সাহিত্যকর্মটিই সর্বাধিক আলোচিত। অথচ এই সম্পর্কে রুচির অন্তত একটা নিম্নতম মান গড়ে তোলার জন্য সৎ, স্থিতধী, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা বিশেষ সুলভ নয়। আবর্জনার স্তূপে যার যথার্থ স্থান, সেই রচনা সম্বন্ধেই যখন তাবৎ পণ্ডিতব্যক্তিরা শেকস্‌পীয়রিয় নৈর্ব্যক্তিকতা, দান্তের নরকবর্ণনার চমৎকারিত্ব ইত্যাদি আপ্তবাক্য নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেন, তখন মনে হয়, বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে দীর্ঘপরিচয়টা আসলে সাহিত্য- ও বিবেকবোধ-বর্জিতের আত্ম- এবং পর-প্রবঞ্চনার চমৎকার মূলধন মাত্র।

জীবনের জটিল সামগ্রিকতার বোধেই যে ঔপন্যাসিকের সাধনার সিদ্ধি, তা আমরা জানতে চাইনি। সৎ জীবনজিজ্ঞাসায়, নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে জীবনকে আয়ত্ত করার চেষ্টাতেই যে উপন্যাসে কাহিনী এবং চরিত্র তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে ওঠে, অ্যাকাডেমিক আলোচনা এ শিক্ষা দেয়নি। বলা হয়, আধুনিক জীবনের সমস্যা উপন্যাসের উপজীব্য। কিন্তু কার্যত লক্ষ্য করি, সমস্যার ছদ্মবেশ-পরানো অর্থহীন ভাবালুতার বুদ্‌বুদ্‌বিলাসই সমালোচকদের মন মজায়; সমস্যাটা আসলে কী বস্তু, তার মূল অন্বেষণে ঔপন্যাসিকের চেতনা কতটা জীবনসন্ধানী, দায়িত্বশীল—এ সমস্ত প্রশ্নে তাঁরা চিন্তিত হন না।

এই প্রশ্নগুলো যে শিল্পরূপায়ণেরই, তা তাঁদের যান্ত্রিক বিচারে ধরা পড়ে না। শিল্পপ্রেরণাই ঔপন্যাসিককে সমস্যার মূল অন্বেষণ করায় ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে, সমাজ ও ব্যক্তির জটিল দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে। সমাজের নানাশক্তির টানাপোড়েনে মানুষের সম্পর্কগুলো ভাঙে, বদলায়; এই ভাঙাগড়ার আবর্তে ব্যক্তির ভেতর এবং বাইরের দ্বন্দ্বসংঘাত, জর্জরিত ব্যাকুল আত্ম-অন্বেষণেই উপন্যাসের সত্যকারের সমস্যা। প্রকৃত সাহিত্যরসিক সমালোচকদের মতে, অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, উনিশশতকী ভারসাম্যহীন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বযন্ত্রণার পটেই, ব্যক্তিচৈতন্যের দ্বন্দ্ব- এবং রূপান্তর-চিত্রণের সৎ প্রচেষ্টার জন্যই মহৎ উপন্যাসের মর্যাদা 'গোরা'র প্রাপ্য।

'গোরা'র কাছে আমরা কোনও সাহিত্যিক পাঠ গ্রহণ করিনি। শরৎ-চন্দ্রের মত একজন সাধারণ গল্পকারই আমাদের মনকে বেশি টানেন। তাঁর 'অনন্যসুলভ মৌলিকতা' বিষয়ে পণ্ডিত সমালোচক যেভাবে নিঃসন্দিগ্ধ হন

তাতে শুধু আমাদের চিন্তাদৈন্যই প্রকাশ পায় : বাঙলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে শরৎচন্দ্রের অবদান যুগান্তকারী ; নিষিদ্ধ সমাজবিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর-সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি বাঙালীর মনের সংকীর্ণ গণ্ডী বহুদূর ছাড়িয়ে দিয়ে অতি-আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন। অতঃপর শরৎ-প্রতিভার বিশেষ দিকের প্রশস্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন : প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। প্রেমের অদম্য স্বাধীনতা ও সমাজের অন্যায় প্রতিষেধের বিরুদ্ধে নির্ভীক বিদ্রোহ, সর্বোপরি এর ব্যাকুল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা-সন্দেহ-জড়িত আত্মোপলব্ধি তিনি প্রত্যক্ষগভীর অনুভূতির সঙ্গে ও অভ্রান্ত নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে চিত্রিত করেছেন ; এবং বাঙলার উপন্যাসসাহিত্যে এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

'গৃহদাহ' বিশ্লেষণের সময় এই বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যাবে। আপাতত লক্ষণীয়, যুক্তির শৃঙ্খলা রক্ষায় সমালোচকের অবহেলা। তাঁর রায়ে 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়ে এর সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার 'দোলাচলচিত্তবৃত্তি'। এবং ডিহরী-প্রবাসের সময় অচলা-সুরেশের মূর্ছাহত, জীবন্মৃত প্রেমের অবস্থার চিত্রটি সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে কলাকৌশলের দিক দিয়ে উচ্চতম স্থান অধিকার করে। অথচ তিনি আগেই জানিয়ে রাখেন, কোন্ অবস্থায় পাত্রপাত্রীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের উদ্ভব হয়, শরৎচন্দ্র তা নিপুণভাবে বিবৃত করেন, কিন্তু তাদের পাপের প্রতি প্রবল ও অনিবার্য প্রবণতা থাকে না। যেমন, অচলা অবস্থার প্রতিকূলতা ও বাহ্য আত্মসম্ভ্রম রক্ষার অন্য সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু সুরেশের প্রতি তার মন কোনদিনই অনুরাগরঞ্জিত হয়নি। তাহলে অচলার 'দোলাচল-চিত্তবৃত্তি'টি কোন্-জাতীয় বস্তু! সমালোচক নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে যে কত অসতর্ক, তার আরও প্রমাণ পাই। অচলার 'দোলাচল-বৃত্তি'ই উপন্যাসটির সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয়, তার এবং সুরেশের মূর্ছাহত প্রেমই কলাকৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, স্বীকার করে নিলেও আমাদের পরিত্রাণ মেলে না। 'দ্বিমুখী প্রেমের আকর্ষণে' অচলার জীবন কিভাবে সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে, দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় তার চেতনা, এটাও উপন্যাসের আসল জিনিস নয়। পরেও জানানো হয়, উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রশ্নটি হল,

অবস্থা-সংকটে পতিত এবং দৈহিক-পবিত্রতা-বিচ্যুত অচলা সতী কিনা, তাকে কি কুলটা বলা যায়? প্রশ্নটির উত্তরও নাকি খুব পরিষ্কার ও উচ্চাঙ্গের মননশক্তির পরিচায়ক। অচলার সতীত্বনির্ণয় সম্বন্ধে তার অন্তরের অনির্বাণ জ্বালাই দৈহিক বিচ্যুতি অপেক্ষা মূল্যবান সাক্ষ্য। নিজের সহজ স্থান থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য অচলা কিছুটা পরিমাণে দায়ী, কিন্তু সে দায়িত্বও তার সতীত্বের বিরোধী নয়। মানুষের মগ্নচৈতন্যের কিছুটা অংশ তার নিজের কাছে অস্পষ্ট, সেখানে মহিম-সুরেশের প্রতি অচলার অনুরাগ একই সঙ্গে ছিল, কিন্তু সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তির বিচারে মহিমই জয়ী। অবশ্য মৃণালের সতীত্বের আদর্শ একদিক দিয়ে 'অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত', লৌকিক সম্ভ্রমের দুর্বল মোহ মৃণালের সতীত্বকে একমুহূর্তের জন্যও অভিভূত করতে পারত না, কিন্তু মৃণালের মত অত উচ্চস্তরের সতী না হলেও অচলা যে অন্তত মাঝারিগোছের সতী, অবশ্যই স্বীকার্য! প্রশ্নটি ও তার সমাধান উচ্চাঙ্গের মননশক্তির পরিচায়কই বটে! আর এটাই শরৎচন্দ্রের স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের সম্পর্কের 'নির্ভীক পুনর্বিচারে'র অন্যতম উদাহরণ।

বস্তুত শরৎচন্দ্রের কোনও গভীর জীবনজিজ্ঞাসা ছিল না। তিনি সত্যই একজন সাধারণ গল্পকার মাত্র। সুখদুঃখের হাসিকান্নার ব্যঞ্জনে গল্পকে উপাদেয় করে তোলায় তাঁর সুগৃহিণীসুলভ সহজাত পটুতা অনস্বীকার্য। কিন্তু গল্পের ঘরোয়া গণ্ডী ছেড়ে উপন্যাসের সমস্যার রাজ্যে এলেই তিনি দিশেহারা হন, কাহিনী এবং চরিত্রকে সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করতে গিয়ে তাঁকে ভাবের ঘরে চুরির আশ্রয় নিতে হয়, অশিক্ষিতপটুত্ব তখন কোনও কাজে লাগে না। মানুষের সম্পর্কের ভাঙাগড়ার জটিলতা কার্য-কারণ-সংগতির সূত্রে তিনি ধরতে পারেন না, প্রতিপদে তাঁকে গোঁজামিল দিতে হয়।

পণ্ডিতজনদের অভিমত অনুসারে অচলার 'দোলাচল-বৃত্তি'ই বহুলপ্রশংসিত 'গৃহদাহে'র সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার তাৎপর্য কী? একই সঙ্গে দুটি পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ দেশকালবিধৃত জীবনের সম্পর্কবিহীন বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মাত্র! প্রকৃতিতে বা জীবজগতে যেমন অন্ধ প্রাকৃতিক বা জৈবিক নিয়মেই অনেক কিছু ঘটে, তেমনি ভাবেই কি 'দুই প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বীর আকর্ষণে' নারীর মনে দ্বিধা-অনিশ্চয়ের ভাব জাগে। এঁরা স্বীকার করবেন না, নর-নারীর প্রেম নিছক প্রেম নয়, তাদের সমগ্র অস্তিত্বের সমস্যার সঙ্গেই তা জড়িত, তাই বিভিন্ন যুগে, সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় নরনারীর সম্পর্ক, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব নতুন রূপ নেয়।

উপন্যাসে অল্পবিস্তর পরিমাণে জীবন-রূপায়ণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলেই কিছুমাত্র সচেতনতা থাকলেই লেখক সমাজপটকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন না। শরৎচন্দ্রও তাঁর নায়িকার সমস্যাকে বাস্তব পরিচ্ছদ দেওয়ার জন্যই তাকে আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তিনি এই সমাজকে বোঝার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না, যান্ত্রিক সরলীকরণেই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব সারেন। আমরা জানি, ব্যক্তিগত পক্ষপাতে প্রকৃত শিল্পীর জীবনচেতনা অভিভূত হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ জীবনই তাঁর অন্বিষ্ট। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণায় শরৎচন্দ্র ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, একদেশদর্শী মন্তব্য ও বিবৃতির স্থূলতায় উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন। এই সমাজের চিন্তা ও জীবনাচরণের ছকটা তাঁর কাছে প্রথম পাঠের মতই খুব সরল : ডিহরিতে থাকার সময় অচলার স্মৃতিরোমন্থনে জানি, আত্মসুখলোলুপতা, বাহ্য সম্মানের জন্য কাঙালপনাই তাদের সমাজের স্বরূপলক্ষণ। এই সমাজে আছে কেদারের মত নীচ, স্বার্থপর ; আর অচলা, হিন্দুধর্মের ত্যাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে যার সতীত্ববোধ দুর্বল। 'গৃহদাহ'-এর প্রথম অংশে দেখি, অচলার সম্পর্কে সুরেশের কাছে কেদার বলে, তার মেয়ে স্বাধীন মুক্ত পরিবেশে মানুষ, প্রেমজ স্বেচ্ছানির্বাচনের বিবাহ ছাড়া ওর সম্মতি মিলবে না। সমগ্র সমাজপটে এই পরিবেশের স্বাধীনতার, মুক্তির আপেক্ষিক অর্থ বা চেহারা এবং তাতেই গঠিত অচলার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপ ফুটুক বা না ফুটুক, এ স্বাধীনতার ভয়াবহ 'কদর্য' পরিণাম সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করার প্রতি লেখক বিশেষ সচেতন। তার ওপর আছে যাত্রাগানের বিবেকের মত হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতার প্রতীক মৃণালের ভাষণ, যার কাছে সুরেশ অচলা, এমন কি কেদারকেও জীবনের চরম শিক্ষা নিতে হয়।

সমগ্র অস্তিত্বের প্যাটার্নেই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ব্যক্তিস্বরূপ গভীর, উজ্জ্বল হয়। অচলার জীবনে দেশকালের সীমায় আধুনিক নারীর অস্তিত্বের বিরোধযন্ত্রণা, দ্বন্দ্ববিক্ষত আত্ম-অন্বেষণ কোথায়? সমাজপটের জটিলতা শরৎচন্দ্র বোঝেন না বলেই অচলার চরিত্রচিত্রণ প্রতিপদে অসংগতিদুষ্ট, তার সমস্যা তাৎপর্যহীন।

প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে, তার সত্তার গভীরে নতুনভাবে বাঁচে। প্রেমের সমস্যায় জীবনের মূল্যবোধের প্রশ্নটা তাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, গোরা এবং সুচরিতার প্রেম সেই কারণেই এত তাৎপর্যপূর্ণ। অচলা এবং মহিমের প্রেমে কখনই তো দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির সম্পর্কে টান অনুভব

করা যায় না। মহিমের কাছে যেমন 'অচলাকে তিল তিল করিয়া ভাল-বাসিবার প্রথম ইতিহাস অস্পষ্ট', স্বভাবতই তার প্রতি এই ব্রাহ্মিকার আকর্ষণের পেছনেও কোনও কার্যকারণসূত্রের সম্পর্ক নেই। জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে, চিন্তা-আবেগের সূত্রে, ব্যক্তিত্বের গভীর আকর্ষণে তারা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, তার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত। অর্থাৎ আবেগহীন কর্তব্যপরায়ণ মহিমের সঙ্গে তার প্রেম অনিবার্য, কারণ ললাটের লিখন। প্রথম পরিচয়ের একদিন পরেই অচলা সুরেশের কাছে মহিম সম্পর্কে তার দীর্ঘদিনপোষিত ক্ষোভ জানায়—চিরদিন প্রয়োজনই তাঁর সর্বস্ব। অপর দিকে, পিতার দারিদ্র্যের জন্যই সুরেশের সঙ্গে তার বিবাহ যখন মোটামুটিভাবে স্থির, তখন তীব্র আঘাত সত্ত্বেও মহিমের অটল গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হবে না, এই চিন্তায় তার দুচোখ 'প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে' ভরে যায়। দীর্ঘ দিনের বিরতির পর মহিম উপস্থিত হলে অচলার স্নেহ প্রেম উথলে ওঠে, অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে মহিমের কাছে সুরেশ-রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানায়, পরে কেদারের প্রতিও তার চোখের জলের নালিশ। এই ভাবালুতা, বাষ্পোচ্ছ্বাসের বন্যায় 'স্বাধীন, মুক্ত, পারিবেশে' আবাল্যবর্ধিত নারীর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব কিছুমাত্র নেই।

সুরেশের সঙ্গে অচলার সম্পর্কের ইতিহাসেও ঠিক এমনি ধরনের সরলী-করণ। সুরেশের স্বভাব উদ্দাম, অতএব ঘৃত ও অগ্নির সম্পর্কের মতই অচলার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তেই সে তীব্র কামনায় অস্থির হয়ে উঠবে, উপন্যাসের কাঠামোয় নারী-পুরুষের সম্বন্ধ এত সহজে উপস্থাপিত করা যায় না। তাই বন্ধুর প্রেমিকার প্রতি তার মোহের একটা ব্যাখ্যা দিতে হয় : কয়েক দণ্ডের আলাপেই অচলা যে তাকে এমনভাবে পরাজিত করে ফেলল, তার কারণ, অচলার ব্যবহারের সংযম। নিজের মধ্যে এ বস্তুটির একান্ত অভাব ছিল বলেই তার 'শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ' এই 'গৌরবময়ী'র পদতলে মাথা নত করে ধন্য বোধ করল। 'গৃহদাহ'র পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অচলার চরিত্রে সংযমের ছিটে-ফোঁটাও অদৃশ্য, বরং অসংযত অন্ধ আবেগের সূত্রেই তাদের সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন। সামান্য আলাপ-পরিচয়ের পরই শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণের কোনও বালাই না রেখেই সুরেশ যখন উন্মত্ত ইতর আকর্ষণে এই 'গৌরবময়ী'কে কাছে টেনে আনে, তখন সে মূর্ছিত মায়ামুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে। অতঃপর সুরেশের ব্যাকুলতায় অচলার চোখে কখন কখন জল আসে। মহিমের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে কেদারবাবুর সঙ্গে সুরেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়, সে কেদারের ঋণ শোধ করে। সেই সময় অচলাকে একা পেয়ে সুরেশ যখন

বলে 'তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নিচের মাটি পর্যন্ত টলতে থাকে,' তখন সুরেশের চোখের 'টলটলে জল' লক্ষ্য করে অচলা মুহূর্তের করুণায় হাত দিয়ে তার জল মুছিয়ে দেয়, বলে : 'আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।' মহিমের আবির্ভাবের পর তার সম্বন্ধে অচলা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তারপর আশাহত সুরেশের অচলা আর কেদারের প্রতি নির্লজ্জ কুৎসিত আক্রমণ। কিন্তু অচলার মনে তার প্রতিক্রিয়া সাময়িক। ফয়জাবাদ থেকে আহত অবস্থায় সুরেশ ফিরে এলে মমতায় অচলা আবার বিগলিতচিত্ত : সে সুরেশকে জানায়, তার বিরুদ্ধে ওর কোন ক্ষোভ নাই। অচলা উচ্ছৃঙ্খল অথচ মহৎ-প্রাণ সুরেশের ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ ঠিক করে দেয়, তার শরীরের ওপর অচলার চোখের জল মুক্তোর আকারে ঝরে পড়তে থাকে। এও অদৃষ্টেরই লীলা। মহিমের সঙ্গে বিবাহ স্থির হবার পর সে কেদারের সঙ্গে সুরেশের বাড়িতে যায়, ফেরবার সময় সুরেশের ম্লান শুষ্ক মুখ দেখে 'অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস' তার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে ওঠে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ির গ্রামপরিবেশের সঙ্গে অচলার বিরোধ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়নি। সুরেশ অচলাদের গ্রামের বাড়িতে এসে তাকে যখন জিজ্ঞেস করে, সে সুখে আছে কিনা, তখন দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে। নির্জন মুহূর্তে সুরেশ বলে, তার ওপর অচলার অধিকার আছে এটুকু শুনতে পেলেই তার তৃপ্তি। অচলা জানায়, ওসব কথায় সে দুঃখ পায়, সে পাষাণ নয়। তখন অশ্রুভারে সুরেশের কণ্ঠরোধ হয়, অচলারও দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। অসুস্থ মহিমকে নিয়ে পশ্চিমে যাত্রার আগে সুরেশের পাণ্ডুর মুখ লক্ষ্য করে অচলা উৎকণ্ঠিত হয়, তার প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ বলে, সে ভালই আছে। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন জবাব না পেয়ে মুখ তুলে দেখে : 'অচলার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছিল, চোখাচোখি হইবামাত্রই বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অচলার 'শিক্ষা ও সংস্কার' 'গৃহদাহে' বহুবার উল্লিখিত, কিন্তু মহিম-সুরেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের চিত্রগুলোয় সেই 'শিক্ষা ও সংস্কার' এবং তৎসঞ্জাত ব্যক্তিস্বরূপের ক্ষীণতম চিহ্নও নেই। অবিশ্যি শরৎচন্দ্র হয়ত পরে বুঝতে পেরেছিলেন, অপাত্রে করুণা-মমতায়, অঢেল চোখের জলে, শুধু 'অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে' উপন্যাসের সমস্যা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তা সেটা যতই তুচ্ছ হোক না কেন। সেই জন্যই শরৎচন্দ্রকে বিশেষত উপন্যাসের শেষভাগে অচলার জীবনযাত্রায় সুরেশের প্রতি তার আকর্ষণের

একটা নিজস্ব পছন্দমাফিক ব্যাখ্যা খুঁজতে হয়। সে প্রসঙ্গই এবার বিবেচ্য।

ডিহরিতে সুরেশ অচলাকে নিয়ে থাকার জন্য বাড়ি ঠিক করে, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আসবাবপত্র গাড়িঘোড়া আনায়। অচলা সুরেশের ঐশ্বর্যের বিপুল আয়োজনে অনুভব করে: 'এ যেন একজনকে আরাম ও আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।' তার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে: 'সুরেশের সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে দিন এই সুরেশের হাতেই আত্মসমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই।' উপন্যাসের প্রথমার্ধে তার কোনও ইঙ্গিত নেই। সুরেশের ঐশ্বর্যের প্রতি অচলার মোহের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অচলাদের সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে লেখক টীকা-টিপ্পনি জোড়েন: 'সেখানে প্রত্যেক চলা-ফেরা মেলা-মেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে, যেখানে হিন্দুধর্মের কোন আদর্শের সহিতই তাহার পরিচয় ঘটিতে পায় নাই—পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই; সে দেখিয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে। যাহার প্রত্যেক নর-নারীই সংসারের আকণ্ঠ পিপাসায় দিনের পর দিন কেবল শুষ্ক হইয়াই উঠিয়াছে।' ঐ চিন্তার সূত্র ধরেই অচলা ভাবে, এই সুরেশই তার স্বামী হতে পারত, ভবিষ্যতেও হতে পারে। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যেটা ফাঁকি একদিন সত্য হয়ে ওঠার পথে তার কোনও বাধাই ছিল না। তাদের সমাজে বিধবার বিয়ে হয়, হিন্দু নারীর মত কেবল একটিমাত্র লোকের কাছেই পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ধরে বহন করবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাদের মানতে হয় না, জীবন-মরণে শুধু একজনকে অনন্যাগতি ভাববার মত অবরুদ্ধ মন তাদের নয়: 'সেই মন এক স্বামীর জীবিতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে যতই কেননা পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।' সুতরাং আমরা এখানে দেখি, অচলার আত্মগ্লানির কারণ, সতীত্ববোধ নয়, 'পিতা, স্বামী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব'—লোকসমাজে হেয় হওয়ার অপমান। ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ আর লোকলজ্জার স্থূল দ্বন্দ্বেই অচলার যন্ত্রণা। কিন্তু এটাও ওপর থেকে আরোপিত: জীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায়, সমাজপট-

বিধৃত চরিত্রের স্বকীয়তায়, তার বিকাশের পারম্পর্যে ঐ আসক্তির, প্রথাসিদ্ধ সংস্কারের বিশ্বাসহীনতার কোনও আকারই ফোটেনি। 'গৃহদাহে'র প্রথমাংশে অচলার বিপরীত মনোভাবই লক্ষণীয় : মহিমের বাড়ি পুড়ে যাবার পর সে সুরেশের সঙ্গে কলিকাতায় হাজির হলে কেদার মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়। তাকে গোপনে ঝির কাছে খোঁজখবর নিতে দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়! অবিশ্যি কেদার যখন শুধু টাকার লোভেই সুরেশের হাতে মেয়েকে সমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল, তখনই মানুষ হিসেবে সে অচলার চোখে অত্যন্ত নেমে গিয়েছিল। অচলা আক্ষেপের সঙ্গে ভাবে, স্বামীকে ভালবাসে না উচ্চারণ করে সে অপরাধী হয়েছে সন্দেহ নেই, এমন কি সুরেশের মত লোকও তাকে সহজেই লালসার সঙ্গিনী হিসেবে পাবার আশা করতে পারে, কিন্তু সমস্ত প্রলোভন বিরোধ পায়ে দলে সে তার ভালবাসাকে সর্বজয়ী করেছিল, সেটাই বা সকলে ভুলবে কেন। সতীত্ববোধের জ্বালাও তার কম নয়। সতীসাধ্বী মৃণালের প্রশংসায় যখন সকলেই পঞ্চমুখ, তখন ঈর্ষায় হীনতাবোধে সে ছটফট করতে থাকে। ধর্মহীন পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশকেও মৃণালের 'সতীত্বের পাদপদ্মে' প্রণাম করতে দেখে সতীত্বই যে নারীজীবনের কত বড় সম্পদ অচলা তা বুঝতে পারে : 'সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কায়মনে নিষ্ঠাই যে সতীত্ব, একথা তাহার অবিদিত ছিল না।'

জীবনের সমগ্রতাবোধ শরৎচন্দ্রের ছিল না বলেই তিনি অচলার 'শিক্ষা ও সংস্কারে' কোনও মূল্যবোধের সন্ধান পান না, উপন্যাসের চরিত্রপরিকল্পনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই প্রসঙ্গের ন্যায় রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোঝেন না। পরেও এই লোভ আর লজ্জার দ্বন্দ্ব বেশি দূর টেনে নিয়ে যাবার সাহস লেখকের হয় না। যে 'ধর্ম ও পরকালের গদা' অচলাকে ধরাশায়ী করতে পারেনি বলে আগে উল্লেখ করা হয়, অদৃষ্টের চক্রান্তে সুরেশের শয্যাসঙ্গিনী হবার পর সেই ধর্মরক্ষার প্রশ্নই তার জীবনে সব থেকে বড়ো হয়ে দেখা দেয় : 'নিরববুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ-কান খোলা রাখিয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই ছিল তাহার গর্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ সকল তাহার কোন কাজে লাগিল না'। মৃণাল তাকে জীবনে মরণে যা অদ্বিতীয় ও নিত্য বলে বোঝাতে চেয়েছে, সেই অনন্য সতীধর্মই তাকে রক্ষা করতে পারত। মৃণাল তাকে উপদেশ দিয়েছে, স্বামীর সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধের দিকটা কোনদিন নিজের বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে নেই। এই চরম পরীক্ষায় অচলা মৃণালের বাণীর মাহাত্ম্য বোঝে, অসহ্য

আত্মগ্লানির সঙ্গে ভাবে, তার 'আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার' 'বাহিরের খোলসটাকে'ই বড় করে তার ধর্মকে ধূলিসাৎ করেছে : 'যে ধর্ম গুপ্ত, যে ধর্ম গুহাশায়ী, সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম কোনদিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই।'

অচলার বহুকথিত 'দোলাচল-বৃত্তি'র যে কোনও ভিত্তি নেই, তা স্পষ্টই প্রতিভাত : সুরেশের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ঘটা মাত্রই দুর্বিষহ লজ্জা অপমানে অচলার সমস্ত মন বিষিয়ে ওঠে, সুরেশের বাতাসে তার দেহ বিষেভরে যায়। মহিমের প্রতি অনুরক্তির প্রশ্নেও সে বিচলিত নয়, তার আত্মদহনে প্রেমের কোন সমস্যাই, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব নেই : অস্তিত্বের কোন্ অসঙ্গতির যন্ত্রণায় তার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও ভাঙে, আমরা জানি না। নিজের ও পরিবেশের দ্বন্দ্বে অপর একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেও গড়ে না। আমরা দেখি ক্ষণিকের উত্তেজনায় স্বামীকে ভালবাসে না উচ্চারণ করেছিল, কোনও সংকোচ মানেনি, এত কাণ্ডের পরও সহানুভূতিবশে সুরেশকে সঙ্গী হবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হবে না, কলঙ্কের এ দাগ আর মুছবে না। সুতরাং, আত্মজিজ্ঞাসার আলোড়ন নয়, এক-টানা অসহায় হীনতা আর পাপবোধের তাড়নায় এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই তার অদৃষ্ট। অসম্মানের পাঁক থেকে বাঁচার কোনও চেষ্টাই সে করবে না, সতীত্ব-বিসর্জনের পর একরকম নরকজ্বালায় পুড়েই মনের অসংযমের মূল্য দিতে হবে। অবশেষে মৃণালের বাণীর প্রভাবে 'জীবনের কদর্য সংগ্রাম' থেকে তার মুক্তি, এই ইঙ্গিতেই উপন্যাসের উপসংহার।

শরৎচন্দ্রের জীবনবোধের অগভীরতা, শিল্পদায়িত্বহীনতার জন্যই পারস্পরিক 'জটিল সম্পর্কের দোটানায় গৃহদাহে'র প্রধান চরিত্রগুলোর কোনও বিবর্তন ঘটে না। উপন্যাসের আগাগোড়া মহিম নিরুত্তাপ, নিশ্চেষ্ট—তার একই আচরণ : সমস্যার মুখোমুখি হলেই সে পলায়নের পথ খোঁজে, তার চেতনায়ও বিশেষ কোনও প্রশ্ন জাগে না। লেখক অবিশ্যি তাঁর নিজস্ব সংস্কার, রুচি অনুযায়ী দাম্পত্য-জীবনের বিপর্যয়ের জন্য অচলার অপরাধ প্রদর্শনের দিকে যতটা মনোযোগী, মহিমের দায়িত্ব সম্পর্কে ততটা নন। কেদারের উদ্যোগে সুরেশের সঙ্গে অচলার বিবাহবন্ধন প্রায় স্থির, তখন অচলা মহিমের হাতে আংটি পরিয়ে তাকে ওর সমস্ত ভার নিতে বলে। কিন্তু নিজের সম্পর্কে মহিম আস্থাহীন : 'এই যে এতগুলো বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এতগুলিকে প্রতিহত করিয়া অচলা যে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না ; তাই তাহার

শেষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের নিমিত্ত চঞ্চল করা ভিন্ন মহিমকে সত্যকার ভরসা কিছুই দেয় নাই। আংটিটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিল না।' মহিমের এমনই কর্তব্যনিষ্ঠা যে কোনদিন স্ত্রীর কোনও অনুরোধই সে রক্ষা করে না। মৃণালের সম্বন্ধে অচলার ঈর্ষার পরিচয় পেয়ে মহিম একবার স্ত্রীর ক্ষোভের কারণ বুঝতে পেয়ে তার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিন্তু অচলার ভুল ভাঙাতে গিয়ে ওর ঘরের দরজাটা বন্ধ দেখতে পেয়েই সে স্বস্তি অনুভব করে : 'একটা অতি কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে আপাতত নিষ্কৃতি পাইয়া নিজেও যেন বাঁচিয়া গেল।' 'হিন্দুধর্মের নিষ্ঠুরতা' নয়, তার বিক্ষুব্ধ 'নিষ্ঠা' পেলেও সুরেশের মৃত্যুর পর অচলাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে তার ধর্মবোধের কথা ভাবে : 'কিন্তু এই আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল···যাহা ধর্ম সে ত ধর্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই! সেই ত তার শেষ পরীক্ষা!' নিজের পলায়নটাও রাম-বাবুর মত কিনা এ চিন্তা মহিমের মনে একবার জাগে বটে, কিন্তু সেটা মন থেকে দূর করতে তার বেশি দেরি হয় না, তার পরিত্রাণের পথ খুবই সহজ। তাছাড়া, মহিমের ঐ ক্ষীণ প্রশ্নের সঙ্গে উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্যের যোগও বিশেষ কিছু নেই।

সুরেশের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে নাস্তিক, ধর্মাধর্মবোধহীন। কিন্তু তার মধ্যে কিছুমাত্র চিন্তা, বুদ্ধি নেই। নাস্তিক হয়েও ব্রাহ্মসমাজের মেয়ের প্রতি মহিমের আকর্ষণ জানতে পেরে সে বন্ধুকে দ্বিধাহীনচিত্তেই বলে : 'যখন হিন্দুর বংশে জন্মেছি, তখন হিন্দুসমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ'। আগুনে যে সতীদের পুড়ে মরার বিবরণে শিহরণ জাগে, সুরেশের মতে মৃণাল তাদেরই জাতের, ওর উদ্দেশ্যে সে ভক্তি প্রকাশ করে : যারা মৃণালেরই মত সামাজিক অনুশাসন মেনে নেয় তাদের জীবনের একটা অর্থ আছে—'একটা অজানা ভবিষ্যতের ভার তেমনি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপরে দিয়ে তারা যে বরঞ্চ আমাদের চেয়ে জিতের পথেই চলে, তা আমি অনেক দেখেচি।' অচলাকে ভুলিয়ে নিয়ে আসার পরও মৃণালের সতীত্বের প্রসঙ্গ তুলে সে অচলাকে আঘাত করে। প্রচলিত ধর্মের বোধ ছিল না বলেই তার পক্ষে পাপাচরণ সম্ভব হয়েছে, সুরেশকে নাস্তিক আখ্যা দেবার এই কারণ। সে কখনও উচ্ছৃঙ্খল, নীচ, আবার কখনও সামান্য কারণেই তার চোখে জল আসে। তার হাস্যকর চিত্তবৈকল্যে, স্বার্থত্যাগের তাৎপর্যহীন, চমকপ্রদ নাটকীয় দৃষ্টান্তে অচলাকে বিগলিত হতেই হয়।

চরিত্রচিত্রণের মত 'গৃহদাহ'-র ঘটনাবিন্যাসের নৈপুণ্যও প্রশংসিত। কিন্তু অস্তিত্বের সমস্যার তাৎপর্যের সূত্রেই উপন্যাসে চরিত্র এবং ঘটনা সত্যকারের পটভূমি পায়। শরৎচন্দ্র সমস্যার গভীরে যেতে পারেন না বলেই 'গৃহদাহ'র চরিত্রগুলো যেমন কাহিনীর বিকাশে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা পায় না, তেমনি তার ঘটনাও—কার্যকারণের জটিল সম্পর্কের টানে চরিত্র থেকে আসে না। এক ধরনের আকস্মিকতাতেই 'গৃহদাহ'র ঘটনার ছক কাটা হয়েছে। এই ঘটনাবিন্যাসে লক্ষণীয়, মৃণালের অভেদ্য সতীত্ববোধের তুলনায় স্বাধীন, শিক্ষিত ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ের ধর্মবোধ যে কত দুর্বল, অসম্পূর্ণ, সেই পরীক্ষার জন্যই অদৃষ্টের ফাঁদ পাতা। কেদার অত্যন্ত বৈষয়িক-বুদ্ধিসম্পন্ন, অথচ ভাবী জামাতা সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। সুরেশের মুখে মহিমের দারিদ্র্যের সংবাদে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, এই 'নাস্তিকে'র ঐশ্বর্যের গন্ধও পায়, এ ভাবেই সুরেশের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগসৃষ্টি। গাড়ির দরজা খুলে সুরেশ সযত্নে অচলার হাত ধরে নামতেই বিস্মিত মহিমের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিবিনিময়। সুরেশের দুর্ব্যবহারের পর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে একটি স্ত্রীলোককে উদ্ধার করতে গিয়ে সুরেশ আহত হয়েছে জানতে পেরে পিতা-পুত্রী যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, তখনই অচলাকে করুণাবিহ্বল করে তোলার জন্যই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় সুরেশের আবির্ভাব। অচলার শ্বশুরবাড়িতে সুরেশ উপস্থিত হয়, তাকে একান্তে বলে: অচলার হাত থেকে সুরেশ যখন শুধু দুঃখই পেয়ে এসেছে, তখন ওর সমস্ত দুঃখের বোঝা সুরেশের হোক, এই তার প্রার্থনা। বলতে বলতে অশ্রুভারে সুরেশের কণ্ঠরোধ হয়, অচলার চোখ দিয়েও 'বিগত দিবারাত্রির সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা' তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঝর্ ঝর্ করে পড়তে থাকে—ঠিক সেই মুহূর্তেই মহিমের উপস্থিতি। সুরেশ অচলার অজ্ঞাতসারেই তাদের তদ্গত অবস্থার মিথ্যা কৈফিয়ত দেয়, তবু এটাকে কেন্দ্র করেই অচলা-মহিমের সম্পর্ক তিক্ত হয়। এই ঘটনারই জের টেনে, স্বামীর অবিচলিত গাম্ভীর্যের কাছে সুরেশের 'কদাকার ভাঁড়ামিতে,' 'বেহায়াপনায়' ক্ষুব্ধ হলেও, অচলা আকস্মিক উত্তেজনায় মহিমের উপস্থিতিতে সুরেশকে বলে—যাকে সে ভালবাসে না তার ঘর করার জন্য সুরেশ যেন তাকে রেখে না যায়। এভাবেই সে সুরেশকে তাকে সহজলভ্যা ভাবার অধিকার দেয়। আগুনে তাদের বাড়ি পুড়ে যাবার সময় সুরেশ মহিমের সঙ্গে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে চায়, কিন্তু অচলা সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরে বাধা দেয়, সেটা মহিমের চোখে পড়ে।

অসুস্থ স্বামীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং শুশ্রূষার আনন্দে অচলার হৃদয় যখন পরিপূর্ণ, সেই সময় হঠাৎ সুরেশের শুষ্ক মুখ শীর্ণ শরীর লক্ষ্য করে সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে, সুরেশকে তাদের সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ জানায়। সতীত্ববিসর্জনও তার 'দোলা-চলবৃত্তি'র পরিণাম নয়, তার জীবনের এই চরম সর্বনাশও এসেছে আকস্মিক দুর্ঘটনার আকারে, অদৃষ্টের ছলনায়। নিজের বাড়িতে অতিথিদের সংবর্ধনার জন্য হাতে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও, অচলার ঘরকন্নার আনন্দ উপভোগ করার জন্যই রামবাবু তাদের বাড়িতে আসেন, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েন। অতঃপর বৃদ্ধ তাঁর স্নেহপ্রকাশের জন্যই সুরেশের শয়নঘরে যাবার জন্য অচলাকে ক্রমাগত বলতে থাকেন, 'তুমি শুতে যাও সুরমা, আমি দেখি।' অদৃষ্টের কাছে অচলাকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়: 'বৃদ্ধের সনির্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।' অচলা তারপর সুরেশের সঙ্গে রামবাবুদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। সুরেশ অচলার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামায়, সেই মুহূর্তেই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে মহিমের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ।

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক বিচারে সাহসিকতা, অভ্রান্ত ও নিপুণ বিশ্লেষণ—শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এ সমস্ত ধারণা নিছক কুসংস্কার মাত্র। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কের প্রশ্নে মাঝে মাঝে কিছুটা চিন্তিত হলেও প্রচলিত সংস্কারের নিশ্চিন্ত অভ্যাসিক আশ্রয়েই তাঁর মনের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য। ঔপনিবেশিক জীবনের দায়ভাগ আমাদের চৈতন্যের বিকাশকে অবরুদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক দ্বিধা-সংশয়, বিরোধ-যন্ত্রণায় মধ্যবিত্তের যে আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রপাত, শরৎচন্দ্র তার সমস্যা বোঝেন না, সেই খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা তাঁর চেতনায় ধরা দেয় না। ঐ সমস্যার পটেই রবীন্দ্র-নাথের 'গোরা'র মত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা দুর্বলতা-সবলতায়, জিজ্ঞাসার সচেতনতায় ব্যক্তিত্বদীপ্ত হয়ে ওঠে, তাঁর পাত্রপাত্রীরাও শরৎচন্দ্রের নারীদের মত অদৃষ্টের, নিছক হৃদয়-দৌর্বল্যের পুতুলমাত্র নয়; অভয়ার বিচ্ছিন্ন চমক বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। অচলার সংগ্রাম সত্যি স্থূল, 'কদর্য', শরৎচন্দ্রের অন্যান্য পাত্রপাত্রীর মত এই নারীর জীবনও নতুন চৈতন্য-সঞ্চারে, জীবনের ব্যাপ্তির আভাস-ইঙ্গিতে কোনও সার্থকতা পায় না। আর ব্যক্তিত্বের ভান যে- চরিত্রে আরোপিত, সেটা যে কতদূর হাস্যকর হতে পারে কিরণময়ীতে তার প্রমাণ মেলে। শরৎচন্দ্রের ভাবালুতার ঐতিহ্যের সূত্রেই হাল আমলের বাঙলা উপন্যাস-নামধেয় রচনায় দেখি নানাধরনের দিদি-মাসি-বউদিদের ভাব-

বিলাস, বাইজী-বেশ্যার বর্ণাঢ্য প্রেম, উচ্ছৃঙ্খল ভবঘুরে অথচ নারীবাঞ্ছিত নায়ক। অবিশ্যি শরৎচন্দ্রের তুলনায় এদের সৃষ্টিকর্তারা আরও নিরঙ্কুশ। কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের অক্ষমতা প্রসঙ্গেই নয়, আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের অরাজকতার আলোচনায়ও হেনরি জেম্‌সের এই উক্তিটি স্মরণীয় :

'There is one point at which the moral sense and the artistic sense lie very near together ; that is in the light of the very obvious truth that the deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer.... No good novel will ever proceed from a superficial mind ; that seems to me an axiom which, for the artist in fiction, will cover all needful moral ground.'

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : আঙ্গিক বিষয়ে

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত

১

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাদি নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। তাঁর গ্রন্থাদির শিল্পমূল্য নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে কিছু ভাবনা-চিন্তা করতে গেলে, আমার তো মনে হয়, উপন্যাসের শিল্পরূপের মধ্যে ঢুকে যাওয়া দরকার। বর্তমান প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কিছু প্রাথমিক কথাই মাত্র বলব।

উপন্যাসের শিল্পরীতি বলতে মোটমাট বুঝি লেখার কলা-কৌশল, অর্থাৎ প্লটগঠন, অঙ্গাদির বিন্যাস বিবরণ-বর্ণনা—সংলাপের সম্পর্ক, ঘটনার প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য-বিধান, নাট্যধর্ম-কবিত্ব প্রভৃতির ব্যবহার, চরিত্ররচনার পদ্ধতি এবং ভাষারীতির বিভিন্ন দিক। শেষোক্ত প্রসঙ্গে শব্দের নির্বাচন, বুনট, আভিধানিক অর্থকে মানা-ভাঙা, শব্দের গন্ধবর্ণাদি ভাবাসঙ্গ, ধ্বনির জগৎ, অলংকরণ, চিত্রকল্প, বাক্যের রহস্য প্রভৃতি নিয়ে বেশ জটিল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা গড়ে উঠতে পারে। এবং উভয়ত এই বিশ্লেষণের শিকড় উপন্যাস-বিশেষের প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এবং তাকে ভেদ করে শিল্পীর ব্যক্তিবোধ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

এই সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের সীমা আরও কিছু সঙ্কুচিত করছি। ভাষারীতি-বিষয়টি এই আলোচনার বাইরে রাখা হচ্ছে, কারণ উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক কথার দ্বারা কিছু প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, বিস্তৃত বিবেচনা ও হিসেবের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়।

২

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস-নির্মাণে এলোমেলো এবং অসতর্ক ছিলেন, একথা মোটেই বলা চলে না। তিনি নিজস্ব ধ্যানধারণা-অনুযায়ী একটা আঙ্গিকঘটিত মডেল আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন, এবং সে-ক্ষেত্রে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মতো ডাকসাইটে পূর্বসূরীদের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছিলেন। ঐ দুজন ঔপন্যাসিক যে কী পরিমাণ রীতিসচেতন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্র তা জানেন। অন্তত আঙ্গিক বিষয়ে শরৎচন্দ্র এঁদের দুজনের কাছ থেকে বুঝেসুঝে ঋণ নিয়েছেন এবং তাকে নিজের মতো করে বদলে একটা বিশেষ ঢঙে দাঁড় করিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্যায়ে রোমান্স রচনার প্রাথমিক দুটি চেষ্টায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণরীতিতে, অথবা তৃতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎদৃপ্ত রম্যতায়—সর্বত্র বঙ্কিম-প্রবর্তিত নাট্যধর্মী আঙ্গিককে অস্বীকার করে-ছিলেন। উল্লেখ্য ব্যতিক্রম মাত্র নৌকাডুবি। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত শেক্সপিরিয় নাটকের রীতিকে ঔপন্যাসিক আদলে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। যদিও উপন্যাসের আগ্রাসী শক্তি ও স্বাধীনতার দ্বারা নাটকীয় রীতির সীমাবদ্ধতাকে তিনি ভেঙেও নিয়েছিলেন, এবং বিচিত্র আভ্যন্তর কারিগরির সাহায্যে তাকে জটিল ও মনোরম করে তুলেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তাঁর প্রধান দান নাট্যরীতির স্বীকরণ। মনোজগতের গভীর বিক্ষোভ বা কূট বিশ্লেষণও নাটকীয়তা-আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসে নাট্যভঙ্গি বলতে যে বহিরঙ্গ ঘটনামূলকতা ও রোমাঞ্চকর চমৎকারিত্ব মাত্র বোঝায় বঙ্কিমচন্দ্র সে ধারণার মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নাট্যবৃত্তের নিটোলতার ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি শাখায়িত কাহিনী-বিস্তারের পথ ধরলেন। য়ুরোপে অতি-পুষ্ট নাট্যসাহিত্যকে পাশ কাটিয়ে যেভাবে গড়ে উঠেছিল উপ-ন্যাসের স্বতন্ত্র পৃথিবী—বর্তমানমুখী, বাস্তবজীবনাশ্রয়ী—পরিচিত প্রাত্যহিক ঘটনার বিস্তার, খুঁটিনাটি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ; সুনির্বাচিত কয়েকটি মাত্র বিস্ফোরিত ও উত্তেজিত ঘটনার তুঙ্গচারিতার স্থানে সমতলে বিচরণশীল জীবনের অনুসন্ধান। রবীন্দ্র-উপন্যাস মূলত অ-নাটক।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের নাট্যবিরোধিতাকে পছন্দ করেন নি। গল্প-রসের নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। ফলে বঙ্কিমী আঙ্গিকের দিকে তাঁকে ফিরতে হয়েছে, যে আঙ্গিক গল্পকে খর্ব করেনি, বরং আরও আকর্ষণীয় করেছে এবং যুগপৎ অন্তর্মুখী গভীরতা দিয়েছে। যদিও বঙ্কিমের বর্ণাঢ্যতা, কল্পনালোকে অবাধবিহার, ভেতরের প্যাশন-তীব্রতার প্রতিরূপ হিসেবে শেক্সপিরিয় নাট্য-রীতির আত্মীকরণ শরৎচন্দ্রের কাছে অপরিচিত দুনিয়া, তবুও নাট্যিক রীতিতে বিবৃত গল্প সাধারণ পাঠকের মনে যে ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে অন্যরীতিতে তা সম্ভব নয় ভেবে শরৎচন্দ্র আবার পুরাতন বঙ্কিমী ঢঙে ফিরে যেতে চেয়েছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত 'সংসার' বা 'সংসার কথায়' গল্পাবর্ত থেকে পরিবার ও সমাজচিত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমপ্রভাবমুক্ত পদ্ধতির কথা আগেই বলা হয়েছে। শরৎচন্দ্র তুলনায় বঙ্কিম-অনুসৃত সুবলয়িত গল্পকথন-রীতিই পছন্দ করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসরীতির সঙ্গে তাঁর ভঙ্গির অনেক পার্থক্য স্পষ্ট হলেও ভিতরের এই সাদৃশ্য সতর্ক পাঠকেরই চোখে পড়বে।

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'পণ্ডিতমশাই', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি বড়-ছোট অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য উপন্যাসই গল্প-কথনে অতন্দ্র নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, য়ুরোপীয় নাট্য-তাত্ত্বিকেরা কখনো কখনো একে পিরামিড-ধর্মী গঠন বলেছেন। মোটকথা, এর রূপটা ত্রিভুজের মতো। অবশ্য ফ্রেতার্গ-কথিত পিরামিড আসলে প্যাশন-নিয়ন্ত্রিত। শরৎচন্দ্রে প্যাশনের স্থান নিয়েছে সেণ্টিমেণ্ট, তাই তাঁর উপন্যাস-আঙ্গিকের পিরামিড সেণ্টিমেণ্ট-ত্রিভুজ, অর্থাৎ সেণ্টিমেণ্টের ওঠাপড়ায় তার শীর্ষমুখিতা এবং সমভূমিতে প্রত্যাবর্তন, তথা সেণ্টিমেণ্টজড়িত ঘটনার উত্থানপতন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আরম্ভ একটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত সমস্যায়। সমস্যার পশ্চাদ্‌ভূমিতে যদি সামাজিক সংঘাতও থাকে শরৎচন্দ্র তাকে গুটিয়ে পরিবারের মধ্যে, ব্যক্তির জীবনে ও মনে ঘনীভূত করে তোলেন। পল্লীসমাজ-দেনা-পাওনার মতো উপন্যাসে ব্যক্তিগত কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লেষহীন অংশ যেমন স্বল্প, তেমনি পেছনের দৃশ্যপটে মাত্র পরিণত। এই সমস্যাটি যখন খুব বড় আকারে দেখা দিয়েছে ঔপন্যাসিককে সামলে ওঠার জন্য টালমাটাল খেতে হয়েছে। নিদর্শন 'পথের দাবী'। ভারতী-অপূর্বর প্রেমকাহিনী ঐ বিশাল বিপ্লবসাধনাকে ধরে রাখার যোগ্য নয় বলেই সব্যসাচীর বক্তৃতা ও উচ্ছ্বসিত আত্মম্ভরিতায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে তুলতে হয়েছে। আর 'শেষপ্রশ্নে' লেখক অহেতুক বিতর্কের আসর পেতেছেন। আসলে পরিবারের চৌহদ্দি এবং ব্যক্তিগত সমস্যা, এবং সে সমস্যাও পারিবারিক মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত (পরিবার-বিচ্যুত মুক্ত প্রেম ও অবৈধ কামনা ক্বচিৎ ব্যবহৃত এবং তা-ও গার্হস্থ্য মূল্যবোধে আত্মসমর্পিত)—এটিই শরৎচন্দ্রের ভাবনার পৃথিবী এবং ঔপন্যাসিক আঙ্গিকেও এই জীবনেরই অনুকরণ ; আসলে তাঁর কাহিনী-ত্রিভুজ গৃহধর্মের বৃত্তলগ্ন।

৩

উপন্যাসের শুরু সমস্যার আরম্ভে এবং সমস্যা সংঘাতরূপেই দেখা দেয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। কখনও কিছু প্রাথমিক কথা বলে অভিপ্রেত সংঘাত-সমস্যার ভিত্তি তৈরি করা হয়। কখনও পূর্বকথা কিছু পরে সুযোগ বুঝে বিবৃত করা হয়। নিদর্শন 'চন্দ্রনাথ' 'পথের দাবী'। ক্বচিৎ কিছু বলে, কিছু না-বলে পূর্বপ্রসঙ্গকেও রহস্যময় করে রেখে কৌতূহল বাড়ানো হয়, যেমন 'দেনা-পাওনায়। সমস্যা যে সংঘাতের রূপ নিয়ে দেখা দেয় তার উল্লেখ আগেই

করা হয়েছে। কুসুম-বৃন্দাবনের প্রণয় ও দাম্পত্য সম্পর্কে দ্বন্দ্ব, অচলার চিত্তে মহিম-সুরেশের বিপরীত প্রভাবের ফলে আন্দোলন, ষোড়শী-জীবানন্দের ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং এদের দুজনের মনের মধ্যে নিজের সঙ্গে লড়াই, বিজয়ার মনে ও জীবনে বিলাস ও রাসবিহারী বনাম নরেনের কর্ম ও স্বভাবের প্রতিক্রিয়া—সর্বত্রই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনাটি চরিত্রদ্বন্দ্ব ও ঘটনা-দ্বন্দ্বরূপে অনুভব করা হয়েছে এবং তার বিকাশ-পরিণতি অনুযায়ী প্লট বিন্যস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গে-প্রসঙ্গে, ঘটনায়-চরিত্রে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে, পাত্র-পাত্রীর অন্তরের বিরোধী বৃত্তিতে দ্বন্দ্ব—এবং সর্বদা দ্বন্দ্ব-কেন্দ্রে ঔপন্যাসিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন এবং তার ক্রমবিকাশ ও সমাপ্তিমুখী ধারাটি গ্রন্থের অঙ্গবিন্যাসে অনুসরণ করেছেন। ত্রিভুজশীর্ষে ক্লাইম্যাক্স এবং ভূমিস্পর্শী তৃতীয় বিন্দুতে পরিণতি ঘটেছে। সংঘাত তুঙ্গে উঠেছে (সেখানে সমস্যা সবচেয়ে জট পাকিয়েছে) এবং কোথাও সমাপ্তি ঘটেছে সমস্যার সমাধানে, কখনও বা সমাধান যে অসম্ভব এই বোধে ; অর্থাৎ দ্বন্দ্বের অবসানে পরিণতি।

ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় ও কাহিনীর বিস্তার অনুযায়ী ত্রিভুজশীর্ষ কখনও মধ্যবর্তী (অর্থাৎ ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু), কখনও তা পূর্বে বা উত্তরে হেলে থেকেছে। প্রায়শ ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাসে শীর্ষ ও সমাপ্তি কাছাকাছি, যেন শীর্ষ-বিন্দু সরাসরি লম্বভাবে, সমাপ্তিতে পৌঁছে দেয়। দীর্ঘাকৃতি বা জটিলতর কাহিনীতে শীর্ষ থেকে সমাপ্তির দিকে গতি তুলনায় মন্থর এবং হেলে-পড়া রেখাদ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যায়। চন্দ্রনাথ-পণ্ডিতমশাই-দেবদাসের সঙ্গে গৃহদাহ-দেনাপাওনার তুলনা করলে এই পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়বে। অবশ্য সর্বত্রই সমাপ্তিতে কিছু চমক জমিয়ে রেখে নাট্যস্বাদ সৃষ্টির চেষ্টা আছে : একান্ত আড়ম্বরহীন সমাপ্তি তাঁর উপন্যাসে বিরল।

বড় আকারের উপন্যাসে তিনি মাঝে মাঝে উপকাহিনীর ব্যবহার করেছেন। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর আদর্শ। তিনি যেমন নাট্যরীতিকে মেনে এবং ডিঙিয়ে উপকাহিনী প্রয়োগের পদ্ধতি বের করেছিলেন, শরৎচন্দ্রে তারই অনুসরণ দেখি উপন্যাসকে জটিল করে তুলতে, মূল অভিপ্রায়কে তাৎপর্যমণ্ডিত করতে, তুলনায় বা বৈসাদৃশ্যে, ভাবঘটিত কোন ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে গৃহদাহে মৃণালঘটিত প্রসঙ্গ, দেনাপাওনায় নির্মল-হৈমের কাহিনী উপস্থিত হয়েছে। চরিত্রহীনে অবশ্য কিরণময়ী বা সতীশ-সাবিত্রীর কোন্ প্রসঙ্গটি মুখ্য—কোন্‌টি গৌণ—তা নির্ণয় করা তুলনায় কঠিন। এদের সম্পর্কও কয়েকটি বিন্দুর যোগাযোগ মাত্র। নিঃসন্দেহে চন্দ্রশেখরের অঙ্গ-বিন্যাস এখানেও মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

পথের দাবী উপন্যাসে অপূর্ব-ভারতী-সব্যসাচীকে ঘিরে মূল কাহিনী আবর্তিত। সব্যসাচী-সুমিত্রাকে কেন্দ্র করে একটি শাখায়িত বিস্তারও প্রায় স্বতন্ত্র ত্রিভুজের চেহারা নিয়েছে। এদের যোগাযোগ কতক অচ্ছেদ্য, কতক নিঃসম্পর্ক, কিন্তু শশীতারা-উপাখ্যান নেহাত উপকাহিনী এবং অলংকরণের বেশি ভূমিকা তার নেই। মোটকথা, উপকাহিনীর সাহায্য নিলেও তা প্রায়ই একটা সরল রীতি-মাফিক, ক্বচিৎ এলোমেলো—যথার্থ জটিল কখনো নয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যচাঞ্চল্য পাঠককে আগ্রহী করে রাখে। যে ধরনের আঙ্গিক তাঁর সাধ্য তাতে নাট্যচমক অমানান নয়। তবে এঁদের উৎসে চরিত্রগত গাঢ় প্যাশন নেই, থাকবার কথাও নয়—কারণ শরৎচন্দ্র ক্বচিৎ ও রসের রসিক। স্বল্প ব্যতিক্রম কিরণময়ী প্রসঙ্গে। তাঁর উপন্যাসে স্বভাবের সাময়িক উচ্ছ্বাস, তরল ভাবালুতা, তীব্র অভিমান থেকেই বহু ক্ষেত্রে ঘটনার তির্যকতা এসেছে। এগুলিতে নাট্যিক গভীরতা না থাকলেও সরল গার্হস্থ্য স্বাদুতা আছে। তবে নরেনের বন্ধ জানালা খোলা বা বিজয়ার বাবার লেখা চিঠির মতো প্রসঙ্গ (দত্তা), অথবা চরণের হঠাৎ মৃত্যু (পণ্ডিতমশাই), সংকটকালেই নায়কের হঠাৎ রোগে পড়া ও কাহিনীর কঠিন গ্রন্থিমোচন (শ্রীকান্ত, পথের দাবী, গৃহদাহ প্রভৃতি সর্বত্র) একান্ত বাইরের নাটুকেপনা—শিল্পগুণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই।

৪

শরৎচন্দ্রের অঙ্গগঠনবিষয়ক যে প্রবণতাগুলি উল্লিখিত হল তার মধ্যে অন্তত তিনটি নামকরা উপন্যাসকে ফেলা যায় না। পথের দাবী, শ্রীকান্ত, শেষপ্রশ্ন। এদের অভিপ্রায় কিছু পৃথক বলেই আলাদা শরীর তৈরি করতে হয়েছে। পথের দাবীতে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছড়ানো বৈপ্লবিক সক্রিয়তাকে ধরবার জন্য ঘরোয়া কাহিনীভঙ্গি থেকে তাঁকে বাইরে বেরোতে হয়েছে। অথচ সে পথ তিনি খুঁজে পাননি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের সিদ্ধরীতি অনেকটা ভেঙে আনন্দমঠের বিশালতা এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গোরার ব্যাপ্তি তাঁর আঙ্গিকবিশিষ্টতার স্বাভাবিক ফল। শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর বক্তৃতার বাহুল্যে, গোপন সভার অবিশ্বাস্য কাল্পনিকতায়, একটি জনসভা, একদিন, বস্তীভ্রমণের বিবরণে দেশ-দেশজোড়া প্রসার আনতে পারেননি। অপূর্ব-ভারতীর প্রণয়কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়ে এবং তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অপ্রতিফলিত রেখে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

শ্রীকান্ত চারখণ্ড জুড়ে বিচিত্র ঘটনার বিস্তার আছে। শ্রীকান্তের জীবন-

অভিজ্ঞতা ও ভবঘুরে বৃত্তির আশ্রয়ে উপন্যাসটি স্থান থেকে স্থানে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। ফলে একটা নিটোল কাহিনীতে ত্রিভুজ হয়ে ওঠার সুযোগ এর নেই। বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত একটা বক্ররেখার দ্বারা এর প্লটগঠনকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর অতি প্রিয় ত্রিভুজগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন নি। তাই ঐ বক্ররেখাটি বারবারই ছোট ত্রিভুজকাহিনীর মধ্য দিয়ে গিয়েছে। অনেক ছোটো ছোটো ত্রিভুজ, তার একটি বাহু বর্ধিত হয়ে পরবর্তী ত্রিভুজের দিকে এগিয়েছে। শ্রীকান্ত স্বয়ং এই বর্ধিত বাহু, বিভিন্ন ত্রিভুজের যোগসূত্র এঁর উপন্যাসদেহের শিথিল বন্ধনের (শিথিলতাই এর ধর্ম—দোষ নয়) সূত্র। 'পথের পাঁচালি'র অপু কিংবা 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের জীবনপথের যে আঁকাবাঁকা রেখা উপন্যাস-দেহ হয়ে উঠেছে তার মধ্যে কিছু সরলতা কিছু বক্রতা আছে, কিন্তু কোথাও কাহিনীত্রিভুজ গজায় নি। শ্রীকান্তের উপন্যাস-শরীর সুপ্রচলিত ত্রিভুজরীতি এবং রেখ-ভঙ্গিব মিশ্রণে তৈরী, শেষোক্ত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত নয়; এবং সে কারণে লেখকের স্বধর্মাচরণও অনেকখানি শিল্পসফল।

পরধর্ম ভয়াবহের নিদর্শন শেষপ্রশ্নের আঙ্গিক। বিষয় ও মননশীলতার এই প্রদর্শনী হয়তো রবীন্দ্রনাথের উত্তর-উপন্যাসের প্রভাবজাত। হয়তো একান্ত নব্যলেখকদের কণ্টিনেণ্টালইজম ও চতুরতার সঙ্গে পাল্লা দেবার বাসনা। কিন্তু বিতর্কপ্রধান·ঘটনাবিরল উপন্যাসের বুদ্ধিচর্চার কৃত্রিমতা সামান্য নাড়াচাড়া দিলেই ধরা পড়ে। একটা বিতর্কের আখড়ায় লোকদের জড়ো করা এবং রমণীবিশেষকে নানা বিষয়ের মতামত আউড়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়াই প্লটবিন্যাসের কেন্দ্রীয় অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় এবং তা রূপায়ণের ভঙ্গি উভয়ত বালসুলভতা।

মোট কথা, সরল ধরনের ত্রিভুজাকার প্লট শরৎচন্দ্র ভালোই গড়তেন। তাতে মোটা দাগের কারুকার্যও থাকত। গার্হস্থ্য পাঠককে খুশি করার অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে তাঁর এই বিশিষ্ট অঙ্গসাধনা বিরূপতা করে নি—সহায়কই হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শ : বামুনের মেয়ে

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখক-জীবন মোটামুটিভাবে ১৯১২-১৯১৩ থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ—এই পঁচিশ বছর, যদিও খোলাখুলিভাবে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছে সেই ১৮৯৬ থেকেই। শরৎচন্দ্রের আগে বাংলাদেশে ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান ছিলেন—আরও কয়েকজনের লেখা যে জনপ্রিয় হয়নি, তা অবশ্য নয়।* বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর আর্কেটাইপ : একই সঙ্গে আধুনিকতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল। এই ধরনের বুদ্ধিজীবীর মতই তাঁর উপন্যাস বুদ্ধি-নির্ভর বিমূর্ত-বিষয়কেন্দ্রিক : সুখ কী, প্রকৃতির কোলে মানুষ সমাজে এলে কেমন হয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদ, গীতার নিষ্কাম ধর্ম ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিম উপন্যাসে খুঁজেছেন। চতুর্দিকের বাস্তব বা তার অভিজ্ঞতা নয়, বরঞ্চ বিদেশী গ্রন্থে পড়া বা স্বদেশী শাস্ত্র থেকে পাওয়া নানা সমস্যা তাঁকে আন্দোলিত করেছে বেশী। আসলে বঙ্কিমের উপন্যাসকে নর্থপ ফ্রাই তাঁর 'অ্যানাটমি অব ক্রিটিসিজমে' রোমান্সের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার আলোকে দেখলে, সঠিক বিচার করা হয়। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বিপরীত : তাঁর উপন্যাসের সবকিছুই প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর, চতুর্দিকের অভিজ্ঞতাকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, প্রায় ঠিক সেই ভাবেই গল্পে-উপন্যাসে এনেছেন, আর এই অভিজ্ঞতা-নির্ভরতার জন্যই কবিতা ও নাট্যবোধ ছাড়াও জনপ্রিয়তায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে শরৎচন্দ্রের এই অভিজ্ঞতানির্ভর গল্পকেও চরিত্রপ্লটে সম্বন্ধযুক্ত করে গেঁথে তুলতে হয়েছে, আর এই সম্বন্ধ- বা সম্পর্ক-বুনোটের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শগত জগৎ—বা জর্জ লুকাচ যাকে বলেন ওয়র্লড ভিশন—সেটি স্পষ্ট হয়েছে ; শরৎচন্দ্র যে এটা সচেতনভাবে করেছেন তা নয়। এই বিশ্ববীক্ষার পটভূমি ও উপাদান কী ?

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ ভূমিনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য আর কেবল বড় জমিদারদের রক্ষা করা ছিল না। ১৮১৯-এর রেগুলেশনেই লক্ষ্য করা হয়েছিল যে জমিদারির খণ্ডীভবন শুরু হয়েছে,

---

* রবীন্দ্রনাথের নাম এ প্রসঙ্গে ইচ্ছা করেই বাদ রাখছি। কারণ এই নক্ষত্রবিহারী বিরাট প্রতিভার উপন্যাস-কীর্তির মূল্যায়নের পটভূমি ও মানদণ্ড দুইই পৃথক হওয়া উচিত। বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম আধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

পত্তনিদার ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে। পুরনো বড় বড় জমিদারির ভাঙন ও বিভক্ত হওয়া থেকে মধ্যবিত্ত ভূমিস্বার্থের জন্ম হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহরের লোকই, বা শহরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন লোকই, এই পত্তনি কিনছে। অনুপস্থিত ভূমির মালিকের সংখ্যাও বাড়ছে; যাকে বলা যায় কৃষিভিত্তিক এণ্টারপ্রেনিউর, তা থাকছে না। ১৮৫৫-য় জে. পি. গ্রাণ্ট দেখিয়েছিলেন, জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তালুকদারি। ১৮৫৯-এ আইনে এই মধ্যবিত্ত ভূমির মালিকদের অধিকারই স্বীকৃত হল।[১] জমির এই মধ্যবিত্ত মালিকরাই মূলতঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কুশীলব; এছাড়া যে তিনি অন্য ধরনের চরিত্র নেননি, তা নয়; কিন্তু সামাজিকভাবে গ্রামের জমিজমা-নির্ভর মধ্যবিত্তরাই তাঁর উপন্যাসে সামাজিক শ্রেণী হিসাবে এসেছে।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা, যখন শরৎচন্দ্র উপন্যাস-গল্প লিখছেন, তখন শোচনীয়—ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জটিল বাঁধনে এই শ্রেণীর অনেকেই প্রায় কপর্দকশূন্য; গ্রামের চৌহদ্দিতে প্রায় মুমূর্ষু। ১৯১৯-এর ২২ অগস্টে নায়ক পত্রিকা লিখেছিল যে আমাদের সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটলে, সমাজবন্ধন শিথিল না হলে, ব্যবসাবাণিজ্য বাড়তে পারবে না, অর্থ উপার্জিত হবে না। সেইজন্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের বাধা ভাঙবার চেষ্টা করতে হবে। বস্তুতঃ, এই দাবির বিপক্ষে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ভূমিজীবীরা তাদের জমির মালিকানা, উচ্চবর্ণ ও কিছুটা লেখাপড়ার জন্য নিজেদের ভদ্রলোক ও বৃহত্তর জনসাধারণকে ছোটলোক ভাবত। তারা সশঙ্ক হয়েছিল, চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের মধ্যেও সম্পত্তির ভিত্তিতেই ভোটাধিকারের দাবি তুলেছিল ১৯১৮ ও ১৯১৯-এ। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের ভদ্রলোক শ্রেণীর তখনই উদ্ভব ঘটেছে। ১৯১৪-র ৩০শে ডিসেম্বরের দৈনিক বসুমতী লিখেছিল যে, কংগ্রেস হচ্ছে বাবুদের প্রতিষ্ঠান; অধার্মিক, বিলাসপ্রিয় এই ভিখারীরা ইংরেজী শিক্ষার সৃষ্টি। জনগণ তাদের জানে না, তারাও জনগণকে জানে না। ১৯১৫-র ১৭ই এপ্রিল বসুমতী আরও লিখেছিল যে এই বাবুরা যা করে, তা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করে। আর মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভূমিজীবী ও পেশাজীবী মধ্যবিত্তের মধ্যে পার্থক্য ছিল, বাংলাদেশে তা ছিল না।[২] শরৎচন্দ্র এই সংকটাক্রান্ত ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তর কথাই বলেছেন:

১। The Indian Middle Class : Their Growth in Modern Times : B. B. Misra, 1961. পৃ: ১৩৩-পৃ: ১৩৫।

২। এই উদ্ধৃতিগুলি Elite Conflict In a Plural Society : Twentieth Century Bengal : J. H. Broomfield (1968) থেকে নেওয়া। পৃ: ১৩৮, পৃ: ১৬৫।

তাদের নীচতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতার কথা ; দৈন্য, করুণ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

আর এই দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সময়কার চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। ১৯১৭-তেই চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার, বাংলাদেশ ও বাঙালীদের প্রতি উদাসীন থাকার সমালোচনা করেন। অতীত ইতিহাসের প্রতি মনোযোগী না হওয়ার কথাও তিনি বলেন। তবে শরৎচন্দ্রের মত প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর লেখকের পক্ষে অতীতনির্ভর বা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা স্বধর্ম-অনুযায়ী ছিল না ; তিনি প্রায় লেখেনও নি। কিন্তু দেশ অর্থাৎ গ্রামের প্রতি আমরা উদাসীন, একথা শরৎচন্দ্র নানাভাবে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কোন সামাজিক আন্দোলন বা সংস্কারের কথা বিশেষ বলেননি বা কৃষি-উৎপাদনগত কোন প্রোগ্রামও উপন্যাসের কাঠামোয় তিনি দেননি। বস্তুতঃ, শরৎচন্দ্র গ্রামের মুক্তি দেখেছিলেন রমেশ বা পরিবর্তিত জীবানন্দদের মধ্যে ; উদারচেতা ভূস্বামীদের গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই গ্রামের পুনরুজ্জীবন আসবে, এমন একটা ধারণাই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে পাই। এক্ষেত্রে গান্ধীর ট্রাস্টিশিপের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। এক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের মূল প্রবণতার সঙ্গেই তাঁর চিন্তার মিল ছিল, তিনি নিজের মত করে "Indian tendency to look upwards for guidance and enlightenment"[৩] বুঝেছিলেন। আলোকপ্রাপ্ত জমিদাররাই, বড় ভূস্বামীরাই গ্রামের উন্নতির, রাস্তাঘাট-স্কুল-হাসপাতাল নির্মাণের প্রধান মাধ্যম — একথা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে জানতে পারা যায়, আর এদেরই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির কথা তিনি লিখেছেন। এদিক থেকে শরৎচন্দ্র ট্রাডিশন্যাল বা ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীর পর্যায়েই পড়েন : তাঁর পথের দাবীর (১৯২৬) অবাস্তবতা, রোমান্টিক আকস্মিকতা বা শেষ প্রশ্নর নীরক্ততা দেখায়—এর বাইরে যখনই গেছেন, তখনই তিনি আরোপিত চিন্তা, নিজ স্বধর্মের বাইরের ভাবাদর্শে পা বাড়িয়েছেন। মনে হয়েছে, নিতান্ত ফ্যাশনেবল হতে চেয়েছেন তিনি।

শরৎচন্দ্রের এই ঐতিহ্যবাহী ভাবাদর্শ কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে শুভ হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে এ ভাবাদর্শ নিশ্চয়ই পশ্চাদ্‌মুখী, কিন্তু বিশেষ শিল্পীর ক্ষেত্রে এই পশ্চাদ্‌মুখীন ভাবাদর্শই একটা ঐক্যবদ্ধ জগৎ গঠনে সহায়ক হতে পারে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এই ঐতিহ্যবাহী চিন্তাই শরৎচন্দ্রের দুটি

৩। C. H. Philips ও M. D. Wain Wright সম্পাদিত The Partition of India (1970)-র P. Spear-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৯০-৫০৩।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। প্রথমতঃ, এই চিন্তা থেকে জমিদারশাসিত এক ঐক্যবদ্ধ সমাজের কথা শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শে থাকে ; আলোকিত জমিদারের মানবিকতা তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষভাবে ছায়া ফেলে—দেবদাস, জীবানন্দ, রমেশ সকলেই খানিকটা সমাজনিষিদ্ধ মানবিকতার প্রতিভূ শেষ পর্যন্ত হন, তার মূলে এই মানবিকতাই। শরৎচন্দ্র একথা বলেননি—নিম্নবর্ণ, পতিত, বেশ্যা বিদ্রোহ করুক। তিনি বলেছেন, এরাও মানুষ, এদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে। সমাজসীমান্তের এই অধিবাসীরা তাঁর রচনায় তাই তাদের কুশ্রীতা-উজ্জ্বলতা সমেত আসেনি, এসেছে আমাদের ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত মানদণ্ডে, রুচির সঙ্গে খাপ খেয়ে। অর্থাৎ ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত মানসে, সেবাপরায়ণা, স্নিগ্ধা, নারীর যে মূল্যবোধ; বা সৎ, সবল, নিম্নবর্ণ মানুষ সম্পর্কে যে অনুকম্পা, সেটাই এখানে কার্যকর। এ মানবিকতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেকদিনের ; সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অটুট রেখেই এই মানবিকতা ছড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, শরৎচন্দ্র তাঁর এই মানবিকতার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দেখেছিলেন জাতি- বা বর্ণপ্রথাকে। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের প্রধান কীর্তিই আমি বলব, এই জাতি- বা বর্ণপ্রথার কাঠামোকে উপন্যাসে অপরিহার্যরূপে ব্যবহার করা। সমাজতাত্ত্বিকেরা এই সেদিন পর্যন্ত জাতিবর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের সমাজকে ব্যাখ্যা করেছেন ; শরৎচন্দ্রের জীবৎকালেই এই প্রসঙ্গে নানা রিপোর্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ১৯০৮-এ প্রকাশিত Bougle-র ও ১৯৩৮-এ প্রকাশিত Hocart-এর বই দুটি এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য—ভারতবর্ষের ইতিহাসের চালিকাশক্তি যে জাতিবর্ণ, একথা শরৎচন্দ্রের সময়ে তো বটেই, এখনও সমাজতাত্ত্বিক-সমাজনৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে খুবই চালু।[8] ব্রিটিশ যুগে, অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষে জাতিবর্ণপ্রথার ওপর নানা দিক থেকে আঘাত আসে, তার ফলে এর প্রভাব কমতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি ; বরঞ্চ জাতিধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য জাতিবর্ণপ্রথার কঠোরতা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদানপ্রদান ছিল। কিন্তু প্যাক্স ব্রিটানিকার প্রতিষ্ঠার পর এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে গেলে, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হলে, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ চালু হলে জাতিধর্মপ্রথা আরও সংগঠিত হয়ে, বিভিন্ন প্রান্তের একজাতিরা পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পায়। বিশ শতকের প্রথমে গ্রামে

৪। ইদানীং আন্দ্রে বেতেই-এর মত লেখকদের হাতে ভারতীয় সমাজে শ্রেণী, স্বার্থ ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে। তবে Louis Dumont-র মত লেখকদের লেখায় এখনও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণই বড় কথা।

এই জাতিভেদ আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত।[৫] এই অবস্থায় গ্রামের পট-ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জাতিবর্ণপ্রথার প্রাধান্য যে থাকবে, তা স্বাভাবিক : তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এই দিকটিকে তাঁর কাছে স্পষ্ট করে তুলেছিল। শ্রেণী হিসাবে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায় আসেইনি, এসেছে কাস্ট হিসাবে : আর জাতিবর্ণগত জটিলতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে কিন্তু শরৎচন্দ্র জাতি-বর্ণভেদ উঠে যাক এমন কথা না বললেও অন্ততঃ এটা যে অন্তঃসারশূন্য একথা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে বুঝিয়েছেন, যদিও তাঁর কুশীলবরা জাতিবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বেরিয়ে এল, এমন কোন দৃষ্টান্তও নেই। অথচ শরৎচন্দ্রের লেখকজীবন শুরু হবার আগেই রবীন্দ্রনাথের গোরা (১৯১০) লেখা হয়ে গেছে : তাঁর ছোট গল্পের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এতে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহিতা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি আমাদের সমাজে জাতি-বর্ণবোধ যে কত গভীর, সে সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তীব্রতাও বোঝা যায়। একথা ঠিকই, শ্রেণী হিসাবে গ্রামীণ মধ্যবিত্তকে না বোঝার দরুন শরৎচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিপ্রেক্ষিত হারিয়েছেন। তথাপি জাতিবর্ণপ্রথার অনিবার্য কাঠামোটির জন্য তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের ইতিহাস-চেতনা-শ্রেণীচেতনার পটসমৃদ্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল না। ভারতীয় সামাজিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দায় পরবর্তীকালেও শরৎচন্দ্রের মত লেখকদের মধ্যে দেখা যায় : অনুন্নত সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীর উন্নতির জন্য নয়, ঐতিহ্যগত সমাজেই নতুন জীবনাচরণ আনবার জন্য এইসব আন্দোলন। সমাজ একই থাকবে, কেবল মানুষগুলো পালটাবে। শরৎচন্দ্রও তাই মানুষগুলোর কথা বলেছেন, কিন্তু সমাজের কথা নয়।[৬] একদিকে সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব, অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহিতা,—শরৎচন্দ্রের এই উভয়মুখীনতা পরিবর্তমান সময়ে ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীর দ্বন্দ্বকেই দেখায়।

২

ঔপন্যাসিক যে চরিত্রাবলী, ব্যক্তিদের তাঁর উপন্যাসে আনেন তাদের একটা পার্সনা বা সামাজিক মুখোশ পরাতেই হয়। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দৃঢ়মূল

৫. Caste in Modern India and Other Essays : M. N. Srinivas (1962) পৃঃ ১-১৪।

৬. Indian Nationalism and Hindu Social Reform : Charles H. Heimsath (1964) পৃঃ ৫।

সমাজের কাঠামোর প্রয়োজন তাঁর হয়[৭] —শরৎচন্দ্র তাঁর জাতিবর্ণচেতনার সূত্রে এই সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজকেই তাঁর পটভূমি হিসাবে পান। এই পটভূমিকেই তিনি তাঁর নানা উপন্যাসে ব্যবহারও করেছেন : কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত উপন্যাস বামুনের মেয়েতে (১৯২০)। শরৎচন্দ্রের লেখক-জীবনের মধ্যপর্বের এই উপন্যাসটিতে শরৎ-চন্দ্রের ঔপন্যাসিক হিসাবে বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন উপস্থিত, তেমনি তাঁর দুর্বলতা-গুলিও কম প্রকট। দেনাপাওনা (১৯২৩) ছাড়া আর বোধহয় কোন উপন্যাসেই, বামুনের মেয়ের মত এত তাৎপর্যের সঙ্গে গ্রামীণ প্যাটার্নটি তিনি ধরেন নি।

শরৎসাহিত্যসংগ্রহ-র (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এর সংস্করণ) চতুর্থ সম্ভারের ১৫৭ থেকে ২২৭ পৃষ্ঠা, এই সত্তর-একাত্তর পৃষ্ঠার ছোট উপন্যাস বামুনের মেয়ে। মেদহীন উপন্যাসটির তেরটি পরিচ্ছেদ নাটকের তেরটি দৃশ্যের মত ; কোন অঙ্কবিভাগ করা যায় না। শরৎচন্দ্রের নাটক যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন, সেই নাট্যবোধ ও কবিতা তাঁর নাটকে কোন সময়ই ছিল না, যা নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করতে পারে ; কিন্তু সংলাপনির্ভর বামুনের মেয়েকে বিজয়া বা ষোড়শীর মত নাট্যরূপ দিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই। এমন কি নাটকের স্থানকালচরিত্রগত সেই প্রাচীন ঐক্যের কাঠামোও এখানে উপস্থিত। মাঝে মাঝে কেবল শরৎচন্দ্র, নাটকের নির্দেশনার মত, একটু ধরিয়ে দিয়েছেন। যেমন প্রথমেই, "পাড়া বেড়ানো শেষ করিয়া রাসমণি অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে দশ-বারো বৎসরের নাতিনীটি আগে আগে চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত পল্লীপথের এধারে বাঁধা একটি ছাগ-শিশু ওধারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল।" (পৃঃ ১৫৭)

'অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বারো তেরো বছরের একটি দুলেদের মেয়ের প্রতি। সে ব্রস্তব্যস্ত হইয়া তাহার ছাগশিশুটিকে সরাইবার জন্য আসিতেছিল।" (ঐ) 'পিতার সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে ক্রোধে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।" (পৃঃ ১৫৯)।

"যে গোলোক চাটুয্যে মহাশয়ের নামে বাঘে ও গরুতে একত্রে একঘাটে জলপান করে বলিয়া সেদিন রাসমণি বা'ংবার সন্ধ্যাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন ; সেই হিন্দুকুলচূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি এই মাত্র তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানের পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা

৭. এ প্রসঙ্গে Arnold Kettle সম্পাদিত The Nineteenth Century Novel : Critical Essays and Documents (1972) দ্রষ্টব্য।

করবী পুষ্প দেখিয়া মনে হয় অনতিবিলম্বেই তাঁহার সকালের আহ্নিক ও পূজা সারা হইয়াছে।" (পৃঃ ১৭২)।

"মেয়েটি বিধবা। দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়সও বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই। পরিধানে মিহি সাদা ধুতি, হাতে কোন অলঙ্কার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ-বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার।"

এর সঙ্গে পাশাপাশি 'বিজয়া' (ঐ) নাটকটির বন্ধনীর মধ্যে বাক্যগুলি দেখা যাক: 'বিজয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল', 'বিজয়া পা বাড়াইয়া ছিল। বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকমাত্র বিলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। এমনি সময় বৃদ্ধ রাসবিহারী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেই পুত্র বিলাসবিহারী লাফাইয়া উঠিল।' 'শরৎ-অন্তে শীর্ণ সঙ্কীর্ণ সরস্বতী নদী। এ তটে বিস্তীর্ণ মাঠ ও তটে লতাগুল্মপরিব্যাপ্ত ঘন বন। বনান্তরালে দিঘড়া গ্রাম। নদীর উভয় তীর ক্ষুদ্র বাঁশের সেতু দিয়া সংযুক্ত। একটা পায়ে হাঁটা সঙ্কীর্ণ পথ বনের মধ্য দিয়া দিঘড়া গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই সকলের অন্তরালে নরেনের বৃহৎ অট্টালিকার কিছু কিছু দেখা যায় মাত্র।' বস্তুত উপন্যাস ও নাটকের এই উদ্ধৃতিগুলি এক কাজই করেছে: চরিত্রের বর্ণনায় ও গল্পের এগিয়ে যাওয়ায় সহায়তা। অনেক ঔপন্যাসিকের মতই পোশাক, চেহারা ইত্যাদি দিয়ে শরৎচন্দ্র চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। আর ওয়েন বুথ যাকে উপন্যাসের রেটরিক বলেছেন,[৮] তাও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই সূত্রেই আসে; বিমূর্ত যুক্তি দেখিয়ে বা আলোচনা করে অনেক সময়ই উপন্যাসে লেখক তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান না। তখন তাঁর অভিজ্ঞতাদৃষ্টির যাথার্থ্য এই রেটরিকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে চান, পাঠককে তার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। (অবশ্য গোরা বা ডিকেন্সের হার্ড টাইমস-এর মত উপন্যাসের ছন্দে, সামগ্রিকতায় তর্ক, যুক্তি অনায়াসেই আসে।) শরৎচন্দ্র 'পাড়া বেড়ানো শেষ করিয়া' 'দুলেদের মেয়ে' (দুলে মেয়ে নয়, জাতিবর্ণের ছাপ শরৎচন্দ্র দিতে চান না) 'রাসমণির কণ্ঠস্বরের তীব্র সৌরভ ক্রমে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, গন্ধ পাইয়া পাছে পাড়ার সমজদার মধুমক্ষীর দল জুটিয়া যায়', 'হিন্দুকুল-চূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি', তাঁহার পরিধানের পট্টবস্ত্র ও শিখা সংলগ্ন টাটকা করবী পুষ্প' ইত্যাদি বাক্য বা বাক্যাংশে শরৎচন্দ্র যে রেটরিক ব্যবহার করেন তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও তার যাথার্থ্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়।

৮. The Rhetoric of Fiction: Wayne C. Booth (1961)—বিশেষত: প্রথম ৮৮ পাতা, তবে সমগ্র বইটিতে এ আলোচনা ছড়িয়ে আছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ঃ এই পরিচ্ছেদেই উপন্যাসের মূল সুরটি বাঁধা হয়ে যায়। রাসমণি-নামধেয় শুচিবায়ুগ্রস্তা, পাড়াগাঁর টিপিক্যাল এক গ্রাম্য প্রৌঢ়ার পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময়ের একটি ঘটনায় উপন্যাসটির মাত্রা বাঁধা হয়, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সব চরিত্রই প্রায় এসে পড়ে। উৎকট জাতিবর্ণভেদ ও অহমিকা-চিহ্নিত, সংকীর্ণমনা, কুৎসাপরায়ণ গ্রাম সমাজের কাঠামোটি অনিবার্যভাবেই উপস্থিত হয় প্রথম পরিচ্ছেদে ঃ ছাগলের দড়ি ডিঙোবার কুসংস্কার, বামুনপাড়ায় দুলেদের এনে বসানোয় কী ভয়ঙ্কর অন্যায় ও এক বিত্তবান সমাজপতির অস্তিত্ব রাসমণির মারফত ঘোষিত হয়। জমিজমার আয়ের ওপর নির্ভরশীল, শরৎচন্দ্রের আপনভোলা সন্ধ্যার বাবা প্রিয়বাবুর কথাও এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্র বাস্তব টাইপ চরিত্র বেছে নিতেই পছন্দ করেন ; রাসমণি, গোলোক, প্রিয়নাথ এসবই টাইপ চরিত্র, যাদের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের এক-একটি অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়েছে। এই জাতিবর্ণশাসিত সমাজ ও তার পটে একটি প্রেমকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী এগোয়, কিন্তু এ উপন্যাসে আরও গভীর আয়রনিকেই শরৎচন্দ্র ধরেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যে ক্রিয়ার কাল ব্যবহার করেন, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রয় প্যাসকাল তাঁর 'টেন্‌স্ অ্যাণ্ড নভেল' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ক্রিয়ার-কাল ব্যবহার ঔপন্যাসিকের জগতের ফিকশনাল চরিত্রকে স্পষ্ট করে।[১] অধিকাংশ উপন্যাসে যে অতীত কাল ব্যবহৃত হয়, ঐতিহাসিক বিবরণের অতীত ক্রিয়া থেকে তা ভিন্ন—এখানে অতীত ক্রিয়া এমনভাবে ব্যবহৃত হয়, যা প্রচলিত ব্যাকরণে বর্তমান-ভবিষ্যৎ হিসাবেও ব্যবহার করা চলে। বামুনের মেয়ে আরম্ভ হচ্ছে—"পাড়া বেড়ানো শেষ করিয়া রাসমণি অপরাহ্ণ বেলায় ঘরে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে দশবারো বৎসরের নাতিনীটি আগে আগে চলিয়াছিল।" ফিরিতেছিলেন, এই ঘটমান অতীত ক্রিয়াটি কিন্তু পাঠককে উপন্যাসের বর্তমানে পৌঁছে দেয় ; পরের বাক্যের 'চলিয়াছিল' ক্রিয়ায় উপন্যাসে নাতনীর ভূমিকার নগণ্যতা স্পষ্ট, কিন্তু পরের বাক্যেই "ছাগশিশু··· ঘুমাইতেছিল" ছাগশিশুর ভূমিকা উপন্যাসটিতে যথেষ্ট। ঐ ঘটমান অতীত, যা আসলে বর্তমানে, পুনরায় প্রত্যাবর্তন। তাছাড়া ঘটমান অতীত ক্রিয়ায় উপন্যাস আরম্ভ করার আরও তাৎপর্য, শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে উচ্চবর্ণ হিন্দুর পুরুষানুক্রমিক এক বীভৎস প্রথা ও লালসাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যা অতীতের নয়, আবার অতীত থেকেই। এখানে আরও স্মরণীয় ছাগশিশু শব্দটি ; উচ্চবর্ণের কৌলীন্যপ্রথার বলি অসংখ্য নারীর প্রচ্ছন্ন রূপক নির্দোষ ছাগশিশুটি

১। Language of Fiction : David Lodge (1966) দ্রষ্টব্য।

আর এরই বৈপরীত্যে, উপন্যাসটির মূল ভিলেন গোলোক চাটুয্যের দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়া চালানের ব্যবসা। শরৎচন্দ্রের কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য অর্থনৈতিক নয় : বরঞ্চ অরুণের সাগরপারে যাওয়ায় জাতিভ্রষ্ট হওয়ার প্রতিতুলনাতেই এসেছে। সাগরপারে ছাগল-ভেড়া রপ্তানি করে পয়সা করায় আপত্তি নেই, পড়তে গেলেই আপত্তি —এতে ঔপনিবেশিক গ্রামীণ বিকাশের ছবিও ধরা পড়ে। মুনাফার জন্য যা কিছু করতে চাও করতে পার, কিন্তু সমাজের জাতিধর্ম-বাঁধন ঠিক রাখতে হবে। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক বিকৃত মনোভাব স্পষ্ট।

গোলোক চাটুয্যের বিপরীত চরিত্র গল্পের নায়িকা সন্ধ্যার পিতা প্রিয়নাথ মুখুয্যে। এই আপনভোলা হোমিওপ্যাথি-পাগল মানুষটার মধ্যেই কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর আদর্শের টাইপের আদল রাখেন ; ঐ আলোকিত প্রজাবাৎসল্যের জমিদারের আদর্শটাই খানিকটা আরোপ করেন প্রিয়নাথের ওপর। সে সুদ মকুব করে দেয়, বিনা পয়সায় যেমন হোক চিকিৎসা করে। আর এদের ওপরই গ্রামের ভরসা, তাও স্পষ্ট হয় : "ত্রৈলোক্য কহিল লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্চে জামাইবাবু, তাই খালটার ওপরে সাঁকো তৈরি করচি। আপনার ওই বৈকুণ্ঠের দরুণ ছোট বাঁশঝাড়টা না দিলে ত আর কিছু হয় না।······আপনি দয়া করেন ত দশজনে চলে বাঁচবে, নইলে আমরা চাষী-মানুষ কোথায় পাব বাঁশ কেনবার টাকা ? ·····প্রিয় চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, লোকজনের কষ্ট হচ্চে, আচ্ছা নাওগে যাও—কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়।···ত্রৈলোক্য কহিল, ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত সাদা। এই বলিয়া সে যেদিকে পাগলাঠাকুর অন্তর্হিত হইয়াছিল সেই দিকে মুখ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিল।" (পৃঃ ১৮৭, ১৮৮) এই অংশে গ্রামীণ প্যাটার্ন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য-বাহী চিন্তার প্রকাশ অকুণ্ঠ : যাদের আছে, তারাই গ্রামকে উন্নত করবে। শেষের ওই নমস্কারটিই তাঁর পেটারনিলিজম-নির্ভর প্রত্যক্ষ-সম্পর্ক-নির্ভর সমাজচিন্তাকে দেখায়। প্রিয় মুখুজ্যে নিশ্চয়ই আদর্শ জমিদার নয়, বরঞ্চ বাস্তববুদ্ধি-অভাবহীন, গিন্নীভীত ঘরজামাই। কিন্তু এর মধ্যেই শরৎচন্দ্রের আদর্শ ব্যক্তির ছাঁচ লুকিয়ে আছে।

তবে রাসমণি তার স্বার্থপরতা, মিথ্যাবাদিতা, কুৎসাপরায়ণতা, তোষামোদী চরিত্র নিয়ে টাইপ, গোলোক চাটুয্যে তার লালসা, নিষ্ঠুরতা নিয়েও টাইপ ; প্রিয়নাথও তাই। জ্ঞানদা উচ্চবর্ণের সামাজিক অন্যায়ের, অমানবিক নিষ্ঠুরতার

বলির নিদর্শন।* কিন্তু সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, এই জাতিধর্ম-বোধ কি বিপুলভাবে আমাদের সংস্কারাবদ্ধ করেছে। অরুণের প্রতি ব্যক্তি হিসাবে সন্ধ্যার আকর্ষণ কম নয়, বস্তুতঃ সেই তার ঈপ্সিত মানুষ। অরুণের প্রতি তার মার আচরণে সে ক্ষুব্ধই হয়। তথাপি অরুণ বিলেত যাওয়াতে যে তার জাত গেছে, ধর্ম গেছে এ কথাও সে কোন সময়েই ভুলতে পারেনি। সন্ধ্যা বলেছিল, অরুণের যে লাঞ্ছনা, তা কি সে নিজেই ডেকে আনেনি।

আভাসে ইঙ্গিতে কতবার জানিয়েছে অরুণ তাদের স্বজাতি, কিন্তু অরুণের জাত খোয়ানোয় তাদের বিয়ে হতে পারে না। অন্যদিকে অরুণ সন্ধ্যার প্রতি ভালবাসাতে প্রায়শ্চিত্তও করতে চায় কিংবা সন্ধ্যার ঘৃণা থেকে চলে যেতে চায় দূরে।

সন্ধ্যার ওপর গোলোকের দৃষ্টি পড়া, অন্যদিকে জ্ঞানদার গর্ভসঞ্চারে তাকে হত্যা করার চেষ্টা, প্রিয়নাথের মায়ের অতীত ইতিহাস টেনে বার করার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের জট যেমন পাকায়, তেমনি খোলেও। সন্ধ্যারও বিয়ের ঠিক হয় এক কুলীনের সঙ্গেই—ঐ বিয়ের দিনই ভয়ঙ্কর সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। অরুণ বা সন্ধ্যা যে জাতিধর্মের গণ্ডী তাদের সংস্কারে পেরোতে পারে না, প্রিয়নাথের জননী কালীতারা, কাশীবাসিনী সন্ন্যাসিনী তা পেরিয়ে গেছেন—তাঁর জীবনের বীভৎস অভিজ্ঞতার জোরে। শরৎচন্দ্র এখানে উচ্চশিক্ষার অসহায়তা আমাদের ঔপনিবেশিক গ্রামীণ সমাজে অরুণের মেরুদণ্ড-হীনতার মধ্যে দেখিয়েছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিয়েছেন কালীতারার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্মের গণ্ডীর বাইরে দাঁড়াবার দৃষ্টান্তে। সন্ধ্যার বিবাহের রাতেই গোলোক চাটুয্যের নিয়োজিত লোকেরা তথ্য উদ্ঘাটন করল: বিবাহের সাজেই সন্ধ্যা অরুণের ঘরে এল। সন্ধ্যাকে দেখে, 'ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা সেই মুহূর্তেই একেবারে শুকাইয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না।' (পৃঃ ২১৯) সন্ধ্যা হাহাকার করে উঠল, 'কুল রক্ষা হবে না বলছিলে? কার কুল অরুণদা? আমি ত বামুনের মেয়ে

* তবে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র আঁকার স্বাভাবিক দক্ষতায় জ্ঞানদা চরিত্র হিসাবে সজীব, তার শ্বশুর আসা ও তার না যাওয়ার ঘটনাটির বিবরণে শরৎচন্দ্র চরিত্র-সচেতনতা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক্ষমতা দুইই দেখিয়েছেন।

† সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় জাতিবর্ণপ্রথায় কলুষিত হওয়া ও পবিত্রতার ধর্মীয়-বোধ কত প্রখর তা দেখান হয়েছে: তাঁদের ভাষায় Purity links contributions to Indian Sociology no 2 (1958) দ্রষ্টব্য। শরৎচন্দ্র সঠিক ভাবেই এটার ওপর জোর দিয়েছেন।

নই—আমি নাপিতের মেয়ে ; তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না। উঃ! এত বড় শাস্তি আমাকে তুমি কেন দিলে ভগবান! আমি তোমার কি করেছিলাম।' (শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তিনি যে কতবার গোরা পড়েছেন তার ঠিক নেই। গোরার জন্মরহস্যের ছায়া হয়তো এখানে আছে, তবে গোরার ব্যাপ্তি, মহত্ত্ব, তাৎপর্য নিশ্চয়ই এখানে নেই)। এরপর কুলীনপ্রথার এক বীভৎসতম কাহিনী সে বলে ঃ 'আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপর চোদ্দ পনর বছর পরে একজন এসে জামাই বলে, মুকুন্দ মুখুয্যে বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দুদিন বাস করে চলে যায়।······সে লোকটা প্রায়ই আসত। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—আর সে টাকা নিত না। তারপরে একদিন যখন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন।' লোকটা ধরা পড়ে স্বীকার করল, 'এ কুকাজ সে ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেচে। একে বুড়োমানুষ, তাতে পাঁচ'সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে আদায়ের তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ, এখন থেকে যা-কিছু রোজগার করে আনবি তার অর্ধেক ভাগ পাবি' (পৃঃ ২২১-পৃঃ ২২২) আরও দশবারো জায়গায় সে একাজ করেছে। সন্ধ্যার কিন্তু যন্ত্রণামূল তার জাতি হারানোয়। আসলে জাতিবর্ণই হিন্দু সমাজে ব্যক্তির আশ্রয়, সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগের মাধ্যম—সেই আশ্রয় হারানো একটি বিযুক্তিই, বিচ্ছিন্নতাই। তাই কালীতারার ভয়ানক অভিজ্ঞতা তাঁকে এতটা নাড়া দেয় না, যতটা দেয় নিজের জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা, ঘটনা। আমাদের সমাজে বিচ্ছিন্নতাবোধের সূত্রপাত এখানেই, অরুণের বিচ্ছিন্নতাই এখানে। কিন্তু অরুণের বিলেত যাওয়ার সাহসও এখানে স্তব্ধ ঃ 'কিন্তু এখনও তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারিনে সন্ধ্যা।' যে সন্ধ্যা জাত বজায় রাখার জন্য অরুণকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই সন্ধ্যাই বলল, 'তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি বাঁচব কি করে?' তার জাত খোয়ানোর পরই এই আবেদন ; কিন্তু অরুণ বলল, 'আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।' শরৎচন্দ্র এখানে আশ্চর্য সংযমী নিরপেক্ষ ঃ ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি যে তাঁর ছিল, বামুনের মেয়ের সমাপ্তিতে তা বোঝা যায়। বিন্দুমাত্র আপোস না করে, শরৎচন্দ্র জাতিবর্ণপ্রথার বীভৎসতা. এর থেকে জাত সংস্কারের সর্বব্যাপী প্রভাব যেভাবে এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহেই তাঁর শক্তিরই পরিচায়ক। বাংলাদেশের উচ্চবর্ণ সমাজের কুৎসিত চিত্রের এমন উদঘাটন খুব কমক্ষেত্রেই দেখা গেছে—সন্ধ্যা ও তার পিতা প্রিয়নাথ

যেদিন গৃহত্যাগ করছে, সেদিনই বিপত্নীক গোলোক চাটুয্যে একজন কিশোরীকে বিয়ে করছেন। শ্যালিকা জ্ঞানদা তার সন্তান গর্ভে নিয়ে রাতের অন্ধকারে এদেরই সঙ্গী হল। জাতিচ্যুত দুজন, হিন্দুকুলচূড়ামণির লালসার বলি একজন ; জ্ঞানদা কোনক্রমেই তার সন্তানকে মারতে দেয়নি, যেমন দেয়নি প্রিয়নাথের মা কালীতারা। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন গোলোক চাটুয্যের মধ্যে মুকুন্দ মুখুয্যেরা আরও বীভৎসভাবে যেমন সমাজে উপস্থিত, তেমনি জ্ঞানদার মধ্যে কালীতারা। মূল পরিবর্তন কিছুই হয়নি ; জগদ্দল ঔপনিবেশিক গ্রামীণ প্যাটার্নে অরুণদের শিক্ষা, চরিত্র আর-এক ভীরু শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। তাদের আধুনিকতা নিজ স্বার্থের জন্য ; ব্রিটিশ-আনীত ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় চাকরির জন্য পড়তে বিলেত যেতে পারে, কিন্তু সর্বগ্রাসী সামন্ততান্ত্রিক স্বদেশের পরিবেশের সামনে অসহায়, পালিয়ে যাওয়ায় উন্মুখ। এক শিকড়-হীন শ্রেণী তারা। শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী ভাবাদর্শও গ্রামীণ সমাজের এই স্বরূপ উদ্ঘাটনে তার যাথার্থ্য এইভাবেই প্রমাণিত করে। প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা থেকেই, যা দেখেছেন তাকে যথাযথভাবে বলতে গিয়ে, আর জাতি-ধর্মগত কাঠামোর প্রতি মনোযোগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুটা অচেতনভাবেই যে ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর এখনকার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে লভ্য নয়।

বাঙলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ট্রাডিশন

গোপাল হালদার

বাংলা সাহিত্যে শরৎসংবর্ধনা এক বিস্ময়কর বস্তু। এটা সত্য যে তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও আজও তিনি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। যদিও এই প্রসঙ্গে আমরা শরৎ-পূর্ব 'চোখের বালি-গোরা'র স্রষ্টার যুগান্তকারী অবদান, বা তাঁর অনুবর্তী কনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক-নক্ষত্রমণ্ডলী যাঁরা ১৯৩৫-৪০ সালে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যুগ শুরু করেছিলেন—তাঁদের বিস্মৃত হচ্ছি না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাঙালী জীবন ও সাহিত্য ঐ সময় থেকে একটা বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনের যুগে প্রবেশ করেছে, তবুও শরৎচন্দ্র এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে বর্তমান। দুই পুরুষ ধরে পাঠকদের অবিরত বিমূঢ় করে রাখা এক বিস্ময়কর ঘটনা। যে জনপ্রিয়তার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে তা নিশ্চয়ই শুভ এবং সুস্থ; অন্যদিকে তা জনগণ ও কালের পরিবর্তিত আশার ঐতিহাসিক দাবি পূরণে সমর্থ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, প্রিয়তম পুরোধার তুলনায় নূতন বাঙালী লেখককুল কিভাবে অস্তিত্বরক্ষা করেছেন এবং বাংলা উপন্যাসস্রোতে কোন্ কোন্ লক্ষণকে 'শরৎচন্দ্র ট্রাডিশন' বলে আখ্যা দেওয়া যায়?

শিশুসুলভ অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও আমরা এই নিরীক্ষায় এগোতে পারি। প্রথমত, শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক অবদানের পশ্চাতে সামাজিক, শৈল্পিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্য বিচার্য।

১. সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের সামাজিক দিগন্তকে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় জীবনে—অর্থাৎ সাধারণ ভদ্রলোকের, গরিব- ও মধ্য-মধ্যবিত্তের জীবনে বিস্তৃত করেছিলেন। এর মূলে জাতীয় অবস্থা এবং উপন্যাসের বর্গের দাবিই সক্রিয় ছিল।

২. সুতরাং উপন্যাসশিল্পের দিক থেকে শরৎচন্দ্র দ্ব্যর্থহীনভাবে জীবনের বাস্তব চিত্রণের ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তববাদ উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই সঠিক পদ্ধতি হিসেবে অনুসৃত। শরৎচন্দ্র শিল্পের এই ক্ষেত্রে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। যেমন, (ক) চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে আমরা কয়েক ধরনের নরনারী উপন্যাসে দেখতে পাই যাদেরকে সহজে শরৎচন্দ্র-টাইপ বলা যায়।

(খ) শিল্পীরূপে তিনি একজন দক্ষ গল্পকথক ছিলেন ও আছেন, সেখানে বঙ্কিম ছাড়া তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

(গ) স্টাইলে, সংলাপে, বর্ণনায় তিনি নিজেই একটি শ্রেণী এবং পরবর্তী বাংলা উপন্যাসশিল্পের শিক্ষানবিশদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।

৩. যা ছাড়া কোন শিল্পসৃষ্টি পরমায়ু পেতে পারে না—সেই জীবন-ব্যাখ্যানের দিকে মানবতাই ছিল শরৎচন্দ্রের জীবন ও রচনার মূল আবেগ। মানবতা এখানে বিশেষরূপে মূর্ত। এই মানবতা তাঁর দুটি বিশ্বাসের দ্বারা মণ্ডিত হয়েছিল : (ক) 'Man's man for all that' ; সে গরিব-বড়লোক সাধু-পাপী যাই হোক না কেন। (খ) 'সর্বহারা'দের জন্য আবেগমিশ্রিত ভালবাসা ও সহানুভূতি ; পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষেত্রে এটা ছিল অধিক সক্রিয়। শরৎচন্দ্রের এই তন্ময় আত্মিকবাদ (objective spirituality) বাঙালী লেখকদের তাঁর সমকক্ষ ও অনুসারক হওয়ার ট্র্যাডিশন তৈরি করেছে।

উপরের এই মূল্যায়ন শুধু অতিসরলীকরণই নয়, সীমিত আলোচনাও বটে। কিছু ব্যাখ্যা ছাড়া আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য—যেমন, শরৎচন্দ্রের পরে ঐ লক্ষণসমূহের শক্তি ও প্রাসঙ্গিকতার বিচার সফল পরিপূর্ণ হয় না। সীমিত পরিসরের মধ্যে এই নিয়ে চেষ্টার কোন প্রশ্নই ওঠে না যদি না আপনাদের অনুগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তা এই লেখকের দোষত্রুটিকে আড়াল করে।

উপন্যাসের সামাজিক অগ্রগতির প্রথম লক্ষণ—বাংলা উপন্যাসের সমাজ-দিগন্ত বিস্তার—এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপন্যাস পশ্চিমী দেশে বুর্জোয়াদের শিল্পমাধ্যম ছিল। আমাদের ঔপনিবেশিক পরিবেশে বুর্জোয়াদের তখনও জন্ম হয় নি। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোয় সঠিক শৈল্পিক তন্ময়তা—নরনারীকে সমাজের ব্যক্তিসত্তা হিসাবে দেখানো—বঙ্কিমের উপন্যাসে থাকলেও তাঁর সমাজসমস্যা সমাধানের উপায়ে ভুল ছিল। তাঁর জগৎ ছিল মূলত আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও ধনবানদের অভিজাত জগৎ। সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশাধিকার পেলেও সে ছিল ব্যঙ্গের পাত্র। অন্যদিকে, তারকনাথ তাঁর 'স্বর্ণলতা'য় সঠিক সামাজিক লক্ষ্য থেকে সাধারণ নিম্ন ও মধ্য মধ্যবিত্তের জীবন এঁকেছেন। কিন্তু এই সাফল্য ছিল সীমিত, কেননা লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন স্বল্পপ্রতিভাধর ; অন্যপক্ষে সমকালীন বঙ্কিমের অনন্যসাধারণ প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছোটোগল্পে ও উপন্যাসে তাঁকে সঠিক চিন্তায় সাহায্য করেছে। চোখের বালি ও গোরার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পরিবেশ হলেও এই মধ্যবিত্ত জাতে আলাদা। এরা শহুরে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এমনই ভিন্ন ধরনের পরিবার-বদ্ধ যে অসংখ্য গ্রামীণ ও শহুরে ভদ্রলোক ঐ মধ্যবিত্ত পরিবারকে নিজের বলে মানতে পারেন না। যদিও তাঁরা ঔপনিবেশিক অবস্থার সবচেয়ে জোরালো সামাজিক শক্তি, তবুও

তাঁরা নিজেদের উপন্যাসে উপেক্ষিত মনে করেন। বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, বিরাজ বৌ, নিষ্কৃতি, চন্দ্রনাথ ইত্যাদির লেখক দ্বারা এই সাধারণ ভদ্রলোকশ্রেণী বাংলা উপন্যাসে সংবর্ধিত হয়েছিল। সুতরাং আমাদের উপন্যাস সামাজিক ভিত্তি পেল এবং বাঙালী ভদ্রলোকশ্রেণী অদ্যাবধি বাংলা উপন্যাসের প্রধান সামাজিক উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই বিশাল 'কাব্যে-উপেক্ষিতা' শ্রেণী বাঙালী ভদ্রলোকেরা শরৎচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ স্বাগত জানাল : যদিও সংস্কৃতিবান পাঠক ও রক্ষণশীল নেতারা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট অবহিত ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে দুয়েকটি বিষয় স্মরণ করা যায় : (ক) শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি শুধু সামাজিক প্রগতি বা শিল্পবিচারে সত্য ছিল না, তারা একটি বহু-উপেক্ষিত সমাজসত্যকে আলোকিত করেছিল। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হৃদয়, একটি মূলীভূত ঐক্য ও মানবতা যা উন্নত সমাজের উপরতলায় দুর্লভ, তা অরক্ষণীয়ায় দীন-দরিদ্র ভদ্রলোকজীবনে এবং নিষ্কৃতিতে যৌথ পরিবার-ব্যবস্থায় প্রতিভাত হয়েছিল। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই প্রথম এই সত্যের উদ্ঘাটন করেন এবং ঐ শ্রেণীকে অহংকার ও আত্মমর্যাদায় ভূষিত করেন। (খ) শরৎচন্দ্রের এই ন্যায়বিচারের ফলে সত্যের আয়নায় এই সমাজের অসুন্দর বিকৃত মুখ, এর শূন্যগর্ভ ভণ্ডামি, দুর্বল ও দুর্ভাগার প্রতি অত্যাচার, ছোটো-খাটো ব্যাপারে অমানবিকতা স্পষ্ট হল। ভদ্রলোক পাঠকেরা মনে মনে এই প্রতিরূপ সত্য জেনেও পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ের লেখকের নিন্দা মেনে নিলেন। (গ) শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঐ সমাজেরই—যিনি দুঃখে করুণায় সাধারণ ভদ্রলোকেদেরই একজন। কোনো প্রাসাদশীর্ষ থেকে কথাবলা আগন্তুক, সংস্কারক, বহিরাগত ব্যক্তি শরৎচন্দ্র ছিলেন না। বস্তুত তিনি তাদের সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন। আজও শরৎচন্দ্রের কোনো পাঠক এই অভিন্নতার শক্তি অস্বীকার করতে পারেন না। যদিও ইতোমধ্যে সামাজিক অবস্থা অনেক পরিবর্তিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বহুল পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে বাঙালী ভদ্রলোকেরা যাঁরা শতবর্ষের ট্রাডিশনে বেঁচে ছিলেন, নিজেদের ভূমিকা হারিয়েছেন শ্রেণী হিসাবে। ঐ শ্রেণী এখন তাৎপর্যহীন, নরনারীও শতধা বিভাগে বিভক্ত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ট্রাডিশনের আজকের দিনে কি যৌক্তিকতা আছে ? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নিজের কর্মজীবন আরম্ভ করেন তখন এই ভাব ছিল প্রবল। কিন্তু তারাশঙ্করের সঙ্গে সামন্ত-শ্রেণীর সংযোগ ছিল আরো গূঢ়, আরো গভীর।

শরৎচন্দ্রের ট্রাডিশনকে যদি ঠিকমতো উপলব্ধি করা যায় তাহলে তা বাঙালী লেখকদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ও সম্ভাবনাপূর্ণ অংশের—সর্বহারা নিপীড়িত জনতার—কাহিনী লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করবে। অনেক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস এই ক্ষেত্রে হলেও বাংলা উপন্যাস মূলত সেই অসারত্বের স্রোতে ভাসমান অতিরিক্ত ভদ্রলোকের জীবনেই সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আমাদের ধারণা কতদূর সত্য তা দেখা যেতে পারে। শিল্পের বাস্তবতার পথে বাংলা উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রই এগিয়ে দিয়েছিলেন। বেশি না বলেও আমরা এই প্রসঙ্গটিকে স্পষ্ট করতে পারি। উপন্যাসকে নরনারীর সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাস্তব ও সত্য হতে হবে জীবনচিত্রণ, চরিত্র- ও ঘটনাবর্ণনে। বাস্তববাদ পরে অনেক শাখায়িত হয়েছে। যে কটি আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ, তা হল ফিল্ডিং, ফ্লবেয়ার, টলস্টয়ের ক্লাসিকাল রিয়ালিজম্, জোলার 'প্রকৃতিবাদ'; হেনরি জেমস্. প্রুস্ত, জেমস জয়েসের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ। শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদ প্রধানত ক্লাসিকাল এবং রাশিয়ানদের কথিত 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমে'র কাছাকাছি। যদিও তাঁর আবেগপ্রবণতা আমাদের ডিকেন্সের কথা মনে পড়ায়।

এখন, এ কথা অনস্বীকার্য যে শরৎচন্দ্র আমাদের সাহিত্যানুশীলনে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বাস্তববাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। (ক) তিনি সাধারণ ভদ্রলোকের জীবনকে তাঁর বিষয়বস্তু করেছিলেন। (খ) তাঁর শিল্প-ভাবনায় সক্রিয় ছিল তাঁর পরিচিত জ্ঞাত জীবন। (গ) বিশেষত তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা, জীবনের নির্মমতা-হীনতার সঙ্গে সত্যের প্রতি আবেগময় আস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন; যদিও তিনি কখনই মোটা স্থূল বিষয়ে বা 'জীবনটা-যেরকম' বা জীবনের নিন্দার্হ অংশ (ভীতি, যৌন আবেদন বা শহুরেপনা), যাদের সঙ্গে বাস্তববাদের প্রায়ই অন্বয় দেখা যায়, তার পক্ষে যান নি। শরৎচন্দ্র এদিক থেকে চোখের বালির লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদের অনুগামী। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো চতুরঙ্গ-ব্যাখ্যাত আমিত্বকে প্রধান করে দেখেন নি। তিনি 'চেতনাপ্রবাহ', 'ইনার মনোলগ' ইত্যাদি পদ্ধতি বা সিনেমাটিক ফ্ল্যাশ-ব্যাক, মন্তাজ ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করেন নি। শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সৎ, প্রত্যক্ষ, ক্ল্যাসিকাল বাস্তববাদের সাহায্যে শিল্পীসুলভ দক্ষতায় চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবর্ণন এবং গল্পকথনের অপূর্ব ভঙ্গি। এই শৈল্পিক ট্রাডিশনই তিনি রেখে গেছেন। আবার তিনি একটি সতর্কবাণীও রেখে গেছেন—শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি শেষ পর্বের উপন্যাসের মতো ক্ষেত্রে এই আলো নাও জ্বলতে পারে। যখনি তিনি অপরিচিত জগৎ বা

ধারণায় পদক্ষেপ করেছেন, তখনি ঔপন্যাসিকের বাস্তবতার অভিজ্ঞতা জীবন ও সত্যের সেই পরম দীপ্তিকে হারায়, কেননা তাঁর অভিজ্ঞতাই যে গভীর নয়।

আমরা জানি, এখন ক্ল্যাসিকাল বাস্তববাদের দিন ফুরিয়েছে। কিন্তু ফ্লবেয়ার, টলস্টয় কোনদিনই অচলিত হয়ে যাবেন না। পরিবর্তনশীল সময় এবং জটিল আধুনিক যুগ মানবজীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ নানা ভাবনার চিত্রণে আরো সূক্ষ্ম রূপকলা ও পদ্ধতি দাবি করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই দাবি অগ্রাহ্য করেন নি। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি এবং জগদীশ গুপ্তের অসাধু সিদ্ধার্থ প্রকাশিত হয়েছিল; অন্নদাশঙ্কর রায়ের সত্যাসত্য এবং ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলা নতুন উপন্যাসভূমির পত্তন করল। একই সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন জীবনের কতকগুলি অসন্দিগ্ধ অংশে বাস্তববাদ প্রসারণের জন্য। আমাদের ঔপন্যাসিকরা পশ্চিমী ঔপন্যাসিকদের কৃতিত্বের সারাংশটুকু স্বীকরণের প্রয়াসী ছিলেন এবং তাঁদের সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও আমাদের উপন্যাসে আনতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতই শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদের ট্রাডিশন বিভিন্ন বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে তাঁদের মুক্ত করেছিল এবং তাঁদের চরিত্রকল্পনায় শরৎচন্দ্রের বাস্তব এবং বিস্ময়কর চরিত্র-গুলি অলক্ষিতভাবে সক্রিয় ছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। যে-সামাজিক সমস্যাগুলি শরৎচন্দ্রকে উদ্দীপিত করেছিল, সেগুলির মতোই শরৎ-ঐতিহ্য এখন সম্পূর্ণ সেকেলে হয়ে পড়েছে।

'সেকেলে' হওয়ার অর্থ এই নয় যে তা প্রাসঙ্গিকতা বা জীবনের পরম স্বাক্ষর আত্মিক মর্যাদাকে হারিয়েছে। এর অর্থ হল, আবেগময় আবেদন বা সাময়িকতা হারানো—যা শরৎচন্দ্রে অতিরিক্তই ছিল। ইন্দ্রনাথ, রাম, দিবাকর ইত্যাদি পুরুষ-চরিত্রের কথা বাদ দিলে তাঁর অঙ্কিত বেশির ভাগ পুরুষ-চরিত্রই 'বানানো'। তারা কেউই ভদ্রলোকের নিরন্তর নির্মম জীবনসংগ্রামের আঘাতে গড়েপিটে তৈরি হয় নি। এমনকি কয়েকটি নারী-চরিত্র সম্পর্কেও পাঠক এই সন্দেহে ভোগেন। যদিও আকর্ষণীয় নারী-চরিত্রের প্রদর্শশালা শরৎচন্দ্রের মতো সহানুভূতির আবেগ দিয়ে আর কেউ দেখান নি।

বঙ্কিমের কাল থেকেই বাঙলা উপন্যাসে আকর্ষণীয় নারী-চরিত্র প্রচুর ছিল। এছাড়া এটা উপলব্ধি করতে হবে যে তারা শরৎচন্দ্রের মানবতা—তাঁর আত্মিক স্বভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এর মূল ছিল নির্যাতিত মানব-সমাজের প্রতি সমব্যথায়—এবং নারীই তো ইতিহাসের ধারায় সবচেয়ে অত্যা-চারিত। শরৎচন্দ্রের সহজাত এই ভালোবাসা কখনই নিঃশেষিত হয় নি।

পথের দাবীর কুয়াশাজটিলতায়, শ্রীকান্তের শেষের পর্বগুলিতে, শেষ প্রশ্নে—এই ভালোবাসা তাঁকে চালনা করেছে। ছোটগল্পগুলিতে এই ভালোবাসা অবিস্মরণীয় শক্তিতে তীব্র ভাবে উপলব্ধ। একটা পরিণত সামাজিক অভিজ্ঞতা, সহজাত শিল্পবোধ এবং মানুষের অন্তর্নিহিত তন্ময় আত্মিকতা তাঁর একটি রচনায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। আমি মহেশের কথাই বলছি, যেখানে কৃষক-সমাজের দুরবস্থা এবং সর্বহারাকরণ—যা বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক শক্তির স্রষ্টা, তা চিত্রিত হয়েছে। এখানেই তাঁর চরম দলিল—সাধারণ ভদ্রলোকের জীবনশিল্পী এবং নির্যাতিত মানবাত্মার যোদ্ধা অন্য কালের স্বার্থে সম্মিলিত হয়েছেন।

এদিক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ট্র্যাডিশন সামাজিক, শৈল্পিক ও নন্দনতাত্ত্বিকভাবে কখনোই নিঃশেষিত হবার নয়। একে বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা—যাঁরা বিশ্বাস করেন, উপন্যাস শুধু বিনোদন নয়, একটি মনন-ঋদ্ধ শিল্পকর্ম—তাঁরা এখনো শরৎ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করতে পারেন।

শরৎচন্দ্র, বিপ্লববাদ ও সাহিত্যসৃষ্টি

অংশুমান পাল

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-বিচারের সময় মনে রাখতে হবে যে, আজকের দিনে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবের যে আন্দোলন, তখনকার দিনের বিপ্লবের আন্দোলন থেকে কি আদর্শগত, কি প্রকৃতিগত, কি সংগঠনগত—সর্বদিক থেকে বদলে গিয়েছে। এমন কি, বিপ্লব করবার মানুষগুলো পর্যন্ত গিয়েছে পাল্টে। সুতরাং আজকের দিনে প্রগতি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে অগ্রসর বলে মনে হয়, তার মাপকাঠিতে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করা যাবে না। আমাদের দেখতে হবে, শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িককালে সাহিত্যের মাধ্যমে যে জীবনদর্শন, চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত করেছিলেন, সেটা তখনকার দিনে আমাদের দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক ছিল কিনা।

শরৎচন্দ্রের সময়টা ছিল একদিকে সারা-ভারতব্যাপী সমাজবিপ্লবের রেনেশাঁ আন্দোলনের সময়, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারের সময়। এই রেনেশাঁ বা জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের শুরু হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় থেকে। ইউরোপীয় মানবতা-বাদী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ধর্মের মূল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি রেনেশাঁ বা সমাজবিপ্লবের আন্দোলনের জন্ম দেন। তাই প্রথম দিকে সমাজবিপ্লবের আন্দোলন প্রধানত ধর্মীয় সংস্কারের পথ ধরেই এগিয়েছিল। তারপর এলেন বিদ্যাসাগরমশাই। তিনিই প্রথম ধর্মীয় সংস্কারের পথে সমাজবিপ্লবের আন্দোলনের ছেদ ঘটিয়ে মানবতাবাদী আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে চাইলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার একটা যুক্তিভিত্তিক সংযোগ করতে চেয়েছিলেন। তারপর আবার বিদ্যাসাগর মশায়ের যুগটা পার হয়ে এসে আমাদের রেনেশাঁ আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পথেই এগোতে লাগল। একদিকে হল ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার, অপরদিকে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের তুমুল আন্দোলন। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন,—অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

তারপর যখন ধীরে ধীরে দেশের চারিদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল—ঠিক সেই সময়ে বাঙালী

সমাজে সাহিত্যিকরূপে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎসাহিত্য ও শরৎচিন্তাই প্রথম বাংলার মাটিকে স্পর্শ করে—মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তন করবার জন্য একই সঙ্গে হিন্দুসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ ও তাদের পুরানো আচার, রীতি-নীতিগুলোর বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। তাঁর গল্প বা উপন্যাসে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য একটা কথাও তিনি বলেন নি। প্রথমে তিনি মানুষের মনে ব্যথা ও বেদনা সৃষ্টি করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে বড় বড় চিন্তা বা ভাবনা ও ধারণার বিষয়বস্তুগুলো মানুষের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছেন—পেরেছেনও। এইভাবে শরৎচন্দ্র দেশের অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষের সামনে নতুন বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং তাদের মনে মানুষের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে নতুন মূল্যবোধের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে দেশের অগণিত লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষের সামনে নতুন বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

জাতীয় জীবনের এই অধ্যায়ে আমাদের দেশে যে দেশাত্মবোধ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার চিন্তা এবং মানবতাবাদের জন্ম হয় তা কিন্তু দুটো ধারায় প্রবাহিত হল—একদিকে মানবতাবাদের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা, অপরদিকে অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের সঙ্গে আপোস-রক্ষাকারী মানবতাবাদী চিন্তাধারা। যৌবনদীপ্ত, বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র ও নজরুলের সাহিত্যে, আর অধ্যাত্মবাদের দিকে মুখ-ফেরানো মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যে। তাই একজন সৃষ্টি করেন 'পথের দাবী', অপরজন সৃষ্টি করেন 'চার অধ্যায়'। একজনের হাতে 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের সৃষ্টি, আর একজন সৃষ্টি করেন 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য। একজন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, যা কিছু যুক্তির ভিত্তিতে পুরানো এবং অতীত তা অর্থহীন ; তাকে ভাঙো। আর একজন স্থিতিলাভ করতে চান শাশ্বত সৌন্দর্যের আড়ালে। একজন চরম বাস্তববাদী—দ্বন্দ্বসংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তাই তিনি জীবনদ্রষ্টা ; সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি হলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেমের মূর্ত-প্রতীক। অপরজন তত্ত্বব্যাখ্যা ও অপূর্ব বাচনভঙ্গীর আড়ালে জীবন-সংগ্রাম থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একজনের দৃষ্টিভঙ্গী আপোসহীন বিপ্লবাত্মক, অপরজনের দৃষ্টিভঙ্গী উদারনৈতিক, আপোসমূলক ও সংস্কারপন্থী। একজনের চিন্তাধারারার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার মিল, অপরজনের মিল হল মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারার সঙ্গে।

একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন বৃহৎ নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকা নেন নি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বুকে যে আগুন জ্বেলেছিল তা তাঁর কথাবার্তায় ও লেখায় বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। অথচ, নিজে তিনি ছিলেন সামাজিক গল্প ও উপন্যাসের সার্থক লেখক। মানুষের মনের অতলে ডুব দিয়ে গভীর সব রহস্য তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তবু, যখনই দেশের কথা, বিশেষ করে পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা লেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তিনি অন্য সব দিক উপেক্ষা করে সেই দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁর সমকালীন কোন লেখক, তিনি যত তরুণই হোন, যদি দেশাত্মবোধক লেখা লিখেছেন তিনিই শরৎচন্দ্রের আন্তরিক শ্রদ্ধা পেয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর আগুন-ঝরানো লেখার জন্যই শরৎচন্দ্রের অত প্রিয় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৩ সালের ১০ই চৈত্র 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিঠির একজায়গায় তিনি লিখেছেন, "সমাজের মধ্যে আবর্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই—একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তোমরা যে কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে মিলেছ—তোমরা যে নর-নারীর যৌন সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন করনি, এইটি আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বার বার ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন আর ব্যতিক্রম না হয়।"

শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, প্রতিটি ভারতবাসী দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করুক। জয় তাদের হবেই। তিনি বিশ্বাস করতেন, জনগণ হচ্ছে অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের মধ্যে যে অদম্য কর্মক্ষমতা রয়েছে, নেতৃত্ব শুধু সেই ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে সক্রিয় করতে পারে—তাই যেখানে প্রয়োজন প্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগের—সেখান থেকে জনগণ কোনমতেই সরে থাকতে পারে না। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের আমার কথা প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

"স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব, ঠিক ততখানি কর্তব্যের দায় নিয়েও তো আমাদের মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। একটাকে এড়িয়ে আর একটাকে পাবে এতবড় অন্যায়, এতবড় অসঙ্গত দাবী—এত বড় পাগলামী আর ত কিছু হতে পারে না।"

রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের অন্যতম সাহিত্যকীর্তি হিসেবে শরৎচন্দ্রের 'পথের

দাবী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। রাজনৈতিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে আরও যে-সব উপন্যাস লিখিত হয়েছে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', গোপাল হালদারের 'একদা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ইত্যাদি—এদের মধ্যে 'পথের দাবী'ই সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত গ্রন্থ। বাজেয়াপ্ত থাকার কালে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় 'পথের দাবী'র একখণ্ড সংগ্রহ করবার জন্য বহু দুঃখ ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল। এই 'পথের দাবী' উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবচেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে বলা যেতে পারে। 'পথের দাবী'র সেক্রেটারি ভারতী বলেছেন,

"আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী স্বীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙেচুরে ফেলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ।"

'পথের দাবী'র স্রষ্টা সব্যসাচী বলেছেন,

"জীবনযাত্রায় মানুষের পথচলবার অধিকার যে কতবড় এবং কত পবিত্র সেই সমস্ত সত্যটাই মানুষ ভুলে গেছে। আপনারা অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান।"

১৩৩৭ সালে চন্দননগরের এক আলোচনা-সভায় শরৎচন্দ্র নিজে বলেছিলেন,

"আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরানো জিনিষটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিষটার মানে কি। ওটা ভালো কিছু নয়—যেটা খারাপ জিনিষ অনেকদিন ধরে চলে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করানো। যেমন গভর্ণমেণ্টের শাসনসংস্কার—reforms, আর একদল যারা revolution চাইছে। revolution মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না। তারা চান reforms অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয় মেরামত করে জিনিষটা ভাল হয় না, যা আছে তার পরমায়ুটা বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা neglect দ্বারা আপনি ধ্বংস হয়ে যেত—সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ, তাকে মেরামত করে, সংস্কার করে দাঁড় করানো উচিত নয়।"

'পথের দাবী'তে সব্যসাচীও ভারতীকে বলেছেন,

"সংস্কার মানে মেরামত—উচ্ছেদ নয়। গুরুভার যে অপরাধ আজ

মানুষের অসহনীয় হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা, যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠ করার যে কৌশল, বোধ হয় তারই নাম শাসনসংস্কার।"

'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচী বিপ্লবী। আমাদের জাতীয় জীবনে যা কিছু জগদল পাথরের মত চেপে বসে আছে তিনি তার বিরোধী। তিনি যে শুধু রাষ্ট্রশক্তি বা প্রাচীন সংস্কারকে ভেঙে ফেলতে চান, তাই নয়। সত্য সম্পর্কেও তাঁর ধারণা নতুন। তিনি ভারতীকে স্পষ্টই বলেছেন,

"তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা জানো, মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্যশাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয় ? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলেছে। শাশ্বত, সনাতন নয়, এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, প্রয়োজন হলে সত্য সৃষ্টি করি।"

সত্য সম্পর্কে সব্যসাচীর এই যে ধারণা তাই তাঁকে সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর পথ হিংসার পথ। অপরকে ধ্বংস করে তিনি আদর্শ বা বা লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। তাই বলেন,

"বৃথা নরহত্যার আমি কোন দিনও পক্ষপাতী নই—আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজ হাতে পিঁপড়েও মারতে পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ? আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল-সমস্ত যে কেড়ে নিল তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, রইল না আমার ?"

তাই বলে কিন্তু সব্যসাচী মানবজীবনের বৃহত্তর প্রয়োজন ও আদর্শ সম্পর্কে অচেতন ছিলেন না। নিজেই বলেছেন,

"ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের কোন আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই। কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তম কাম্য আর নেই, এমন ভুলও আমার কোন দিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ —এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা ?" এই জন্যই তিনি শশী কবিকে উদ্দেশ করে বলেছেন,

"তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী, রাজনীতির চেয়ে তুমি বড়, একথা ভুলো না। তোমার পরিচয়েই তো জাতির সত্যিকারের পরিচয়। তোমায় ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে ? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতার সমস্যার মীমাংসা হবেই—এর দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য

পাবে না, কিন্তু তোমার কাজের মূল্যনিরূপণ করবে কে? তুমিই তো দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন ভাবধারাকে মালার মত গেঁথে।"

সব্যসাচীর এই উক্তির মধ্যে শুধু তাঁরই নয়, আমরা বিপ্লবী শরৎচন্দ্রেরও রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার একটি স্পষ্টতর পরিচয় পাই। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়—শরৎচন্দ্র স্বাধীনতার জন্য অহিংস না সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই নিহিত আছে। দেশ-প্রেমিক শরৎচন্দ্র দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য মত ও পথের গোঁড়ামি বর্জন করে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সহিংস ও অহিংস দুই রকমের আন্দোলনকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় 'পথের দাবী'তে তিনি সব্যসাচী ও ভারতীর মত দুইটি বিপরীতমুখী আদর্শকে একান্ত কাছাকাছি সহাবস্থান করিয়ে উভয়েরই প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। মোটের উপর, সামাজিক বা রাজনৈতিক যে কোন পট-ভূমিতেই তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করুন না কেন—স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মঙ্গল-চিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেন নি। বিদেশী শাসক ও শোষক এবং স্বদেশী স্বার্থপর, লোভী ও অত্যাচারী শক্তিমানদের বিরুদ্ধে তীনি সর্বদা কলম চালিয়েছেন। আমাদের দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো, ধন-তান্ত্রিক সমাজে বণ্টনব্যবস্থার অসাম্য, দেশী ও বিদেশী শোষকদের অবিরাম বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ও তাদের আকাশপ্রমাণ লোভ ও লালসার শিকার দেশের সাধারণ মানুষের মনে হতাশা ও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী কর্মোৎসাহ বা উদ্দীপনার অভাব—এ সবই শরৎচন্দ্রের বুকে যে অসহ্য জ্বালা তার প্রতিফলন দেখতে পাই সমগ্রভাবে শরৎমানসে তথা শরৎসাহিত্যে। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁর কাছে ছিল একটি পবিত্র কর্তব্য। যে চেতনার অভাবে নিপীড়িত মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, সেই চেতনার সৃষ্টি করাই ছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মূল কথা।

শরৎচন্দ্রের নাটক : উপন্যাসপাঠের স্মৃতি

ড. বিষ্ণু বসু

শরৎচন্দ্র সাকুল্যে তিনখানি নাটক লিখেছিলেন।[১] তিনটি নাটকই আগে লেখা নিজেরই উপন্যাসের নাট্যরূপ। কাজেই এদের ঠিক মৌলিক নাটক বলা যায় না। অর্থাৎ, সরাসরি লেখা নাটক একখানিও নয়। কাজেই প্রশ্ন জাগতে পারে, শরৎচন্দ্র একখানাও মৌলিক নাটক লেখার প্রেরণা পেলেন না কেন? অন্যভাবেও প্রশ্নটি হাজির করা যেতে পারে—কেন তিনি শুধু আগে লেখা উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দিতে উৎসাহী হলেন?

অবশ্য উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানোর ব্যাপারটি আমাদের দেশে অপরিচিত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব বিখ্যাত উপন্যাসই একসময় নাট্যরূপ লাভ করে বাঙালী দর্শককে প্রীত করেছিল। এখনও করে। মঞ্চের অধ্যক্ষরা এতে পয়সাও পেয়েছেন অনেক। সেই উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দেন নি। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত নাট্যকার ও অভিনেতারাই সাধারণত সে ভার নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' প্রায় নাট্যরূপ দেওয়াই ছিল, তাকে 'চিরকুমার সভা'তে প্রতিষ্ঠিত করতে লেখককে বেশি বেগ পেতে হয়নি। উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরে শরৎচন্দ্র কোন্ কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং কতটা সাফল্যলাভ করেছেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার।

আরেকটি কথাও মনে রাখা দরকার। শরৎচন্দ্রের নাটক কিন্তু এখন আর বিশেষ অভিনীত হতে দেখি না। শিশিরকুমার ভাদুড়ী যতদিন বেঁচে ছিলেন 'ষোড়শী' মাঝে মাঝে অভিনীত হত। এখন আর কোনো অভিনেতা বা মঞ্চের মালিক তা নিয়মিত প্রযোজনায় আগ্রহী হন না। অবশ্য মধুসূদন-গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদও আধুনিক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় নন। মধুসূদনের প্রহসন দুটিকে উৎপল দত্ত জীবিত করলেও কৃষ্ণকুমারী বেঁচে

---

[১] ষোড়শী : [প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৪, ইং ১৩ অগস্ট ১৯২৭] দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ।

রমা : [প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৫, ইং ৪ঠা অগস্ট ১৯২৮] পল্লীসমাজ উপন্যাসের নাট্যরূপ।

বিজয়া : [প্রকাশকাল—পৌষ ১৩৪১, ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৪] দত্তা উপন্যাসের নাট্যরূপ।

ওঠে না। রবীন্দ্রনাটককেও সেকালের মতো একালেও শ্রদ্ধাভরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। শরৎচন্দ্রের নাটকের প্রতি আধুনিক কালের উদাসীনতাকেও হয়তো একই মাপকাঠিতে বিচার করা চলে। তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদ শরৎচন্দ্রের মতো 'জীবিত' লেখক নন। ছাত্র আর গবেষক ছাড়া তাঁদের লেখা পড়ে আর কজন? রবীন্দ্রনাথ বরাবরই লোকপ্রিয়, লোকরঞ্জক নন। তাঁকে নিয়ে আমরা যতটা বিহ্বল, তাঁর লেখা আমাদের কাছে ততটাই দুরধিগম্য। তিনি নিজের সম্মানের মহিমায় নিত্যনির্বাসিত। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। তাঁর রচনা এখনো জনপ্রিয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো ভয়ানকভাবে 'জীবিত'। শরৎকাহিনী নিয়ে সিনেমা হলে বক্স অফিস হিট করবেই। 'ষোড়শী', 'বিজয়া' 'রমা'ও হয়তো বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আজও সমান আদরণীয় হতে পারে। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের অন্যান্য গল্প বা উপন্যাস সম্পর্কেও সে কথা বলা যায় না। তাই আলাদা করে 'ষোড়শী', 'বিজয়া' বা 'রমা' শরৎপ্রতিভার কোন্ বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করেছে, এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোলা যেতে পারে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সাধারণত বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ল্যাসিক উপেক্ষিত হয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের নাটক তিনটির প্রতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উপেক্ষা কি তাদের ক্ল্যাসিক বলে প্রমাণ করে?

'ষোড়শী' সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে।" শরৎচন্দ্র নিজে অবশ্য একবার একখানি চিঠিতে জানিয়েছিলেন 'আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা।' নিজের সম্পর্কে এ মন্তব্য তিনি করেছিলেন 'ষোড়শী' ও 'রমা' লেখার অনেক পরে। ইতিমধ্যে কিন্তু দুটো নাটকই দারুণ জনপ্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জীবানন্দ বা রমেশ তখনই প্রায় কিংবদন্তী। কাজেই শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্যকে বিনয় বলে ধরা যেতে পারে। বিশেষত সেই একই চিঠিতে তিনি আবার জানিয়েছেন নাটক তিনি লিখতে পারেন। এবং এ প্রসঙ্গে নাটক লিখতে গেলে কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নাট্যকারের আধিপত্য প্রয়োজন তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। সেসব উপাদান তিনি যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষম, একথাও জানিয়েছেন। এখানে শরৎচন্দ্র-নির্দেশিত উপাদানগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. "নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না, সেই ডায়লগ লেখার অভ্যাস আমার আছে।"

২. "নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্রসৃষ্টির জন্যেই।"

৩. “চরিত্রসৃষ্টি দুরকমের হতে পারে :—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র পাত্রী যা, ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনে পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দের দিকেও যেতে পারে।”

৪. “উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই। নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না।”

অর্থাৎ, চরিত্রসৃষ্টি, সিচুয়েশান ও ডায়ালোগ : এ তিনটি উপাদানকে সঠিক-ভাবে কাজে লাগানোর উপর নাটক লেখার ক্ষমতা নির্ভর করে বলে শরৎচন্দ্র মনে করেন। কথাগুলো এমন কিছু অভিনব নয়, এবং এ উপাদানগুলো উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ করা চলে।

আসলে, ভালো নাটককে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে মাপা যায় না। সারা পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে—তা সে ধ্রুপদী বা আধুনিক হোক না কেন—নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। বিভিন্ন দেশের ও কালের নাটকের রচনাপদ্ধতি, জাতি ও স্বাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রসিকের কাছে তারা সমান আবেদন নিয়ে হাজির হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, শরৎচন্দ্রের সবগুলো নাটকই উপন্যাসের পরিবর্তিত রূপ। নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন—“যাঁহারা ‘দেনা-পাওনা’ এবং ‘ষোড়শী’ মিলাইয়া পড়িবেন তাঁহারা সহজেই দেখিতে পাইবেন, একমাত্র অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ ছাড়া নাট্যরচয়িতাকে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই।” সাধারণভাবে দেখতে গেলে কথাটা ভুল নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গঠন-রীতি নাট্যানুগ। এ রীতি অবশ্য বাঙলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সার্থক-ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখার সময় সমকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাসের গঠনরীতিকে অনুসরণ করেন নি। সেকালের পাশ্চাত্য, বিশেষত ইংরেজী, উপন্যাসের আকার হতো বৃহৎ এবং চাল হতো মন্থর। বঙ্কিমচন্দ্রের তা পছন্দ হয়নি। বরং তিনি গঠনরীতির জন্য আদর্শ মেনেছিলেন শেক্সপীয়রকে। সেই তীব্র ঘটনাবর্ত, অসাধারণ প্যাশন ও গতির আরোহ-অবরোহ বঙ্কিমের উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তাঁর উপন্যাসের পটভূমি বিশাল হলেও আয়তন কখনোই বৃহৎ হয়নি। সেজন্যেই বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর নাট্যরূপ দিতে বাংলা থিয়েটারের নাট্য-কারেরা বিশেষ অসুবিধে বোধ করেন নি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস জাতে পৃথক

হলেও রীতির দিক দিয়ে মোটামুটি বঙ্কিমকে মেনে চলেছে। . অবশ্য বঙ্কিম-উপন্যাসের দ্রুত ঘটনাবর্ত ও তীব্র প্যাশন শরৎচন্দ্র আয়ত্ত করতে পারেন নি। সম্ভবত প্রয়োজনও হয়নি।

এতে কিন্তু ক্ষতি হয়েছে নাটকের। উপন্যাসের ঘটনা ও সিচুয়েশন নাটকে বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। অথচ তাতে তীব্র আবেগ ও গতিবেগ না থাকায় তা অনেক সময় বর্ণহীন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, আরেকটি কথাও মনে রাখা দরকার। উপন্যাস পড়ার জন্য লেখা হয়। আর নাটক লেখা হয় অভিনয়ের জন্য। তাই ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারকে কম্যুনিকেট করতে হয় দুটো পৃথক শ্রেণীর মানুষকে। কাজেই তাদের প্রকাশভঙ্গী আলাদা হতে বাধ্য। পড়তে ভালো লাগে—এমন বহু বিষয় চোখের সামনে এলে আবেদন জাগায় না, বরং অনেক সময় বিরক্তির সঞ্চার করে। তাছাড়া, নাটক ও উপন্যাসের undertone এক নয়। ঔপন্যাসিকদের 'most precious asset, a tone of voice—often subtle and ironical, implying an intimate relationship with the reader—hardly carries in the booming vastness of the auditorium।

'দত্তা' শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসের মধ্যে সেরা। সমাজসমস্যা, গ্রাম্যজীবন বা ধর্মীয় বাদানুবাদ এ উপন্যাসে নরেন-বিজয়ার হৃদয়গত সম্পর্কের পটভূমিতে প্রধান হয়ে ওঠেনি। দুটি হৃদয় পরস্পরকে ভালোবেসেছে, আশা-নিরাশার টানাপোড়েনে তাদের জীবন আন্দোলিত হয়েছে, লেখক সাবলীল বর্ণনায় তাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে 'দত্তা' 'বিজয়া'য় পরিণত হলো, নাট্যকার তার tone of voice-কে বিনষ্ট করলেন। ঘটনা বা সিচুয়েশন হয়তো প্রায় একই রইলো। অথচ উপন্যাসের elasticityকে দমন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সম্ভাব্য বিশ্লেষণকে বর্জন করলেন। তাই নরেনের প্রতি বিজয়ার মনোভাবের পরিবর্তনের যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রায় সময়েই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অবহিত হয়ে লেখক যখন আবার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন তা নিতান্ত জোলো হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, শরৎচন্দ্র যেন ভেবেই নিয়েছিলেন, যাঁরা নাটকটি দেখবেন উপন্যাসটি তাঁদের ভালো করে পড়া থাকবেই। তাই নাটক লিখতে গেলে সিচুয়েশন ও সমস্যাকে অনেক সময় পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দরকার—এমন কথা শরৎচন্দ্র ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা করেন নি। 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন'—এদের উৎস এক হলেও দৃষ্টিকোণ পৃথক।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। তাঁর উপন্যাসগুলোতে সাধারণভাবে বাস্তবতার দুটো স্তর থাকে। প্রথম স্তরকে আমরা বহির্বাস্তবতা (outer reality) বলতে পারি ; দ্বিতীয় স্তরকে বলা যায় অন্তর্বাস্তবতা (inner reality)। এই উভয় বাস্তবতা উপন্যাসে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বহির্বাস্তবতা-চিত্রণে শরৎচন্দ্র নিপুণ। এই স্তরে থাকে সামাজিক রীতিনীতি, অন্যায় অবিচার, ধর্মীয় অন্ধতা প্রভৃতি বিষয়। আর মানবিক সম্পর্ক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অর্থাৎ যা থেকে লেখকের জীবনদৃষ্টির গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্যকে চিনে নেওয়া যায়, সে সকল বিষয়কে দ্বিতীয় স্তর বা অন্তর্বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। যে উপন্যাসগুলোতে শরৎচন্দ্র বাস্তবতার এ উভয় স্তরকে মেলাতে পেরেছেন, রচনা হিসেবে সেগুলোকে তুলনামূলকভাবে সার্থক বলা চলে। 'দত্তা', 'বামুনের মেয়ে', 'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্প বা উপন্যাস এ হিসেবে উৎকর্ষের দাবি করতে পারে।

'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা' এবং আরো অনেক গল্প-উপন্যাসে বাস্তবতার এ দুটো স্তর নিঃশেষে মিশে যায় নি। 'পল্লীসমাজে'র কথাই ধরা যাক। গ্রাম্যসমাজের অন্ধতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, দলাদলি এ উপন্যাসে আঁকা হয়েছে নিপুণভাবে। ধর্মদাস, দীননাথ, আকবর, এমন কি ভৈরব আচার্যিও এখানে জীবন্ত ভূমিকা পেয়েছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে রমেশ-রমার সম্পর্ক এবং জ্যেঠাইমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা হয়ে উঠেছে বর্ণহীন ও অবাস্তব। পল্লীসমাজের বৈশিষ্ট্যকে যদি এ উপন্যাসে আমাদের প্রস্তাবিত প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে রমেশ-রমা বা জ্যেঠাইমাকে দ্বিতীয় স্তরে রাখা যেতে পারে। উপন্যাসে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরটি সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কিংবা হয়তো বলা যায়, প্রথম স্তরটির দিকে শরৎচন্দ্র মনোযোগ দিয়েছেন অধিক (উপন্যাসটির নামকরণেও এ ইঙ্গিত ধরা পড়েছে।) কিন্তু নাটকে প্রথম স্তরটি হয়েছে অবহেলিত। ফলে পল্লীসমাজের চিত্র নাটকে হয়েছে অসংলগ্ন। অথচ দুর্বল দ্বিতীয় স্তরটি নাটকে প্রাধান্য পাওয়ায় 'রমা' নাটকটি উপন্যাসের মতো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। 'পল্লীসমাজ'কে কেটে-ছেঁটে 'রমা'র শরীরে পরানো হয়েছে বটে, কিন্তু তা যথার্থ মাপমতো হয় নি।

'ষোড়শী' সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে বাস্তবতায় প্রথম স্তরটি দ্বিতীয় স্তরের তুলনায় এমনিতেই নিষ্প্রভ করে রাখা হয়েছে। পল্লীসমাজ ও ভৈরবী প্রথার আনুষঙ্গিক এখানেও আছে বটে, কিন্তু উপন্যাস কিছু এগুবার পরেই তা নিতান্তই পটভূমিতে

পর্যবসিত হয়েছে। অলকা-জীবানন্দ ও নির্মল-হৈম তাদের হৃদয়গত সমস্যা নিয়ে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। বিশেষত, একদা বিবাহিত বর্তমানে বাধ্যতা-মূলক সন্ন্যাসী-জীবনে অভ্যস্ত ভৈরবী ষোড়শীর জীবনে সামাজিক প্রেম কতটা দুর্নিবার হতে পারে, তার পরিমাপ করতে চেয়েছেন লেখক। থীম হিসেবে এটি এমন কিছু অভিনব নয়। বিশেষত শরৎসাহিত্যে বিবাহিত স্ত্রীকে অনিবার্যভাবে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর কাছে ফিরে আসতে হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম অভয়া। কিন্তু ঘটনা বা সিচুয়েশনের যে ব্যাখ্যা উপন্যাসে আছে অথবা চরিত্র-সৃষ্টির বিকাশরীতিকে যেভাবে 'দেনাপাওনা'য় অনুসরণ করা হয়েছে নাটকে সে বিষয়গুলো আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ফলে সমস্যাটি আর বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য থাকে নি। "যে ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলি নে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়।"—'ষোড়শী' নাটক প্রসঙ্গে এ সমালোচনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। 'ষোড়শী' নাটক রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা শরৎচন্দ্রকে খুশী করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আরো জানিয়েছিলেন, "ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটিই যখন সত্য ভাবে মেলে তখন চরিত্র সৃষ্টি খাঁটি হয়। এবং ষোড়শী যে ভেতরে বাইরে মিলে সত্য হতে পারে নি, এ অভিযোগও তিনি করেছিলেন।

ষোড়শীর ভৈরবী থেকে নারীতে রূপান্তর দেখাতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। এ রূপান্তরে নির্মল-হৈমের গার্হস্থ্য প্রেম মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল; তার বিশ্লেষণ 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ মনে রেখেও বলা যায়, এ বিশ্লেষণে ফাঁক কম। কিন্তু নাটকে এ বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাব্যতায় স্থাপিত হয় নি। নাটকে হৈমর সঙ্গে ষোড়শীর প্রথম দেখা হয়েছে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে। সেখানে সমাজপতিদের অপমান থেকে ষোড়শীকে বাঁচাতে চেয়েছে হৈম। অবশ্য ষোড়শী হৈমর আন্তরিকতাকে তখন বিশেষ মূল্য দেয় নি। কেন হৈমর ছেলের কল্যাণকামনায় পুজো করতে সে অক্ষম, অন্তত হৈমকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনও সে মনে করে নি। অতঃপর তাদের দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। এ দৃশ্যের নির্মল-হৈমের দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য দেখে ষোড়শী স্বগতোক্তি করেছে: হৈম, তুমি যেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে গেলে বোন। উপন্যাসেও ষোড়শীর এ ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিলো, কিন্তু সেখানে

লেখকের বর্ণনা ও ষোড়শীর আত্মচিন্তন মিলে দিয়ে একটি সুমিত ব্যঞ্জনা লাভ করেছিলো। নাটকে কিছু উপন্যাসের মতো কাঙ্ক্ষিত ফলশ্রুতি আসে নি। এখানে যেন দুটি বয়স্ক নারী একটি পুরুষকে সামনে রেখে প্রগল্ভ আত্মকথনে মেতেছে। স্বামী, শিশু ও সংসার নিয়ে হৈমর উচ্ছ্বাস প্রায় যুক্তিহীনতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। শরৎচন্দ্রের পুরুষরা সাধারণত অসহায় হয়ে থাকে—"বাইরের দিকে যিনি যত বড়, যত দুর্দাম, যত শক্তিমান, ভেতরের দিকে তিনি তেমনি অক্ষম, তেমনি দুর্বল, তেমনি অপটু" (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)। এই অক্ষমতা ও দুর্বলতার পটভূমিতে নরেন বিজয়ার প্রেম লাভ করেছে, বিজয় অনুরাধাকে পেয়েছে এবং ঊষা ও শৈলেশের মিলন হয়েছে। হৈমর এ উচ্ছ্বাসের জবাব ষোড়শীও শান্তভাবে দিতে পারে নি। সে বলেছে—"তোমার কথাটা আমি বুঝেছি হৈম। এ যেন তোমার আনন্দের মধুচক্র। ভার যতই বাড়ছে ততই এর অন্ত্র-রন্ধ্র মধুতে ভরে ভরে উঠছে" (দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য) কথাগুলোতে স্বাভাবিকতার সুর বাজে নি। বিশেষত নাটকের সংলাপ অলঙ্কার-মুখ্য হয়ে উঠতে গেলে প্রেক্ষাপটে যে সুতীব্র প্যাশনের প্রয়োজন হয়, এখানে তা নেই। এখানে ষোড়শী নিজে কথা বলে নি, তাকে দিয়ে কথাগুলো বলানো হয়েছে। তাছাড়া নাটকে হৈমর অবস্থিতি যে কত কৃত্রিম, তা প্রমাণ হয় নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে তার সংযোগের পরিমাপ দিয়ে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ষোড়শীর সঙ্গে হৈমর ঘরোয়া জীবনের আলাপ হয়েছে, হৈম অলকার সুপ্ত সংসারকামনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। অলকা যতই ভৈরবী-জীবন যাপন করে দেবীমহিমায় নির্বাসিত হোক, অন্তরে সে যে বাঙালী রমণী—একথা এখানেই স্পষ্টভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর ষোড়শীর জীবনে হৈমর আর প্রয়োজন হয় নি। উভয়ের মধ্যে নাটক চলাকালীন আরো দীর্ঘ-তর সময়ে একবারও দেখা হয় নি। হৈম যে ষোড়শীর জীবন থেকে চলে গেছে তাই নয়, নাটক থেকেই সে প্রস্থান করেছে। নাটকে হৈমর আসা-যাওয়া শুধুমাত্র লেখকের প্রয়োজনেই ঘটেছে, নাট্যক্রিয়ায় স্বাঙ্গীকৃত হয়ে অনিবার্য ও বাস্তব হয়ে ওঠে নি। ফলে উভয়ের হার্দ্য আলাপকেও প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে।

নাটক লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে উপন্যাসগুলোর আনুগত্য মেনে নিয়েছেন। উপন্যাসের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ঘটনাগুলোকে দৃশ্য ও সংলাপে সাজিয়ে দিয়েছেন। নাটক যে শুধুমাত্র ডায়ালোগ, সিচুয়েশন ও চরিত্রসৃষ্টির সমাহার নয়, তাকে মেনে চলতে হয় আরো কিছু অনিবার্য নিয়ম, শরৎচন্দ্র সম্ভবত তা ভাবেন নি। চরিত্রবিকাশের inner reality-র স্তর-

গুলো খণ্ডিত হলে নাটক বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বিশেষত শরৎচন্দ্রের নাটকগুলো যেখানে চরিত্রমুখ্য।

এ কারণেই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপের তুলনায় 'বিজয়া', 'রমা' বা 'ষোড়শী' এমন কিছু স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে এখনো কম নয়। এই গল্প-উপন্যাসপাঠের স্মৃতির অনুষঙ্গ নিয়ে বাঙালী দর্শক শরৎকাহিনীর নাট্যরূপ দেখতে যায়। নাটকে কিছু ন্যূনতা ঘটলেও স্মৃতি থেকে তার পরিপূরণ করে নেওয়া হয়। ফলে নাটক হিসেবে কেমন, সে বিচার থাকে অবগুণ্ঠিত। তাই 'পরিণীতা', 'পথের দাবী' বা অন্য কোনো কাহিনীর নাট্যরূপ 'ষোড়শী', 'রমা' বা 'বিজয়া' থেকে কম আলোড়ন সৃষ্টি করে না।

অবশ্য দেনাপাওনার নাট্যরূপ 'ষোড়শী'র শেষ দৃশ্যে জীবনানন্দের মৃত্যু হয়েছে। উপন্যাসটি কিন্তু বিয়োগান্ত নয়। নাটকটি বিয়োগান্ত হবার জন্য শিশিরকুমারের অবদান রয়েছে। শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ষোড়শী'র উপসংহার উপন্যাসের অনুরূপ করেছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমারের অনুরোধে তাকে বিয়োগান্ত করেন।

বরং সরল মাধুর্য : 'দত্তা' ও 'পরিণীতা'

জ্যোৎস্না গুপ্ত

শরৎচন্দ্রের দুখানি মধুর-রসের উপন্যাস পরিণীতা এবং দত্তা। পরিণীতা প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালে এবং দত্তা ১৯১৮ সালে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রধান তিনটি বিভাগ—

(১) নিষ্কৃতি, রামের সুমতি -জাতীয় নিছক পারিবারিক ঘটনাভিত্তিক।

(২) গৃহদাহ, চরিত্রহীন -জাতীয় জটিল প্রেমসমস্যাভিত্তিক।

(৩) চন্দ্রনাথ, পরিণীতা দত্তার মত সুখান্ত উপন্যাস।

প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রমণীর মাতৃহৃদয়ের মহৎ বৃত্তিকে গ্রহণ করেছেন। মেজদিদি, বিন্দু, নারায়ণী—এরা উপন্যাসে উপস্থিত শিশুচরিত্রগুলির গর্ভধারিণী নয়, অথচ এদের সকলেরই সন্তানস্নেহ তীব্র একাগ্রভাবে বর্ষিত হয়েছে। সম্পর্কের এই তির্যকতাই এদের অভিনবত্ব এবং উপভোগ্যতার অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে জটিল সমাজ-বিদ্রোহী প্রেম। শরৎচন্দ্র এইজাতীয় প্রেমচিত্রাঙ্কণে উৎসাহ বোধ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং হৃদয়স্বাতন্ত্র্যঘটিত কিছু সংঘর্ষ দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন লেখক। এগুলি প্রায়ই বেদনাগর্ভ, এবং কখনও কখনও নিরাসক্তিকে স্পর্শ করেছে। এইজাতীয় উপন্যাসগুলিতেই শরৎচন্দ্রের লেখকসত্তা সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত। তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে—বিশেষ করে পরিণীতা এবং দত্তাতে—লেখক সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা গ্রহণ করেছেন। এই দুখানি বইতেই সহজ-শোভন প্রেমের কথা বলা হয়েছে। এ প্রেম সমাজকে বিব্রত ও বিরক্ত করেনি। উপযুক্ত পুরুষ এবং কুমারী কন্যার বিবাহ-পূর্ব স্নিগ্ধ প্রণয়কাহিনী দত্তা এবং পরিণীতার অবলম্বন।

পরিণীতাতে শেখর এবং ললিতার প্রণয়পথের অন্তরে অথবা বাইরে কোনখানেই কোন বাধাসৃষ্টির সুযোগ ছিল না। শেখরের জননীর স্নেহ-ধন্যা ললিতা। নিজের ব্যবহারে যোগ্যতায় সে বাড়িতে ললিতার যদৃচ্ছ অধিকার ছিল। অনাবিল এবং রোমান্টিক সুখপ্রদ কাহিনীটিতে আস্বাদ সঞ্চারিত হয়েছে মাত্র গিরীনের উপস্থিতিতে। ত্রিভুজ প্রেমসমস্যার কোন সুযোগ তৈরি হয়নি। ললিতা প্রথমাবধি শেখর সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। শেখরের ভুল-বোঝাই কাহিনীর সুখপ্রবাহে ক্ষণকালের জন্য বক্ররেখা সৃষ্টি করেছে।

দত্তা ঠিক এতখানি সহজ গতির নয়। সেখানে প্রথম থেকেই প্রবল প্রতিপক্ষ রূপে রাসবিহারী এবং তার ছেলে বিলাসবিহারী উপস্থিত। মানসিকতার দিক থেকেও ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে বিজয়া অনেকখানি একাত্ম। নরেনের সঙ্গে মিলনে বিজয়াকে কয়েকটি শক্ত বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে।

পরিণীতা এবং দত্তা দুখানিই হালকা অনুভূতির ; মিলনান্ত কাহিনী দুটির অনেক কিছু একে অন্যাকে স্পর্শ করেছে। দুখানি উপন্যাসেই নায়িকার প্রেমিক হিন্দুধর্মস্থিত এবং প্রতিপক্ষ ব্রাহ্ম। গিরীন এবং রাসবিহারী ব্রাহ্ম। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে কোন গোঁড়া শত্রু-মনোভাব পোষণ করতেন না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তুষ্ট ছিলেন না বলেই মনে হয়। তাঁর শিল্পিসুলভ নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানত পরিণীতাতে গিরীনের মতো সৎস্বভাবের ব্রাহ্মের চরিত্রাঙ্কণের মধ্যে। সে স্পষ্টতই পরোপকারী সজ্জন। ললিতার প্রেমে বঞ্চিত হয়েও সে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়নি, বরং ললিতার ছোট বোনকে বিবাহ করে নিকট আত্মীয় হিসেবে তাদের সংসারে সাহায্য করেছে যথাপূর্বম্। ললিতার সঙ্গে বিয়ে বা না-বিয়েতে তার ব্যবহারে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

দত্তার রাসবিহারী অবশ্যই মন্দস্বভাবাপন্ন। তার কাছে ধর্ম বিষয়টি নেহাতই গৌণ, তদপেক্ষা অনেক অর্থপ্রদ বিজয়ার পিতার সম্পত্তি অধিকার। প্রয়োজনে ধর্মবোধকে সংকুচিত করতে তার দ্বিধা নেই। আবার এই উপন্যাসেই আচার্য দয়ালবাবু ব্রাহ্ম এবং প্রকৃত সুনীতিপরায়ণ। বলতে গেলে তিনিই কাহিনীর বিপত্তারণ।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ শরৎচন্দ্রের ছিল না। তাঁর জীবনযাত্রায় বোহেমিয়ানিজমের স্পর্শ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের রক্ষণশীলতাকে সরাসরি ভাঙতে পারেন নি, তার প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন উপন্যাসে। বরং হিন্দুসমাজের প্রতি আক্রমণোদ্যত কোন শক্তিকে তিনি পছন্দ করেন নি। শররৎচন্দ্র সেকালীন হিন্দুধর্ম-পোষক 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণীর' নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতার অন্যতম একটি কারণ এটিও হতে পারে। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে তিনি পল্লীসমাজ, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে ইত্যাদিতে যেমন হিন্দু সংস্কার ও গোঁড়ামি, তেমনি দত্তা এবং পরিণীতাতে (অংশতঃ গৃহদাহতে) ব্রাহ্মসমাজকে পটভূমিতে রেখে সে সম্বন্ধে কিছু সুনির্দিষ্ট মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসগুলিতে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কটাক্ষও যেমন আছে তেমনই আবার লেখক বিজয়া ও অচলার মত স্ত্রীচরিত্রনির্মাণে ব্রাহ্মধর্মের আলোকবর্তিকার সমীপ। বিজয়ার মত সপ্রতিভ

বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা এবং মার্জিতা বঙ্গনারী শরৎচন্দ্রের লেখায় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েই মাত্র সত্য হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি লেখক আদ্যন্ত মনোযোগী। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, এই দুটি উপন্যাসের একটিতে নায়িকা ললিতা দরিদ্র এবং নায়ক শেখর ধনী। যদিও এই লাইনে কোন সমস্যাই তৈরি হয়নি। ললিতা অনায়াসে শেখরের টাকা ব্যবহার করেছে, তার জন্যে দুতরফের কোথাও কোন প্রশ্ন ওঠেনি। অধিকারবোধ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্য উপন্যাসটিতে নরেন্দ্র দরিদ্র এবং বিজয়া অগাধধনশালিনী। কিন্তু প্রথম থেকেই. নরেন প্রায় সবরকম পার্থিব সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন। দারিদ্র্য তো সমস্যা নয়ই। মাইক্রোস্কোপ বিক্রির ব্যাপারটিও আসলে বিজয়া-নরেনের প্রণয় বিকাশের সুমিষ্ট উপকরণ। নরেনের টাকার দরকারের চেয়ে উপন্যাসক্ষেত্রে তা আরও জরুরী কাজে লেগেছে। নরেনের অর্থাভাব অনুভব করার সময়ই পাঠক পাননি। সে অল্প সময়ের মধ্যেই বারবার ভাল চাকরি পেয়ে গেছে। দারিদ্র্য এই দুটি উপন্যাসে প্রতিবন্ধক তো নয়ই, বরং এই কোমল অংশটির মধ্য দিয়ে অপর পক্ষের ভালবাসার প্রবেশপথ সুগম হয়েছে।

দত্তা ও পরিণীতা দুইটি উপন্যাসে লেখক প্রেমে প্রতিপক্ষ উপস্থিত করেছেন। শরৎচন্দ্র গৃহদাহ ব্যতীত প্রায় কোন গ্রন্থেই প্রতিপক্ষ হাজির করেন নি। সমাজ, এবং কোন কোন জায়গায় ধর্মই প্রেমের বিরোধী শক্তি। পরিণীতা এবং দত্তাতে প্রত্যক্ষভাবে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজ ও ধর্ম অপেক্ষা ব্যক্তিমানুষ আরও অনেক বেশি জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে, লেখককে অধিকতর ঘোরপ্যাঁচে জড়িয়ে পড়তে হয়—চরিত্রগুলি নতুন মাত্রা পায়। অবশ্য লেখক এই ত্রিমাত্রিক জটিলতাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কমেডির মায়াজালে সব সমস্যাই অনায়াসে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। পরিণীতাতে গিরীনের প্রথম ভাল-লাগা নিবিড় প্রেমানুভবে পৌঁছুবার আগেই ললিতা সেজদিদিতে পরিণত হয়েছে। মনের দিক থেকেও কারো কোন সমস্যা থাকেনি। কারণ, ললিতা প্রথমাবধি গিরীন সম্পর্কে নিরাসক্ত। শেখর সম্বন্ধে তার চিন্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন রাজলক্ষ্মীর বঁইচির মালা তার সমস্ত জীবনব্যাপী জটিলতার কারণ হয়েছে, ললিতারও তেমনি ছেলে-মানুষির মালা-বদল নিছক ছেলেমানুষিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং শেখরের তরফ থেকেই পরবর্তীকালে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য পুরুষ-চরিত্রের মত শেখরও অন্যমনস্ক থেকেছে। অবশ্য একজন মেয়ে তার সহজাতসংস্কারবশে এই ঘটনাকে যতখানি গুরুত্ব দেয় একজন পুরুষের পক্ষে

তা সম্ভব নয়। শেখর ললিতাকে ভালবাসে কিন্তু ললিতার মত এত দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারেনি, তাই তার মনে ঈর্ষা জাগাবার দরকার ছিল। এবং সেই প্রসঙ্গেই কাহিনীতে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত। কিন্তু শেখরকে বোঝানোর পর এই তৃতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে লেখক আর কোন দায় বোধ করেননি। কমেডির সরল রেখায় লেখক অনায়াসে জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

দত্তাতে তৃতীয় ব্যক্তি বিলাসবিহারী অনেক বেশী বলশালী। তার বাবা রাসবিহারীর প্রভাব পিতৃমাতৃহারা বিজয়ার উপর অনেক দূর বিস্তারিত ছিল। প্রথমত ধর্মমতের মিল, দ্বিতীয়ত নিঃসঙ্গ অবস্থার। অভিভাবক রাসবিহারীর পুত্রকে বিবাহ না করার কোন কারণই ছিল না। নরেনের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং প্রেম-অনুভবের পূর্ব পর্যন্ত বিজয়ার মনে দ্বিতীয় কোন বাসনাই জাগে নি। নরেনের প্রতি বিজয়ার প্রেমই পাঠককে বিলাসবিহারীর প্রতি বিরূপ করে। তখন থেকে কাহিনীতে বিলাসবিহারী তৃতীয় পক্ষ এবং আচরণে কতকটা ভিলেন। বিজয়ার মনোভাবও এখানে পরিণীতার ললিতা অপেক্ষা খানিকটা জটিল। বিজয়া সর্বপ্রকারেই রাসবিহারী-অধিগত। নরেনের প্রতি আকর্ষণও তাকে সেখান থেকে সহজে সরিয়ে আনতে পারছে না। তার পক্ষে এদের অতিক্রম করা অনেক অসুবিধের। শেষ পর্যন্ত বিজয়াকে পিতার শেষ ইচ্ছা এবং চিঠির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। অবশ্য এখানেও প্রণয়-ক্ষেত্রে কোন মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত নয়। বিলাসবিহারীকে বিজয়া মেনে নিয়েছিল। হৃদয়গত দুর্বলতার কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠে নি। অতএব নরেনের প্রতি প্রণয়-ভাবনাতেও তার মনের দিক থেকে কোন সমস্যা তৈরি হয়নি। বাধা যা তা নিতান্তই বহিরঙ্গ। বিজয়ার তরফ থেকে নরেনের প্রতি প্রেম সরল ও একমুখী। বরং বিলাসবিহারীই অনেক দূর প্রতিদ্বন্দ্বী। সে আদ্যন্ত বিজয়াকে ভালবেসেছে। এইখানেই গিরীন-চরিত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য। গিরীনের প্রেম প্রাথমিক স্তর অতিক্রমের সুযোগ পায়নি। সেখান থেকে তার চিত্তবৃত্তি অনায়াসে মোড় ফিরেছে শ্রদ্ধা-আত্মীয়তার দিকে। এদিকে বিলাসবিহারীর পক্ষে একই সঙ্গে রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভের বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করা ততদূর সহজসাধ্য হচ্ছে না। বিলাসবিহারী আবার চাতুর্যে পুরোপুরি পিতার মত নয়। সে সরল, একান্ত সাধারণ মানুষ। তার ঈর্ষাবোধও নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে। বিজয়ার প্রতি তার আকর্ষণ, এমন কি সম্পত্তিপ্রাপ্তির লোভকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার ঈর্ষাজাত রূঢ় আচরণ অনেক সময় পাঠকের কাছে উৎকট বোধ হয়, কিন্তু তা অবশ্যই স্বাভাবিক। নরেন-বিজয়ার প্রেমের জগতে লেখক

তাকে অসহায়ভাবে ভিলেনরূপে ঠেলে দিয়েছেন, এবং কতকটা অযথাই হাস্যকর চরিত্র বানিয়েছেন। এর জন্য দায়ী কমেডির সহজ মীমাংসার সরল-পন্থার প্রতি লেখকের ঝোঁক।

নলিনী নিতান্তই বিজয়ার মনকূটের সৃষ্টি। উপন্যাসে তার ক্ষণকালের উপস্থিতি বিজয়ার প্রেমকে দৃঢ় করা এবং পরিণতির পথ প্রশস্ত করার জন্য। নরেন- নলিনীর সম্পর্ক বিজয়ার মানস-রচনা, নরেনের সঙ্গে তার মিলনে এই সামান্য ঈর্ষার দহন আর একটু স্বাদ বাড়িয়েছে।

পরিণীতার সামাজিক পটভূমিতে রয়েছে কলকাতা শহর এবং দত্তাতে গ্রাম। আসলে ললিতারা বা বিজয়ারা তৎকালীন শিক্ষিত মার্জিত পরিবারের প্রতিনিধি। বিজয়া ব্রাহ্মধর্ম পরিবেশে যতখানি আলোকপ্রাপ্তা ললিতা ততখানি হয়তো নয়, কিন্তু মনের দিক থেকে দু কাহিনীর নায়ক-নায়িকারাই যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন। অবশ্য তুলনায় তৎকালীন সমাজেও বিলাতফেরত ডাক্তার নরেন, শেখর অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্টিসম্পন্ন বটে। লেখকও যত্নসহকারে এই মার্জনার অনুসরণ করেছেন। পরিণীতার কাহিনী-নায়ক-নায়িকা দারিদ্র্য, হিন্দুত্ব ধর্মপরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে দুটি পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। অন্যত্র দত্তাতে শহরের লোক গ্রামে গিয়েছে, কিন্তু গ্রামের পরিবেশ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং গ্রামপ্রকৃতির একটি সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপট সমস্ত সময় কাহিনীকে অধিকার করে রেখেছে।

পরিণীতা এবং দত্তা দুটিই বৃত্তাকার একমুখী গল্প রচনা করেছে। নায়ক-নায়িকা-কেন্দ্রিক সমস্যা এবং সমস্যা-সমাধান এর লক্ষ্য। মূল চরিত্রগুলি ছাড়া অপ্রধান সব চরিত্রই প্রায় অনুগামী হয়ে থেকেছে। কোন উপকাহিনী গড়ার দিকেও লেখকের ঝোঁক নেই। নিবিষ্ট চিত্তে পাঠক শুধু মিষ্টিমধুর প্রণয় ঘটনা অনুসরণ করবে—দুটি উপন্যাসেই লেখকের ইচ্ছা বোধ হয় এই।

শরৎচন্দ্রের রচনার ঘরোয়া স্বাদ বাঙালী পাঠকের বড় প্রিয়। বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের মনটি যে ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিচারে এক জায়গায় একটি বিশেষ সুরে বাঁধা, এই বড় সত্যটি লেখক বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সার্থক আঘাত এইখানে। সেবাপরায়ণতায় বাঙালী মেয়ের প্রায় সহজাত অধিকার। বলতে গেলে এইখানেই তার অস্তিত্ব। শরৎচন্দ্রের সর্বপ্রকার উপন্যাসেই বাঙালী মেয়ের এই ঘরনীর পরিচয়। এমন কি শরৎ-চন্দ্র এই প্রবণতা তাঁর প্রয়োজনমত উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। যেমন দত্তায় নরেনের মত অন্যমনস্ক পুরুষকে কাছে বসিয়ে খাইয়ে বিজয়া তৃপ্তি পেল, এবং সেই তুষ্টিই ক্রমে মমত্ব থেকে প্রণয়ে পৌঁছে দেবার সিঁড়ির

কাজ করেছে। ললিতা তো বাল্যকাল থেকে শেখরের বাড়িতে সেবার অধিকার নিয়েই প্রবেশ করেছে, এবং শেখর ও শেখর-জননীর স্নেহ-ভালবাসা জয় করে নিয়েছে। বিজয়া ধনী, উচ্চশিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা; আবার ললিতা দরিদ্র সাধারণ শিক্ষিতা; অথচ দুজনেই প্রিয়জনের প্রতি সমানভাবে সেবা-পরায়ণ। অবশ্য একে প্রেমের ফাঁদ মনে করাও ভুল, কারণ এদের কল্যাণী চিন্তা কেবল প্রেমিকের দিকেই ধাবিত নয়। ললিতা তার মামাবাবু প্রভৃতি সমস্ত পরিজন এবং বিজয়াও দয়ালবাবু পর্যন্ত সকলের জন্যই সমানভাবে যত্ন আদর বিলিয়েছে।

লেখা দুটি সুখপাঠ্য সহজবোধ্য। কিন্তু প্রায় কয়েকবারই মনে হয়েছে লেখক যেন জোর করে চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশপথ বন্ধ রাখছেন। নরেনকে অদ্ভুত উপায়ে বহুগুণসম্পন্ন এবং খুব বেশি শক্তিমান নায়কের গুণে ভূষিত করার জন্যই যেন একধারে নরেনকে উঁচুদরের ডাক্তার, জীবাণুবিজ্ঞানী, কৃষিবিদ্ এবং চিত্রশিল্পী হবার সুযোগ দিয়েছেন লেখক; তার লোহার মত আঙুলের শক্তি দেখানো যেন বিজয়ার প্রেম উৎপাদনের জন্যই। নাহলে আর কোথাও তার দৈহিক শক্তির বাড়াবাড়ির পরিচয় পাই না, তার দরকারও হয় না। পরিণীতার অনেক ঘটনাই এত সহজে মীমাংসিত, যেন গল্প মেলানোর জন্যই।

পরিণীতা এবং দত্তাতেও কতকটা প্রেমের গল্প বলা হয়েছে, কিন্তু প্রেম-প্রবৃত্তির কোন তীব্র পরিচয় নেই। পরিণীতাতে শেখর তো সহজাত বৃত্তির মত ললিতার প্রেমকে মেনে নিয়েছে। প্রেমের বাধা তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে মাত্র—গল্পকার এগিয়ে এসে মীমাংসা করেছেন। ললিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে শেখরের তরফ থেকে ঘটনা কতদূর এগোতো বলা শক্ত। নরেনের প্রতি বিজয়ার প্রেম ছিল, কিন্তু শুধুই প্রেমের জন্য নয়; লেখক জানিয়ে দিলেন পিতার প্রতিশ্রুতির কথা, অর্থাৎ গল্প মিলিয়ে দেবার আর-একটি পথ খুলে গেল, নিছক প্রেমানুভূতির তীব্র তাড়নার অপেক্ষা করতে হোল না।

অনেক অনেক জটিল, তির্যক প্রেমকাহিনীর পাশে লেখকের এই দুটি উপন্যাসকে হাল্‌কাচালের বোধ হয়। মনে হয় লেখক ধর্ম বনাম প্রেম, সামাজিক রক্ষণশীলতা বনাম প্রেম, ত্রিভুজসমস্যা-তাড়িত প্রেমকে অত্যন্ত সরল পদ্ধতিতে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। আবার অনেক অনেক কষ্টকল্পিত যন্ত্রণামুখর দীর্ঘশ্বাসের পাশে এ দুটি যেন স্বস্তির মুহূর্ত। সুখপ্রদ পরিণতিতে, রোমাণ্টিক অথচ জীবনমুখী প্রেমের স্বচ্ছন্দ আস্বাদে পাঠককে স্মিত হাস্য উপহার দেয়। যদি মহাকাল তাঁর জটিল মনস্তাত্ত্বিক রচনাগুলি স্থায়ী নাও করে, উপভোগ্য মধুর প্রণয়কাহিনী দত্তা ও পরিণীতাকে অনেক কালই বাঁচিয়ে রাখবে।

‘শেষপ্রশ্ন’-এর প্রশ্ন

ড. অরবিন্দ পোদ্দার

‘শেষ প্রশ্ন’-এর প্রশ্নের চমক আজ আর কিছু নেই, তা খুবই পুরাতন; আর এ নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক বহুকাল নীরব। সেজন্য, ঐ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আলোচনার অবতারণা হওয়া অ-সময়োচিত বলে বিবেচিত হতে পারে। আমি তথাপি একেই আমার নিবন্ধের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করেছি একারণে যে, ঐ প্রশ্নের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যদি কোন সত্য থেকে থাকে তো শরৎচন্দ্র তার কি তাৎপর্য গ্রহণে সম্মত ছিলেন, এবং সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপান্তরে ঐতিহ্যের দাবি কতখানি গ্রাহ্য, এই জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণের জন্য।

কিন্তু সেজন্য প্রারম্ভেই আলোচনার সীমানা চিহ্নিত করা সংগত। আমার বিশ্বাস, ‘শেষপ্রশ্নে’ বহুবিধ জিজ্ঞাসা ও সমস্যাকে তিন-চারটি মৌল জিজ্ঞাসার কেন্দ্রীভূত করা যায়। যথা—(ক) সামাজিক মূল্য এবং সত্যের স্বরূপ কী? কমলের কথায়, “অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসছে বলেই আমি মেনে নিইনে।”—এর ইঙ্গিত, যে মন মেনে নেয়, সে মন মৃত বা বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত। “বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন! অতীতই তার সর্বস্ব।” প্রশ্ন, মানুষ কি শুধুই তার অতীতের সংস্কার নিয়ে অচল, অবক্ষয়ের মধ্যেই সৃষ্টির সম্ভাবনাহীন অস্তিত্বের গ্লানি বহন করে একদা নিশ্চিহ্ন হবে?

(খ) আত্মপরিচয়ের যে বিশিষ্টতা জাতীয় আত্মম্ভরিতার জনক, পরিবর্তিত জাগতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার মূল্য এবং গুরুত্ব কতটুকু? কমলের বক্তব্য, “কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসছে বলেই সে ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই।” “ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে তো কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?” পুনশ্চ, “পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে। কিন্তু তার কল্যাণে যা পড়বে না আমি নিশ্চয় বলতে পারি।”

(গ) প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সহজাত প্রেরণা, হৃদয়বৃত্তি অথবা তার দেহজ-

উৎস কতটা অনুষ্ঠাননির্ভর, অথবা সামাজিক বিধি-নিষেধের শাসনে তাকে কতখানি বাঁধা সম্ভব ? কমলের উক্তি, "একদিন যাকে ভালবেসেছ কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই। মনের এই অচল অনড়, জড় ধর্ম সুস্থও নয়—সুন্দরও নয়।" "একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত আবদ্ধ হয়ে আসে—তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না।" "সংসারেও অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহও একটা ঘটনা, তার বেশী নয় ;—ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে ট্রাজিডি।" "তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় সে আত্মহত্যা করে মরে।"

(ঘ) ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় মুক্তির স্বরূপ এবং তাৎপর্য কী ? কমল সম্পর্কে নীলিমার মন্তব্য : "এ কেউ কাউকে দিতে পারে না—দেনাপাওনার বস্তুই এ নয় ; কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে।" আশুবাবু, "আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়। ওর আশা যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয় ; মুক্তি অদৃষ্টবাদের স্বীকৃতিতে নেই, আছে সম্মুখের পথে দুঃসাহসিক যাত্রায়।"

বলা বাহুল্য, এইসব প্রশ্ন এবং আক্রমণের লক্ষ্য হলো, ভারতীয় সমাজ-মানস, যা কালপ্রবাহের সূত্রগুলো আত্মস্থ করতে পারেনি, এবং পারেনি বলেই সে প্রাণধর্মিতায় প্রবল এবং বোধের ব্যাপ্তিতে উজ্জ্বল সাড়া দিতে পারছে না। সেই সমাজমানসের শক্তি ও দুর্বলতা, সংস্কার ও পরমার্থ ইত্যাদি উপন্যাসে আশুবাবুর চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে ; আর, তার ছোট্ট সংসারটি এবং নির্ভরতার স্তম্ভগুলো হৃদয়বৃত্তির অপরিচিত বিক্ষেপে ধসে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সম্ভবত সমাজ-মানসের আয়ুর ক্ষীণতার আভাস দেওয়া হয়েছে। আর পাশ্চাত্যী-করণের অনুকূলে কমলের যুক্তি-তর্ককে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'শেষপ্রশ্নে'ই যে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলো সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে তা নয়। এই উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩১ ; এর পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'পথের দাবী'তে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপিত ও বিতর্কিত হয়েছে। তারও আগে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে জাতীয় অহমিকাকে

আক্রমণে বিদ্ধ করেছেন, এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা যে বিশ্বমানবচিত্তের উপযুক্ত সাড়া নয়, আবেগপূর্ণ ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। সংবেদনশীল চিত্তের এই বিক্ষোভ এই ইঙ্গিতই বহন করে যে, ঐতিহ্য ও সংস্কার বনাম সমাজরূপান্তর—এই সমস্যাটি যুগমানসকে বিশেষভাবে সঞ্চালিত করেছিল। 'শেষপ্রশ্নে' তা উচ্চারিত হয়েছে উপলব্ধির প্রখরতায়, বুদ্ধির অসামান্য দীপ্তিতে এবং আক্রমণের প্রচণ্ডতায়।

কিন্তু, এই আক্রমণের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়গত সংকেত অনুধাবন করার জন্য সর্বাগ্রে আক্রমণকারীকেই জানার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, আগ্রার ক্ষুদ্র প্রবাসী বাঙালী সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে একজন বিধবা যুবতী নারী, কমল। সে ইংরেজ পিতা এবং ভারতীয় মাতার সন্তান, কিন্তু সামাজিক আইনসিদ্ধ বিবাহের প্রসূন নয়। কমলের সামাজিক অধিষ্ঠান নিরূপণের সময় শরৎচন্দ্র কতটা কালসচেতন ছিলেন বলা কঠিন, কিন্তু কমল আশ্চর্য সততায় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিভূরূপে নিজেকে উন্মোচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে বুদ্ধিজীবী দলের আবির্ভাব, মানসবৈশিষ্ট্যের বিচারে, তাদেরও পিতা ইংল্যাণ্ড, জননী ভারতবর্ষ। কমল তাদের সগোত্র।

দ্বিতীয়ত, ইংল্যাণ্ডের ভারতবিজয় এবং পরিণামে সাংস্কৃতিক সংঘাত, তার মর্মবাণীটিও কমল আত্মস্থ করেছে পূর্ণ মাত্রায়। ইংরেজের কণ্ঠকে আশ্রয় করে ইউরোপের প্রেয়োবাদী সংস্কৃতি, যা ইন্দ্রিয়সংবেদ্যতার মধ্যেই জীবনের পরমার্থ অন্বেষণ করে এসেছে, ভারতের অধ্যাত্মবাদী মননকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। প্রেয়োবাদ ঐহিক সম্ভোগের গরজে ইউরোপকে সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল; আর ভারতবর্ষ বস্তুসম্পর্কের প্রত্যক্ষ ভুবন থেকে মনকে সরিয়ে এনে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সন্ধানে ছিল ব্যাপৃত। এই দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির সংঘাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিমানস অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যক্ষবাদী জীবনদর্শনকেই জীবনসর্বস্বরূপে গ্রহণ করে। উপস্থিত প্রাপ্তিটাই বড়, অনিশ্চিত স্বর্গ নয়—ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরাও পিতৃত্বের অধিকারে ঐ ইন্দ্রিয়সংবেদ্যতার রস আকণ্ঠ পান করেছে। কমলও তাই; পিতৃত্ব এবং শিক্ষা উভয় সূত্রেই সে ইওরোপের সন্তান। সেজন্য, তার কণ্ঠ থেকে অপরূপ শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হয়, "যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে ফলে, শোভায় সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি।"

তৃতীয়ত, কমল ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত সম্পর্কহীন, অনন্বিত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদেরও এই একই সাধারণদৃষ্ট চরিত্রবৈশিষ্ট্য। শিক্ষায় দীক্ষায়, আদর্শের অনুধ্যানে, ব্যক্তিক সংস্কৃতিতে তারা বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কহীন, অনন্বিত। অনন্বয় সংবেদনশীল চিত্তে যেমন আত্মোপলব্ধির ক্রন্দন সঞ্চারে সক্ষম, তেমনি, অপরপক্ষে, লক্ষ্যবস্তুকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার শক্তিরও এর অভাব নেই। যেমন অভাব নেই কমলের। সেই শক্তিতেই কমল পাশ্চাত্ত্য কালের প্রবক্তা।

৩

সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই কমল ভারতীয় সমাজের সংস্কার, তার মূল্য-বোধ, ঐতিহ্য ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছে। এর উপযোগিতা আজ নিঃশেষিত ; এর প্রাণ নেই। সুতরাং সভ্যতাও নেই। এই উপলব্ধিকে প্রাথমিক সোপান হিসেবে গ্রহণ করে যুক্তিপরম্পরার যে কাঠামো সে সৃষ্টি করেছে তার সংকেত হলো, আধুনিক কালের বিশ্বব্যবস্থায় সব দেশেরই মানুষ অনিবার্য গতিতে এক বিশ্বজনীনতার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এ এমন এক বিশ্ব-জনীন সত্তা যা দেশের সীমা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে একই নীল আকাশের নিচে সকলকে একাকার করে দেবে। এই সম্ভাবনা, কমলের ধারণায় দুর্বার ; এবং দুর্বার বলেই একে নমস্কার জানিয়ে কমল দেশের ঐতিহ্যকে অস্বীকারের আহ্বান জানিয়েছে। বলেছে, ভারতীয় হিসেবে পরিচয় যদি ঘোচেই, বিশ্বমানুষ হিসেবে বৃহত্তর পরিচয় তো রইলোই। কমলের আহ্বানের মধ্যে আত্যন্তিকতার এবং অবশ্যম্ভাবিতার ছাপ সুস্পষ্ট।

এই আহ্বানে শরৎচন্দ্রের সমর্থন আছে কি নেই, সে জিজ্ঞাসা আপাতত মুলতুবি রেখে সাংস্কৃতিক রূপান্তরে ঐতিহ্যের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে ঈষৎ আলোচনা করা যাক। ঐতিহ্যের সংজ্ঞানিরূপণের স্থান এ নয় ; তবে, একথা স্বীকার্য যে আধুনিক কালের মানুষের নিকট ঐতিহ্যের অভিধা অনেক ব্যাপক ও গভীর। বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আশ্রিত বলে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার যে গৌরব ঐতিহ্যের বেগবান দিক, তার অধিকার তো মানুষের বংশানুক্রমিক। এছাড়াও আছে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টিসম্ভার, তার ঐতিহ্যের সঞ্চয়, শ্রেয়ের ধ্যান, বিভেদজয়ী ঐক্যের সাধনা। এই সাধনায় স্থানিক বিশেষত্ব ততটা স্বীকার্য নয়, যতটা স্বীকার্য বিশ্ববিহারের সত্যতা এবং মানবিক অভিজ্ঞানের সৌন্দর্য। অর্থাৎ ঐতিহ্যের বোধে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার চেতনার সঙ্গে বিশ্ব-মানবিক উত্তরাধিকারের চেতনা সম্পৃক্ত।

কিন্তু বিকাশের অসমতার দরুন ঐ সাধনায় সব দেশ বা সব জাতির অবদান ঐশ্বর্যের গুরুত্বে এক বা সমান নয় ; বিশেষত, ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নটি জড়িত বলে একটি পরাধীন দেশের মানুষের বোধ থেকে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের নিকট ঐতিহ্যের বোধ—সেই ঐতিহ্য যদি তার বেগ-বান সত্তা হারিয়েও ফেলে থাকে—আনে সংগ্রামের প্রেরণা, যেমন 'শেষপ্রশ্ন' রচনাকালীন ভারতবর্ষেও এনেছিল। সেই বোধে আশ্রিত থেকে আক্রমণ-কারীকেও অনায়াসেই প্রত্যাক্রমণ করা যেতে পারত। ইওরোপে 'প্রেয়োবাদ কমলের কণ্ঠ আশ্রয় করে যখন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণে বিদ্ধ করেছিল, তখন পালটা এই প্রশ্ন উচ্চারণ করা যেত—ইওরোপীয় বিশ্বদর্শনকেই সর্বমানবিক আদর্শ বলে স্বীকৃতি দানের দাবি কেন, যেখানে জানি ইউরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন জ্বালাবার জন্য ? (ঋণস্বীকার—রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু, আশুবাবু অবিনাশবাবুরা ঐতিহ্যের অবক্ষয়ী প্রভাবে সংকুচিত ছিলেন ; তাই, প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি।

ঐতিহ্যকে একটি প্রবাহরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। প্রবাহে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক, আর সেই ক্লান্তিলগ্নে প্রবাহ গতি রুদ্ধও হয়। বহিরাক্রমণ বা বহু-রাষ্ট্রিক সংযোগ, বিশ্বমানবিক ঐতিহ্যের অধিকার দান করে, পুনরায় গতি-শীলতা অথবা রূপান্তরের পথ উন্মুক্ত করে। এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই নতুন অধিকারের মাধ্যম কিন্তু বুদ্ধিজীবীর দল। সেজন্য দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বোধ এবং অনন্বিত বুদ্ধিজীবীদের বোধ এক নয়, হওয়া বোধ করি সম্ভবও নয়। কারণ, হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হতে থাকা একটি সমাজের পুরাতত্ত্বের বৃত্ত, প্রতীক মূল্যবোধ শ্রেয়ের আশ্রয় ইত্যাদি থেকে জনমানসকে বিচ্যুত করা এক অবাস্তব অভাবনীয় প্রস্তাব। সম্ভবত সেজন্য সহস্র বছর ধরে সামাজিক মনোভূমি কর্ষণ করার প্রয়োজন হবে। তাই, জনসমষ্টি ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগের সম্পর্কে সম্পর্কিত, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যুগপৎ সংযোগ ও বিয়োগের সম্পর্কে। সংযোগ তাদের জন্মগত ; আর বিয়োগের সম্পর্কে অর্জিত মূল্যবোধ ও বিশ্বমানবিক সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে এ বিষয়ে জনমানসকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলে তারা ঐতিহ্যে গতিশীলতা অর্থাৎ রূপান্তরের জন্য জমিকর্ষণ করে। যেমন করেছিলেন, বিগত শতাব্দীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের ক্ষেত্রে ঐক্য-বিরোধের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা সৃষ্টির পথ দেখিয়েছে। কিন্তু সম্পর্কটা যেখানে শুধুই অস্বীকারের, শুধুই বিয়োগের,—যেমন কমলের ক্ষেত্রে—সেখানে সৃষ্টির

মন ও পথ দুইই অবরুদ্ধ। কমল তাই ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ স্বদেশ-পলাতক বুদ্ধিজীবীর দল; তেমনি ব্যর্থ ও নির্লিপ্ত ইওরোপীয় প্রেয়োবাদে আশ্রিত উচ্চকোটির ভারতীয়রা।

সত্য অর্থে, ঐতিহ্য স্থিতিশীল বা কালাতীত সত্তা নয়, তা রূপান্তরশীল; মানুষের বাস্তব জীবনের রূপান্তরধর্মিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। রূপান্তরের পথে অগ্রসর হতে হতে পারস্পরিক আত্মী-করণের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ একদিন নিজনিজ ভৌগোলিক ও সংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করে মিলিত হবে;—এই ভবিষ্যৎ-বাণীর সঙ্গেও বিবাদের কোন হেতু নেই। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ হয়তো একে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু উদার জাতীয়তাবাদ তো এই শতাব্দীর গোড়াতেই জাতীয়তাবাদকে বিশ্ব-জাতীয়তাবাদের ঔদার্য ও বিশালতা দান করেছে। মহামিলনের সেই লগ্নটি কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের গহ্বরে নিহিত, এই মুহূর্তে তা অনুমান করা কঠিন। তবে এটা নিশ্চিত যে, বর্তমান অস্তিত্বশীল বিশ্বসংস্থাগুলোর বিবিধ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তার আবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রশস্ততর হচ্ছে। কিন্তু এহ বাহ্য। প্রশ্ন, সেই শুভদিনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষ কি উপঢৌকন নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে? সে কি বিশিষ্টতাহীন সাদৃশ্য, না বিশিষ্টতাযুক্ত সহমর্মিতা? যদি সাদৃশ্যটাই মুখ্য হয়, তাহলে তার নবসৃষ্টির সম্ভাবনাহীন ক্লীবত্ব মানব-গোষ্ঠীকে অবক্ষয়ের পথেই নিয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে সেদিন প্রত্যেক জাতিই আপন ঐতিহ্যের সৃষ্টিসম্ভার দিয়েই বিশ্বের মানবিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে, পাশ্চাত্যীকরণের প্রবক্তা কমল যাই বলুক না কেন। কারণ, এ তো পরীক্ষিত সত্য, মানুষ আপন সৃষ্টির ঐশ্বর্য দিয়েই অপরকে আকর্ষণ করে; অনুকরণজনিত সাদৃশ্যে সৃষ্টি নেই, আকর্ষণও না।

মানুষের হৃদয়বৃত্তি কতটা অনুষ্ঠাননির্ভর, প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ আছে কি নেই, একনিষ্ঠতা অথবা নিষ্ঠার অভাব, সেই সম্পর্কে কী আবর্তের সৃষ্টি করে, ইত্যাদি সমস্যার অব-তারণা শরৎ-সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু কমল সেই সমস্যাগুলোর বিচারে গুরুত্ব আরোপ করেছে দুটি বিষয়ের উপর: (১) ব্যক্তিমানসে সুখপ্রবণতা এবং তা চরিতার্থ করার আত্যন্তিক বাসনা, এবং (২) হৃদয়বৃত্তিকে তার স্বনিয়মে, এর উৎস, অভিব্যক্তি, এবং সার্থকতার নিয়মে বিচারের দাবি।

প্রথমেই স্বীকার্য, নর-নারীর প্রেম অতিশয় জটিল; এবং জটিল বলেই একে কোন সূত্রে আবদ্ধ করা সুকঠিন;—অসম্ভব। আর এও স্বীকার্য, মানুষের মন যেহেতু আত্মগত বিশ্বের বাইরে থেকে, অর্থাৎ যেসব উপাদান নিয়ে তার প্রতিবেশের সৃষ্টি, তা থেকে প্রেরণা আহরণ করে রসিয়ে ওঠে, সেইহেতু তার রসিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও অনন্ত। সেজন্য কমলের দাবি—একদা কাউকে ভালবেসেছি বলে আর কখনও আর কাউকে ভালবাসতে পারব না, মনের এই জড়ধর্ম সুস্থ নয়—এর সঙ্গে বিবাদ অচল। অধিকন্তু, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক সুখান্বেষণের দাবিতে আধুনিক মানুষ এতই সোচ্চার, সেই ব্যক্তির মানসবৈশিষ্ট্যকে মর্যাদাদানের প্রশ্নেও অসঙ্গত কিছু নেই'। কিন্তু এপ্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় যে, একান্তভাবে স্বাধীন, অন্য-নিরপেক্ষ, পরম অর্থে স্বতন্ত্র ব্যক্তি অস্তিত্বহীন; তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, মানবিক বিশ্বে তার অধিষ্ঠান বলেই মানুষমাত্রই যুগপৎ সামাজিক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। তা ছাড়া বৃহত্তর অর্থে, মানুষের প্রেমসম্পর্কও সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। কোন একজন মানুষের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার অর্থই একটি বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের অঙ্গীভূত হওয়া। সেজন্যই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে নর-নারীর প্রেমসম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠানগত প্রথা, বিধিনিষেধের অনুশাসন, দায়িত্বের বোঝা,—ইত্যাদির প্রবর্তন হয়েছে। সামাজিক সম্পর্ককে যুগপৎ সৃষ্টিশীল ও স্থিতিশীল, এবং ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্যই এইসব আচরণবিধি এবং নৈতিক মান-দণ্ডের সৃষ্টি। অর্থাৎ সমাজ তার নিজস্ব মূল্যবোধ এবং নৈতিক দৃষ্টিমার্গই মানুষের প্রেমসম্পর্কের উপর আরোপ করেছে, করে আসছে।

আর সেজন্যই ব্যক্তিক কামনা-বাসনার সঙ্গে কোন একসময়ে ঐসব মূল্য-বোধের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ, নৈতিক মানদণ্ডের সীমা পূর্ব-নির্ধারিত ও স্থিতিশীল; কিন্তু মানুষ রূপান্তরশীল সত্তা বলেই তার রূপান্তরের সম্ভাবনাও সীমাহীন। সুতরাং, বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ দুজন মানুষের পক্ষে অন্যের আকর্ষণের প্রেরণায় নতুনভাবে রসিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও সর্বথা-স্বীকার্য। আর, এই রসিয়ে-ওঠা ব্যক্তিসত্তা যদি প্রেরণার বস্তুকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠার পথে হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতা কামনা করে, তাহলে পূর্বতন বিবাহসম্পর্ক অচল হয়ে পড়ে। এই জটিলতার সমাধান কী? মনের এই সৃষ্টিশীল সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা কি স্বীকার্য, না অবদমনীয়? কমল তার যুক্তিবাদী মননের শাণিত-বাণ এবং ব্যক্তিগত আচরণ—উভয়ত এর যৌক্তিকতা

প্রমাণ করেছে। তাই শিবনাথের মানসিক বিচলন প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে মুক্তি দিয়েছে; এবং স্বয়ং, পরিবর্তিত পরিবেশে অজিতকে কেন্দ্র করে রসিয়ে উঠেছে। গ্রন্থশেষে উভয়ে প্রেম-সমৃদ্ধ মিলিত জীবন যাপনের দরুন আগ্রা ত্যাগ করেছে, আনুষ্ঠানিক বিবাহসম্পর্কে আবদ্ধ হয়নি। অন্যত্র, বিতর্কের সময়, সে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করেছে—প্রাণহীন প্রেমহীন বিবাহ-সম্পর্ক থেকে ইওরোপীয় নারীরা যেভাবে বিচ্ছেদের পথে মুক্তি অর্জন করেছে এবং নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হচ্ছে, ভারতীয় মহিলারাও যদি সে পথ অনুসরণ করে তাহলে তার থেকে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারে না।

যুক্তিবিচার ও মানবিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কমলের বক্তব্য এবং আচরণের বিরুদ্ধতার কোন যুক্তিসিদ্ধ হেতু নেই। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে প্রশ্ন অনেক। নব-উন্মেষিত প্রেমসম্পর্ক যদি পূর্বতন বিবাহসম্পর্ক অস্বীকার করতে চায়, তাহলে বিবাহসম্পর্কজাত সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? প্রেমসম্পর্কের মধ্যে নব-নব ভাবে উজ্জীবিত হওয়ার বিশ্বজনীন সম্ভাবনার পটভূমিতে সামাজিক সম্পর্কের স্থিতি-শীলতা অথবা সামাজিক সংহতির রক্ষাকবচ কোথায়? যে সমাজসংগঠনে আমাদের অধিষ্ঠান এবং অদূর ভবিষ্যতের যে সমাজসংগঠনের চিত্র আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়, তা নারীপুরুষের প্রেমসম্পর্কের সার্বভৌমত্ব কতটা স্বীকার করবে? প্রতিটি মানবসন্তান যদি আপন আপন প্রেমসম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থাপন করার দাবিতে সোচ্চার হয়, তাহলে মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ কতটা নিশ্চিত? আনুষ্ঠানিক বিবাহসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা কি নিঃশেষিত? প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক কি দায়হীন?

৪

'শেষ-প্রশ্ন'-এর প্রশ্নটিকে অবলম্বন করে এত সব জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। মানব-অভিজ্ঞতার শেষ কথা আজও উচ্চারিত হয় নি, কোন দিনই উচ্চারিত হবে না। সেইজন্য, একথা কোনক্রমেই স্বীকার্য নয় যে, ভারত-ইতিহাসের বা ইওরোপীয় ইতিহাসের বা চৈনিক ইতিহাসের কোন এক স্তরে উচ্চারিত বাণী সেই সেই দেশের জাতীয় জীবনসাধনার চরম ও পরম বাণী। প্রতিটি রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ঐতিহ্যের সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর। যে বিশ্বজনীন ঐক্য ও একীকরণের পথে আধুনিক বিশ্ব দ্রুত ধাবমান, সেই ঐক্য সংসাধিত হওয়ার পর মানবসমাজ সম্ভবত নতুনভাবে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবে। আর, অধুনা

পাশ্চাত্য ভুবনে যে সহনশীল আজ্ঞাপ্রদায়ী (পারমিসিভ) সমাজ আবির্ভূত হয়েছে, তা-ই যদি বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে, তা হলে ভাবিকালের সমাজ হয়তো বিবাহসম্পর্ককে সৃষ্টিশীল অথবা প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বলেই গণ্য করবে না। আনুভূতিক সম্পর্কের দিক থেকে সেকালের সমাজসংগঠন হবে অভিনব। আজকের মন আর চোখ দিয়ে সে সমাজকে চেনা দুষ্কর।

কিন্তু মানবিক ইতিহাস-বিবর্তনের বর্তমান স্তর পর্যন্ত যে প্রেয়সের বোধে মানুষের উত্তরাধিকার, তার বিচারে কমল-অজিত সম্পর্ক নৈরাজ্যবাদী ; কেননা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এর স্বীকৃতি অনুপস্থিত। এই সম্পর্ক বিস্ফোরণের বারুদে ভরা, ব্যক্তিক স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণপ্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি ; কিন্তু সাংস্কৃতিক রূপান্তরে তাদের ভূমিকার সৃষ্টিশীলতা সন্দেহজনক। লক্ষণীয় যে, কমল বা অজিত কেউই দেশের আর্থনীতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সৃষ্টিশীল সম্পর্কে সংযুক্ত নয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, কমল সমাজের সঙ্গে অনন্বিত ; শুধু জন্মগত বিশিষ্টতার দরুন নয়, শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণেও। অজিতও তাই। পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকার তাকে উচ্চকোটির এমন এক অংশে সংস্থাপিত করেছে, যারা অনুপার্জিত অর্থ সম্ভোগ করে। সুতরাং সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তব কর্মসম্পর্ক বা সৃষ্টিশীলতা থেকে তারা বহুদূরে অবস্থিত। আরো লক্ষণীয় যে, কোন সংগ্রামী ঐতিহ্য তারা বরণ করে নেয় নি, নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের কোন আন্দোলনে অথবা সংগঠিত ক্রিয়াকাণ্ডের অংশীদার তারা নয়। তাদের একক এবং যুগ্ম অভিজ্ঞতার ভুবন সে জন্যই অতিশয় ক্ষুদ্র, এবং ঐ ক্ষুদ্র পরিসরে স্বাধীনতা ও মুক্তির অনুভব, প্রখর এবং ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও, অনুর্বর। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবেই একথা ঘোষণা করা চলে, তাদের পক্ষে নতুন সৃষ্টিশীল বা গভীর সামাজিক-সংকেতবহ জীবনদর্শনের পথিকৃৎ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

প্রসঙ্গত এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্র স্বয়ং পূর্ব-আলোচিত প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে দিয়েছেন, বা আদৌ দিয়েছেন কি না। পাশ্চাত্ত্যীকরণের অনুকূলে কমলের যে সুতীক্ষ্ণ যুক্তিসওয়াল তার সপক্ষে শরৎচন্দ্রের সায় বা সমর্থন আছে কি ? উপন্যাসে কমল অপর সকলকে যুক্তিতর্কের এবং ব্যবহারিক আচরণের সাহসিক বলিষ্ঠতায় বিধ্বস্ত করে অজিতের সঙ্গে চলে গেল। তার অসামান্য বিজয়ে কমলের প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্বের ধারণা পাঠকচিত্তে জাগ্রত হওয়া সম্ভব (রাজেনের সঙ্গে বিতর্কে কমলের নিষ্প্রভ পরিচয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন গৌণ অধ্যায় বলেই তেমন গুরুত্ববহ নয়)। কিন্তু এবংবিধ ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যীকরণের

সমস্যাটিকে তাঁর আপন শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে চিত্রিত করেছেন এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি কী তার আভাস দিয়েছেন। কিন্তু অভিমত ব্যক্ত করেন নি, প্রশ্নের উত্তরও দেন নি। সে উত্তর তিনি দিয়েছেন 'শেষপ্রশ্ন'-এ নয়, 'বিপ্রদাস'-এ। 'বিপ্রদাস'-এ তিনি বন্দনাকে রক্ষণশীল মুখুজ্যে পরিবারের ঐতিহ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। মানসবৈশিষ্ট্যে পাশ্চাত্ত্যের সন্তান বন্দনার হিন্দু সমাজের সনাতন মূল্যবোধের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভঙ্গি যেমন নতুন ভাবে পুনর্লিখিত হয়েছে তেমনি এর মাধ্যমে এ ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন যে ঐতিহ্যের প্রাণধর্মিতা এখনও নিঃশেষিত হয় নি ; তা বর্তমান কালেও সজীব এবং সম্ভাবনাময়।

অন্যভাবে ব্যক্ত করলে বলা যায়, বন্দনাকে তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বিত করেছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে কমলের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ বিয়োগের, বন্দনার পরিপূর্ণ সংযোগের, আত্মসমর্পণের। বিশুদ্ধ সংযোগের সম্পর্ক শুধু দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের সচেতনতা জাগায় ; যা আছে, চলে আসছে, তাকেই বাঁচিয়ে রাখার গরজে উদ্‌বুদ্ধ করে। ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের এই সম্পর্ক আদর্শ বা সৃষ্টিশীল সম্পর্ক নয়। বিশুদ্ধ বিয়োগের সম্পর্কও সত্য সম্পর্ক নয়। পূর্বে যুগপৎ সংযোগ-বিয়োগের যে সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, ব্যক্তি-মানসের সেই মনোভঙ্গিই সৃষ্টিশীল ; তাই রূপান্তরের জমি কর্ষণ করে সার্থকভাবে।

শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল কিনা

সুধীর বেরা

শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল ছিলেন কিনা এই নিয়ে এখন এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক দেখা যায়। তাদের একাংশের মতে, শরৎচন্দ্র আধুনিক ছিলেন না। তিনি মধ্যযুগের সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ঠিকই : কিন্তু এই সমাজ ভেঙে যে নতুন সমাজের অভ্যুদয় হবে, তার হদিসই রাখতেন না। তাঁদের মতে, বর্তমান যুগে শরৎচন্দ্র প্রায় অচল হয়ে পড়েছেন এবং এখনকার প্রগতিশীলতার মাপকাঠিতে তাঁকে প্রগতিশীল বলা চলে না। প্রকাশভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু—সবদিক থেকেই শরৎচন্দ্র আগের যুগের। বর্তমান যুগের সমস্যা ও জটিলতা তাঁর লেখায় যেমন নেই, প্রকাশভঙ্গীও তাঁর গতানুগতিক ধারায়ই চলে এসেছে।

সবিনয়ে বলি, কোন লেখক প্রগতিশীল কি প্রগতিশীল নয়, সেই বিচারের একটা মাপকাঠি ঠিক করা উচিত। নতুবা বিচার করা যাবে না, কোন লেখা প্রগতিশীল কিনা। প্রগতিশীলতার একটা standard ঠিক করা দুরূহ। কেননা প্রগতিশীলতার ধারণাটা আপেক্ষিক। আজকের দিনে যাকে প্রগতিশীল বলা হচ্ছে, আগামীকালে তাকেই হয়তো প্রথার শিকল বলে ভাঙতে হবে। বিপরীত সত্যও মনে রাখতে হবে। আজ যা সহজ, শরৎচন্দ্রের কালে তা অনেক কঠিন, অনেক দুঃসাহসিক ছিল।

মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের যথাযথ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মানবসভ্যতার একটি মূল সুর ও সুনির্দিষ্ট গতি আছে। ইতিহাসের পথ ধরে পরিক্রমা শুরু করলে তা মনে না হয়ে উপায় নেই। মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের সেই মূল সুর হচ্ছে মানবমুক্তি—ক্ষুধা থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তি, শাসন থেকে মুক্তি, শোষণ থেকে মুক্তি। সেই সুদূর অতীতে যেদিন মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখলো এবং সভ্যতার সোপানে প্রথম পদার্পণ করলো তার থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মানুষ মুক্তির চেষ্টায় রত আছে। অবশ্য সেই মুক্তিই আবার যুদ্ধ-মারামারিরও কারণ হয়েছে। যখন সেই মানবমুক্তিকে বৃহৎ মানব-ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষুদ্র করে খণ্ড করে স্বার্থান্ধতায় পর্যবসিত করা হয়েছে, তখনই হয়েছে মারামারি, লেগেছে যুদ্ধ, কিন্তু তাতেও মানবসভ্যতা ও ইতিহাস এই মূল পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। সাক্ষী আমাদের ইতিহাস।

উদাহরণস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথাই ধরা যাক না। 'পাণ্ডব পাণ্ডব থাক কৌরব কৌরব'—এই যদি মেনে নেওয়া হত তাহলে কুরুক্ষেত্র হতো না। কিন্তু সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কৌরবরা যখন স্বার্থান্ধতায় মগ্ন হল, তখন হল কুরুক্ষেত্র এবং কুরুবংশের ধ্বংস। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বললেন 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'—তখনই আমি আসবো। এখানে 'গ্লানি' অর্থে মানব ইতিহাসের মূল সুর ও মূল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

মানবমুক্তি মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের পথকে বিধৃত করে আছে। মানব-মুক্তির পথে যে যতটা এগিয়ে যেতে পারবে তাকে আমরা ততটা প্রগতিশীল বলবো। মানবমুক্তিকে লক্ষ্য করে মার্কস, গান্ধী, এমন কি মাও সেতুংও চলেছেন। সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিন্তু মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তি, যদিও পথের বিভিন্নতা অনেক সময়ই দুরতিক্রম্য। হিন্দুরা আরো একধাপ এগিয়ে গেছেন। মানুষের শুধু জড়জগতের অভাব-অনটন থেকে মুক্তি নয়, আত্মার আধ্যাত্মিক মুক্তিও তাঁদের লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা ছেড়ে দিয়ে মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির বাস্তব ও জড়বাদী মতবাদ নিয়েই আমরা বলতে পারি যে মানব-মুক্তির জন্য যিনি যতটা এগিয়ে গেছেন বা পথের নিশানা দিয়ে-ছেন তাঁকে আমরা ততটা প্রগতিশীল বলি। সেই অর্থে মাওসেতুংকে প্রগতি-শীল বলি। সেই অর্থে যাঁরা মানবের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন তাঁদের আমরা প্রগতিশীল বলি, বিপ্লবী বলি।

এখন আমরা প্রগতিশীলতার একটা মাপকাঠি পেয়ে গেছি। এবার আমরা যে কোন লেখকের লেখাকে সেই মাপকাঠিতে দেখে তা প্রগতিশীল কিনা স্বচ্ছন্দে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করতে পারবো।

এই নিরিখেই আমরা এখন দেখতে চেষ্টা করব শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল লেখক ছিলেন কিনা।

শরৎচন্দ্র বাংলা-ভাষাভাষীদের সব থেকে প্রিয় লেখক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তা এক, আর প্রগতিশীল হওয়া আর-এক। তাই আমাদের এই পূর্বস্বীকৃত ও নির্দিষ্ট মানদণ্ডের সাহায্যে তাঁর লেখা মাপ করতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানবসভ্যতার ও ইতিহাসের মূলভাব বা সুর মানব-মুক্তি এবং মূল সংগ্রাম মানবমুক্তির সংগ্রাম। নদী বা খালকাটার সময় ইঞ্জিনীয়াররা যেমন তার মূল লাইন (central line) ঠিক করে নেন, তার পর নদী বা খাল সেই central line-এর এধারে ওধারে কাটা হয়ে চলে, তেমনি মানুষ আমরা আর যাই করি তা ঐ মূল লাইনের দুপাশে অল্পস্বল্প এধার ওধার করা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের এই মূল বক্তব্য (central theme) কী, তাই নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করি আমরা দেখবো যে শরৎচন্দ্রের সব লেখার মূলসুর বা ভাব হচ্ছে এই মানবমুক্তি—ক্ষুধা থেকে মুক্তি, সংস্কার ভয় থেকে মুক্তি, শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি ; সে 'মহেশ'-এর কথাই ধরা যাক বা 'পথের দাবী'র কথাই ধরা যাক—এই মূলসূত্র বা সুর শরৎচন্দ্রের সব লেখা ও চিন্তায় আগাগোড়া বিধৃত। তিনি সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সমাজকে মানুষের মুক্তির পীঠস্থান করতে। তিনি নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন মানবসমাজের অর্ধেককে শাসন ও অবিচারের হাত থেকে বাঁচাতে। তিনি অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার জন্যে।

প্রগতিশীলতার যে মাপকাঠি নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম তার নিরিখে তাঁর স্থান কোথায় দাঁড়ালো ? নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রগতিশীল শিল্পী বলা যায়। আজও কি দেশে ক্ষুধা থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তি, শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামের অবসান হয়েছে যে আমরা বলব শরৎচন্দ্র যা নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তা চুকেবুকে গেছে, কাজেই তাঁর সংগ্রাম শেষ হয়েছে, এবং আজকের যুগে তাঁর আর প্রয়োজন নেই ? আজকের অন্যায়-অবিচার-শোষণ-শাসনে জর্জরিত সমাজব্যবস্থায় আমার তো মনে হয় শরৎচন্দ্রের প্রয়োজন আরো বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইদানীং কালের কিছু কথাশিল্পী কথাচাতুর্য আশ্রয় করে মনস্তাত্ত্বিকতার নামে যে যৌনবৃত্তিগুলির নির্লজ্জ বর্ণনা দিয়ে থাকেন, তাকে আর যাই বলা যাক, আধুনিকতা বা প্রগতিশীলতা বলা যায় না। তাঁদের সাহিত্যে সাধনা নেই, মানবমুক্তির কথাও নেই। সুতরাং শরৎসাহিত্যের মত যুগে যুগে তাঁদের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নেরও প্রয়োজন হবে না।

আর শরৎচন্দ্রের কালজয়ী লেখার প্রয়োজন ফুরায় নি ও ফুরাবে না যতদিন না সেই মানবমুক্তি আসে। আর তা আনবার জন্য শরৎচন্দ্রের অবদান হবে প্রগতিশীলতা, বৈপ্লবিকতা, আধুনিকতার সর্বোচ্চ নিরিখে স্বীকৃতি ও সমাদর।

নলিনীকান্ত সরকারকে লিখিত একটি চিঠির প্রতিলিপি

তেলুগু সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

বোম্মানা বিশ্বনাথন

দক্ষিণভারতের কাউকে প্রশ্ন করুন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়েছেন ? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেবেন, না। আবার জিজ্ঞেস করুন, শরৎবাবুর দেওয়াদাসু পড়েছেন ? যাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হেসে বলবেন, বহুবার পড়েছি। ফিল্মও দেখেছি।

শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' বাংলায় প্রকাশিত হয় ২০শে নভেম্বর ১৯১৬তে, আর এই গ্রন্থ অন্ধ্রের ভাষা তেলুগুতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয় ১৯২৯এ। এই ঘটনার থেকেই প্রমাণিত হয় যে শরৎসাহিত্য কত দ্রুত ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রসারিত হতে পেরেছিল। কোন সরকারী বা বেসরকারী বড় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই অনুবাদ বা প্রকাশনের কাজ হয়নি। অনুবাদ করেছেন সাধারণ অনুবাদক। নাম সহদেব সূর্যপ্রকাশ রাও। প্রকাশ করেছেন রাজামন্ত্রী, আদ্দেপল্লী অ্যাণ্ড কোং। কয়েক বছর পরে 'নীলকণ্ঠম্' ছদ্মনামে আরও এক অনুবাদক অরক্ষণীয়া অনুবাদ করেন।

তারপর থেকে বড়দিদি, বিরাজবৌ, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন, স্বামী, দত্তা, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনাপাওনা, নববিধান, পথের দাবী, শুভদা, বিপ্রদাস, দর্পচূর্ণ, ছেলেবেলার গল্প, রমা, শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি গল্প, উপন্যাস, নাটক অনূদিত হতে থাকে। এমনকি শরৎচন্দ্রের বহু চিঠিপত্রের অনুবাদও তেলুগু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এইসব গ্রন্থাবলীর অনুবাদকদের মধ্যে নীলকণ্ঠম্ গাড্ডেলিঙ্গাইয়া, সহদেব সূর্যপ্রকাশ রাও, চক্রপাণি, বোগুলাপাটি শিবরামকৃষ্ণ, ভেলুরি শিবরাম শাস্ত্রী, পুরানম্ কুমাররাঘব শাস্ত্রী, জোন্নালাগাড্ডা সত্যনারায়ণ, লাবণ্য, কে. রমেশ, কান্নুরি বৈকুণ্ঠ রাও, অহল্যা রামকৃষ্ণ রাও, আন্নাপানেনি সুব্বারাও, রবি ও শ্রীশঙ্করাইয়া শাস্ত্রী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী তেলুগু ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে তেলুগু ভাষায় প্রগতিশীল ধারার যে সূক্ষ্ম রেখা মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল, তা জীবনের ছোঁয়া পেল।

শরৎসাহিত্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল যে, কোন গ্রন্থের সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে, পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করতে দেরি হবে শুনে

অন্য প্রকাশক অন্য কোন অনুবাদককে দিয়ে ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়ে সাত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে ফেলতেন। কয়েক মাসের মধ্যে দেখা যেত শেষের প্রকাশকের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশকের গ্রন্থের চেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে। তেলুগু সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, শরৎচন্দ্রের অনূদিত গ্রন্থেরও অনুবাদ হয়েছে।

অন্য চিত্রও আছে। কিছু পাঠকের মতে শরৎসাহিত্যে আছে একধামা পায়ের ধূলো এবং এককলসী চোখের জল। এই-মতাবলম্বী পাঠকদের সংখ্যা বেশি না হলেও একেবারে নগণ্য বলা চলে না।

আখ্যানের ভাষা ও শরৎচন্দ্র

নির্মল দাশ

আখ্যানের দুটি প্রধান অঙ্গ : ১ বর্ণনা, ২ সংলাপ। বর্ণনা-অংশে লেখকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ। তিনি সেখানে সমস্ত ব্যাপারটা নিজের অভিজ্ঞতার জবানবন্দী হিসেবে বর্ণনা করে যান। এই জায়গায় লেখকের মানস-প্রবণতা অনুসারে বর্ণনার ভাষার তারতম্য ঘটে। লেখক যদি নিতান্ত বস্তুধর্মী ও প্রতিবেদনশীল হন তবে তাঁর গদ্যে এক ধরনের বর্ণহীন অনাসক্তির ছাপ পড়ে, আর লেখক যদি বর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে কিছুটা পক্ষপাতী হয়ে পড়েন, তবে তাতে তাঁর পক্ষ-পাতের প্রকৃতি অনুসারে কোথায়ও বর্ণাঢ্যতা, কোথাও বা কৌতুক-বক্রতা দেখা দেয়। বাংলা কথাসাহিত্যের বর্ণনার ভাষায় সাধারণতঃ এই পক্ষপাতের লক্ষণই ধরা পড়েছে, কারণ বর্ণহীন অনাসক্তি খুব কঠিন ব্যাপার এবং তা মাত্র দু-একজন লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায় (যথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)। দ্বিতীয়তঃ, সংলাপ-অংশে লেখকের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় তথা পরোক্ষ। তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীর মুখের কথাগুলোকে অবিকল লিপিবদ্ধ করে যান মাত্র। এখানে তাদের কথার মধ্যে তিনি যদি নিজেকে ঢোকাবার চেষ্টা করেন তবে সেটা হবে তাঁর অনধিকার-প্রবেশ। কারণ পাত্রপাত্রীর শ্রেণীগত চরিত্রবৈশিষ্ট্য সংলাপের ভাষাপ্রকৃতিকে গভীর ও ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। সংলাপের ঔপভাষিক কাঠামো, শব্দাবলীর সমাবেশ, অর্থগত (semantic) বৈশিষ্ট্য—সমস্তই সংলাপভাষকের শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য লেখক যে ভাষায় বর্ণনা দেন, তাঁর পাত্র-পাত্রী যদি তাঁর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তবে ঠিক তাঁর ভাষাতেই পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন রচনা করলে সংলাপের তথা পাত্রপাত্রীর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত বিচলিত হয়। এই কারণে বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা বহুক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এমনকি, পাত্র-পাত্রী ও লেখক শ্রেণীবিচারে সমপর্যায়ভুক্ত হলেও (যথা লেখকও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত, আবার পাত্র বা পাত্রীও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত) সংলাপের ভাষা ও বর্ণনার ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাটা অনিবার্য। কারণ, বর্ণনায় লেখক সরল-জটিল-যৌগিক কিংবা ইতিবাচক নেতিবাচক প্রশ্নবাচক বিস্ময়বাচক ইত্যাদি যে ধরনের বাক্যই ব্যবহার করুন না কেন, সবটাই তাঁর নিজের উক্তি। এই উক্তি অনর্গল ধারায় তাঁর মন থেকে লেখার মধ্যে চলে আসছে। এইজন্য বর্ণনার ভাষায় বাক্যের গঠন ও অর্থগত বৈচিত্র্য যদি থেকেও থাকে,

তবু সমগ্র বর্ণনা-অংশে একটা সার্বভৌম একমুখীনতা ও অবাধ প্রবহমানতা বিরাজ করে। পক্ষান্তরে সংলাপ সাধারণতঃ একেতর ব্যক্তিবর্গের উক্তিসংকলন, সুতরাং তার মধ্যে সার্বভৌম একমুখীনতা আশা করা যায় না। অন্য দিকে, সংলাপ যেহেতু পাত্রপাত্রীর মনোভাবের স্বচ্ছতম প্রতিধ্বনি, সেইজন্য সংলাপের ভাষায় ভাবান্তরের বিচিত্র উত্থানপতন সহজেই ফুটে ওঠে। মনোভাবের বৈশিষ্ট্যেরই জন্যই বাক্য কোথাও দীর্ঘ কোথাও হ্রস্ব, কোথাও অসমাপ্ত বা এলোমেলো (anacoluthon)। সংলাপবাক্যের এইসব বৈশিষ্ট্য ব্যাকরণের সরল-যৌগিক-জটিল বা ইতিবাচক নেতিবাচক প্রভৃতি মামুলি মাপকাঠিতে মাপা যায় না। অথচ এইসব বৈশিষ্ট্যই সংলাপকে জীবন্ত করে তোলে এবং এইসব বৈশিষ্ট্য আছে বলেই সংলাপের ভাষায় বর্ণনার ভাষার অবাধ প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্ণনা ও সংলাপের কাজ ও স্বভাব এক নয়, এবং এক নয় বলেই এই দুইয়ের ভাষাভঙ্গীর কিছু না কিছু তফাত অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু বাংলা আখ্যানসাহিত্যের গোড়ার দিকে আখ্যানের এই দুই খণ্ডের ভাষাভঙ্গীতে কোন ব্যবধান রক্ষা করা হয় নি। গড়-উইলিয়ম কলেজের লেখকেরা প্রচলিত অর্থে উপন্যাস না লিখলেও গদ্যচর্চার অবলম্বন হিসাবে কিছু কিছু উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সহস্রাব্দপ্রাচীন পদ্যভাষার বিকল্প হিসাবেই গদ্যভাষার নির্মাণকর্মে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের প্রয়াস গদ্যের প্রাথমিক কাঠামো তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আলাদা করে আখ্যানের উপযোগী ভাষা নির্মাণের দিকে এঁরা নজর দিতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের মধ্যে সংবেদনশীল শিল্পী-স্বভাব ছিল, এবং কিছু কিছু গদ্য উপাখ্যান তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল টানা গদ্যে কীভাবে নাটক বা কাব্যের কাহিনীকে প্রকাশ করা যায়। এইজন্য তাঁর আখ্যানেও বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নি। প্রচলিত অর্থে উপন্যাসের প্রথম রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর রচনাতেই বাংলা আখ্যান সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। তিনি আখ্যানের ভাষাকে সামগ্রিক ভাবে সমৃদ্ধি দান করেছেন। কিন্তু বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষার সূক্ষ্ম ব্যবধান তিনি সর্বত্র রক্ষা করেন নি। তবে তাঁর রচনায় বর্ণনা ও সংলাপের ভাষার একটা অভিনব বৈচিত্র্য দেখা গেল। লেখক হিসাবে বঙ্কিম ছিলেন গদ্যভাষার নিয়মানুসারিতার প্রচারক ও অনুশীলক, সেইজন্য বর্ণনার বিষয় অনুসারে বর্ণনার ভাষার ইতর-বিশেষ ঘটেছে (উদাহরণস্বরূপ বিষবৃক্ষ উপন্যাসের ৩৪তম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদের সঙ্গে ৩৭তম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ তুলনা করুন।)

আবার চরিত্র অনুসারেও সংলাপের ভাষার উচ্চাবচতা ঘটেছে। অভিজাত চরিত্রগুলির মুখে সর্বত্রই তৎসমপ্রধান সাধুভাষা দিয়েছেন। কিন্তু অনভিজাত কিংবা লঘুভাবাপন্ন অভিজাত চরিত্রের মুখে অনেকক্ষেত্রে মোটামুটি কথ্য-ভাষার অনুগত ভাষা দেবার চেষ্টা করেছেন।

শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রে পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য চরিত্রের মুখে লৌকিক বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সংলাপ দিয়েছেন। এইসব সংলাপের ভাষা ব্যাকরণের দিক থেকে নিখুঁত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু চরিত্রের ভাষাসাম্প্রদায়িক শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের কথা যে তিনি মনে রেখেছেন এটা অত্যন্ত বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষণীয়। আখ্যান-সাহিত্যে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা সর্বাঙ্গীণ আত্মস্বাতন্ত্র্য পায় নি বটে, কিন্তু তিনি যে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষার বিষয়ানুসারী তারতম্য ঘটাবার কথা চিন্তা করেছেন, অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সেখানেই আধুনিক ঔপন্যাসিক ভাষার সফল সূত্রপাত। বঙ্কিম যার সূচনামাত্র করলেন তার পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটন রবীন্দ্রনাথে। বর্ণনায় 'সাধু' ও সংলাপে 'চলিতে'র ব্যবহার তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। 'গোরা' উপন্যাস এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'গোরা'র পর 'চতুরঙ্গে' পুরোপুরি সাধুভাষা ও অন্যান্য বইতে পুরোপুরি চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে আখ্যানের দুই অঙ্গের আত্মস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ ঘটেনি। তবে তাঁর গদ্য যেহেতু মহাকবির হাতের গদ্য, সেইজন্য সেই গদ্য অনতি-বিলম্বেই বাঙালীর কথনভঙ্গীর সাধারণ সীমাকে লঙ্ঘন করে এক অ-লৌকিক মহত্ত্বের মাত্রাকে স্পর্শ করল (পাঠককে 'শেষের কবিতা'র গদ্যকেই স্মরণ করতে বলি)। গদ্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যদি মুখে বলার 'ভাষা' হয়, তবে রবীন্দ্রগদ্য ক্রমশই তা থেকে সরে গিয়েছে। যে বিপুলসংখ্যক অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন জনসমষ্টি জনপ্রিয়তার ভোটদাতা তারা রবীন্দ্রগদ্যে কোন অভ্যস্ত প্রত্যাশার পরিতৃপ্তি পায় নি। এইজন্য রবীন্দ্রগদ্য তথা রবীন্দ্র-উপন্যাস ঐ জনসমষ্টির কাছে সুখপাঠ্য বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁর আন্তর্জাতিক কবি-খ্যাতি তাঁর শ্রদ্ধার আসনকে অবিচল রেখেছে বটে, কিন্তু প্রীতির অর্ঘ্য পেয়েছেন আর-একজন, যিনি গদ্যভঙ্গীতে অনেকটাই তাদের অভ্যস্ত প্রত্যাশার অত্যন্ত নিকটবর্তী। ইনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাসের ভাষায় শরৎচন্দ্র আকস্মিকভাবে কোন নতুন রীতির প্রয়োগ বা উদ্‌ভাবনের চেষ্টা করেন নি। পূর্বগ্রামী প্রথা অনুসারে বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন (চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন)। বর্ণনার ভাষা অনেকক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে

কথনো কথনো কথ্য ভাষার বিপরীত মেরুকে স্পর্শ করেছে (যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তকর্তৃক আঁধারের রূপ বর্ণনা ; এক্ষেত্রে ঐ অংশ নায়কের বিমুগ্ধ চেতনার আবিষ্ট প্রতিক্রিয়া, বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ শিথিল, কল্পনাভাবাতুর বিষয়ের বর্ণনা হিসাবে ঐ অংশ অমন মেদুর, মন্থর ও অন্তর্মুখী হওয়াই স্বাভাবিক ।) কিন্তু যে বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবের সাক্ষাৎ যোগ আছে, তার বর্ণনা কেমন সহজ, ক্ষিপ্র ও মৌখিক ভঙ্গীর অনুগামী ('শ্রীকান্ত' ২য় পর্বের সেই সাইক্লোন-কবলিত জাহাজটির বর্ণনা স্মরণ করুন ।)

সমগ্র শরৎসাহিত্যে অনুভূতিগাঢ় অন্তর্মুখী বর্ণনা অপেক্ষা সাংবাদিকতা-ধর্মী বহির্মুখী বর্ণনাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । হয়ত উপন্যাসের স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠতা কিংবা লেখকের বহির্মুখী প্রবণতাই এর মুখ্য কারণ । আর এইজন্যই তাঁর সমগ্র রচনায় 'আঁধারের রূপ' বর্ণনাজাতীয় অন্তর্মুখী গদ্যের নিদর্শন খুবই কম । এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে এই ধরনের গদ্যরচনাতে তাঁর নিজস্বতার ভাগ খুবই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ : 'এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার ।' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে যে অন্তর্গততার আভাস আছে তাতে তো রবীন্দ্রপদ্যেরই অনুচিকীর্ষা প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায় ।

'শ্রীকান্ত' তাঁর অন্তর্জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল বলে এই গ্রন্থ থেকেই তাঁর অন্তর্মুখী পদ্যের রবীন্দ্রানুকারিতার আরও কিছু নমুনা দেওয়া যাক ।

১ : বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি । নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দ্রংষ্টারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে । [১ম পর্ব : ২য় অধ্যায়]

২ : অস্তগামী সূর্যের তির্যক্ রশ্মিছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম । [১ম পর্ব : ৯ম অধ্যায়]

৩ : আজ সারাদিনটা কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল । অপরাহ্নসূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল । তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা-দুই তেঁতুল গাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল ।···হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয় , হয়ত যে আলো আর এক নারীর কাছ হইতে এই মাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল । [৩য় পর্ব : ৮ম অধ্যায়]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র যে দম্ভোক্তি করেছেন ['ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোন দিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখ-টুখ তো কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা তো চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।'] তা আসলে রবীন্দ্রপ্রমুখ রোমাণ্টিক লেখকদের অন্তর্মুখী বস্তুবর্ণনার বিরুদ্ধে লোকদেখানো 'বস্তুবাদ'। এই বস্তুবাদের কোন প্রকৃত চেহারা নেই, এটা যতখানি বিজ্ঞাপিত ততখানি রূপায়িত নয়। নচেৎ যে পদ্ধতিকে তিনি মুখে বিদ্রূপ করলেন, কাজের বেলায় আবার তাকেই অবলম্বন করলেন কেন ? এই স্ববিরোধ কি শরৎচন্দ্রের গোটা শিল্পী-মানসের ভিতরেই আমূল প্রোথিত ? পাঠকদের ভেবে দেখতে বলি। আমার তো মনে হয়, শিল্পী হিসাবে তিনি রোমাণ্টিকদের অন্তরীক্ষ ও রিয়্যালিস্টদের ভূতল খণ্ডের মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত বিরাজ করেছেন। সেইজন্য অন্তর্মুখী বর্ণনার গদ্যে তিনি রিয়্যালিস্টদের মতো পুরোপুরি নীরক্ত হতে পারেন নি, আবার রোমাণ্টিকদের মতো কল্পনাশক্তির অসাধারণত্বও দেখাতে পারেন নি। এইজন্যই তাঁর অন্তর্মুখীন গল্পে যে অনুভূতির রঙ দেখা যায় তা মনোহর হলেও অসাধারণ নয়, এবং এই কারণেই ঐ গদ্য কথ্য ভাষার বিপরীত মেরুকে স্পর্শ করলেও তা পাঠকদের অপরিচিত ঠেকে নি, তাদের অভ্যস্ত প্রত্যাশাও প্রতিহত হয় নি। এইজন্য তিনি অন্তর্মুখীন গদ্যাংশেও সমান সুখপাঠ্য।

তবে আগেই বলেছি, তাঁর বর্ণনায় অনুভূতিরঞ্জিত অন্তর্মুখী গদ্যের চেয়ে সাংবাদিকতাধর্মী বহির্মুখী গদ্যই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গদ্য বাদ দিলে তাঁর রচনায় অবশিষ্ট থাকে সংলাপের গদ্য। বর্ণনার বহির্মুখী গদ্য ও সংলাপের গদ্যের মধ্যে সাধুচলিত-ঘটিত একটা বাহ্য তফাত অবশ্যই আছে, কিন্তু ওই তফাত নিতান্তই রূপগত, উভয় শ্রেণীর গদ্যের ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের উপর সামান্য কিছু ব্যাকরণসম্মত অস্ত্রোপচার করলেই একে অপরের রূপ

ধারণ করতে পারে—এই অস্ত্রোপচারে বর্ণনার রস বা সংলাপের প্রাণ বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রমাণ-ব্যাকুল পাঠকদের জন্য এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই :

১ : "রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে ঘরের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার, দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি ; তাই বলি—

"রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল ; কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

"লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসন গ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগল। এ দিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমের ইস্কুল মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্নমেণ্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না ; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে, উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে রশিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্য মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।"

২ : "[বনমালী পাড়ুই ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

রমেশ। আপনি কে ?

বনমালী। আপনাদের ভৃত্য, বনমালী পাড়ুই। গ্রামের মাইনার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

রমেশ। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি ইস্কুলের হেডমাষ্টার ?

বনমালী। আপনার ভৃত্য। দু'দিন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও দেখা হয় নি।

রমেশ। আপনার ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত ?

বনমালী। বিয়াল্লিশ জন। গড়ে দু'জন পাস হয়। একবার নারায়ণ বাঁড়ুজ্যের সেজছেলে জলপানি পেয়েছিল।

রমেশ। বটে ?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ-বছর চাল ছাওয়া না হলে বর্ষার জল আর বাইরে পড়বে না।

রমেশ। সমস্তই আপনাদের মাথায় পড়বে ?

বনমালী। আজ্ঞে, হাঁ। কিন্তু সে এখনো দেরি আছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাই নি। মাষ্টাররা বলচেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ আর বেশিদিন তাড়ানো যাবে না।"

পাঠকদের অবশ্যই বলে দিতে হবে না যে প্রথম উদ্ধৃতিটি 'পল্লীসমাজ' (৫ম অধ্যায়) ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি 'রমা' (১০ অঙ্ক। ৪র্থ দৃশ্য) নাটক থেকে নেয়া হয়েছে, তবে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উদ্ধৃতাংশদুটির বিষয়বস্তুর দিকে। বিষয়বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই এক, তবে উভয়ের উপস্থাপনা-পদ্ধতি ভিন্ন। প্রথম উদ্ধৃতিতে প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি অর্থাৎ সংলাপ ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা ব্যক্ত করা হয়েছে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে তা-ই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ উক্তি অর্থাৎ সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েয়েছে (নাট্যাংশে যে ঈষৎ তফাত দেখা যায় তা নাটকের দৃশ্যপরিকল্পনাগত, মূল বিষয়ের উপর এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র অনায়াসেই বর্ণনাকে সংলাপের ভাষায় এবং সংলাপকে বর্ণনার ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারেন। তাঁর এই দক্ষতা দু-একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র রচনাতেই তা পরিব্যাপ্ত। প্রথার মুখ চেয়ে বর্ণনার সময় তিনি হয়তো ক্রিয়া ও সর্বনামের চেহারাটা দীর্ঘতর করে দিয়েছেন, কিন্তু সংলাপের হ্রস্বতর গদ্যের সঙ্গে তার কোন সত্যিকারের বিভেদ নেই। তাহলে তাঁর বর্ণনার গদ্যরূপ ও সংলাপের গদ্যরূপ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও আসলে কোনো অন্তর্লীন অভিন্ন মৌল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্তর্লীন মৌল কাঠামোটি কী বা কেমন ? এই কাঠামোটি হচ্ছে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীর মুখের গদ্য। এই গদ্যের চেহারা কেমন তা শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্র পড়লেই বেশ জানা যায়। তাঁর চিঠি-পত্রেও দেখা যাচ্ছে, তিনি কখনো তথাকথিত 'সাধু' কখনো তথাকথিত 'চলতি' রূপের গদ্য ব্যবহার করেছেন, কিন্তু উভয়েরই ধরনটা মৌখিক। চিঠিপত্র ব্যক্তিগত ভাববিনিময়ের ব্যাপার, তাছাড়া কৈফিয়ত দেবার কোন উপলক্ষও সেখানে থাকে না। সেইজন্য চিঠি, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত চিঠি মানুষ স্বাধীন ও অসতর্ক হয়েও লিখতে পারে। সেই স্বাধীনতা ও অসতর্কতা নিয়ে চিঠি

লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যখন একই সময়ে একই ব্যক্তির কাছে কোথাও সাধু, কোথাও চলিত ভাষা ব্যবহার করেন এবং ক্বচিৎ একাধারে উভয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকেন, তখন বুঝতে হবে আসলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উভয় রীতির চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান ছিলেন না। অবশ্য সাহিত্যের পোশাকী ক্ষেত্রে তাঁকে সতর্ক হতে হয়েছে। এই সতর্কতার নমুনা হিসাবে, তিনি সাবেক প্রথার অনুসারে বর্ণনার ভাষাকে সংলাপের প্রত্যক্ষতা থেকে আলাদা করার জন্য ঐ গদ্যের ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপগুলি দীর্ঘতর করেছেন এবং সংলাপের গদ্যে কথ্যরীতির মৌলিক রূপটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অবশ্য এই পার্থক্য নিতান্তই নামমাত্র, আসলে ভিতরের কাঠামোটা এক ও অভিন্ন। এই কাঠামোটির ভাষাতাত্ত্বিক নাম রাঢ়ী উপভাষা। শরৎচন্দ্র একটি আঞ্চলিক উপভাষাকে অবলম্বন করলেও এমন একটি উপভাষাকে অবলম্বন করেছেন নানা দিক থেকে যার ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিশ্রুতি সুবিপুল। এই উপভাষা অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ হলেও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা কারণে সমগ্র বাংলার সমস্ত উপ-ভাষী সম্প্রদায়ের কাছেই এটি সুপরিচিত ও অনুকরণযোগ্য। শরৎচন্দ্র ব্যাকরণের বিচারে সাধু বা চলিত যে রীতিতেই লিখুন না কেন, আসলে তিনি আজীবন রাঢ়ী উপভাষার কাঠামোর উপরই অবিরলভাবে তাঁর ঔপন্যাসিক সৌধ নির্মাণ করেছেন। এইজন্য তাঁর ভাষা বাঙালী পাঠকের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ভাষা। রবীন্দ্রনাথসহ আরও কেউ কেউ চলিত গদ্যে লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ঐ চলিত গদ্য ক্রিয়া ও সর্বনামের চেহারার দিক থেকে 'চলিত', কিন্তু বাক্যবন্ধের ধরন বা শব্দচয়নের ভঙ্গীতে সর্বাংশে বাঙালীর কথনভঙ্গীর নিকটবর্তী নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ লেখকেরা সাহিত্যে ব্যবহৃত চলিত ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষাকে উপভাষার সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন। এই জন্য ওই গদ্য চলিত হয়েও গড়পড়তা উপন্যাসপাঠকের কাছে সুপরিচিত ঠেকেনি। কিন্তু শরৎচন্দ্র সংলাপের গদ্যে তো বটেই, বর্ণনার গদ্যেও বাঙালীর বাচনভঙ্গিমাকে রূপান্তরে রক্ষা করেছেন। এইজন্য মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের দুর্মর আভিজাত্য বা অলঙ্কারের নিবিড় প্রলেপ নেই ; এই কারণেই তিনি সর্বাপেক্ষা পরিচিত, সর্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প

শ্যামল সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের খ্যাতির মূল কারণ তাঁর উপন্যাসগুলি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ধারাপথে আবির্ভূত হয়ে জীবন সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র ও লোকায়ত চেতনার গৌরবেই তিনি বাঙালীর প্রাণের আসনটি অধিকার করে-ছিলেন। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত ঘটনাগ্রন্থনের নিপুণ সার্থকতা বা রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তি ও জীবনবোধ তাঁর রচনায় ছিলো না ; কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবনবৃত্তটিকে তিনি অসাধারণ সমবেদনায় সিক্ত করে বাঙালীকে উপহার দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র জানতেন, জীবনের অসংখ্য বিস্মৃতিরাশির ক্ষেত্র থেকে দুটি-একটি অবিস্মরণীয় মুক্তা আহরণ করতে, যার বর্ণচ্ছটা হৃদয়মনকে অনায়াসেই বিদ্ধ করতে পারে। স্বভাবতই মনোভঙ্গির দিক দিয়ে এই বিশিষ্টতা ঔপন্যাসিক অপেক্ষা ছোটগল্পকারের মধ্যেই আমরা অধিক পরিমাণে প্রত্যাশা করে থাকি। কেননা, ছোটগল্পের উৎসমূলেই রয়েছে একটি ব্রাত্য জীবনপ্রীতি, তুচ্ছতার মধ্যে মহত্ত্বের দ্যোতনার আভাস, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের ব্যঞ্জনাধর্মিতা। সার্থক ছোটগল্প শুধুমাত্র আকৃতিতে ছোট এবং প্রকৃতিতে গল্পমাত্রই নয়, তা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদগ্রহণ, মুহূর্তের স্মৃতিস্তম্ভে অন্তরের অমরতার ঘোষণা। শরৎচন্দ্রের মনোভঙ্গির সাধারণ প্রবণতায় তাই ছোটগল্পের একটি স্রষ্টা চৈতন্যকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা তথ্যসাহচর্যে সিদ্ধ হতে পারে না। ছোটগল্পের শিল্পরূপ যে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নি, তা তাঁর বহুসংখ্যক উপন্যাসের পাশে স্বল্পসংখ্যক ছোটগল্পের অস্তিত্বের সূত্রেই প্রমাণিত হয়। তাঁর সমগ্র রচনাবলী অনুসন্ধান করলে ছোটগল্পকেই প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বলে বোধ হয়। ছোট প্রাণ, ছোট কথার বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি কতো অনায়াসেই না উপন্যাস রচনা করেছেন। সদাভাসমান সহস্র বিস্মৃতিরাশি থেকে দুটি একটি অশ্রুজলের আহরণে তিনি কি নিপুণভাবেই না তাঁর আখ্যান রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তুলনামূলকভাবে দেখা যায় যে, 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' ছাড়া যথার্থ ছোটগল্প-নামধেয় রচনা তাঁর রচনাবলীতে পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের আলোচনায় এই তথ্যটি সর্বাগ্রে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকালে বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের

হাতে যথার্থ শিল্পরূপ অর্জনে সমর্থ হয়েছিলো। কেননা, উনিশ শতকের শেষাংশেই সাময়িক পত্রের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন এবং লিরিক প্রতিভার অধিকারী এই লেখক স্বল্পকালমধ্যেই এই বিশিষ্ট শিল্পরূপটিকে আপন আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করেন। ছিন্নপত্রের চিঠিতে তিনি তাঁর নিভৃত মানস-সম্ভোগের উপায় হিসাবে প্রত্যহ দুটি একটি করে ছোটগল্প লেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, আর 'সোনার তরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতায় এই ছোটগল্পেরই এক রসস্নিগ্ধ শিল্পরূপের ইঙ্গিত দিয়েছেন বাঙালী পাঠক ও গল্পকারদের। যদিও রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সময় থেকেই ছোটগল্প লেখবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং ছোটগল্পের উৎস নির্ধারণ করতে গিয়ে গবেষক প্রাচ্যভূমি এই ভারতেই তার জন্মস্থান নির্দেশ করেছিলেন, তথাপি আধুনিক বাঙালী ছোটগল্পকারেরা যে রবীন্দ্রসরণীতে আপন আপন গন্তব্যের সন্ধান করেছেন ও করছেন,—এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। বিশেষ করে একথা মনে রাখা দরকার যে, ছোটগল্প যে বাস্তবতাবোধ ও বিদ্রোহসংকেত আধুনিক যুগে সংযোজিত হয়ে তাকে শিল্পী-মনের সামাজিক বক্তব্য প্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ করে দিয়েছে, তা একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তনা। বঙ্কিমচন্দ্রও 'উপকথা' নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্তাকার ও অজটিল কাহিনীযুক্ত 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' লিখেছিলেন, তার মূল লক্ষ্য ছিলো আখ্যান-বর্ণনা। বহু সম্ভব ও অসম্ভব ব্যাপারের পর নায়ক-নায়িকার প্রীতিস্নিগ্ধ মিলনপরিবেশ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পূর্বতন আখ্যানধর্মিতা, যা একদা প্রাচ্যভূমির অরণ্য-জনপদে কিংবা মরুপ্রান্তরে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, এগুলি যেন তারই উত্তরসূরী। কিন্তু ইউরোপের গল্পধারায় প্রথম যুগেই যে বাস্তবতাবোধ ও সমাজজিজ্ঞাসার নতুন মাত্রাটি সংযোজিত হয়েছিল, বাংলা গল্পসাহিত্যে তা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথই এনেছিলেন। অবশ্য তাঁর বাস্তবতাবোধ সব সময়েই সমাজজিজ্ঞাসায় রূপান্তর গ্রহণ করেনি, বরং বহু ক্ষেত্রেই তাঁর কবিত্বময় মানসধর্ম বাস্তব জীবনপ্রতিবেশে প্রকৃতি ও মানুষের অদ্বৈত লীলামাধুর্যের আস্বাদ নিয়েছে, অথবা কল্পনার উত্তুঙ্গ শিখরচূড়ায় পাষাণপ্রাসাদের ক্ষুধা কিংবা মানবহৃদয়ের দুরাশাকেই ব্যক্ত করেছে। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটগল্পকে একটি শক্ত বনিয়াদের ওপর স্থাপন করে এর যথার্থ শিল্পরূপটিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পধারার পরিচিত পরিবেশেই বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। যদিও মধ্যবর্তী পর্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের আসরে তার স্বল্পকালীন আবির্ভাবেই বাঙালীর মন কেড়ে

নিয়েছিলেন। তাঁকে বাংলার মোপাসাঁ বলে তৎকালীন বাঙালী পাঠক কতোখানি বিচারবোধের পরিচয় দিয়েছেন বলা যায় না। কিন্তু প্রীতি যে অনেকখানিই জানিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রও যে-সমস্ত রচনার সাহায্যে বাঙালী পাঠকচিত্তকে প্রথম আবির্ভাবেই জিতে নিয়েছিলেন, তারা সকলেই ছিলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় গল্প। 'বড়দিদি' কিংবা 'মন্দিরের' মতো রচনাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আখ্যা দেওয়া কোনমতেই সমীচীন হবে না। বলা যেতে পারে যে, বাঙালী গল্পপাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের গল্পের উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তিহেতু গল্পরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে যেটুকু অতৃপ্ত বোধ করছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের কাছে তার পূর্ণ উপচার নিয়ে হাজির হলেন। বলাবাহুল্য, অচিরেই বাঙালী হৃদয়ে সাদরে স্বীকৃত হলেন। শরৎচন্দ্র বাঙালীকে তার ঘরের কথা গল্পাকারে শোনালেন; কিন্তু কবিত্বের আবরণে ঢেকে নয়, ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে নয়, আবেগের আবেদনে।

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বৃহদাকার উপন্যাস ও কিছু রচনা বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ সংক্ষিপ্তাকার রচনাকেই ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এই শ্রেণীবিন্যাস বিচারের অপেক্ষা রাখে। কেবলমাত্র আয়তনগত সংক্ষিপ্ততাই ছোটগল্পের একমাত্র চরিত্রলক্ষণ নয়, তা ছোটগল্পের যে কোনো আধুনিক পাঠকের কাছেই স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আকারের দিক দিয়ে 'পরেশ' অপেক্ষা বিস্তৃততর। কিন্তু নষ্টনীড়ের ছোটগল্পলক্ষণ যেমন অবিসংবাদিত, তেমনি 'পরেশ'কে কোনমতেই ছোটগল্প-শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। এই রচনাটি অবলম্বন করেই শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পরচনার দ্বিধাটি বুঝে নেওয়া যায়। গুরুচরণ মজুমদারের পারিবারিক জীবনের অন্তর্কলহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশকে ঘিরে গুরুচরণের একধরনের স্নেহবাৎসল্যবিশ্বাস-মিশ্রিত মনোভাবের উপরেই গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যে রীতিতে শরৎচন্দ্র এটি লিখেছেন, তাতে ছোটগল্পের ইঙ্গিতধর্মী তাৎপর্য অপেক্ষা উপন্যাসের বর্ণনাধর্মী বিবৃতিই দেখা দিয়েছে অধিক পরিমাণে। সময়ের বিস্তার, ঘটনার কেন্দ্রভ্রষ্টতা, রচনায় তির্যকতার অভাব এটিকে উপন্যাসের ছোট সংস্করণ রূপেই পরিচিত করেছে। 'নভেলেট' বা 'ছোট উপন্যাস' বলতে যা বোঝায়, এটি বা এই ধরনের অন্যান্য রচনাগুলি, যেমন, মামলার ফল, অনুপমার প্রেম ইত্যাদি, তারই সার্থক উদাহরণ। নষ্টনীড়ের আয়তনিক বিশালতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সংহতি, ভাষার তির্যক-কবিত্ব কিংবা পরিণামগত রহস্যময়তা তাকে সার্থক ছোটগল্পের শিল্প-রূপে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

সুতরাং, শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প বলতে আমরা প্রধানত যে দুটি রচনাকে

বুঝবো ; সে দুটি 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' ; 'হরিচরণ' নামক একটি রচনাকেও এর স্বধর্মী বলে মনে করা যায়, কিন্তু সেটিকে গল্প না বলে গল্পের খসড়া রূপে গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত হবে। কেননা, এটিতে চরিত্র, বিষয়, সমস্যা ও পরিণতি, সমস্তই যেন অনালোচিত ও অলিখিত রয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের দুটি গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় যথাক্রমে ১৩২৬ ও ১৩২৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৯ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাধনা তখন তাঁর রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। 'হিতবাদী', সাধনা', নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' কিংবা 'বালক'-'ভারতী'র পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্য তখন 'সবুজপত্রে'র যুগে যাত্রা করেছে। বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা, নতুন করে ইউরোপ ভ্রমণ রবীন্দ্র-মানসিকতায় একটি নতুন পর্যায় যোজনা করেছে। গল্পরচনাকে শিল্পরচনার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে তিনি সামাজিক বক্তব্য প্রকাশের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। সবুজপত্রের যুক্তিধর্মিতা ও নাগরিক মনন তাঁর গল্পে একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছে। বনওয়ারি কিংবা মৃণাল, কল্যাণী কিংবা অনিলা—নতুনতম সামাজিক বক্তব্য নিয়ে এসেছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সর্বহারার বিপ্লব সংঘটিত ও জয়যুক্ত হয়েছে। কল্লোলের কাল তখনো অনাগত। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গে'র আবির্ভাব বাংলা গল্পসাহিত্যের গতিপথকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পথ দেখিয়েছে। শরৎচন্দ্র দুটিমাত্র ছোটগল্প লিখলেও বাংলা ছোটগল্পের রবীন্দ্র-পরবর্তী ধারাটির তিনিই পথিকৃৎ-স্বরূপ। গল্পকার হিসাবে তাই তাঁর কৃতিত্ব যতটা না শিল্পগত, তার চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহাসিক। তাঁর গফুর জোলা কিংবা অভাগী কাঙালী পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ব্রাত্যচরিত্রের মিছিলে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়ে সাহিতের শোভাযাত্রায় স্থানলাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

গল্প দুটি বাঙালী পাঠকের এতোই পরিচিত যে, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গল্প দুটির রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিক চলচ্চিত্রের মতোই এই গল্পগুলিতে একটি পার্শ্বচরিত্র ও অপ্রধান ঘটনার সূত্রে লেখক পাঠকের মনোযোগ ক্রমে মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রে এনে স্থিত করেন। তারপর সমস্যাকেন্দ্রটি থেকে লেখকের মনোযোগ মুহূর্তের জন্যও ভ্রষ্ট হয় না এবং গল্পটি একটি নিটোল ঐক্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দুটি গল্পেরই পটভূমিকা গ্রামীণ বাংলা। দুটি গল্পেই সামাজিক অনাচারের চেহারা স্পষ্ট। জমিদারশাসিত বাংলার গ্রামীণ সমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতিই দুটি গল্পের উপজীব্য। কিন্তু দুটি গল্পের সমস্যাকেন্দ্র স্বতন্ত্র, অভাগীর স্বর্গলাভকামনা যতোটা আবেগাশ্রিত, ততোটা বাস্তবভূয়িষ্ঠ নয়, মুখুজ্যে-গিন্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্যটি তার বঞ্চিত জীবনে একটি পারলৌকিক প্রাপ্তির উজ্জ্বল ছবি জাগিয়ে তুলেছিলো, যার বাস্তবিকতা সন্দেহাতীত নয়। ফলে, জমিদারের গোমস্তার ছুৎমার্গ কিংবা দারোয়ানের হৃদয়হীনতা সত্ত্বেও গল্পের সামাজিক বক্তব্যটি অনেকাংশেই অননুভূত হয়ে থাকে। কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় একটি কিশোরের বৃদ্ধে পরিণত হওয়ার ঘটনাটিকে বিস্ফোরণের বদলে সহানুভূতির বিষয়রূপেই লেখক চিহ্নিত ক'রে তুলেছেন। ফলে গল্পটির মধ্য দিয়ে সামাজিক বাস্তবতার প্রকাশটি কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এদিক থেকে 'মহেশ' গল্পটি অনেক বেশি পরিমাণে মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ। তর্করত্ন, জমিদার, জমিদারের পেয়াদা,—সবাই মিলে গ্রাম-বাংলার শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। গফুরের গৃহবর্ণনা, পিতা ও কন্যার সংসারযাত্রার স্বল্পাক্ষর চিত্রণ, পর পর দু-সন অজন্মা ও গ্রীষ্মের দিনে পানীয় জলের কষ্ট ও সমস্যা—মোটামুটি বিশ্বস্তভাবে পটভূমিকাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গল্পটিতে সামাজিক অনাচার একসঙ্গে দুটি প্রাণীকে পিষ্ট করেছে,—একজন মানুষ গফুর জোলা, অপরজন একটি অবোলা জীব—গফুরের গৃহপালিত বৃদ্ধ বলদ মহেশ। অবশ্য এক্ষেত্রে মুসলমান কৃষকের গৃহপালিত বলদের নাম 'মহেশ' রাখার ব্যাপারটি কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেননা, হিন্দুর দেবতার নামে নামকরণ মুসলমানের পক্ষে কিছুটা বেমানান, কিন্তু মহেশ সম্পর্কে মমতা, গো-হাটায় বেচে-দেওয়ার প্রস্তাবে শিহরিত হয়ে ওঠা, কিংবা কসাইকে বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে গফুরের যে বিশেষ মনোভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে, তা হিন্দু জমিদারের গ্রামে দীর্ঘকালীন পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের সূত্রে পাওয়া বলেই মনে হয়। যাই হোক, এই অত্যাচারিত দুই প্রাণীর প্রতিক্রিয়ার দুটি ভিন্ন রূপ লেখক গল্পে দেখিয়েছেন। গফুর নিরুপায়ের মতো সমস্ত অত্যাচার শিরোধার্য করে রাত্রির অন্ধকারে আপন ভিটেমাটি ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে চাকরি নিতে যাত্রা করেছে। তার নিরুপায় হৃদয় আল্লার কাছে নালিশ জানিয়েই সমস্ত হৃদয়ক্ষোভ প্রশমিত করেছে। মহেশের প্রতিক্রিয়াটি কিন্তু অন্য রকম। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন, 'গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পর সে দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের

প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।' ঘটনাটি অবশ্য নতুন নয়, আগেও কয়েকবার ঘটেছে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য কিছুটা স্বতন্ত্র। তর্করত্নের হাতে চাল-কলার গন্ধ পেয়ে সে দীনভাবে প্রার্থনা করে যা পায়নি, এখানে তা সে জোর করে আদায় করে নিতে চেয়েছে। গল্পটিতে দুটি প্রাণীর প্রতিক্রিয়াগত এই দুই ভিন্ন রূপ গল্পটির সাংকেতিক তাৎপর্যকে বর্ধিত করেছে বলেই মনে হয়।

গল্পের পরিণতিতে আরো একটি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ সত্যের সীমা যথাযথভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। দরিদ্র ভাগচাষীর জীবনের শোচনীয় দারিদ্র্য ও জমিদারের নিদারুণ অত্যাচার তাকে তার পল্লীর স্নেহ-সুনিবিড় আশ্রয়টি থেকে উৎখাত করে ফুলবেড়ের চটকলে শ্রমিকের বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছে। আপন ভিটেমাটি ও জমির ওপর তার যে অসীম মমতা, অর্থ-নৈতিক দিক থেকে সুতীব্র অভাব এসে তাকে কঠিন আঘাত করেছে। বাংলা-দেশের অর্থনীতি ও সমাজনীতির এই জ্বলন্ত বাস্তব সত্যটি কিন্তু শরৎচন্দ্রের গ্রামবাংলাভিত্তিক অন্য কোন রচনাতেই পাওয়া যায় নি। এদিক থেকে মহেশ গল্পটি বাংলাদেশের নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে যথাযথভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত, রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনা অংশে গ্রামের শ্যামাঞ্চল ছেড়ে টিটাগড়ের কাগজকলে কৃষকের শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মরণীয়। সেখানে যা সাঙ্কেতিক তাৎপর্য পেয়েছে, এখানে তাই বাস্তবজীবনাশ্রয়ী রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৩

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি আধুনিক মূল্যায়ন এই যে, শরৎচন্দ্র সত্যের প্রতিলিপি-রচয়িতা মাত্র, সমাজ-মুক্তির পথপ্রদর্শক নন। তাঁর গফুর অত্যাচারিত কৃষক, বিচারের আশায় যার দীন আবেদন ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চারিত। তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, স্পষ্ট কোনো সমাধানের পথ নির্দেশ করেন নি। তাই গোর্কী-নির্দেশিত বাস্তবতার শ্রেণীবিচারে তাঁকে socialist realist না বলে, critical realist বলাই শ্রেয়তর; অথচ বাস্তবতাবোধে জীবনের সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তার যথার্থ রূপ হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ, যে লেখা শুধুমাত্র সামাজিক অনাচারের চিত্রায়ণই করবে না মাত্র, শিল্পশোভন রূপের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্টভাবে

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করে সমাজ-বিপ্লব বা সমাজ-মুক্তির স্পষ্ট পথ নির্দেশ করবে।

সমগ্রভাবে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে এই মূল্যায়ন গ্রহণীয় হলেও তাঁর ছোট-গল্প বিশেষত 'মহেশ' সম্পর্কে এই কঠোর মূল্যায়নে কিছু বক্তব্যের অবকাশ থাকে। 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'বামুনের মেয়ে' কিংবা 'অরক্ষণীয়া'—যেখানে শরৎচন্দ্রের সমাজভূয়িষ্ঠ চৈতন্যটি সর্বাপেক্ষা জাগ্রত বলে প্রচারিত, সেখানে কিন্তু গ্রন্থের ফলশ্রুতিতে আমরা হতাশ না হয়ে পারি না; কেননা মনে প্রশ্ন জাগে লেখকের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু 'মহেশ' গল্পে তাঁর বক্তব্য অনেকটাই স্পষ্ট, সমস্যার চেহারা বহুলাংশেই বাস্তব এবং পরিণতির ফলশ্রুতিও দ্বিধামুক্ত। শরৎচন্দ্রের পক্ষে কি সত্যই 'মহেশ' গল্পের মধ্য দিয়ে সমাজ-মুক্তির স্পষ্ট পথনির্দেশ করা সে যুগে সম্ভব ছিল? টলস্টয়ের উত্তর-জীবন বা গোর্কীর সাহিত্যিক জীবনের দেশকালগত প্রেক্ষাপট আর বাংলাদেশের তৎকালীন পরিবেশের মধ্যে সাধর্ম্য কোথায়? গোর্কীর চোখের সামনে একটি স্পষ্ট, বাস্তব, জীবন্ত ও সার্থক বিপ্লবের নজির দেখা দিচ্ছিল ও দিয়েছিল, ছিল লেনিনের মতো নেতার নেতৃত্ব, দেশজোড়া জার-বিরোধী মনোভাব ও সর্বহারা বিপ্লবের যথাযথ বনিয়াদ। তাই realismকে তিনি খুব সঙ্গত-ভাবেই socialist realism-এর লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমরা জানি যে, আমাদের সাহিত্যে যাঁদের মধ্যে গোর্কী-কথিত এই সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাবোধ দেখতে পাওয়া গেছে, তাঁরা দ্বিতীয় পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। 'কল্লোলে'র যুগ ও কালকে অতিক্রম করেই এই সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার চেহারা বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। সুতরাং রুশ-বিপ্লবের ঠিক অব্যবহিত পরেই এবং সুকান্ত-মানিকের প্রায় কুড়ি বছর আগে শরৎচন্দ্রের কাছে এই socialist realism-এর পরিপূর্ণ প্রত্যাশা করা কি ঠিক? কিন্তু ইতিহাসগতভাবে একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র কল্লোলীয়দের অন্যতম প্রেরণাদাতা ও 'কল্লোলে'র পথে এসেই আপন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মিত হয়েছিলেন কল্লোলীদের উপদেশে, যাঁরা হামসুন ও গোর্কীকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। তাঁরই ভাষায় 'ভাবের আকাশের ঝড়' ও 'মাটির পৃথিবীর বন্যা'কে কি কখনো মেলানো যায়? কল্লোলীয়দের বাস্তবচেতনায় এই ত্রুটি অবশ্যই ছিল, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ফ্রয়েড থেকে মার্কসে এসে পৌঁছোতে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। আর একথাও সত্য যে 'হারানের নাতজামাই' বা 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র মতো গল্পও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি লেখেন নি,

কেননা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধকে যথার্থ শিল্পরূপ দেওয়া খুবই দুরূহ, এবং এ বিষয়ে লেনিন কিংবা মাও সে-তুং-এর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

আমরা জানি যে, নব্যপন্থীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধের সময় শরৎচন্দ্র কল্লোলীয়দের সমর্থন করেছিলেন এবং তরুণেরা তাঁকেই গুরু রূপে বরণ করেছিলেন। যুবনাশ্ব বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প শরৎচন্দ্রের আদর্শেই আবির্ভূত হয়েছিলো। আর শরৎসাহিত্যের সামগ্রিক ক্ষেত্রভূমিটি থেকে মহেশ গল্পটি উঠে এসেছিলো স্পষ্ট একটি সাহিত্যিক পথনির্দেশরূপে। রবীন্দ্রনাথের তির্যকতা বা প্রভাতকুমারের সরলীকরণ নয়, আপন যুগ ও জীবনের উপযোগী বাস্তবতাবোধ ও জীবনসমালোচনার ভঙ্গি নিয়ে শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লিখেছেন। শুধুমাত্র socialist realismএর অভাবের জন্যই তাঁর অবমূল্যায়ন করা অর্থহীন। যা সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যেই তথা ছিলো না, যা থাকা সম্ভবপর ছিলো না,—তার অভাববোধটাই খুব সম্ভব বাস্তব অভাববোধ নয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র স্বল্পতম ছোটগল্পের রচয়িতা, প্রচুরতম গল্প-রচনার সুনির্দিষ্ট প্রেরণাভূমি ; রবীন্দ্রছোটগল্পের ধারাপথ থেকে বাংলা গল্পের ভিন্নধারাপথপ্রদর্শক, বাংলার কৃষকসাধারণের যথার্থ প্রতীকের স্রষ্টা।

শরৎচন্দ্র ও টেগার্ট

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

মনে হয় বছরখানেক আগের কথা। 'দেশ' পত্রিকায় পড়েছিলাম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটা লেখা। দীর্ঘ লেখা। প্রধানত তার যা বিষয়বস্তু তা নিয়ে আমার কিছু জানা নেই, বক্তব্যও নেই। আমার যা কথা তা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নিয়ে উক্ত লেখায় যেটুকু ছিল সেই সম্পর্কে। 'পথের দাবী' বের হবার পর টেগার্ট সাহেব নাকি তাঁকে ডেকে ধমকেছিলেন : এতে নাকি তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন।

পথের দাবী প্রথম বের হয় 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে। আমরা জেলে বসে পড়ি। বলাবাহুল্য, ভাল লাগে। বঙ্গবাণী পরিচালনা করেন তখন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জেল থেকে বের হবার পর ডাঃ অমিয় বোস আমায় বলেন, পুরুলিয়ায় তাঁদের বাড়ি ছিল, সেখানেই শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। পরে অমিয়, উমাপ্রসাদ—এঁরা শরৎবাবুর কাছে প্রায়ই যেতেন। এঁরা তখন আমাদের দলে। এঁদের কাছে যতীন মুখার্জি, রাসবিহারী বোস, যাদুগোপাল মুখার্জি প্রমুখের গল্প শোনেন শরৎবাবু। এখানেই পথের দাবী লেখার প্রেরণা। যখন লিখতেন, এঁরা গেলে পড়ে শোনাতেন, আলোচনাও হত অনেক কথা নিয়ে।

১৯২৮ সালে জেলে থেকে বের হবার পর আমি ও অরুণদা। (অরুণচন্দ্র গুহ) মাঝে মাঝে শরৎবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতাম। পরে আমি ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রায়ই যেতাম। বহু কথা হত। ওঁর আলাপের ধরন ছিল এত মিষ্টি, এমন রসিকতায় ভরা, ৪।৫ ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যেত টের পেতাম না। অনেক দিন সহজে ছেড়েও দিতেন না। স্বভাবতঃই পথের দাবী নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। বহু আলোচনাও হয়েছে ও বই নিয়ে, টেগার্ট ওঁকে ধমকেছেন—এমন কোনো কথা কিন্তু আমাদের বলেননি।

কথা চেপে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, তেমন কিন্তু আমরা কখনও অনুভব করিনি। বরং মনে হয়েছে, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ। অমিয়র মুখেও শুনেছি, ওঁর কোনো দুর্বলতা কথায় প্রকাশ পেলে ধমক দিয়েছেন, শিশুর মতো হেসেছেন। নিজের দোষ দুর্বলতা ঢেকে কথা বললে সে মানুষের সঙ্গে খুব একটা অন্তরঙ্গতা যেন আসে না। অথচ আমরা তাঁর অনাত্মীয় এমন মনে করারও কোনো কারণ ঘটেনি কখনও। এমনও শরৎবাবু ভাবতে পারেন না যে টেগার্টের বিরুদ্ধে কোন উক্তিতে আমরা অসন্তুষ্ট

হব। সাহিত্যিক মানুষ প্রকৃতি কোমল। কোমলতা মানেই যে ভীরুতা নয় তাও তাঁকে দেখে মনে এসেছে। টেগার্ট ধমকাবে আর প্রতিবাদ না করে তা হজম করে আসবেন, ভাবতে পারা যায় না। প্রতিবাদ করলে টেগার্ট মারবে? হাতকড়া পরাবে? তাই চুপ করে এসেছেন? শরৎবাবু সম্পর্কে এমন চিন্তা, হীনতাও কখনও সন্দেহ করিনি। প্রতিবাদ করে উঠে আসার পক্ষে বাধা কি ছিল? বই তো বাজেয়াপ্তই করেছে। আবার ধমক কেন?

১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশন কলকাতায়। সুভাষচন্দ্র বোস ভলাণ্টিয়ার দলের জি-ও-সি, দলের তরফ থেকে জি-ও-সি করা হয়। তিনি তখন জামসেদপুরে এক ধর্মঘট পরিচালনা করছেন। সময় চলে যায়, তিনি আসছেন না। আমি যাই। তাঁকে তাগিদ দিই, সব কাজ পড়ে রয়েছে, তুমি এখানে, কবে হবে সব? হেসে বললেন, তুমি দল-সংগ্রহ আরম্ভ কর, পার্কগুলিতে প্যারেডের ব্যবস্থা কর, আমি আসছি। তাই করি। আমহার্স্ট স্ট্রীটে অফিস করে কাগজে ঘোষণা প্রচার করি। ১৯১৮ সালের ৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের ফেরত আমাদের দলের কর্মী কয়েকজনকে দিয়ে প্যারেড শুরু করাই। হেমন্ত বোস ছিলেন তাঁদের একজন। আবার তাঁদের ভিতর ছিলেন না, নিজের চেষ্টায় প্যারেড শিখেছেন, এমনও ছিলেন সত্যভূষণ গুপ্ত। ভলাণ্টিয়ারদের ভিতর থেকে দলে ছেলে পাওয়া যায় কিনা, সেই চেষ্টায় ডাঃ নারায়ণ রায় ও তাঁর তিন বন্ধু ডাক্তারও ভলাণ্টিয়ারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন। অমিয় তখন বিলেতে।

সুভাষ আসার পর ভলাণ্টিয়ার অফিস পার্কসার্কাসে যায়। সুভাষকে অনেক সময় বাইরে কাটাতে হয়। অফিসের কাজ আমিই দেখি। আমার অনেক সময় কাটে অফিসে। শরৎবাবু তখন প্রায়ই আসতেন। তিনি তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। সুভাষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেশ গড়ে ওঠে, যদিও সুভাষ ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী। শরৎবাবু উপহাস করতে ছাড়তেন না। লাল হয়ে উঠত সুভাষের মুখ। এসময় কি সুভাষের সঙ্গে, কি আমার সঙ্গে, যখন একলা থাকতেন টেগার্টের কথা কখনও কিন্তু বলেননি। সুভাষ যখন না থাকতেন তাঁরও ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু শরৎ-বাবুর কথায় বিদ্বেষের বা নিন্দার লেশ থাকতো না কখনও, প্রতিটি কথা সুভাষ সম্পর্কে স্নেহসিক্ত। আর সুভাষের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ১৯১৩-১৪ সালে, আমি তখন দৌলতপুর কলেজে পড়ি। ভিন্ন দলে তখন ওঁরা, তাঁরা অনেকে আসতেন। তার পর তো একসঙ্গেই আমরা অনার্স ক্লাসে পড়ি। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট, সম্পর্ক নিবিড় প্রীতিশ্রদ্ধার।

১৯২৮-এর কংগ্রেসেই নেহেরু রিপোর্ট অনুযায়ী কংগ্রেসের ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাব পাশ করবার কথা। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রধান শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রেসিডেণ্ট এবং জহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বোস যুগ্ম-সম্পাদক। রাতারাতি দুই বৃদ্ধ নেতা মোতিলাল নেহরু ও গান্ধীর চাপে পড়ে রাজী হয়ে এসেছেন—ও প্রস্তাবে বাধা দেবেন না। পরদিন ভলাণ্টিয়ার অফিসে ধরি সুভাষকে। বলি, দলের কারও সাথে পরামর্শ না করে কি করে রাজি হয়ে এলে ?

—এমন চেপে ধরলেন, বাধা দিতে পারলাম না।

—বাধা তোমাকে দিতে হবে। সকালে সাবজেকট কমিটির মিটিংয়ে তোমার দাদা শরৎবাবুকে দিয়ে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করিয়ে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসে তা তোমায় তুলতে হবে।

—কিন্তু কথা দিয়ে এসেছি যে !

পাশে থেকে শরৎচন্দ্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় মন্তব্য কাটেন মুখের উপর হাত নেড়ে। সুভাষের চোখ মুখ কান লাল হয়ে ওঠে। মুখে কথা সরে না।

পরদিন যুগান্তরের সব কর্মী ও নেতাদের এবং তাঁদের যাঁরা এ. আই. সি. সি. ও বি. পি. সির সদস্য তাঁদের সভা ডাকা হয়। সুভাষকে ডেকে আনা হয়। অনেকে অনুরোধ জানান। সব চেয়ে আবেগভরে বলেন আজকের অমর শহীদ সতীন সেন। তাঁর কথা—শরৎ বোস বাংলার নেতা নয়, বাংলার নেতা সুভাষ, তিনিই বাধা দেবেন।

সুভাষ তখন জি-ও সির শিরস্ত্রাণ ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনারা যদি সকলে চান তাই হবে। সবাই খুশি। সুভাষ আমায় আড়ালে বললেন, গান্ধীর কাছে হারব তো নিশ্চয়ই। দেখো যেন মাত্র ২।৪ ভোট না পাই। আমি বলি, সে ভাবনা তোমার নয়, সে ভার আমাদের।

অরুণদাকে নিয়ে সব ক্যাম্প ঘুরি। অন্য প্রদেশের সহকর্মীদের বলি। সবাই মুষড়ে আছেন সুভাষ বাধা দেবেন না শুনে। এখন তাঁরা উৎসাহিত। গান্ধী বিরক্ত হন, একটা কথা দিয়ে কথা রাখবেন না ? আমাদের কিন্তু লাভ হয়। গান্ধী বলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা মুখে বললেই তো হল না। তার পেছনে জোর কোথায়, sanction কোথায় ? ফাঁকা বুলিতে কংগ্রেস খেলো হবে। তখন প্রস্তাবের রূপ-বদল হয়। ইংরেজ সরকারকে এক বছরের সময় দেওয়া হল। এর ভিতর যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস না দেয় তো আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করে আইন অমান্য আন্দোলন করা

Sunday **15 January, 1933**

Beng. : 2 Magh, 1339

Sam : 4 Magh (Budee) 1989 *Fus* : 4 Magh 1340

শ্রী[illegible]

গ্রাম [illegible]

পোষ্ট — [illegible] ; জেলা কটক

বাকি বেতন ছিল — ২০,
১৩৪০ — ৩০,
৫০,
১লা কার্ত্তিক — ৮,
১৩৪০ (ঠাকুর [illegible] বাড়ী [illegible] ১৩৪০ [illegible])
১০ই কার্ত্তিক m.o.
বাড়ীর ঠিকানায় — ৩০,
মাসে m.o — ২০,
১০৮,
বৈশাখ ১৩৪১ — ২০,
১লা m.o.
বাকী — ১৫,

২০শে ফাল্গুন ১৩৩৯
হতে আরম্ভ করিল বাড়ী হইতে
ফিরিয়া —
{২০শে কার্ত্তিক পর্যন্ত —
১৩৪০
৮ মাস ১০, হি: ৮০,
২০শে কার্ত্তিক [illegible]
বাড়ীর ঠিকানায় [illegible]

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪০
ঠাকুর বাড়ী [illegible]
[illegible]
ফাল্গুন ৪০ — ১০,
চৈত্র ৪০ — ১০,
বৈশাখ ৪১ — ১০,
১১০,

শরৎচন্দ্রের হিসাবের খাতার একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

হবে। এই আইন অমান্যই sanction। আমাদের "স্বাধীনতা" কাগজেরও সুর চড়লো।

কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ দিনে রাত ১টা পর্যন্ত ভোটগণনা হল, হেরে গেলাম। কিন্তু বারশ ভোটের ভিতর মাত্র চারশরও কম ভোটে। সে ভিন্ন কথা। ইতিহাসের কথা এই উপলক্ষে কিছু বলা হল। আমার আসল কথা, শরৎবাবুকে যদি টেগার্ট ধমকেই থাকেন, এত কথার ভিতর তিনি তা লুকোবেন কেন? কত তো ঘরোয়া কথা হয়েছে কত সময়ে, তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি।

আরও আগের কথা। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর উমাপ্রসাদ আমায় দেখান পথের দাবী পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন সেই চিঠি। উমাপ্রসাদের কাছেই রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন। শরৎ-বাবুকে তিনি তা দেখিয়েছেন। বুঝতেই পারা যায়, কী রকম আঘাত পেয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে গেছেন। বললাম, এ চিঠি এখন প্রকাশ না করা ভাল।

কিছু কাল পরে কিন্তু উমাপ্রসাদ তা প্রকাশ করেন। হয়তো জন-সাধারণের প্রতি কর্তব্য বড় মনে হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক, আর এমন ত হয়ই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথের মনোভাবের কথা বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখে গেছেন। শিশিরকুমার ঘোষ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উক্তির উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ গভীর স্নেহ করতেন দ্বিজেন্দ্র-লালকে, তবু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তাঁর ব্যঙ্গনাট্য "আনন্দবিদায়"। নীরবে সহ্য করেন সে আঘাত রবীন্দ্রনাথ। অনুশোচনাই হয়ে দাঁড়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদ্‌রোগের (heart attack) কারণ। তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তাঁর শেষ চিঠি। "ভারতবর্ষে" তাঁর অশ্রুসিক্ত সেই চিঠির ছবি বেরিয়েছিল। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নীরবতাই ঐ heart attack-এর মূলে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির উল্লেখ শরৎবাবুর কাছে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। করেছিলেন তিনি নিজেই। করে আর কথা বলতে পারেননি। সেদিন আর আলোচনা জমেনি।

এতসবের পরেও ভাবতে পারি না টেগার্টের কথাটা কেন তিনি আমাদের কাছে চেপে যাবেন। তবে জিতেনবাবুও পরে লিখেছেন, যা শুনেছিলেন তার ছাপ তাঁর মনে যা থেকে গিয়েছিল, তাই তিনি লিখেছেন। আমিও বলি, হতেও পারে। মানুষের সাইকোলজি সব সময় কোনো বাঁধা সিস্টেম মেনে চলে না। কথাটায় শরৎবাবু হয়তো তেমন গুরুত্ব দেননি, আমাদের কাছে তাই বলেননি কিছু। কিন্তু তাও কি সম্ভব অত গল্পগুজবের ভিতর?

পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। অতি সহজেই এ থেকে আমরা বুঝতে পারি শরৎচন্দ্রের প্রজ্ঞা ও মনীষার পরিচয়।

চন্দননগরের আলাপ-সভায় (১৯৩০ সালে) শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রসঙ্গত বলেছেন, 'আমার বাড়ীতে যে বই আছে, তার অধিকাংশ সায়েন্সের বই। সেইজন্যই আমার বইয়ে যুক্তির অবতারণা বা synthetic result বেশী।' শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে কথিত এই সায়েন্সের বই কী পরিমাণে ছিল তা তালিকাদৃষ্টে বিচারের ভার সমালোচকদের। আপাততঃ তাঁর গ্রন্থাগারে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত আর যেসব বই আছে— মোটামুটি তার একটা আলোচনায় আসা যাক।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোন বইয়ের সংগ্রহ নেই। শুধুমাত্র কবি শরৎচন্দ্রকে যে 'Golden Book of Tagore' বইখানি উপহার দিয়েছিলেন—তা বর্তমান আছে। গ্রন্থাগারে বিশেষ করে নজরে পড়ে ডিকেন্স ও টলস্টয়ের সমস্ত রচনাবলীর সংগ্রহ। শরৎচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশ ঘোষাল শরৎচন্দ্রের বিদেশী সাহিত্যিকদের পুস্তক প্রীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, 'বিদেশীদের দু'একখানা বই আমি অনুবাদ করেছিলুম, কিন্তু সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়—ওদের মধ্যে ডিকেন্সের লেখা আমার খুব ভালো লাগতো।' ডিকেন্স-এর লেখা যে সত্যিই ভালো লাগতো তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থাগারে ডিকেন্সের বইয়ের এই সংগ্রহ। অন্যদিকে টলস্টয়ের পুস্তক সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে। টলস্টয়ের যে তিনি একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তা বোঝা যায় চরিত্রহীন উপন্যাসটির immoral দুর্নাম খণ্ডন করার জন্যে, তিনি বহুবার বহু চিঠিতে কাউণ্ট টলস্টয়ের লেখার এবং তাঁর লিখিত 'রিসারেকশন' বইটির উল্লেখ করেছেন।

নারীজাতির আত্মসম্মান নিয়ে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পরিকল্পনা ছিলো—'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে তিনি খানকতক বই লিখবেন। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে দেখা যাচ্ছে, 'Woman in All Ages and in All Countries' সিরিজের সাতখানি বইয়ের সংগ্রহ। বিভিন্ন দেশের নারীজাতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবার জন্যেই হয়তো বইগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

১৯১৩ সালে বন্ধু ফণী পালকে তিনি লিখেছেন, 'আর একটা কথা আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছি—এক-একবার ইচ্ছে করে, এইচ. স্পেন্সারএর সমস্ত 'সিন্থেটিক ফিলোসফির' একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়,

আলোচনা এবং ইউরোপের অন্যান্য ফিলোসফার যাঁরা স্পেনসারএর শত্রু মিত্র—তাঁদের লেখার ওপর একটা বড়ো রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি।' পরবর্তী কালে 'সমাজ-ধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে তিনি স্পেন্সারের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাগারের সংগ্রহে স্পেন্সারের পুস্তকও দেখা যাচ্ছে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বাংলাদেশে সোস্যালিজমের চিন্তাধারা আমদানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লব ও রুশ-বিপ্লবের মহানায়কদের জীবনী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে লিখিত পুস্তকের চাহিদা হয়। এইসব পুস্তকের অধিকাংশই তখন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিল না; কিন্তু শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে এই সম্পর্কে বহু পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে এবং যথারীতি সংগ্রহের তারিখও পুস্তকের পৃষ্ঠায় নিজস্ব স্বাক্ষরের সঙ্গে উল্লিখিত আছে। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, "···এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে হাওড়া শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। তিনি এই বৈঠকগুলিতে বাঙলাদেশে একটি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের এই 'সমাজতন্ত্রের' দিকে ঝোঁক যে এইসব রাজনৈতিক গ্রন্থগুলি থেকে প্রভাবিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। ১৯২২-২৩ সালে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদিত 'Young India' সাপ্তাহিকের সংগ্রহ আছে। সেই সঙ্গে বর্তমান কালের কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গের সম্পাদিত 'The Socialist' কাগজেরও যে তিনি গ্রাহক হয়েছিলেন—তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থাগারে বর্তমান। তাই হয়তো পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধীজীর সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে, 'তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজম্‌কে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে?'

সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকগুলি এবং পুস্তকগুলির পাতায় দাগ-সমন্বিত শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্যগুলি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও মনীষা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে। আগ্রহশীল গবেষকদের কাছে শরৎপ্রতিভার মূল্যায়নে এই গ্রন্থাগারটি যে যথেষ্ট সহায়ক হবে—তা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অবহেলায় এবং কীটদষ্ট হয়ে বইগুলির আয়ুষ্কাল অবিলম্বেই শেষ হতে চলেছে। এখন সরকারী উদ্যোগে রাহুমুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে রক্ষিত
বই ও পত্রিকার একটি তালিকা

(*-চিহ্নিত বইগুলিতে নিজের হাতে দাগানো আছে এবং তারিখসহ স্বাক্ষরিত বইগুলির পরিচয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত।)

গল্প, উপন্যাস, নাটক (ইংরাজী)

Benavente, Jacinto—Plays. New York, 1923.
,, —2nd Series.
,, —3rd Series.
,, —4th Series.
(signature and date 2. 8. 23)। **প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৫ সালে নাট্যকার স্পেন থেকে কবি দিনেশ দাশের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন।**

Bojer, Johan—The Great Hunger. London, 1922.
(signature and date 30th June, 1922.)

Brienx—Woman on Her Own, False Gods and the Red Hole : Three Plays. London, 1916.
(signature and date 11. 2. 21.)

Dickens, Charles—Sketches by BOZ
—The Works of Charles Dickens. London, 1938.
, Vol—II The Posthumous Papers of the Pickwick Club.
,, Vol—III The Adventures of Oliver Twist.
,, Vol—IV The Life and Adventures of Nicholas Nickleby.
,, Vol—V The Old Curiosity Shop & Master Humphrey's Clock.
,, Vol—VI Barnaby Rudge.

Dickens, Vol—VII The Life and Adventures of Martin Chuzzleurt.
„ Vol—VIII Dombey and Son.
„ Vol—IX The Personal History of David Copperfield.
„ Vol—X Christmas Books & Reprinted Pieces.
„ Vol—XI Bleak House.
„ .Vol—XII Little Dorrit.
„ XIII—A Tale of Two Cities & The Uncommercial Traveller.
„ XIV—Great Expectation & The Lazy Tour of Two Idle Apprentices.
„ XV—Our Mutual Friend.
„ XVI—The Mystery of Edwin Drood & Hard Times.
„ XVII—Christmas Stories.
„ YVIII—American Notes. Pietures from Italy. Contribution to "The Examiner."
„ XX—Charles Dickens, by George Gissing. Dickens Land by J. A. Nicklin. Dictionary of Characters, Places etc. in the Novels & Stories.

Dumas, Alexandre—The Black Tulip. London.
Dumas, Alexandre—The Lady with the Camelias. London.
France, Anatole—The Red Lily. London.
Gorki, Maxim—The Orloff Couple and Malva, London, 1901. (signature 7. 21.)
„ —A Night's Lodging. Boston, 1920. (signature and date 17. 8. 20.)
Gorki, Maxim—In the World. London.
* Ham Sun, Knut—Growth of the Soil, London. (signature and date 21. 4. 22.)

Ham Sun—Hunger. London.
(signature and date 10/22.)
Hutchinson, A.S.M.—If Winter Comes. London.
Ibanez, Vicente Blasco—The May Flower—A Tale of the Valencian Sea-Shore. London.
(signature and date 10. 1. 23.)
Lagerlof, Selma—The Outcast. London.
(signature and date 22. 7. 22.)
Maran, Rene—Baltouale—a Negro Novel from the French. London, 1921.
Marrion, I—Tillers of the Ground. London. 1911.
Pope, Alexander—The Poetical Works. London.
Sudermann, Hermann—The Song of Songs. New York, 1908. (signature and date 20. 4. 22.)
Tagore, Rabindranath—Golden Book of Tagore.
(signature and date 7th March 1932)
Tolstoy—Crime and Punishment. London.
(signature and date 17. 8. 20.)
Tolstoy's Work—(a) The Cossaks. (b) Sevastopol. (c) The Invaders and other Stories.
(signature and date 1. 26.)
„ —Resurrection. London, 1910.
The Complete Works of Tolstoi
„ Anna Karenina. Vol I
„ „ „ Vol II
„ Master and Man. The Kreutzer. Sonata. Dramas.
„ The Long Exile and Other Stories.
„ The Life of Count Tolstoi.
„ A Russian Proprietor. The Death of Ivan Ilyitch and Other Stories.
„ My Confession. My Religion. The Gospel in Brief.
„ Childhood, Boyhood, Youth.

Tolstoy, Resurrection, Vol—I & Vol—II.
„ What Is To Be Done ? Life.
Wragge, Clement L—The Romanece of the South Seas. London, 1906.

রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও জীবনী

Blatchford, Robert—Merrie England. London, 1895.
Bonomi, Ivanoc,—From Socialism to Fascism (A Study of Contemporary Italy). London, 1924.
(signature and date 9. 7. 25.)
Brockway, A. Fenner—Non-Co-Operation in Other Lands. Madras.
(signature and date 14. 2. 22.)
Carree, Jean—Degeneration in the Great French Masters.
Das, Rajanikanta—Factory Labour in India. London.
Douglas, Sir Robert K.—China. London.
(signature and date 6. 7. 25.
Keynes, John Maynard—A Tract On Monetary Reforms. London, 1923.
(signature and date 20. 3. 24.)
Macswiney, Terence—Principles of Freedom. London, 1921.
Madelin, Louis—The French Revolution. London.
(signature and date 9. 7. 25.)
Marcu, Valeriu—Lenin. London, 1928.
(signature and date 27. 7. 28.)
Marx, Karl—The Civil War in France. (Preceded by the Two Manifestoes of the General Council of the International on the Franco-Russian War). London, 1921.

Mitra, H. N.—A Chronological Record of the Phases of Developments in Indian Polity during 1918.

,,—Punjab Unrest Before and After. (1921)

Morrison, Sir Theodor—The Economic Transition in India. London, 1916.
(signature and date 5. 21.)

Nag, Hem Chandra—Lawless Laws or, Regulation III & Bengal Ordinance.

Por, Odon—Fascism. London, 1923.
(signature and date 9. 7. 25.)

Postgate, R. W.—The Bolshevik Theory. London, 1920.

Rao, M. Ramachandra—The Development of Indian Polity.
(signature and date 28. 4. 23.)

Seely, J. R—The Expansion of England. London, 1918.
(signature and date 16. 12. 22.)

Skelton, O. D.—Socialism. New York, 1911.

Trotsky—Lenin. London, 1925.
(signature and date 12. 25.)

Webster, Nesta H.—Secret Societies and Subversive Movement. London, 1926.
(signature and date 12. 25.)

Williams, Robins, Ransome—Lenin. London, 1919.
(signature and date 1923.)

বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধপুস্তক

Berl Emmanuel—The Nature of Love. London, 1924.
(signature and date 7. 7. 24.)

Bhandarkar, D. R.—Asoke. Calcutta, 1925.

Chanda, Ramaprasad—The Indo-Aryan Races, Part I.—A Study of the Origin of Indo-Aryan People and Institutions. Varendra Research Society, Rajshahi, 1916.

Cockton, Henry—Valentine Vox. The Ventriloquist, London.

Fick, Richard—The Social Organisation in North-East India in Buddha's time. (Pub : University of Calcutta) 1920.

Frink, H. W.—Morbid Fears and Compulsion,—Their Psychology and Psychoanalytic Treatment London, 1918.

Haeckel, Ernst—The Wonders of Life—a Popular Study of Biological Philosophy.
(signature and date 2. 4. 10.)

„ —The Riddle of the Universe—At the Close of the Nineteenth Century.
(signature and date 7. 5. 10.)

Haeckel, Ernst—The Evolution of Man—A Popular Scientific Study.
(signature and date 30. 7. 10.)

Hall, Stephen King—Western Civilisation and the Far East. London.
(signature and date 16. 2. 25.)

Hunter—Annals of Rural Bengal.
(signature and date 18. 2. 26.)

Huxley, Thomas Henry—Ethical aud Political. London, 1903.
(signature and date 19. 3. 12.)

„ —Lectures and Essays. London.
(signature and date 19. ?. 12.)

„ —Man's Place in Nature and a Supplementary Essay. London, 1908.
(signature and date 5. 12. 09.)

Keynes, John Maynard—The Economic Consequences of the Peace. London, 1920.

„ —Money, Banking and Exchange in India.
(signature and date 28. 4. 23.)

Kroptkin, P—Russian Literature—Ideals and Realities.
(signature and date 1924.)

Kroptkin—The Russian Literature. London, 1916.

Marchant, Sir James—The Control of Parenthood, London.
(signature and date 18. 8. 23.)

Macabe, Joseph—Haeckel's Critics Answered.
(signature and date 21. 6. 10.)

Mercier, Charles—Crime & Criminals, being the Jurisprudence of Crime. London, 1918.

Mohindra, K. C.—India Currency & Exchange. Madras, 1922.
(signature and date 26. 12. 26.)

Russel, Bertrand—An Outline of Philosophy. London. (signature and date 10. 5. 28.)

Seth, James—A Study of Ethical Principles. London, 1897.

Spencer, Herbert—Principles of Ethics, Vol—I. London, 1904.

State, George—The Koran, London.
(signature and date 8. 7. 11.)

Stephen, Henry—Elements of Analytical Psychology. Calcutta, 1907.

Williams, L. F. Rushbrook—India in 1923-24—a statement prepared for presentation to Parliament in accordance with the requirements of the 26th Section of the Govt. of India Act. Govt. of India, 1924.
(signature and date, January 25.)

"Woman—in All Ages and in All Countries" series :-
„ Larus, John Rouse—Woman of America.
„ Thieme, Hugo, P—Woman of Modern France.
„ Brittain, Rev Alfred--Roman Women.
„ Sohoeufeld, Hermann—Woman of the Teutonic Nations.
„ Carrol, Mitchell—Greek Women.
„ Butler, Pierce—Women of Mediaeval France.
„ Brittain, Rev. Alfred—Women of Early Christianity, Philadelphia.

Origin of Species, London.
(signature and date 27. 7. 10.)

বিবিধ

Dem, Ditcher,—Bengalische Erzahlor—Der Sieg Det Seele. (Pub Ausdemindischen in Deutsche.)

Criminal Procedure Code, 1924. (Pub, M. C. Sarker & Sons. Calcutta, 1924.)

Pocket Criminal Hand Book (Pub. M. C. Sarker & Sons. Calcutta, 1925)

Beeton's Medical Dictionary, London.

Marteen, J. T.—Census of India—Bengal, Part—I. 1921 (Govt. of India, 1921)

Nelson's Encyclopaedia, Vol—IV. London.

Thompson, W. H.—Census of India, Vol—1,1921. (Govt, of India 1621.)

পত্র-পত্রিকা

The Indian Annual Register (being an Annual Chronicle and Digest of Public Affairs of India in matters Political, Educational, Economic etc. 4 Vols. (From 1920—1923)
(১৯২০ সালের খণ্ডটিতে পেন্সিলে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে ২৬।৬।২১ এবং ১৯২১ ও ১৯২২ সালের খণ্ড দুইটিতে শুধুমাত্র স্বাক্ষর আছে—S. C. Chatterjee।

The Indian Quarterly Register—Journal of Indian Public Affairs, in matters of Political, Social and Economic etc. 8 Vols. (From 1924 to 1933.)
(১৯২৪ ও ১৯২৭ সালের খণ্ড দুইটিতে পুস্তানির ওপর শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর ও তারিখ আছে যথাক্রমে S. C. Chatterjee, 20. 6. 25. এবং 21. 9. 28.)

The Round Table (Quarterly Review of the Politics of the British Empire.)

The Socialist (A Magazine of International Socialism.) Edited by S. A. Dange, Bombay. VOL—1. No 2, 1923.

Young India, Edited by M. K. Gandhi. (Weekly) Vol—III, 1921. Vol—IV. 1922
(১৯২১ সালের খণ্ডটির পুস্তানিতে ১৮৭, ৩০৯, ও ৪১৮ পৃষ্ঠার উল্লেখ আছে এবং ইংরাজীতে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে।)

বঙ্গবাণী, ভাদ্র-মাঘ, ১০২৯, ১০৩০, (এই 'বঙ্গবাণী'তেই মহেশ' ও 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়েছিল।)

ভারতবর্ষ—১৩২৫, ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮
(১৩২৬ সালের খণ্ডটিতে শরৎচন্দ্রের বাংলায় স্বাক্ষর ও তারিখ দেওয়া আছে ২রা পৌষ ১৩২৬)

গল্প, উপন্যাস, নাটক (বাংলা)

আলী, সেখ মোহাম্মদ ইস্‌লাম—মর্মবীণা (কবিতার বই) ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৯২৫)

(প্রথম কবিতার উপরে নিম্নোক্ত কথা লেখা আছেঃ 'বঙ্গের গৌরবরত্ন, সুধীসমাজের শিরভূষণ, ঔপন্যাসিক কুলগুরু, সাহিত্য-সম্রাট পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্তবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সু-কর-কমলে ভক্তি উপহার সরূপ প্রদত্ত হইল।—দীন গ্রন্থকার' ২৮।১।২৫।

উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ২য় অধিবেশন, প্রয়াগ।

কালিদাস-এর গ্রন্থাবলী—রঘুবংশম্।

খাঁ, মোহাম্মাদ আকরম—কোর আন শরীফ (১ম খণ্ড) মোহাম্মদী পাবলিশিং কোং, কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী' (২য় খণ্ড) বসুমতী কার্যালয়।

চৌধুরী প্রমথ—নানাকথা, (প্রকাশক : প্রমথ চৌধুরী কলিকাতা)।

প্রথম পাতার উপর লেখা আছে :

শ্রীযুক্তবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করকমলেষু—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ৫।৬।১৯

চৌধুরী প্রমথ—চার-ইয়ারী কথা।

উপহারপৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত কথা লেখা আছেঃ

'To

Srijut Sarat Chandra Chatterjee with the author's complimets.

20. 9. 16.'

ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী, (শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত, ১৩১৪)

পরশুরাম—কজ্জলী (এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা)। পুস্তানিতে লেখা আছে "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু —লেখক"।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস—ময়ুখ (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩). উপহারপৃষ্ঠায় সবুজ কালিতে লেখা আছেঃ

পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদেষু,

···চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে

শ্রীমহারাখাল।

প্রকাশ থাকে যে, সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত রাখালদাসবাবুর সমস্ত পাণ্ডুলিপি সবুজ কালিতে লেখা।

বেদব্যাস—মহাভারত—কাশীখণ্ড (অনুবাদ ৺নিবারণচন্দ্র দাস)

মনুসংহিতা—(মলাটের উপরে বাংলায় স্বাক্ষর ও তাং ১. ৩. ১৩)

মুকুন্দরাম—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথমভাগ) কলিকাতা, ১৩২৫। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহৃষীকেশ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

" কবিকঙ্কণ চণ্ডী (২য় ভাগ) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)

প্রথম পাতায় শরৎচন্দ্রের ইংরাজীতে স্বাক্ষর তারিখ আছে ২২. ১০. ২৫. এবং একস্থানে শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষরে লেখা আছে চারুর দেওয়া)

মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন—রূপের বালাই (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,)

(ইংরাজীতে পেন্সিলে সই ও তারিখ ২৭. ৩. ১৭.)

মল্লিক, রমণীমোহন,—চণ্ডীদাস (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)

রায় চৌধুরী, বিভাস—অভিশাপ (দি বুক স্টল, কলিকাতা)

রায়, দিলীপকুমার—বহুবল্লভ, স্বপ্নভঙ্গ, দুধারা (অরবিন্দ আশ্রম)

উপহারপৃষ্ঠায় লেখা আছে :

এই বইখানি অশেষ শ্রদ্ধাপ্রেমাস্পদ শরৎদাকে উপহার দিলাম। ইতি স্নেহধন্য মণ্টু ; তারিখ ৮।৭।৩৬।

রায়, যোগেশচন্দ্র—বাঙ্গলা ভাষা (২য় ভাগ)

প্রথম পাতায় স্বাক্ষর আছে নিম্নোক্ত জনের : 'শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৮'।

শর্মা, সোমেশচন্দ্র—বৈদিক সন্ধ্যা—১ম খণ্ড (বৈদিকা)।

"—বৈদিক সন্ধ্যা, ২য়খণ্ড (ক্রিয়াংশ), ১৩৩৭।

সিদ্দিকী, মৌলভী চৌধুরী কাজেমদ্দিন্ আহাম্মদ্—শান্তি সোপান বা পান্থপ্রদীপ।

(শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর ও তারিখ আছে ২৪. ৩. ১৯৩৩।)

হোসেন, কাজী মোতাহার —সঞ্চরণ, ঢাকা।

শরৎচন্দ্রের অনুবাদ পুস্তক (হিন্দী)।

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র—মঝলী দিদি (অনুবাদক, রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়) ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ।

,,—নববিধান

,,—পণ্ডিতজী।

হিন্দী বই

গিবন্স, এডোয়ার্ড এডমণ্ডস্—বর্তমান এশিয়া (অনুবাদ শ্রীরামচন্দ্র বর্মা) প্রকাশক, হিন্দীগ্রন্থ রত্নাকর কার্যালয়, বোম্বাই।

প্রেমচন্দ্র—প্রেম পূর্ণিমা (হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা)

স্টোয়ী, হ্যারিয়েট এলিজাবেথ—টাম কাকা কী কুঠিয়া (অনুবাদ মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দার) প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকলিপি

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।